শওকত আলীর উপন্যাসে সমাজচেতনা ও জীবনবাস্তবতার রূপায়ণ

Depiction of Social-Consciousness and Reality of Life in the Novels of Showkat Ali

মো. জাহাঙ্গীর আলম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট-২০২০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

জাহানারা বেগম

ও

আবদুল করিম

মা-বাবার উদ্দেশে

‘ পিপিড়ার ভয়ে মাও ন থুইলা মাটিত ।
কোল দিলা বুক দিআ জগতে বিদিত ॥
ন খাই খাওয়ায় পিতা ন পরি পরাএ ।
কত দুক্ষে এক এক বছর গোঞাএ ॥’

– শাহ মুহম্মদ সগীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **মো. জাহাঙ্গীর আলম** কর্তৃক উপস্থাপিত **'শওকত আলীর উপন্যাসে সমাজচেতনা ও জীবনবাস্তবতার রূপায়ণ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য গবেষক উপস্থাপন করেননি।

(ড. ফাতেমা কাওসার)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

'শওকত আলীর উপন্যাসে সমাজচেতনা ও জীবনবাস্তবতার রূপায়ণ'– শীর্ষক আমার পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভের মুদ্রিত রূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের একজন নিয়মিত গবেষক হিসেবে আমি এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। প্রথম অধ্যায় ও উপসংহার ব্যতীত উপন্যাস-সম্পর্কিত আলোচনাকে প্রধান পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়: সমকালীন সংকট ও সংকট-উত্তরণ'–শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্রিটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ শাসনামলের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। সঙ্গতকারণেই বাদ পড়েনি ক্ষমতার পালাবদল, সমাজের রূপ-রূপান্তর, জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শোষণ-বৈষম্য, বিপ্লব-বিক্ষোভ, মুক্তির সংগ্রাম, সেনাশাসন, গণতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতা সর্বোপরি ইতিহাসের সংকট ও সংকট-উত্তরণের সকল বিস্ফোরক মুহূর্ত। 'শওকত আলীর মানসগঠন ও শিল্পিসত্তার স্বরূপ'–শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে শওকত আলীর শিল্পিমানসের চারিত্র্য। 'উপসংহার'–অংশে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারাৎসার তথা শওকত আলীর জীবনাদর্শের মৌলসূত্রসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে। 'রাজনৈতিক চেতনার উপন্যাস'–শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *ত্রয়ী দক্ষিণায়নের দিন (১৯৮৫-৮৬), ওয়ারিশ (১৯৮৯), উত্তরের খেপ (১৯৯২), অবশেষে প্রপাত (১৯৯৬), দলিল (২০০০), স্ববাসে প্রবাসে (২০০১)* ও *বসত (২০০৫) উপন্যাসসমূহ।* 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক উপন্যাস'–শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *যাত্রা (১৯৭৬), অপেক্ষা (১৯৮৫), উত্তরের খেপ (১৯৯২), হিসাব নিকাশ (১৯৯৮)* ও *ঘরবাড়ি (২০০১)* উপন্যাসসমূহ। *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটিতে দেশভাগ, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তুসংকট মূল প্রেক্ষাপট হলেও একাত্তরের চেতনাস্রোত এখানে প্রবল হয়ে ওঠায় এ অধ্যায়ে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

'নাগরিক চেতনার উপন্যাস'–শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩), গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭), ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮), যেতে চাই (১৯৮৮), বাসর ও মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০), পতন (১৯৯২), জননী ও জাতিকা (২০০১), জোড় বিজোড় (২০০১), পাকা দেখা (২০০৩), স্থায়ী ঠিকানা (২০০৫)* উপন্যাসসমূহ। তবে বিষয়বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের গভীরতা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ববহন না করায় *প্রেম কাহিনী (১৯৯২), তনয়ার স্বীকারোক্তি (২০০১), শেষ বিকেলের রোদ (২০০১), এক ডাইনীর গেঙুয়া খেলা (২০০১), ছবির উপরে ছাপ (২০০২), দোলাচল (২০০৬), কাহিনী ও কথোপকথন (২০০৭), অস্তাচলের আলো (২০০৯)* ও *ঘরে যেতে চাই (২০০৯)* উপন্যাসসমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। 'গ্রামীণ চেতনার উপন্যাস'–শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *সম্বল (১৯৮৬), নাঢ়াই (২০০৩)* ও *মাদারডাঙার কথা (২০১১)* উপন্যাসসমূহ।'ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনার উপন্যাস'- শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪)* নামক উপন্যাস।

উপন্যাসের ভাব-ভাষা-ভাবনা, বয়নকৌশল ও প্রসাধনকলার মাপ-কাঠিতে শওকতের উপন্যাসকে প্রধানত তিনটি পর্যায় বা পর্বে বিভক্ত করা যায়। যথা: এক. প্রস্তুতি পর্ব (১৯৬৩-১৯৭৬), খ. পরিণত পর্ব (১৯৭৭-২০০০) এবং গ. প্রান্তিক পর্ব (২০০১-২০১১)। প্রস্তুতিপর্বের উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* ও *যাত্রা* বর্ণনায় শওকত কিছুটা আবেগনির্ভর, কাব্যময় ভাষা ও বর্ণনাধর্মী আখ্যান গ্রহণ করেছেন। এ পর্বের মধ্যবর্তী প্রায় এক যুগের মতো সময় তিনি মূলত ব্যয় করেছেন ছোটগল্প লিখে। উল্লেখ্য যে, শওকত লেখক জীবনের সূচনাপর্বের সহজাত রোম্যান্টিকতার পরিবর্তে জীবন ও সমাজের সংকটকে গভীরভাবে উপস্থাপনে যে-শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন; তা একই সঙ্গে বিস্ময়কর ও প্রশংসাযোগ্য ।

পরিণত পর্বের উপন্যাস *ত্রয়ী দক্ষিণায়নের দিন, প্রদোষে প্রাকৃতজন, ওয়ারিশ, উত্তরের খেপ ও দলিল*-এ শওকত স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি সমকাললগ্ন এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অনুষঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত। এ পর্বে তিনি নির্মোহ-নিরাসক্ত-নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, বলশালী গদ্যভাষা, চরিত্রের মানসলোক বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক রীতি, চৈতন্যপ্রবাহ রীতি ও অতীতস্মৃতিমুগ্ধতা বা নস্টালজিয়া প্রয়োগে অনেক বেশি দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যান নির্বাচনে যেমন ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকমিথ ও লোকশ্রুতি বেছে নিয়েছেন, তেমনি রাজনীতিসচেতন নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-জিজ্ঞসা রূপায়ণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। রাজনীতির চড়াই-উতরাই, জটিলাবর্ত ও বিস্ফোরক মুহূর্তগুলো এ পর্বে বিরাট ক্যানভাসে রূপ লাভ করেছে।

প্রান্তিক পর্বের উপন্যাস *জননী ও জাতিকা, জোড় বিজোড়, পাকা দেখা, স্থায়ী ঠিকানা, দোলাচল, কাহিনী ও কথোপকথন, অস্তাচলের আলো, ঘরে যেতে চাই, নাঢ়াই* ও *মাদারডাঙার কথা*-য় শওকত রাজনীতির উত্তাল ঘটনাতরঙ্গের আবাহন অপেক্ষা গ্রামীণ লোকাচার, বিশ্বাস-বিস্ময় আকীর্ণ নিস্তরঙ্গ জীবনজঙ্গমতার সমান্তরালে নাগরিক প্রৌঢ়জীবন ও নিঃসঙ্গতার অনুষঙ্গকে নির্মাণ করেছেন। আখ্যান বয়ানে তিনি যেমন দীর্ঘকাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি ক্ষুদ্র কায়াকলেবর বিশিষ্ট উপন্যাসিকাও নির্মাণ করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের পাশাপাশি সহজ-সরল নাগরিক মান-ভাষাও প্রয়োগ করেছেন। তিনি এখানে গ্রামের দৃঢ়চরিত্রের গাভুর জোয়ানের বিপ্রতীপে নাগরিক জীবনের অসহায়-আপসকামী

Dhaka University Institutional Repository

প্রৌঢ় চরিত্রের সমাবেশ এবং গ্রাম, মফস্বল ও নাগরিক জীবনবাস্তবতার আকাঁড়া ও অনুদ্‌ঘাটিত প্রান্তসমূহকে বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপায়ণ করেছেন।

অনেক সমালোচক শওকতের এ প্রান্তিক পর্বের অধিকাংশ উপন্যাসকে অপেক্ষাকৃত কম শিল্পসফল ও কম মনোযোগ-প্রাপ্ত সৃষ্টিসম্ভার বলে সাব্যস্ত করেছেন। জীবনের অন্তিমপর্বে (২০০১-২০১১) শওকত-সাহিত্যের শিল্পগুণ-মান কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল; তা খানিকটা সত্য। এর মূলে কার্যকর ছিল তাঁর স্মৃতিবিভ্রাটজনিত ব্যাধির তীব্রতা, স্ত্রীবিয়োগজনিত একাকীত্ব এবং আমৃত্যু লালিত শোষণহীন-অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। এতদ্ব্যতীত পত্রিকার ঈদসংখ্যায়, লিটল ম্যাগাজিন এবং বড় ও ছোট কাগজে দ্রুত কাহিনি-নির্ভর লেখার প্রবণতাও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। তবে স্মৃতিবিভ্রাটের পীড়নই তাঁর মতো একজন সিরিয়াস লেখককে সাহিত্য সৃজনে পূর্বের মতো সর্বাত্মকভাবে বিষয় ও আঙ্গিকে মনোযোগী কিংবা যত্নবান হতে দেয়নি। ফলে এ পর্বের উপন্যাসগুলোর আকার-অবয়ব যেমন ক্রমশই ক্ষুদ্র হয়ে এসেছে, তেমনি ভাষাও হয়ে উঠেছে সহজ-সরল-ঋজু এবং কাহিনি-নির্ভর। এসব তাপ-চাপের কারণেই মৃত্যুপূর্ববর্তী প্রায় এক দশক (২০১১-২০১৮) তাঁর বন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হয়। যা একজন সৃষ্টিশীল লেখকের জন্য বড়ই বিরক্তিকর ও বেদনার। কিন্তু জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে তিনি যখন *নাঢ়াই* ও *মাদারডাঙার কথা*-র মতো গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন, তখন তাঁর উপর আনীত এ সমালোচনা নিয়েও আমাদের পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ এসে যায়। কারণ তিনি গণমানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, মুক্তি ও সমতার জায়গায় উন্নীত হয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। দেশের প্রচলিত গণতন্ত্রের উপর আস্থা না থাকায় তিনি সমাজরূপান্তরমূলক রাজনৈতিক দর্শনকেই উপযুক্ত মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাস থেকেই তিনি *নাঢ়াই* ও *মাদারডাঙার কথা*-র মতো যুগান্তকারী দুটি উপন্যাস লিখেছেন।

এ অভিসন্দর্ভে শওকত আলীর মোট ছাব্বিশটি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাতটি, তৃতীয় অধ্যায়ে পাঁচটি, চতুর্থ অধ্যায়ে দশটি, পঞ্চম অধ্যায়ে তিনটি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটি। আলোচনার দাবি রাখায় শুধু *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শওকত আলীর উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণ দেখার সুযোগ থাকলেও অভিসন্দর্ভের আলোচিত প্রায় উপন্যাসই ঢাকার বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে বারোখণ্ডে শওকত আলী রচনাসমগ্র অনুসৃত হয়েছে। এ কারণে উদ্ধৃতি হিসেবে উপন্যাসের মূলপাঠ শওকত আলী রচনাসমগ্র থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের উদ্ধৃত উপন্যাসের মূলপাঠের সঙ্গে শওকত আলী রচনাসমগ্রের খণ্ড সংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে এগারো ও বারো সংখ্যক খণ্ড বিলম্বে প্রকাশ পাওয়াতে *বসত*, *স্থায়ী ঠিকানা*, *পাকা দেখা*, এবং *মাদারডাঙার কথা* মূলগ্রন্থ অনুসরণ করা হয়েছে।

দুই

'শওকত আলীর উপন্যাসে সমাজচেতনা ও জীবনবাস্তবতার রূপায়ণ'–শীর্ষক পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে নাম নিবন্ধন করি। এ পি-এইচ.ডি গবেষণায় অনুমতি প্রদানের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ফাতেমা কাওসার-এর তত্ত্বাবধানে আমি এ গবেষণাকর্ম শুরু করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়-নির্বাচন, সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. ফাতেমা কাওসার-এর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সস্নেহ তাগিদ ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। তিনি গবেষণার প্রয়োজনীয় বইয়ের তথ্য দিয়ে,বই সরবরাহ করে এবং তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে আমার শ্রমলাঘবে সহায়তা করেছেন। এছাড়া শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিশাল আকারের এ অভিসন্দর্ভটি বারবার পাঠ করে বিভিন্ন সংশোধনীসহ সুপরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ এবং ঋণ অপরিশোধ্য। বর্তমান গবেষণার ইংরেজি-শিরোনাম নির্ধারণে আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমার শিক্ষক ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। এ পর্যায়ে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. সৈয়দ আকরম হোসেনকে। গবেষণার গুণ-মান উন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধিকরণ এবং শওকত আলী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে স্যার আমাকে ও আমার গবেষণাকে একই সঙ্গে ঋণী ও ঋদ্ধ করেছেন।

বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার আরেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. সিরাজ সালেকীনকে। স্যার আমার গবেষণার সহায়ক হিসেবে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এক সেট সাহিত্য-ত্রৈমাসিক 'উলুখাগড়া' পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। স্যারের এ স্নেহের দানকে আমি পরমপ্রাপ্তি বলে বিবেচনা করছি। ব্যক্তি-শওকত আলী এবং সাহিত্যিক-শওকত আলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে আমি দেশ-বিদেশের কয়েকজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক-গবেষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমার শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ড. অজয় রায়, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, অধ্যাপক ড. হায়াৎ মামুদ, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক আহমদ কবির, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক শফিউল আলম, কথাসাহিত্যিক হোসেন উদ্দিন হোসেন,

Dhaka University Institutional Repository

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কথাসাহিত্যিক হরিপদ দত্ত, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ, কথাসাহিত্যিক শাহরিয়ার কবির, শিশুসাহিত্যিক আলী ইমাম, গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান ও অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি প্রমুখ। এঁদের সুচিন্তিত অভিমত ও দিক-নির্দেশনা শওকত-সাহিত্য মূল্যায়নে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। এজন্য সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ অভিসন্দর্ভ রচনাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে উদারভাবে সাহায্য করেছেন। এঁরা হচ্ছেন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান (বর্তমানে শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য), অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ড. গিয়াস শামীম, অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম,অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর ও সহকারী অধ্যাপক বন্ধুবর জসিম উদ্দিন তানিম প্রমুখ। এঁদের সান্নিধ্য ও সতর্ক-পরামর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এপর্যায়ে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোমেনুর রসুলকে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত শওকত আলী বিষয়ক কিছু দুর্লভ বইয়ের সন্ধান ও সরবরাহ করে তিনি প্রকৃত অর্থেই আমাকে ঋণী করে রেখেছেন। সাহিত্য পর্যালোচনামূলক লিটল ম্যাগাজিন ‘গল্পকথা’–র সম্পাদক এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. চন্দন আনোয়ারকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এ পর্যায়ে ধন্যবাদ জানাই শওকত-গবেষক ও কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. তপন কুমার রায়কে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আরেক শওকত-গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক শাফিক আফতাবকে। যিনি অকৃপণভাবে আমাকে এ গবেষণায় নানা তথ্য, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। ধন্যবাদ জানাই বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক আবু হেনা মোস্তফা এনামকে। অভিনন্দন জানাই বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের কাজী ইকবালকে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই শওকত আলীর অনুজ লন্ডনপ্রবাসী ডা. ওসমান আলী সরকারকে। যিনি পারিবারিক বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই শওকত আলীর মেজো ছেলে ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আসিফ শওকত কল্লোল ভাইকে। যিনি নির্দ্বিধায় শওকত আলী বিষয়ক বহু দুর্লভ তথ্য দিয়ে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধিকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। সবশেষে স্মরণ করছি সতীর্থ ও পি-এইচ.ডি গবেষক মাজেদুল হক সৈকতকে।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাবিভাগের সেমিনার ও বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এতদ্ব্যতীত গবেষণাকর্ম রচনায় নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে এবং সাংসারিক সকল দায়-দায়িত্ব বহন করে আমাকে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নে মনোযোগী রাখতে যাঁদের অবদান অসামান্য; তাঁরা হলেন আমার মা-বাবা, বড় ভাই ও সহধর্মিণী আফরোজা। আফরোজা তাঁর প্রাপ্য ভালোবাসাকে নির্বিবাদে বিসর্জন দিয়েছে শুধু এ মূল্যবান গবেষণার স্বার্থে। এক্ষেত্রে তাঁর এমন ত্যাগ ও ঔদার্যের মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। এ পর্যায়ে বার বার মনে পড়ছে আমার আত্মজা জিনাত জেবা গুলরুখ-এর মিষ্টি মুখটি। এ গবেষণার জন্য আমি নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে প্রাপ্য পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। তারপরেও মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি এই ভেবে যে, একটি দুরূহ কর্ম অবশেষে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাই সোনামণির প্রতি রইলো আমার আদর ও শুভকামনা।

এ গবেষণার জটিল কম্পিউটার কম্পোজ বা মুদ্রণের কাজটি বরাবরের মতো করে দিয়েছেন মানিকগঞ্জ পূর্বাশা কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মো. সাঈদ তারেক এবং অনুজপ্রতিম ফরিদুর রহমান রাসেল। স্বল্প সময়ের মধ্যে অসীম ধৈর্য ও দায়িত্ব নিয়ে এ বিশাল অভিসন্দর্ভটি যে-সুনিপুণ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন– তা সত্যিই প্রশংসনীয়। দুজনকেই অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আগস্ট, ২০২০
মানিকগঞ্জ

(মো. জাহাঙ্গীর আলম)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	: সমকালীন বাংলাদেশ ও ঔপন্যাসিক শওকত আলী	০৮
	১ম পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশের অভ্যুদয়: সমকালীন সংকট ও সংকট-উত্তরণ	০৯
	২য় পরিচ্ছেদ: শওকত আলীর মানসগঠন ও শিল্পিসত্তার স্বরূপ	৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: রাজনৈতিক চেতনার উপন্যাস	৮৯
তৃতীয় অধ্যায়	: মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক উপন্যাস	১৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	: নাগরিক চেতনার উপন্যাস	২২৪
পঞ্চম অধ্যায়	: গ্রামীণ চেতনার উপন্যাস	২৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়	: ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনার উপন্যাস	৩৩৪
উপসংহার	:	৩৫৭
জীবনপঞ্জি	:	৩৬৪
কুলপঞ্জি	:	৩৬৯
গ্রন্থপঞ্জি	:	৩৭ ১

সমকালীন বাংলাদেশ ও ঔপন্যাসিক শওকত আলী

ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ছিল বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। সিরাজের এ পরাজয় ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পতন আর বণিকগোষ্ঠীর বিজয় ছিল মূলত উঠতি ধনতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য উত্থানের আগাম মঞ্চায়ন। যা এক অর্থে পুঁজিবাদের কাগজি নোটের কাছে সামন্তবাদী ধাতব মুদ্রার পরাজয়ের গতিপথ তৈরি করে। তাই আঠারো শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরকে এ সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের জয়-পরাজয়মূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতিকাল এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছরকে ধনতন্ত্রের জন্য চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠাকাল বলে চিহ্নিত করা যায়। বাঙালির রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, আধুনিক শিক্ষা তথা প্রযুক্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও দেশপ্রেমের অভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে মেনে নিতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ(১৮২০), ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের (১৮৩৫) প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয় সিপাহিবিদ্রোহ (১৮৫৭)। ব্রিটিশদের স্বার্থে প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) মাধ্যমে সুচতুর শাসকগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ রোপন করে। যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬)ও দেশভাগের (১৯৪৭) মধ্য দিয়ে। অমানবিক-অদূরদর্শী একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নিমেষেই বহু মানুষ নিজ দেশে পরবাসীতে পরিণত হয় এবং সংঘটিত হয় স্মরণকালের ভয়াবহ অভিবাসন (১৯৪৭-৪৮) প্রক্রিয়া। উপরন্তু বাঙালি জাতি এক ব্রিটিশ প্রভুর হাত থেকে আরেক পাকিস্তানি প্রভুর অধীন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন অবজ্ঞা ও শাসন-শোষণে বাঙালির মোহভঙ্গ হতে দেরি হয় না। তেভাগা আন্দোলন(১৯৪৬-৪৯), ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২), যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), শিক্ষা-আন্দোলন (১৯৬২), ছয়দফা আন্দোলন (১৯৬৬) ও গণঅভ্যুত্থানের (১৯৬৯) মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার এবং গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে পঁচাত্তরে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগস্ত্যযাত্রা শুরু হয়। কংসরূপী সামরিক দুঃশাসনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা কূটকৌশলে মুছে ফেলা হয়। তারপরেও অশুভ শক্তির কাছে হার না মানা বাঙালি শাকুনিক স্বৈরাচারের পতন ঘটায়। নব্বইতে এসে বাংলাদেশ পুনরায় বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার মোহ, অদূরদর্শিতা, রাজনৈতিক ডিগবাজি (political somarsolt), সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্ববাদ (majoritarian chauvinism), স্বজনতোষী পুঁজিবাদ (crony-capitalism), ভয়াবহ দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং দলের ভেতরে-বাইরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাবে দেশ পুনরায় গভীর সংকটে পড়ে। এজন্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দেশবাসীকেও চরম মূল্য দিতে হয় । বর্তমানে এ ভয়াবহ সংকট উত্তরণে জাতির প্রাণান্তকর প্রয়াস চলছে। 'বাংলাদেশের অভ্যুদয় : সমকালীন সংকট ও সংকট-উত্তরণ'– শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে ব্রিটিশ- পাকিস্তান- বাংলাদেশ শাসনামলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতার পালাবদলের ঘটনাতরঙ্গ । 'শওকত আলীর মানসগঠন ও শিল্পিসত্তার স্বরূপ'– শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে শওকত আলীর যুগ-জীবন, পারিবারিক ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, লেখক-জীবন, সাহিত্যভাবনা ও শিল্পদৃষ্টির ক্রমবিকাশের বিষয়সমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়: সমকালীন সংকট ও সংকট-উত্তরণ

প্রাক-ব্রিটিশ আমল

প্রাক-ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলার এক বছর তিন মাসের রাজত্বকাল (১০ এপ্রিল ১৭৫৬-২৩ জুন ১৭৫৭) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ১৭০৭খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে শেষ মুঘল গৌরব রবির অস্তের ঘটনা ও কেন্দ্রের শক্তিশালী শাসকের অভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। আবার সুচতুর সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের (১৭০৪-১৭২৭) একাধারে দেওয়ানি ও নিজামত পদ অধিকার করে স্বাধীন নবাবী শাসনের প্রচলন– বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক পালাবদল বয়ে আনে। নবাব মুর্শিদকুলীর গৃহীত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার 'মাল-জামিনি' পদ্ধতিতে জায়গিরদারের পরিবর্তে ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। 'যদিও মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো স্থান ছিল না'।[১] কিন্তু মুর্শিদকুলীর নিয়োগকৃত এ ইজারাদারগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। এরা এজেন্টদের মাধ্যমে রাজস্বসংগ্রহ করতেন এবং কমিশন পেতেন। 'এই নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারেরা প্রায়ই লুপ্ত হইল এবং নতুন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা-মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বাংলাদেশে নতুন এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল'।[২] আর মুর্শিদকুলীর দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দক্ষতার কারণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সুবা বাংলায় তুলনামূলকভাবে তখনো শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। 'তাই ইউরোপ, ইরান, আর্মেনিয়া, পশ্চিম ভারতের বণিক, পোদ্দার ও মহাজনদের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যান্বেষী ভাড়াটে সৈন্যরাও বাংলায় এসে ভিড় করছিল। এরাই পরে দেশের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[৩] উপরন্তু একই ব্যক্তিকে(মুর্শিদকুলীকে) একাধিক পদে নিয়োগের ফলে পরবর্তীকালে প্রশাসনের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং অরাজকতা, দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। আবার ১৭১৭ সনে সম্রাট ফররুখশিয়ারের কাছ থেকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য-সুবিধা, এক বছরেই (১৭১৯খ্রি.) দিল্লির সিংহাসনে পাঁচজন সম্রাটের রদবদল, তিরিশ বছরে (১৭২৭-১৭৫৭) সুবা বাংলার চারজন নবাবের অভিষেক, মারাঠা বর্গীদের তাণ্ডবলীলা (১৭৪২-১৭৫১) এবং নবাব সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খানের সীমাহীন ভোগ ও লাম্পট্যের কারণে সিরাজউদৌল্লার সুবা বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে জনমনে অশান্তি ও অস্বস্তি বিদ্যমান ছিল। এসময় ইংরেজ কোম্পানির রাজ্যলিপ্সা, মুসলমান রাজপুরুষদের অব্যাহত বিরোধিতা এবং দেশীয় হিন্দু অভিজাত শ্রেণির ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবল তরুণ সিরাজের ছিল না। এরূপ এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপুল সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও পলাশীর প্রান্তরে মাত্র আধা ঘণ্টার এক প্রহসনের যুদ্ধে ইংরেজদের তিনহাজার সৈন্যের কাছে সিরাজকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে পরাজয় বরণ করতে হয়।[৪] দিনটি ছিল ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রি./ ৫ শাওয়াল ১১৭০ হিজরি, রোজ বৃহস্পতিবার।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেও সিরাজ রক্ষা পাননি। বাল্যসখা ও পিতার অনুগ্রহজীবী মোহাম্মদী বেগের হাতে সিরাজের নির্মম মৃত্যু হয়। তাই দেখা যায়, '৩রা জুলাই যখন একদিকে সিরাজের লাশ নিয়ে এক শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করছে এবং শহুরে লোকজন নিহত নবাবের উপর তাহশির (গঞ্জনা) বর্ষণ করছে, তখন আরেক দিকে বিজয়ী ইংরেজরা মিলিটারি ব্যান্ড বাজিয়ে দুশো নৌকায় লুটের বখরা বোঝাই করে কলকাতা রওনা হচ্ছে। ভাগীরথী বেয়ে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গিয়ে যে-বন্দিনী হলেন তেমন কোনো কথা সেদিন কারও মনে খেয়াল হয়নি।'[৫] পলাশীর এ পরাজয় কেবল সুবা বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলের অবসান ঘটায়নি বরং ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের পথকেও প্রশস্ত করে। এসময় দেশি ও বিদেশি বণিক শক্তির ঐক্য ও বিত্তের প্রভাব এতই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে, যা দমন করার সক্ষমতা সামন্তশাসক সিরাজের ছিল না। ফলে সিরাজের পরাজয় ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ইংরেজ বণিকদের বিজয় ছিল মূলত উঠতি ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য উত্থানের ইঙ্গিত। যা এক অর্থে পুঁজিবাদের কাগজি নোটের কাছে সামন্তবাদী ধাতব মুদ্রার পরাজয়ের গতিপথ নির্দেশ করে। তাই আঠারো শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরকে এ সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের জয়-পরাজয়মূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতিকাল এবং পরের পঞ্চাশ বছরকে ধনতন্ত্রের জন্য চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠাকাল বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ততদিনে সামন্তশ্রেণির কর্মক্ষমতা, উদ্যোগ, দেশপ্রেম, শুভবোধ ও সংগ্রামীচেতনা জীর্ণ হয়ে পড়ে; পক্ষান্তরে পুঁজিপতিশ্রেণি পুঁজির সর্বকালিক ও সর্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিষ্ঠার পথ পেয়ে যায়।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল

ইংরেজদের সুবা বাংলা বিজয় একটি 'আকস্মিক ঘটনা' ছিল না বরং এর পেছনে তাদের সুদূরপ্রসারী পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল। ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির পথকে নিষ্কণ্টক ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিতে ইংরেজরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন সুবা বাংলার হিন্দু-মুসলান সম্প্রদায়ের দ্বিধা-বিভক্ত সমাজ তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। কারণ ৫৫৩ বছর (১২০৪-১৭৫৭) যাবত বাংলায় মুসলমানদের টানা দেশ শাসনকে এদেশের অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। মনে মনে তারা মুসলমান নবাবি শাসনের অবসান কামনা করতো। সার্বিক বিবেচনায় তারা খ্রিষ্টান ইংরেজদেরকে উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে শনাক্ত করে এবং সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে–'পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ প্রধানত দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসকের নিপীড়নে নির্যাতিত সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান নবাবের অধীনতা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কোনো ত্রাণকর্তার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে পড়েছিল। আর ইংরেজদের জানিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনা'।[৬] এসময় সমাজের কর্তৃত্বের মতো নবাবের রাজদরবারে হিন্দুদের একচ্ছত্র দাপট বজায় ছিল। কারণ দরবারের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের ছয়টিই ছিল হিন্দুদের দখলে। কেবল বকশী পদে ছিলেন মীর জাফর। আবার সুবা বাংলার উনিশজন বড় রাজা ও জমিদারের মধ্যে আঠারো জনই ছিলেন হিন্দু।[৭] তাই মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে সেনাপতি মীর জাফরের নাম প্রচার পেলেও এর মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। এ প্রসঙ্গে মঁসিয়ে জাঁ ল ও রবার্ট ওরম বলেছেন– 'পলাশী চক্রান্তের মূল নায়ক জগৎশেঠরা, মীর জাফর নয়। ইংরেজরা প্রথমে সিরাজের স্থলে নবাব হিসেবে ইয়ার লতিফ খানকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা জগৎশেঠদের মনোনীত প্রার্থী মীর জাফরের দিকে ঝুঁকলো। কারণ তারা জানত, জগৎশেঠদের সাহায্য ছাড়া বাংলায় কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না।'[৮] কেননা সকল ক্ষমতা ও সামাজিক সম্মান-প্রতিপত্তির মূল উৎস যে-পুঁজি বা অর্থ; তা ছিল সম্পূর্ণভাবে জগৎশেঠদের কব্জায়। এ অর্থের জন্য তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশাজীবীই ছিলেন মরিয়া ও আত্মবিক্রীত। তাই নবাবের রাজদরবার, রাজা-মহারাজা ও জমিদারদের বৈঠকখানাগুলো রীতিমতো ষড়যন্ত্রের গোপন মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন দেশের সমাজপ্রবাহের যেসব পর্যায়কে যুগসন্ধি, ক্রান্তিকাল, যুগসংক্রান্তি, অন্ধকার যুগ, অরাজক পরিস্থিতি, মগের মুল্লুক, মাৎস্যন্যায়, আইয়্যামে জাহেলিয়াত ও might is right বলে অভিহিত করেন; তৎকালীন সুবা বাংলায় এ ধরনের একটি পর্যায় বিরাজ করছিল। দেশের অভিজাত, রাজপুরুষ, সৈনিকদের মতো জনসাধারণের মধ্যেও নাগরিক অধিকারবোধ, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত চেতনার ছিঁটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট ছিল না। দেশের অরাজক পরিস্থিতিতে নবাবের পরিবর্তন হওয়া ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যা নিয়ে জনগণের তেমন মাথাব্যাথা ছিল না। কারণ নবাবের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই দেখা যায়– 'পলাশী প্রান্তরের প্রহসনের পর বিজয়োদ্ধত ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের প্রতি অপেক্ষমাণ বিপুল জনতা শুধু মুগ্ধ-ভীত-বিস্ময়ে চাহিয়া ছিল; কোনোরূপ বাঙ্কনিষ্পত্তি পর্যন্ত করে নাই। ক্লাইভ পার্লামেন্টারি কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে সগর্বে বলিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ জনতা দাঁড়িয়ে দেখছিল সে-ঘটনা। ইউরোপীয়দের ধ্বংস করার কোনো ইচ্ছা যদি তাদের থাকত, তাহলে কেবল লাঠি এবং ঢিলের সাহায্যেই তারা তা করিতে পারত।'[৯] রাজধানী মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের মানসিক এ চেতনা থেকে দেশের অপরাপর জনগণের চেতনার স্তর সহজেই অনুমান করা যায়। জনশ্রুতি আছে, মীর জাফরের নবাব হবার কথা শুনে মুর্শিদাবাদের এক দরিদ্র বৃদ্ধা মন্তব্য করেছিলেন– 'এই নিয়ে ছয়টা নবাব দেখলাম।' রবার্ট ক্লাইভের হাত ধরে মীর জাফর বাংলার মসনদে বসেন এবং কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হন। ক্লাইভের গর্দভখ্যাত (Lord Clive's jack ass) মীর জাফরের সুপারিশে দিল্লির বাদশাহ কর্নেল ক্লাইভকে– 'সাবুদ জং' (সমরে শক্ত) ও 'মুইনুদ্দৌলা' (রাষ্ট্রের সেরা), এ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে– 'দিলীর জং' (সমরে সাহসী) এবং কর্নেল কুটকে 'সাইফ জং' (যুদ্ধের তলোয়ার) উপাধি দেন। উপরন্তু বাদশাহ ক্লাইভকে ছয় হাজারি জাট ও পাঁচ হাজারি মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত করেন।[১০] বাদশাহর চোখে এদের বণিক পরিচয়ের চেয়ে সামরিক বীরযোদ্ধা পরিচয়ই বড় হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। এদেরকে আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ উপাধি দিয়ে বাদশাহ অবিবেচকের মতো রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যুক্ত করে নেন। যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কয়েক বছর পরেই বাদশাহকে ইংরেজদের দেয়া অপমানজনক পেনশনভোগীতে পরিণত হতে হয়। এভাবে ক্লাইভ দিল্লির বাদশাহর কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে খান-ই-খানান খেতাব, নালকিতে চড়ার ক্ষমতা,মাহি-মারাতব ওড়ানোর সুবিধাপ্রাপ্ত হন এবং মুঘল অভিজাত শাসকশ্রেণির একজন হয়ে উঠেন। অথচ কারও খেয়াল হয়নি এ ক্লাইভকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্রিটিশ রাজের রয়্যাল পার্লামেন্ট। ক্লাইভের মতো সকল

জাঁদরেল সাম্রাজ্য-নির্মাতাকেই ইংল্যান্ডে জবাবদিহি করতে হয়েছে। সুবা বাংলায় সব কিছুই ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে দেখা হতো। আইনানুগ জবাবদিহির ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এদেশ কোনো স্থিতি লাভ করতে পারেনি।[১১] তাই দেখা যায়, ইংরেজদের অব্যাহত দাবি-দাওয়া মেটাতে গিয়ে বাংলার নবাবদের বেসামাল হতে হয়েছে। মাত্র চোদ্দ বছরে (১৭৫৭-১৭৭১) মীর জাফর, মীর কাসিম, নাজিমউদ্দৌলা, সইফুদ্দৌলা ও মুবারক উদ্দৌলার মতো পাঁচজন নবাবের ঘনঘন সিংহাসন আরোহন ও পদচ্যুতির নাটক মঞ্চস্থ হয়। এদের মধ্যে একমাত্র মীর

কাসিমই ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক ও ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ক্লাইভ কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেপরোয়া দুর্নীতি বন্ধে এবং স্থায়ীভাবে পুঁজি সংগ্রহের জন্য বাংলার দেওয়ানি লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। যার ফলে দিল্লির বাদশাহকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা এবং বাংলার নবাবকে তেপ্পান্ন লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাইভ ১২আগস্ট ১৭৬৫ সনে কোম্পানির পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। কোম্পানির এ দেওয়ানি সনদ পাওয়াতে দেশীয় কেউ-ই বিস্ময় প্রকাশ করেনি। পূর্বে রাজস্ব আদায়ের দেওয়ানি ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নিজামত দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকলেও মুর্শিদকুলী তা একীভূত করেছিলেন। এভাবে ১৭৬৫ সনে এসে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী তদারকি ব্যবস্থা না থাকায় কোম্পানি পেল দেওয়ানির দায়িত্বহীন অবাধ ক্ষমতা আর নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন নিজামত। ক্লাইভের মস্তিষ্কপ্রসূত এ শাসন ব্যবস্থাই ইতিহাসের দ্বৈত শাসন পদ্ধতি (Dual Govt. System) নামে পরিচিতি পায়।

কোম্পানির দেওয়ানি কাজ তদারকির জন্য নবাবের অভিভাবক রাজস্ববিশারদ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে নাজিম নিযুক্ত করা হয়। ক্লাইভ ও হ্যারী ভেরেল্স্টের সার্বিক সহযোগিতায় রেজা খান বৈরী সময়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরা ইঙ্গ-মুঘল যৌথ শাসনব্যবস্থা কায়েম করে খুব কৌশলে বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করেন। কারণ তারা এমন নিখুঁতভাবে মুখোশ পড়েছিলেন যে, কোম্পানি বাংলার প্রকৃত রাজনৈতিক প্রভু হলেও তা কার্যত প্রকাশ পায়নি। স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে মুঘল ব্যবস্থাধীনে রেখে এমন একটি ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করা হয়– যেন দেশ আসলে আগের নবাবি যুগের মতই স্বাধীন। ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের মুখোশ উন্মোচিত হয় ১৭৬৭ সনে ক্লাইভের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পর থেকেই।[১২] স্বাধীনচেতা রেজা খান কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ উপার্জনে হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজদের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাকে চাপে রাখতে এবং কাজের ছিদ্রানুসন্ধান করতে ১৬ আগস্ট১৭৬৯ সনে প্রতি জেলায় একজন করে ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়। এসকল জেলা সুপারভাইজারদের অযাচিত হস্তক্ষেপ-খবরদারি, কোম্পানির বেপরোয়া অর্থলিপ্সার ফলে গোটা দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, প্রশাসন ভেঙে পড়ে এবং জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এর জেরে তেরো বছরের মাথায় কোম্পানির দুঃশাসনে সারা বাংলায় দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৯-৭০খ্রি.) নামে পরিচিতি পায়। অথচ এ দুর্ভিক্ষের জন্য নায়েবে নাজিম রেজা খানকে সরাসরি দায়ী ও দোষারোপ করা হয়। এ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে সারা বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। মানুষ খাদ্যের জন্য বীজধান, গরু-ছাগল এমনকী স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত বিক্রি করে। তৎকালীন বাংলার দেড়কোটি লোক বা জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের নির্মম মৃত্যু ঘটে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের *অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল* গ্রন্থে এর বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন, অতিরিক্ত কর-আরোপ, আদায়ের কঠোরতা ও অব্যবস্থাপনাকেই এমন দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অথচ এ দুর্ভিক্ষের বছরেও কোম্পানি যে-পরিমাণ খাজনা আদায় করে, তা পূর্ববর্তী যে-কোনো বছরের তুলনায় ছিল অনেক বেশি।[১৩] কোম্পানির দুঃশাসন সুবা বাংলার মানুষের শুধু মুখের ভাত ও সংসারের শান্তিই কেড়ে নেয়নি বরং হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে কূটকৌশলে ধ্বংস করে। পেটের দায়ে বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী, কৃষকরা দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে। ফলে গোটা বাংলা বিপ্লব-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একে একে দেখা দেয় মজনু শাহ ও মুসা শাহের ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), মেদিনীপুরের চুয়ারবিদ্রোহ (১৭৬০-৮৩), ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), খাসিবিদ্রোহ (১৭৭২), ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), তন্তুবায়দের বিদ্রোহ (১৭৭৮), রংপুরের নূরলদীনের কৃষকবিদ্রোহ (১৭৮৩), সুবান্দিয়ার বালকী শাহের বিদ্রোহ (১৭৯২), গারো-হাজংদের হাতিখেদা বিদ্রোহসহ (১৭৯৯) অসংখ্য ছোট-বড় বিদ্রোহ। এছাড়া তাঁতি ও কারিগরদের ওপর কোম্পানি সীমাহীন অত্যাচার চালায়। এদেরকে বাড়ি থেকে কোম্পানির কুঠিতে গিয়ে কাজ করতে বাধ্যকরণ ও ক্ষেত্রবিশেষ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করা হয়। এভাবে দেশীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি কয়েক বছরের মাথায় এসে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের কোম্পানির কুঠির অধ্যক্ষ বেকার সাহেব স্বীকারোক্তি করে লিখেন–

> ‘I well remember the country when trade was free and the flourishing state it was then in with concern. I now see its presents rinous condition which I am convinced is greatly owing to the monopoly that has been made of late years in the company’s name of almost all the

manufactures in the country. Let the trade be made free and this time country will soon recover itself, the revenues increase.'[১৪]

তিনি আরো খোলাখুলিভাবে লিখেন–

> 'It must give pain to Englishmen to have reason to think that since the accession of the company to the dewanee the condition of the people of this country has been worse than it was before and yet I am afraid the fact is undoubted.'[১৫]

আবার সংগৃহীত রাজস্বের বিপুল পরিমাণ টাকা ইংল্যান্ডে পাচার হওয়াতে দেশের বড় ধরনের ক্ষতি হয়। রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি বছর পাচার হতে থাকে। এ কাজটি সুচারুভাবে করতেই গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-১৭৮৫) দেশীয় রাজস্ব কর্মকর্তাদের ছাঁটাই করে প্রতি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করেন। এ শ্বেতাঙ্গ প্রশাসনে দেশীয় বলতে ছিল শুধু নিম্নবেতনভোগী মুনশি ও মুহরার। এ জেলা কালেক্টরগণ রাজস্ব, বিচার ও পুলিশি কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা পেয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। যা সমকালীন ইংল্যান্ডেও ছিল অকল্পনীয়। রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও ব্যবসায়িক সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়।[১৬] আবার কোম্পানির আধিপত্যকে সুবা বাংলার সর্বত্র বিস্তারের জন্য দিউয়ানি দপ্তর কলকাতায় (১৭৭২ সনের ২৭ এপ্রিল) স্থানান্তর করা হয়। এর দুই বছর পর ১৭৭৪ সনে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় আনয়নের ফলে মুসলমান আভিজাত্য যেমন ক্ষুণ্ন হয়, তেমনি উদীয়মান ইংরেজশক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ রাজধানীকে কেন্দ্র করে বহু মিল-কারখানা, অফিস-আদালত ও আবাসন গড়ে ওঠে। ফলে নানা পেশাজীবী এসে জড়ো হয়। কলকাতার স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে স্কটল্যান্ডের বক্সওয়ালী ও ইংরেজ মেমরা বাসা বাঁধে। জব চার্নকের কুড়িয়ে পাওয়া (১৬৯৮) স্থান ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী হয়ে ওঠে। এমন বড় শহর বিশ্ব এর আগে আর কখনো দেখেনি। তাই বালজাক যথার্থই বলেছেন– 'প্রতিটি বিরাট সমৃদ্ধির পেছনে থাকে বড় বড় অপরাধ আর অসততা।' কোম্পানি কর্তৃক এ দিউয়ানি ক্ষমতা গ্রহণ, রাজস্বকর্মকর্তা নিয়োগ ও রাজস্বদপ্তর স্থানান্তর– এর বৈধতা নিয়ে বিলেত ও কোম্পানির ভেতর থেকে প্রশ্ন উঠলেও তৎকালীন সুবা বাংলা তথা ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণভাবে নীরব। তখনো পর্যন্ত নবাবই যে-দেশের সার্বভৌম কর্তা ছিলেন– তা কোম্পানিও স্বীকার করে নেয়। অথচ সুবা বাংলার রাজপুরুষ ও অভিজাতশ্রেণির রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ কালেক্টরগণ দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করেন। তারা বৈধ-অবৈধভাবে শুধু কোম্পানিকেই লাভবান করেনি বরং নিজেরাও দ্রুত বিত্তবান শ্রেণিতে উন্নীত হন। তারা বেতনই পেতেন চার হাজার টাকা। যা খোদ ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সচিবের বেতনের চেয়েও ছিল দ্বিগুণ। বেতন ব্যতীতও ব্যক্তিগত ব্যবসায়, ঘুষ, বখশিশ ও পুরস্কার বাবদ তাদের উপার্জন ছিল সবার ঈর্ষার বিষয়। ব্যঙ্গ করে এদেরকে অনেকে বলতো 'নবাব'।[১৭] এভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রশাসনের মাধ্যমে হেস্টিংস ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। আর সে-ভিত্তির উপরিকাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।

বিভিন্ন সময় একসনা, পাঁচসনা ও দশসনা ইজারা দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহে যে-সংকট দেখা দেয় তার নিরসনকল্পে নানা চিন্তা ভাবনার পর ১৭৯৩ সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement system) প্রবর্তন করেন। এ কর্ণওয়ালিস ছিলেন আমেরিকা যুদ্ধের (১৭৮৪) পরাজিত সেনাপতি। তার হাত ধরে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকা উপনিবেশ হারায়। সঙ্গতকারণেই কর্ণওয়ালিস এ ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং খুব সূক্ষ্মচিন্তা থেকেই এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় স্থির হয় যে, জমিদাররা রাজস্ব সংগ্রহ করে নয়-দশমাংশ বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে কোম্পানিকে প্রদান করবে আর বাকি একাংশ রাজস্ব তারা বংশানুক্রমে ভোগ করবে। অথচ কৃষক বা রায়ত কতটুকু রাজস্ব বা খাজনা প্রদান করবে তা নির্দিষ্ট করা হয় না। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় জমিদারেরা ছিলেন সরকার বা কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট মাত্র। জমিতে তাদের কোনো দখলীস্বত্ব ছিল না। কিন্তু এ ব্যবস্থাপনায় এজেন্ট জমিদাররা হলেন জমির মালিক আর স্বাধীন কৃষকরা হয়ে গেল তাদের পরাধীন প্রজা। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে জমিদারদের জমিদারি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় করে দেয়া হয়।[১৮] কাজেই জমিদাররা জমিদারি টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছে মতো খাজনা বা কর আরোপ করে। বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহে প্রজাদের ওপর নানাবিধ নিপীড়ন চালায় এবং জমি ক্রয়-বিক্রয় ও বিলিবণ্টনে স্বৈরচারী হয়ে ওঠে। এতে সুবা বাংলার কৃষক প্রজার সর্বনাশ হলেও কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ঠিকই চরিতার্থ হয়। এর মাধ্যমে কোম্পানি সারা বাংলার ভূমিরাজস্ব নির্দিষ্ট করে (বার্ষিক ৩৪ লক্ষ পাউন্ড বা ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা) অভিজাত মুসলমানদের নিঃস্ব করে দেয় এবং হিন্দুশ্রেণিকে সুবিধা দিয়ে সহযোগী বা

দালাল (comprador) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।[১৯] এ সকল হিন্দু জমিদার ও তাঁর মিত্র উকিল এবং জমিদারি আয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় সকল মসিজীবী ও বুদ্ধিজীবী শেষদিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসককে বিপদে-আপদে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। এদের উপর ভর করেই ইংরেজরা এদেশে ১৯০ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে শাসন করতে সক্ষম হয়। তারপরেও বলা যায়, ইংরেজ শাসনামলে এ জমিদারি ব্যবস্থাই ছিল উদীয়মান মধ্যশ্রেণির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির মূল ভিত্তি। এ বন্দোবস্তের ফলে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রের পরাজিত পুঁজি নিয়োজিত হয় কৃষিতে। ফলে জমির ওপর চাপ পড়ে ও বিনিয়োগ বাড়ে। এতে প্রাচীন জমিদারদের বদলে নতুন ব্যবসায়ী জমিদারদের আবির্ভাব ঘটে। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু জমিদার। এ সকল জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজেই বলেছেন–

> ‘আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূ-সম্পদ নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে শান্তিতে ভোগ করিতে পারিবে, তাহার মনে কোনোরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।’[২০]

এ বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজদের স্বার্থচরিতার্থ হলেও বাংলার লাখো কৃষকের জীবন ধ্বংস হয়। যার ফলে চারদিকে কৃষক -বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব কৃষকবিদ্রোহ মোকাবেলায় ইংরেজ অনুগত জমিদারগণের সহযোগিতামূলক কর্মতৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। এটি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে লর্ড বেন্টিঙ্ক বলেন–

> ‘আমি বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে।...এর ফলে এমন বিপুলসংখ্যক ধনী ভূস্বামীশ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে যারা ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণের উপর যাদের অখণ্ড প্রভুত্ব বজায় আছে।’[২১]

এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমেই ইংরেজ কোম্পানি কৃষক বিদ্রোহের মতো পরবর্তীকালে উদ্ভূত সিপাহিবিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলনসহ বহু গণআন্দোলন দমন করতে সক্ষম হয়। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কোপ বা আঘাতটি পড়ে অভিজাত মুসলমানদের ওপর। এতে করে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত মুসলমানেরা অর্থনৈতিকভাবেও চরম দুর্দশা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। ফলে পলাশী যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর এসে এক সময়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমান শ্রেণি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। নবাবি আমলের অভিজাত মুসলমানদের অর্থাগমনের তিনটি প্রশস্ত পথ (সামরিক বিভাগ, রাজস্ববিভাগ, বিচারবিভাগ তথা রাজনৈতিক নিয়োগসমূহ) কৌশলে কোম্পানি কাটছাঁট ও সংকোচন করায় এরাই সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হয়।[২২] অথচ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণিরূপে যে-হিন্দু নতুন জমিদারদের উদ্ভব ঘটে, তারা শেষদিন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে সমর্থন ও সাহায্য যুগিয়ে যায়। কর্ণওয়ালিসের এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিকভাবে তা সন্দেহাতীতভাবে সফল হয়। এ সাফল্য থেকেই ইংরেজরা পলাশী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের মুসলিম, মারাঠা ও শিখ– স্বদেশীয় এ প্রবল শক্তিধর তিন জাতিকে পরাজিত করার প্রয়াস পায়। এভাবেই বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪), তিনটি ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫, ১৮০৩, ১৮১৭), চারটি ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯, ১৭৮০-৮৪, ১৭৯০, ১৭৯৯), দুটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫, ১৮৪৯) এবং দুটি সিন্ধু যুদ্ধ (১৮৩২ ও ১৮৩৮)– প্রত্যেকটিতেই ইংরেজরা সাফল্য পায়। তাদের গৃহীত ‘ভাগ কর শাসন কর নীতি’ (divide and rule policy), ‘একের পর এক নীতি’ (one by one policy) এবং ‘অজগর নীতি’–এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এভাবে ইংরেজ কোম্পানি তুলনামূলকভাবে খুব কম সময়ে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে বেলুচিস্তান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডের (আসমুদ্র হিমাচলের) অধিশ্বর হয়ে যায়।[২৩] ভারতীয় শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো স্থায়িত্ব, সংহতি, সদ্ভাব, দেশপ্রেম সর্বোপরি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার না থাকায় অপ্রতিরোধ্য ইংরেজদের বশ্যতা মেনে নিতে হয়।

বাঙালি মধ্যবিত্তের জাগরণ

উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একটি হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংগঠিনক পরিপক্বতা অর্জন এবং অপরটি হচ্ছে মুসলিম আত্মসচেতনতা ও তৎপ্রসূত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভঙ্গি।[২৪] মুঘল আমল থেকে শুরু করে নবাবি আমল পর্যন্ত বাংলার রাজদরবারের বা রাষ্ট্রীয় দাপ্তরিক ভাষা ছিল

ফারসি। তথাপি শাস্ত্রীয় আলোচনায় আরবি ও সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। সরকারি চাকরি ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য হিন্দুরাও ফারসি ভাষা সাদরে গ্রহণ করেছিল। ব্রাহ্মণসহ বর্ণবাদী সম্প্রদায়ের লোকজনও এভাষাকে গুরুত্বের সঙ্গে চর্চা করতেন। যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কবি ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তিনি ফারসির বদলে সংস্কৃত ভাষা শিখতে গেলে পরিবারের স্বজনদের কাছে তাকে ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়।[২৫] ফারসি ভাষার প্রাধান্য ইংরেজ আমলের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হিন্দু ও মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে পঠন-পাঠনে উৎসাহ দিতে ওয়ারেন হেস্টিংস গুরুত্বারোপ করেন। এর ধারাবাহিকতায় কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০), এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) এবং সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) প্রতিষ্ঠা পায়। তখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি। চালর্স গ্র্যান্ট ও উলবারফোর্স ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলেও কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কারণ হিসেবে কোম্পানির পক্ষ থেকে সতর্কসংকেতস্বরূপ বলা হয়– 'স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলেই ইংল্যান্ড আমেরিকাকে হারিয়েছে। ভারতবর্ষে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর চলবে না। নেটিভরা শিক্ষায় তেমন আগ্রহশীল হলে তাদেরকে ইংল্যান্ডে আসতে হবে।'[২৬] বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের আটাত্তর বছর পর বহু চিন্তা ভাবনা করে মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তবে এসময় খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তৎপরতায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। যদিও প্রথম দিকে কোম্পানির এ ব্যাপারে কোনোরূপ সম্মতি ও সমর্থন ছিল না। এ জন্য উইলিয়াম কেরিকে (১৭৬১-১৮৩৪) প্রথমাবস্থায় হতাশ হতে হয়। কারণ মিশনারির এ তৎপরতার সঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের বিষয় যুক্ত থাকায় কোম্পানি সতর্ক ছিল। তারপরেও কোম্পানি ইউরোপীয় কর্মচারীদের প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী করতে এবং শাসনপ্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে প্রয়োগ করতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠা করে। লর্ড মর্নিংটন মারকুইস ওয়েলেসলি কর্তৃক এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলা ও উর্দু গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়।[২৭] বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতির ফলে মুসলমান সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের উপর হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উত্থান অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজদের এ তৎপরতার পরিচয় মেলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১৭৯৩), লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণে (১৮২০) এবং রাজভাষার (১৮৩৫) আকস্মিক পরিবর্তনে।[২৮] পূর্ববর্তী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিঃস্ব ও প্রায়-নিঃস্ব হয়ে যাওয়া অভিজাত মুসলমানরা কোনোরকমে নিজেদের মান-সম্মান বজায় রাখতে পারলেও লাখেরাজ সম্পত্তি (নিষ্করভূমি) বাজেয়াপ্তকরণে তারা একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। ফলে তাদের জীবন-জীবিকার ওপর বড় আঘাত আসে। আবার ফারসির বদলে ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষার মযার্দা দেয়াকে মুসলমানরা জাতিগতভাবে বড় অপমান জ্ঞান করে এবং এ বিধর্মী ভাষা শেখা থেকে নিজেদের দূরে রাখাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। কারণ কোম্পানির গৃহীত এ তিনটি পদক্ষেপের প্রথম দুটি মুসলমানদের পেটে আঘাত করলেও শেষেরটি মনের ওপর আঘাত করে। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলার মুসলিম মানসে গভীরভাবে প্রতিভাত হয়। নতুন রাজভাষা ইংরেজিকে আগ্রহভরে হিন্দু সম্প্রদায় গ্রহণ করায় তাদের জন্য তা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। কোম্পানির নেকনজরে পড়ে সকল অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের প্রবেশ একচেটিয়াভাবে ঘটে। ইংরেজ কোম্পানি ও উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মাঝে সম্পর্কের এক নতুন সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। এতে হিন্দুশ্রেণি শুধু আত্মোন্নয়নই করে না বরং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় বহু অগ্রগামী হয়। আর অতীত গৌরব, আভিজাত্য-অহং, ক্ষমতা হারানোর বেদনায় মুসলিম সম্প্রদায় দূরে সরে থাকায় সর্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদের তুলনায় বহু পশ্চাৎবর্তী হয়ে পড়ে। বাংলার সমাজ জীবনের এ পালাবদলে ইংরেজ কোম্পানি চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কারণ 'বাঙলায় মুসলমানের শিথিল হাত থেকে ইংরাজ কেবল রাজদণ্ডই ছিনিয়ে নিল না– সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও ইংরাজের হাতে এসে পড়ল।'[২৯] লাভজনক এ ইংরেজি ভাষা প্রচলন ও প্রবর্তনের মাধ্যমে কোম্পানি তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী এক অনুগত আধুনিকপন্থীদের উদ্ভব ঘটাতে চেয়েছিল। এজন্য মেকলে Filteration Theory নামে এক বিতর্কিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এর গূঢ় অর্থ প্রসঙ্গে মেকলে বলেছিলেন–

> 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the Millions who we govern- a class of person Indian blood and colour but English in tastes in Opinions in moral and intellect.'[৩০] অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা এমন এক শ্রেণির লোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা রক্তে ও রঙে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতবাদে, নীতিতে ও হাবভাবে হবে ইংরেজ।

এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে ইংরেজরা মূলত হিন্দুদেরকেই বেছে নেয় এবং এদেরকেই তারা সর্বাংশে অনুগত ও নিরাপদ বলে মনে করে। কারণ হিন্দুদের পক্ষে ইংরেজি ভাষা যত সহজে গ্রহণ ও বরণ করা সহজ ছিল, তা মুসলমানদের ক্ষেত্রে ততটা সহজ ছিল না। কিছুটা জাত্যাভিমান, বিরূপ পরিস্থিতি, আর্থিক বিপর্যয়, খ্রিষ্টান ভাষার প্রতি ঘৃণা ও কুসংস্কারের ফলেই তারা দূরে সরে থাকে। মুসলমানদের এমন মনোভাব গড়ে ওঠার পেছনে তাদের পশ্চাৎপদতা যতটা না দায়ী ছিল, তার চেয়ে ক্রিয়াশীল ছিল কোম্পানির বিমাতাসুলভ আচরণ। কূটকৌশলেই কোম্পানি মুসলমানদের যেমন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, তেমনি হিন্দুদের দেয় পৃষ্ঠপোষকতা। মুসলমানদের এ দুরবস্থার জন্য ইংরেজদের পক্ষপাতিত্বের কথা স্বীকার করে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেছেন–

> ‘এখানকার মুসলমান অধিবাসীরাই ব্রিটিশ শাসনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একশ সত্তর বছর আগে বাংলার কোনো মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বর্তমানে তার ধনী হওয়াই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।’[৩১]

এককালের অভিজাত মুসলমান জাতি তাদের সকল বিদ্যাশিক্ষা, বাহুবল, মনোবল ও রুচিজ্ঞান থাকার পরেও শুধু ইংরেজদের রোষানলে পড়ে তারা সুযোগ-সুবিধা ও চাকরি-বাকরি হারিয়ে দীনহীন, নির্জীব ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। নিজেদের নিরাপত্তা ও শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতেই ইংরেজরা ঠাণ্ডা মাথায় মুসলমানদের ওপর এমন আঘাত হানে। এ কথা হান্টারও স্বীকার করেছেন। মুসলমানদের এ ইংরেজি ভাষা গ্রহণে অনীহা-অনাগ্রহের কারণ বলতে গিয়ে হান্টার বলেছেন–

> ‘মুসলমানরা নতুন ধারার শিক্ষাপদ্ধতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এর পেছনে যে কারণগুলো ছিল তা হচ্ছে, এ পদ্ধতির শিক্ষা ছিল তাদের ঐতিহ্যের বিরোধী, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং ধর্মচেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ। ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো থেকে তারা যে-নিজেদের দূরে রাখল, তার পিছনে আরো কারণের মধ্যে ছিল– পর্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষকের অভাব, মুসলমানি ভাষা শেখার কোনো রীতি না থাকা এবং এসব বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদান তথা বিধানের অনুপস্থিতি।’[৩২]

এ প্রসঙ্গে সুশীল কুমার গুপ্তের মন্তব্যটিও মূল্যায়নযোগ্য:

> ‘রাজনৈতিক কারণে ইংরেজগণ মুসলামনদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি প্রদর্শন করিত। বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মুসলমানেরা সেই জন্য হিন্দুদের মতো সুযোগ-সুবিধা না পাইলেও, যেটুকু পাইয়াছিল তাহারও সদ্ব্যবহার করে নাই।’[৩৩]

তবে মুসলমানদের অভিমানবশত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে যে-অনাগ্রহ-অনিচ্ছার কথা বলা হয়, তা ড. আনিসুজ্জামান সর্বাংশে সমর্থন করেননি। এ পর্যায়ে আনিসুজ্জামানের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য :

> ‘১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত তাঁদের (মুসলমানদের) পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই আধুনিক শিক্ষার দ্বার মুসলমানের পক্ষে রুদ্ধ ছিল। এর পর (১৮৭০) শিক্ষাসংক্রান্তনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটায় মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষালাভ সহজ হয় এবং তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।’[৩৪]

এভাবে ইংরেজ রাজশক্তি মুসলমান সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের দিকে যে-দৃষ্টি দিয়েছিল, তাতে মুসলমান সামন্ততন্ত্রের কেবল আর্থিক ধ্বংসই হয়নি, মানসসম্পদেরও এই একদা বিত্তবানসম্প্রদায় প্রায় রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে যায়। অথচ ইংরেজ শাসক ও দেশীয় হিন্দুগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেলে হিন্দু সমাজে এক নবজাগরণ ঘটে।[৩৫] আবার ডিরোজিওর– ‘সত্যের জন্য বাঁচা ও সত্যের জন্য মরা’ এমন যুক্তিদর্শন এবং পরবর্তীকালে কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসুর প্রগতিবাদ হিন্দু সমাজকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। এসময় হিন্দু সমাজের একদিকে ছিলেন ডেভিড হেয়ার, অক্ষয় কুমার, ডিরোজিওর ভাবশিষ্য ইয়ংবেঙ্গলরা ও মধুসূদনের মতো আধুনিকেরা; অন্যদিকে ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীলেরা। আর মধ্যপন্থী তথা সংস্কারবাদী হিসেবে ছিলেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন ও বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিরা।[৩৬] এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে *দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদকৌমুদী, বঙ্গদূত, সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি, তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শনের* মতো পত্র-পত্রিকা। প্রথম দিকের উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের অবসানে ইয়ং বেঙ্গলরা সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলায় যে-হিন্দু নবজাগরণের পথ নির্মাণ করেছিলেন–এর তাৎপর্যও

ছিল সুদূর-প্রসারী। নবযুগের এ মুখপাত্ররা গর্বভরে বলতেন–'বাংলা যা আজ চিন্তা করে, অবশিষ্ট ভারত তা আগামীকাল চিন্তা করবে।'

ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই বাংলার আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে এবং শ্রীবৃদ্ধি পায়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ও নতুনকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার মানসিকতার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটলেও রাজ্যহারা মুসলমানরা অন্ধকারেই রয়ে যায়। ইংরেজ শাসকদের সন্দেহের দৃষ্টি ও নেতিবাচক ধারণার কারণে মুসলমানদের আত্মজাগরণ সম্ভবপর ছিল না। এ প্রসঙ্গে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মন্তব্যটি মূল্যায়নযোগ্য:

> 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বাঙালি মুসলমানেরা নোতুন পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহিত হননি, নোতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হননি, ইংরাজ প্রবর্তিত নোতুন শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী হননি। ফলে এ পথে ক্রমে হিন্দু সমাজে যে-রকম একটি ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল, মুসলমান সমাজে তা সম্ভব হল না। নবসৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তখন স্বর্ণযুগ।...পাশাপাশি মুসলমান সমাজে তার বিপরীত অবস্থা।'[৩৭]

এমন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একশ বছর হিন্দুগণ নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে উপরে উঠে আসে; আর মুসলমানগণ হতাশা ও ব্যর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মক্কা-মদিনার ইসলাম ভারতের মুলতান হয়ে বাংলায় প্রবেশকালে এর বহুপরিবর্তন ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে গোটা বাংলায় সেন শাসকদের কৌলীন্যবাদী শাসন-শোষণে বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুজনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে নাভিশ্বাস ওঠে। এ রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে (transition period) বাংলায় পরাক্রমশালী ও উদীয়মান ইসলামের জয়যাত্রায় এ গোষ্ঠী মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ফলে তারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। দিগ্বিজয়ী ইসলামের এ আগ্রযাত্রা; তা নিঃসন্দেহে তৌহিদি ইসলাম নয়, বরং সুফিবাদের ইসলাম দ্বারাই এ দেশবাসী দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে ইসলামের মূল spirit যে-সাম্যবাদ, তা এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই অভিজাতদের তুলনায় অন্ত্যজ শ্রেণিই ইসলামের পতাকাতলে বেশি আশ্রয় নেয়। সুফিবাদের এ ইসলাম এদেশীয় নিরাকার ব্রহ্মবাদের খুব কাছাকাছি। তাই এদেশীয় বাঙালি মুসলমান ও তৌহিদি সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সুফিয়ানা ও তুর্কানা– এমন দুটি তরিকা বা পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে কার্যকর ছিল।[৩৮] এছাড়া বাংলার ইসলামের ওপর হিন্দু প্রভাবের চারটি পথ যথা– হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ, মুসলমান পিরের হিন্দু মুরিদ ও হিন্দু যোগির মুসলমান শিষ্য, মুসলিম মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ধর্মান্তর-গ্রহণের অসম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করা যায়।[৩৯] এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পিরপূজা, তাবিজের ব্যবহার, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস, ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, হোলি ও দেওয়ালীর মতো উৎসবে যোগদান করার রীতি-রেওয়াজ গড়ে ওঠে। দুই ধর্মের সমন্বয়ে হিন্দু দেব-দেবীর মতো মুসলিমমানসে পৌত্তলিকতার জন্ম দেয়। যেমন– বনদুর্গার প্রতিপক্ষ বনবিবি ফাতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর গাজীপির ও কালুশাহ, মৎস্যেন্দ্রনাথের সংস্করণ পির মসন্দলি এবং সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপির। তাই শীতলা, ওলাবিবির মতো দেবদেবীরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই পূজ্য ছিল। মুসলমান সমাজে খাজা খিজির; বদরপির, মানিক পির ও পাঁচ পিরের উপাসনাও দেখা দেয়। ফলে হিন্দুরা প্রয়োজনে যেমন মুসলমান পিরের আস্তানায় মানত ও মসজিদে শিরনি দিত, তেমনি মুসলমানেরাও হিন্দু দেব-দেবীর স্মরণ নিত।[৪০] সুফি মতবাদের বিকাশের ধারায় পিরবাদের আবির্ভাবের মূলে বৌদ্ধধর্মত্যাগী মুসলমানদের ওপর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল। তাই সুফি সাধনার 'ফনা', 'মোরাকাবা' ও 'কেরামত'– এর সঙ্গে ভারতীয় 'নির্বাণ', 'যোগ' ও 'অলৌকিকতার' সাদৃশ্য রয়েছে। 'জিকির' ও 'প্রাণায়াম' তাই অভিন্ন।[৪১] সুফিবাদের অনিবার্য প্রভাবের ফলে গোঁড়া সুন্নি ও তৌহিদিদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের সমূহ বিপর্যয়ে গোঁড়াপন্থীরা ইসলামে প্রবিষ্ট বেদাত, অনাচার ও রীতি-নীতিকে দায়ী করে মতবাদ প্রচার করে। এজন্য তারা আদি যুগের ইসলামের বিশুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য 'পিউরিটানিক' ধর্মান্দোলনের সূচনা করে। এ আন্দোলনকে বেগবান করেন শেখ আহমদ সরহন্দী (মোজাদ্দদ-ই-আলফ-ইসানী খ্যাত), শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ, শাহ আবদুল কাদির, শাহ ইসমাইল, সৈয়দ আহমদ বেরিলভী প্রমুখ। এরা সকলেই ছিলেন ওয়াহাবীপন্থী।[৪২] এদের মতে ইংরেজ অধিকৃত বাংলা তথা ভারতবর্ষ ছিল দার-উল-হারব বা বিধর্মী শাসিত দেশ। তাই এ অবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্তি দিতে সৈয়দ আহমদ বেরিলভী ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮১৭-১৮৩১) শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা জঙ্গিরূপ নেয়। শিখদের বিরুদ্ধে বালাকৌটের যুদ্ধে (১৮৩১) তিনি শহিদ হন। তারপরেও বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন গোটা দেশে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মুসলমানদের অভূতপূর্ব

সমর্থনও পায়। এ আন্দোলনে বিপর্যস্ত মুসলমানদের মাঝে আত্মজাগরণের ঢেউ লাগে। যার ধারাবাহিকতায় গোটা বাংলায় একে একে দেখা দেয় ময়মনসিংহের পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৩১), মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের নারিকেল বাড়িয়ার বিদ্রোহ (১৮৩১), বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে হাজি শরিয়তউল্লাহ ও তদ্বীয় পুত্র মুহসীন উদ্দিন দুদু মিয়ার ফরায়েজি আন্দোলন (১৮২৮-১৮৬০) প্রভৃতি। এসকল আন্দোলন প্রথম ধর্মীয় সংস্কারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে গড়ে উঠলেও কালক্রমে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চারিত্র্যধর্ম গ্রহণ করে এবং সারা বাংলায় বেশ আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হয়। কারণ ব্রিটিশ শাসক ও তাদের অনুগত হিন্দু ভূস্বামী-জমিদারদের শোষণ–বঞ্চনা, অন্যায় খাজনা বা কর-আরোপের বিরুদ্ধে–'সমুদয় জমির মালিক আল্লাহ। সুতরাং খাজনা আদায় শরিয়তি আইনের পরিপন্থী' বলে তিতুমীর ও ফরায়েজিরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ পর্যায়েও ইংরেজ শাসককে হিন্দু জমিদার ও নেতৃস্থানীয়রা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করায় এসকল আন্দোলন শেষপর্যন্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন দমন-পীড়ন, জেল-জুলুম, ফাঁসি, দ্বীপান্তরের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে প্রতিহত করা হয়। ফরায়েজিদের প্রতি ইংরেজ সরকারের রোষদৃষ্টি প্রসঙ্গে টেলর লিখেছেন:

> 'The Ferajees have the character of being stricter in their morals than their other Mohammedan bretheren but they are inclined to intolerance and persecution and in showing their contempt of the the religious opinions of their neighbours they frequently occasion affrays and disturbanees in the town. Their leader 'Hajee Shuritulla' has more than once been taken in custody on this account and is at present under the ban of the police. I believe for exciting his disciples in the country to withold the payment of revenue.'[৪৩]

ইংরেজ সরকারের এমন বিমাতাসুলভ আচরণ ও গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বিশেষত মুসলিম জনমনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ধূমায়িত হয়। এর ধারাবাহিকতায় পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বছর পর (২৯ মার্চ, ১৮৫৭) সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক সিপাহিবিপ্লব নামক মহাবিদ্রোহ।[৪৪] এ বিদ্রোহ দমনে হিন্দু বিত্তবানশ্রেণি আগ্রহভরে ইংরেজ কোম্পানিকে সহযোগিতা করে। সমকালীন এ বাস্তবতার বিষয়ে বিনয় ঘোষের বক্তব্যটি মূল্যায়নযোগ্য:

> 'সিপাহি বিদ্রোহ সফল হলে ব্রিটিশ রাজশক্তির অবসান এবং মুসলমান রাজশক্তির পুনরাধিষ্ঠান হবে। এই ধরনের একটা আশঙ্কা হিন্দু মধ্যবিত্তদের মনে জেগেছিল।...ব্রিটিশ শাসনের ভোগবিলাসের যা কিছু আশীর্বাদ তার প্রায় সবটুকুই বর্ষিত হয়েছিল এদেশের ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপরে। তাঁরাই লাভবান হয়েছিলেন এবং স্বভাবতঃই এই লাভটুকু হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে জুটেছিল। এজন্যই সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য হিন্দু মধ্যবিত্তের বিশেষ করে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ উপলব্ধি করতে পারেনি।'[৪৫]

অনুরূপ স্বীকারোক্তিমূলক মন্তব্য করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত *সেই সময়* শীর্ষক রচনাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুবিধাবাদী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত দালাল শ্রেণি, চাকরিজীবী ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতার কথা বলেছেন।[৪৬] কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না। এ বিদ্রোহ চলাকালেই কবি ঈশ্বরগুপ্তের মতো মানুষও উৎসাহ ভরে লিখেছিলেন :

'ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
উচ্চমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।'[৪৭]

এসকল কারণেই বিরাট সম্ভাবনা থাক সত্ত্বেও সিপাহিবিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য না থাকা, নিজেদের মধ্যে পর্যাপ্ত যোগাযোগের ঘাটতি, কতিপয় স্বার্থন্বেষী সামন্ত শাসককে অন্তর্ভুক্তি, সমন্বয়হীনতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা, নিমজ্জমান সামন্ততন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকে সবিশেষ গুরুত্বারোপ, দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার অভাব, দেশীয় অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সমর্থন লাভে ব্যর্থতাই এ বিদ্রোহের পরাজয়কে তরান্বিত করে। কেউ কেউ এ বিদ্রোহকে 'ধর্মান্ধ সিপাহিদের বিদ্রোহ', 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা', 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' ও 'জাতীয় বিপ্লব' বলে অভিহিত করে থাকেন।[৪৮] সবকয়টি লক্ষণই এ বিদ্রোহে নিহিত ছিল। কিন্তু কোম্পানির কূটকৌশলের কাছে এ বিদ্রোহ সফল হতে পারেনি। সকল সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও সাধারণ সিপাহিদের এ বিদ্রোহ কোম্পানির সীমাহীন শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এক বিরাট গণবিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। যার অভিঘাতে কোম্পানির শাসনের ভিত কেঁপে ওঠে। এ মহাবিদ্রোহের প্রবল ঝাঁকুনিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষের

দিকে নজর দিতে বাধ্য হন। তাই কোম্পানির প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের হাত থেকে এদেশের শাসনভার মহারানি ভিক্টোরিয়া (১ নভেম্বর, ১৮৫৮) নিজ হাতে তুলে নেন। বিদ্রোহের একটিই প্রাপ্তিযোগ ঘটে, তা হলো ভারতবর্ষে কোম্পানির দুঃশাসনের অবসান। এ গণবিপ্লবের পশ্চাতে মুসলমানদের যে-প্রধান ভূমিকা ছিল এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বণিক কোম্পানির শতবর্ষব্যাপী অবৈধ শাসন-শোষণ ও দুর্বিনীত অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহই ছিল দেশীয় রাজপুরুষ, সিপাহি ও সাধারণ মানুষের একাংশের প্রথম বৃহত্তম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ।

ব্রিটিশ সরকারের শাসনামল

ভারতবর্ষের দায়িত্বভার গ্রহণকালের ঘোষণাপত্রে মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কিত নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যে পরিণত হয় না। বরঞ্চ রানির প্রথম দুই বছরের শাসনামলে পূর্বের ন্যায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যায়। ব্রিটিশ সরকারের কৃষিখাত ও সেচের ক্ষেত্রে অবহেলা-উদাসীনতা প্রদর্শনের ফলে কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় সরকার রেলপথ নির্মাণ, সুতার কল, পাটকল স্থাপন ও কয়লা খনির কাজে অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে।[৪৯] ফলে ইউরোপীয়দের অধীনে শিল্পখাতে উন্নতি ঘটলেও কৃষিখাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। আবার এসময় যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর ও পাবনা অঞ্চলে ইংরেজ নীলকরদের সীমাহীন জুলুমের প্রতিবাদে কৃষকদের নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮-১৮৬০) শুরু হয়। দেশব্যাপী অব্যাহত আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার আইন করে তা বন্ধ করে। কিন্তু এসময়ই (১৮৫৯) ভারতীয়দের উচ্চ সরকারি চাকরি অর্থাৎ আই.সি.এস পরীক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমা তেইশ থেকে বাইশ করা হয়। পরবর্তীকালে তা কূটকৌশলে একুশ (১৮৬৬) ও উনিশ (১৮৭৭) বছরে নামিয়ে আনা হয়।[৫০] এভাবে ইংরেজ শাসন-শোষণের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি যেমন ধ্বংস হয়, তেমনি চাকরি ও ব্যবসায়ে বাঙালির সুযোগ হাতছাড়া হয়। হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের মানিয়ে নিতে সক্ষম হলেও মুসলমানরা নানাভাবে পিছিয়ে পড়ে।[৫১] মুসলমান জাতির এ দুর্দশা দেখে কতিপয় মুসলিম ব্যক্তি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব মুহসিন-উল-মুলক, নবাব ভিকার-উল-মুলক, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। এদের সকলেরই উদ্বিগ্ন হবার মূলে ছিল ইংরেজ সরকারের প্রভাবে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের মাপকাঠি জমি থেকে ব্যবসায়িক কাগজি নোটে রূপান্তরের ঘটনা। কারণ ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দান হল, প্রাচীন ভারতীয় সামন্তপ্রথার ভিত শিথিল করে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রবর্তনের অনুকূলে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করা।[৫২] তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে চাকরি, বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ।

দিল্লিবাসী স্যার সৈয়দ আহমদ খান রাজক্ষমতার প্রত্যক্ষদর্শী ও চাকুরে হিসেবে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই সিপাহি বিদ্রোহের জন্য ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদেরকে সরাসরি অভিযুক্ত করায় এবং এ গোষ্ঠীর প্রতি রোষানল থাকায় সৈয়দ আহমদ সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে তৎপর হন। এ জন্য পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, চাকরির সুযোগ, শাসকের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন সংগঠন, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হন। তিনি মুসলমান জাতির নবজাগরণে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ বা আলীগড় কলেজ (১৮৭৭), আলীগড় বৈজ্ঞানিক সমিতি (১৮৬৪), সোসাইটি ফর দ্য এডুকেশনাল প্রগ্রেস অব ইন্ডিয়ান মুসলিমস (১৮৭০), মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স (১৮৮৬) ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৬৬), ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্রেট্রিয়েটিক এসোসিয়েশন (১৮৮৮) ও আলীগড় মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৩] ১৮৮৫ সনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তাতে হিন্দুশ্রেণির কর্তৃত্ব প্রাধান্য থাকায় তিনি মুসলমানদের কংগ্রেসে যেতে নিষেধ করেন এবং নিজেদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলার দিকে গুরুত্বারোপ করেন। শাসকগোষ্ঠীর নেকনজর কাড়তে মুসলমানদের মাঝে জেঁকে বসা গোঁড়ামি দূরীকরণে তিনি 'সিপাহি বিদ্রোহের কারণ' (১৮৫৮), 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমান' (১৮৬০), 'ভারত বিদ্রোহের কারণ', 'বাইবেল সম্পর্কিত টীকা' (১৮৬২) 'রিসালা আহকাম-ই-তায়াম-ই-আহলে কিতাব' নামক পুস্তিকা বের করেন এবং 'তাহজীব-আল-আখলাক' (১৮৭০) নামক সমাজসংস্কারমূলক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৫৪] এর মাধ্যমে তিনি যুক্তিসহকারে পূর্ববর্তী ওয়াহাবীপন্থীদের 'দার-আল-হারব' ভারতবর্ষকে 'দার-আল-ইসলাম' বলে ঘোষণা দেন।[৫৫] তিনিও রামমোহনের মতো নিজেকে ও স্বজাতিকে রাজভক্ত হিসেবে প্রমাণ করতে

চেয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বর প্রেরিত মনে করতেন। দেওবন্দপন্থীদের মতো কট্টরবাদীদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হলেও তিনি আলীগড় কলেজ ও মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও নবজাগরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁর এ সমিতি মুসলমানদের রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। সমকালের অভিভাবকহীন মুসলমানদের জন্য তিনি জাতীয় নেতায় পরিণত হন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ভিকার-উল-মুলক, মুহসিন-উল-মুলক, ডা. নজির আহমেদ, হালী ও শিবলীর মতো মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব ঘটে।

পরবর্তী পর্যায়ে নবাব মুহসিন উল-মুলুকের (প্রকৃত নাম সৈয়দ মেহেদী আলী খান) 'আঞ্জুমান-ই-তরাক্কি-ই-উর্দু', নবাব ভিকার-উল-মুলুকের (প্রকৃত নাম মুশতাক হোসাইনের) 'মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সমিতি' (১৮৭০) ও 'ভারতে মুসলমানদের ভাগ্য' (১৯১১) নামক নিবন্ধ এবং নবাব আবদুল লতিফের মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩), কলকাতা ও হুগলি মাদ্রাসায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ খোলা ও মুহসিন ফান্ডের টাকা মুসলিম শিক্ষাখাতে ব্যয়ের উদ্যোগ এবং সৈয়দ আমির আলীর ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৭) প্রতিষ্ঠার[৫৬] মধ্য দিয়ে মুসলমানদের আত্মজাগরণ, আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ, পৃথক নির্বাচন ও চাকরির বন্দোবস্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিপর্যস্ত ও বেসামাল মুসলমানদেরকে মুক্তি দিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যেমন শিক্ষা ও রাজনীতিতে গুরুত্বারোপ করেছেন, তেমনি নবাব আবদুল লতিফ জোর দেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায়। আর সৈয়দ আমির আলী মুসলিম গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত করেন এবং সৈয়দ আহমদের 'মুসলিম কওম'-এর সীমানা অতিক্রম করে একে 'মুসলিম নেশন'-এ রূপদান করেন। এদিক থেকে তাঁকে জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের পূর্বসূরিও বলা যায়।

সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলায় বেশ কিছু রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৭৬) অন্যতম। এসময় কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো মুসলমানরাও জড়িত ছিলেন। এ সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বৃহৎ বাংলা প্রদেশের বাঙালিরা শিক্ষা-দীক্ষায়, কৃষ্টি-কালচারে ও নবজাগরণের দিক দিয়ে বহু অগ্রগামী ছিল। শিক্ষিত বাঙালি স্বভাবে স্বাধীনচেতা হবার কারণে ব্রিটিশ সরকার এ প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করতে অপরাপর জনগোষ্ঠী দিয়ে ব্রিটিশ শাসন সুরক্ষায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল গড়ার চিন্তা করে। এর ধারাবাহিকতায় অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস কর্মকর্তা এলান অক্টাভিয়ান হিউম ও ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায় বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ সনের ২৮ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭] বাঙালি প্রাধান্যকে খণ্ডন করে অবাঙালিদের নেতৃত্বে আনতে কলকাতার পরিবর্তে বোম্বেতে সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারপরেও বাঙালি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এতে হিউম দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন। কারণ তিনিসহ ইউরোপীয়রা এ ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক বিক্ষোভকারী ও সরকারের চাকরিচ্যুত উমেশচন্দ্রকে পছন্দ করতেন না। বাঙালির হাতে নেতৃত্বে চলে যাওয়াতে অবাঙালি নেতৃবৃন্দও ক্ষুব্ধ হন। তাই ব্রিটিশ শাসনকে সুরক্ষার শপথ নিয়ে কংগ্রেসের পথ চলা শুরু হলেও তা অচিরেই ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ ও প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়।[৫৮] প্রথম দিকে সরকার এর পৃষ্ঠপোষকতা করায়, পারস্পরিক প্রশংসা বিনিময় ও লেনদেনের কৃতজ্ঞতায় একটা আপস রফার ভাব বজায় থাকলেও অচিরেই এ মনোভাবের পতন ঘটে। ফলে সরকার নোটিশ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কংগ্রেসের সভা সমাবেশে যোগদান করতে নিষেধ করেন।[৫৯] প্রথম যুগে যেখানে রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, কেশব সেন প্রমুখ সমাজনেতা ইংরেজশাসনের প্রশংসা করেছেন এবং স্থায়িত্ব কামনা করেছেন; সেখানে পরবর্তীকালে শিশির কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতা ব্রিটিশ সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসে দাদা ভাই নওরোজী যোগদানের পর থেকে এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ফলে সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদে দেশীয়দের নিয়োগ, শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, আর্থিক নিষ্কাশন ও সামরিক খাতে ব্যয় কমানোর বিষয় নিয়ে কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করলেও সরকার কর্ণপাত করেনি। যার দরুন উভয় পক্ষের সম্পর্কের সদ্ভাবের অবনতি ঘটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে লর্ড কার্জন দেশবাসীকে 'মিথ্যাবাদী' বলাতে গোটা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে তখন বাংলা প্রদেশ চালকের আসনে চলে

আসে। বাংলার এ দুর্বার আন্দোলনকে দুর্বল করতেই তিনি ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন।[৬০] এ সিদ্ধান্তের পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন পাবার প্রত্যাশায় কার্জন এদেরকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেন।

বঙ্গভঙ্গ পদ্ধতি ও প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক কারণে এ বাংলাকে দুইবার ভাগ করা হয়। ১৯৪৭ সনের বাংলা ভাগের সঙ্গে ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের মৌলিক পার্থক্য ছিল। সাতচল্লিশে মুসলিম জনশক্তি সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি দাবি করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলাকেও বিভক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ জনসাধারণের কোনো দাবির ফল নয়– বরং শাসকচক্রের পরিকল্পনা সেদিন জনসাধারণের উপরে আরোপিত হয়েছিল। আর এ পরিকল্পনায় এদেশবাসীকে স্বাধীনতা দানের কোনো ইচ্ছা ইংরেজ শাসকদের ছিল না।[৬১] লর্ড কার্জনের এ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতাদের যেমন বিমূঢ় করে, তেমনি তাদের নেতৃত্বকে শিথিল পর্যায়ে এনে তদ্‌স্থলে চরমপন্থীদের জায়গা করে দেয়। ১৮৭০ সনের দিকেই শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুগোষ্ঠীর চেতনায় প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে এক উগ্র জাতীয়বাদে প্রত্যাবর্তনের উন্মেষ দেখা যায়। এর ধারাবাহিকতায় রাজনারায়ণ বসুর ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা’, কলকাতার ‘সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা’(১৮৭৩), শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সাধারণ ধর্মসভা’(১৮৬৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের রচিত সাহিত্যে যেমন এ হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুজাগরণবাদ সমার্থক হয়ে ওঠায় এটি সবচেয়ে শোচনীয় রূপধারণ করে।[৬২] আবার রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর বাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ‘হিন্দু মেলার’ (১৮৬৭) আয়োজনের মধ্য দিয়ে ভারতের হিন্দুদের আত্মনির্ভরতার কথা বলা হলেও অহিন্দু (মুসলিম) জনগোষ্ঠীকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে ক্রমশই হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্যার সৈয়দ আহমদ যেমন আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন, তেমনি উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছিল দয়ানন্দ সরস্বতীর ‘আর্যসমাজ’ (১৮৭৫) ও ‘গোহত্যানিবারণী আন্দোলন’ (১৮৮২) এবং বালগঙ্গাধর তিলকের ‘শিবাজী উৎসব’ (১৮৯৫) প্রভৃতি। বালগঙ্গাধর ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের গুরু।[৬৩] পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দুমহাসভা’ (১৯১৫), ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ’ (১৯২৫) ও ‘বিশ্বহিন্দুপরিষদ’– এর মাধ্যমে বীর সাভারকার, মদনমোহন মালব্য, সদাশিব গোলওয়ালকর, ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ও লালা লাজপৎ রায়দের[৬৪] মতো চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের কর্মকাণ্ড মুসলমানদের আপন না করে, কাছে না টেনে বরং দূরে ঠেলে দেয়।

বাংলা প্রদেশের আয়তন বড় হওয়ায় এবং এর শাসনকার্য সম্পাদনে বিড়ম্বনার অজুহাতে বাংলাকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে ভাগ করা হয়। আসামপ্রদেশের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট,ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোকেও যুক্ত করা হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা। আর পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িশা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। এর রাজধানী পূর্বের কলকাতাই বলবৎ থাকে। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব অনেক দিন ধরেই সরকারি মহলে চলে আসছিল। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই স্যার চার্লস গ্রান্ট ১৮৫৩ সনে ও লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৪ সনে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের মতো বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভক্তির সুপারিশ করে এ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় অবশেষে বাঙালি হিন্দুদের তীব্র আন্দোলন ও বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর) কার্যকর করেন। অধিকাংশ মুসলমান এর সমর্থন করলেও কতিপয় মুসলিম নেতা এর বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুর রসুল (পরে ব্যারিস্টার), আব্দুল হালিম গজনবী (পরে স্যার), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী কাজিম আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা আকরম খাঁ, ড. আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সৈয়দ আলী ইমাম ও হাসান ইমাম (পাটনার দুই ব্যারিস্টার ভাই), ব্যারিস্টার মজহারুল হক ও লিয়াকত হোসেন প্রমুখ।[৬৫] তবে বঙ্গভঙ্গ বিভিন্ন সুবিধা ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ এনে দেয়ায় একে সমর্থন ও স্বাগত জানিয়েছিলেন পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধি নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীরা। এজন্য তাদেরকে ব্রিটিশ সরকার ঘুষ হিসেবে নগদ অর্থ (১৪ লক্ষ টাকা) ও খেতাব প্রদান করেছিলেন। তবে এ বঙ্গভঙ্গের মূলে

হিন্দু-মুসলমানদের লাভ-ক্ষতির চেয়ে শাসক ইংরেজদের কূটকৌশল সক্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তা রিজলির মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য:

> ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলা ইংরেজদের পক্ষে একটি বিপজ্জনক শক্তি; বিভক্ত হলে বাংলাদেশ আর তেমন আমাদের বিপদে ফেলতে পারবে না।’[৬৬]

১৮৭০ সনের পর থেকে মূলত ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ওপর রোষদৃষ্টি সরিয়ে আনুকূল্য শুরু করেন। ততদিনে মুসলমানরা অনেকেই পাটচাষের বদওলতে কিছু নগদ প্রাপ্তিতে সচ্ছল হয়ে ওঠে এবং আধুনিক বিদ্যা-শিক্ষায় নিজেদের উপযুক্ত করে তোলে। ফলে মুসলমানদের সরকারি চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে যায়। যা হিন্দু মনে একই সঙ্গে ঈর্ষা ও উদ্বেগের জন্ম দেয়। কারণ এরপর থেকেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। আবার নবগঠিত পূর্ববঙ্গ-আসামপ্রদেশের ল্যা.গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এক অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বলেছিলন– ‘হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় আমার দুই স্ত্রীর মতো। এর মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর।’[৬৭] এমন বক্তব্য হিন্দুজনমনে শাসক ও মুসলমানদের প্রতি যুগপৎ অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। যার পথ ধরে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গবিরোধী গণআন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে সরকার ব্যাপক দমননীতির আশ্রয় নেয়। বহু নেতাকর্মীকে আটক, নির্বাসন, বিস্ফোরক আইন, সংবাদপত্র আইন, প্রেসআইন, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক মামলা, সভাসমিতি সংক্রান্ত আইনজারির ফলে প্রকাশ্য পথ ছেড়ে আন্দোলন গুপ্তপথে পরিচালিত হয়।[৬৮] যার ফলে প্রমথনাথ মিত্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় ‘সন্ত্রাসবাদী সমিতি’ (১৯০৩)। কলকাতাকেন্দ্রিক এ সংগঠনটি পরিচালিত হতো ‘অনুশীলন সমিতি’ নামে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ‘ঢাকা অনুশীলন সমিতি’। আবার অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় সংগঠন হিসেবে ‘যুগান্তর’-এর (১৯০৬) সৃষ্টি হয়।[৬৯] এসকল সংগঠনের তৎপরতা দাবাগ্নির মতো গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সংগঠন থেকেই বেরিয়ে আসে বাঘা যতীন, হেমচন্দ্র, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, রাসবিহারী বসু, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল ও প্রফুল্ল চাকীর মতো বহু সূর্য সন্তানেরা। এরা দেশীয় বিত্তবানদের বাড়িতে ডাকাতি করে এ অর্থে সংগঠন চালাতেন। আর ব্রিটিশ সরকারকে চাপে ফেলতে ল্যা. গভর্নর বামফিল্ড ফুলার, ফ্রেজার, চার্লস ট্রেগার্ট, কিংসফোর্ড ও লর্ড কার্জনের মতো মানুষকে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে সারা বাংলায় আলোড়ন তুলতে সক্ষম হন।[৭০] দেশবাসীর চোখে এরা ছিলেন ‘স্বদেশি’ আর ইংরেজ সরকারের চোখে ছিলেন ‘সন্ত্রাসী’। যুগান্তরের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[৭১] স্বদেশি আন্দোলন যুগে (১৯০৮-৩০) বাঙালি হিন্দু মানসে প্রবল দেশাত্মবোধের জন্ম দেয়। যদিও এর সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যগৌরব যুক্ত ছিল। বিদেশি পণ্যবর্জন আন্দোলন সফল করতে ছাত্রনেতারা (বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার, লিয়াকত হোসেন ও আবদুর রসুলরা) কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায়– ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই’ গান গেয়ে জনমত গড়ার চেষ্টা করেন।[৭২] বঙ্গভঙ্গের এ প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ নামক সঙ্গীত। আবার জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে তিনি ‘রাখিবন্ধন’ প্রবর্তন করেন।[৭৩] হিন্দুদের কাছে এ বাংলাভাগ ছিল সাক্ষাৎ ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের সমতুল্য।

স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী– এমন দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বেও কংগ্রেস গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও বালগঙ্গাধর তিলক– এ দুই স্রোতে বিভক্ত ছিল।[৭৪] এমন পরিবেশ ও আবহাওয়াতেই কংগ্রেসের মতই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ঢাকায় ১৯০৬ সনের ৩০ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। আর নেতৃত্ব চলে যায় ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর হাতে। এ সংগঠন গড়ে ওঠার পেছনে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মুসলমানদের মৈত্রীবন্ধন করা এবং এ শাসন ব্যবস্থার অধীনে থেকে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা– এমন লক্ষ্য নিয়ে মুসলিম লীগ গড়ে ওঠায় হিন্দুদের বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সরকার স্বরাজ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আপসরফা করতে বাধ্য হয়। তবে লীগের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় না। মর্লি মিন্টোর সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেয়া হয়। ফলে রাজনৈতিক বিভেদ আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দুদের অব্যাহত আন্দোলনের মুখে ভারত সচিব লর্ড ক্রিউ ও গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সুপারিশে ১৯১১ সনের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ এক

ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। তবে বাঙালি হিন্দুমধ্যবিত্তের আন্দোলনের খেসারতস্বরূপ ইংরেজ সরকার রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন। এতে করে বাঙালির কর্তৃত্ব লোপ পায়। উপরন্তু ব্রিটিশভারতের প্রথম শহর কলকাতা তার গৌরব হারায় আর বাংলা হারায় এর প্রধান প্রেসিডেন্সির মর্যাদা। আর পূর্ববাংলার ক্ষুব্ধ মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

এসময় ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দারুণভাবে প্রতিভাত হয়। বিপ্লবীদের গদর (বিদ্রোহী) পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯১৩), এম.এন রায়ের অস্ত্রসংগ্রহে বিদেশ গমন (১৯১৫), ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌচুক্তি (১৯১৫), সফল রুশবিপ্লবের (১৯১৭) প্রভাবে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ার তৎপরতা (১৯১৭-১৯), রাওলাট আইনের প্রতিবাদে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' খেতাব বর্জন, শঙ্করণ নায়ারের বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকা বেতনের চাকরিতে ইস্তফা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্কের খেলাফত বিলুপ্ত করার প্রতিবাদে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী) খেলাফত আন্দোলন (১৯২০), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২২) এবং কমিউনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ– এসব মিলিয়েই ভারতে এক টালমাটাল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।[৭৫] হিন্দু-মুসলমানের যৌথ গণআন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। এ পর্যায়ে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সম্মিলিত অংশগ্রহণের ঘটনাটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করে মুহম্মদ আলী খান জিন্নাহ ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। আর কংগ্রেসেও গান্ধীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' এবং মুসলমানদের জমিয়তুল উলামার 'তবলীগ' ও 'তানজিম'-কে কেন্দ্র করে বাংলায় ঘন ঘন দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।[৭৬] চরমপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় এসময় একই সঙ্গে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সমকালে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা ভিন্ন হলেও আদর্শ একই ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. আম্বেদকর বলেন– 'উভয়ের মধ্যে শুধু পার্থক্য এই যে, হিন্দু মহাসভা কথাবার্তায় অশালীন এবং কার্য ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর। আর কংগ্রেস মোলায়েম ও বিজ্ঞ।'[৭৭] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনে চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে (১৯২২) প্রস্তাব করেও ব্যর্থ হন। ফলে তিনি মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খানকে নিয়ে (১৯২২, ৩১ ডিসেম্বর) কংগ্রেস-খেলাফত স্বরাজ্য দল গঠন করেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা স্থায়ীভাবে রোধ করতে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) উত্থাপন করেন। যা প্রগতিশীলদের মাঝে দারুণ উৎসাহের জন্ম দেয় এবং দেশবাসী তাকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।[৭৮] পরবর্তীকালের লবণ আইনকে উপলক্ষ করে আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-১৯৩৪) চলাকালে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী সংগঠনগুলো তৎপরতা শুরু করে। তারা গেরিলা কায়দায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখে আর বহু ইংরেজ কর্মকর্তা হত্যা করে। এভাবে মেদিনীপুরে তারা কয়েকদিনের জন্য এক বিপ্লবী সরকার গঠন করতেও সক্ষম হয়।

এসময় বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮) নিয়ে হিন্দু-মুসলমান মতানৈক্য শুরু হয়। তারপরেও বাংলার কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি (১৯২৯) গঠিত হয়। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন মেনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি (১৯৩৬ সনে প্রজা সমিতির নাম পাল্টানো হয়) ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে (১৯৩৭) অংশ নিয়ে বেশ ভালো ফলাফল অর্জন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পায় চল্লিশটি, কৃষক প্রজাপার্টি পায় আটত্রিশটি আর স্বতন্ত্র মুসলমানরা পায় তেতাল্লিশটি আসন।[৭৯] ফজলুল হক কংগ্রেসের শরৎ বসুর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেও ব্যর্থ হন। কারণ কংগ্রেস নিজ দলীয় সকল রাজবন্দি ও সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তির বিষয়ে শর্তারোপ করায় এবং কৃষক প্রজাপার্টির জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্তির ঘোষণায় স্বার্থহানির আশঙ্কায় হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত সরকার গঠনের সুযোগটি হাতছাড়া হয়। এতে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের আবির্ভাব ঘটে। বাধ্য হয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনকে নিয়ে সরকার গঠন করেও বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। ফজলুল হক কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন।[৮০] যার ফলে সমকালীন বাস্তবতায় মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পায় আর ফজলুল হকের ইমেজ ও অবস্থানের

অবনতি ঘটে। তারপরেও ফজলুল হক ‘ঋণ সালিশী বোর্ড’ (১৯৩৮), ‘প্রজাস্বত্ব আইন’ (১৯৩৯) এবং ‘মহাজনী আইন’-এর (১৯৪০) মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান ও অসহায় কৃষকদের জন্য প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।[৮১] যদিও মন্ত্রিসভা ও লীগের অধিকাংশ সদস্যরাই ছিলেন জমিদার ও ভূস্বামী।

এসময় সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রভাবে দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। এ যুদ্ধে ব্রিটেন জড়িয়ে পড়লে এবং হিটলারের আগ্রাসী পদক্ষেপে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় প্রগতিশীল মানুষ যেমন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, তেমনি রাজনীতিবিদরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনের অবসানে স্বাধীনতার বিষয়টি বড় করে তোলেন। এসময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও বেগবান হয়। এর প্রভাবে ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সঙ্ঘ’ যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি ‘নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’-এর (১৯৩৬) একটি শাখা ঢাকায় ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’ (১৯৩৯) নামে প্রতিষ্ঠা পায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৪১ সনের ১৬ জানুয়ারি) সকলের অগোচরে দেশত্যাগ করে বার্লিন পৌঁছান। পরবর্তীতে জাপান গিয়ে জাপানি সরকারের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army গঠন করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের ‘স্বরাজ’ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।[৮২] এর পূর্বেই ১৯৪০ সনের ২২ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোরের এক অধিবেশনে জিন্নাহ ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব মতবাদ’ বা Two Nation Theory এবং মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবি উচ্চারণ করেন। এর একদিন পর ২৩ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ উত্থাপন করেন। এর মাধ্যমে তিনি ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকায় ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ (Independent States) প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এ প্রস্তাবে কোথাও ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’ ও ‘পাকিস্তান’ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও কালক্রমে তা ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ নামে পরিচিতি পায়।[৮৩] অবাঙালি জিন্নাহ কৌশলে বাঙালি ফজলুল হককে দিয়ে এ ‘পাকিস্তান’ প্রস্তাবটি করিয়ে নেন। ১৯৩০ সনেই পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। এরপর ১৯৩৩ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলীর নেতৃত্বে একদল ছাত্র ‘পাকিস্তান’ শব্দটি তৈরি করেন। এ নামকরণের ক্ষেত্রে তারা পাঞ্জাবের-P, কাশ্মীরের-K, সিন্ধুর-S এবং বেলুচিস্তানের-tan–এমন প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করেন। সেখানে মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদ পড়ে। ইকবাল ও রহমত আলীদের পরিকল্পনায় ‘পূর্ববাংলার’ নামগন্ধও ছিল না। এমনকি তাঁরা স্বাধীন পাকিস্তানের কথাও কখনো বলেননি। তাঁরা কেবল স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন।[৮৪] কিন্তু পরবর্তীকালে ‘স্বাধীন পাকিস্তান দাবি’ মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন বিষয়ে জিন্নাহ ও ফজলুল হকের মধ্যে বনিবনা না হবার কারণে শেরে বাংলা মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং প্রগ্রেসিভ পার্টি গঠন করেন। আর হিন্দু মহাসভা, ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক সমিতি ও তফসিলি হিন্দু দলগুলোর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। কিন্তু তাও বেশিদিন টিকেনি। দ্বিতীয় দফায় তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। যা ‘শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা’ (১৯৪১-১৯৪৩) নামে পরিচিতি পায়। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সম্প্রীতিপূর্ণ বাংলা গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে এ মন্ত্রিসভা উদ্যোগী হলেও গান্ধীর ‘ভারতছাড় আন্দোলন’ বা Quit India Movement (৮ আগস্ট, ১৯৪২) এর প্রভাব, সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় নানা অবরোধে জনজীবনের নাভিশ্বাস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক প্রাণহানি ও শস্যহানির ঘটনা–এ মন্ত্রিসভার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এসময় (১৯৪২ সনের ৮ মার্চ) ঢাকায় দাঙ্গাবিরোধী মিছিলে অংশ নিয়ে ছাত্র ফেডারেশন কর্মী ও তরুণ লেখক সোমেন চন্দ রাজপথে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর হাতে নির্মমভাবে খুন হলে সারা বাংলা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এসব কারণে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে (২১ মার্চ, ১৯৪৩) এবং খাজা নাজিমুদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন (১৩ এপ্রিল, ১৯৪৩) করেন। যা ১৯৪৫ সন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটি ‘বেঙ্গল কোয়ালিশন সরকার’ হয়েও এবং ব্রিটিশদের নেকনজর থাকা সত্ত্বেও তেমন কাজ করতে পারেনি। তাই ১৯৪৩ সনের সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় এ সরকারকে ব্যর্থতার গ্লানি মেনে নিতে হয়। তারপরেও এ তিরিশের দশকের শেষ পর্যায়ে এসে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংহত বিকাশের সূত্র পেয়ে যায়। এ বিকাশের ধারাকে সম্ভব করার ক্ষেত্রে দুটি ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথমত; বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা– এমন সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা (১৯১৮)। দ্বিতীয়ত; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীদের মতো

সমমনাদের উদ্যোগে মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) চুক্তি কার্যকর। প্রথম ঘটনার ফলে বাঙালি মুসলমানের আত্মসত্তা, জাতিসত্তা ও জাতীয় জাগরণের ভিত্তি তৈরি হয়। আর দ্বিতীয়টির ফলে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্রমশই গড়ে ওঠে সঞ্চরণশীল একটি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সমাজ আত্মপ্রকাশ, আত্মবিকাশ ও সামাজিক জাগরণের তাড়নায় গড়ে তোলে নানা সভা-সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশমাধ্যম। নব-উন্মাদনা ও উদ্ভাবনামুখরতায় পুরোনো বৃত্ত ভেঙে নতুন অভিমুখের প্রত্যাশায় হয়ে ওঠে দীপ্র। এ ভাবব্যঞ্জনা ও আর্তিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেন আরেক মানবতাবাদী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালি মুসলমানের এ জাগরণ ও যাত্রায় প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

মন্বন্তর

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার ইতিহাসে দুটি দুর্ভিক্ষের ঘটনা ধ্বংস ও ভয়াবহতার দিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। একটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ/১৭৬৯-৭০ খ্রি.) এবং অন্যটি পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ/১৯৪৩ খ্রি.) বা ‘The Great Bengal Famine’ নামে সমধিক পরিচিত। খাদ্যাভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষের করুণ মৃত্যু ও ধ্বংসের সঙ্গে ব্রিটিশ দুঃশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) মাধ্যমে বাংলার শাসনভার গ্রহণের অল্পকাল পরেই তীব্র শোষণের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তৎকালীন বাংলার দেড়কোটি জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরই মৃত্যু ঘটে এ মন্বন্তরে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পূর্বে সংঘটিত হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। এদেশে ব্রিটিশ শাসকদের আগমন ও নির্গমনের সঙ্গে এ দুটি মন্বন্তর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল । ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মূলে ছিল কোম্পানির অতিরিক্ত করারোপ এবং তা আদায়ের নির্মমতা। পক্ষান্তরে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া।[৮৫] এ যুদ্ধ চলাকালে জাপানি সৈন্য কর্তৃক বার্মা দখল (১৫ মে, ১৯৪২) ও কলকাতায় বোমাবর্ষিত (২০ ডিসেম্বর, ১৯৪২) হলে সরকার যেমন বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ রাখে, তেমনি জীবন বাঁচাতে অসংখ্য বাঙালির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ঘটে। আবার ভারতকে সুরক্ষা দিতে অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্যের আগমন ঘটায় তাদের রসদ সংগ্রহে সরকার গ্রাম অঞ্চলের সমস্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করে বাংলার বাইরে সুদূর জব্বলপুরে গুদামজাত করে রাখে। আর জাপানি সৈন্যদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে ‘ডিনায়েল পলিসি’ হিসেবে নদীমাতৃক বাংলার অন্যতম যোগাযোগের মাধ্যম সমস্ত নৌকা ধ্বংস করে এবং লঞ্চ, স্টিমার সরিয়ে ফেলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দেশীয় বণিক- মহাজনদের মজুতদারি ও কালোবাজারি। ফলে ৪৩ সনেই সারা বাংলায় খাদ্য ঘাটতি ছিল পাঁচ কোটি মণ চাল।[৮৬] যুদ্ধ ও মানবসৃষ্ট এ সংকটের কারণে এ মন্বন্তরে সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ। কিন্তু বেসরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা বলা হয় ৩৫ লক্ষ। আনুমানিক ১২ থেকে ১৫ লক্ষ লোক ভিখারিতে পরিণত হয়। আর ৬০ লক্ষ ভূমিহীন চাষি, ১৫ লক্ষ দরিদ্র চাষি, ১৫ লক্ষ দেশীয় কারখানার শ্রমিক ও ২৫ হাজার স্কুল শিক্ষক মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। খাদ্যের জন্য মানুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং নর্দমার ভেতরে কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। বাংলার ছয় কোটি মানুষের জীবন দুর্ভিক্ষের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বাংলার ৯০টি মহকুমার মধ্যে ২৯টি মহকুমা এবং ৮২৯৫৫ বর্গ মাইলের মধ্যে ২১৬৬৫ বর্গ মাইলের মানুষ তীব্রভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।[৮৭] উডহেড কমিশনের মতে, ৪২ সনে যে-চাল ১৪ আনা মণ দরে বিক্রি করা হয়, তা ৪৩ সনের ৩ মাসের মধ্যে ৩ টাকা মণ থেকে ৬৫ টাকায় গিয়ে পৌঁছায়। এক বছরেই মুনাফাখোররা কৃত্রিমভাবে চালের দাম বাড়িয়ে দেড়শো কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা আদায় করে।[৮৮] শহরাঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা থাকায় খাদ্যসংকট ততটা প্রকট না হলেও গ্রামাঞ্চলে তা ভয়াবহ রূপ নেয়। জীবন বাঁচাতে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল কলকাতামুখী হলে তা এক করুণ, মর্মস্পর্শী ও ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

এ মন্বন্তর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়াতে হক-মন্ত্রিসভা ও নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রিসভা পরস্পরকে দোষারোপ করলেও এর জন্য মূলত দায়ী ছিলেন ব্রিটিশ সরকার। নাজিমুদ্দিন বিহার থেকে চাল সরবরাহ করতে চাইলেও সরকার ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিরোধিতা করেন। অনেকে প্রতিবাদ করে বলেন– ‘খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ কী করে পাকিস্তান দাবি করে তা শিখিয়ে দেব।’[৮৯] তারপরেও তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নিজ উদ্যোগে কলকাতায় বহু লঙ্গরখানা খুলে এক বেলা খাবারের

ব্যবস্থা করে এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে কিছুটা দুর্ভোগ লাঘব করেন। এজন্য তাঁকে অক্লান্ত শ্রম ও প্রচণ্ড চাপ সামাল দিতে হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনার সত্যতা শেখ মুজিব তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* বর্ণনা করেছেন।[৯০] ১৮২০ থেকে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত ৩৫ বছরে মোট দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ১৩ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। কিন্তু রেলপথ স্থাপন ও সেচ ব্যবস্থা ধ্বংসের কারণে ১৮৬০ থেকে ১৮৭৯ এ ২০ বছরে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ এবং মৃত্যুর পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষতে পৌঁছায়। এ দুর্ভিক্ষ যে-ব্রিটিশ দুঃশাসনের ফল– তা ইংরেজ সরকার মেনে না নিয়ে বরং এক ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য মনগড়া মতবাদ ও ইতিহাস উত্থাপন করে। তারা এদেশের দুর্ভিক্ষকে ‘অতিবৃষ্টি’ বা ‘অনাবৃষ্টির ফল’ এবং বাংলাকে ‘চির দুর্ভিক্ষের দেশ’ এবং ‘চিরদারিদ্র্যের দেশ’ বলে প্রচার করে।[৯১] এমন বিকৃত ইতিহাস রচনা আরো আগে থেকেই জেমস মিল, ইলিয়ট, ডাউসন, ব্রিগস ও কর্নেল টডের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার শুরু করেছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই সারা বাংলায় কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে।

তেভাগা-আন্দোলন

তেভাগার দাবিটি ১৯৪০ এর জুন মাসে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হলেও তা আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৬ সনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই কৃষককুলের এ আন্দোলনটি বেগবান হয়। এসময় সারা বাংলায় দুই হাজার জমিদারের মধ্যে দুইশত বারোটি ছিল খুব বড় জমিদার পরিবার। এছাড়া সারা প্রদেশে বড় জোতদার ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। এরা সম্মিলিতভাবে কৃষকদের হয়রানি করতে এবং আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে অসংখ্য খাজনা ও খাস দখলের মামলা দায়ের করে। আর্থিক অনটন ও মামলার মারপ্যাঁচে পড়ে বহু কৃষকের জমির দখলিস্বত্ব জমিদারদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ফলে ভাগচাষি, গুলাপ্রজা, ক্ষেতমজুর, ঠিকা বা উঠবন্দি প্রজাদের জমির উপর কোনো স্বত্বই আর থাকে না। আবার জমিদার- জোতদাররা ইচ্ছে করেই বহু খাসজমি কৃষকদের বন্দোবস্ত না দিয়ে পতিত ফেলে রাখে।[৯২] কৃষকদের দাবির মুখে পূর্বের গৃহীত সুদি কর্জ আইন বা Usarious Loan Act (১৯১৮), বঙ্গীয় মহাজনি আইন বা Bengal Agriculture Debters Act (১৯৩৬) করা হলেও এবং পরবর্তীকালে সংশোধিত হলেও কৃষকরা এর সুবিধা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।[৯৩] উপরন্তু বীজধানসহ উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয়ভার বহন সত্ত্বেও আধিয়ার বা বর্গাদারকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশই জমির মালিকের খোলানে মাড়াই করে তুলে দিতে হতো। এর সঙ্গে থাকতো নানা রকম শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতারণার খেলা। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতায় ‘কৃষক সমিতি’ গড়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের মতো হিন্দু-মুসলমান কৃষকরাও সম্মিলিতভাবে প্রতিপক্ষ জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে তেভাগার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ‘আধি নাই তেভাগা চাই’, ‘রশিদ বিনা ভাগ নাই’, ‘পাঁচ সেরের বেশি সুদ নাই’, ‘বাজে কোনো আদায় নাই’, ‘দখল রেখে চাষ কর’, ‘পতিত জমিতে ফসল কর’, ‘নিজ খামারে ধান তোল’ এবং ‘জান দিব তবু ধান দিব না’– কৃষকদের এমন শ্লোগানে সারা বাংলা মুখরিত হয়।

দেখতে দেখতে তেভাগার আন্দোলন বাংলার উনিশটি জেলা-দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, চব্বিশপরগণা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, নদীয়া, খুলনা, পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।[৯৪] ষাট লক্ষ কৃষক-কৃষাণী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সরকারের প্রশাসন ও পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই জমিদার-জোতদারদের পক্ষাবলম্বন করায় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পুলিশ ও জমিদারদের ভাড়াটে লাঠিয়ালদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে বহু কৃষকের রক্তে ফসলের মাঠ রঞ্জিত হয় এবং জেল-জুলুম ও মামলার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়। সমাজতন্ত্রী দলের বিপ্লবী লাইন, জমিদার ও প্রশাসনের উস্কানিতে এ আন্দোলন ক্রমশই জঙ্গিরূপ নেয় এবং রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে। এসব ষড়যন্ত্রের পড়েও কৃষককুল নিজেদের অধিকার আদায়ে যে-অপরিসীম সাহস, আন্তরিকতা, ত্যাগ, বুদ্ধিদীপ্ততা ও সজ্ঞচেতনার পরিচয় দেয়– তা এ সংগ্রামের উজ্জ্বল প্রান্ত। এ সংগ্রামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– কৃষকবধূ ও কন্যাদের সমান অংশীদারের বিষয়। কাকদ্বীপ, বড়া কমলাপুর, ডুবির ভেড়ি, অগ্রদ্বীপ, খগাখড়িবাড়ি, খাঁপুর ও শোভনা ইউনিয়ন তেভাগা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।[৯৫] সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কৃষকদের এ আন্দোলন ইতিহাসের স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠে। এ স্ফূলিঙ্গ বিপ্লবের দাবানল সৃষ্টি করতে পারেনি। তারপরেও এ বিদ্রোহ এমন এক বিপ্লবী চেতনার দীপ জ্বালিয়ে যায়, যা পরবর্তীকালের প্রতিটি

সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে প্রণোদনা যুগিয়েছে। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে কৃষকদের এ সংগ্রাম ও সজ্ঘচেতনা এক অনন্য দলিল হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার পথ ও পরিণাম

১৯৪৫ সনে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হলেও ব্রিটিশ সরকারকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়। কারণ এ যুদ্ধের পরপরই বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্রিটেনের হাত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। এসময় অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতো ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোও ক্রমশই স্বাধীন হতে থাকে। এছাড়া নির্বাচনে রক্ষণশীল উইনস্টন চার্চিলের পরিবর্তে লেবার পার্টির ক্লিমেন্ট এটলী ক্ষমতায় আসায় ব্রিটিশ রাজনীতির ধরন পাল্টে যায়। এসব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় ভারতে স্বাধীনতার প্রশ্নটিও প্রবল হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ সরকারও স্বায়ত্তশাসন প্রদানে সম্মত হন। ১৯৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা' আর কংগ্রেসের 'অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা'-র দাবি জোরদার হয় । উপরন্তু– 'হাত মে বিড়ি মুখ মে পান/লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'– এমন নির্বাচনী শ্লোগান মুসলমানদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করে। আবার ১৯৪১ সনের আদমশুমারিতে প্রকাশিত বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটির মধ্যে হিন্দুর (৩.১০ কোটি) চেয়ে মুসলমানের (৩.৭০ কোটি) সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থান ছিল সুবিধাজনক পর্যায়ে।[৯৬] ফলে এ নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমান অঞ্চল হতে স্ব স্ব প্রার্থী বিজয়ী হন। এ নির্বাচনে মূলত ধর্মের বিজয় ঘোষিত হয়। যার ফলে অখণ্ড বাংলার ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ১১৩টি, কংগ্রেস পায় ৮৬টি এবং বাকি ৫১টি আসনে অন্যান্য প্রার্থীরা বিজয়ী হন। ভারতের ১১টি প্রদেশের ৪৯৪টি মুসলিম আসনের ৪৩০টিতেই মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়।[৯৭] পাকিস্তান দাবির প্রেক্ষাপটে বাঙালির বিজয় ছিল চোখে পড়ার মতো। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদ (১৯৪৬-৪৭) গঠন করেন। এ সময় ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ৩ সদস্যের 'ক্যাবিনেট মিশন' (মার্চ, ১৯৪৬) এলে জিন্নাহ এপ্রিল মাসে দিল্লিতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এক সম্মেলন ডাকেন। জিন্নাহর নির্দেশ ও প্ররোচনায় মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পূর্বের লাহোর প্রস্তাব ক্ষুণ্ন করে মুসলমানদের জন্য একাধিক রাষ্ট্রের (States) স্থলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের (State) প্রস্তাব করেন। লীগ নেতা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এর প্রতিবাদ করলেও জিন্নাহর কূটকৌশল ও ছাপা ভুলের কৈফিয়তমূলক বক্তব্যকে সকলে মেনে নেন।[৯৮] যা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও বাংলা মুসলিম লীগের বিবাদ ও বিসংবাদ জাগিয়ে তোলে। প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা নাজিমুদ্দিনের চেয়ে জিন্নাহর প্রতি নিজের বেশি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী এমন অবিবেচকের মতো কাজটি করেন। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতেই শেরে বাংলা ফজলুল হক ৬ বছর পূর্বে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন।[৯৯] মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ এমন দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্রের মতো কংগ্রেসের ভেতরেও নেতাজী সুভাষ বসু, জওহর লাল নেহেরু ও আবুল কালাম আজাদের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল। তবে সার্বিক বিবেচনায় গান্ধী নেহেরুকেই কংগ্রেসের সভাপতি করেন। শেষপর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশনের গৃহীত অখণ্ড ভারত পরিকল্পনা (১৬ মে, ১৯৪৬) জিন্নাহ মেনে নিতে রাজি হলেও নেহেরুর বোম্বাইয়ের এক সংবাদ সম্মেলনের হঠকারী বক্তব্যে (১০ জুলাই, ১৯৪৬) জিন্নাহ ক্ষুব্ধ হন। ফলে তিনি আন্দোলনের নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে ১৬ আগস্ট কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বা Direct Action Day পালনের ঘোষণা দেন এবং লীগের সকল সদস্যদের ব্রিটিশ খেতাব-উপাধি বর্জনের নির্দেশ দেন।[১০০] এ দিন হরতালের ডাক দেয়াসহ প্রদেশ ও জেলা পর্যায়ে দলীয় সভা-সমাবেশের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত গড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু রহস্যময়ভাবে ১৬ আগস্ট থেকে পরবর্তী চারদিন কলকাতাসহ আশেপাশের এলাকায় এক ভ্রাতৃঘাতী ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সঙ্ঘটিত হয়।

অথচ ৪৬-এর ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য ও জেলবন্দি রসিদ আলীর দণ্ড মওকুফ ও মুক্তির দাবিতে সমগ্র কলকাতা গণআন্দোলনের মুখে যে-রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাতেও হিন্দু-মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত ও সমান অংশগ্রহণ ছিল। এ বছরের শুরু থেকে জুলাই পর্যন্ত সমগ্র ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের যে-ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রতিশ্রুতি দেখা যায়, তাতেও উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন আন্তরিকভাবে অংশ নেয়।[১০১] সরকারি হিসেব অনুযায়ী, একমাত্র ৪৬ সনেই মোট ১৬২৯টি ধর্মঘটে ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার শ্রমিক অংশ নেয়। যার ফলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ২৭

লক্ষ ১৮ হাজার কর্মদিবস।[১০২] ব্রিটিশ শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত এসব আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল বিশেষত হিন্দু-মুসলিম শ্রমিক, সেনা ও চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কিন্তু মাত্র তিন সপ্তাহ যেতে না যেতেই রহস্যজনকভাবে উভয় সম্প্রদায় সকল সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য জলাঞ্জলি দিয়ে বর্বর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

৪৬-এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ আহূত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'কে কেন্দ্র করে কলকাতায় সঙ্ঘটিত ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকাণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এদেশের হিন্দু-মুসলমানের ভেতরে যে-বিভাজনের বীজ বপন করেছিল, এ দাঙ্গা ছিল তার চূড়ান্ত বিষফল। ১৬ আগস্টের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম দিবসে' মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে ব্রিটিশ সরকার ও উগ্রবাদী কংগ্রেসীদের লক্ষ্যবস্তুরূপে নির্ধারণ করে। এতে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব যুক্ত হলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য এতে যুক্ত ছিল ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ মদদ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং উগ্রহিন্দু গুণ্ডাবাহিনীর অতি উৎসাহী মনোভাব। যার ফলে 'বন্দে মাতরম' ও 'আল্লাহু আকবর' বা 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান তুলে পরস্পর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কলকাতার মানিক তলায় সংঘটিত হয় এক বীভৎস–পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট। চার দিন ধরে (১৬-১৯ আগস্ট) চলা এ জঘন্য দাঙ্গায় কলকাতা ধ্বংস্তূপ ও শ্মশানের নগরীতে পরিণত হয়। সরকারি হিসেব মতে, কলকাতায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে তিন হাজার এবং আহত হয় সাড়ে চার হাজার। দেড়লক্ষ লোকের শহরত্যাগ ও নব্বই হাজার লোকের দুঃস্থ হবার ঘটনা ঘটে।[১০৩] কলকাতার এ দাঙ্গার জের ধরে বোম্বে (১ সেপ্টেম্বর), নোয়াখালী (১০ অক্টোবর), বিহার (২৫ অক্টোবর), গড় মুক্তেশ্বর (নভেম্বর) ও পাঞ্জাব (মার্চ, ৪৭) দাঙ্গার বিষে জর্জরিত হয়ে ওঠে। সারা দেশে আনুমানিক একলক্ষ আশি হাজার লোক প্রাণ হারায়। এ দাঙ্গায় মুসলমানরা অধিকতর সংখ্যায় নিহত হয় আর হিন্দু ও শিখদের বিনষ্ট হয় অধিক পরিমাণে ধনসম্পদ।[১০৪] এর পূর্বেও ভারতবর্ষে ১৯১০-১৯২২ এর মধ্যে ২২টি এবং ১৯২৩-১৯২৬ এর মধ্যে ৭২টি দাঙ্গা সংঘটিত হলেও ৪৬-এর দাঙ্গার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।[১০৫] দাঙ্গার এ সহিংস ও বীভৎস রূপ দেখে গান্ধী সবচেয়ে বেশি আঘাত পান। তিনি লীগের পাকিস্তান দাবিকে কেবল অযৌক্তিকই মনে করেননি বরং একে ব্লাসফেমি হিসেবে অভিহিত করেন।[১০৬] কিন্তু তারপরেও দাঙ্গার ফলে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ এ দাঙ্গা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ ও ঘৃণার প্রাচীর গড়ে তুলে। দাঙ্গার ভয়াবহতায় গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি (অখণ্ড ভারতের) থেকে সরে আসতে বাধ্য হন।

দেশভাগ

১৯৪৭ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এ কাজটি দ্রুত ও সুচারুভাবে করার জন্য রানি ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাঁদরেল সেনাপতি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে ওয়াভেলের স্থলে সর্বশেষ লর্ড ভাইসরয় করে পাঠানো হয়। তিনি ২২ মার্চ ১৯৪৭ সনে দিল্লি আসেন এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে জোরেশোরে আলোচনা শুরু করেন। মাউন্টব্যাটেনের রাজকীয় আকর্ষণের খ্যাতি ছিল বিশ্বময়। তাই নিজের মোহনীয় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তিনি যে-নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করবেন– এতে কারো সন্দেহ ছিল না। তবে নেহেরু যেভাবে মাউন্টব্যাটেনের কৃপা ও সৌহার্দ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, জিন্নাহ তা থেকে বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে নেহেরুর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী এডুইনার একধরনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক যে-ক্রিয়াশীল ছিল– তা লর্ড দম্পতির একমাত্র কন্যা পামেলা হিকস তাঁর রচিত *ডটার অব এ্যাম্পায়ার: লাইফ এ্যাজ আ মাউন্টব্যাটেন* গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।[১০৭] মাউন্টব্যাটেনের সদিচ্ছার কারণে গুণমুগ্ধ নেহেরু গান্ধীকে বাদ রেখেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত (৪৬-এর ১৬ মে) 'অখণ্ড ভারত' প্রশ্নে জিন্নাহ শেষপর্যন্ত মেনে নিতে প্রস্তুত থাকলেও নেহেরুর কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য দেশভাগকে তরান্বিত করে। প্রচলিত ইতিহাসে ভারত ভাগ বা বাংলা ভাগের জন্য মুসলিম লীগকে দায়ী করা হয়েছে। অথচ জয়া চ্যাটার্জী তাঁর *দেশভাগের অর্জন: বাঙলা ও ভারত (১৯৪৭-১৯৬৭)* বইয়ে এ ভাগ-বাটোয়ার জন্য যে-কংগ্রেসের নেতারা দায়ী ছিলেন, তা প্রমাণসহকারে উপস্থাপন করেছেন।[১০৮] দেশভাগের বিষয়গুলো লন্ডন ও দিল্লি সিদ্ধান্ত নেয়, এতে প্রাদেশিক চিন্তা ও স্বার্থ গুরুত্ব পায় না। তাই লন্ডনের নির্দেশ মোতাবেক বেঙ্গল বিধান সভাকে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হয় (৪৭-এর ২০ জুন, শুক্রবার)। এদিনই বাংলা প্রদেশকে ভাগ করা বা না করার

পক্ষে মতামত জানতে মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর আইন সভায় ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০৬–৩৫ ভোটে মুসলমানরা বাংলাকে অখণ্ড রাখার পক্ষে রায় দিলেও অমুসলিমরা ৫৮-২১ ভোটে বাংলা ভাগ করার পক্ষে রায় দেন।[১০৯] কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন হিন্দু কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়। তিনিই বাংলা বিভক্ত করার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।[১১০] অথচ গান্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারত বিভক্তির ঘোর-বিরোধী ছিলেন। আবার জিন্নাহ ও নেহেরু কেউ-ই প্রাদেশিক নেতা হতে রাজি ছিলেন না। দুজনেই সর্বভারতীয় নেতা হতে চেয়েছিলেন। তাই পরিস্থিতি ক্রমশই জটিলতর হয়ে ওঠে।

কারণ তারা ভেবেছিলেন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ন হবে। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাব দুটুকরো হয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটবে– এটা কেউ-ই কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন পরাজয়ের গ্লানি নিতে আসেননি। তিনি সবাইকে খুশি রেখেই ভারত ভাগ করার দিকে নজর দেন। তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক নেহেরু ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির শর্তে ভারত বিভক্তিতে রাজি হন এবং তা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পাস করিয়ে নেন।[১১১] মাউন্টব্যাটেনের এ পরিকল্পনাটিতে জিন্নাহ সমর্থন দেন এবং তা মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় উত্থাপন করেন। আবুল হাশিম একে– 'মাথাছাঁটা পাকিস্তান' বলে বিরোধিতা করেন। কিন্তু জিন্নাহ এক আবেগঘন ভাষণে সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন– 'আপনারা কি আমার জীবদ্দশায় পাকিস্তান চান?' প্রায় সবাই তা সমর্থন করায় তিনি জানান– 'তাহলে আপনাদের গ্রহণ করতে হবে এই মাথাছাঁটা কীটদষ্ট পাকিস্তানকে।'[১১২] এর ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে লীগ নেতা আবুল হাশিম ও কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর মধ্যে পূর্বে আলোচিত (৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে) বাংলা, বিহার ও আসাম প্রদেশের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার সমন্বয়ে একটি সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুনরায় সামনে চলে আসে। ফলে আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী-ফজলুল হক এবং শরৎ বসু-কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শেষ প্রচেষ্টা চালান। গান্ধীর কাছে শরৎ বসু ও জিন্নাহর কাছে সোহরাওয়ার্দীকে পাঠানো হয়। জিন্নাহ এতে মৌন সমর্থন দিলেও গান্ধীজী নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের দোহাই দিয়ে এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তথা চাতুর্যের মাধ্যমে এ প্রস্তাব এড়িয়ে যান।[১১৩] উপরন্তু সর্দার প্যাটেল অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে 'একটি ফাঁদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং কংগ্রেস সহযোদ্ধাদের সতর্ক করতে বলেন–'বাংলার অমুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বাংলাকে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে'।[১১৪] তিনি আরো বলেন, বাংলা অবিভক্ত থাকলে হিন্দুরা বেঁচে থাকতে পারবে না। আবার রাজেন্দ্র প্রসাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলেন, মুসলিম লীগ বাংলা বিভক্তি না মানলে কংগ্রেসও ভারত বিভক্তি মানবে না। ফলে লীগ ও কংগ্রেসের কিছু বাঙালিবিদ্বেষী নেতৃবৃন্দের কূটকৌশল এবং অসহযোগিতার কারণে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কারণ তারা অখণ্ড বাংলার বেদিমূলে তাদের সর্বভারতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

লন্ডনের কমন্স সভার ঘোষণা মোতাবেক (১৫ জুলাই, ৪৭) ভারতে 'ভারত ও পাকিস্তান' নামক দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য এক সীমানা নির্ধারণ কমিটি করা হয়। এর প্রধান করা হয় স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে। আর কংগ্রেস ও লীগের মনোনীত হাইকোর্টের ভারতীয় চারজন বিচারপতিকে করা হয় সদস্য। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ এদের মতামতের তোয়াক্কা করতেন না। আবার এ দেশ সম্পর্কে তার ন্যূনতম ধারণাও ছিল না। তিনি দিল্লিতে বসে মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ মোতাবেক একটি ম্যাপ নিয়ে এর ওপর সীমানা টানতেন।[১১৫] জিন্নাহসহ লীগ নেতারা সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ ও ব্যতিব্যস্ত থাকায় নতুন দেশের সীমানার বিষয়ে তারা তেমন গুরুত্ব দেননি। অথচ মাউন্টব্যাটেনের অনুগ্রহভাজন নেহেরু ঠিকই ইচ্ছেমতো জেলাগুলো কব্জায় নিয়ে নেন। কংগ্রেস দল ও নেহেরুর এ বাংলা বিভক্তি মেনে নেবার অন্য কারণও ছিল। কারণ তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল বাংলা ভাগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই বর্তমানে বাংলা ভাগ হলেও কয়েক বছর পর তা পুনরায় হিন্দুস্থানের মধ্যে একীভূত হয়ে যাবে বলে নেহেরু মন্তব্য করেন। তাছাড়া মাউন্টব্যাটেন একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহেরু এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেও জিন্নাহ তা নাকচ করে দিয়ে নিজেই এ পদ দখল করায় মাউন্টব্যাটেন অপমানিত বোধ করেন। এর ফলে জিন্নাহর নতুন পাকিস্তান অনেক ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়।[১১৬] তাই পাকিস্তানের অংশ হতে যাওয়া পাঞ্জাবের

ফিরোজপুর, জিরা শহরদ্বয়, গুরুদাসপুরের জেলা কেটে যেমন ভারতকে দেয়া হয়, তেমনি অযৌক্তিকভাবে কংগ্রেসের দাবির মুখে ও সর্দার প্যাটেলের শর্তারোপকৃত সাবেক রাজধানী কলকাতা এবং পানি নিষ্কাশন ও কৃষির জন্য হুগলি, গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর সুবিধা নিতেই মুর্শিদাবাদ (৫৬.৬% মুসলিম), নদীয়া (৬১% মুসলিম) ও মালদহের (৫৭% মুসলিম) মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জেলাগুলোও ভারতকে দেয়া হয়। এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাকিস্তানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেয়া হয়।[১১৭] অথচ বর্ধমান জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও সাধারণ সম্পাদক অতুল ঘোষ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা পাকিস্তানকে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ চা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হলেও জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ে গোর্খা ও নেপালি উগ্রপন্থী উপজাতিরা বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় এ পাঁচ জেলার পরিবর্তে তারা খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের মতো হিন্দু জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ঘাঁটি অধ্যুষিত মহকুমা নিতে চেয়েছিলেন।[১১৮] অথচ এসবের খবর কোনো মুসলিম লীগ নেতা রাখতেন না। আবার কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের মতো প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজ্যকে অমীমাংসিত রাখা হয়। এভাবে তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে র‍্যাডক্লিফ তড়িঘরি করে নানা অসামঞ্জস্য রেখে দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করে চলে যান। আবার সোহরাওয়ার্দী পূর্ববাংলার লীগ নেতা হতে খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে পরাজিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পশ্চিম বাংলার মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি নেতা বনে যান।[১১৯] বাংলা যখন ভাঙছিল তখনো কলকাতায় হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের হতাহতের ঘটনা ঘটছিল। গান্ধী ভগ্নহৃদয়ে নিরুপায় হয়ে কলকাতার দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকার বেলাঘাটার এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে আশ্রয় নিয়ে অনশন করেন। পাশে থাকেন সোহরাওয়ার্দী। এরূপ অবিবেচনা থেকেই ১৪ আগস্ট ১৯৪৭খ্রি./২৮ শ্রাবণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ সোমবার পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট মঙ্গলবার ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

তাই দেখা যায় স্বাধীনতার আনন্দে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মুসলমানরা পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে বিজয়োল্লাস করে। অথচ পরক্ষণেই ভারতভুক্ত হবার কথা জেনে তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। সরেজমিনে বা অকুস্থলে সীমানা নির্ধারণ না করায় কোনো গ্রাম ও বাড়ির মাঝখান দিয়ে তা চলে যাওয়াতে দেখা যায় গৃহস্থের শোয়ার ঘর পড়েছে পাকিস্তানে আর গোয়াল ঘর বা রান্না ঘর পড়েছে ভারতে। এভাবে দেশভাগের হাঙ্গামায় রাতারাতি অসংখ্য মানুষ নিজ দেশেই পরবাসীতে পরিণত হয়। প্রায় দেড়কোটি মানুষ জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[১২০] এভাবেই শুরু হয় স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ দেশত্যাগের প্রক্রিয়া।

উদ্বাস্তু সৃজন প্রক্রিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের উভয় সীমান্ত থেকে দেড়কোটি লোক দেশত্যাগ করে। ২৮ হাজার বর্গমাইলের পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। এখানে প্রায় ৫০ লক্ষ ছিল মুসলিম। আবার ৪৯ হাজার বর্গমাইলের পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৯০ লক্ষ। এর মধ্যে হিন্দু ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ। দেশভাগের ফলে ১৫ লক্ষ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্বপাকিস্তানে চলে আসে। আবার পাঞ্জাব থেকে হিন্দু-শিখদের ভারতে ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে আরেক দফা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুটপাট, ধ্বংসলীলা ও রক্তের হলিখেলা সংঘটিত হয়। দেশভাগের প্রথম চার বছরেই পূর্বপাকিস্তানে আটকে পড়া হিন্দুদের মধ্য থেকে ২১ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে গমন করে।[১২১] দেশভাগের ফলে ভারত ৩ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা ও ৭৫ মিলিয়ন লোক থেকে বঞ্চিত হয়। আর বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রায় অর্ধাংশ ছেড়ে দিয়ে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব নিয়ে গড়ে ওঠে জিন্নাহর– 'মাথাছাঁটা, সীমান্তছাঁটা ও কীটদষ্ট পাকিস্তান'।[১২২] এমন দেশভাগকে নেহেরু ও জিন্নাহর না মেনে উপায় ছিল না। উপরন্তু জিন্নাহ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে এবং নেহেরুও জেল-জুলুম খেটে ততদিনে ক্লান্ত-অবসিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই বর্ষীয়ান এ দুই নেতাই ক্ষমতার মসনদে বসতে চাচ্ছিলেন। ফলে মাউন্টব্যাটেন, র‍্যাডক্লিফ, নেহেরু ও জিন্নাহ– দেশভাগের এ চার কুশীলব তিন জাতির (ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলিম) স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। অথচ ভারতবর্ষে তখনো ছিল সতেরোটি জাতি। কিন্তু এ নেতারা ধর্ম নামক সামাজিক আঠাকে রাজনীতির হাতিয়ার করে এ দেশভাগকে হিন্দু-মুসলিম ভাগ-বাটোয়ার রঙ লেপনে সক্ষম হন। তাই তারা 'শ্রেণি' বিষয়টি এড়িয়ে 'জাতি' বিষয়কে বড় করে তোলেন। গরিব হিন্দু ও গরিব মুসলমানকে তাদের 'সামাজিক অবস্থান বা শ্রেণি-চরিত্র' ভুলিয়ে দেয়া হয়। যাতে করে তারা বিত্তবানদের বিরুদ্ধে সচেতন হতে না পারে এবং আন্দোলন করতে না পারে। কারণ লীগ ও কংগ্রেস বরাবরই ছিল ব্যবসায়ী-বিত্তবান-জমিদারদের সংগঠন। ইংরেজরাও এ দুই বিত্তবান শ্রেণিকে সন্তুষ্ট রেখে ভারত ভাগ করে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। তাই মাউন্টব্যাটেনের এ বাংলা ভাগের নীতিকে উভয়

দলই স্বাগত জানায়। কারণ পশ্চিম বাংলার প্রয়োজন ছিল বিড়লা-ডালমিয়াদের। আর পূর্ব বাংলার প্রয়োজন ছিল আদমজী-ইস্পাহানীদের।[১২৩] কাজেই রাশিয়া ও চীনে সমাজবিপ্লব বা রূপান্তর সম্ভব হলেও ভারত ও পাকিস্তানে তা সম্ভব হয়নি। বরং জন্মলগ্ন থেকেই দুটি দেশেই সীমাহীন বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা জেঁকে বসে। লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাওয়া হয়েছিল, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে নয়। তবুও ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করা হয়। আর এ প্রক্রিয়াতে স্বাধীনতার প্রত্যাশী, সংগ্রামমুখর, রাজনীতিসচেতন ও প্রতিবাদী বাঙালিকে সবচেয়ে চড়া মূল্য দিতে হয়। ব্রিটিশদের বিরাগভাজন হয়ে স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি কার্যকর হওয়ায় এর বিষ থেকে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আজো মুক্ত হতে পারেনি। তারপরেও 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বিদেশি-বিভাষী ব্রিটিশদের ১৯০ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) শাসন-শোষণ পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশবাসী মুক্তি পায়।

পাকিস্তান আমল

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম লীগ প্রধান জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট জিন্নাহ লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আব্দুর রশিদের নিকট থেকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। একই দিনে তিনি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার শপথবাক্য পাঠ করান।[১২৪] জিন্নাহকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জাতির পিতা ও কায়েদ-ই আজম (মহান নেতা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু জিন্নাহর গভর্নর জেনারেল পদগ্রহণ করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াতে বহু রাজনীতিবিদই বিস্মিত হন। এরূপ মনোভাবই পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ভাষ্যমতে– 'জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হোক, এটা আমরা যুবকরা মোটেও চাই নাই। তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হবেন, পরে প্রেসিডেন্ট হবেন– এটাই আমরা আশা করেছিলাম। লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের বড়লাট থাকলে এতখানি অন্যায় করতে পারতেন কিনা সন্দেহ ছিল'।[১২৫] জিন্নাহর এ ক্ষমতালিপ্সা ও গোঁয়ার্তুমির কারণে পাকিস্তানকে জন্মলগ্নেই বহু ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পশ্চিম পাকিস্তান' নামক দুটি বিচ্ছিন্ন (ভারত দ্বারা ১২০০ মাইলের ব্যবধান) ভূখণ্ড নিয়ে 'পাকিস্তান' নামক এ অদ্ভুত রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) এবং পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রদেশ (পূর্ববাংলা) নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। সঙ্গতকারণেই এ পাঁচটি (বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ ও পাঠান) জাতির শাসন ব্যবস্থায় সমান অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করার কথা থাকলেও ঐতিহাসিক কারণেই পাঞ্জাবিরা আধিপত্য বিস্তার করে। আর দিনে দিনে বাঙালি জাতি সাক্ষী গোপাল ও দাসে পরিণত হয়। যদিও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ৫৫১২৬ বর্গমাইলের পূর্বপাকিস্তান (৫ কোটি ১০ লক্ষ/শতকরা ৪৩.৭ ভাগ) ৩১০৪০৩ বর্গমাইলের পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কেবল ধর্মীয় মিল ছাড়া ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দুই পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর তেমন সাদৃশ্য ছিল না। লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জোর দেয়া হলেও ধর্মীয় রাষ্ট্রের কথা বলা হয়নি। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার শুরু থেকেই পাকিস্তানকে 'ইসলামি রাষ্ট্রে' রূপদানে ব্যতিব্যস্ত হয়। ভারতভাগের সময় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে দুই হাজার আই.সি.এস অফিসার, দশহাজার সামরিক অফিসার, ষাট হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ও দুই লক্ষ দেশীয় সৈন্য ছিল।[১২৬] কিন্তু মুসলিম লীগ নেতাদের অদূরদর্শিতার কারণে এসবের ন্যায্য হিস্যা পাকিস্তান পায়নি। পাকিস্তানকে শুরুতেই পর্যাপ্ত অবকাঠামোর সংকটে পড়তে হয়। এসব কারণে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ (যখন এমনিতেই মুসলমান কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল নগণ্য) পাকিস্তানে আসতে অনাগ্রহী ছিলেন। যার ফলে পাকিস্তানকে প্রারম্ভকালে উচ্চপদগুলো হয় শূন্য রাখতে হয়েছে, নয়তো অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করতে হয়েছে।[১২৭] আবার পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে কলকাতা ও দিল্লির মতো কলকারখানা, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ব্যবসায়কেন্দ্র পায়নি। উপরন্তু বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের কারণে দুই প্রদেশের বিত্তবান ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা ভারতে চলে যাওয়াতে পাকিস্তানের অর্থসম্পদ ও দক্ষ মানবসম্পদের বিরাট ক্ষতি হয়।

অন্যদিকে কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালে (৪৭-এর অক্টোবরে) ভারত তার পূর্বপ্রতিশ্রুত এক হাজার কোটি টাকার সম্পদ,সামরিক ও বেসামরিক সরঞ্জামাদি পাকিস্তানকে প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। উপরন্তু বাহাত্তর লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষকে সামাল দিতে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। আবার প্রথম দশ বছরের মধ্যে করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদের মতো তিনটি রাজধানী শহর গড়ে তুলতে গিয়েও বহু অর্থের অপচয় ঘটে। ৫০ সনে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটলে পূর্ব বাংলার রাজনীতি চলে যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের হাতে। কিন্তু তখনো পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় রাজনীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় জমিদার, ব্যবসায়ী ও আমলাদের দ্বারা। পশ্চিম পাকিস্তান উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু ব্রিটিশ সরকারের আমলা ও অভিজাত শ্রেণি পেলেও পূর্বপাকিস্তানের এসব পদ পূরণ করতে হয় ভারত থেকে আগত মোহাজের, বিহারি ও দেশীয় বাঙালি হিন্দুদের দ্বারা। আর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে শুরু থেকেই পাঞ্জাবি, পাঠান ও বেলুচদের একচেটিয়াভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় পূর্বপাকিস্তান সব দিক থেকেই পিছিয়ে পড়ে। সোহরাওয়ার্দীও শেষপর্যন্ত কলকাতা ত্যাগ করে করাচিবাসী হন। ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান গণপরিষদের আসন দেয়া হতো পূর্ববাংলার কোটা থেকে। এভাবে গণপরিষদেও পূর্ববাংলা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।[১২৮] মাত্র দশ বছরে সাতটি মন্ত্রিসভার নাটকীয় রদবদল ঘটে। মূল রাজধানী করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে শিল্পকারখানা, অফিস-আদালত, বন্দর, সামরিক সদরদপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা এসব থেকে বঞ্চিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানিদের কব্জায় চলে যাওয়াতে পূর্ববাংলা পুনরায় স্বজাতির হাতে এক নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে এমন ঘনঘন পট পরিবর্তন দেখে এবং পূর্ববাংলাকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে রাখার কারণে বাঙালি জাতি সহজেই বুঝতে পারে যে, তারা এক সাদা চামড়ার (ব্রিটিশদের) হাত বদলে আরেক বাদামি চামড়ার (পাকিস্তানিদের) শোষণের জালে বন্দি হয়ে পড়েছে। বাঙালিকে ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ঘোষণা করেন– ‘ভারতে যেমন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানে তেমনি উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত’।[১২৯] এমন প্রস্তাবে সারা বাংলায় ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়। মুঘল আমলের রাজভাষা ফারসি ব্রিটিশ আমলে এসে গুরুত্ব হারিয়ে ফেললে (ইংরেজিকে রাজভাষা করায়) ভারতবর্ষে উর্দু ভাষার উদ্ভব ঘটে। হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষার মাধ্যমে যে-উর্দু ভাষা গড়ে ওঠে, তার ব্যাকরণ পদ্ধতি নেয়া হয় হিন্দি থেকে, শব্দ নেয়া হয় আরবি-ফারসি থেকে আর লেখা হতো ফারসি বর্ণমালায়। এ উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল মূলত বিহারে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলে মুসলিম লীগও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পায়তারা করে।[১৩০] পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৭% এবং পূর্বপাকিস্তানে ৮০% মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও উর্দুতে কথা বলতো মাত্র ৩.৪৮% মানুষ। আর বাংলায় কথা বলতো ৫৬.৪০% মানুষ।[১৩১] তাই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যুক্তিসহকারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার জোর প্রস্তাব করেন। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তমুদ্দন মজলিশ (৪৭-এর ২ সেপ্টেম্বর) ও ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ (৪৮-এর ২ মার্চ) গড়ে ওঠে এবং আন্দোলন জোরদার হয়।

৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সাংসদ বাঙালি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বক্তব্যে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্র ভাষার দাবি জানালে তাকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর কোপানলে পড়তে হয়। উপরন্তু হিন্দু হওয়াতে দত্তবাবুকে ‘ভারতের দালাল’ অপবাদ শুনতে হয় এবং এতে ‘ভারতের ষড়যন্ত্র’ আবিষ্কার করা হয়। উপরন্তু পূর্ববাংলায় এসে জিন্নাহর (৪৮-র ২৪ মার্চ) এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের (৫২-র জানুয়ারি) উর্দুর পক্ষেই রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দিলে ভাষা আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এছাড়া বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে বাংলাকে আরবি কিংবা রোমান অক্ষরে রূপান্তরের নীলনকশা করায় পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। যার ফলে ৫২-র ৪ ফেব্রুয়ারি ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করা হয়। আন্দোলনের ভয়ে শঙ্কিত সরকার ৫২-র ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। প্রতিবাদী ছাত্রনেতারা তা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউরসহ পাঁচ জন নিহত এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশের অধিক।[১৩২] দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২খ্রি./৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ/২৪ জামাদিউল আউয়াল

১৩৭১ হিজরি। এর ফলে বাঙালি জনমনে পাকিস্তানবিদ্বেষী মনোভাব তীব্ররূপ ধারণ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের–'ভারত থেকে পায়জামা পরে হিন্দুরা এসে এই আন্দোলন করেছে। কমিউনিস্টরা সাপ, তারা গর্তে থাকে, রাত্রিবেলা বের হয়'– এমন কদর্যপূর্ণ বক্তব্য কাটা ঘায়ে লবণ ছিটানোর মতো এ অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে দেয়।[১৩৩] ৫২-র এ ঘটনা বাঙালিকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি', 'স্মৃতিস্তম্ভ'-এর মতো কবিতা ও 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'-র মতো রক্তে দোলা লাগার মতো গান।[১৩৪] এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ আরো সুদৃঢ় হয়। যার অনিবার্য প্রভাব পড়ে ৫৪-র নির্বাচনে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালির স্বপ্নমোহ ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি। এ কোণঠাসা বাঙালির ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান ও সমমনা নেতারা মিলে বিকল্প দল হিসেবে প্রথমে 'পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' (৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮) ও 'পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' (২৩ জুন, ১৯৪৯) গঠন করেন।[১৩৫] কারণ চল্লিশ-দশকের শুরুতেই মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল নামক দুটি ধারা সুস্পষ্ট ছিল। প্রগতিশীল ধারায় ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও আধুনিক শিক্ষায় বিকশিত মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণি। পক্ষান্তরে রক্ষণশীল ধারায় ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ, ইস্পাহানী ও খাজা নাজিমুদ্দিনদের মতো নবাব-নাইট-জমিদার-পুঁজিপতি শ্রেণি। তাই পূর্ব বাংলার বৃহৎ মধ্যবিত্ত- গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ও প্রত্যাশিত স্বপ্নপূরণে পরবর্তীকালে এ দুটি সংগঠনকেই অসাম্প্রদায়িক রূপ দিতে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়। তবে এ নিয়েও দ্বন্দ্ব-দলাদলি ও বিভাজনের সূত্রপাত ঘটে। সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর মতো প্রভাবশালী রাজনীতিবিদরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিলেও শেখ মুজিবের প্রভাব ও আলাদা অবস্থান এসময় থেকেই স্পষ্টতর হয়। ৫৪-র অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বাংলায় এক মেরুকরণ তৈরি হয়। পূর্বের কোয়ালিশন সরকারের কুরুচিপূর্ণ দলাদলি দেখে শেখ মুজিব ও ভাসানী জোটগঠনে অনাগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাসানীর আগ্রহে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রব্বানীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট (৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩) গঠন করা হয়। এ যুক্তফ্রন্টের সভাপতি মনোনীত হন সোহরাওয়ার্দী। আর লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত একুশ দফা কর্মসূচিকে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।[১৩৬] এ সময় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল– 'লীগের (মুসলিম লীগের) পোলা বিলাত যায়। মোগের পোলা মইষ খেদায়।' আঞ্চলিক বৈষম্য উন্মোচনে এ শ্লোগানের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। আর সরকারি দল মুসলিম লীগ– 'ইসলাম রক্ষা' কিংবা 'পাকিস্তান রক্ষা'–র প্রপাগান্ডা তুলে নির্বাচনে নামে এবং ফুরফুরা পির, শর্ষীনার পির ও মাওলানা শামসুল হকরা সাধারণ বাঙালিকে ধোঁকা দিতে ফতোয়া দেন। তাঁরা বলেন– 'যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিলে কোরান ও সুন্নাহর বরখেলাপ হবে' এবং কোথাও কোথাও বলা হয়– 'বিবি তালাক হয়ে যাবে।'[১৩৭] এছাড়া 'কাফের', 'ইসলামের শত্রু', 'পাকিস্তানের শত্রু', ও 'ভারতের দালাল' বলেও প্রচার করা হয়।

তারপরেও নির্বাচনে (৫৪-র ৮-১২ মার্চ) মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে এবং যুক্তফ্রন্ট আশাতীত সাফল্য লাভ করে। নৌকা প্রতীক নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ মুসলিম আসনের মধ্যে ১২৮ টিতেই জয়ী হয়। মাত্র ৯টি আসনে সরকারি দল মুসলিম লীগ জিততে পারে।[১৩৮] সাত বছরেও সংবিধান প্রণয়ন করতে না পারা, দলীয় কোন্দল, রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা ও বাংলা ভাষা নিয়ে গোঁয়ার্তুমির কারণেই মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। এ বিপর্যয় ও দৈন্যদশা ব্যাখ্যা করতে আবুল হাশিম বলেন, 'মুসলিম লীগ তিন বিষয়ে তিন জায়গায় বন্ধক থেকে যাওয়ায় স্থবির ও অচল হয়ে পড়ে। যেমন– নেতৃত্বে আহসান মঞ্জিলে, প্রচারে দৈনিক আজাদে এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্পাহানীদের কাছে।'[১৩৯] শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা (৫৪-র ৩ এপ্রিল) গঠন করলেও মন্ত্রিত্বের বিলিবণ্টন নিয়ে কয়েকদিন যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে। শেখ মুজিব ফজলুল হকের বিরাগভাজন হওয়াতে তাকে প্রথমে বাদ রাখায় এমন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। আবার কলকাতা সফরে গিয়ে ফজলুল হকের দুই বাংলা ও বাঙালির আত্মিক বন্ধনের বিষয়ে আবেগ ঘন বক্তৃতা দান (৩০ এপ্রিল), বক্তব্যটি মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের বিকৃত করে নিউইয়র্ক পত্রিকায় প্রকাশের জের ধরে তাঁকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া সরকারি মদদে নারায়ণগঞ্জের আদমজি জুটমিলের দাঙ্গায় (১৫ মে) দেড়হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হলে

প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন এবং গভর্নরের শাসন চালু করেন।[১৪০] জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ববাংলার গভর্নর নিযুক্ত (১৭ মে) করা হয়। এসময় শেখ মুজিবসহ বহু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে বন্দি করা হয়। আবার শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী দ্বন্দ্বের কারণে যুক্তফ্রন্টও ভেঙে যায়। এরপর শুরু হয় সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা ও আতাউর রহমান খানের ক্ষমতায় যাবার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের সময় (৫৬ সনে) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হলেও পূর্ব বাংলার নাম 'পূর্বপাকিস্তান' রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর সামরিক বাহিনীর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেসিডেন্ট (৫৬ সনে) করা হয়। এসময় মাওলানা ভাসানীর পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ, সংখ্যাসাম্যনীতি কার্যকর না হলে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলার ঘোষণা, কাগমারীতে আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলনের (৫৭-র ৯ ফেব্রুয়ারি) আয়োজন এবং মতবিরোধের কারণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ (৫৭-র ২৫ জুলাই) গঠনের বিষয়গুলো পূর্ব বাংলার রাজনীতিকে বেশ প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক ময়দানের অব্যাহত পালাবদল, অস্থিরতা ও সহিংসতার কারণে (৫৮-র ১০ সেপ্টেম্বর) পূর্ব বাংলার গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী সদস্যদের হাতে পীড়নের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১৪১] এর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খান নূনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন (৫৮-র ৭ অক্টোবর) জারি করেন। আর প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে জেনারেল আইয়ুব খানকে (৫৮-র ৮ অক্টোবর) নিয়োগ দেন এবং ৫৬ সনের সংবিধান বাতিল করেন। কিন্তু মাত্র বিশ দিনের মাথায় এক রক্তপাতবিহীন সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খান মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে লন্ডনে নির্বাসিত করেন। সেই সঙ্গে নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে সেনা-রাজত্বের 'জঙ্গল শাসন' শুরু করেন।[১৪২] এভাবে পাকিস্তানে নামে মাত্র চলমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং শুরু হয় এক দশকব্যাপী সামরিক শাসন।

এসময় দেশের বিরোধীদলগুলো বিভিন্ন কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনেও ব্যর্থ হয়। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকারের শাসনামলে কমিউনিস্ট পার্টির[১৪৩] অবস্থানও ছিলো নানা বিভ্রান্তিতে বিপর্যস্ত। বিরোধী দলগুলোর দ্বন্দ্ব-বিভাজন, দুর্বল অবস্থান, স্বার্থের হিসেব-নিকেশ, দলের ভাঙাগড়া ও রাজনীতিবিদদের আত্মবিক্রিত মানসিকতার কারণে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বাঙালিদের ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর ক্ষমতার কেন্দ্র অবাঙালিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকেও বাঙালিকে বঞ্চিত করা হয়। তাই দেখা যায় পাকিস্তান শাসনামলের তেইশ বছরে (১৯৪৭-৭০) মাত্র একবার খাজা নাজিমুদ্দিনকে গভর্নর জেনারেল এবং সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও মোহাম্মদ আলীকে (বগুড়া) প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল। কিন্তু এদের ক্ষমতাকাল যেমন ছিল স্বল্প সময়ের, তেমনি কেন্দ্রের কূটকৌশলে এদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়। আবার একমাত্র সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকি দুজনের কেউ-ই বাঙালির স্বার্থবিষয়ে আন্তরিক ছিলেন না। নাজিমুদ্দিন ছিলেন আবার উর্দুভাষী।[১৪৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আমলতান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এদেশের রাজনীতিকে ক্রমশই জটিল ও কলুষিত করে তোলে। জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীর সময় থেকেই আমলাদের দাপট বাড়ে। কারণ এ দুজন রাজনীতিক হিসেবে প্রভাবশালী হলেও তাদের প্রশাসনিক কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না। তাই এদের অতিমাত্রায় নির্ভর করতে হতো সাবেক ব্রিটিশ আই.সি.এস. আমলাদের ওপর। জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর এ প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। আবার আমলা গোলাম মোহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল করার পর এটি আরো একধাপ এগিয়ে যায়।[১৪৫] যার দরুন গোষ্ঠী রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর সেনাবাহিনীও ক্ষমতার হিস্যা বুঝে নেয়। এতে মুসলিম লীগের ভাঙন দেখা দেয় এবং প্রভাবও কমে আসে। যার প্রথম প্রকাশ ঘটে টাঙ্গাইলের এক উপনির্বাচনে (৪৯-এর জুনে)। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নবীন প্রার্থী শামসুল হকের কাছে। মুসিলম লীগের প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নী বিপুল ভোটে পরাজিত হন। ফলে সরকারি দল মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদদের মনে নির্বাচন নিয়ে ভয় ঢুকে যায়। এ কারণেই তারা পূর্ববাংলার চৌত্রিশটি আসনের উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করেনি। এ ভয় থেকেই তারা ৫১ সনে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনের কথা থাকলেও তা ছলে-বলে-কৌশলে ৫৪ সন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখে।[১৪৬] আসলে মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন ভারতফেরত মোহাজের। নির্বাচনে জয়ী হবার মতো এদের শক্ত ভিত্তি যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না নির্বাচন করার মানসিকতাও। এসব কারণেই ৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। আর রাজনীতিবিদদের স্বার্থচিন্তা, দূরদর্শিতার অভাব ও রাজনীতির মাঠে ব্যর্থ হবার কারণেই ক্ষমতার মসনদে আইয়ুব খানের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সামরিক দুঃশাসন

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই ৫৬ সনের সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করেন। আর নিজের স্বচ্ছ ইমেজ গড়তে অপরাপর সামরিক শাসকদের কায়দায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হেয়প্রতিপন্ন করতে EBDO (Elective Bodies Disqualification Order) ও PODO (Public Officer Disqualification Order) নামক দুটি আদেশ জারি করেন। এ আইনের মারপ্যাঁচে তিনি সাতাশি জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অযোগ্য ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে বিয়াল্লিশ জনই ছিলেন পূর্বপাকিস্তানের। যাদের মধ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অন্যতম। অন্যদিকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, প্রাদেশিক সার্ভিস, ফরেন সার্ভিস ও পুলিশের মোট ১৬৯৩ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়।[১৪৭] এসব জনসাধারণের মাঝে দারুণ চাঞ্চল্য ও উৎসাহের জন্ম দেয়। একে পুঁজি করেই তিনি ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে নিজেই নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করেন (৫৯-এর ২৫ অক্টোবর) এবং একই দিনে মৌলিক গণতন্ত্র বা Basic Democracy প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। এভাবে তিনি দুই পাকিস্তানের জন্য ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার বিডি মেম্বার তৈরি করেন। যারা 'আয়ুব খানের ফেরেশতা' নামে পরিচিতি পায়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করেছিলেন, তেমনি আইয়ুব খানও এ বিডি মেম্বারদের মতো জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে অনুরূপ দালালগোষ্ঠী তৈরি করেন। এদের ওপর ভর করেই আইয়ুব খান এক প্রহসনের গণভোটের (৬০-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি) মাধ্যমে নিজেকে প্রেসিডেন্ট করেন।[১৪৮] আর মুসলিম লীগকে ভেঙে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' (৬২-এর ৪ সেপ্টেম্বর) অংশকে নিজের মতো গড়েন। আবার BNR (Bureau of National Reconstruction) এর মাধ্যমে তিনি জিন্নাহর মতো রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রচলিত কবিতার শব্দ রদবদল করেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে যথারীতি প্রতিবাদ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রবিদ্বেষী আইয়ুব খানকে সমুচিত জবাব দিতে বহু বাধার মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এখান থেকেই গঠিত হয় 'ছায়ানট' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন।[১৪৯] এসময় শরিফ কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করলে এর প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে (৬২-র ১৭ সেপ্টেম্বর) বাবুল ও মোস্তফা নিহত এবং ওয়াজিউল্লাহ আহত হয়।

মোনায়েম খান পূর্ববাংলার গভর্নর নিযুক্ত (৬২-এর ২৮ অক্টোবর) হয়েই অনুগত ড. ওসমান গণিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেন। এ দুজনের পৃষ্ঠপোষকতায় NSF (National Students Fedaration) গড়ে তোলা হয়। ছাত্রদের এ পেশাদার গুণ্ডাবাহিনী এক দশক জুড়ে আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।[১৫০] আইয়ুববিরোধী মনোভাব যখন দেশবাসীকে উজ্জীবিত করছিল, তখনই কাশ্মীরের হরতাল পালনকে কেন্দ্র করে সরকারের উস্কানিতে প্রথমে শুরু হওয়া হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাংলা-বিহারি দাঙ্গায় রূপ নেয়। ঢাকা ও আদমজীতে (৬৪-এর জানুয়ারি) তা বীভৎস আকার ধারণ করে। ঢাকার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন কবি আমির হোসেন চৌধুরী (১৫ জানুয়ারি) ও নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক (১৬ জানুয়ারি)। এ দাঙ্গা মোকাবিলা করতে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' আন্দোলনের ভিত্তি।[১৫১] যার দরুন এ দাঙ্গা পূর্ববাংলায় তেমন ভয়াবহ ও বিধ্বংসী রূপ নিতে পারেনি। ৬৫-এর ২ জানুয়ারি পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিমলীগ থেকে 'ফুল' প্রতীকে এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের 'হারিকেন' প্রতীকে মিস ফাতেমা জিন্নাহ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও ফতোয়া, টাকা ও কাদা ছোঁড়াছুড়ি হয়। আলেম সমাজ আইয়ুবের পক্ষে ফতোয়া দিয়ে বলেন– 'ইসলাম নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সমর্থন করে না।'[১৫২] আবার জামায়াতের আমির মওলানা মওদুদী কারাগার থেকে মন্তব্য করেন– 'পুরুষ হওয়া ছাড়া আইয়ুব খানের আর কোনো গুণ নেই। অন্যদিকে মহিলা হওয়া ছাড়া ফাতেমা জিন্নাহর আর কোনো দোষ নেই।'[১৫৩] নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে ভাসানী ন্যাপের বহু নেতা আইয়ুবের পক্ষে কাজ করেন। নির্বাচনে ৭৮ হাজার ৮৯০ জন বিডি মেম্বাররা ভোট দেন। আইয়ুব খান পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে যথাক্রমে ৭৩.৫৬% ও ৫৩.১২% ভোট পান। আর ফাতেমা জিন্নাহ পান যথাক্রমে ২৬.০৭% ও ৪৬.৬০% ভোট।[১৫৪] এ নির্বাচনে আইয়ুব খান ক্ষমতার দাপট, কারচুপি ও টাকার বিনিময়ে বিজয়ী হন। যে বিডি মেম্বার তাকে ভোট দেননি, তাদের বহুদিন

পালিয়ে বেড়াতে হয়। আর যারা টাকার বিনিময়ে ভোট দিয়েছিলেন, তারা ব্যাংকে নোট ভাঙাতে গিয়ে দেখেন সব 'জাল নোট'।[১৫৫] এর ফলে নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর বাঙালি আস্থা হারিয়ে ফেলে। আইয়ুবের ৮০ হাজার ফেরেশতার (বিডি মেম্বার) পরিবর্তে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচন হলে ফাতেমা জিন্নাহ অনায়াসেই বিজয়ী হতে পারতেন।

এ নির্বাচনে জয়লাভ করেও আইয়ুব খানের মনে শান্তি ও স্বস্তি ছিল না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামে। তাই বাঙালি জনমতকে নিজের অনুকূলে নিতে এবং নিজেকে আরো জনপ্রিয় করতেই কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে তিনি পাক-ভারত যুদ্ধে (৬৫-এর ৬-২২ সেপ্টেম্বর) জড়ান। ১৭ দিনের এ যুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থা নাজুক হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনির যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগে তিনি অপমানজনক তাসখন্দ চুক্তি করতে বাধ্য হন। অথচ এ যুদ্ধের পেছনে আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর দুরভিসন্ধি ছিল। কারণ তিনি আইয়ুব ও সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[১৫৬] কিন্তু এ পরাজয়ের গ্লানিতে আইয়ুব প্রথমে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের শায়েস্তা করতে Enemy Property Act নামক কালা কানুন তৈরি করে হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দেন। আর বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার ফলে পূর্ববাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর পক্ষে-বিপক্ষে দেশের বুদ্ধিজীবীগণও বিভক্ত হয়ে পড়েন।[১৫৭] তবে এ ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালিকে জাগিয়ে দেয়। কারণ যুদ্ধকালীন সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে যায়। ভারতের পক্ষে এ পূর্ববাংলা দখল শুধু সদিচ্ছার ব্যাপার ছিল মাত্র। এরকম পরিস্থিতিতেই শেখ মুজিব লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে (৬৬-এর ৫-৬ ফেব্রুয়ারি) আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিখ্যাত 'ছয় দফা' প্রস্তাব উত্থাপন করে রাজনীতির মাঠ গরম করে তোলেন। এ ছয় দফা প্রস্তাবটি মুসাবিদা করে দেন বাঙালি সি.এস.পি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস।[১৫৮] তবে এ ছয় দফা প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট ছিল আরো গভীরে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আখলাকুর রহমান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রমুখ পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০) ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬০-৬৫) পর্যালোচনা করে দুই অঞ্চলের জন্য বরাদ্দের বিশাল বৈষম্য, ফাঁকি ও বঞ্চনার সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।[১৫৯] তাদের মতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে) ছিল পর্বতসমান।[১৬০] এ বৈষম্যকে আরো প্রকট করে তুলে সরকারি মুসলিম লীগ ঘেঁষা হারুন, আদমজী, ইস্পাহানী, দাউদ, ইসমাইলি, চিনিওটি, সায়গল, বোহ্‌রা, মেমন ও বাওয়ানীদের মতো বাইশ পরিবারের একচেটিয়া ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ। এদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন বাঙালি এ. কে. খান। এমন সীমাহীন সুবিধা পেয়েই ষাটের দশকে এসে অতিবিত্তবান পরিবারের সংখ্যা বাইশ থেকে তেতাল্লিশে গিয়ে পৌঁছায়। এদের মধ্যে গান্ধারা শিল্পের মালিক ছিলেন আইয়ুব খানের ছেলের শ্বশুর জেনারেল হাবিবুল্লাহ খান খট্টক।[১৬১] বাংলার উৎপাদিত পাট, চা ও চামড়ার বৈদেশিক অর্থ ও সরকারি বরাদ্দ দিয়ে কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, সামরিক, অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ব্যবস্থাপনাসহ জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়া হয়েছে, কীভাবে সম্পদ পাচার করা হয়েছে, কীভাবে বাংলাকে বাজারে পরিণত করা হয়েছে– এমন বৈষম্য তারা তুলে ধরেন।

তাদের এ গবেষণা থেকেই বেরিয়ে আসে পাকিস্তানি সরকারের অনুসৃত 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' বা 'Two Economy Theory।' এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে শেখ মুজিব যে-ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, তা খুব দ্রুত বাঙালির কাছে 'বাঁচার দাবি ও মুক্তির সনদ' হয়ে ওঠে।[১৬২] আর আইয়ুব খানের চোখে তা– 'পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতার ষড়যন্ত্র' নামে প্রতিভাত হয়। অথচ পূর্বপাকিস্তানের প্রতি পর্বতসমান বৈষম্য-বঞ্চনা ও বেদনা থেকেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এর মূলে অবদান ছিল শেখ মুজিবের। কিন্তু এ ছয় দফাকে চীনপন্থীরা 'সি.আই.এ-র দলিল' বলে প্রচার করে। আবার লীগের ভেতরেই একটি অংশ একে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদে (৬৬-এর ২১ ফেব্রুয়ারি) এটি পাস করাতে শেখ মুজিবকে বেশ বেগ পেতে হয়। অথচ এ ছয় দফা মাত্র পাঁচ বছরে (১৯৬৬-৭১) বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দেয়। তবে ষাটের দশকে বামদলের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর (ছায়ানট, সংস্কৃতি সংসদ, সৃজনী লেখক গোষ্ঠী, উদীচী ও ক্রান্তি) কার্যক্রম ও তৎপরতা এ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো শানিত

করে তুলে।[১৬৩] মুজিবের এ জনপ্রিয়তা এবং বাঙালির জাগরণকে নস্যাৎ করতে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (৬৮-এর জানুয়ারি) দায়ের করেন। শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করে সহযোগী হিসেবে আরো পয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দায়ে দেশোদ্রহী মামলা দায়ের করা হয়। এর মূলে ছিল শেখ মুজিবকে দেশের মানুষের কাছে বিতর্কিত করা এবং সম্ভব হলে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আন্দোলনকে দমন করা। তবে এ মামলা করানো নিয়েও ষড়যন্ত্র ছিল। যতদূর জানা যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত আইয়ুব খানকে ক্ষমতালিপ্সু সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান এ মামলাটি করতে প্ররোচিত করেন। কারণ ইয়াহিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে, এ মামলা পূর্বপাকিস্তানে গণবিস্ফোরণ ঘটাবে, আইয়ুব সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন করবে, বাংলা স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেলে রাজনৈতিক অস্থিরতায় আইয়ুবকে হটিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ সহজ হবে।[১৬৪] এ উদ্দেশ্য সাধনে ইয়াহিয়া খান সফলও হন। ইয়াহিয়ার কপট পরামর্শেই আইয়ুব খান এমন স্পর্শকাতর মামলাটিতে বিদেশি আইনজীবী ও সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিত থাকতে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারেন। কারণ যে-অমানুষিক নির্যাতনের কথা আসামিগণ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বর্ণনা করতেন এবং তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়াতে আইয়ুব খানের জন্য তা হিতে বিপরীত হয়ে যায়। এতে সারা বাংলার মানুষ ক্ষেপে ওঠে। ভাসানীসহ বামদলের সম্মিলিত আন্দোলন জোরদার হয় এবং 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'– শ্লোগানে আইয়ুব খানের মসনদ কেঁপে ওঠে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে 'সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' (৬৯-এর জানুয়ারি) গড়ে ওঠে এবং ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। দিনে দিনে শেখ মুজিব জাতীয় বীরে পরিণত হন। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনে তিনটি ধারার অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল। প্রথমত; সোহরাওয়ার্দীর আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক ধারা। এর সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী, কিরণশঙ্কর রায় ও আবুল হাশিমের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক যুক্ত বাংলা আন্দোলনের ধারা। দ্বিতীয়ত; নেতাজি সুভাষ বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি গভীর আকর্ষণ। তৃতীয়ত; রাজনীতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল, আবুল হাশিম ও হুমায়ুন কবিরের প্রভাব।

৬৮-এর গণআন্দোলন শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পেশোয়ারের জিন্নাহ পার্কে বক্তব্যরত আইয়ুব খানকে লক্ষ করে এক পাঠান যুবক গুলি ছুঁড়ে এ আন্দোলনের (৬৮-এর ১১ নভেম্বর) সূত্রপাত করে।[১৬৫] এ গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পুলিশ ও সেনাদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যু (৬৯-এর ২০ জানুয়ারি), মতিউর ও রুস্তমের মৃত্যু (৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি), জেলবন্দি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু (৬৯-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবান্ধব জনপ্রিয় শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার নির্মম মৃত্যু (৬৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি) আইয়ুব খানের ক্ষমতার মসনদকে কাঁপিয়ে দেয়।[১৬৬] আইয়ুবের এ শাসনামলেই সরকারবিরোধী আন্দোলনে ১৯৭ জনের মতো ছাত্র-শিক্ষক-কৃষক-শ্রমিক মারা যায়।[১৬৭] তবে এ রক্তদান বৃথা যায়নি। আইয়ুব খান জনতার আন্দোলনের কাছে পরাভব মানতে বাধ্য হন। ক্ষমতা বাঁচাতে তিনি শেখ মুজিবসহ সকল আসামিকে (৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি) নিঃশর্ত মুক্তি দেন। পরের দিন (৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি) শেখ মুজিব বাঙালির প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত হন।[১৬৮] আইয়ুব খান মুজিবের সঙ্গে আপস রফা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর কূটচালে তা ব্যর্থ হয়।[১৬৯] আইয়ুব পুনরায় সামরিক শাসন জারি করতে বিশ্বস্ত ইয়াহিয়ার সমর্থন চাইলে তিনি প্রেসিডেন্টকে যে-প্রস্তাব দেন, তাতে তার ক্ষমতালিপ্সার বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরন্তু সকল জেনারেল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানরাও ইয়াহিয়ার পক্ষে থাকায় ৬৯-এর ২৫ মার্চ লৌহমানব আইয়ুব খানকে ক্ষমতা ছেড়ে বিদায় নিতে হয়। আইয়ুবপতন-আন্দোলনে ছাত্রদের হাতেই ছিল বিদ্রোহের পতাকা। ছাত্ররাই এ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের নিয়মানুযায়ী স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা থাকলেও সেনাপ্রধান ইয়াহিয়ার কাছে তা হস্তান্তর করাকে আইয়ুব খান শ্রেয় মনে করেন। দশ বছর পূর্বে তিনি ইস্কান্দার মির্জাকে যেভাবে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন, ঠিক একই কায়দায় তাকে সরিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহন করেন। এভাবে দেশ পুনরায় সামরিক শাসনের কবলে পড়ে।

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ৬৯-এর ২৫ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ৩১ মার্চ নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে বিশ্বস্তসহচর জেনারেল হামিদ, জেনারেল পীরজাদা ও জেনারেল গোলাম উমরকে নিয়োগ দেন। আর সামরিক শাসকদের চিরাচরিত নিয়মে বেসামরিক প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালান। ৩০৩ জন রাজনীতিবিদ ও আমলাদের গ্রেফতার-হয়রানি করে সেনাবাহিনীর ইমেজ বৃদ্ধি করেন। তাঁর গঠিত মন্ত্রিসভায় সমানসংখ্যক বাঙালিকে মন্ত্রিত্ব দান এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাঙালিদের নিয়োগ দিয়ে নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ ও বাঙালির সহানুভূতি অর্জনে সচেষ্ট হন।[১৭০] ৫৬ সনের সংবিধান পুনর্বহাল করেন এবং খুব দ্রুত একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফেরার ঘোষণা দেন। এ লক্ষ্যে তিনি ৭০-এর ৩১ মার্চ একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (LFO) জারি করেন। প্রথমত তিনি পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে চারটি নতুন প্রদেশ করেন। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– এ নীতিতে তিনি ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু বন্যার বিবেচনায় ৭ ডিসেম্বর তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। তবে ১২ নভেম্বর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হওয়াতে ঐ এলাকায় নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সনে। এ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বড় দল হিসেবে জোরেশোরে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। 'শক্তিশালী কেন্দ্র, ইসলামি সমাজতন্ত্র ও অব্যাহত ভারত বিরোধিতা'-কে ভুট্টোর দল প্রচারণার বিষয়বস্তু করে। অন্যদিকে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?– নামের পোস্টারই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'- লীগের এ নির্বাচনী শ্লোগান বাঙালিকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। 'ভোটে মুক্তি আসবে না'– এমন যুক্তি তুলে ভাসানীর দল ন্যাপ নির্বাচন বয়কট করে চরম হঠকারিতার পরিচয় দেয়।[১৭১] শিল্পী হাসেম খানের আঁকা 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'–বিখ্যাত এ পোস্টারে দুই পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক খতিয়ান বাঙালিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।[১৭২] নির্বাচনে এর প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়ে । তাই দেখা যায় এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ১৬৭টি পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আর ৮৮টি আসন পেয়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ নির্বাচনে দুটি দলেরই আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। এ নির্বাচনী রায় পাকিস্তানের দুই অংশকে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করায়। উপরন্তু বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ২ লাখের বেশি মানুষ ও অসংখ্য গবাদি পশুর মৃত্যু এবং বিপন্ন মানুষের প্রতি পাকিস্তান সরকার চরম অবহেলা দেখালে বাঙালি ক্ষেপে ওঠে। দেশের জাতীয় সংহতি ও অস্তিত্ব বিপন্ন হবার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এ নির্বাচন নিয়ে লন্ডন টাইমস পত্রিকার (৭০-এর ৯ ডিসেম্বর) মন্তব্য ছিল 'The First and Perhaps Last Elcetion'।[১৭৩] প্রকৃত অর্থেই ৭০-এর নির্বাচন ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন।

বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম

'No Political Ambition'– বলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসলেও তিনি নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নানা টালবাহানা শুরু করেন। কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে না– এই মর্মে গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়েই তিনি অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল সব কিছু উল্টে দিলে তিনি মহাসঙ্কটে পড়েন। তিনি মুখে শেখ মুজিবকে-'দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' বলে ঘোষণা দিলেও ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। পাকিস্তানিরা কোনোভাবেই বাঙালি শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চায়নি। তাই ইয়াহিয়া নিজে ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট থেকে মুজিবকে নামেমাত্র প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুজিব তা নাকচ করেন এবং ইয়াহিয়াকেই নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট (টিটুলার) হতে বলেন। আর ভুট্টোও বিরোধী দলের নেতা হতে চাননি।[১৭৪] ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার পূর্বঘোষিত তারিখ ১ মার্চ স্থগিত করেন। এতে ঢাকাসহ সারা দেশ বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। ছাত্রলীগের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে 'জাতির পিতা' উপাধি, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ, ঢাকার বিভিন্ন স্থান-স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টে রাখা হয়।[১৭৫] আর সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে ৭ মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার মাঝে ১৮ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রস্তুতি নেবার ইঙ্গিত দেন। আর ইয়াহিয়া খানও সময় ক্ষেপণের জন্য ঢাকায় এসে

১১ দিন (১৫-২৫ মার্চ) ধরে সংলাপ নিয়ে নাটক শুরু করেন। এ কয়েকদিনে পাক সেনাবাহিনী বাঙালিকে শায়েস্তা করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। কারণ শেখ মুজিবের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন (৩ মার্চ–২৫ মার্চ) অভূতপূর্বভাবে সফল হয়ে ওঠে। তাঁর কথা মতো সারা পূর্ববাংলা পরিচালিত হয়। তাঁর ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়িটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে রূপ নেয়। শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন defacto বা কার্যত সরকার প্রধান।[১৭৬] পাকিস্তানি সরকারের কারফিউ ভেঙে বাঙালি জনতা তোলে গগনবিদারী শ্লোগান; 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি', 'পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা।' বাঙালির এ স্বশাসন সম্পর্কে ড. রেহমান সোবহানের মন্তব্যটি মূল্যায়নযোগ্য:

> 'প্রজন্মের পর প্রজন্মের রাজনৈতিক সংগ্রাম যা অর্জন করতে পারেনি, সেটা অর্জিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৭০-এর শেষ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের প্রচার অভিযানে।...নির্বাচনী অভিযান হয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধাতুকে পিটিয়ে গঠন করার কামারশালা। ১৯৭১ সালের মাঠের স্বশাসন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইস্পাতকে কাঠিন্য প্রদানের নেহাই।'[১৭৭]

১৭৫৭ সনের পলাশীর পরাজয়জনিত ক্ষমতা হাতছাড়া হবার পর এ মার্চ মাসই ছিল সেই সময়, যে-সময় বাঙালি প্রকৃত অর্থেই নিজেরা এ অঞ্চলের শাসনভার হাতে তুলে নেয়। নেহেরু, মাওসেতুং, হোচিমিন, বেনবেল্লা, নক্রুমা, নারায়ে এমনকি নেনসন ম্যান্ডেলার মতো নেতাদেরও স্বাধীনতার পর নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা পেতে হয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই সে-বৈধতা পেয়ে যান। বাঙালির এ জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধীনতার স্পৃহাকে স্তব্ধ করে দিতে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায়ের দোহাই দিয়ে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর সরকারি সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রি./১১ চৈত্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ। তার শাসনামলের ঠিক দুই বছর পূর্তিতে (২৫ মার্চ ১৯৬৯-২৫ মার্চ ১৯৭১) তিনি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক এক জঘন্য হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে পাকিস্তানের পতন ডেকে আনেন। এর ফলশ্রুতিতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সামরিক কায়দায় সমাধান করতে গিয়ে 'পোড়ামাটি নীতি'[১৭৮] (scorched earth policy) গ্রহণ করেন। পাকবাহিনীর গণহত্যার প্রথম শিকারে পরিণত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী, পিলখানার ইপিআর রাইফেলসের বহু সেনা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বহু পুলিশ। শেখ মুজিবকে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই বন্দি করা হয় এবং তিনদিন ঢাকায় রাখার পর পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৭৯] শেখ মুজিব অবশ্য বন্দি হবার পূর্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান এবং যা বেতার, টেলিফোন, টেলেক্স ও টরে-টাক্কার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থাও হয়।[১৮০] বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এ বার্তা পেয়ে দেশের অভ্যন্তরে যেমন প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, তেমনি ভারতে গিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী (বিশেষত তাজউদ্দিনের) ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে প্রবাসে একটি বেসামরিক সরকার (৭০-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে) গঠন করা হয়। এ সরকার কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী, শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি (তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি) ও কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীকে যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করাসহ বিভিন্ন জনের ওপর দপ্তরবন্টন করা হয়। গ্রামটির নাম রাখা হয় মুজিবনগর।[১৮১] এ দিনটি ছিল শনিবার, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রি./৪ বৈশাখ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। পলাশীর আম্রকাননে একদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। ২১৪ বছরের (১৭৫৭-১৯৭১) ব্যবধানে মেহেরপুরের আম্রকাননে সেই সূর্যের উদয়াচল পর্ব শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে মাত্র তেইশ দিনের মাথায় প্রবাসে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করতে পারা ছিল বাংলাদেশের এক বিরাট সাফল্য। আর এ কৃতিত্ব অনেকটা ছিল তাজউদ্দিনেরই প্রাপ্য। তার দূরদর্শিতা ও সাহসী পদক্ষেপের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ঢাকা-দিল্লি-মস্কো এবং ইসলামাবাদ-পিকিং-ওয়াশিংটন নামক দুটি প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্লকে বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারত প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়, প্রবাসী সরকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যুদ্ধকে সার্থক করে তোলে।[১৮২] নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে ইন্দিরা গান্ধী সরকার বাংলাদেশের বামপন্থীদের বিষয়ে সতর্ক থাকার কারণে প্রথম দিকে এদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। আবার চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়ায় বাংলাদেশের চীনপন্থীরাও বিপাকে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক তৎপরতায় বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান নিজেদের পরাজয় আড়াল করতে ভারতে আক্রমণ চালিয়ে একে 'পাক-ভারত যুদ্ধ' বলে চালিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর তৎপরতায় মাত্র দুই সপ্তাহে (ডিসেম্বর ৩-১৬) বাংলাদেশ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের ইঙ্গিতে আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে 'নিশ্চল যুদ্ধবিরতি' (stand still ease-fire) কার্যকর করতে গিয়ে রাশিয়ার ভেটোতে ব্যর্থ হয়।[১৮৩] আর ভুট্টোও এ প্রস্তাবকে অকার্যকর করতে দেরি করে জাতিসংঘে উপস্থিত হন এবং জাতিসংঘকে 'ফার্স অ্যান্ড ফ্রড' বলে হাতের কাগজগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন। কারণ পাকিস্তান অখণ্ড থাকলে বা বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে ভুট্টোকে বিরোধী দলের নেতাই থাকতে হতো। আর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনীকে পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে ফেলে দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। এতে ভুট্টোর উদ্দেশ্যও সফল হয়। তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারেন।[১৮৪] অবশেষে ৯১ হাজার সৈন্যসহ জেনারেল নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।[১৮৫] দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রি./২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। কিন্তু ১৮ ডিসেম্বর রায়ের বাজারের কাটাসুর এলাকার এক বদ্ধভূমিতে দুইশত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর লাশ আবিষ্কারের ঘটনায় বিজয়-আনন্দ হরিষে বিষাদময় হয়ে ওঠে। তারপরেও জেলবন্দি (৯ মাস ১৪ দিন) শেখ মুজিবের জননায়কের বেশে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনে (১০ জানুয়ারি ৭২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়।[১৮৬] এ যুদ্ধে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে মৃত্যু, ধ্বংসযজ্ঞ ও সম্পদহানির দিক থেকে বাংলাদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল ও অপরিমেয়।[১৮৭] বাঙালি তার স্বদেশি-স্বজাতি মুসলমানের হাতেই (পাকিস্তানিদের) বহু স্বজন-সম্পদ হারিয়ে শূন্য হাতে পথ চলা শুরু করে। একাত্তরের এ অর্জিত স্বাধীনতা লাহোর প্রস্তাবের সত্যতা ও দেশভাগের বাস্তবহীনতাকে প্রমাণ করে। অথচ যে-ইসলাম ধর্মকে পুঁজি করে, হাতিয়ার বানিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান কায়েম করেছিল, তাদের আদর্শ ও যাপিত জীবনে ইসলামের ছিটেফোঁটাও ছিল না।[১৮৮] এজন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে দেওবন্দের 'জমিয়তুল ওলামা-ই-হিন্দ'-এর নেতা মাওলানা হোসাইন আমহদ মাদানী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন।[১৮৯] আর জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবু আলা মওদুদী পাকিস্তানি শাসকদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।[১৯০] এদের হঠকারী শাসন ইসলামকে যেমন রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি পাকিস্তানকেও সুরক্ষা না দিয়ে বরং ধ্বংস করে। মুক্তিযুদ্ধের এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৪ বছর ৪ মাস ২ দিনের ভয়াবহ দুঃশাসনের অবসান ঘটে। বাঙালি পায় দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। যে-মুসলিম কওমের স্বার্থরক্ষায় ৪৭-এ ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছিল, সে-মুসলিম শাসকদের স্বার্থমগ্নতাই আবার ৭১-এ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের চড়াই-উৎরাই

শেখ মুজিব সত্তরের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে (১৯৭২-এর ১২ জানুয়ারি) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের হাল ধরেন। স্বাধীন দেশের মানুষ (বিশেষত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিসচেতন লাখো যুবসম্প্রদায়) তাঁকে ঘিরে নতুন স্বপ্নের জাল বুনে। কিন্তু শেখ মুজিবকে প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি লোকের (এক কোটি ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থী ও দেশের দেড় কোটি মানুষের উদ্বাস্তু) পুনর্বাসন করা, শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা, পাকিস্তানে আটকে পড়া চার লক্ষ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনা, সোয়া লক্ষ ভারতীয় সেনাকে ফেরত পাঠানো, নব্বই হাজার যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনার ব্যবস্থা করা, চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা, প্রায় এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দেড়লক্ষের মতো অস্ত্র উদ্ধার করা এবং ষাট থেকে সত্তর হাজার স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১৯১] এর সঙ্গে বিধ্বস্ত কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, টেলিফোন, বিদ্যুৎসহ অবকাঠামোগত সংকট ও প্রশাসনিক শূন্যতা মোকাবিলা করাও শেখ মুজিবের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আবার স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়ন করাও জরুরি হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব তার সম্মোহনী গুণ ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসা (৭২-এর ১৭ মার্চ) ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বলে ভারতীয় সেনাদের তিন মাসের মধ্যে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন। বেশ কিছু বড় বড় শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করেন এবং অন্যান্য সংকট মোকাবিলায় আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেন। এক বছরের মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র– এ চার মূলনীতিকে আদর্শ মেনে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশগড়ার লক্ষ্যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। দেশ শাসনের জন্য সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু সমকালীন কিছু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট শেখ মুজিবের শাসনকে ক্রমশই অস্থিতিশীল করে তোলে। আদর্শিক দ্বন্দ্বে ৭২ সনে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করে; যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এছাড়া আওয়ামী লীগের পরবর্তী বড় দুটি দল ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিও বিরোধী দল হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়াতে

রাজনৈতিক মাঠও অস্থির হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কিছু সংসদ সদস্য, নেতা-কর্মী, সরকারি আমলা ও ব্যবসায়ীদের সীমাহীন ঘুষ, দুর্নীতি ও কালোবাজারি।

এসব কারণে শেখ মুজিব তাঁর দল থেকে পর্যায়ক্রমে (৭২-এর এপ্রিল–সেপ্টেম্বর) মোট বিয়াল্লিশ জন সাংসদকে বহিষ্কার করেন।[১৯২] এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (৭২-এর ৩১ অক্টোবর) ও সহযোগী সংগঠন গণবাহিনী (৭৪-এর জুলাই) গড়ে ওঠে।[১৯৩] একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে ওঠার সুযোগ আওয়ামী লীগ করে না দেয়াতে দেশের রাজনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হয়। জওহরলাল নেহেরু জয়প্রকাশ নারায়ণকে দিয়ে যেভাবে বিরোধী দল গঠন করিয়েছিলেন, শেখ মুজিব তা করেননি।[১৯৪] আবার শেখ মুজিব নির্দিষ্ট অভিযুক্ত (হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ) ছাড়া গ্রেফতারকৃত বাকি দালাল–রাজাকারদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় (৩০ নভেম্বর ৭৩) পরিস্থিতি আরো জটিলরূপ ধারণ করে। এসময় শেখ মুজিব চরম বামপন্থী ও কট্টর ডানপন্থী রাজনীতির বিরোধিতার সম্মুখীন হন। একদিকে সিরাজুল আলম খানের জাসদ, সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি, উগ্র চীনপন্থী আবদুল হক-আবদুল মতিন-মোহাম্মদ তোয়াহা-দেবেন শিকদার-অমল সেনদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা; অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল জামায়াতে ইসলামী-নেজামে ইসলামী-মুসলিম লীগ-পিডিপি-র মতো দলগুলোর মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠার গোপন কার্যক্রম। এর সঙ্গে ছিল আমেরিকা-চীন-সৌদি আরব-পাকিস্তান রাষ্ট্রের অব্যাহত বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র। সিরাজ শিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি ও জাসদের গণবাহিনীর ব্যাংক ডাকাতি, পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ, রক্ষীবাহিনীর ওপর আক্রমণ, আওয়ামী লীগ দলের এম.পি ও নেতাকর্মীদের হত্যা করায় গোটা দেশের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। কেবল ৭৩-এর ছয় মাসেই (১২ জুন–১৫ ডিসেম্বর) ৬১টি থানা, বহু পুলিশ ফাঁড়ি ও রক্ষীবাহিনীর ওপর হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এদের হাতে ৩ বছরে (৭২ ফেব্রুয়ারি–৭৫ আগস্ট) ৫ জন সংসদ সদস্যসহ ১৬৭ জনের নির্মম মৃত্যু ঘটে।[১৯৫] এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ডি.পি. ধরকে নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়া, ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের পাকিস্তানের লাহোরে গমন (২৩ ফেব্রুয়ারি ৭৪), কিউবায় সামান্য পাট রপ্তানির অজুহাতে আমেরিকার অবরোধ-আরোপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (৭৪), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচির (১৭ মার্চ ৭৪) সহিংস ঘটনা, সরকারি বাহিনীর হেফাজতে সিরাজ শিকদারের মৃত্যু (২ জানুয়ারি, ৭৫), মুদ্রাস্ফীতি, আইনশৃঙ্খলার ক্রমাবনতি, মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক-অফিসার-আমলাদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা প্রদানের সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ঢাকা লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিম দম্পতির লাঞ্ছিত হবার ঘটনায় কিছু মুক্তিযোদ্ধা তরুণ সেনা অফিসারদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত– এসব শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। আবার তিনি দেশের বিদ্যমান নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিতে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন (২৫ জানুয়ারি, ৭৫), জরুরি অবস্থার (৭৪-এর ২৮ ডিসেম্বর হতে চলমান) মধ্যে তড়িঘড়ি করে একদলীয় বাকশাল পদ্ধতি (৭ জুন, ৭৫) আরোপ করায় নিজ দলের কিছু সদস্য, নাগরিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর একাংশ ও বৃহৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ফলশ্রুতিতে নিজ হাতে খেতাব দেয়া ও দেশীয় সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হাতে সপরিবারে শেখ মুজিবকে অত্যন্ত নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়। দিনটি ছিল শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রি./৩০ শ্রাবণ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার দেশের বৃহত্তর মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। ঐক্যের বদলে গোষ্ঠীতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। যার প্রতিক্রিয়ায় অনিবার্যভাবে উত্থান ঘটে জাসদের।[১৯৬] বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, কোনো সংগ্রাম বা বিপ্লবই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও শতভাগ সুখ-শান্তি বয়ে আনতে পারেনি। এর জন্য প্রয়োজন হয় দূরদর্শী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, দীর্ঘমেয়াদী সৃজনশীল কর্মপরিকল্পনা ও একটি দার্শনিক ভিত্তি। কারণ স্বাধীন দেশের জনগণ বিপ্লব-বিক্ষোভ অপেক্ষা শান্তি, স্থিতি ও সংস্কার চায়। বাংলাদেশের জনগণও 'ভোটের আগে ভাত' চেয়েছিল। কিন্তু দেশবাসীর এ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সরকার তাল মেলাতে পারেনি। এভাবেই শেষ হয় শেখ মুজিবের ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিনের শাসনামল। একই সঙ্গে নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশও এক গভীর সংকটে পতিত হয়। ৭১-এর যুদ্ধকালীন সময়ে একটি বেসামরিক সরকারের অধীনে যে-দেশ স্বাধীন হয়, সেই স্বাধীনদেশে দুইবার সামরিক স্বৈরাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শেখ মুজিবের মতো একজন নেতার সপরিবারে হত্যার পরেও সেনাবাহিনী, তাঁর দলের নেতাকর্মী ও দেশের জনগণের মধ্য থেকে তাৎক্ষণিক

তেমন প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এমনটিই ঘটেছিল পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী সময়েও। উপপ্রধান জিয়াউর রহমান, সিজিএস খালেদ মোশাররফসহ জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাগণও রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করেন। আর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারের মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারাও এমন ক্রান্তিকালে বলিষ্ঠ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। এরা কার্যত কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং সবাই আত্মগোপনে চলে যান।[১৯৭] যার ফলে খুব সহজেই খুনী চক্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হয়।

এরপর বাংলাদেশের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক একটি বিষাদময় নাটক মঞ্চস্থ হয়। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। এ মন্ত্রিসভার আরো অনেকেই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা (২০ আগস্ট, ৭৫), জাতীয় চার নেতাকে হত্যা (৩ নভেম্বর,৭৫), খালেদ মোশাররফপন্থীদের অভ্যুত্থানে জিয়াকে বন্দি করে খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান করা (৪ নভেম্বর, ৭৫), মোশতাককে সরিয়ে বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি (৬ নভেম্বর, ৭৫) করা, একদিনের মাথায় জাসদের কর্নেল তাহের ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে সিপাহি বিপ্লবের (৭ নভেম্বর, ৭৫) মাধ্যমে জিয়াকে মুক্ত করা, খালেদ মোশাররফসহ সেনা অফিসার হায়দায় ও নাজমুল হুদার করুণ মৃত্যু– এসব রুদ্ধশ্বাসকর ঘটনায় জিয়া লাভবান হন।[১৯৮] ৭ নভেম্বর প্রচারিত ভাষণে জিয়া প্রাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন এবং সর্বময় শাসন ক্ষমতা দখল করেন।

এক্ষেত্রে জিয়ার সামনে আদর্শ ছিলেন পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আইয়ুব খান। তাকে রোল মডেল ধরেই জিয়া অগ্রসর হন। প্রথমেই তিনি ৭২-এর সংবিধানের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যেমন যুক্ত করেন, তেমনি প্রস্তাবনার 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম'-এর স্থলে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের' ও' বাঙালি জাতীয়তাবাদ'– এর স্থলে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' এবং 'জয়বাংলা'র স্থলে- 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শব্দগুলো যুক্ত করে সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিটি পাল্টে দেন।[১৯৯] জিয়া তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, মেক্সিকোর প্লুতার্কো এলিয়াস কালেম, লাজারো কার্দেনাস এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুং হি-র পথ ধরে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করেন। কারণ সেনা-অভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্য তাঁর একটি জনভিত্তির দরকার ছিল।[২০০] জিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি (৭৬-এর ২১ জুলাই), বহু বিদ্রোহী সেনা ও অফিসারকে ফাঁসি, বঙ্গন্ধুর হত্যাকারীদের বিদেশে পুনর্বাসন, রাজাকারদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী বানিয়ে দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনকে কলুষিত করেন।

তিনি কৌশলে রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিদের দলে টানতে সক্ষম হন। পর্যায়ক্রমে জাগদল (৭৮-এর ২২ ফেব্রুয়ারি), বিএনপি (৭৮-এর ১ সেপ্টেম্বর) ও ছাত্রদল (৭৯-এর ১ জানুয়ারি) গড়ে তোলেন। জিয়ার গড়া এ বিএনপিকে কামাল আতাতুর্কের রিপাবলিকান পিপলস পার্টি, জেনারেল কালেমের ন্যাশনাল রেভলিউশনারি পার্টি, পার্ক চুংহি-র ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টি, জেনারেল চুন দুহুয়ানের ডেমোক্রেটিক জাস্টিস পার্টির সঙ্গে তুলনা করা যায়।[২০১] আর রাজনীতির হাটে তিনি নেতাদের কেনাবেচার মতো কাছে টানতে এবং ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করেন। তিনি প্রশাসন ও রাজনীতিকে একই সঙ্গে সামরিকায়ন এবং অসামরিকায়ন করতেও সক্ষম হন।[২০২] এতে করে বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে। জিয়া তাঁর শাসনামলে প্রায় ১৭-১৮টি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সামাল দিতে পারলেও শেষেরটিতে ব্যর্থ হন।[২০৩] ফলে রহস্যজনকভাবে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ঘুমন্ত অবস্থায় একদল সেনা-অফিসারের হাতে জিয়া নির্মমভাবে নিহত হন।[২০৪] জিয়ার পতনের পর ক্ষমতার মঞ্চে আবির্ভূত হন জেনারেল এরশাদ।

এরশাদের রোষানল গিয়ে পড়ে মূলত বিএনপির ওপর। ফলে বিএনপির ২৩৩ জন নেতা ও রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার-হয়রানি করা হয়।[২০৫] সকল সামরিক সরকারের মতো তিনিও রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব ও গতি বাড়াতে 'উপজেলা' করার ঘোষণা দিয়ে জনগণকে মোহিত করেন। রাষ্ট্রক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এরশাদও জিয়ার মতো বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদদের দলে ভেড়ান। রাজনীতির হাটে নেতা বেচাকেনার ব্যাপারে এরশাদ ছিলেন একজন পাকা ফড়িয়া। ফলে বহু নেতাকে তিনি Political Somarsolt বা রাজনৈতিক ডিগবাজি খাওয়ান। জাসদ নেতারাও এরশাদের সমর্থকে পরিণত হন।[২০৬] তিনি পর্যায়ক্রমে 'জনদল' (৮৪-

এর নভেম্বর), 'জাতীয় ফ্রন্ট' (৮৫-এর ১৬ আগস্ট), 'জাতীয় পার্টি' (৮৬-এর ১ জানুয়ারি) ও সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'ছাত্রসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।[২০৭] অষ্টম সংশোধনীর (৮৮-এর ১১ মে) মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জিয়া যা শুরু করেছিলেন, এরশাদ তা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এর প্রতিবাদে রাজপথে জোরালো কোনো আন্দোলন, মিছিল ও প্রতিবাদও হয়নি।[২০৮] এরশাদের প্রথম বছর (৮২) নির্বিঘ্নে কাটলেও পরের বছরগুলোতে আন্দোলন জোরদার হয়। তিনি প্রথম দিন সাইকেল চালিয়ে অফিস করে, লাঙল প্রতীক নিয়ে 'পল্লীবন্ধু' সাজলেও পরবর্তীকালে হেলিকপ্টারে চড়ে বিভিন্ন পিরের দরবারে যাতায়াত, ব্যক্তিগত ঘুষ-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে রাজপথ ও শিক্ষাঙ্গন ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।[২০৯] ফলে ৮৩ সন থেকেই আওয়ামী লীগের জোটভুক্ত পনেরো দল ও বিএনপির জোটভুক্ত সাত দলের সম্মিলিত আন্দোলনে এরশাদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জাফর-জয়নাল-দিপালী সাহার মৃত্যু (৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি), সেলিম ও দেলোয়ারের মৃত্যু (৮৩-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি), আদমজীতে কমরেড তাজুলের মৃত্যু (৮৩-এর ২ মার্চ), ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়ার মৃত্যু (৮৫-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি), 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'– শ্লোগান শরীরে ধারণকারী নূর হোসেনের মৃত্যু (৮৭-এর ১০ নভেম্বর), সাংবাদিক আতাউস সামাদের গ্রেফতার (৮৭-এর ২৩ নভেম্বর) ও নীরু-অভি বাহিনীর গোলাগুলিতে বি.এম.এ-র নেতা ডা. শামসুল আলম খান মিলনের মৃত্যু (৯০- এর ২৭ নভেম্বর)– এসব হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় এরশাদ–পতন আন্দোলন জোরদার হয়। এরশাদের শাসনামলের বিভিন্ন আন্দোলনে প্রায় ৬০ জনের মৃত্যু হয়।[২১০] জাতীয় কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানে চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা স্বৈরাচারের প্রতিকৃতির নিচে লেখা– 'বাংলাদেশ এখন বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে আছে' এ মন্তব্যটি এরশাদের খেতাব হয়ে ওঠে। নব্বইতে এসে 'এরশাদ হটাও' আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। নিরুপায় হয়ে বিশ্ববেহায়া এরশাদ লীগ ও বিএনপির মনোনীত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর (৯০-এর ৬ ডিসেম্বর) করে বিদায় নেন। ঊনসত্তরের মতো আরেকটি গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের ন্যায় এরশাদেরও প্রায় দশকব্যাপী সামরিক দুঃশাসনের (৮ বছর ২শত ৫৫ দিন) অবসান হয়। এরশাদ পতন আন্দোলনেও ছাত্রদের বিরাট ভূমিকা ছিল। পনেরো বছরের স্বৈরশাসনের পর বাংলাদেশ পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করে।

১৯৯১ থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত তিনটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলেও দলের ভেতরে-বাইরে গণতান্ত্রিক চর্চার ধারা ও ঐতিহ্য এ দেশে গড়ে ওঠেনি। তাই বিরোধীদলের বক্তব্য, সমালোচনা ও মতামতকে কোনো সরকারি দলই সম্মান দেখায়নি বরং সমালোচনাকারী ব্যক্তি ও দলকে শত্রুজ্ঞান করে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নেবার মতো চারিত্রিক ঔদার্য রাজনীতিবিদদের মাঝে দেখা যায়নি। আবার সকল সরকারি দল, তাদের অঙ্গসংগঠন ও ছাত্রসংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য, বিরোধীদলের ডাকা অসংখ্য হরতাল-অবরোধ এবং সংসদ বর্জনের রাজনীতিতে যেমন সংসদ অকার্যকর হয়, তেমনি দেশের ক্রান্তিলগ্নে রাজনীতিবিদগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে না পারায় এক-এগারোর মতো (১১ জানুয়ারি,২০০৭) সেনা শাসনের উত্থান ঘটে। রাজনীতিবিদদের এমন রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব, ব্যর্থতা ও স্বার্থচিন্তার কারণেই বার বার এদেশে সামরিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। তবে একতরফা ও প্রশ্নবিদ্ধ দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্ববাদ (majoritarian chauvinism) নতুন করে আরেকটি সংকটের জন্ম দিয়েছে। শক্তিশালী বিরোধীদল হিসেবে বিএনপি দাঁড়াতে না পারায় লীগ সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে শাসক দল ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি বর্তমানে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলছে। রাষ্ট্রকাঠামোর সর্বত্র দুর্নীতি ও স্বজনতোষী পুঁজিবাদ (crony capitalism) বর্তমান বাংলাদেশের জন্য রীতিমতো অভিশাপ হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল-এর তত্ত্বানুযায়ী এ সীমাহীন দুর্নীতি রাষ্ট্র ও জনজীবনে চার ধরনের কুফল বয়ে আনছে। প্রথমত; সামষ্টিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত; সামাজিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। তৃতীয়ত; প্রকট অর্থনৈতিক বৈষম্যের দায় বা মাশুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বহন করতে হচ্ছে। চতুর্থত; বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করছে।[২১১] তাই বাংলাদেশ আজ রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত, সামাজিকভাবে পঙ্গু, নৈতিকভাবে পতিত, আদর্শগতভাবে দিশেহারা, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এবং সেই সঙ্গে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামরত।[২১২] তারপরেও এ সংগ্রামকে সবসময় চালিয়ে যেতে হবে। কারণ অন্যায়-অবিচার-অপকর্মের বিরুদ্ধে

পরিচালিত বিদ্রোহীচেতনাই জন্ম দেয় মহত্তম মানবিক মূল্যবোধ। যেদিন এ সংগ্রাম ও প্রতিবাদ থেমে যাবে, সেদিন বুঝতে হবে মানবিক মূল্যবোধেরও বিপর্যয় ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, দেশে কোনো জবাবদিহি না থাকায় মৌলিক অধিকার সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে উঠেছে। এ রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের সঙ্গে আবার শুরু হয়েছে ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়। ফলে স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদেশ গণতন্ত্র ও দলীয় রাজনীতিতে যে-ভঙ্গুর ও দিকভ্রান্ত অবস্থায় এসে পড়েছে– এমন অবস্থায় আগে কখনো হয়নি। আবার স্বাধীনতা-পূর্ব, স্বাধীনতাকালীন ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে দেশের সকল আন্দোলনে ছাত্রসংগঠনগুলোর যে-বিরাট ও বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল, বর্তমানে এ ছাত্ররাও চরমভাবে আদর্শচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে পড়েছে। রূপকথার ভূতের পশ্চাৎমুখী পায়ের মতো দেশ আর্থিক ও প্রযুক্তিখাতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও রাজনীতির দিক থেকে ক্রমশই পশ্চাৎবর্তী হয়ে পড়ছে। তাই এ সংকট কেবল কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, বরং সমগ্র দেশ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার। তারপরেও আমরা আশাবাদী। কারণ বায়ান্ন ও একাত্তরের মতো প্রেক্ষাপটে লাখো সূর্যসন্তানের আত্মত্যাগে যে-জাতি স্বাধীন হয়েছে, সকল সংকটকে লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অতিক্রম করেছে, সে-জাতি কখনোই ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হতে পারে না।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. বদরুদ্দীন উমর : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক;* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৮, পৃ. ১১

২. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.) : *বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ);* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৪৩, পৃ. ২১০

৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮-৩৯

৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২

৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২

৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১);* ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫২-৫৩

৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৬

৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৬

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*; কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১২, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আবুল কাসেম ফজলুল হক: *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলাসাহিত্য;* জাগৃতি প্রকাশনী, ১ম জাগৃতি সংস্করণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪১

১০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৪

১১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৩

১২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৪

১৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তার-পূর্ববর্তী কয়েক বছরের খাজনা আদায়ের ধারাবাহিক চিত্র:

বছর	নির্ধারিত খাজনা	আদায়কৃত রাজস্ব
১৭৭২	৯৯,৪১০ পাউন্ড	৫৫,২৩৭ পাউন্ড
১৭৭৩	১,০১,০৮৯ পাউন্ড	৬২,৩৬৫ পাউন্ড
১৭৭৪	১,০৩,৭৯৯ পাউন্ড	৫২,৫৩৩ পাউন্ড
১৭৭৫	১,০০,৯৮০ পাউন্ড	৫৩, ৯৯৭ পাউন্ড
১৭৭৬	১,১১,৪৮২ পাউন্ড	৬৩,৩৫০ পাউন্ড

উৎস- অতুল সুর: *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন;* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৯০

১৪. Edward Thomson and G.T. Garrat: *Rise and Fulfilment of British Rule in India* (2nd ed. London; 1935). P.100, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামানঃ *মুসলিম-মানস ও বাংলাসাহিত্য*; মুক্তধারা, ৩য় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৮

১৫. Ibid: p. 105, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

১৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৭-৯৮

১৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৮-৯৯

১৮. বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩-১৪

১৯. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪১

২০. Radha Kamal Mukherjee : *Land Problems in India*; P. 35, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** বদরুদ্দীন উমরঃ *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

২১. Lord William Bentinck : *Speech, Quoted from Rajani Palm Dutt*: India Today; P. 218, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** বদরুদ্দীন উমর*;* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২২. W.W. Hunter : *Statistical Accounts of Bengal*, IX (London, 1876), P. 60, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামান*;* পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৪

২৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৬

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.) : *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৯, পৃ. ২৬-২৭

২৬. Second Report of the House of Lords (1852-53) on Indian Territories, p. 113 তে বর্ণিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সাক্ষ্য। উদ্ধৃত; Syed Mahmud, P. 2-3, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২৭. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২৮. হুমায়ুন কবির : বাঙলার কাব্য; চতুরঙ্গ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৩৫

২৯. হুমায়ুন কবির : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩০. Sateyendranath Roy: *Selectories from Educational Research* (শহিদুল ইসলাম; আমাদের শিক্ষানীতিঃ অতীত ও বর্তমান); শিক্ষা ও পরিকল্পনা এবং আবু জাফরঃ আর বক্তৃতা নয়, ভিন্নমত; ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮, প্রবন্ধে উদ্ধৃত। **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মোহাম্মদ হাননানঃ *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* (১৮৩০-১৯৭১); আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫০

৩১. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স* (এম আনিসুজ্জামান অনূদিত); খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ১৩৭

৩২. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারঃ পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭৭

৩৩. সুশীল কুমার গুপ্ত : *উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাগরণ*; কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ২৪৭, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** ফাতেমা কাওসারঃ *কায়কোবাদঃ কবি ও কবিতা;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪০

৩৪. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** ফাতেমা কাওসার; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৩৫. হুমায়ুন কবির : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৩

৩৬. ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হিন্দু কলেজ (১৮১৭), জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (১৮৩০), সেন্ট জোভিয়ার কলেজ (১৮৩৪), কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৩৫), লামার্টানিয়ার কলেজ (১৮৩৬), শীলসফি কলেজ (১৮৫০), হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ (১৮৫৩) ও কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুশ্রেণি এর সুফল একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, নীতি-দর্শনে ঋদ্ধ করে। এছাড়া রামমোহনের আত্মীয়সভা (১৮১৫) ও সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১), ডেভিড হেয়ারের কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭); ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল সোসাইটি (১৮২৬-১৮৩১); রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট, ঈশ্বরগুপ্তের সম্বাদ প্রভাকর (১৮৩১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮-১৮৭৮); জর্জ টমসন ও প্যারীচাঁদ মিত্রের বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), বেথুন ও বিদ্যাসাগরের বেথুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৪৯) ও বেথুন কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির ইমেজে হিন্দুসমাজে এক নবজাগরণ ঘটে।- [উৎস- আনিসুজ্জামানঃ পূর্বোক্ত; পৃ. ৪১]

৩৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম: *মুসলিম বাংলাসাহিত্য পাঠ পরিক্রমা*; ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** ফাতেমা কাওসার; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৩৮. অরিজিৎ ভট্টাচার্য: *ইতিহাসের আখ্যান; এবং প্রান্তিক*, বারানাসী, ২০১৭, পৃ. ৪০

৩৯. আনিসুজ্জামান: পূর্বোক্ত; পৃ. ২৫

৪০. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৬

৪১. Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture (Elahabad, 1948), P. 81-82, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭

৪২. Khalid Ahmed Nizami: *Shah Waliullah (II), Mahmud Hussain* (ed.), *History of the Freedom Movement*, P. 540, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-৩১

৪৩. James Taylor: *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca* (Culcutta, 1839), P. 248, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২

৪৪. ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ (১৮২০) ও রাজভাষা হিসেবে ইংরেজির (১৮৩৫) স্বীকৃতি দান– এ তিনটি বিষয় বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনে মূলত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত নেমে আসলেও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণে হিন্দু-মুসলমান উভয় গোষ্ঠীই ক্ষতির শিকার হন। কারণ বংশানুক্রমে ভোগদখলে থাকা এ নিষ্কর ভূমির ওপর নির্ভর করে অভিজাত মুসলমান ও বর্ণবাদী হিন্দুশ্রেণি নিজেদের আভিজাত্য কোনো রকমে বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সমাজে ধর্ম, সাহিত্য, বিনোদন ও সেবামূলক কাজে বরাদ্দকৃত আইমা (ইমামদের), পিরুত্তর (সুফিদের), ব্রহ্মোত্তর (ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের), দেবোত্তর (প্রতিমাপূজার), ভাতুত্তর (চারণ কবিদের), বৃত্তি, মহাত্রাণ, মিল্লাকী ও ওয়াকী-র নিষ্কর ভূমি হাতছাড়া হবার কারণে সামন্ত-ভূস্বামীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা শিখে চাকরি করে নতুন জমিদারি পেয়ে ও ইংরেজ বণিকদের সহযোগী হয়ে নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারলেও মুসলমানরা সে-সুযোগ পায়নি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত সমুদ্রযাত্রা, গঙ্গায় সন্তানবিসর্জন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা (১৮২৯) নিষিদ্ধ করায় এবং বিধবা বিবাহ (১৮৫৬) চালু করায় রক্ষণশীল হিন্দু জনমনেও অসন্তোষ দেখা দেয়। আবার ১৮৫৬ সনে সেনাবাহিনীতে প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ গরু ও শূকরের চর্বি দ্বারা তৈরির গুজব এবং নিজ নিজ ধর্মনাশ করে খ্রিষ্টানধর্মে দীক্ষিতকরণের আশঙ্কায় মুসলমান ও হিন্দু সৈনিকগণ ফুঁসে ওঠে। তবে এ গুজব যে-মিথ্যা ছিল না, তা কোম্পানির কর্তাব্যক্তি এডমন্ডের পত্র, মিশনারিদের তৎপরতায় প্রকৃত সত্য উঠে আসে। এছাড়া লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ, ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাই ও মারাঠা নেতা নানা সাহেবের ব্যক্তিগত স্বার্থহানিতে তারা যেমন ক্ষুব্ধ ছিলেন, তেমনি তাদের দুরবস্থায় দেশীয় সৈনিকরাও অসন্তুষ্ট ছিলেন। আবার এ সময় ইউরোপীয় ৩৪,০০০ সৈনিকের বিপরীতে দেশীয় ২,৫৭,০০০ সৈনিকের সংখ্যা বিদ্রোহী সেনাদের আত্মবল বৃদ্ধি করে। তাই বিদ্রোহী সেনাদের সর্বাধিনায়ক বখত আলী খান এবং তার দুজন সহকারী শাহজাদা ফিরোজ শাহ ও মৌলভী আহমদউল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে বাহাদুর শাহকে গোটা ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করেন এবং ওয়াহাবীপন্থীদের বিদ্রোহে যোগদানের আহ্বান জানান। তারা সকলে ওয়াহাবী মতাদর্শী হওয়াতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী এতে শামিল হন এবং দিল্লির লালকেল্লা বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৫৭ সনের ২৯ মার্চ অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ১০০ বছর পর কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ সূচিত হয়। দেখতে দেখতে এ বিদ্রোহ দাবানলের মতো দিল্লি, রোহিলাখণ্ড, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ঝাঁসি, পাটনা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 'খালক্-ই-খুদা/মুলক্-ই-পাদশা/হুকুম-ই-সিপাহ্'– অর্থাৎ পৃথিবী ঈশ্বরের, সাম্রাজ্য বাদশাহর এবং নেতৃত্ব সিপাহিদের–এমন শ্লোগান উচ্চারণ করে বিদ্রোহী সিপাহিরা নির্বিচারে ইউরোপীয় অফিসার, সেনা ও তাদের স্বজনদের হত্যা করে। প্রথমে কোম্পানি এ আকস্মিক আক্রমণে বিচলিত হয়ে পড়লেও পরবর্তী সময়ে স্বভাবসুলভ ঠাণ্ডা মাথায় যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এবারও পুরস্কার, খেতাব ও সুযোগ-সুবিধার মোহে দেশীয় বিত্তবানশ্রেণি কোম্পানিকে পূর্ণ সমর্থন করে। ঢাকার জমিদার খাজা আবদুল গণি, ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী, চট্টগ্রামের কালিন্দী রানি, যশোরের রাজা বরকান্ত রায়, নোয়াখালীর যশোদা কুমার পাইন, রংপুরের রানি স্বর্ণময়ী, পাবনার বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী প্রমুখ কোম্পানিকে সাহায্য করে 'নবাব', 'রাজা' উপাধি এবং 'হাতি' উপহার পান। আর কলকাতা অঞ্চলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রানি রাসমনি, ঠাকুর, সিংহ, দত্ত, ঘোষ ও মিত্র বাবুরা দালালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এদের সহযোগিতায় কোম্পানি সরকার নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমন করেন। মুঘল শাহজাদাদের রক্তে লাল কেল্লা রঞ্জিত হয়। বয়োবৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। আর বিদ্রোহী হাজার হাজার

সেনাদের পাইকারিভাবে কোর্ট মার্শালে ফাঁসি, গুলি করে হত্যা, দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড দেয়া হয়। মঙ্গলপাণ্ডেকেও ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। তেমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা না ঘটলেও কেবল ঢাকাতেই বাহাদুর শাহ পার্কের (বর্তমান ভিক্টোরিয়া পার্কের) আন্টাঘরে এক প্রহসনের বিচারে মোট এগারো জনকে জনসম্মুখে ফাঁসি দেয়া হয়। আর কয়েকজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এরা হলেন– কাফুর খান, শেখ দীন আলী, হোসেন বক্স, দীনদয়াল মিশ্র, জীউলাল রাম, শঙ্কর রাম, আবদুল্লাহ খান, সুনজ সিং, নিরঞ্জন সিং, পীরবক্স ঢাকী, বলদেব রাম, প্রভু ওঝা, এলাহী বক্স, ধোবন সিং, রমজান খান ও রামরাজ সিং প্রমুখ। ঢাকার ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর মোট ১১৯ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ ছিল মুসলিম। তার মধ্যে আবার ৩ জন ছিল পাঠান।– [উৎস- রতন লাল চক্রবর্তী: *সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৩-১৪, ২৯, ১৫, ১২৪, ১২৬, ৫৯-৬০; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.): পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৮; আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৫]

৪৫. বিনয় ঘোষ : *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (কলিকাতা, ১৯৬৪); ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৭

৪৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : *সেই সময়* (ধারাবাহিক রচনা); দেশ পত্রিকা, সংখ্যা- ২৭, ১২ জানুয়ারি, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮

৪৭. ঈশ্বর গুপ্ত : *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ* (ঢাকা, ১৩৭৬), পৃ. ৩৩১, **দ্বৈতীয়িক উৎস**-আবুল কাসেম ফজলুল হক; পূর্বোক্ত; পৃ. ৭২

৪৮. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৩

৪৯. A.R. Desai: *Social Background of Indian Nationalism* (2nd ed. Bombay, 1954); P. 87- 88, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ৬২

৫০. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৩-৬৪

৫১. সমকালীন সরকারি স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণের বৈষম্যের চিত্র:

সন	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যধর্মীয় ছাত্র	মোট ছাত্র
১৮৪১	৩১৮৮	৭৫১	৯৫	৪০৩৪
১৮৪৬	৩৮৪৬	৬০৬	৮৫	৪৫৩৭
১৮৫১	৩৮১৪	৭৯৬	৬৪	৪৬৭৪
১৮৫৬	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	৭২১৬

উৎস- Report of the General committee of public Instruction; 1840-41, 1841-42, 1845-46-এর তথ্য অবলম্বনে। **দ্বৈতীয়িক উৎস**- আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২

৫২. বিনয় ঘোষ : *বাঙলার নবজাগৃতি* (কলিকাতা, ১৩৫৫); পৃ. ৪৭-৪৮, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৫

৫৩. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৫-৭১

৫৪. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৫-৬৯

৫৫. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩

৬৬. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩-৯৫

৫৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০২-১০৪

৫৮. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৫

৫৯. C.F. Andrew and Girija Mukharji : *The Rise and Growth of the Congress in India* (London; 1938), P. 49, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৬০. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৯-৮০

৬১. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮০-৮১

৬২. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮১

৬৩. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮২

৬৪. নূহ-উল-আলম লেনিন : *বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদ;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৮-৮৯

৬৫. মোহাম্মদ হাননান : *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* (১৮৩০ থেকে ১৯৭১); আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩০

৬৬. গৌতম চট্টোপাধ্যায়: *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ;* চারুপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মোহাম্মদ হাননান; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৬৭. Surendranath Benerjea: *Abul Kalam Azad: India Wins Freedom* (Calcutta, 1959), P. 4**, দ্বৈতীয়িক উৎস-** আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
৬৮. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৭
৬৯. সিরাজুল ইসলাম : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৫৮-১৫৯
৭০. সিরাজুল ইসলাম : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৫৯-১৭১
৭১. সিরাজুল ইসলাম : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭১
৭২. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩১
৭৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯০৫-১৯৪৭), চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৫, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** রফিকউল্লাহ খান: *বাংলাদেশের উপন্যাস:* বিষয় ও শিল্পরূপ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১
৭৪. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩২
৭৫. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৩-৩৭
৭৬. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭০-১৭১
৭৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭১
৭৮. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০৩
৭৯. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০৬
৮০. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০৬-২০৭
৮১. কামরুদ্দীন আহমদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*; স্টুডেন্টস পাবলিকেশন; ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ৪২, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** রফিকউল্লাহ খান; পূর্বোক্ত; পৃ. ২১
৮২. ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮
৮৩. কামরুদ্দীন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৯, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** রফিকউল্লাহ খান; পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৮৪. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম : *পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি*; ইস্টপাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ২ ও ১৫৭, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মোহাম্মদ হাননান; পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬
৮৫. সৈয়দ আজিজুল হক: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৭৮-২৭৯
৮৬. The Report of famine enquiry commission Under Sir John Wodhed; ৫ম খণ্ড, ১২৭৪, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** ইনাম-উল হক; পূর্বোক্ত; পৃ. ২১২
৮৭. পূর্বোক্ত; পৃ. ২১২
৮৮. সৈয়দ আজিজুল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭৯
৮৯. আবুল মনসুর আহমদ : *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*; খোশারাজ কিতাব মহল, ঢাকা, পৃ. ২৩৭-২৩৮; **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মুহাম্মদ ইনাম-উল হক; পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২
৯০. ‘দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান-চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।...তিনি (সোহরাওয়ার্দী) রাতারাতি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুললেন। কন্ট্রোল দোকান খোলার বন্দোবস্ত করলেন। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লিতে যেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন। চাল-আটা ও গম বজরায় করে আনতে শুরু করলেন। ইংরেজের কথা হল, বাংলার মানুষ মরে মরুক, যুদ্ধের সাহায্য আগে।...যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না।...সেই বাংলায় এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মায়ের দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলে-মেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলে-মেয়েকে বিক্রির চেষ্টা করছে। কিন্তু কেউ কিনতে রাজি হয় না।’– [উৎস- শেখ মুজিবুর রহমান: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭-১৮]
৯১. বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২-৪৩
৯২. বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৩

৯৩. বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬০

৯৪. বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬২ ও ৮৫

৯৫. সৈয়দ আজিজুল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৯৯-৪০০

৯৬. এম.এ রহিম: *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮-৯

৯৭. Joya Chattarji: *Bangla Divided: Hindu Communialism and Partition 1932-1947*; Cambridge University press, Cambridge, 1994, p.224, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মহিউদ্দিন আহমদ: *আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০)*; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৭

৯৮. কামরুদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭০, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮

৯৯. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক: পূর্বোক্ত; পৃ. ২১৭

১০০. মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ: *আমাদের মুক্তিসংগ্রাম*; পৃ. ৩৬২, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

১০১. হিন্দু-মুসিলম যৌথ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা যায়– জানুয়ারিতে সেনা অত্যাচারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের লক্ষ জনতার শোভাযাত্রা, কোলার সোনার খনিতে বিশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট; ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বেতে নৌসেনাদের ধর্মঘট এবং তার সমর্থনে বোম্বেতে তিন লক্ষ শ্রমিকের, মাদ্রাজে বিমান সেনাদের ও ত্রিচীতে এক লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট; মার্চে জব্বলপুরে নৌসেনাদের অনশন; বোম্বেতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট, মুলুন্দ শিবিরে বন্দি নৌসেনাদের অনশন, দিল্লি ও এলাহাবাদে পুলিশের অনশন, বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট, নারায়ণগঞ্জ সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট;এপ্রিলে বিহারে দশ সহস্র পুলিশের ধর্মঘট, বোম্বেতে ধাঙ্গড় ধর্মঘট; মে মাসে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট; জুলাইতে সারা ভারতে ডাক ধর্মঘট এবং এর সমর্থনে চার লক্ষ শিল্পশ্রমিকের প্রতীকী ধর্মঘট ও কলকাতাসহ শহরতলির চল্লিশ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সর্বাত্মক হরতাল ও ধর্মঘট পালন প্রভৃতি।- [উৎস- অমলেন্দু সেনগুপ্ত: *উত্তালচল্লিশ–অসমাপ্ত বিপ্লব*; কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১৭৩-১৭৫, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- সৈয়দ আজিজুল হক; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫]

১০২. অমলেন্দু সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১৯, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- সৈয়দ আজিজুল হক; পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪৪

১০৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৭, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- সৈয়দ আজিজুল হক; পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫১

১০৪. সৈয়দ আজিজুল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫১

১০৫. ‘খুব সম্ভবত ইংরেজ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিব্রত থাকায় ভেদনীতির খেলাটা তেমন জমিয়ে খেলতে পারেনি। ৪৬-এর ক্ষমতা প্রাপ্তির দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দাঙ্গা ঘটে কলকাতা- নোয়াখালী-বিহার-পাঞ্জাব-দিল্লিতে। কিন্তু প্রদীপ জ্বালার পূর্বে যেমন সলতে পাকানোর ব্যাপার থাকে, তেমনি কলকাতার দাঙ্গার পূর্বে কানপুর, আহমেদাবাদ ও ঢাকায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে এবং অনেকে হতাহতের শিকার হয়। তবে কলকাতার দাঙ্গা ছিল প্রত্যুত নরমেধযজ্ঞ। এ নরমেধযজ্ঞের সর্বাগ্রে মৃত্যুবরণ করেন শিয়ালদাহ এলাকার এক বাঙালি যুবক। এ দাঙ্গায় সর্বপ্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সহজলভ্য হয়ে ওঠা আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার হয়। ১৬ আগস্টকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা ‘লড়কে লেঙ্গে’ মানসিকতাকে আরো পুষ্টি সাধন করে। সকালবেলা লীগের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা জোর করে হিন্দুদের দোকানপাট বন্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং লালবাজার পুলিশের কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থেকে পুলিশের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিলেও দাঙ্গার ব্যাপকতা ও বীভৎসতা কমার বদলে বৃদ্ধি পায়। বিপুল পরিমাণ ধন-জন ক্ষয় ও নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বধর্মীয়দের এলাকায় স্থানান্তরের ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য, চারদিনের এই প্রাথমিক মারণ-যজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারে না এবং তাই দেশবিভাগ অপরিহার্য– এই মানসিকতারও বীজ বপন করা হয়।’ অথচ ‘প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের এ কর্মসূচিকে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার নির্দেশ দেন। কারণ গোলমাল হলে তাতে লীগ সরকারেরই বদনাম হবে। এজন্য তিনি ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। কিন্তু এতে কংগ্রেস ও হিন্দুসভা আরো ক্ষেপে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেও পুলিশ প্রশাসন যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি।’-[উৎস-শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: *দাঙ্গার ইতিহাস*; কলকাতা, ১৯৯২, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬২-৬৫ এবং শেখ মুজিবুর রহমান: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*; ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৬৩]

১০৬. Louis Fischer (ed.): *The Essential Gandhi*; Vintage books, New York, 1983, p.351-352, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মহিউদ্দিন আহমদ: পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯-২০

১০৭. Pamela Hicks: *Daughter of Empaire: Life As A Mountbatten*; London, 2012, p. 45

১০৮. জয়া চ্যাটার্জী: *দেশভাগের অর্জন: বাঙলা ও ভারত (১৯৪৭-১৯৬৭)*; প্রথম মাওলা ব্রাদার্স বাংলা অনুবাদ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২২

১০৯. জয়া চ্যাটার্জী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২২

১১০. অলি আহাদ :*জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ৭৫*; বাংলাদেশ কো-অপরাটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩১, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত; পৃ. ২২

১১১. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩৯

১১২. কামরুদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৮-৮১, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত; পৃ. ২০

১১৩. কামরুদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮২, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১

১১৪. Durga Das (ed.) : *Sardar Patel's Correspondence*: 1945-50 (vol. iv); Ahmedabad, 1972, p.43, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯

১১৫. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪১

১১৬. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪৩

১১৭. মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.) : *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*; সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৬-৬৭

১১৮. জয়া চ্যাটার্জী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৪-৪৬

১১৯. আবুল হাশিম : *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*; বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৬৫-১৬৬, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত; পৃ. ২২-২৩

১২০. মহিউদ্দিন আহমদ : আওয়ামী লীগঃ উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০); পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪

১২১. জয়া চ্যাটার্জী : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৮-১৩০

১২২. জয়া চ্যাটার্জী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৯

১২৩. অবিভক্ত ভারতের ১৭টি জাতীয় ইউনিট ছিল। যেমন- তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঠানস্থান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম।– [উৎস- মোহাম্মদ হাননানঃ পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩]

১২৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৬০-২৬১

১২৫. শেখ মুজিবুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৪-৭৫

১২৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৫

১২৭. Henry Frank Goodnow: *The Civil Service of Pakistan*; London, 1964, p. 24-30, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** সিরাজুল ইসলাম; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

১২৮. জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ছিল অস্থিতিশীল। ৪৭-এর ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শেষপর্যন্ত এ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ২১-এ উন্নীত হলেও পূর্বপাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন একজন নবাবজাদা। যিনি ভারত থেকে মোহাজের হয়ে করাচি যান এবং তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। ৪৮-এর সেপ্টেম্বরে জিন্নাহর আকস্মিক মৃত্যু হলে গভর্নর জেনারেল হন খাজা নাজিমুদ্দিন। আঁততায়ীর গুলিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যু (১৯৫১) হলে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার (৫১-র ১৯ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন আর গভর্নর জেনারেল হন পাঞ্জাবের গোলাম মোহাম্মদ। তাঁর ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় মাত্র ৫ জন ছিলেন পূর্বপাকিস্তানি। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে তৃতীয় মন্ত্রিসভার (১৭ এপ্রিল ১৯৫৩) ১৩ সদস্যের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানি ছিল মাত্র ৪ জন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বেই চতুর্থ মন্ত্রিসভা (৫৪-র ২৪ অক্টোবর) গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী ও এম.এ.এইচ ইস্পাহানীকে পূর্ব পাকিস্তানি হিসেবে দেখানো হলেও পূর্ববাংলার প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র ৪ জন। কিন্তু এ মন্ত্রিসভাতেই পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে এক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়। রাজনীতিতে সেনাকর্মকর্তারা ক্ষমতার হিস্যা দাবি করায় মন্ত্রিসভায় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও মেজর জেনারেল আইয়ুব খানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় যোগদান করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পঞ্চম মন্ত্রিসভার (৫৫-র ১১ আগস্ট) ১৬ সদস্যের মধ্যে ৭ জন ছিলেন পূর্বপাকিস্তানি। এ মন্ত্রিসভাতেও শেরে বাংলা ফজলুল হক যোগদান করে আরেক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। কারণ এ মন্ত্রিসভার অনেক জাদরেল মন্ত্রীই অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলার শাসনামলে সাধারণ মন্ত্রী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ষষ্ঠ মন্ত্রিসভা (৫৬-র ১২ ডিসেম্বর) গঠিত হলে পূর্বপাকিস্তানি হিসেবে ৭ জন স্থান পায়। এসময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী তথা পূর্বপাকিস্তানিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। তাই এ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব হয় মাত্র এক বছর এক মাস। আই.আই.

চুন্দ্রিগড়ের নেতৃত্বে সপ্তম মন্ত্রিসভা (৫৭-র ১৮ অক্টোবর) গঠিত হলে এতে ৬ জন পূর্বপাকিস্তানি স্থান পান। মালিক ফিরোজ খান নূনের নেতৃত্বে গঠিত অষ্টম মন্ত্রিসভার (৫৭ সনের ১৬ ডিসেম্বর) ২৮ জনের মধ্যে ১২ জন ছিলেন পূর্বপাকিস্তানি। তিনিই ছিলেন পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী।– [উৎস- মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.): পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৯-৬৩]

১২৯. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৩-১৩৪

১৩০. মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্প.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৯

১৩১. পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের শতকরা হার:

ভাষার নাম	জনসংখ্যার শতকরা হার	ভাষার নাম	জনসংখ্যার শতকরা হার
বাংলা	৫৬.৪০	পশতু	৩.৪৮
পাঞ্জাবি	২৮.৫৫	সিন্ধি	৫.৪৭
উর্দু	৩.২৭	ইংরেজি	০.০২
বেলুচি	১.২৯	অন্যান্য	১.৫২

উৎস: মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান; পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৫

১৩২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৩৭-৩৬৩

১৩৩. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪৭

১৩৪. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৬৫-১৬৭

১৩৫. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৮-৪৩

১৩৬. মহিউদ্দিন আহমদ: পূর্বোক্ত; পৃ. ৬২-৬৪

১৩৭. মোহাম্মদ হাননান: পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৫

১৩৮. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৬

১৩৯. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৩

১৪০. মোহাম্মদ হাননান: পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৮-১৯৯

১৪১. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৫-৯৬

১৪২. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫৬-৩৫৯

১৪৩. মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম.এন. রায়ের (প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি (ডিসেম্বর ১৯২১) গড়ে ওঠে। এ কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক সমিতির মাধ্যমে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। আবার তিরিশ ও চল্লিশ দশকের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও মেদিনীপুর বিকল্প সরকার গঠনেও এ পার্টির তৎপরতা ও কার্যক্রম ছিল প্রশংসনীয়। ভারতবিভক্তির পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে 'পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' (৪৮-এর ৬ মার্চ) গঠিত হয়। পার্টির সদরদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়াতে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবেই কাজ করে। এরা বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বি.টি রনদীভে-র সংগ্রামী লাইন অনুসরণ করে। এর ধারাবাহিকতায় এ পার্টির নেতৃত্বে নাচোলের কৃষক আন্দোলন (১৯৪৯-৫০) ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনকে দমন করতে পাকিস্তান সরকার (৫০-এর জানুয়ারি) বর্বর হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করে। হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার, ভয়াবহ জেলজুলুম চালানো হয়। এ আন্দোলনের নেত্রী কৃষকদের 'রানি মা'খ্যাত ইলা মিত্রের ওপর পাকিস্তানি পুলিশ যে-পাশবিক নিপীড়ন চালায়, তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানায়। জেলবন্দি অবস্থায় ইলা মিত্রকে পুলিশ গণধর্ষণ করে, পায়ে পেরেকবিদ্ধ করে এবং যোনিপথে গরম ডিম ভরে দেয়। আবার ১৯৫০ সনের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়াওয়ার্ডে পুলিশ বেপরোয়াভাবে গুলি করে সাত জন কমিউনিস্ট বন্দিকে হত্যা করে। এতে বত্রিশ জন গুরুতর আহত হয়। এ পার্টির বহু নেতা-কর্মী হিন্দু থাকায় এরা স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানি সরকারের রোষানলে পড়ে। তাই পাকিস্তানে প্রথমবার ৫৪-র ২৩ জুলাই এবং দ্বিতীয়বার ৫৫-র জুলাইতে এ পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে অধিকাংশ নেতাকর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান এবং গুপ্তভাবে কর্মকাণ্ড চালাতে থাকেন। মেহনতি কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব ঠেকাতে পুঁজিপতি মুসলিম লীগ উঠেপড়ে লাগে। তাই দেখা যায়, ভারতে যেমন কংগ্রেসবিরোধী মুসলিম লীগ নিষিদ্ধ হয়নি, তেমনি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়নি লীগবিরোধী কংগ্রেস। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রেই নিষিদ্ধ করা হয় কমিউনিস্ট পার্টি। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কতিপয় নেতাকর্মী প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগে সম্পৃক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে ভাসানীর ন্যাপ (১৯৫৭) প্রতিষ্ঠিত হলে এরা এর ছত্রছায়ায় চলে আসে। আদর্শিক মিল থাকায় এ পার্টিতে আত্তীকরণের মাধ্যমে নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, অনিল মুখার্জী, শহীদুল্লা কায়সায়, সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আমজাদ হোসেন ও কুমার মৈত্র প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিকে উজ্জীবিত করে তোলেন। কিন্তু ৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তান চীনকে সমর্থন দেবার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি চীনপন্থী ও সোভিয়েতপন্থী নামক দুটি ধারায়

বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে পাকিস্তানের ৬৫-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও। আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে এসময় (১৯৬৭) ন্যাপ বিভক্ত হয়ে মস্কোপন্থী মোজাফফর ন্যাপ এবং চীনপন্থী ভাসানী ন্যাপের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এতে লাভবান হয় জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের এ বিভাজনের প্রভাব পড়ে ছাত্র ইউনিয়নে। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই সহযোগী ছাত্রসংগঠনরূপে 'পূর্বপাকিস্তান' ছাত্র ইউনিয়ন (৫২-র ২৬ এপ্রিল) গড়ে উঠেছিল। এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর কৃষক নেতা হাজী দানেশ গঠন করেন গণতন্ত্রী দল। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ ও হায়দার আকবর খান রনো কমিউনিস্ট পার্টির তোয়াহার লাইন অনুসরণ করেন। কিন্তু মোহাম্মদ ফরহাদসহ অনেকেই এ সমর্থনের বিরোধিতা করেন। অবশেষে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে (৬৫-র ১-৩ এপ্রিল) মস্কোপন্থী মতিয়া গ্রুপ এবং চীনপন্থী মেনন গ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ৬৫-র ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে এবং মস্কো ভারতকে সমর্থন দিলে এদেশের চীনপন্থী ও মস্কোপন্থীদের মধ্যে আদর্শিক দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। এভাবে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের বিভক্তির ফলে পূর্ব বাংলায় বামধারার রাজনীতি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭) ও সর্বহারা পার্টির প্রভাবে 'শ্রেণিশত্রু খতম' লাইনের রাজনীতি এদেরকে জনগণ থেকে ক্রমশই দূরে ঠেলে দেয়। মাওলানা ভাসানীর ৭০-এর নির্বাচন বয়কট করার হঠকারী সিদ্ধান্তে রাজনীতির মাঠ থেকে এরা ছিটকে পড়ে। এ সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। বহু সম্ভাবনা থাকার পরেও নিজেদের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব, বিভাজন, হঠকারী রাজনৈতিক লাইন, বিশ্ব বামরাজনীতির প্রভাব ও দেশীয় সরকারের ধর্মীয় রাজনীতির রোষানলে পাকিস্তানের বামরাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।– [উৎস- মোহাম্মদ হাননান: পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৬; মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.): পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৪-৮৫; মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী: *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ: সমকালীন রাজনীতি ও ইলামিত্র*; উত্তরণ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩৩-১৫২; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ১৯৪৭: ট্রাজেডির অগ্রপশ্চাৎ; দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১১ আগস্ট ২০১৭, পৃ. ১-২;]

১৪৪. মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬২

১৪৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯৪

১৪৬. মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৯

১৪৭. মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪৮-১৪৯

১৪৮. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৩

১৪৯. মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪৯-১৫০

১৫০. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭২

১৫১. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭৭-২৭৮

১৫২. মোস্তফা দৌলত *(অনূদিত)*: *কুদরতউল্লাহ শেহাবের ডায়েরী*; শৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩১-৩২; **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৫৩. গোলাম আযম: *জীবনে যা দেখলাম* (৩য় খণ্ড); কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪০-৪২, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৫৪. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১২৯-১৩০

১৫৫. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯১

১৫৬. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩২

১৫৭. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩১৫-৩১৭

১৫৮. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩২-১৩৩

১৫৯. রেহমান সোবহান : *বাংলাদেশের অভ্যুদয়*: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য; প্রথমা প্রকাশন, পরিবর্ধিত প্রথমা সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৪-৩৯

১৬০. পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্যের খতিয়ান:

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২

১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস- রেহমান সোবহান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৬

১৬১. রেহমান সোবহান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩১ ও ৫৮

১৬২. হারুন-অর-রশিদ : *আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা'র ৫০ বছর*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৫

১৬৩. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৫৬

১৬৪. Craig Baxter (ed.): Diaries of Field Marshal Mohammed Ayub Khan (1966-1972); Oxford University Press, Karachi, 2008, P. 422, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭১

১৬৫. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮৩

১৬৬. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭০-৩৭৭

১৬৭. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

১৬৮. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭৮

১৬৯. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৪-১৯৫

১৭০. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০২-২০৫

১৭১. হারুন-অর-রশিদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬০-৬১

১৭২. বিভিন্ন খাতে দুই পাকিস্তানের পর্বতসমান বৈষম্যের চিত্র (৭০-এর নির্বাচনে ব্যবহৃত আওয়ামী লীগের প্রচারণা-পোস্টার):

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?		
বৈষম্য বিষয়	**বাঙলাদেশ**	**পশ্চিম পাকিস্তান**
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
স্বর্ণ ভরি প্রতি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

উৎস- মহিউদ্দিন আহমদ: পূর্বোক্ত; পৃ. ২১৭-২১৮

১৭৩. হারুন-অর-রশিদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬১-৬২

১৭৪. মহিউদ্দিন আহমদ : *আওয়ামী লীগ: যুদ্ধদিনের কথা* ১৯৭১; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২২-২৮

১৭৫. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪১-৪২

১৭৬. হারুন-অর-রশিদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬২-৬৩

১৭৭. রেহমান সোবহান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৮

১৭৮. মঈদুল হাসান : *মূলধারা* ৭১; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ১৪৯

১৭৯. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৫-৬৬

১৮০. অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) : *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*- চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৮-১৯

১৮১. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৪

১৮২. অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) : *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*- চতুর্থ খণ্ড (তৃতীয় পর্ব); পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৩৬-৩৩৮

১৮৩. মঈদুল হাসান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭৪-১৭৫

১৮৪. Lt. Gen. Kamal Matinuddin: *Tragedy of Errors: East Pakistan Crisis 1968-1971*; Lahore, p. 434-435, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪৫-১৫৫

১৮৫. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪৫

১৮৬. মঈদুল হাসান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৮-২০১

১৮৭ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ; ২ লক্ষের অধিক নারী ধর্ষণের শিকার হয়। পাকিস্তানের নিহত সৈন্যের সংখ্যা ৫৮৬৬ জন; বন্দি হয় ৯০,৩৬৮ জন। ভারতের নিহত সৈন্যের সংখ্যা ১৪২১ জন এবং আহত হয় ৪০৫৮ জন এবং নিখোঁজ হয় ৬৩ জন।– [উৎস- মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪৭]

১৮৮. পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোড়াতেই গলদ ছিল। জিন্নাহকে বলা হতো 'জাতির পিতা'। আবার তার বোন ফাতেমা জিন্নাহকে বলা হতো 'মাদার মিল্লাত বা জাতির মাতা'। এরা আপন দুই ভাই-বোন হয়েও জনগণের কাছে ছিলেন পিতা-মাতা। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত– 'পাকসার জমিন সা'দ বাদ' এটি ছিল ফারসি ভাষায় রচিত। অথচ পাকিস্তানি শাসকদের পছন্দের রাষ্ট্রভাষা ছিল উর্দু। আবার সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' করা হয় এবং কোনো অমুসলিমকে রাষ্ট্রপ্রধান করার বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অথচ জিন্নাহর পূর্ব-পুরুষরা মুসলমান ছিলেন না। জিন্নাহর দাদা ছিলেন কর্ণাটকের ধর্মান্তরিত মুসলিম। জিন্নাহ ব্যক্তিজীবনেও ধার্মিক ছিলেন না। তিনি পাশ্চাত্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন পারসিক অগ্নি উপাসক রতনবাঈকে। তার মেয়ে দিনা জিন্নাহ বিয়ে করেন পার্সিয়ান নেভিল ওয়াদিয়াকে। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বিয়ে করেন একজন খ্রিষ্টান নারীকে। ফিরোজ খান নূনও বিয়ে করেছিলেন খ্রিষ্টান ভিকারুন্নিসাকে। ফিরোজ খান নূনের ছেলেও বিয়ে করেন একজন আমেরিকান নারীকে।সোহরাওয়ার্দীর স্ত্রীও ছিলেন একজন রাশিয়ান। জিয়াউল হকের মা ছিলেন কাদিয়ানী। ভুট্টোর মা ছিলেন একজন অগ্নিউপাসক। ইস্কান্দার মির্জা ছিলেন বিতর্কিত মীর জাফরের বংশধর। আর শেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নারী, মদ ও নাইটক্লাবে আসক্ত ছিলেন। নিজেরা ধার্মিক না হয়েও এরা সবাই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেছেন।– [উৎস- মোহাম্মদ হাননান: পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩১-৭৩২]

১৮৯. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ২২৮-২২৯

১৯০. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৮

১৯১. মঈদুল হাসান : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৫-১৯৬

১৯২. আনোয়ার-উল আলম : *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৭

১৯৩. মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪,পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৭ ও ১৩৫

১৯৪. আহমদ ছফা: *যদ্যপি আমার গুরু*; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,১৯৮৮, পৃ. ৭৩, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মহিউদ্দিন আহমদ; পূর্বোক্ত; পৃ. ১০১

১৯৫. আনোয়ার-উল আলম : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১৯

১৯৬. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৪

১৯৭. আনোয়ার-উল আলম : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪২-১৪৩

১৯৮. আনোয়ার-উল আলম : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৫৮-১৭৯

১৯৯. মহিউদ্দিন আহমদ : *বিএনপি: সময়-অসময়*; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯২-৯৩

২০০. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৪ ও ১৫৬

২০১. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১২ ও ১৫৬

২০২. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৯

২০৩. মওদুদ আহমদ : *চলমান ইতিহাস: জীবনের কিছু সময় কিছু কথা*; ইউপিএল, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৮৬, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মহিউদ্দিন আহমদ; *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪০

২০৪. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৫২-১৫৪

২০৫. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮৬-১৮৭

২০৬. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৭-২০০

২০৭. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০০-২০৩

২০৮. মহিউদ্দিন আহমদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৬-২১০

২০৯. মোহাম্মদ হাননান : *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: এরশাদের সময়কাল*; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ১৮-২০

২১০. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১০-২১৫

২১১. আকবর আলি খান : *পরার্থপরতার অর্থনীতি*; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫-১৬

২১২. আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য*; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

শওকত আলীর মানসগঠন ও শিল্পিসত্তার স্বরূপ

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধিৎসার আগ্রহ, সংবেদনশীল মানসিকতা এবং অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো সৃষ্টিশীল প্রতিভার সঙ্গে সময়-সমাজ-ইতিহাসচেতনার সুসমন্বয় ঘটলে সেই শিল্পিমানস সার্থকতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। সময়-সমাজ ও সাহিত্য-শিল্পীর সমবায়েই মহৎ সাহিত্যের বিনির্মাণ ঘটে। এসবের আন্তঃসম্পর্ক পরস্পর বিপ্রতীপ নয় বরং পরিপূরক। তাই সাহিত্য শুধু যুগ, জগৎ ও জীবনের দর্পণ বা দলিল-ই নয়, একই সঙ্গে ভাব-কল্পনা-আবেগ-অনুভূতির নান্দনিক অভিব্যক্তির মাধ্যমও হয়ে ওঠে। একজন সাহিত্যিক যেমন সময় ও সমাজের রূপকার, তেমনি জীবনের অনুকারকও বটে। সমাজদ্রষ্টা ও সংবেদশীল ব্যক্তি হিসেবে একজন সাহিত্যশিল্পি জীবনে যা অনুভব করেন এবং সমাজ- প্রতিবেশে যা প্রত্যক্ষ করেন; তার-ই প্রতিচ্ছবি সাহিত্য-সম্ভারে বাণীমূর্তি লাভ করে। তাই যুগ-জীবন, যুগ-জিজ্ঞাসা ও যুগ-যন্ত্রণা শিল্পি মানসের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ কারণে সাহিত্য যে-বিষয় নিয়েই রচিত হোক না কেন, তাতে লেখকের যুগ-জীবন, সমাজ, প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার চিত্র ধরা পড়বেই। তাই সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, সহজাত ও শাশ্বত। এ কারণে সৃষ্টি-সমকালীন জীবনস্রোত ও সমাজপ্রবাহের সঙ্গে শিল্পিসত্তার জারণ-বিজারণজাত নিবিড় প্রতিচ্ছবি সকল সার্থক সৃজনকর্মেই বিম্বিত হয়ে ওঠে। এ কথাগুলো উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ উপন্যাস মাত্রই সমকালীন জীবনবাস্তবতা ও বৈচিত্র্যকে অন্তর্গত সত্তায় ধারণ করে তার শিল্প-আঙ্গিকের শক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্যের পরিচয় দেয়। এমন দায়ভার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের অগাস্টান যুগে (১৭০০-১৭৪৫ খ্রি.) এক শক্তিশালী শিল্প-আঙ্গিক (art-form) হিসেবে উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে।[১] সমকালীন গোটা ইউরোপের ক্রমজটিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে-বুর্জোয়া মানবতাবাদী শক্তির উদ্ভব ঘটে, সে-শক্তিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয় এ বিশিষ্ট সাহিত্য-আঙ্গিকের। সমাজবিবর্তনের ক্রমধারায় এ সাহিত্যশৈলী ধারণ করে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত সমাজজীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী সমস্যা ও তার সমাধানপদ্ধতি। যার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে প্রবহমান সময় ও সমাজ-অন্তর্গত জীবনের রূপকল্প এবং মানুষের আনন্দ-বেদনার অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি।[২] এদিক থেকে উপন্যাস যুগশিল্প বিশেষ। ইতিহাসের বিচারেও আধুনিককালের সাহিত্যের প্রধান ও শক্তিশালী শাখায় পরিণত হয়েছে এ উপন্যাস। কেননা উপন্যাস সর্বগ্রাহী এক শিল্প মাধ্যম। তাই একজন ঔপন্যাসিক সময়শাসিত সমাজ ও মানুষের বিচিত্র ভাঙচুর, চড়াই-উৎরাই, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আনন্দ-বেদনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষারূপ দিতে সক্ষম হন। এ জন্যই–

> 'The novelist has been quicker than the poet or the philosopher to borrow their spcialities, than they have to borrow his.'[৩]

এভাবে একজন সৃজনশীল ঔপন্যাসিক সর্বত্রচারী হয়ে ওঠেন। কারণ এ উপন্যাসের সঙ্গেই জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যার ফলে একজন মানুষের সমগ্রজীবনকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাব্যরস-নাট্যগুণ সমন্বিত করে বিনির্মাণ করা যায়। অর্থাৎ জীবন যেমন, তাকে ঠিক তেমনভাবে উপন্যাসে রূপদানের অবাধ সুযোগ পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে হেনরি জেমস তাঁর সুবিখ্যাত *Art of Fiction* প্রবন্ধে যা বলেছেন, তা এ পর্যায়ে স্মরণযোগ্য–

> 'As people feel life, so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel.'[৪]

জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা রূপায়ণে উপন্যাসশিল্পের রয়েছে অনিঃশেষ প্রাসঙ্গিকতা। কেননা যে-সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া মানবতাবাদী শ্রেণির হাতে উপন্যাসের উদ্ভব; এর বিদ্রোহ ও অবস্থান এ পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধেই। জন্মলগ্ন থেকেই এ স্ববিরোধিতা,শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের কারণেই উপন্যাস শিল্পে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। এ যুগেই প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনাচরণকে জীবনাদর্শ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। যার ফলে ঔপন্যাসিকেরও গুরুদায়িত্ব হয়ে ওঠে এসকল শ্রমজীবী কর্মিষ্ঠ বহুমুখী প্রত্যয়বাদী সাধারণ মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা।[৫] ফলে শিল্পবিপ্লব-উত্তর গতিময় অথচ ক্রমজটিল ও যান্ত্রিক জীবনাচরণের ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে অনিবার্য হয়ে ওঠে anti-plot, anti-hero, anti-time শিল্প-আঙ্গিকের। যেহেতু চলমান সময় ও সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত হয়েই উপন্যাস-শিল্পের উদ্ভব, সেহেতু উপন্যাস-শিল্পে অন্তর্ভুক্ত হয় দেশ-কাল-ইতিহাস-সমাজ-সভ্যতার অন্তর্গত ভাবসত্য। সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই উপন্যাসস্থিত বিষয়রূপেরও ঘটে পরিবর্তন। একজন ঔপন্যাসিক এ পরিবর্তনের দ্বন্দ্বময় রূপচিত্র তাঁর উপন্যাসে চেতন-

অবচেতনে উপস্থাপন করেন। তিনি-ই সার্থক ঔপন্যাসিক, যিনি সময় ও সমাজ ধারণায় বিজ্ঞানমনস্ক; static নন বরং dynamic.[৬] উপন্যাস তাই সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্তিচিহ্নিত, সমকালতাড়িত, আধুনিক মনস্তত্ত্বব্যঞ্জিত এক জীবনশিল্প। বিপুল রাষ্ট্রীয়-সামাজিক সংঘাত, ভাঙচুর কিংবা ব্যক্তিজীবনের অতৃপ্তিজনিত যন্ত্রণা তথা আধুনিকতম জীবনভাবনার ফসল এই উপন্যাসকে জীবনের বিশ্বরূপদর্শনের অখণ্ড দর্পণও বলা যায়। জীবনঘনিষ্ঠ আখ্যান, যন্ত্রণাসুদ্ধ চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা, ভাষার চমৎকারিত্ব এবং প্রাকরণিক পরিচর্যার ব্যঞ্জনায় অখণ্ড জীবনবীক্ষা কিংবা বাস্তব-উপযোগী মানবতাবাদের ইঙ্গিতদান–এসবই একটি সার্থক উপন্যাসের জন্য অনিবার্য শর্ত।[৭] অর্থাৎ বিরাট ক্যানভাসে অখণ্ড জীবনের দ্যোতনাসৃষ্টি অথবা বলা যায়, নেতি-অস্তি বা অশুদ্ধ-শুদ্ধ সত্তার সমন্বয়ে জীবনের আকাঁড়া বাস্তবতাকে উপস্থাপনই উপন্যাসের স্বভাবধর্ম। এভাবেই সাহিত্যের আধুনিকতম, সর্বগ্রাহী এ শাখাটিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। এ ব্যাখ্যাসূত্রেই আলোচ্য শিল্প-আঙ্গিকের রচয়িতার মানস-আত্মীয়তার নিবিড়তাও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রতীতি নির্বাচনে নিপুণতা এবং তার বিন্যাসের আভ্যন্তর-ছন্দে জীবনের চিরন্তন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি– এই উভয় ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিত্ব বলতে তথা শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮] এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, লেখকের ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত তার সামগ্রিক জীবনদর্শন এবং বোধ-বিশ্বাসকেই বোঝানো হয়। তাই উপন্যাসে বিম্বিত জীবন ও সমাজসত্যের অখণ্ড বৃত্ত উপস্থাপনার শর্ত হিসেবে লেখক বা স্রষ্টার মানসভূমির প্রকৃত পরিচয় জানাও অবশ্য জরুরি।

শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮ খ্রি.) উপন্যাসে রূপায়িত সমাজচেতনা ও জীবনবাস্তবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য লেখকের মেধা-মনন-ধীশক্তি, অনুপ্রেরণার উৎস, অভিজ্ঞতার চারণভূমি এবং জীবন-পরিসীমার প্রেক্ষাপটে সমাজ-সংগঠনসমূহের বিচিত্রমুখী অভিঘাতের মর্মোদ্ঘাটন আবশ্যক। কারণ ব্যক্তিমনের চিন্তা, অনুভূতি, বোধ-বিশ্বাস, কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা প্রভৃতি নিবিড়ভাবে সমাজসংলগ্ন। শওকত প্রতিভার শক্তি, স্বাতন্ত্র্য, বিস্তার ও বৈচিত্র্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টির প্রশ্নটিও মীমাংসা হওয়া জরুরি। কারণ ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমকালের অভিঘাত, পারিবারিক প্রতিবেশ, অধীতবিদ্যা, ব্যক্তি-সান্নিধ্য এবং জন্মগত উত্তরাধিকারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একজন লেখকের জীবনমানস ও শিল্পদৃষ্টি।

পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

বাংলাসাহিত্যের প্রজপ্রতিম কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর জন্ম অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার উকিলপাড়ায়। শওকতের ভাষ্যমতে,

> ‘রায়গঞ্জ ব্রিটিশ আমলে বাংলা প্রদেশের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি থানা শহর ছিল। ১৯৪৭ সনে দেশভাগ হলে দিনাজপুর জেলাকে দুই ভাগ করা হয়। এর একটি অংশ পড়ে ভারতে, তার নাম দেওয়া হয় পশ্চিম দিনাজপুর। আরেক অংশ পড়ে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে, এর নাম দেওয়া হয় পূর্ব দিনাজপুর। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ হওয়ার পর এরশাদ-সরকার এই দিনাজপুরকে ভেঙে তিনটি জেলায় (দিনাজপুর ,পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) পরিণত করেন। শুনেছি ভারতের অংশ পশ্চিম দিনাজপুরকেও তারা দুই অংশে (দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর) বিভক্ত করেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশদের সেই দিনাজপুর এখন পাঁচ টুকরো হয়ে গেল। এর অর্থ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত বাস্তবতায় কত পরিবর্তন আসতে পারে– এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।’[৯]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবাষ্প ও তার খড়গাঘাতে ভারত বিভক্তির মতো এ দিনাজপুরও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এ বৃহত্তর দিনাজপুর এক সময় মহারাজার অধীন ছিল। শওকতের পূর্বপুরুষ ও বংশপরিচিতি সম্পর্কে তাঁরই অনুজ ডা. ওসমান আলী সরকার বলেন–

> ‘আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.) দিল্লি রাজপ্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক। শোনা যায় তিনি সাত-আট ফিট লম্বা ছিলেন এবং তার গায়ের রঙ ছিল দুধের মতো সাদা। আমাদের ধারণা তিনি আজারবাইজান অথবা তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। আমাদের পারিবারিক পির ছিলেন সৈয়দ বোরহান। স্থানীয় হিন্দুরা তাকে বলতেন ‘ব্রহ্মসাউধ’। অর্থাৎ সৈয়দকে ‘সাউধ’ আর বোরহানকে ‘ব্রহ্ম’। এ ‘সাউধ’-কে ‘সাধু’ বা ‘সওদাগর’ অর্থেও বোঝানো হয়। এর মূলে শুধু উচ্চারণের জট-ঝামেলার বিষয় জড়িত ছিল না; বরং বর্ণবাদী হিন্দুরা কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করে এরূপ উচ্চারণ করতো। এ পির সাহেব ঘোড়ায় চড়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরে শাসনামলে (১৬০৫-১৬২৮খ্রি.) আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। এ জন্য এলাকার সবাই তাকে ‘ঘোড়াপির’ বলতেন।’[১০]

এ রায়গঞ্জ প্রথমে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এ অঞ্চলে একচ্ছত্র দাপট ছিল জমিদার ও ব্রাহ্মণদের। সমাজে জমিদাররা ছিলেন সাধারণ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক এবং ব্রাহ্মণদের অবস্থান ছিল Next to God-এর মতো। সমাজে আয়ের উৎস ছিল একমাত্র ভূমিনির্ভর অর্থনীতি (Land-basis Economy)। অর্থাৎ ফসল ও খাজনা থেকে সামন্ত রাজা, জমিদার, জোতদার ও ভূস্বামীরা অর্থ পেতো। এমন সমাজব্যবস্থায় সম্রাট আকবরের শাসনামলে শওকতের পূর্ব-পুরুষেরা রায়গঞ্জে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাদের মাধ্যমেই এলাকায় মুসলমানদের আগমন, বসবাস ও ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটে। মুসলমান বাদশাহ ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে শওকতের পূর্ব-পুরুষেরা এ এলাকার প্রচুর জমি-জমা ও ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। আর 'প্রধানবাড়ি'[১১] হিসেবে এ বংশের প্রভাব-প্রতাপ ও পরিচিতির প্রসার ঘটে।

সওহর আলী প্রধান এবং গওহর আলী প্রধান নামে শওকতের পিতামহেরা দুই ভাই ছিলেন । সওহর ও গওহরের বাবা ছিলেন হাইদর ওরফে হায়দার আলী প্রধান। হাইদর প্রধানের বাবা ছিলেন সফদার আলী প্রধান। এদের বসবাস ছিল রায়গঞ্জের পার্শ্ববর্তী খোশালপুর এলাকায়। সওহর আলী মামা শেখ দরবার আলী প্রধানের একমাত্র মেয়ে মাহেজাবিন বেগমকে বিবাহসূত্রে খোশালপুর ছেড়ে রায়গঞ্জে এসে থিতু হন। দরবার শেখের কোনো ছেলে-সন্তান না থাকায় সহওরকে ঘরজামাই হয়ে রায়গঞ্জ মামার বাড়িতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়। মাহেজাবিন বেগম বা বেওয়াকে (ফারসি ভাষায় বেগমকে বেওয়া বলা হয়) স্থানীয় হিন্দুরা বিকৃত করে বলতো 'মহাজনি বিবি'। মাহেজাবিন বেগম দেখতে কালো হলেও বিদ্যা-শিক্ষায় যেমন ছিলেন পারদর্শী, তেমনি সংসার নৈপুণ্যে ছিলেন অসাধারণ। কারণ পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারেই তাকে আরবি, ফারসি, বাংলা শেখানো হয়। যাতে করে দলিল-দস্তাবেজ দেখা ও সাংসারিক হিসেব-নিকেশ পরিচালনা করতে পারেন। এ প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মতো মাহেজাবিনের জন্য বাড়ির অন্দরমহলে পড়ালেখার ব্যবস্থা করা হয়। মাহেজাবিন বেগম জীবিত থাকাবস্থায় সওহর আলী চিনিজান নামক এক বোম্বের বাইজিকে বিয়ে করেন।[১২] চিনিজান রায়গঞ্জে আসেন যাত্রাভিনয় করতে। তার রূপ-গুণ ও নাচ-গানের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে সওহর আলী চিনিজানকে বিয়ে করেন এবং তাকে মূল বাড়িতে না এনে পার্শ্ববর্তী খেকিপাড়ায় (বর্তমান নাম বিরনগর) বাড়ি করে দেন। পারিবারিক জোতদারি দেখাশোনা ছাড়াও সওহর আলী র‍্যালি ব্রাদার্স জুটমিলের (পাটের গাঁইট বাঁধার কারখানায়) ম্যানাজার ছিলেন। এতে বংশ ও বাড়ির পরিচিতি পায় 'প্রধানবাড়ি', 'ম্যানাজারবাড়ি' এবং পরবর্তীকালে 'সরকারবাড়ি' হিসেবে।[১৩] 'প্রধান' বলতে মূলত এলাকা বা গোত্রের কর্তাব্যক্তিকে কিংবা প্রধান ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। যেমন 'খান' বলতে গোত্রপ্রধান বা সর্দারকে বোঝায়। এ 'প্রধান' উপাধিটা বৌদ্ধ সমাজ ও ধর্ম থেকে এসেছে। এখনো জাপানে 'প্রধান' উপাধিধারী মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়।

সওহর-মাহেজাবিন দম্পতির দুই ছেলে এবং তিন মেয়ের জন্ম হয়। বড় ছেলে খোরশেদ আলী সরকার এবং ছোট ছেলে সিরাজউদ্দিন আহমদ (তিনি 'সরকার' পদবি গ্রহণ করেননি)। সওহর আলী আরবি-ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এবং রক্তে সামন্তস্বভাব মিশে থাকলেও ইংরেজদের জুটমিলে ম্যানাজারির চাকরিসূত্রে তিনি দূরদর্শী হয়ে ওঠেন। নিজেদের দান করা জমিতে রায়গঞ্জ থানা শহর প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ভাগ্যান্বেষণে আসা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু উকিল,ডাক্তার ও শিক্ষকদের মতো পেশাজীবীদের চোখের সামনে দ্রুত প্রভাব-প্রতাপ নিয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখে তার চিন্তাস্রোতে পরিবর্তন আসে। দূরদর্শী ও বাস্তববাদী সওহর আলী যুগের দাবিকে স্বীকার করে নিয়েই দুই ছেলেকে আধুনিক ইংরেজি-বাংলায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য নিজের জমিতে রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] ছোট ছেলে সিরাজউদ্দিন আহমদ পড়াশোনা শেষে BADC-তে চাকরি নেন। অথচ মায়ের বাড়তি আদর ও প্রশ্রয়ে বড় ছেলে খোরশেদ আলী সরকার মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা সংসারবিমুখ ও হুজুগে স্বভাবের হয়ে ওঠেন। তাছাড়া নবম-দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাবস্থাতেই তিনি কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজেকে একজন গান্ধীবাদী সৈনিক হিসেবে পুরোপুরি দীক্ষিত করেন। সমকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বিষবাষ্পীয় পরিমণ্ডলে তার এ সত্যাগ্রহ ও অহিংসার মত-পথ অবলম্বন করার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল নিঃসন্দেহে প্রাগ্রসর চেতনার ইঙ্গিতবাহী। পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অধীত বিদ্যার বৈপরীত্য, মুসলিম লীগ পরিহার করে কংগ্রেস দলে আস্থা স্থাপন এবং অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশায় বিদ্যমান পরাধীনতার গ্লানি– এ ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ্বে খোরশেদ আলী সরকার অন্তঃকরণে কিছুটা বিহ্বল, বিভ্রান্ত, সংসারবিমুখ ও

হুজুগে স্বভাবের হয়ে ওঠেন। ফলে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে তিনিও টেস্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা বর্জন করে চড়কা, মিটিং-মিছিল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হন। এ নিয়ে বাবা সওহর আলীর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন। বাবার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শওকত বলেন–

> ‘স্ব-ধর্মের প্রতি বাবার বিশেষ আস্থা ছিল না। আউল-বাউল, ফকির-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনাদর্শন তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। সেজন্য তিনি সন্ন্যাসীদের বেশ ধরে আলখাল্লা পরে প্রায়ই ভ্রমণে বের হতেন। একবার ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি রায়গঞ্জ থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলেন।...এলাহাবাদ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বিহার, উড়িষ্যা যান– কখনো হেঁটে, কখনো ট্রেনে চড়ে।’[১৫]

এভাবে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি একবার জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকেন। পথচারীরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে এবং সেখান থেকে টেলিগ্রাম আসায় সওহর আলীর গ্রাম্য বন্ধু ডা. জগদীশ সেনের তত্ত্বাবধানে খোরশেদ আলীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। ছেলের সুমতি ফিরিয়ে আনতে মা মাহেজাবিন বেগম তাকে বিয়ে করানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু খোরশেদ আলী বিয়ের পাত্রী বাছাইয়ে শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেন–‘মেয়েকে শিক্ষিত হতে হবে এবং মেয়ের বয়স ১৫-১৬ বছর বা তার বেশি হতে হবে।’[১৬] নিজের বিয়ের পাত্রী বাছাইয়ে এমন দুটি শর্ত জুড়ে দেবার মূলে খোরশেদ আলীর প্রগতিশীল চেতনা, উন্নত রুচিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় মেলে। কিন্তু তার এ মতামতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করতে অভিভাবকদের নাস্তানাবুদ হতে হয়। কারণ তৎকালে ১২-১৩ বছর বয়সেই অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হত। তাই কাঙ্ক্ষিত সেয়ানা ও শিক্ষিত পাত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীকালে রায়গঞ্জের ৮-১০ মাইল দূরবর্তী খোশালডাঙার জোতদার ওয়াদা মোহাম্মদের মাতৃহারা একমাত্র মেয়ে সালেমা খাতুনের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানীয় হিন্দুরা দেবনাগরি ভাষায় বিকৃত করে ‘ওয়াদা মোহাম্মদ সরকারকে’ বলতো ‘বদা মোহাম্মদ সরকার’।[১৭] মানুষ খেকো বাঘ ও কুমিরশিকারী ডাকসাইটে জোতদার ওয়াদা মোহাম্মদের একান্ত ইচ্ছে ছিল ভালো ঘরের কোনো ছেলের সঙ্গে মাতৃহীন মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখার। এভাবে পাত্র বাছাই করতে করতে মেয়ের বয়স বেড়ে যায়। এমন মেয়ের কথা শুনে খেয়ালি স্বভাবের খোরশেদ আলী নিজেই খোশালডাঙা চলে যান এবং আম পারতে থাকা সালেমা খাতুনকে দেখে তার পছন্দ হয়। কোনো সংকোচ না করে তিনিই বিয়ের প্রস্তাব করায় ওয়াদা মোহাম্মদ ও তার দুই ছেলে তাকে প্রথমে পাগল মনে করেন। পরে খোরশেদ আলীর গড়গড় করে ইংরেজি বলা, বাড়ি-ঘর-বংশের পরিচয় পেয়ে তাকে সমাদর করা হয় এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়।[১৮] ১৭ বছর বয়সের খোরশেদ আলী ১৫-১৬ বছরের সালেমা খাতুনকে বিয়ে করেন। তবে তিনি ঘরজামাই হিসেবে থাকেননি।

নতুন বউ সালেমা খাতুনের বয়স, শাড়ি পরার স্টাইল ও গহনার ডিজাইন নিয়ে লোকজন কটূক্তি করায় খোরশেদ আলী হতাশ হন। তবে মাহেজাবিন বেগমকে চিকিৎসা করতে আসা এক ইংরেজ ডাক্তারের কথা পরবর্তী সময় হুবহু বাড়ির মানুষদের কাছে ইংরেজিতে বলতে পারা এবং তার *গুলিস্তা, বোস্তা*, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, মীর মশাররফ হোসেনের বই পড়া ও সংগ্রহের কথা জেনে খোরশেদ আলী উজ্জীবিত হন।[১৯] সালেমা খাতুনকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করতে এক খ্রিষ্টান শিক্ষিকাকে ঠিক করা হয় । এ নিয়ে পরিবার ও সমাজে নানা কুৎসা ও চাপ বাড়লেও তিনি অনড় থাকেন। পরবর্তীকালে সালেমা খাতুন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করলে তিনি আরো উৎসাহী হন। তাই পরিবারের মতামতকে অগ্রাহ্য করে, কিছু জমি বন্ধক রেখে এবং বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে সস্ত্রীক শ্রীরামপুর যান। শ্রীরামপুরের *All India Textile Institiute*-এ স্ত্রী সালেমা খাতুনকে ভর্তি করেন এবং নিজেও হোমিওপ্যাথির HMB কোর্সে ভর্তি হন।[২০] এভাবে শওকতের পিতৃবংশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও পাশ্চাত্যশিক্ষায় শামিল হবার সুযোগ পায়। ফলে ক্রমশই ভূমিনির্ভর প্রধান পরিবার সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে চাকরির দিকে অগ্রসর হয়। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে খোরশেদ আলীর গ্রামসীমানা ত্যাগের ঘটনায় বংশানুক্রমিক বৃত্তির বলয় ভাঙা বা অতিক্রমণের সুযোগও সৃষ্টি হয়। শ্রীরামপুরে তিন বছরের ডিপ্লোমা করে সালেমা খাতুন স্পিনিং ও ডাইং-এর ওপর দুটি ডিগ্রি লাভ করেন। এখান থেকে তিনি বৃত্তিও পেয়েছিলেন। একবার কাটিহারের (বিহারে) এক সুচিকর্ম প্রতিযোগিতায় সালেমা খাতুন অংশগ্রহণ করে প্রথম হন এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি Singer সেলাই মেশিন পান। তিনি ঝাঁড়গ্রামের একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেন। আর খোরশেদ আলী HMB ডিগ্রি নিয়ে শ্রীরামপুরেই ‘সরকার ফার্মেসি’ খুলে প্র্যাকটিস শুরু

করেন। এ সময়ই তার কাছে প্রেসার মাপার আধুনিক মেশিন ছিল।[২১] মনে-প্রাণে আধুনিক ও প্রগতিশীল এ দম্পতি নিজেদের উদ্যোগ আর সাধনার দ্বারা সামন্তব্যবস্থার বলয় ভাঙতে সক্ষম হন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫)টালমাটাল পরিস্থিতি এবং কলকাতায় জাপানি সৈন্যদের বোমা ফেলার গুজবে খোরশেদ আলী সপরিবারে রায়গঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে এসেও সালেমা খাতুন স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং জোতদারির জৌলুস হারানো প্রধান বাড়ির হাল ধরেন। ঘরে বাইরের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি আসন্ন পতনকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। তবে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক হলাহলপূর্ণ রাজনৈতিক অভিঘাতে সবকিছু বেসামাল হয়ে পড়ে।

শৈশব কাল

শওকতেরা ছিলেন চারভাই ও তিন বোন। বড় ভাই মোহাম্মদ আলী সরকার। এরপর মর্জিয়ানা খাতুন ও সোফিয়া খাতুন নামে দুই যমজ বোনের জন্ম। নয় বছর বয়সে সোফিয়া অসুখে আক্রান্ত হয়ে কিছুটা বাক্‌প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। বাবা-মায়ের চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয় ছেলে হিসেবে শওকতের জন্ম। রাবেয়া খাতুন নামে তাঁর আরেক বোনের জন্ম হয়। কিন্তু শৈশবেই তার মৃত্যু ঘটে। এরপর ওসমান আলী সরকার ও আব্দুর রোউফ সরকার নামক দুই ভাইয়ের জন্ম হয়।[২২] শওকতের জন্মের সময় তাদের জোতদার পরিবারের জৌলুস অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। তাদের তিনটি পুকুর, তিনটি বাগান, দুটি খোলান বিশিষ্ট বিশাল বাড়িতে অন্দরমহল ও বাহিরমহল মিলিয়ে বহু মানুষের বসবাস ছিল। অন্দর মহলের পাকা ঘর, টিনের ঘর ও মাটির ঘরে শওকতেরা ভাইবোন, চাচা-চাচি, চাচাতো ভাই-বোন ও পড়াশোনার জন্য আসা ফুপাতো ভাই-বোনেরা মিলে বসবাস করতেন। আর বাহির মহলের বাংলো ঘরে অতিথিশালা, রাখাল-চাকরদের বসবাস, গরুর গোয়াল ও খোলানের ব্যবস্থা ছিল। দাদা সওহর আলী মারা যাবার পরপরই প্রধানবাড়ির জৌলুস কমতে থাকে। বাবা খোরশেদ আলী ও চাচা সিরাজউদ্দিনের বাউণ্ডুলে স্বভাব এবং বৈষয়িক বিষয়ে অনীহার কারণে দেনা ও মামলার দায়ে জোতগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে শওকতের দাদি মাহেজাবিন বেগমের তৎপরতায় তখনো কিছুটা আভিজাত্য বজায় ছিল। এতদ্বিষয়ে শওকতের বক্তব্য স্মরণযোগ্য–

> ‘আমাদের প্রতিবেশীরা অনেকেই বাইরের লোক।...তাঁরা আমাদের জমি পত্তন নিয়ে বাড়ি করেছেন। অর্থাৎ তারা আমাদের প্রজা হয়ে বসবাস করছিলেন। এরা প্রতিবছর খাজনা দিতেন। ৫ টাকা, ৬ টাকা, ৭ টাকা ছিল একেক জনের বার্ষিক খাজনা। আমার দাদা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মাইনে করা পেয়াদা, মুন্সী ছিল। তারা খাজনা আদায় করে আনতো।...দাদা মারা গেলে আমাদের আয়-উপার্জন কমে যায়। পেয়াদা, মুন্সী, কাজের লোক রাখার সামর্থ্য তখন আর ছিল না। দাদী তখন বাবাকে খাজনা আদায় করতে পাঠাতেন। বাবা যেতে চাইতেন না। তবুও বাড়ির কাছাকাছি অনেক জায়গায় দাদী নিজে গিয়ে অথবা লোক মারফত বাড়িতে ডেকে এনে খাজনা আদায় করতেন।’[২৩]

কিন্তু পরবর্তীকালে এ খাজনা আদায় করা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে। আবার আধিয়ারদের কাছে জমিবণ্টন , বীজসরবরাহ এবং ফসল বুঝে নেবার কাজটিও তদারকির অভাবে ব্যাহত হয়। ফলে ন্যায্য ফসল দিতেও আধিয়ারগণ নানা ছলচাতুরি শুরু করে। এমন পারিবারিক বিপর্যয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকালীন উত্তপ্ত পরিবেশে ১৯৩৬ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি শওকত জন্মগ্রহণ করেন। নিজের জন্মলগ্নের বিষয়ে শওকত জানান–

> ‘আমি যখন মায়ের পেটে তখন আইন পরিষদ (এম.এল.এ) নির্বাচন নিয়ে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এ.কে ফজলুল হক। আমার মা ফজলুল হকের খুব ভক্ত ছিলেন। আমার বাবা যদিও কংগ্রেস করতেন, সেবার ভোট দিয়েছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির এম.এল.এ কাদের বখস উকিলকে। নির্বাচনী হাওয়া আমাদের অখ্যাত- অজ্ঞাত রায়গঞ্জের মতো শহরেও পড়েছিল। রাস্তায় মিছিল করতে করতে জনতা স্লোগান দিত– ফজলুল হক দেশের ভাই, তাকে ভোট দেওয়া চাই। তখন ছিল জ্যোৎস্নালোকিত রাত। এমনি এক রাতে আমার জন্ম হয়।’[২৪]

চন্দ্রালোকিত রাতে জন্ম হওয়াতে শওকত আলীর মা তার এ দ্বিতীয় সন্তানের নাম রাখেন ‘চাঁদ’। আবার শোনা যায়, তাঁর মামা তাঁকে দেখতে এসে বোনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– ‘সালেমা, তোর কোলে দেখি চাঁদ নেমে এসেছে রে।’[২৫] তবে এ ডাকনাম রাখা প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্য-

> ‘বাড়ির সবাই আমাকে চাঁদ বলে ডাকত। মা রেখেছিলেন নামটা। আমার জন্মের আগে মা না কি স্বপ্নে দেখেছিলেন–জানালা দিয়ে তার পেটে ঢুঁকে যাচ্ছে চাঁদ। তো, ঐ চাঁদ নামটাই আমার পারিবারিক ডাকনাম। সবাই তা-ই ডাকতো।’[২৬]

শওকতের জন্মগ্রহণে তাঁর মা সালেমা বেগমের মতো বাবা খোরশেদ আলীও খুশি হয়েছিলেন। তিনি নবজাতকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– 'এই ছেলে একদিন আমাদের পরিবারের সবার মুখ চাঁদের মতো উজ্জ্বল করবে।'[২৭] কিন্তু স্বভাবে বাউণ্ডুলে বাবা খোরশেদ আলীর ছেলে সম্পর্কে এ ধারণা বেশিদিন বলবৎ ছিল না। কারণ রাবেয়া নামে শওকতের এক বোনের জন্ম হলে এবং শৈশবেই সে কলেরায় মৃত্যুবরণ করায় তিনি শওকতকে অলুক্ষণে ভেবে কুয়ার পার্শ্ববর্তী শালকচুর মাঝে ফেলে আসেন।[২৮] তবে শওকতের দাদি মাহেজোবিন বেগমের তৎপরতায় তাঁকে সেখান থেকে আনা হয় এবং তার ভর্ৎসনায় খোরশেদ আলী এমন কাজ আর কখনোই করতে সাহস পাননি। হুজুগে স্বভাবের খোরশেদ আলীর সমগ্রজীবন পর্যালোচনা করলে কতিপয় হঠকারী কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করা যায়। যেমন–

ক. বিয়ের পূর্বে একাধিকবার বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া।

খ. মেজো ছেলে শওকতকে অলুক্ষণে জ্ঞান করে শালকচুর মাঝে রাখা।

গ. ভবিষ্যৎ না ভেবে জেদের বশে ৪৮ সনে স্থানীয় এম.এল.এ পদের এক উপনির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে মুসলিম লীগের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হওয়া। নির্বাচনি প্রচার কাজে তিনহাজার টাকা ব্যয়ে উইলি জিপগাড়ি কেনা। পরে তা মাত্র সাতশত টাকায় বিক্রি করা [২৯]।

ঘ. নির্বাচনের পরাজয়কে মানতে না পেরে সপরিবারে আমেরিকা যাবার ব্যর্থ-উদ্যোগ।[৩০] স্ত্রীর পাকস্থলীতে ক্যান্সাররোগ ধরা পড়ায় আরো নিরাশ হওয়া।

ঙ. দেশভাগের বাস্তবতা না মেনে প্রতিকূল পরিবেশেও দীর্ঘ পাঁচ বছর সপরিবারে নির্যাতন ভোগ। এর প্রতিকারে থানা পুলিশ- এমপি মন্ত্রীদের কাছে ব্যর্থ দৌড়ঝাঁপ পেরে স্থানীয়দের ক্ষেপিয়ে তোলা।[৩১]

চ. সর্বস্বান্ত হয়ে দেশত্যাগ করে উপযুক্ত ছেলেমেয়ে থাকার পরেও ৫৩ সনে বন্ধু-বান্ধবদের প্ররোচনায় এক বিধবাকে বিয়ে করা।[৩২]

উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেমন খোরশেদ আলীর অদূরদর্শী মানসিকতার পরিচয়ে মেলে, তেমনি অন্যায়-প্রতারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী মানসিকতার বিষয়টিও উন্মোচিত হয়। তবে পারিবারিক ক্ষয়-ক্ষতি মেনেও শেষপর্যন্ত স্ত্রীর উচ্চশিক্ষা এবং নিজের হোমিওপ্যাথির পড়াশোনার জন্য বাড়ি ত্যাগের সিদ্ধান্ত– তার চরিত্রের উজ্জ্বল প্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া সন্তানদের সবাইকে উচ্চশিক্ষিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস এবং বাড়িতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার সহায়ক পরিবেশ বাস্তবায়নে তার উদ্যোগ যুগ বিবেচনায় ছিল অভিনন্দন যোগ্য। এমনি ক্ষয়িষ্ণু জোতদার পরিবারে শওকতের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারে অন্য সকল কিশোরদের মতো শওকতও জ্যৈষ্ঠ মাসে হৈহুল্লোড় করে আম কুড়ানো, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা, বর্ষার মৌসুমে উজানির মাছ ধরা, বনে বনে ঘুরে মৌসুমী ফল খাওয়া, আধিয়ারদের ফসল কাটা ও বিলি-বণ্টন দেখা, রেলব্রিজ থেকে কুলিক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া, শীতকালে ব'লো ভাইয়ের গান শোনা, যাত্রাভিনয় দেখা, মহররম উপলক্ষ্যে পারিবারিক আয়োজনে তাজিয়া মিছিলে অংশ নেয়া, হাইদোস খেলা দেখা, জঙ্গনামা শোনা, জারি-সারি গান শোনা, পীরের দীঘির ঘোড়া মানত করা, মাজারদর্শন, সাধু-সন্ন্যাসীদের কিংবদন্তি শোনা, বিভিন্ন মেলায় যাওয়া ও লোকাচারের সংস্পর্শে নিজেকে ঋদ্ধ করেন। শৈশবের সোনা ঝরা দিন প্রসঙ্গে শওকত বলেন–

> 'বাড়িটি দুপুরের দিকে ফাঁকা পড়ে যেত। বড়দা (আমার বড় ভাই) স্কুলে থাকতেন। সমবয়সী কোনো ছেলেমেয়েও ছিল না। দুপুর বেলা আমি বাড়ির ভেতরে নয়তো বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াতাম। রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে গরু-মহিষের গাড়ি চলাচল করতো।...গাছের ডালে নতুন পাখি, ধান ক্ষেতের আইলে প্রজাপতি আর ফড়িং বসলে তা দেখতাম।...আমি সময় কাটাতাম পাখি শিকার ও ছিপ দিয়ে মাছ ধরে। একটা মাছ ধরতে পারলে দৌড়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতাম। আমার মাছ ধরার আনন্দ আর কেউ উপভোগ না করলেও আমার দাদী খুবই খুশি হতেন।'[৩৩]

এসময় শওকত তাঁর অগ্রজ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে রায়গঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতায় বোমা ফেলার আতঙ্কে বড় ভাইবোনদের সঙ্গে তাঁকেও শ্রীরামপুর থেকে রায়গঞ্জ পাঠানো হয়। বাবা-মায়ের ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত না হওয়াতে তারা তখনো শ্রীরামপুরেই অবস্থান করছিলেন। ফলে পিতা-মাতার অবর্তমানে তিনি দাদি মাহেজাবিনের তত্ত্বাবধানে থাকতেন এবং বান্ধবহীন অবস্থায় বাড়ির চারপাশে, মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। আর প্রজাপতি ধরে এবং বুনো ফল থেকে আঠা বের করে তা দিয়ে ফাঁদ তৈরি করে তাতে গোবরে পোকার টোপ দিয়ে মাছ শিকার করে সময় কাটাতেন। খেলাধুলার বিষয়ে শওকত বলেন–

‘শীতকালে আমাদের ধানকাটা হয়ে গেলে সরিষা চাষ হতো। যখন শীত শেষ হয়ে আসত তখন মাঠে মাঠে সর্ষেফুল ফুটে থাকতো। দেখতে খুবই সুন্দর লাগতো। সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে নানা প্রকারের পোকামাকড়, মৌমাছি, প্রজাপতি উড়ে বেড়াতো। আমরা ছেলেরা শুকনো মাঠে ফুটবল, গোল্লাছুট নানা প্রকার খেলাধুলা করতাম।...স্থানীয় যারা চাষাবাদ করতেন, তাঁরা চাষাবাদের ফাঁকে ফাঁকে... জালবোনা, সুতা কাটা, বাঁশ-বেত-কাঠের ফার্নিচার বানানোর কাজ করতো।...প্রত্যেক পরিবারে নাচ, গানের চর্চা হতো।’[৩৪]

সমবয়সী খেলার সাথী বাড়িতে না থাকায় এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তেমন নিবিড়ভাবে মেশার সুযোগ না থাকায় শওকতের সঙ্গে বাড়ির গরুর রাখাল-চাকরদের এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরা তাদের বাড়িতে পুরুষানুক্রমে আশ্রিত ও কাজের লোক হিসেবে অবস্থান করতো। এদের সঙ্গে মাঠে যাওয়া, গল্পগুজব করা এবং তাদের কাজ-কর্ম ও হাসি-ঠাট্টা তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতো। এ প্রসঙ্গে শওকত বলেছেন–

‘আমাদের দুটি গোয়াল ঘর ছিল।...গরুর দেখাশোনা তথা রাখালি করতো আসির আর নাছির নামের দুই ভাই।...তারা গরু নিয়ে মাঠে যাওয়ার সময় আবার মাঠ থেকে গরু গোয়ালে বাঁধার সময় নানা গল্প বলতো। কোনো কোনো দিন মা ও দাদীর চোখ এড়িয়ে আমি তাদের সঙ্গে মাঠে চলে যেতাম। তারা বলতো পীরের দীঘিতে বড় বড় শোল আর গজার মাছ থাকে, ঘাঁ মারে, বড় বড় মুখ করে ভেসে ওঠে। গজার মাছের লাল লাল চোখগুলো দেখতে সত্যিই ভয় লাগতো। এই মাছগুলো না কি কেউ ধরতে পারে না। যদি কেউ ধরে, তাহলে পীরের বদদোয়ার গজব নেমে আসে। কারণ এই মাছগুলো নাকি আরব দেশ থেকে পীর সাহেব নিয়ে আসেন।’[৩৫]

এমন লোকমিথ আর কিংবদন্তির সঙ্গে শৈশবেই শওকতের পরিচয় ঘটে। এসব ঘটনার গভীর ছাপ তাঁর মনে অঙ্কিত হয়। যা তাঁর *ওয়ারিশ*, *বসত*, *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাস এবং *দুই গুজুয়ার গল্প* নামক ছোটগল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এভাবে শওকত পৃথিবীর পাঠশালা এবং প্রকৃতির উদার পরিবেশ থেকে জীবনের প্রথম পাঠ বা দীক্ষাগ্রহণ করেন। এসকল অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও শ্রুতিই পরবর্তীকালে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। তবে শওকতের শৈশব নীরোগ আর নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। রোগ-ব্যাধি ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। প্রায়ই ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর হতো। একবার মস্তিষ্কের জ্বরের প্রকোপে তাঁকে দীর্ঘদিন অজ্ঞান-অচেতন অবস্থার মধ্য দিয়ে পার করতে হয়। তাঁর দাদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাহেরপুর ও মালগাঁও দুই ফুপুর বাড়ি সংবাদ দিতে গিয়ে সাইকেলসহ রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শওকত জানান–

‘যখন জ্ঞান ফেরে, তখন দেখি হাসপাতালে শুয়ে আছি। প্রথমে আমাকে দিনাজপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু যখন অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল না, তখন ডাক্তার জগদীশ সেন একটা চিঠি লিখে দিনাজপুরের নামকরা ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠান। ডাক্তার বাবু রোগ নির্ণয় করে বলেন, রোগটা খুবই জটিল, সেরে উঠতে দেরি হবে। রোগটার ডাক্তারি নাম ম্যানেনজাইটিস। ব্রেইন ফিভার বলেই সাধারণত রোগটাকে চিহ্নিত করা হয়। পরে মায়ের কাছে শুনেছিলাম, মা ছাড়া সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল।’[৩৬]

তাঁর এ অজ্ঞান অবস্থা এতটাই ভয়াবহ আর দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে, যা দেখে সবাই রীতিমতো ঘাবড়ে যান। এতদ্বিষয়ের এক স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শওকত বলেছেন– ‘তখন আমার বয়স নয়-দশ বছর। জ্ঞান হারাবার আগে গাছে মুকুল দেখেছিলাম। জ্ঞান ফেরার পর দেখি গাছে আম ঝুলছে।’ এমন রোগ-ব্যাধিকে সঙ্গী করেই শওকতকে বেড়ে উঠতে হয়। তবে শওকতের এ রোগ-ব্যাধি তাঁর পড়াশোনা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। মার্কসবাদে আস্থা স্থাপনের পূর্বে তিনি মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নকালেই পারিবারিক ‘সরকার’ পদবি বর্জন করেন। এর পেছনে মার্কসবাদের কোনো আদর্শ বা চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল না। যতদূর জানা যায়, শওকতের দাদার বংশের পদবি ছিল ‘প্রধান’। দাদির ছিল ‘শেখ’ এবং মায়ের ছিল ‘সরকার’ পদবি। কিন্তু শওকতের বাবা খোরশেদ আলী কংগ্রেস দলের রাজনীতি করার কারণে পিতৃ ও মাতৃ বংশের ‘প্রধান’ ও ‘শেখ’ কোনো উপাধি গ্রহণ না করে শ্বশুর বংশের ‘সরকার’ উপাধি বেছে নেন। এতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধও করেন। ফলে শওকতের সকল ভাই বোনের নামের শেষে ‘সরকার’ পদবি যুক্ত হয়। কিন্তু রায়গঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় তাঁরই বাবার বন্ধু এবং স্কুল শিক্ষক যোগেশচন্দ্র ঘোষ ক্লাশে তাঁকে প্রায়ই ঠাট্টা-রসিকতা করে বলতেন–

‘শওকত আলী সরকার
কান মলা দরকার।’[৩৭]

এভাবে ক্লাশে তিনি যেমন শিক্ষকের দ্বারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তেন, তেমনি শিক্ষকের অবর্তমানে সহপাঠী বন্ধুরাও তাঁকে এ নিয়ে বিদ্রূপ করত। এমন পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে তিনি নামের শেষাংশ থেকে ‘সরকার’ পদবি ছেঁটে ফেলেন।

অনুরূপ ঘটনার নজির মেলে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের ক্ষেত্রেও। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র'। সহপাঠীরা তাঁকে 'গন্ধ' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় তিনিও 'গন্ধর্বনারায়ণ' বর্জন করে 'দীনবন্ধু' নাম জুড়ে দেন। এ 'সরকার' পদবি বর্জন করলেও পরবর্তীকালে শওকত তাঁর সাহিত্যকর্মের দ্বারা নিজ বংশ-পরিচয়কে পাঠক সমাজে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

শিক্ষাজীবন

শওকতের লেখাপড়া শুরু হয় তাঁর পরিবারেই এবং মা সালেমা বেগমের তত্ত্বাবধানে। কংগ্রেস রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত বাবার সান্নিধ্য-সংস্পর্শ তিনি তেমন পাননি। মা ও দাদি তাঁকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতেন। ফলে মায়ের কাছেই শওকতের হাতেখড়ি এবং বর্ণপরিচয় ঘটে। এ সময় রায়গঞ্জ থানা শহরে জমিদার-জোতদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত স্কুলে আধুনিক ইংরেজি-বাংলা শিক্ষার প্রচলন শুরু হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। সমাজে প্রচলিত গুরুগৃহ ও পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে হতো। শওকতের সমকালেও এ ব্যবস্থাপনাটি বলবৎ ছিল। শৈশবের শিক্ষাজীবন প্রসঙ্গে শওকত জানান-

> 'আমি যখন ছোট স্কুলে ভর্তি হইনি, তখন বাড়িতে বসে বর্ণমালার বই পড়ে শেষ করেছি।...আমার বড় ভাই তখন স্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়তেন। তাঁকে ও আমাকে দাদীর কাছে রেখে মা-বাবা দুজনেই হুগলি জেলার শ্রীরামপুর চলে যান। আমাকে গোপাল পণ্ডিতের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আমার বয়স কম দেখে তিনি ভর্তি করেননি।'[৩৮]

শুধু বয়সের স্বল্পতার কারণেই নয়, বরং তাঁর মতো পাঁচ-ছয় বছরের এক বালকের পক্ষে একাকী দীর্ঘপথ ভেঙে পাঠশালায় যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাছাড়া গুদারী বাজার এলাকা দিয়ে স্থানীয় কুলিক নদীর ধারঘেঁষা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা এবং পথ হারিয়ে ফেলারও সম্ভাবনা থাকায় শওকতকে তাঁর দাদি পাঠশালায় যেতে দেননি। তাই বাড়িতেই তিনি ইচ্ছেমতো পড়াশোনা চালিয়ে যান। পরবর্তী সময় বড় ভাইয়ের সঙ্গে শওকত ১৯৪০ সনের দিকে শ্রীরামপুরের মল্লিকপাড়ায় যান এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে ভাড়া বাসায় ওঠেন। স্থানীয় প্রতিবেশী পূর্ণিমা সেনের সঙ্গে সালেমা খাতুনের সখ্যসূত্রে শওকত তাকে 'পূর্ণিমা মাসী বা পুন্নি মাসী'[৩৯] বলে ডাকতেন এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকতেন। মা, বড় বোন মর্জিয়ানা, বড় ভাই মোহাম্মদ আলী স্কুলে চলে গেলে তাঁর বাবা ছোট দুই ছেলে ওসমান আলী ও আব্দুর রোউফকে সামলাতেন। সোফিয়া বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়াতে তার পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বড় বোন স্কুল থেকে ফিরলে শওকতের বাবা স্থানীয় বাজারে দেওয়া 'সরকার ফার্মেসি'তে গিয়ে বসতেন। হুজুগে স্বভাবের খোরশেদ আলীর ডাক্তার হবার পেছনে রায়গঞ্জের বন্ধু ডাক্তার জগদীশ সেনের বড় ভূমিকা ছিল। কারণ জগদীশ সেনের ফার্মেসিতে আড্ডা দিতে দিতেই তিনি ডাক্তারি বিদ্যায় হাতেখড়ি নেন। পরে হাতুড়ে ডাক্তার হয়ে জুটমিলের শ্রমিকদের ম্যালেরিয়া জ্বরসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে পাশ করা সার্টিফিকেট না থাকায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। তাই তিনি হোমিওপ্যাথিতে HMB কোর্স করতে শ্রীরামপুরে আসেন। বিকেলবেলা ট্রেনযোগে কলকাতা গিয়ে ক্লাশ করে রাত দশটা-এগারোটার দিকে বাসায় ফিরতেন। এসময় পূর্ণিমা সেনের বোন রমা সেনের নজরে পড়ে শওকতকে শ্রীরামপুর মিশনারি স্কুলে ভর্তির জন্য নেওয়া হয়। রমা সেন ছিলেন এ স্কুলের প্রাইমেরি শাখার প্রধান শিক্ষিকা। প্রতিষ্ঠান প্রধান ফাদার যোসেফ শওকতের বয়স পুরো ছয় বছর না হবার সন্দেহে তাঁকে মাথার ওপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে কাঁধ স্পর্শ করতে বলেন। শওকত এতে ব্যর্থ হলে তাঁর বাবা শওকতের ইংরেজি ও বাংলা বর্ণমালায় ভালো জানাশোনা থাকার কথা বলাতে ফাদার যোশেফ তাঁর পরীক্ষা নেন। এ প্রসঙ্গে শওকতের ভাষ্য-

> 'ফাদার ইংরেজিতে ছাপানো একটি খবরের কাগজ বের করে দিয়ে আমাকে অক্ষরগুলো পড়তে বললেন। আমি বড় হাতের ও ছোট হাতের সবগুলো বর্ণমালা গড়গড় করে পড়ে শোনাই। তারপর তিনি একখানা বাংলা বই সামনে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি তখন বইটির নাম পড়ে শোনালাম। বইটির নাম ছিল–*পরম পিতার মহিমা*। এতে ফাদার যোসেফ খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন এবং ভর্তির অনুমতি দিলেন'।[৪০]

এভাবে শওকতকে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনারি স্কুলের প্রাইমারি শাখায় ভর্তি করা হয়। এ স্কুলের পেছনেই ছিল গঙ্গা নদী। এর শান বাঁধানো ঘাটে বসে শওকত পালতোলা ছোট-বড় নৌকা, লঞ্চ-স্টিমার যাওয়ার দৃশ্য দেখতেন। আর মনে মনে ফেলে আসা রায়গঞ্জের কুলিক নদীর সঙ্গে মেলাতেন। নদীর দুইপাড়ের চওড়া রাস্তার ধারেই গড়ে উঠেছিল শ্রীরামপুর আর ব্যারাকপুর শহর। সঙ্গে ছিল জুটমিল, টেক্সটাইল মিলসহ বিভিন্ন কারখানা। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তিনির্ভর এ নগরায়ণের কর্মচাঞ্চল্য কিশোর শওকতের মনে গভীর ছাপ ফেলে। এ ব্যারাকপুরেই

সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) সূচনা হয়েছিল। সবমিলিয়েই শওকতের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আবার প্রতি রবিবারের প্রার্থনা সঙ্গীতে শামিল হওয়া, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি,রবীন্দ্রসঙ্গীত নিবেদন ও পাদ্রিদের বাণী–– এসব মিলেই শওকতের বালক মনে এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ নিশ্চুপে রোপিত হয়। এ স্কুল প্রসঙ্গে শওকত বলেছেন–

> 'আমাদের স্কুলে একমাত্র মুসলমান ছাত্র ছিলাম আমি। হিন্দু ছাত্রছাত্রী ছিল তিন-চারজন। তার মধ্যে একটি মেয়ে ছিল।...আমাদের ক্লাস শিক্ষক ছিলেন কৃষ্ণা দিদিমণি।...বলতে দ্বিধা নেই, ওই বয়সেই হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা যে- আলাদা; তা আমরা বুঝে গিয়েছিলাম।'[৪১]

সমাজ ও রাষ্ট্রসৃষ্ট এ জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের বিষবাষ্প বালক শওকতকেও এক নতুন বাস্তব জগতের সন্ধান দেয়। এসব বিষয় ও ঘটনাবলির পরিচয় মেলে শওকতের *ছবির উপরে ছাপ* (২০০২) উপন্যাসে। বছর শেষে শীতকালের বার্ষিক পরীক্ষাতে শওকত প্রথম হন এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি বাঘাডুলি ও একটি রূপকথার বই পান।[৪২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (৭ আগস্ট, ১৯৪১) হলে শওকতের বাবা-মা উভয়েই কষ্ট পান। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। এজন্য শওকতকে দিয়ে তাঁর মা বড় রাস্তার মোড় থেকে খবরের কাগজ কিনে আনান।[৪৩] শ্রীরামপুরে প্রায় দুই বছর থাকার পর ৪২ সনের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় জাপানি সৈন্যদের বোমা ফেলার আতঙ্কে সপরিবারে তারা ট্রেনযোগে কাটিহার-দিনাজপুর হয়ে রায়গঞ্জে ফিরে আসেন। পরের বছর ৪৩ সনের জানুয়ারিতে স্থানীয় রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক অরুণ বাবুর (যিনি শওকতের বাবার বন্ধু) তৎপরতায় শওকতসহ তাঁর ভাই-বোনেরা স্কুলে ভর্তি হন। 'প্রধান' বাড়ির শুধু তারাই পড়তেন না বরং তাদের আত্মীয়-স্বজন আরো অনেকেই এ স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্য স্মরণযোগ্য–

> 'আমার বাবার ছিলেন এক ভাই, তিন বোন। আমার চাচা সিরাজউদ্দিন আহমদ ইন্টারমেডিয়েট পাস করেছেন। আমার ফুফুদেরও পাঠশালায় পাঠানো হয়েছিল। আমার চাচাতো ভাই, আমার বড় ফুপুর ছেলে জমির, সেজো ফুপুর ছেলে মহেব, তার চাচাতো ভাই আব্বাস, ছোটো ফুপুর মেয়ে জবা আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছিল।'[৪৪]

সমকাল বিবেচনায় এটি এক বিস্ময়কর ঘটনা। কারণ একটি মুসলিম পরিবার থেকে একজন ছেলেমেয়ের আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের নজির তৎকালে খুব বেশি ছিল না। তখনকার বনেদি পরিবারে মাত্র দু'একজনকে এ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে দেখা যেত। আর মেয়েদের তো চৌকাঠের বাইরে পা রাখার তেমন সুযোগই ছিল না। তাহলে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, শওকতের পরিবারে পড়ালেখার একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। যার ফলে শওকতের মা ১৯৪১ সনে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হন। তাছাড়া শওকতের বাবা ও মা উভয়ে বই পড়তে ভালোবাসতেন বিধায় মাইকেল,বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের বই যেমন ছিল; তেমনি কলকাতা থেকে নিয়মিত *আজাদ, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ, ভারতবর্ষ ও সওগাত* পত্র-পত্রিকা আসতো। আবার খোরশেদ আলীর আগ্রহে পরিবারে সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, ছবি অঙ্কনেরও ব্যবস্থা করা হয়। পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে তিনি নৃত্যের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাই শওকতের বোন মর্জিয়ানা হারমোনিয়ামে, সোফিয়া সেতারে, শওকত তবলা ও ছবি অঙ্কনে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেন। শওকত যেমন বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে ভালোবাসতেন, তেমনি বিমূর্ত চিত্রাঙ্কনে, তবলা বাজাতে ও রান্না করতে খুব পছন্দ করতেন।[৪৫] এসময় শওকতের মা সালেমা খাতুনের নামে শ্রীরামপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে মেদিনীপুর মিশনারি টেক্সটাইল স্কুলে ও হায়দারাবাদ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে চাকরির প্রস্তাবজনিত চিঠি আসে। তিনি সন্তান ও সংসারের বিবেচনায় চাকরি না করার পক্ষে থাকলেও শওকতের পিতার আগ্রহে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের স্কুলে যোগদান করেন।[৪৬] শওকত ও মোহাম্মদ আলীকে রায়গঞ্জ রেখে সালেমা খাতুন মেয়ে ও ছোট ছেলেদের নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যান। সমকাল বিবেচনায় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বউ হয়ে সালেমা খাতুন যে-দুঃসাহসের পরিচয় দেন তা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অচলায়তন সমাজের বৃত্ত ভেঙে তার বাড়ির বাইরে যাওয়া এবং এ ক্ষেত্রে স্বামীর উৎসাহ প্রদান–সবই প্রাগ্রসর চেতনার পরিচয়বাহী। তবে বৈরী আবহাওয়া ও নানা রোগ-বালাইয়ের প্রকোপে অতিষ্ঠ হয়ে মাত্র ছয় মাস পরে তিনি রায়গঞ্জে ফিরে আসেন। এসময় শওকতের বয়স অল্প হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত উত্তেজনা এবং ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপে তিনি অনেকটা পরিণত হয়ে পড়েন। তৎকালীন স্কুলের প্রতিবেশ, শিক্ষার্থীদের মাঝে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ-বিষয়ে শওকতের বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য–

‘ক্লাসে আমি আগে গেলেও ফার্স্ট বেঞ্চে বসতাম না। কেমন যেন সঙ্কোচ হতো। তাই মাঝখানের বেঞ্চগুলোতে বসতাম। মুসলমান ছাত্র বলতে আমরা চার-পাঁচজন ছিলাম।...রাজনীতি বোঝার মতো বয়স তখনো আমার হয়নি। শুধু ওইটুকু বুঝতাম যে, ইংরেজরা সাদা চামড়ার বিদেশি লোক; তারা আমাদের দেশ শাসন করছে। আমাদের দেশের ধন-সম্পদ সব তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। তখন অবশ্য মহাত্মাগান্ধীর নাম আমরা সবাই জানতাম।...বড়রা যে শুধু মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে আলোচনা করতেন তা নয়, তাঁরা জওহরলাল নেহেরু, ফজলুল হক, জিন্নাহ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিয়েও আলোচনা করতেন।...বড়দা (মোহম্মদ আলী সরকার) প্রায়ই মুসলিম হোস্টেলে যেতেন।’[৪৭]

শওকতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে যেমন সমাজে বিদ্যমান বর্ণপ্রথার ইঙ্গিত মেলে, তেমনি কিশোর-বালকদের মাঝেও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তা যুগের প্রেক্ষাপটে অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি, বিভাজন ও উগ্রবাদকে পুরিপুষ্ট করে তুলে। কিন্তু শওকত বরাবরই ছিলেন সাম্য, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির পক্ষে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ চলাকালে শওকতের মায়ের স্থানীয় গার্লস স্কুলে চাকরি হওয়াতে পরিবারে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসে।[৪৮] তবে শওকতের মা বেশিদিন চাকরি চালিয়ে যেতে পারেননি। শ্রীরামপুরে অবস্থানকালেই তার পাকস্থলিতে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। তৎকালে ক্যান্সারের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল না। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়াতে কলকাতার হাসপাতালগুলোতে ভালো ইংরেজ চিকিৎসকও তেমন ছিল না। বেশ দেরি করে সালেমা বেগমকে কলকাতার হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু ততদিনে তার ব্যাধি নিরাময়ের অসাধ্য হয়ে ওঠে। আবার ৪৭-এর দেশভাগ এবং ৪৮-এর দাঙ্গাজনিত কারণে কলকাতায় অবস্থান করাও সম্ভব ছিল না। তাই ৪৯ সনে শওকতের মাকে একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। মায়ের এ করুণ মৃত্যুর প্রসঙ্গে শওকত বলেছেন–

‘মামারা মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে আমাদের বাড়িতে আসেন এবং বাবার সঙ্গে কথা বলে তাঁরা মাকে কলকাতা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। ২০-২৫ দিন সেখানে চিকিৎসা করার পর আবার বাড়িতে নিয়ে আসেন। কে দেখাশোনা ও সেবা-যত্ন করবে? অন্যদিকে দেশে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একদিন সকাল বেলা ঘুরতে বের হলে দাঙ্গার লোকেরা মাকে লাঠি দিয়ে কয়েকটি ঘা লাগিয়েও দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আবার যে-হাসপাতালে নিয়ে যাবে, সে-সাহস তারা পাচ্ছিল না। ফলে মৃত্যুকালে মাকে এক রকম বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়েছে।...মায়ের বয়স তখন মাত্র ৩৮বছর।’[৪৯]

মায়ের এ অকাল মৃত্যুতে শওকত খুব ব্যথা পান। এ সময় শওকত ছিলেন নবম শ্রেণির ছাত্র। আর ছোটভাই রোউফের বয়স ছিল মাত্র এক-দেড় বছর। ফলে সাংসারিক এ বিপর্যয়ে হাল ধরতে হয় শওকতের বড় বোন কলেজ ছাত্রী মর্জিয়ানা খাতুনকে। দীর্ঘ রোগ-ভোগে মা সালেমা খাতুনের মৃত্যু শওকতের মানসলোকে বড় ধরনের শূন্যতা তৈরি করে। তারপরেও শওকত পড়াশোনাতেও মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তিনি দেশীয় ঐহিত্য জানতে সংস্কৃত সাবজেক্ট নিতে গেলে ব্রাক্ষ্মণ পণ্ডিত রীতিমতো ক্ষেপে যান। কারণ তৎকালে মুসলাম যবন ছেলের পক্ষে তথাকথিত দেব ভাষা সংস্কৃত পড়া ছিল রীতিমতো গর্হিত অন্যায়। কিন্তু শওকতের জেদ ও দৃঢ়তার কারণে এবং স্কুলে তাদের পারিবারিক অবদান থাকাতে পণ্ডিত মশায় তাঁর সংস্কৃত পাঠদানে অনুমতি দেন। তবে শর্ত হিসেবে তাকে মাটিতে অর্থাৎ মেঝেতে বসে এ পাঠ নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে শওকত জানান–

‘অনেক জোরাজুরির পর পণ্ডিত মশাই সংস্কৃত পড়তে দিলেন; কিন্তু চেয়ার-টেবিলে বসতে পারব না। ব্রাক্ষ্মণের ছেলেরা চেয়ার টেবিলে পড়বে, আর আমি পড়ব মেঝেতে। আমি মাটিতে বসেই সংস্কৃত পড়া শুরু করলাম। ব্রাক্ষ্মণের ছেলেদের চেয়ে খুব একটা খারাপ নম্বর পেলাম না।’[৫০]

এমন অপমান, লাঞ্ছনা আর প্রতিকূল পরিবেশেই শওকতকে সংস্কৃত ভাষা পড়তে হয়। তবে এ বিপ্রতীপ প্রতিবেশ তাঁকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ফলে শওকত বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ও পরবর্তীকালে উর্দু ভাষাতে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত ভাষার এ ব্যুৎপত্তি তাঁর সাহিত্যজীবনের সেরা সৃষ্টি *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের বিষয় নির্ধারণ ও ভাষা নির্মাণে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মনের এ জেদ ও প্রত্যয় থেকেই ১৯৫১ সনের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৮ জনের মধ্য থেকে (মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৩ জন) দুটি লেটারসহ প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। একজন মুসলমান ছেলের এমন অভাবনীয় ফলাফল দেখে হিন্দু শিক্ষকদের গাত্রদাহ শুরু হয়। এ নিয়ে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে শওকত জানান–

'রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার পরেও আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট পাচ্ছিলাম না। যদিও রেজাল্ট বের হয়েছিল দুদিন আগেই। বাড়ি ও স্কুলের সবাই বলতে শুরু করল আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি। আমার খাতা যাচাইয়ের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। ফলে দশ দিন লেগে যায় এ যাচাই-বাছাই করতে। পরে আরো দশ নম্বর বৃদ্ধি পেয়ে দুটি লেটারসহ দুটি টেলিগ্রাম আসে। আর আমাকে হাজী মুহম্মদ মোহসীন বৃত্তিও দেয়া হয়।'[৫১]

এ ঘটনাটি সমকালীন সমাজে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিদ্যমান সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত করে। শওকতের অভাবনীয় সাফল্যে পরিবারের সবাই খুশি হলেও তিনি নিরাশ হন। কারণ হিন্দু শিক্ষকদের হীনমন্যতা দেখে তিনি মর্মাহত হন। একসময় তাঁর ডাক্তার হবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। এ ডাক্তার হবার পেছনে তাঁর মায়ের প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কারণ সক্রিয় থাকতে পারে। তবে ৪৭-এর দেশভাগের অভিঘাত, ৪৮ ও ৫০-এর দাঙ্গা, এলাকাবাসীর জঘন্য আচরণ, কলেজ গমন পথে হিন্দু বখাটে ছেলেদের দ্বারা বড়বোনকে উত্যক্ত করার ঘটনা এবং দেশত্যাগের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়াতে তিনি বাধ্য হয়ে পূর্বপাকিস্তানের দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে এসে ভর্তি হন। এটি কলকাতা রিপন কলেজের অধিভুক্ত ছিল। তবে দেশত্যাগের হাঙ্গামায় ও কালীতলায় সাত হাজার টাকায় বাড়ি কেনার ঝামেলা করতে গিয়ে শওকত যথাসময়ে কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। তবে অধ্যক্ষ জি.সি দেবের (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও শহিদ বুদ্ধিজীবী) আনুকূল্যে তাঁকে মানবিক শাখায় ভর্তির সুযোগ করে দেয়া হয়। নতুন দেশে এসে আর্থিক অনটনে টিউশনি করে হাত খরচ চালানো এবং পিতার স্থানীয় বিধবা মনোয়ারা বেগমকে বিয়ে করায় সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।[৫২] এসবের প্রভাবে ৫৩ সনের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষাতে তিনি অল্পের জন্য প্রথম বিভাগ থেকে বঞ্চিত হন। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। শওকতের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হবার প্রবল ইচ্ছে ছিল। তাঁর বিজ্ঞান শাখার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজয় রায় মণ্টু (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও তিনি আর্থিক কারণে ভর্তি হতে পারেননি। এসময় তাঁর বড় ভাই (মোহাম্মদ আলী) রাগ করে রংপুর চলে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে শওকতকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজেই বি.এ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়। তাঁকে বাড়িতে অবস্থান করে সংসারের দায়িত্বভার নিতে হয়।[৫৩] বি.এ পড়ার সময়েই শওকত সমকালের প্রভাবে অপরাপর প্রগতিশীল ছাত্রদের মতো নিজেও মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং সহ-সম্পাদক পদ লাভ করেন।[৫৪] তাই ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি মিটিং-মিছিল, জনসংযোগ ও বক্তব্য নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে অচিরে এ সরকারের পতন ঘটে। আর গভর্নর ইস্কান্দার মির্জার রোষানলে পড়ে ৯২/ক ধারায় অন্যান্যদের মতো তিনি মার্চ মাসে গ্রেফতার হন।[৫৫] রাজবন্দি হিসেবে তিনি বিখ্যাত কৃষকনেতা কমরেড হাজী মোহাম্মদ দানেশ, বরদা চক্রবর্তী, বন্ধু মোহাম্মদ ফরহাদসহ বহু নেতা-কর্মী আর স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ লাভ করেন। এতে শওকতের রাজনৈতিক চেতনা যেমন ঋদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ও মানব মনস্তত্ত্ব উপলব্ধির এক নূতন দিগন্তও খুলে যায়। কিন্তু বি.এ পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়াতে তিনি বাবার চাপে ও অসহায় ভাইবোনদের কথা ভেবে অপমানজনক বন্ডসই দিয়ে নয় মাস পর ডিসেম্বরে জেল থেকে মুক্তি পান।[৫৬] ফলে মনের এ অসহ্য গ্লানি, পারিবারিক অশান্তি ও যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে বরাবরের মতো ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শওকত ৫৫ সনে তৃতীয় বিভাগে বি.এ পাশ করেন। এসব চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তাঁর *বসত* (২০০৫) উপন্যাসে। পরীক্ষার এ ফলাফল প্রসঙ্গে শওকত নিজেই বলেছেন–

'জেলজীবন আমার পুরো এক বছর নয়। কেননা মনে আছে, ছাড়া পাওয়ার পরই বি.এ ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ পাই। পরীক্ষার জন্য অবশ্যই ভালো প্রস্তুতি নিতে পারিনি। তবে পাস করে যাই একেবারেই ১৯৫৫ সালে। রেজাল্ট থার্ড ডিভিশন। সময়টা আমাদের এরকমভাবেই গিয়েছে। সচেতন ছাত্ররা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকেছে এবং স্কুলের পরীক্ষায় ভালো করলেও পরে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তেমন ভালো ফল অর্জন করতে পারেনি।'[৫৭]

শওকতের এ বক্তব্য শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়, বরং সমকালীন রাজনীতিসচেতন প্রায় সকল ছাত্রের জন্যও কমবেশি প্রযোজ্য। যে- রাজনীতির কারণে একদা শওকতের বাবা গান্ধীর ডাকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জন্য টেস্ট পরীক্ষা দেবার পরও ম্যাট্রিক পরীক্ষা বর্জন করেছিলেন। সেই একই কারণে অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণের প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই তাঁকেও জেলবরণ ও বি.এ পরীক্ষার তুলনামূলক খারাপ ফলাফল মেনে নিতে হয়। যা অপরাপর রাজনীতিসচেতন

ছাত্রের মতো শওকতেরও অনিবার্য নিয়তি হয়ে ওঠে। বি.এ পাশ করার পর শওকত তাঁর কাঙ্ক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে হতাশ হন। কারণ প্রার্থিত বাংলা বিষয়ে বি.এ পরীক্ষার রেজাল্টে ২০০ নম্বর না থাকা এবং তাঁর থার্ড ক্লাশ রেজাল্ট– এ ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে শওকতের বাংলায় লেটার মার্কস ছিল। তৎকালীন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল হাই তাঁকে নাকচ করে দেয়াতে শওকত ভেঙে পড়েন। তবে মুনীর চৌধুরী ও জি.সি.দেবের (যিনি তাঁর কলেজ অধ্যক্ষ ছিলেন) সুপারিশে শওকত বাংলায় ভর্তি হতে সক্ষম হন। কারণ তাঁরা উভয়ে শওকতের *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় লেখালেখির কথা জানতেন।[৫৮] শওকতকে ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) বরাদ্দ দেয়া হলেও তিনি কলেজ বন্ধু অজয় রায়ের সঙ্গে ঢাকা হলেই (বর্তমান শহীদুল্লাহ হলে) থাকতেন। কিন্তু আর্থিক অনটন এবং পুরনো ব্রেইন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে তিনি দিনাজপুর চলে যান। পরের বছর পুনরায় পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি টিউশনি, *দৈনিক সমকাল* এবং *মিল্লাত* পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও শওকত ১৯৫৮ সনে অনিয়মিত ব্যাচের হয়ে ৩০ জনের মধ্য থেকে ১৪ তম স্থান অধিকার করে দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ পাশ করেন।[৫৯] এ সময় বন্ধু কামাল লোহানীর সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পত্রিকা *মিঠেকড়া* বের করেন।[৬০] অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সামরিক সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় গ্রেফতার এড়াতে তিনি ঢাকা ছেড়ে পুনরায় দিনাজপুর চলে যান।

কর্মজীবন

শওকত আইয়ুব খান প্রবর্তিত জরুরি অবস্থার মধ্যে ঢাকা থেকে দিনাজপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ৪৯ সনে তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে ওঠে। ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবস্থাতেই শওকতকে কখনো গৃহ-শিক্ষকতা আবার কখনো স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার চাকরি করতে হয়েছে।[৬১] আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গৃহ-শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করে পড়ালেখার খরচ যোগাতে হয়েছে। সুতরাং শওকতকে তাঁর অভিবাসী জীবনের শুরুতেই টিকে থাকার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে। জীবনযুদ্ধের একজন হার না মানা সৈনিক হিসেবেই শওকত দিনাজপুর ফিরে বসে না থেকে কৌশলে কর্মের সন্ধান চালান। রাজনীতি ও জেলজীবন সূত্রে তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বহু তেভাগা কৃষক-আন্দোলনের নেতাকর্মীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। এমন পরিচিত কিছু লোকজনের মাধ্যমেই শওকতের বীরগঞ্জ হাইস্কুলের চাকরিটা হয়। এ চাকরি হবার বিষয়ে শওকত বলেছেন–

> 'তারা আমাকে ডেকে নিয়ে একটি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন না, তাই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বটাও আমাকেই পালন করতে হয়েছিল। সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমাকে বেতন দেয়া হতো ৪০০ টাকা আর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য দেয়া হতো আরো ২০০ টাকা। মোট ৬০০ টাকা বেতন দেয়া হতো। সেই স্কুলটার নাম ছিল বীরগঞ্জ হাই স্কুল।'[৬২]

অর্থের প্রয়োজনে শওকতকে মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি স্কুলের চাকরি বেছে নিতে হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাস চাকরি করার পর তিনি দ্বিতীয় বারের মতো ম্যানেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দু'মাস শয্যাশায়ী থাকেন।[৬৩] এসময় পূর্বে আবেদন করা ঠাকুরগাঁও কলেজে প্রভাষক নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও তিনি যথাসময়ে যেতে পারেননি। তবুও শওকতের চাকরিটা হয়ে যায়। কারণ কলেজটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তাই বাংলা বিষয়ে প্রভাষক প্রথমে না পাওয়াতে শওকত সুস্থ হয়ে যোগাযোগ করায় তিনি সহজেই চাকরিটা পেয়ে যান। ঠাকুরগাঁও কলেজে তিনবছরের (১৯৫৯-৬১) অধ্যাপনার সময়টি ছিল তাঁর জন্য এক পরম প্রাপ্তি। তিনি সহকর্মী সাইফুল ইসলাম, মোসলেম উদ্দিন মণ্ডল, হারুণ-অর-রশীদ ও করিম দাদকে নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। এসময় তিনি প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মেশার সুযোগ পান। বাসড্রাইভার, হেলপার, ভূমিহীন কৃষক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কাশেম খান নামক এক অবাঙালি অভিজাত, শৌখিন ও খেয়ালি ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ভদ্রলোক ভালো শিকারি ছিলেন এবং সেতার, এসরাজ বাজাতে পারদর্শী ছিলেন। আর উর্দু গজল খুব ভালবাসতেন। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াতে শওকতের নবাবি আভিজাত্যের এক প্রতিনিধিকে জানার অভিজ্ঞতা হয়।[৬৪] এ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই শওকত পরবর্তীকালে লেখেন *জোড় বিজোড়* (২০০১) উপন্যাস এবং *এক কাহিনী* নামক ছোটগল্প। কিন্তু শওকতের এভাবে সহকর্মীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা এবং বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে আলোচনার বিষয় কলেজ কর্তৃপক্ষের

কাছে সুখকর ছিল না। এ নিয়ে শওকতকে জবাবদিহি করতে হয়। ঠাকুরগাঁও কলেজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শওকত বলেছেন–

> 'কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই বলাবলি শুরু করেছিলেন, এরা কেমন প্রফেসর? রাজবংশীদের গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, সাঁওতালদের বাড়িতে বসে গল্প করে, মুড়ি আর কলাইভাজা খায়। এসব তো ঠিক নয়! শুধু তা-ই নয়, আরো প্রশ্ন তোলা হল যে, বাংলার প্রফেসর অর্থনীতির কী বোঝে? সে কেন অর্থনীতি আর রাজনীতির তত্ত্ব বোঝাতে যায়?'[৬৫]

এসব বিষয় নিয়ে শওকতের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে একদিন শওকত ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ুয়া প্রেমিকা শওকত আরা ডলির চিঠি পেয়ে ঢাকায় যান। ডলির অনুরোধে ও বন্ধু অজয় রায় এবং কামাল লোহানীর পরামর্শে ১৯৫৯ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর শওকত অপ্রস্তুত অবস্থায় ডলিকে বিয়ে করেন। বিয়েটি ছিল কোর্ট ম্যারেজ। পরে ঢাকার শাহজাহানপুরের পূর্ব পরিচিতি সেলিম কোরেশির বাসায় স্বল্প সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।[৬৬] শওকতের এসময় বিয়ের বিষয়ে অনিচ্ছা বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মূলে ছিল তাঁর নড়বড়ে চাকরি, নিজে রান্না করে খাওয়া এবং নিয়মিত ছোট-ভাইবোনদের লেখাপড়ার খরচ পাঠানোর চিন্তা।[৬৭] কিন্তু তারপরেও প্রেমের কাঙ্ক্ষিত পরিণতি, দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার থেকেই শওকত পিছ পা না হয়ে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। আর বিয়ের মতো জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। যা সমকাল বিবেচনায় ছিল রীতিমতো দুঃসাহস ও অকল্পনীয় ব্যাপার। ডলির সঙ্গে শওকতের পরিচয় হয় তার ভাই আবুল ফজল নূরন্নবীর সঙ্গে বন্ধুত্বের যোগসূত্রে। দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বি.এ পড়ার সময় নূরন্নবী শওকতের সহপাঠী ছিলেন। তাদের জেলাসদর সংলগ্ন ঘাসিপাড়ার বাসায় শওকত যেতেন। দশম শ্রেণির ছাত্রী ডলির গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সূত্রপাত ঘটে। পরে শওকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ডলি ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ার সময় এ প্রণয় আরো গাঢ়তর হয়। কিন্তু এ প্রেমের কথা জানাজানি হলে এবং উভয়ের পাঠানো প্রায় ২২৫ টি চিঠির সন্ধান মেলাতে ডলির জেইলর বাবা এমদাদ রসুল কিছুতেই এ প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না।[৬৮] শওকতের নড়বড়ে চাকরির কারণে ডলিকে দ্রুত অন্যত্র পাত্রস্থ করতে তার বাবা মরিয়া হয়ে ওঠেন। এমন পরিস্থিতিতে উভয়ে পরিবারের সম্মতি না নিয়ে গোপনে বিয়ে করেন। তাই এ বিয়ে কোনো পরিবারই প্রথমে মেনে নেয়নি। ডলির বড় লতিফা ও জিনাত আরা নামের দুই বোন অবিবাহিত থাকায় পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে ওঠে।[৬৯] তারপরেও শওকত ডলির বিপদ অনুধাবন করে মাত্র চল্লিশ টাকার সম্বল থেকে আঠারো টাকায় বিয়ের শাড়ি কেনেন এবং একদিন ঢাকায় অবস্থান করে পুনরায় ঠাকুরগাঁওয়ের কর্মস্থলে ফিরে আসেন।[৭০] এসব বিষয় ধরা পড়েছে শওকতের *দলিল* (২০০০) উপন্যাসে। এসময় তিনি পাবনা ও সিরাজগঞ্জের কলেজে চাকরির জন্য আবেদন ও যোগাযোগ চালিয়ে যান। স্থায়ী একটি চাকরির ব্যবস্থা ও জীবনের স্থিতি খুঁজে পেতে শওকত এসময় মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাই ঠাকুরগাঁও থেকে ডলির উদ্দেশ্যে পাঠানো চিঠিতে শওকত জানান–

> 'চাকরির স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি। পাবনা-সিরাজগঞ্জে চেষ্টা করছি। সেপ্টেম্বরের আগে ওরা কিছু জানাবে না।...কাজ খুব বেশি দূর এগোয়নি। কিছুটা আশা করছি। এখন দেখা যাক আল্লাহ কপালে কি রেখেছেন?...জীবিকার জন্য যে-এভাবে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে তা ভাবিনি। তবে নিজের মনে একটা জোর আছে আমার। কিছু একটা করে ফেলতে পারবোই।'[৭১]

শওকত কখনোই নিজের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল থেকে বিচ্যুত-বিভ্রান্ত হননি। তাই জীবনের স্থিতি ও স্বস্তির প্রশ্নে তিনি যেমন চাকরির ব্যবস্থা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তেমনি আবার নিজেদের গড়ে তোলা ঠাকুরগাঁও কলেজকে স্থানীয় কুচক্রী মহলের মামলা-হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্য তিনি স্থানীয় তরুণদের নিয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কলেজকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।[৭২] তবে কুচক্রী মহল আক্রোশবশত শওকতের রাজনৈতিক পরিচয় ও ৫৪-তে জেলজীবনের বিষয়ে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে।তাই ৬২ সনের গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় তিনি চাকরি ছেড়ে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা হলে আশ্রয় নেন।[৭৩] আর চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান। পূর্ব পরিচিত *সমকাল* পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে আলাপ করাতে তিনি *সমকাল*-এ চাকরি দেন। কিছুদিন পর *অবজারভার*-এ যোগ দেবারও কথা হয়। কিন্তু শওকতের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ থাকায় তিনি যোগদান করা থেকে বিরত হন এবং অপেক্ষা করেন। এসময় *সমকাল* পত্রিকায় শওকতের *মুখর প্রান্তর* ও

রক্তপদ্ম নামের দুটি লেখা প্রকাশ পায় এবং তা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর অজিত গুহের নজরে পড়ে। তিনি সিকান্দার আবু জাফরের কাছ থেকে শওকতের পরিচয় জেনে নেন।[৭৪] এখানে উল্লেখ্য যে, শওকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন পরে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক ও সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ পি-এইচ.ডি গবেষণার জন্য বিদেশ যাওয়াতে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। শওকত সিকান্দার আবু জাফরের কথামতো আবেদন করেন এবং বি.এ-তে তৃতীয় শ্রেণিজনিত রেজাল্টের ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরীর হস্তক্ষেপে তিনি ভাইভাবোর্ডে যান। এ দুজনের সদয় বিবেচনায় শওকতের চাকরিটা হয়।[৭৫] কারণ অজিত গুহ প্রতিভা চিনতে ভুল করতেন না। আর শওকতও তাঁর কর্মদক্ষতা ও সাহিত্যকর্ম দ্বারা সে-প্রমাণ রাখতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬২ সনের ১ সেপ্টেম্বর ৪০৩ টাকা বেতনে তিনি জগন্নাথ কলেজে যোগদান করেন। ৫৪-তে রাজনীতির কারণে কারাবরণ, ম্যাট্রিকে বাংলা বিষয়ে লেটারপ্রাপ্তি এবং লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকায় শওকতের আলাদা একটি ইমেজ ছিল। এ বিভাগের বাংলা বিষয়ে আরেকজন লেটার নম্বরধারী শিক্ষক ছিলেন, তিনি হলেন শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। বহু চড়াই-উৎরাই পার করে শওকত অবশেষে জীবনে স্বস্তি ও স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পান। এ চাকরি পাওয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে ৬২-এর ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে শওকত স্ত্রী ডলির উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে জানান–

> ‘১ তারিখেই জগন্নাথ কলেজে জয়েন করেছি। মাইনে পাবো ৪০৩ টাকা। *সমকাল*-এর কাজটা পার্ট টাইম হিসেবে রাখবো। যদি সেটা শেষ পর্যন্ত থাকে তাহলে একশো টাকার মতো রোজগার নিশ্চয়ই হবে। তবে সেটা তো খুচরো টাকা। হাত খরচেই টাকাটা চলে যাবে। তা যাকগে। মনে হয় পাঁচশো টাকার মতো রোজগার করতে পারলে আমার সব দায়িত্ব পালন করেও সংসার পাততে পারবো।...কলেজের কাছাকাছি বাসা খুঁজছি, এখানে এসে তোমার চিঠি পেলাম। সেই সঙ্গে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের দুটো কলেজেরই appointment’.[৭৬]

তাহলে দেখা যায়, প্রায় একই সময়ে শওকতের তিনটি কলেজে চাকরি হয়। শওকতও এসময় সংসার পাতার প্রস্তুতি নেন। জগন্নাথ কলেজের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়াতে শ্বশুর ও পিতৃকুলের অভিভাবকদের অভিমানও অনেকটা কমে আসে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে শওকত ডলিকে ঢাকায় এনে শাজাহানপুরের এক বাসায় তুলেন। এখানে তাঁর বড় ছেলে আরিফ শওকত পল্লবের জন্ম হয়। এরপর নারিন্দার ভূতের গলিতে বাসা নেন। এখানে মেজো ছেলে আসিফ শওকত কল্লোলের জন্ম। এরপর কিছুদিন থাকেন আরমানিটোলার হোস্টেল সুপারের কোয়ার্টারে। পরবর্তীকালে থাকেন ভাই ডা. ওসমান আলী সরকারের সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের কোয়ার্টারে। তারপর শওকত ৬৮ সনের দিকে টিকাটুলিতে কে.এম.দাস লেনের আড়াই কাঠা জমি নয় হাজার টাকা দিয়ে কিনে খুব কষ্ট করে, ধীরে ধীরে নিজের চারতলা বাড়িটা করতে সক্ষম হন। ততদিনে তাঁর ছোট ছেলে গালিব শওকত শুভর জন্ম হয়।[৭৭] শওকত ছাব্বিশ বছর বয়সে এখানে যোগদান করে টানা পঁচিশ বছর (১৯৬২-৮৭) জগন্নাথ কলেজে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে চাকরি করেন। সহকর্মী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন এক ঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিক ও কর্মবীরদের। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অজিত গুহ, আবদুল কাদের, হাসান হাফিজুর রহমান, রাহাত খান, আবুল কাশেম চৌধুরী, আব্দুল আজিজ আল আমান, হামিদা রহমান, মাহবুব তালুকদার, শামসুজ্জামান খান, মির্জা হারুণ-অর-রশিদ, হায়াৎ মামুদ, আহমদ কবির, শফিউল আলম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ।[৭৮] এঁদের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে শওকত নিজের সৃজনশীলতা মেলে ধরবার এক উর্বর ভূখণ্ড পান। গোটা ষাটের দশকের উত্তাল রাজনীতিকে কাছ থেকে অনুধাবন করার সুযোগও তিনি এখান থেকে পান। আবার গভর্নর মোনায়েম খান আক্রোশবশত জগন্নাথ কলেজকে সরকারিকরণ (১৯৬৮ সনের ১ আগস্ট) করায় অন্যান্য মুক্তমনা শিক্ষকদের মতো শওকতও খুব কষ্ট পান।[৭৯] কারণ এতে করে শিক্ষকরা নিজেদের ‘কর্মকর্তা’ ভাবতে শুরু করেন এবং সরকারের প্রতি নতজানু ভাব চলে আসে। প্রথমে অধ্যক্ষ পদ সরকারি করা হলেও শিক্ষকদের পদ ঝুলে থাকে। আর পূর্বের কর্মরত সকল সিনিয়র শিক্ষক জুনিয়র হিসেবে পরিগণিত হয় ।[৮০] যা স্বাধীনচেতা ও মুক্তমনা শওকত মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমোশনের ব্যবস্থা থাকলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। আবার ৬৭-৬৮ সনের দিকে তিনি শেরে বাংলানগরের ভাইয়ের বাসা থেকে কলেজে আসা-যাওয়ার জন্য যে-মেরুন রঙের প্রাইভেটকার ব্যবহার করতেন, তা সেনাবাহিনীর একটি কুচক্রী দল পুড়িয়ে দিলে শওকত খুব কষ্ট পান।[৮১]

এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর প্রমোশন পেয়ে তিনি বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়াতে প্রথমে সহ-সম্পাদক হন (১৯৮৭) এবং পরে সম্পাদক পদে (১৯৯০) উন্নীত হন। এখানে তিন বছর (১৯৮৭-৯০) চাকরির পর ৯০ সনে তিনি সরকারি আনন্দমোহন কলেজে বদলির নোটিশ পান। তবে যোগদানের পূর্বেই এক মাসের মাথায় সরকারি সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এখান থেকে তিনি ১৯৯৩ সনে অবসর গ্রহণ করেন। এর বছর খানেক পর ১৯৯৪ সনে শওকত তাঁর লন্ডনে বসবাসরত ভাই ডা.ওসমানের তত্ত্বাবধানে লন্ডনের ব্রুকস হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারি করান। এসময় তাঁর কিডনিতে পাথর, ডায়াবেটিকস ও উচ্চরক্তচাপ ধরা পড়ে। ১৯৯৬ সনের ১৬ ডিসেম্বর শওকতের স্ত্রী ডলি কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভারতের চেন্নাইতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৮২] স্ত্রী হারিয়ে শওকত অনেকটা ভেঙে পড়েন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে যান। এ নিঃসঙ্গতার প্রকোপ ও নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার কারণে ২০০২ সনে তিনি আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত হন। এ স্মৃতিবিভ্রাটের কারণে তাঁর লেখালেখি প্রায় থেমে যায় এবং তিনি অনেকটা মৃতের মতই দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকেন। অবশেষে ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ সনের (১২ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ) রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮.১৫ মিনিটে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ১১ মাস ১৩ দিন। শওকতের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে জুরাইন কবরস্থানে স্ত্রীর পাশে সমাহিত করা হয়। এভাবে জীবনাবসান ঘটে বাংলাসাহিত্যের ক্ষণজন্মা এ প্রাকৃত পুরুষের।

শওকতের মৃত্যুতে বাংলাদেশের সর্বমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের প্রিয় লেখককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এ দিনই বিকাল ৩ টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ছুটে আসেন। বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের তত্ত্বাবধানে শ্রদ্ধা নিবেদনের এ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। তাঁর মরদেহে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের রুহুল কুদ্দুস, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর গণসঙ্গীতশিল্পী ফকির আলমগীরসহ আরো জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী-সাহিত্যিক ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গ। উদীচী, বাঙলাদেশ লেখক শিবির, খেলাঘর, কচি-কাঁচার মেলা, কণ্ঠশীলন, হালখাতা, বটতলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাসদ (খালেকুজ্জামান), জাতীয় গণফ্রন্ট, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমোর্চা, নয়াগণতান্ত্রিক গণমঞ্চ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি, বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, বামমোর্চা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, জাসদ (শিরীন আক্তার), পাহাড়ি ছাত্রসংসদ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ছাত্রমৈত্রী, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় কমিটি-র মতো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ মৃত্যু উপলক্ষে শোকবাণী পাঠান বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং বিএনপি চেয়ারপার্সনের পক্ষ থেকে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান পার্টির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রমুখ। ৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসক্লাবে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নাগরিক শোকসভা পালন করা হয়।

শওকতের মৃত্যুসংবাদ সংবলিত সম্পাদকীয়সহ নানা মন্তব্য ও মূল্যায়নধর্মী লেখা দেশের সকল পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। এসব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, মন্তব্য ও সম্পাদকীয়তে শওকতের মূলত জীবন সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয় এবং জাতীয় জীবনে তাঁর অনন্য-সাধারণ অবদানের কথা তুলে ধরা হয়। কিন্তু এতে শওকতের সাহিত্যকৃতি ও কর্মের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন উঠে আসেনি। তারপরেও কয়েকটি মূল্যায়নের অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হল−

ক. ‘শওকত আলী আমাদের নানা শ্রেণি পেশার মানুষদের নিয়ে লিখেছেন। উত্তরবঙ্গ নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। তবে সবকিছুর মধ্যে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসটির কথা আলাদা করে বলতেই হয়। মধ্যযুগের বাঙালি জীবনের ইতিহাস আর নানা ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর বুনন এত যত্নে গড়া যে, এটি নিয়ে কথা বলতে গেলে বিস্তর বলা যাবে। শুধু এইটুকু বলি যে, বাংলা ভাষায় চিরদিনের সম্পদ এই বই।...তাঁকে নিয়ে যে কথাটি না বললেই নয়; সেটা হলো তিনি কখনো যশ, অর্থ-আত্মপ্রচারের পেছনে ছোটেননি। এসব ক্ষেত্রে তিনি একজন খাঁটি সাহিত্যিকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের বাংলাসাহিত্যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।...শওকত আলী সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার রেখে মহাসিন্ধুর ওপারে চলে গেলেন।...শওকত ভাই, মৃত্যুর ওপারে ভালো থাকুন আপনি; প্রিয় প্রাকৃত পুরুষ।’−[হাসান আজিজুল হক; দৈনিক *সমকাল*, শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮]

খ. ‘শওকত আলী প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাদের জীবন পরিবর্তনের কথা বলে গেছেন তিনি। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ অঙ্গীকার ছিল। নিজস্ব ভাষাশৈলীতে তিনি তা উপস্থাপন করেছেন। দার্শনিক অবস্থান থেকে তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন, বিদ্যমান অস্থির অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে জীবনকে আরো স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে হবে।'–[সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দৈনিক *প্রথম আলো*, শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮]

গ. 'প্রথম দিকের রচনায় তিনি সামাজিক অবক্ষয় তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে তুলে এনেছেন মানুষের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিবৃত্ত। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে সামাজিক অবিচার, অন্যায়ের কথা ফুটে উঠেছে। এসেছে গণমানুষের কথা। এভাবে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মূলত তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এক সংগ্রামী চেতনা। প্রগতিশীল ও স্বচ্ছদৃষ্টির লেখক ছিলেন শওকত আলী। তিনি বাংলাভাষার একালের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।'–[আবুল কাসেম ফজলুল হক; দৈনিক *জনকণ্ঠ*, শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮]

ঘ. 'বাংলা কথাসাহিত্যের অনন্য এই স্বরকে তিনি তাঁর গল্প আর উপন্যাসের ভেতর দিয়ে তুলে এনেছেন। বাংলার প্রাকৃতজন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবৈচিত্র্যকে তিনি ইতিহাসের নিরন্তর যোগাযোগের সূত্র ধরে বাংলার বিভিন্ন কালপর্বের জনমানুষের জীবনচিত্র; চেতনা ও প্রতিবাদ, দুঃখ-আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্তির নানা অবয়বকে চিত্রিত করে গেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে নতুন এক উচ্চতায় উন্নীত করতে শওকত আলীর ভূমিকা অপরিসীম।'–[সঞ্জয় ঘোষ; দৈনিক *সমকাল*, শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮]

ঙ. 'বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা ও অবয়ব নির্মাণ করেছেন যে কজন কবি-সাহিত্যিক, তাঁদের মধ্যে শওকত আলী একজন। কাজটি সহজ ছিল না। চলতি স্রোতে গা না ভাসানোর আরও দুটি পরীক্ষায় শওকত আলীকে পাস করতে হয়েছে। প্রথমটি ষাটের দশকের কলাকৈবল্যবাদের ফাঁদ। দ্বিতীয়টি ছিল বামপন্থী সাহিত্যের যান্ত্রিক ধারা। নিজেকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা বা সুযোগ পেলেই নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার সুযোগ আমরা সহজে হাতছাড়া করতে চাই না। শওকত আলীর অসাধারণ মানসিক শক্তি ও সাহিত্যিক রুচি অবলীলায় অতিক্রম করে গেছে এই দুর্বলতাকে। বাংলাদেশের সাহিত্যের মূলধারা নির্মাতাদের মধ্যে শওকত আলীও স্মরণীয় একজন'।–[জাকির তালুকদার; দৈনিক *প্রথম আলো*, মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮]

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলো মূল্যায়ন করে আমাদের এই প্রতীতি জন্মায় যে, শওকতের উপন্যাস ও গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা সমকালীন সমাজের প্রবহমান ধারা ও প্রবণতাকে বুঝতে পারি। এই ধরনের ফিকশন আমাদের কেবল চরিত্র বা কাহিনি উপহার দেয় না, যা দেয় তা হচ্ছে দেখবার মতো একজোড়া চোখ। কিছু কিছু লেখক আছেন যারা জীবন সম্পর্কে, চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেন। আমাদের তারা যা দেন, তা হচ্ছে দেখার চোখ, সমাজকে বোঝার যুক্তি এবং অনুভব করার মতো মন বা হৃদয়। এই ধরনের লেখকদের মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখকরাই অন্যতম। আর শওকত আলী ছিলেন এ ধারারই একজন অনন্য কথাশিল্পী।

সমাজ ও জীবনের ঘটনাবহুল পর্ব

শওকতের জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি নানা বৈচিত্র্যরাগে রঞ্জিত। একজন ত্রিকালদর্শী (ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামল প্রত্যক্ষদর্শী বিবেচনায়) কথাকার হিসেবে তিনি সাহিত্যে তুলে এনেছেন তাঁর শৈশবের দেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ, তেতাল্লিশের মারী-মঙ্গাময় মন্বন্তর; কৈশোরের দেখা সাম্প্রদায়িকতার হলাহলপূর্ণ ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগজনিত রাজনীতির পাশবিক প্রহসন, লাখো কৃষকের শ্রমে-ঘামে-রক্তে মেশানো তেভাগা আন্দোলন; যৌবনের দেখা কংসরূপী পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের চাপিয়ে দেয়া জগদ্দল পাথরের কণ্ঠরোধ করা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত অনমনীয় বাঙালির হার না মানা প্রতিটি সাফল্যের সংগ্রাম। আবার পরিণত বয়সের দেখা স্বাধীন বাংলাদেশের উল্টোরথযাত্রায় জেঁকে বসা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানো দেশবাসীর গণরোষে শাকুনিক দুঃশাসনের অবসান এবং প্রগতির পথে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গটিও পরম যত্নে আর পারঙ্গমতার সঙ্গে উপস্থাপনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর দীর্ঘায়ু জীবনের (১৯৩৬-২০১৮খ্রি.) অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যেমন ছিল বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি বিচ্ছেদ ও বেদনার জায়গাটিও ছিল গভীর-অপরিমেয়। পরাধীন ও স্বাধীন-ভারতের জীবন (১৯৩৬-১৯৫১), পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক দিনাজপুরের জীবন (১৯৫২-১৯৬১) এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রস্তুতি ও পরবর্তী ঢাকার জীবন (১৯৬২-২০১৮) নানা দিক থেকে ছিল বর্ণাঢ্য, বিপুল আর বৈচিত্র্যময়। এমন ঘটনাবহুল সময়, সমাজ ও রাজনীতি থেকেই শওকত নিয়েছেন জীবনের প্রথম পাঠ। এ দিক বিবেচনায় শওকতের সমগ্র জীবনপরিসরকে ক. রায়গঞ্জের জীবন খ. দিনাজপুরের জীবন ও গ. ঢাকার জীবন– এমন তিনটি পর্বে চিহ্নিত করা যায়। এতদ্বিষয়ে আলোচনা নিম্নরূপ:

রায়গঞ্জের জীবন

শওকত রায়গঞ্জের এক ক্ষয়িষ্ণু জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত প্রায় পনেরো-ষোলো বছরের জীবন অতিবাহিত করেন। এ জীবনপর্বের দুটি বছর (১৯৪১-১৯৪২) তিনি কাটান হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের মল্লিক

পাড়ায়। বাবা-মায়ের পড়াশোনা সূত্রে এখানে আগমন এবং এ সূত্রে শওকতও স্থানীয় শ্রীরামপুর মিশনারি স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়া সম্পন্ন করেন। তবে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে শ্রীরামপুরে এসে শওকতের বড় প্রাপ্তি যেটি ঘটে, তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আতঙ্ক-অস্থিরতার সঙ্গে পরিচয় এবং উদীয়মান নাগরিক সমাজে জীবনবাস্তবতার টানাপোড়েনের উপলব্ধি। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতে ও ভারতবাসীর মাঝে এর উত্তেজনা-আতঙ্ক সে-অর্থে তখনো স্পর্শ করেনি। কিন্তু অক্ষশক্তি জাপান ৪২ সনের২৮ জানুয়ারি বার্মায় বোমা বর্ষণ শুরু করলে এবং ১৫ মে-র মধ্যে সমগ্র দেশ দখল করে নিলে ভারতবাসীর মাঝে আতঙ্ক-উদ্বেগ দেখা দেয়। আর ৪২-এর ২০ ডিসেম্বর কলকাতার বুকে প্রথম জাপানি বোমা বর্ষিত হলে মানুষ চরম উৎকণ্ঠায় ব্যাপকহারে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটে। এমন ভয়ার্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি বালক বয়সী শওকত খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এমন পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে শওকত বলেছেন–

> ‘রাতে ব্ল্যাক আউট শুরু হয়ে গিয়েছিল।...এআরপি-র লোকেরা চিৎকার করে বলতো, দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখুন, ঘরের আলো যেন বাইরে না যায়। রাস্তার বাতি তো নেভানো থাকত। সব মিলিয়ে এক ভুতুরে পরিবেশ বিরাজ করছিল। পুরো শহর জুড়ে আবার একসঙ্গে সাইরেনও বাজানো হতো প্রতি রাতে। তখন বড়রা আল্লা-খোদা-ঈশ্বরের নাম ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কেউ কেউ সাহস করে ছাদে উঠে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিযে প্লেন দেখার চেষ্টা করত।...বড় রাস্তাগুলোতে বাস-ট্রাকভর্তি সৈন্যদের চলাফেরা করতে দেখতাম। এই সৈন্যদের মধ্যে কালো চামড়ার যেমন ছিল, সাদা চামড়ার সৈন্যও ছিল।’[৮৩]

এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আরেকদিকে নিত্যপণ্যের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায়। আবার শহুরে মানুষ দ্রুত গ্রামের দিকে পালাতে থাকলে শওকতের বাবার রোগীর সংখ্যাও কমে গিয়ে উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। তাই রাতের বেলা লাল আটার রুটি আর দিনের বেলা ডালভাত খেয়ে শওকতদের দিনাতিপাত করতে খুব কষ্ট হতো।[৮৪] এ পর্যায়ে শওকতের বাবা বাড়িতে চিঠি লিখে কিছু টাকা চেয়ে পাঠালে অর্থবহনকারী লোক তা আত্মসাৎ করায় পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে ওঠে । আবার চার মাসের ঘর ভাড়া বাবদ দুশো টাকা বাকি থাকায় বাড়িওয়ালা কচিবাবুর দুর্ব্যবহার, মুদি দোকানি পোদ্দার বাবুর গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়াতে পরিবারের অবস্থা আরো বিব্রতকর হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে শওকতের মায়ের ব্যবহৃত সোনার চুড়ি বিক্রি করে খাবারের সংস্থান হয়। তাই বাসাভাড়ার বকেয়ার জন্য বাড়ি ফেরারও উপায় ছিল না। ফলে শওকতের বাবা খোরশেদ আলী বাড়ি গিয়ে জমি বিক্রির টাকা এনে ভাড়া পরিশোধ করায় পরিবারে স্বস্তি ফিরে আসে।[৮৫] এমন বিচিত্র এক অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে শওকত রায়গঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই এ যুদ্ধের ব্যয়ভার ও সৈন্যদের খাবার মজুত করার অনিবার্য ফলস্বরূপ ৪৩ সনে সারা বাংলাজুড়ে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তেমন আন্তরিক উদ্যোগ না থাকাতে তা চরম আকার ধারণ করে। ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল গ্রাম থেকে মফস্বল শহরের দিকে ধাবিত হয়। কোথাও কোথাও সামাজিক উদ্যোগে লঙ্গরখানা চালু হলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং নানা অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত। ফলে অকাতরে মানুষ না খেয়ে মরতে শুরু করে। পথে-ঘাটে-মাঠে মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ দুর্ভিক্ষের ঢেউও এসে থানা শহর রায়গঞ্জে এসে লাগে এবং মঙ্গাপীড়িত রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম এলাকা থেকে মানুষজন এসে ভিড় জমায়। এসব দৃশ্য বালক শওকতকে গভীরভাবে পীড়িত করে। এ বিষয়ে স্মৃতিচারণসূত্রে শওকত জানান–

> ‘দূর এলাকা থেকে আসা বুভুক্ষুদের দল পথে-ঘাটে পড়ে থাকতো।...মানুষের ভিড় বেশি দেখা যেত হাটখোলায় ও রেলস্টেশনে। কখনো চিমসে, শুকনো, হাড্ডিসার মানুষদের রাস্তার ধারে বসে গাছতলায় কোকাতে দেখা যেত। কয়েকজন মডার্ন ভদ্রলোক কয়েক জায়গায় লঙ্গরখানা খুলেছিলেন।...শুনেছিলাম কলকাতার প্রধান সড়কগুলোর পাশে ভুখা মানুষের লাশ পড়ে থাকতো। আমিও একদিন সত্যি সত্যি মরা মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখি দুজায়গায়। একটা দেখেছিলাম বিকেলে রেলস্টেশনের দিকে। ওরা বাইরে থেকে আসা লোক ছিল।...ওদের বউরা মৃত বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করতো।’[৮৬]

এসব ঘটনা ও দৃশ্য কিশোর শওকতের মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। এ দুর্ভিক্ষের আঁচ প্রথম দিকে শওকতের পরিবারেও কিছুটা লেগেছিল। তাঁর মায়ের কথায় খোশালপুর থেকে শওকতের নানা গরুর গাড়িতে করে দুই বস্তা চাল নিয়ে আসেন। তবে শওকতের মায়ের শিক্ষকতার চাকরি ও বাবার ডাক্তারি পেশার বদৌলতে পরিবারে কিছুটা স্বস্তি আসে। এ যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের রেশ কাটতে না কাটতেই ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি জনমনে বড় হয়ে দেখা দেয়। আর রাজনীতির অঙ্গনেও হিন্দু-মুসলমান বিভাজন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি ক্রমশই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষী রূপ

নেয়। ৪৬-এর নির্বাচনে বাবার নির্দেশে শওকতকে মাত্র এগারো বছর বয়সে কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হকের নির্বাচনী এজেন্টের দায়িত্বপালন করতে হয়।[৮৭] কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ডামাডোল ও জোয়ারে মুসলিম লীগ প্রার্থীরই বিজয় ঘটে। এর রেশ শওকতের পরিবারের ওপর পড়ে। তাদের প্রধান বাড়িকে প্রায় একঘরে করে রাখা হয়। তাই দেখা যায়, তার দাদির মৃত্যু হলে ইংরেজি শেখা, গান শেখা, মেয়েদের চাকরি ও বেপর্দার অজুহাতে জানাজার নামাজে তেমন মানুষ পাওয়া যায় না। অগত্যা নিকটাত্মীয়রা মিলে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করে। এ প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্য স্মরণযোগ্য–

> 'দাদির দাফনের সময় লোকজন বেশি হয়নি। কুলখানিতে আশেপাশের মৌলভীরাও আসেননি। স্থানীয় মোল্লারা আমাদের প্রকৃত মুসলমান বলে গণ্য করতেন না। যদিও বাবা মাঝে মধ্যে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তেন, ঈদের জামাতেও অংশগ্রহণ করতেন। আমার মা ও দাদি নিয়মিত নামাজ-রোজা পালন করতেন। তবে বাবার কংগ্রেস করাটাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ধর্মের নামে গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। বাবা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ চাননি।'[৮৮]

এ রকম একটি উদার পারিবারিক পরিমণ্ডলে শওকত বেড়ে ওঠেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি তাদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে। ৪৬-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় কলকাতা, পাঞ্জাব, বিহার ও নোয়াখালীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হলেও হিন্দু-অধ্যুষিত রায়গঞ্জে এর প্রভাব তীব্রভাবে পড়েনি। এলাকার প্রগতিশীল শ্রেণি, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের সঙ্গে শওকতের বাবাও এ দাঙ্গা প্রশমনে সক্রিয় ছিলেন। রায়গঞ্জে খুনোখুনির ও অগ্নিপ্রজ্বলনের ঘটনা না ঘটলেও ছোটখাটো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। যা কিশোর শওকতেরও নজর এড়ায়নি। এ প্রসঙ্গে শওকত বলেছেন–

> 'যখন দাঙ্গা হয়েছিল, তখন আমি ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ি। স্কুলে যাবার সময় দেখলাম রাস্তার ওপর গরুর গাড়িতে যারা যাচ্ছিল, তাদের নামিয়ে ধরে নেয়া হচ্ছে। মায়ের বুক থেকে শিশুপুত্রকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। তাদের কান্না, হৈচৈ কানে ভেসে আসছিল। গরুর গাড়ির ভিতরে ছিল মুসলমান। আর হামলাকারীদের অধিকাংশই ছিল শিখধর্মাবলম্বী।'[৮৯]

পশ্চিমবাংলা থেকে মুসলমানদের দল বেঁধে পূর্বদিকে যাত্রা আর পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের পৈতৃক-ভিটেবাড়ি ছেড়ে পশ্চিমবাংলার দিকে চিরতরে যাত্রার বিষয়টি কিশোর শওকতের মনে প্রচণ্ড আঘাত করে। কতিপয় রাজনীতিবিদদের স্বার্থের মূল্য দিতে গিয়ে রাজনীতির এক নিদারুণ বলির শিকার হয় নিষ্পাপ-নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ মানুষ। নিমিষেই তারা নিজ দেশে পরবাসীতে পরিণত হয় । এমন অমানবিক সিদ্ধান্ত শওকত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। এত শুধু ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া নয়, বরং জন্মশেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য-জন্মপরিচয় থেকে স্থায়ীভাবে হারিয়ে যাওয়া। যাদের এ দুই দেশের সঙ্গে পেশা বা আত্মীয়তার কোনো সূত্র ছিল, তাদের পক্ষে এ দেশত্যাগ তেমন বেদনার ছিল না। কিন্তু যাদের কোনো বন্ধন বা দাঁড়াবার জায়গা ছিল না, তাদের কাছে এ দেশত্যাগ ছিল প্রচণ্ড বেদনার বিষয়। এ প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> 'আমাদের মতো যাদের দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগ করতে হয়েছে, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে তখন আমাদের কোনো সূত্র ছিল না। না ছিল চাকরি-বাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, না ছিল আত্মীয়-স্বজন। সম্পূর্ণ অচেনা একটা দেশ, আমাদের পক্ষে এ দেশে আসাটা ছিল এক অনিশ্চিত যাত্রা। এযে কী ট্রাজেডিপূর্ণ–- তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। জায়গা-সম্পত্তি, সহায়-সম্বল, ঘর-বাড়ি বিক্রি করে আসা বা এক্সেচেঞ্জ করাটা যে কত ঝামেলার ছিল–তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'[৯০]

শওকতের বাবা কংগ্রেস করায় তিনি যেমন স্থানীয় মুসলমানদের শত্রুতে পরিণত হন, তেমনি তার মা মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়াতে হিন্দুরা সন্দেহ করতেন। আবার ৪৮-এর এক উপনির্বাচনে শওকতের বাবা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে পরাজিত হন। ফলে তাকে স্থানীয় হিন্দুবন্ধু ও প্রতিবেশীদের দ্বারা বিদ্রূপ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত শওকতের মাকে লাঠিপেটা করা হয়, বড় বোনকে কলেজ গমনের পথে উত্যক্ত করা হয়, ছোট ভাইদের নাজেহাল করা হয়, বাবার ফার্মেসি ভাঙচুর করা হয় এবং কিছু জায়গা-জমি দখল করা হয়।[৯১] এমন পরিস্থিতিতে শওকতের বাবা ও মা কেউ দেশত্যাগ না করতে চাইলেও রায়গঞ্জে থাকা নিরাপদ ও সম্ভবপর ছিল না। কারণ হিসেবে শওকত জানান–

> 'দেশভাগ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে আমাদের পরিবার উভয় সংকটে পড়ে। আমার বাবা কংগ্রেস করতেন বলে মুসলমানদেরও শত্রু হয়েছিলেন। আবার মুসলমান বলে হিন্দুদেরও শত্রু হয়েছিলেন।'[৯২]

এমতবস্থায় ৪৯ সনে শওকতের মায়ের মৃত্যু হলে তাঁর বাবা কিছু জমি বিক্রি করে প্রথমে ছেলেমেয়েদের পূর্বপাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন দাঙ্গা বেশি দিন থাকবে না, পরবর্তীকালে পুনরায় সন্তানদের সগৃহে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তার এ আশা কোনোদিন পূরণ হয়নি।

দিনাজপুরের জীবন

'তোমরা যাও, আমি এদিক দিয়ে সব গোছগাছ করে আসছি'[৯৩]– একথা বলে খোরশেদ আলী শওকতের উপর তাঁর অন্যান্য ভাইবোনদের দায়িত্বভার দিয়ে সবাইকে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর পাঠিয়ে দেন। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করা পনেরো-ষোলো বছরের শওকত বাবার এ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন। এসময় স্থানীয় হিন্দুদের জবর- দখল এড়াতে শওকতের বাবা বিষয়-সম্পত্তি বিক্রির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করেন। এ সম্পর্কে শওকত জানান-

> 'আমাদের পরিবার যখনই বিপদে পড়ত কিংবা টাকার দরকার হতো; তখনই দেখতাম বাবা ও চাচা বাড়িতে বসে জায়গা-জমির কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন।'[৯৪]

এভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিছু জমি-জিরাত বিক্রি করে একটি বাড়ি কেনার জন্য তিনি নগদ কিছু টাকা শওকতকে দিয়েছিলেন । শওকত ভাইবোনদের নিয়ে প্রথমে একটি ভাড়া বাসায় এসে উঠেন। সবকিছু গুছিয়ে, নিজে ও ভাই-বোনদের স্কুল-কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে তিনি বাড়ি কেনায় মনোযোগ দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শওকতের বড় ভাই মোহাম্মদ আলী দুই বছর পূর্ব থেকেই নিরুদ্দেশ থাকায় সব দায়-দায়িত্ব শওকতের ঘাড়ে এসেই বর্তায়। এমতবস্থায় প্রায় মাসখানেক খোঁজাখুজির পর তিনি সাত হাজার টাকায় একটি বড় বনেদি বাড়ি কিনতে সক্ষম হন। এ বাড়ি কেনা প্রসঙ্গে শওকত বলেন–

> 'আমি দিনাজপুরে বাড়ি খোঁজ করতে থাকি। মাসখানেক খোঁজার পর এক ভদ্রলোক খোঁজ দিলেন এক হিন্দু ভদ্রলোক বাড়ি বিক্রি করবেন। বাড়িটি প্রধান রাস্তার লাগোয়া শহরের মধ্যেই ছিল কালীতলায়। বাড়িটি ছিল আড়াই বিঘার। দাম স্থির হয় তিন হাজার টাকা।...তবে দাম পড়েছিল সাত হাজার টাকা।'[৯৫]

এভাবে শওকত নিজেকে দক্ষ ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলেন। এ বাড়ি কেনায় এবং ৫৩ সনের দিকে শওকতের বাবা স্থায়ীভাবে চলে আসাতে সবার মনে স্বস্তি ফিরে আসে। শওকতের টিউশনি, বড়বোনের স্কুলে শিক্ষকতা এবং বাবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সংসারে সুখ ও সচ্ছলতা ফিরে আসলেও খোরশেদ আলীর দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে তা বিনষ্ট হয়। সংসারে বিমাতার আগমন এবং বাবার এ হঠকারী কর্ম প্রসঙ্গে শওকত বলেন–

> 'রাত প্রায় এগারোটা। আমরা সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় বাবা উঠানে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন, এই মহাম্মদ, চাঁদ, মর্জিনা আসো– দেখ কাকে এনেছি। উঠানে দৌঁড়ে এসে আমি তো হতবাক, লাল কাপড় পরনে একজন মহিলা। বাবা বললেন, এ তোমাদের মা, সালাম কর। আমরা তখন বয়সে পরিপক্ব হয়েছি। এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই আমরা কেউ সালাম করলাম না। এ ঘটনার জন্য আমাদের সৎ মা কোনোদিন আমাদের ক্ষমা করতে পারেননি।'[৯৬]

খোরশেদ আলীর এ দ্বিতীয় বউয়ের নাম ছিল মনোয়ারা বেগম। বিধবা মনোয়ারা বেগমের মোহসীনা নামের এক মেয়েও ছিল। এ মেয়েসহ তিনি শওকতদের বাড়িতে এসে উঠেন। কিন্তু শওকতরা কোনো ভাইবোনই বাবার এ হঠকারী সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ মোহাম্মদ আলী, শওকত ও মর্জিয়ানা– এরা সবাই তখন ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। ফলে বাবার এ কাজকে তাদের চোখে রীতিমতো অন্যায়-অপরাধ হিসেবে প্রতিভাত হয়। তাই সংসারে অনিবার্যভাবে কলহের সূত্রপাত ঘটে। আবার শওকতের বাবা রাজনীতিসচেতন, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও উদার স্বভাবের হলেও ফ্যামেলি প্লানিং এর বিষয়টি তিনি মানতেন না। ফলে একজন ডাক্তার হয়েও এবং বাজারে জন্মনিরোধক 'স্পার্ম কিলিং কেমিক্যাল'[৯৭] থাকলেও তিনি তা গ্রহণ না করায় দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দ্রুত তিন ছেলে ও চার মেয়ের জন্ম হয়।[৯৮] অর্থাৎ মোহসীনাকে ধরে শওকতের বিমাতার সন্তানসংখ্যা আটজনে গিয়ে উন্নীত হয়। ফলে স্বল্প আয়ের সংসারে অধিকসংখ্যক

সদস্যের চাহিদা মেটাতে গিয়ে পারিবারিক সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়। বাধ্য হয়ে শওকতরা বিমাতার সংসার থেকে পৃথক হয়ে যান। পূর্বের মতো এবারও সংসারের পুরো দায়ভার শওকতের ওপর এসে বর্তায়। এ প্রসঙ্গে শওকত জানান–

> ‘আমি টিউশনি করে নিজের খরচ চালিয়ে যেতাম। উপরন্তু আমার ছোট ভাইবোনদেরও দেখাশোনা করতাম। আমার বড়বোনও টিউশনি-শিক্ষকতা করতেন। আমরা ভাইবোন দুজনে আয় করে পুরো সংসার চালাতাম।’[৯৯]

পারিবারিক এ দুর্দিনে শওকতের বড় ভাই নিরুদ্দেশ হয়ে রংপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে দায়িত্ব এড়াতে পারলেও শওকত তা পারেননি। তিনি ভাইবোনদের প্রতি বরাবরই ছিলেন সহানুভূতিশীল, দায়িত্ববান ও নির্ভরতার প্রতীক। ছোট ভাইদের লেখাপড়ার খরচ চালানো ও দেখভালের বিষয়ে শওকত সর্বদাই সচেতন ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধ বাবাকেও তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিয়মিত হাতখরচ পাঠাতেন। এসময় বি.এ শ্রেণিতে পড়াবস্থায় শওকত ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন সফল করতে মিটিং-মিছিল ও জনসংযোগ করেন। মওলানা ভাসানী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, বরদা চক্রবর্তীদের মতো বাম নেতাদের সংস্পর্শ পেয়ে তিনি আরো উজ্জীবিত হন। শওকতকে ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতির পদও দেয়া হয়।[১০০] কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শওকতের রাজনীতিতে জড়ানোর মূলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি সীমাহীন ক্ষোভ ও বিরূপতাই ক্রিয়াশীল ছিল। এ প্রসঙ্গে শওকতের ভাষ্য–

> ‘মানসিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণাটির সঙ্গে আমার শৈশব থেকেই বিরূপ মনোভাব ছিল। দেশ ভাগের পর এখানে সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া কীভাবে হৃদয়ে ক্ষত তৈরি হয় তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।...নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, যারা মার খেয়ে দেশত্যাগ করে অন্য জায়গায় আসে, তারা স্থানীয়দের ওপর এই একই অত্যাচার করে। এ বিষয়গুলো আমাদের সামনে ঘটতো। স্থানীয় হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা হয়েছে, ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে এসব করানো হতো। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি কখনোই আমার আনুগত্য বা শ্রদ্ধা জাগেনি।’[১০১]

তাঁর দেশত্যাগের বেদনা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সহপাঠীদের সংস্পর্শ, কলেজে হাজী মোহাম্মদ দানেশের ইতিহাস ক্লাশের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য এবং সমকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড ও রাজনীতির বিষয়ে শওকতের স্বচ্ছ ধারণা উপলব্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে । ফলে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শওকতের বিশ্লেষণ ছিল–

> ‘নতুন জায়গায় ভিত গড়ার চেষ্টা বটে, কিন্তু চারদিকের ঘটনায় মনের মধ্যেকার অনিশ্চয়তাবোধ থেকেই গেল। কারণ নতুন জায়গার জীবন তো রাজনৈতিক অস্থিরতায় টালমাটাল। তখন কলেজে পড়ি, ভাষা আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়েছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ৫৪-সনের নির্বাচনে পাকিস্তান কায়েমকারী মুসলিম লীগের নাম- নিশানা পূর্ববাংলা থেকে মুছে যাওয়ার দশা হলো। বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিল। ৯২/ক ধারা জারি করে হাজার হাজার মানুষকে জেলে পোরা হল। আর তাতে বোঝা গেল পূর্ণ-আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই পূর্ববাংলার রাজনীতিতে প্রধান হয়ে ওঠবে। কিন্তু রাজনীতি সরাসরি সেদিকে গেল না। শুরু হলো নানা ধরনের টাল-বাহানা আর দলাদলি।’[১০২]

সমকালীন রাজনীতিতে বামদলের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সামরিক সরকারের লোভ ও ক্ষমতার দাপটে পড়ে জাতীয় রাজনীতি ক্রমশই জটিলরূপ ধারণ করে এবং পতন-পচনে সংক্রমিত হয়ে ওঠে। তাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ সমর্থিত আওয়ামী লীগ জোরালো অবস্থান তৈরি করতে পারলেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামদলগুলো জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে ওঠে। তবুও শওকত আদর্শের কারণে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং নয় মাসের মতো তাঁকে অন্যায়ভাবে কারাবন্দি করে রাখা হয়। এ জেলজীবন প্রসঙ্গে শওকতের ভাষ্য–

> ‘কলেজে পড়ার সময় বহু তরুণের মতো আমিও আন্দোলনে শামিল হয়েছি, আর তাতে কারাবাসের অভিজ্ঞতা নানা দিকে নজর দিতে শিখিয়েছে। তেভাগা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়। এমনকী দাগি আসামিদের সঙ্গেও গল্পগুজব হতো। তবে সবাই যে-দাগি আসামি ছিল, তা নয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে শরিক হাজংদের নানা ধরনের ফৌজদারি মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে সাজা খাটানো হয়েছিল। তাদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ হতো।’[১০৩]

এ জেলজীবন সূত্রেই শওকত পূর্ববাংলার তৃণমূলের কৃষক-শ্রমিক ও আদিবাসী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। এখান থেকেই এ সরল অথচ প্রতিবাদী অসহায় মানুষের প্রতি শওকতের যে-দরদ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তা সারাজীবনই বলবৎ ছিল। জেলমুক্ত হয়ে শওকত বি.এ পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় যান। পূর্বপরিচিত হাসান হাফিজুর রহমানের মাধ্যমে সিকান্‌দার আবু জাফরের সঙ্গে জানাশোনা হয় এবং *সমকাল* পত্রিকায় যুক্ত হন। তবে ৫৫ সনে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে, পড়াশোনা শেষ করতে এবং ৬২-এর সেপ্টেম্বরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ চাকরি পাবার পূর্ব পর্যন্ত এ সাত বছর (১৯৫৫-১৯৬২) শওকতকে অমানুষিক পরিশ্রম, অর্থকষ্ট, পারিবারিক ঝামেলা ও রোগ-শোকের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়। এতদ্বিষয়ে শওকতের স্বীকারোক্তি–

> ‘বিএ পাসের পর বাংলা বিষয়ে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হই। কিন্তু ৫৫ সালের ভর্তির বছরেই আমাকে দিনাজপুরে ফিরে যেতে হয়। কারণ অন্য কিছু নয়, টাকা-পয়সার অভাব। পরের বছর আবার ঢাকায় এসে গৃহশিক্ষকতা ও দৈনিক *মিল্লাত* পত্রিকায় চাকরির সুযোগ পেলাম। ভাগ্যে জুটে গেল তখনকার ঢাকা হলে থাকার জায়গাও। এখানে টেনেটুনে কাটল দুই বছর। এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে গন্তব্য আবার দিনাজপুর। এখানে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করলাম অল্পদিন; কিন্তু ভালো লাগেনি। কারণ বেতন কম, আবার রাজনীতির জন্য আমার পেছনে পুলিশের খবরদারি তো ছিলই। তাই আবারও ঢাকায় ফেরা। এসময় সিকান্দার আবু জাফর আমাকে *সমকাল* পত্রিকার দেখভালের দায়িত্ব নেওয়ায় কথা বললে রাজি হই আমি। কিন্তু এ যাত্রায়ও বেশিদিন থাকতে পারিনি আমি। দিনাজপুরে ভাইবোনেরা নানা ঝামেলায় পড়েছিল। সুতরাং আবার ফেরত যাত্রা। নতুনভাবে ফের মাস্টারি চাকরি– বীরগঞ্জ হাই স্কুলে।...ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন কলেজ খোলা হয়েছে, দরখাস্ত করেও যেতে পারিনি। তখন আমি ব্রেইন ফিভারে আক্রান্ত।...পরে ঠাকুরগাঁও কলেজে চাকরির সময়ই বিয়ে করলাম।...এরপর আর বেশিদিন আমার ঠাকুরগাঁও থাকা হয়নি। ততদিনে ঢাকা থেকে লেখালেখির তাগিদ বেড়ে গেছে। অতএব চলো ঢাকা যাই।’[১০৪]

এভাবে জীবনের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করে শওকতকে এ সাত বছরে চার বার ঢাকা থেকে দিনাজপুরে দৌড়ঝাঁপ পারতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশের কাছে হার না মানা শওকত চতুর্থবারের মতো ঢাকায় এসে জীবন-পরীক্ষায় সাফল্য খুঁজে পান। *সমকাল* পত্রিকায় চাকরিরত অবস্থায় ৬২ সনের সেপ্টেম্বরের এক তারিখেই তিনি জগন্নাথ কলেজের চাকরিতে যোগদান করেন। এ চাকরির মাধ্যমে অব্যাহত সংগ্রামমুখর ও অস্থিতিশীল জীবনে শওকত স্থিতি ও স্বস্তির একটি ঠিকানা খুঁজে পান। শওকতের দিনাজপুরের অতিবাহিত এক দশকের (১৯৫২-১৯৬২) জীবন পর্যালোচনা করলে কয়েকটি তাৎপর্যময় প্রান্ত শনাক্ত করা যায়। যেমন–

- ক. ভাইবোনসহ গোটা পরিবারের দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে দেশত্যাগ করে দুঃসাহসের পরিচয় দান।
- খ. ম্যাট্রিক পাশ করা কিশোর বয়সেই নিজেদের বসবাসের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করার গুরুদায়িত্ব পালন।
- গ. পিতার দ্বিতীয় বিয়ের কারণে বিপর্যস্ত পরিবারে ছোট ভাইবোনদের অভিভাবকত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।
- ঘ. আদর্শিক কারণে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে মানবিক রাষ্ট্রের প্রত্যাশায় প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যোগদানের দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ঙ. নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষাসমাপ্ত করে নিজ যোগ্যতায় অবশেষে জগন্নাথ কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে উন্মূলিত জীবনে শক্ত-পোক্ত মাটিতে দাঁড়ানোর সক্ষমতা অর্জন।

পোড়খাওয়া শওকত এভাবে জীবনপাঠশালায় পাঠ নিতে নিতে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলেন। জীবনের এ স্থিতির ঠিকানাই তাঁকে পরবর্তীকালে সৃজনের পথে পৌঁছে দেয়। জীবনের এ বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁর শিল্পসৃষ্টির রসদ হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ঢাকার জীবন

জগন্নাথ কলেজে যোগদান করে শওকত মৃত্যু-পূর্বপর্যন্ত (১৯৬২-২০১৮) অর্থাৎ প্রায় ছাপ্পান্ন বছর রাজধানী ঢাকাতেই বসবাস করেছেন। এ দীর্ঘ পাঁচ দশকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির নানা উত্থান-পতন খুব কাছ থেকে অবলোকনের সুযোগ তিনি পেয়েছেন। গোটা ষাটের দশকের উত্তাল রাজনীতির গতি-প্রকৃতি জগন্নাথ কলেজে চাকরিসূত্রে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা শওকতের জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। মার্ক্সবাদে আস্থাশীল ও রাজনীতিসচেতন শওকতের পক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির স্বরূপ অনুধাবন করা অনেকটা সহজলব্ধই ছিল। তিনি অপেক্ষাকৃত উদার ও সংস্কারপ্রবণ চীনপন্থীতে আস্থাবান থাকলেও অসাম্প্রদায়িক, মানবিক জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণে আমৃত্যু প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির মঞ্চে বারবার সামরিক শাসকের আগমন, জাতিরাষ্ট্রকে কূটকৌশলে ধর্মরাষ্ট্রে রূপদান, বামপন্থীদের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাছে পরাভব মানার কারণে শওকত কিছুটা হতাশ হলেও ভেঙে পড়েননি। তিনি বারবার আস্থা রেখেছেন শ্রমজীবী কৃষক-মজুর-শ্রমিকদের মতো মেহনতি মানুষের প্রতি। তাই মাঠের রাজনীতিতে তিনি সেই অর্থে সক্রিয় না থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়, দিক-নির্দেশনায় দল ও দেশকে পরামর্শ দানে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। ৬৮ সনে জগন্নাথ কলেজ সরকারিকরণ হলে একজন সরকারি চাকুরে হিসেবে তাঁর রাজনীতি চর্চার জায়গা ক্রমশই সীমিত হয়ে পড়ে। তারপরেও তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ৮ম জাতীয় সম্মেলন (১৯৯৩) বাঙলাদেশ লেখক শিবিরে যোগদান করেন। প্রথমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি (১৯৯৭-২০০০) থাকলেও পরবর্তী ৯ম জাতীয় সম্মেলন

(২০০০) থেকে সভাপতির (২০০০-২০১০) দায়িত্ব পালনসহ দীর্ঘদিন যুক্ত থাকেন। আহমদ শরীফ, বদরুদ্দিন উমর, সরদার ফজলুল করিম, আহমদ কবির, আবুল কাশেম ফজলুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও আনু মুহাম্মদদের মতো বিদগ্ধ জনের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ শওকতের চিন্তা-চেতনাকে আরো বেশি উদার, স্বচ্ছ ও শানিত করে। তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, অজিত গুহের মতো বিদগ্ধজনকে। আর জগন্নাথ কলেজে সহকর্মী হিসেবে পান অজিত গুহ (তাঁর শিক্ষক ও সহকর্মী), আবদুল কাদের, হাসান হাফিজুর রহমান, রাহাত খান, আবুল কাশেম চৌধুরী, আবদুল আজিজ আল আমান, হামিদা রহমান (শওকতের ঢা.বি-র সহপাঠিনী), মাহবুব তালুকদার, শামসুজ্জামান খান, মির্জা-হারুণ-অর-রশিদ, হায়াৎ মামুদ, আহমদ কবির, শফিউল আলম, সৈয়দ আবদুল হাদী (বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং আবদুল মান্নান সৈয়দকে। এসকল বহুমুখী প্রতিভাধর সহকর্মীদের সংস্পর্শ শওকত আলীর মানসলোককে পরিশীলিত ও সৃজনশীল করে।

আবার কালীপূজাসহ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বলধা গার্ডেনের টয় হাউসে প্রফেসর অজিত গুহের নিমন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'মিলন সংঘ' নামক আড্ডাতেও শওকত নিয়মিত যোগদান করতেন। এসভায় মিলিত হতেন– অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহীম, ডা. ইব্রাহীম, রণেশ দাশগুপ্ত, আরজ আলী মাতুব্বর, জয়নুল আবেদীন, শওকত ওসমান, কামরুল হাসান, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর,সরদার জয়েন উদ্দিন, সরদার ফজলুল করিম, সত্যেন সেন, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, নূরুল হুদা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ।[১০৫] এসব মুক্তমনা জ্ঞানী-গুণীদের সান্নিধ্য শওকতের জন্য ছিল এক বিরাট প্রাপ্তি। অন্যদিকে বিভাগের সহকর্মীদের নিয়ে নৈশশাখার ক্লাস করতে গিয়ে কলেজে 'ফুচকা-দইবড়া সমিতির' আড্ডাও শওকতকে উজ্জীবিত করে। আবার জনসন রোডের 'র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট ফোরামের' বামদলীয় তত্ত্বের আলোচনা সভাতেও শওকত মাঝে-মধ্যে যেতেন। এখানেও আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও শওকত ওসমানের মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের আনোগোনা ছিল।[১০৬] আর বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ, অধ্যাপক ড. অজয় রায়, কামাল লোহানী, সাংবাদিক আতাউস সামাদ, ভাস্কর নিতুন কুণ্ডু ও চলচ্চিত্রতার সুভাষ দত্ত প্রমুখ। এদের সান্নিধ্য-সংস্পর্শ শওকতের সাহিত্যভাবনারই শুধু নতুন দিগন্ত খুলে দেয়নি বরং তাঁকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল, মানবিক ও সংবেদনশীল চেতনায় অভিষিক্ত করে। এপর্যায়ে শওকতের চরিত্রের বিভিন্ন প্রান্তস্পর্শী কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা জরুরি। যা তাঁর মানসলোককে অনুধাবনে সহায়ক হবে। যেমন–

ক. 'সিনিয়রিটির দিক থেকে শওকত সাহেবের স্থান চার নম্বরে হলেও অজিত বাবু ডিপার্টমেন্টের সব ভার শওকত আলীর ওপরই চাপিয়ে রেখেছিলেন।...অজিত বাবু যতদিন জগন্নাথ কলেজে ছিলেন, ততদিন শওকত আলী সাহেব এইসব দায়িত্ব পালন করতেন।'[১০৭]

খ. 'পাকিস্তান সরকার ৬৭ সনের জুন মাসে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিল। তখন সাংস্কৃতিক সংগঠন *চারণিক*-এর উদ্যোগে মাঝে-মধ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো। এতে শওকত আলীও আলোচনায় অংশ নিতেন'।[১০৮]

গ. 'জীবনানন্দ দাশের কোনো এক কবিতার শব্দার্থ নিয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হাসান হাফিজুর রহমান ও আবদুল আজিজ আল আমানের মধ্যে বিতর্ক হয়। এতে শওকত আমান সাহেবের মতামতকে সমর্থন করেন। ফলে হাসান হাফিজ শওকতের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখেন। এ অবস্থাতেই বাংলা বিভাগের বনভোজনে জয়দেবপুর যাবার পথে টঙ্গী এলাকায় গিয়ে শিক্ষকদের জিপগাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে উল্টে যায়। হাসান হাফিজ ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ার সময় শওকত আলী খুব দ্রুত নিজের হাতটি তার মাথার নিচে বিছিয়ে দেন। এতে শওকত আলীর হাতটি জখম হলেও হাসান সাহেব নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান'।[১০৯]

ঘ. 'শওকত আলী প্রতি মাসেই বাদামতলী থেকে রিকশায় করে বস্তাভর্তি চাল নিয়ে আসতেন। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি নিজের বাসাবাড়ির সঙ্গে একটি ছাপরা ঘর করে কয়েক সন্তানের জননী এক কাজের মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন। তারা সেখানে থাকে আর প্রতিদিন রাতের বেলা খায়'।[১১০]

ঙ. 'শওকত আলী ৬৮ সনের দিকে টিকাটুলির কে.এম দাশ লেনে দুই কাঠার একটি প্লট কিনেন সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়ে। বেতনের টাকা, লেখা বইয়ের রয়্যালিটি, পত্রিকার লেখা বাবদ টাকা দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বাড়িটি সম্পন্ন করেন। তাঁর এ মিতব্যয়ী স্বভাবের কারণে অনেকে শওকত আলীকে 'কৃপণ' বলতেন। অথচ আমি জানতাম, তিনি নিজের সংসার চালিয়েও বৃদ্ধ বাবা, ছোট-ভাইবোনদের নিয়মিত টাকা পাঠাতেন'।[১১১]

চ. ‘৭১-এর ২৫ মার্চ ঢাকা আক্রান্ত হলে শওকত আলী তাঁর ডাক্তার ভাই ওসমানের শেরে বাংলানগরের কোয়ার্টারে আটকা পড়েন। পরে ২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল হলে, ওসমানের শ্বশুর বাড়ি ও নিজের এক সমুদ্ধির বাড়ি মুন্সিগঞ্জ গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু জুন মাসে কাজে যোগদান না করলে চাকরি চলে যাবে– এমন নোটিশ হলে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন। ভাগ্যগুণে তিনি ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার কবল থেকে বেঁচে যান। বামপন্থী হিসেবে এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বিবেচনায় তাঁর নামও হত্যার তালিকায় ছিল। আবার ৭৫ সনে অনেকে সুবিধা পেতে বাকশাল-এ যোগদান করেন। অথচ তিনি নানাবিধ চাপ থাকা সত্ত্বেও বিরত থাকেন। ক্ষমতা, পুরস্কার ও স্বার্থের মোহের কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি’।[১১২]

ছ. “শওকত আলীর দাম্পত্যজীবনে প্রাচুর্য না থাকলেও প্রেম, ভালোবাসা, বোঝাপড়া ও আনন্দে ভরপুর ছিল। তাই স্ত্রী গুরুতর কিডনি রোগে আক্রান্ত হলে তিনি দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিডনির জন্য পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং ভারত পর্যন্ত গিয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি এমন প্রগাঢ় প্রেম, ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা দেখে অনেকেই তাঁকে ‘স্ত্রৈণ’ বলতেন”।[১১৩]

জ. ‘১২ ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে ছিল শওকত আলী ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্মদিন। বাঙলাদেশ লেখক শিবির থেকে এদিনটি ইলিয়াসের জন্মদিন পালন করা হত। অথচ শওকত আলী এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে দীর্ঘদিন থাকার পরেও তাঁর জন্মদিনের বিষয়টি গোপন রাখেন। পরে অবশ্য জানাজানি হয়ে যায়। এমনি মহৎ আর উদার মনের মানুষ ছিলেন তিনি’।[১১৪]

ঝ. ‘শওকত আলী স্যার শুধু একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকই ছিলেন না বরং ছাত্রদের যথার্থ অভিভাবকের দায়িত্বও পালন করেছেন। ক্লাস এবং ক্লাসের বাইরে তিনি সবাইকে অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। সহকর্মী ও ছাত্রদের সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিতেন। তাঁর দরজা সবার জন্য ছিল অবারিত। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখার প্রশংসা, স্বীকৃতি ও সম্মান তিনি যেভাবে করেছেন, আমার জানামতে এমন আর কাউকে করতে দেখিনি। বহু সুযোগ থাকার পরেও তিনি নোটবুক ও ফরমায়েশি লেখা লেখেননি। তিনি জীবনের মোহের কাছে কখনো পরাজিত হননি’।[১১৫]

ঙ. “টেলিভিশনে কাজ করার কারণে চারিত্রিক স্খলনের সন্দেহে আমার বিয়েটা আটকে যায়। এ বিষয় নিয়ে আমার হবু শ্বশুর শওকত স্যারের মতামত জানতে গেলে তিনি এক বাক্যে বলে দেন– ‘আমার যদি একটি মাত্র সন্তানই থাকতো মেয়ে; তাহলে সেই মেয়েকে আমি আমার ছাত্র আলী ইমামের সঙ্গে বিয়ে দিতাম।’ স্যারের এমন একটি কথাতেই আমার বিয়েটা হয়ে যায়। তিনি এমন উদার মনের অধিকারী ছিলেন”।[১১৬]

ট. ‘খোকন (শওকতের ছোট ভাই রোউফ) সম্পর্কে আমার ভয় হচ্ছে। ও নিজেকে একাকী ভাবছে বলে মনে হল। কিছুটা জেদি আর হিংসুটে বলে মনে হল। পরীক্ষায় ফেল, বাবার কাছ থেকে অবহেলা, ভাইবোনদের কাছ থেকে অনাদর–এসবই ওর মনে খুব গভীরভাবে দাগ কেটে যাচ্ছে। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিনাজপুর থেকে বাইরে সরিয়ে আনা দরকার। ওর এই রকম মানসিক অবনতি ঘটতে থাকলে ও (খোকন) শেষপর্যন্ত কারো সুখ সইতে পারবে না।...কেউ এসব চিন্তা করে দেখে না। আমি ওকে বলে এসেছি যে, ঢাকায় বাসা খুঁজছি– পেলেই ওকে নিয়ে আসবো। মিতা, খোকনের জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। মা মৃত্যু শয্যায় ওকে বড়বোন আর বড় ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ওদের সে-কথা বোধ হয় মনেই নেই। আমাকে কিছুই বলে যাননি। অথচ আমাকেই ওদের আজ দেখতে হচ্ছে’।[১১৭]

ঠ. ‘শওকত আলীর নিখাদ-নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব আজ পর্যন্ত বেইমানি করেনি। তাঁর প্রণয় আমাকে বহু সময় অব্যর্থ শক্তি জোগায়। শওকত আলী সাহিত্যের পথেই উপরে ওঠার জন্যে অনেক স্থূল, সস্তা ও সংক্ষিপ্ত পথ ধরতে পারতো আরো অনেকের মতো। বা সুযোগসন্ধানীর মতো বসে রাজনীতির বুলি কপচিয়ে শ্রেণিগত উত্তরণ লাভ করতে পারতো। কিন্তু সে বেছে নিয়েছে সুকঠিন ব্রতচারীর পথ। সস্তা জনপ্রিয়তার পথ নয়।...শওকত আলী সেই সব সংখ্যালঘু লেখকদের একজন, যারা নিঃসঙ্গ কিন্তু নির্ভুল পথের পথিক।’[১১৮]

উপর্যুক্ত বক্তব্য ও বিবৃতি থেকে শওকতের চরিত্র ও ব্যক্তিমানসের দায়িত্বশীলতা, সাহসী মনোভাব, মহানুভবতা, দয়াধর্ম, মিতব্যয়ী স্বভাব, নির্লোভ, আদর্শে অবিচল এবং ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। ব্যক্তি, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও অভিভাবক– এ চার পরিচয়েই শওকত ছিলেন সফল ও সার্থক।

সাহিত্য-ভাবনা ও শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ

জীবনের প্রতি আস্থা, সমাজসচেতনা ও ঐতিহ্যচেতনা– এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা শওকত আলীর শিল্পিসত্তায় আমৃত্যু ক্রিয়াশীল ছিল। দেহাতীত অপার্থিব জীবন নয় বরং রক্তমাংসের পার্থিব জীবনই শাশ্বত ও মূল্যবান–এ উপলব্ধিই শওকতের আধুনিক জীবনবাদী ভাবনার ফলশ্রুতি। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সাহিত্যিক-শিক্ষক-ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সততার সাধনা তাঁকে সাহিত্যাঙ্গনে এক স্বাতন্ত্র্যের জায়গা করে দেয়। জীবনতৃষ্ণা, ঐতিহ্য-অন্বেষা, সমাজ ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকার থেকেই শওকত দ্বিতীয় বিশ্বসমর-পরবর্তী ক্রমজটিল সময়-সমাজ-জনজীবনের সংকট ও সম্ভাবনার জায়গাটি

উপস্থাপন করেছেন। শওকত সচেতনভাবেই সাহিত্যকে কোনো তত্ত্ব বা দর্শনের মাধ্যম না করে বরং একে পরিণত করেছেন সমাজসত্য ও জীবন-সত্যের হাতিয়ারে। কারণ শওকতের কাছে জীবনধর্ম ও সাহিত্যাদর্শ বা সাধনা সর্বদাই ছিল সমার্থক। এ শিল্পসাধনাই ছিল শওকতের জীবনসাধনার রূপান্বিত রূপ। এ সাধনায় শওকত সারা জীবনই ছিলেন অনড়, অবিচল ও আপসহীন। দীর্ঘ পাঁচ দশকব্যাপী (১৯৬৩-২০১১) সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে শওকত সময়-সমাজ-জনজীবন ও রাষ্ট্রকাঠামোর সকল সংকটকে যেমন রূপায়ণ করেছেন, তেমনি এ সংকট-উত্তরণে দিয়েছেন দিকনির্দেশনা। যুগের অনিবার্য দাবিতে সমাজের ভাঙচুর, রূপ-রূপান্তর, প্রযুক্তির আবাহন সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত যে-জীবনের মূল্যমান ও ঐতিহ্যই বড় হয়ে ওঠে– এটিই ছিল শওকতের সাহিত্যাদর্শের মৌল অন্বিষ্ট। প্রবল জীবনতৃষ্ণা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সমাজজ্ঞান ও শ্রমজীবী মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনায় আস্থা–এসবই শওকতকে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস ও সমাজে প্রচলিত মিথের বাইরে গিয়েও অনুদ্‌ঘাটিত সত্য, সম্ভাবনা ও শক্তির জায়গাটি শনাক্তকরণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।শওকতের বিচিত্র বিষয়ে অন্বেষা, শিল্পরীতিতে নিরীক্ষা-প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির রূপ-রূপান্তরের মূলে প্রচণ্ড জীবনজিজ্ঞাসা, সমাজচিন্তা, ইতিহাস-জ্ঞান ও ঐতিহ্যপ্রীতি ক্রীয়াশীল ছিল। এ পর্যায়ে শওকতের সাহিত্য-ভাবনা ও শিল্পদৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও মূল্যায়নযোগ্য।

কৈশোরে মায়ের করুণ মৃত্যুর ঘটনা শওকতের মনে গভীর ছাপ ফেলে। এ জন্যই হয়তো তাঁর মনে ডাক্তার হবার বাসনা ছিল।[১১৯] কিন্তু দেশভাগের অভিঘাত আর পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে শওকতের জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। ফলে তিনি ডাক্তার না হয়ে একজন লেখক হয়ে ওঠেন। নিজের লেখক হওয়ার প্রসঙ্গে শত্তকত বলেছেন–

> ‘চাঁদ নামটাই আমার পারিবারিক ডাক নাম। সবাই তাই ডাকত। আর ভালো নাম শওকত আলী। এই চাঁদ থেকে আমি শওকত আলী হয়ে উঠলাম অর্থাৎ লেখক হয়ে উঠলাম। মাঝে মাঝে ভাবি, লেখক হলাম কেন? লেখক হওয়া কি আমার নিয়তি ছিল’?[১২০]

আসলে জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দেখার শক্তি ও সংবেদনশীল হৃদয়– এসবই লেখক হবার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত। আর এর সঙ্গে যদি পারিবারিক একটি সৃজনশীল পরিমণ্ডল ও আবহ থাকে, তবে সেখান থেকে লেখক হয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শওকত তাঁর এ সহায়ক পারিবারিক প্রতিবেশ সম্পর্কে বলেন-

> ‘ছোট বেলা থেকেই গল্পের বই পড়তাম। বাড়িতে আমার বাবার বই পড়ার ঝোঁক ছিল। মায়েরও ছিল একই ঝোঁক। পত্র-পত্রিকা আসতো নিয়মিত– *আনন্দ বাজার, যুগান্তর,প্রবাসী ও সওগাত*। এগুলো পড়তে পড়তেই আমার বড় হয়ে ওঠা, মনের মাঝে বাসা বাঁধলো লেখালেখির বাসনা।... তৃতীয় শ্রেণীতে থাকার সময়ই আমার মনে হতো আমি কি কবিতা লিখতে পারবো? তখন কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম।...এরপর লিখতে চেষ্টা করলাম গল্প। সে-সব গল্পের বিষয় ছিল বাস্তবজীবন থেকে নেওয়া। বাস্তব বলতে আমার দেখা চারপাশটাই বুঝতাম। যেমন গাছ থেকে আম পাড়া নিয়ে গল্প, পলো দিয়ে জেলেদের মাছ ধরার গল্প।...এই বিষয়গুলোই আমার জীবনের পরিধি বাড়াচ্ছিল’।[১২১]

শওকতের রাজনীতিসচেতন চিকিৎসক বাবা, স্কুলশিক্ষিকা মায়ের পড়াশোনার আগ্রহ, বাড়িতে বই ও সাহিত্য পত্র- পত্রিকার সংগ্রহ, মায়ের শিক্ষা ও পেশাসূত্রে সেলাই মেশিন দিয়ে সব ভাইবোনের জামা কাপড় তৈরিতে দক্ষতা অর্জন, সংগীত চর্চার পারিবারিক ব্যবস্থাপনা[১২২]– এসব প্রেক্ষাপটই শওকতকে সাহিত্য সৃজনে প্রণোদনা যুগিয়েছে। এছাড়া শওকতের লালনসংগীত, কবিগান, কাওয়ালী গানের ভক্ত এবং বাউল-সন্ন্যাসী স্বভাবের চাচা সিরাজ উদ্দিন আহমদের সান্নিধ্য, লেখার প্রবণতাও শওকতকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে।[১২৩] শওকতের বাবাও লেখালেখি করতেন এবং তার একটি প্রবন্ধের বইও রায়গঞ্জ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। আবার নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রবস্থাতেই এক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার হিসেবে বই প্রাপ্তির ঘটনাও শওকতের লেখক হয়ে ওঠার সোপান হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে রায়গঞ্জের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ার সুযোগ এবং সিলেবাস বহির্ভূত সাহিত্যের-বই ও পত্রিকা পড়ার প্রচণ্ড নেশা, পারিবারিক শাসনকে উপেক্ষা করে এসব গল্পের বই পড়ার কৌশলী তৎপরতা শওকতের লেখক সত্তাকে পুষ্টি যুগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শওকত বলেছেন -

> ‘লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই নিয়ে আসতাম। এভাবে গল্পের বই পড়াটা আমার একসময় নেশা হয়ে ওঠে। মা আমার মতিগতি বুঝে শাসন করা শুরু করেন। তখন আমি বই পড়ার একটা উপায় বের করি, তা হল গাছে মাচা বেঁধে সবার অজান্তে বই পড়া শুরু করি।’[১২৪]

এভাবে শৈশব থেকে বইপড়ার এক প্রচণ্ড নেশা শওকতের মধ্যে জেগে ওঠে। বাবা-মা-চাচার বাইরেও তাঁর দাদির সান্নিধ্য-সংস্পর্শ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কারণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মা-বাবা শৈশবে শ্রীরামপুর থাকায় শওকতকে দাদির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে হয়। ফলে অবসর সময়ে ও রাতের বেলা দাদির মুখে শোনা রূপকথার গল্পগুলো তার মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। এর স্বীকারোক্তিস্বরূপ শওকত বলেছেন-

> 'আমি ছোট বেলা থেকেই লেখক হতে চেয়েছিলাম। দাদির বানানো রূপকথা আমাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। তখন থেকেই পণ করি, আমি আমার ভাষায় মানুষের কষ্টের কথা, সংগ্রামের গল্প বলবো।'[১২৫]

নবম শ্রেণির ছাত্রবস্থাতেই শওকতের মায়ের করুণ মৃত্যু ঘটে। তাঁর মা সালেমা বেগম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন রোগ শয্যায় পড়ে থাকেন। মায়ের এ প্রতিকারহীন কষ্ট কিশোর শওকতকে দারুণভাবে আঘাত করে। এসময় তাঁর মা তাঁকে বিছানার পাশে বসে পছন্দের লেখকদের বই পড়ে শোনাতে বলতেন। মায়ের এ অন্তিম ইচ্ছেপূরণ করতে গিয়ে শওকত আরেক নূতন দিগন্তের সন্ধান পান। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শওকত জানান–

> 'আমার মা একসময় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে-নিজে বই ধরে পড়তে পাড়তেন না। কিন্তু তার পড়ার ইচ্ছাটা যেহেতু খুব প্রবল ছিল, তাই তার কথামতো তার পাশে বসে আমাকে পড়ে শোনাতে হতো। রাত জেগে জেগে পড়ে পড়ে শোনাতাম। তখনকার দিনে যারা ভাল লেখক যেমন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাদের লেখা প্রায় সবই পড়ে ফেলেছিলাম। তখন আমি ক্লাস নাইন-এর ছাত্র। এক সময় মা মারা গেলেন। মা মারা যাবার পরই অনুভব করলাম পড়তে পড়তে আমার ভেতর লেখার কেমন একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে। তখনকার অনুভূতিগুলো লিখতামও খাতায়। এ থেকেই বোধ হয় লেখালেখিটা শুরু হয়ে যায়।'[১২৬]

পারিবারিক জীবনের এ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, কতিপয় বেদনাদায়ক ঘটনা এবং সেই সঙ্গে গোটা উত্তাল চল্লিশ দশকের দ্বিতীয় বিশ্বসমর, অসহযোগ আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো রক্তক্ষয়ী ঘটনা– এসব কিছু মিলিয়েই শওকতের লেখকসত্তা পেয়ে যায় সৃজনশীলতার এক উর্বর ভূমি। অন্তরপ্রভাবী সমকালের এসব ঘটনাতরঙ্গের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শওকত জানান-

> 'আমার প্রজন্মের মানুষের অনেককেই ভয়ানক ঘাত-প্রতিঘাতময় সময় পাড়ি দিতে দিতে জীবনযাপন করতে হয়েছে। জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার সময়ই শুনতে পাই দুনিয়াতে যুদ্ধ হচ্ছে।... ঐ যুদ্ধ চলার সময় আবার লেগে গেল দুর্ভিক্ষ।... ক্রমে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ শেষ হলো বটে, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখে স্লোগান শোনা যেত লাগল। এক দিকে জয়-হিন্দ আর ভারত মাতা কী জয়, অন্যদিকে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।...দেখা গেল চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বউ-বাচ্চা, ভাইবোন, মা-বাবাকে নিয়ে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা যেদিকে, মুসলমানরা তার উল্টো দিকে। একদিন রাতের অন্ধকারে গাঁটরি-বোঁচকা ঘাড়ে নিয়ে আমাদেরকেও জন্মভূমি আর ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে হলো। এসব ঘটনায় সর্বস্ব হারানো মানুষের অসহায়ত্ব যেমন দেখা গেছে, তেমনি দেখা গেছে নতুন জায়গায় বসবাসের জন্য ভিতগড়ার দুর্মর ইচ্ছা এবং প্রাণপণ চেষ্টাও।'[১২৭]

সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এমন ঝড়-ঝাপ্টা আর অভিঘাত শওকতের মানসলোকে যে-বেদনার অঙ্কুশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়, সেই রক্তাক্ত ক্ষত তাঁর কোনো দিন শুকায়নি। সকল বেদনা ছাপিয়ে শওকতের মনে দেশত্যাগের বেদনা, জন্মশেকড় ছেঁড়ার হাহাকার সবচেয়ে বেশি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এসব বেদনা ও হাহাকার নিয়েই শওকত নতুন দেশ পূর্বপাকিস্তানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকিস্তান শাসকদের প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক মানসিকতা, গোটা পাকিস্তানকে ইসলামি ধর্মরাষ্ট্রে রূপদানের অপচেষ্টা, মুসলিম লীগের মরণঘণ্টা বেজে ওঠার উপক্রম, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমূহ সম্ভাবনায় প্রগতিবাদী শওকত বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যুক্ত হন। যার দরুন তাঁকে সরকারের রোষানলে পড়ে নয় মাসের কারাবরণ করতে হয়। ডিগ্রি ক্লাসের একজন পরিণত বয়সের ছাত্র হিসেবে শওকতের এ কারাজীবন তাঁর মানসলোকের নূতন দরজা-জানালা খুলে দেয়। কৃষক নেতা হাজী দানেশ ও বরদা চক্রবর্তীদের সান্নিধ্য এবং জেল লাইব্রেরির সফোক্লিসের ত্রয়ী নাটক *ইদিপাস রেক্স*, রমা রোঁলার *জাঁ ক্রিস্তফ* ও মাওলানা মোহাম্মদ আলীর অনূদিত *কোরআন শরিফ*[১২৮]– এর অধ্যয়ন শওকতকে জীবনের এক ভিন্নপাঠে দীক্ষিত করে। আর সহবন্দি আদিবাসী সাঁওতাল, পোলিয়া, মুর্মু, মুণ্ডাদের সঙ্গে পরিচয় লাভ শওকতের জীবনভাবনায় আমূল পরিবর্তন আনে। এ প্রসঙ্গে শওকতের স্বীকারোক্তি–

'জেলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমার ভেতর একটা ভিন্ন জিনিস কাজ করল। মানে একদিক দিয়ে জেলে যাওয়াটা আমার জন্য শাপে বর হল। জেলে গিয়ে আমার লাভই হল। জেলের ভেতরে আমি তেভাগা আন্দোলনের বন্দিদেরও পেয়েছিলাম। আমি তাদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতাম। আমি পোলিয়াদের সঙ্গেও মিশেছি। এদের সঙ্গে কথা বলে, মিশে আমার মনে হয়েছে– সত্যি এরা মাটির মানুষ। এই পোলিয়ারা আমার দেখা সেরা মানুষ।... তেভাগা আন্দোলনের বন্দি, আদিবাসী, পোলিয়া, রাজবন্দিসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমার মাথার মধ্যে ইতিহাসের পোকাটা ঢুকে গেল। ঐতিহ্য,সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব–এসব বিষয় আমার মধ্যে কাজ করতে থাকল। জেল থেকে বের হলাম ঠিকই, কিন্তু এসবের পোকা আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করতে থাকলো।'[১২৯]

এভাবে আদিবাসীদের সঙ্গ ও সংস্পর্শ লাভ শওকতকে জীবন, সমাজ ও জগৎকে নতুনভাবে ভাবার প্রণোদনা যুগিয়েছে। আদিবাসীদের জীবনের সহজাত সারল্য, রক্তে মেশা প্রতিবাদের বারুদ, তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বিপ্লবগাথা আর শক্তি-সঞ্জিবনী ঐতিহ্য– এসবই শওকতের জীবনের বড় প্রাপ্তি। এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই শওকত কারামুক্ত হন এবং নিজের মধ্যে ডুব দেন। এসময় কিছু গল্প আহসান হাবীব সম্পাদিত *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় এবং ৫৫ সনে কলকাতার বামপন্থী *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় বের হয়।[১৩০] বি.এ পরীক্ষা দিয়ে শওকত ঢাকায় পাড়ি জমান এবং হাসান হাফিজুর রহমানের মারফতে *সমকাল* পত্রিকার সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফরের সঙ্গে পরিচয় ও পত্রিকায় যুক্ত হন। *সমকাল* ছাড়াও তিনি *মিল্লাত*, *মিঠেকড়া* পত্রিকায় কাজ করেন। পরের দিকে *পাকিস্তানী খবর, নাগরিক ও পূবালী* পত্রিকাতেও তাঁর বহু লেখা প্রকাশ পায়। তবে নিজের লেখক হয়ে ওঠার পেছনে শওকত কবি হাসান হাফিজুর রহমান ও কবি-নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফরের অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে শওকত বলেন–

'বিএ পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসে জুটে গেলাম কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। তাঁর সূত্রেই পরিচয় হলো *সমকাল* পত্রিকার সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফরের সঙ্গে। তখন থেকেই *সমকালে* লেখালেখি ও কাজের শুরু। আজ পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, এই দুই কীর্তিমান লেখক আমার লেখক জীবনকে নানাভাবে পরিচর্যা করেছেন।'[১৩১]

শওকতকে লেখার ব্যাপারে নানাভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন কবি আহসান হাবীব, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, সিকান্‌দার আবু জাফর, শিক্ষক অজিত গুহ, মুনীর চৌধুরী ও আহমদ শরীফসহ পরবর্তীকালের অনেক সহকর্মীই। তবে লেখার প্রকৃত প্রেরণার প্রাণবীজ শওকত সংগ্রহ করেছেন তাঁর ফেলে আসা শৈশবের জন্মভূমি, জেলজীবনের আদিবাসী মানুষজন, টিউশনি ও শিক্ষকতাসূত্রে ঢাকার জীবন এবং প্রথম কর্মসূত্রে ঠাকুরগাঁওয়ের তৃণমূলের জনপদ থেকে। এ প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য–

'কারাবাস শেষে কলেজের পাঠ চুকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গৃহশিক্ষকতার সুবাদে ঢাকার মধ্যবিত্ত পরিবারে নাগরিক জীবনযাপনের নানা টানাপোড়েনের ঘটনা চোখে পড়ে। তরুণদের রাজনীতি, সংস্কৃতিচর্চা,প্রেম-ভালোবাসা, কিংবা প্রতারণা আর স্বার্থপরতা সংক্রান্ত বহু কিছু জানার সুযোগও ওই সময়ই হয়। তারপর ঠাকুরগাঁও কলেজে শিক্ষকতা করার সময় ওই অঞ্চলের গরিব কৃষিজীবী, বিশেষ করে আদিবাসী রাজবংশী আর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। ঠাকুরগাঁও আর দিনাজপুরে যাওয়া-আসার পথে বাসের ড্রাইভার-হেলপারদের সঙ্গে পরিচিত হই, বন্ধুত্বও হয় অনেকের সঙ্গে। কর্মজীবনে শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা হওয়ার ফলে আমার এই ধারণা জন্মায় যে,আমরা ভদ্দরলোকেরা এঁদের থেকে আলাদা। এঁদের চিন্তাভাবনা, জীবনযাপন–সবই অন্য রকম, যার নাগাল সহজে পাওয়া যায় না। অথচ পুরো সমাজটাই দাঁড়িয়ে আছে এদেরই ওপর।'[১৩২]

শওকত এ পর্যায়ে গ্রাম, মফস্বল ও নাগরিক জনজীবনের সঙ্গ-সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতায় নিজেকে ঋদ্ধ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শওকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.এ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েও সিলোবাস বহির্ভূত পড়াশোনায় ডুবে থাকতেন এবং নিজেকে লেখক হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেন। এ বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন শওকতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ও বিখ্যাত লেখক আবু বকর সিদ্দিক। তিনি বলেছেন–

'প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা আমাদের দুজনেরই চোখের বিষ।...আমরা দুজনে কোনো দিন সিলেবাস শাসিত বিদ্যা উদ্ধারের জন্যে চেয়ারের দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যাইনি।...লেখালেখি নিয়ে কত যে পরিকল্পনা করতাম আমরা দুটি বন্ধুতে। সত্যি বলতে কী, আমাদের জীবন সর্বস্ব সাহিত্যেই সঁপে বসেছিলাম। আমাদের ধ্যান-জ্ঞান সবই ছিল সাহিত্যে। আমি লিখি গল্প কবিতা; শওকত লেখে কবিতা আবার গল্পও।'[১৩৩]

তবে নাগরিক জীবনের মিথ্যা, মেকি, পাপ, প্রতারণা, ভণ্ডামি ও স্বার্থের টানাপোড়েনের চেয়ে তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছে ধুলো-মাটিতে জড়ানো, প্রকৃতির সংস্পর্শে গড়ে ওঠা সহজ-সরল, সৎ, শক্তি, সম্ভাবনাময়, প্রাণবান ও ঐতিহ্যলগ্ন কৃষক-শ্রমজীবী আদিবাসী মানুষজন ও জনপদ। নাগরিক সমাজকে রেখে এ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বন করার মূলে শওকতের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কোনো অনুষঙ্গ জড়িত নয় বরং এক্ষেত্রে তাঁর সহজাত স্বভাবই ক্রিয়াশীল থেকেছে। শওকত তাঁর এ পক্ষপাতের কারণস্বরূপ বলেছেন–

> ‘বীরগঞ্জে চাকরি করার সময় একজন কৃষককে আমি খুঁজে বের করেছিলাম। তেভাগা আন্দোলনের সময় যে খুব সক্রিয় ছিল। তখন বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। শরৎকালের ব্যাপার। সে সকাল-বিকাল মাঠের আলের মধ্যে শুয়ে থাকে। আমি বললাম কী করো এখানে, শুয়ে থাকো কেন? বলে, এখানে গান শুনি। কিসের গান? সে বলে, এই যে বীজ ফেলা হয়েছে ধানের, বীজটি যখন চারা হয়ে একটু একটু করে ওপরে উঠছে, গান গাইতে গাইতে উঠছে। ওই গানটা আমি শুনতে পাই। এটা শোনার পরে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল আমার। এই যে মাটির কাছে তৃণমূলের মানুষ–এদের কল্পনা বলি, আবেগ বলি, প্রেম বলি এগুলো তাদের কর্মের সঙ্গে যুক্ত। তারা প্রকৃতির একটা অংশ। এটা যখন অনুভব করি, তখন প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে।’[১৩৪]

শওকত এমন নিবিড়ভাবে তৃণমূলের জীবন, জীবিকা, তাদের আচার-আচরণ-উচ্চারণ, তাদের বিশ্বাস ও বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে যেতেন। শওকতের এ দেখা ও দেখানোর মধ্যে কোনো দূরত্ব ছিল না। সাধারণ দৃষ্টিতে অনেকের কাছে গ্রামের মানুষকে নির্জীব, নির্বীর্য, অলস আর অসচেতন বলেই মনে হয়। কিন্তু তাদের মাঝে যে-প্রচণ্ড রকমের প্রাণশক্তি, প্রতিবাদের বারুদ ও সঙ্ঘশক্তি রয়েছে– তা শওকত শনাক্ত করে দেখিয়েছেন। এটিই শওকতের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার সবচেয়ে বড় এক শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও সততার জায়গা। শিক্ষকতার স্বল্পবেতনের চাকরি, ভাড়া বাসার ঝামেলা এবং সংসারের টানাপোড়েনের দুশ্চিন্তায় একবার শওকতের স্ত্রী তাঁকে এ চাকরি ও লেখালেখির বিষয় ছেড়ে অন্যত্র চাকরি গ্রহণের তাগিদ দেন। তখন তিনি স্ত্রী ডলির উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে জানান–

> ‘নিজের রাস্তা আমি খুঁজে পেয়েছি। নিজের মনের বিশ্বাস আমি খুঁজে পেয়েছি–এতকাল এলোমেলো পথে হেঁটেছি। সাহিত্যচর্চা ছাড়া অন্য কিছু আমি করতে পারি না। আমাকে দিয়ে আর অন্য কিছু হবে না। কতবার করে বলবো সে কথা।’[১৩৫]

শওকত স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখক হবার কঠোর ব্রতচারীর পথটি বেছে নেন। জীবনের মোহ,যশখ্যাতি ও বিত্তবিলাসের পথ পরিহার করে গণমানুষের কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করেন। একজন লেখক হয়ে এবং নাগরিক জীবনে বসবাস করেও শ্রমজীবীদের পক্ষাবলম্বন করার কারণ হিসেবে শওকত বলেছেন–

> ‘আজ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিই হলো প্রধান কথা। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির চেষ্টাই এখন সমাজকে বিকাশের ও সৃজনশীলতার নতুন প্রান্তে নিয়ে চলেছে। এই জন্যেই বর্তমান অবস্থায় একজন লেখক নিজেকে সম্পর্কিত রাখবে...শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে, কৃষাণের সঙ্গে, শ্রমিকের সঙ্গে। এ সম্পর্ক রাখা লেখককে সৃজনশীল রাখার জন্যেই। কেননা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেই সমাজ রূপান্তরের বীজ উপ্ত হচ্ছে। দিক বদলের হাওয়া যেখান থেকেই নতুন মোড় নিচ্ছে– সেখানেই লেখককে থাকতে হবে। তার রচনার প্রাণরস সেখান থেকেই উঠে আসবে। সুতরাং গভীর জীবনোপলব্ধির তাগিদে, সৃজনশীলতার নতুন নতুন দুয়ার খুলে দেওয়ার জন্যেই লেখকের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে উপায় নেই। শিল্পীর একটাই পক্ষ, আর তা হলো জনগণের পক্ষ।’[১৩৬]

শওকত তাঁর লেখক সত্তার এ সৃজনশীলতার জন্য গোটা সমাজের চালিকাশক্তি মাটিলগ্ন মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়া, তাদের ধারাবাহিক লড়াই-সংগ্রাম উপলব্ধি এবং সমাজের মানবিক বিকাশ ও বৈষম্য নিরসনে এ শ্রমজীবীদের পক্ষ নিয়েছেন। তাই দেশত্যাগের পর শওকত নাগরিক সমাজের একজন হয়েও বীরগঞ্জ চিরিরবন্দর এলাকায় নিয়মিত যেতেন এবং তেভাগা আন্দোলনের রোমহর্ষক কাহিনি কৃষকদের মুখ থেকে গভীর আগ্রহে শুনতেন।[১৩৭] এসকল অভিজ্ঞতা আর নিজের সাবেকি জোতদার পরিবারের উত্তরাধিকারকে অনুভূতির রসায়নে ফেলে শওকত রচনা করেন *সম্বল* (১৯৮৬), *নাঢ়াই* (২০০৩), *মাদারডাঙার কথা*-র (২০১১) মতো উপন্যাস এবং *লেলিহান সাধ* (১৯৭৮) এর মতো ছোটগল্প। আর উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বসবাসরত আদিবাসীদের জীবনযাপনের ধারা, তাদের ঐতিহ্যচেতনা, তাদের সততা-বিশ্বাস-একাগ্রতা ও শ্রমনিষ্ঠা শওকতকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। বাঙালি সমাজের শাশ্বত এ অংশের যাপিত জীবনকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশা শওকতের মাঝে চেপে বসে।[১৩৮] ফলে শওকতের হাতধরে বেরিয়ে আসে *উন্মূল বাসনা* (১৯৬৮) ও *শুন হে লখিন্দর* (১৯৮৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একাধিক বিস্ময়কর ছোটগল্প। তৃণমূলের সঙ্গে একাত্ম হবার নেশা শওকতের ঢাকা শহরে বসবাস করার সময়েও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁর বাসায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দীর্ঘদিন ভাড়া থেকেছেন। এ সুবাদে দেখা যেতো বাসার নিচতলায় জুতা সেলাই করতে আসা চর্মকারের সঙ্গে দুজনের মিলে গল্পের

আসর জমানো, টিকাটুলির হর দে গ্লাস ফ্যাক্টরির চাকরি হারানো শ্রমিকদের সঙ্গে হাস্যরসাত্মক গল্প করা, ৭৪-এর দুর্ভিক্ষে রংপুর থেকে আসা মঙ্গাপীড়িত নারীদের জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করা, কলেজ থেকে ফেরার পথে টয় হাউসের সামনে নেমে ঢাকাইয়া রিকশাচালকদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া এবং ঠাটারি বাজারের মাছ বিক্রেতাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়ার ঘটনা[১৩৯]– এসব বিষয় ও প্রবণতা শওকতের তৃণমূলের প্রতি প্রবল তৃষ্ণার পরিচয় বহন করে। এমন অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে শওকত লিখেছেন *উত্তরের খেপ* (১৯৯১) উপন্যাস এবং *বাবা আপনে যান* (১৯৯৪) নামক ছোটগল্প।

শওকতের লেখার মূল ভিত্তিই ছিল বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা। জীবন বাস্তবে যেমন, তাকে ঠিক তেমনভাবে উপস্থাপনেই শওকত সর্বাংশে মনোযোগী ছিলেন। চারপাশের জীবন, জগৎ ও প্রকৃতিকে দেখার দুটি তীক্ষ্ণ চোখ ও উপলব্ধির একটি সংবেদনশীল হৃদয় শওকতের সর্বদাই সজাগ ছিল। বৈচিত্র্যরঞ্জিত ও বর্ণাঢ্য জীবনের নির্যাস ও আঁষ-শাঁস থেকেই শওকত বাস্তবমণ্ডিত করে তাঁর সাহিত্যভুবন নির্মাণ করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে শওকত জানান–

> 'যা লিখেছি, তাতে নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা কম হোক বা বেশি হোক...তা আমার অভিজ্ঞতাজাত। এমনকি কল্পনার আশ্রয়ে যে জীবন ও ঘটনার অবতারণা করেছি, তার ভিত্তিও বাস্তবনির্ভর ও ইতিহাসভিত্তিকও বলা যায়। যে-সময়ে জীবনকে দেখতে শুরু করেছি, সেই সময় এবং দেখার বিষয়বস্তু তো লেখার মধ্যে আপনা থেকেই এসে যায়। অথবা লেখককে তা বের করে আনতে হয় জীবনোপলব্ধি থেকে। লেখকের রচনায় আকাশ-পাতাল কল্পনা থাকলেও তার রচনার বিষয় ও ঘটনাবলির মধ্যে মানুষের জীবনের বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে আসে।'[১৪০]

এভাবে জীবন জঙ্গমতাকে জারিত করেই শওকত রচনা করেছেন– *যাত্রা* (১৯৭৬), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯), *দলিল* (২০০০), *বসত* (২০০৫) ও *শুধু কাহিনী-র* (২০০৭) মতো উপন্যাস। এসব উপন্যাসে তাঁর আত্মজৈবনিকতার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। শওকতের সাহিত্য সৃজনে জীবনবাস্তবতার নানা পর্বের বিচিত্র অনুষঙ্গ ক্রিয়াশীল ছিল। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদের মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য:

> 'শওকত আলীর বড়বিত্ত– অভিজ্ঞতা। সারা উত্তর বাংলার জীবনের ওপর তাঁর বিপুল দখল। নানা ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। সেই সাথে আহরিত হয়েছে টুকরো টুকরো জীবনের অসংখ্য নিটোল, কোণছেঁড়া, ধূসর, রুক্ষ, রক্তিম ছবি। সেই সঙ্গে পরিবেশ আর প্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ছায়া ফেলে তাঁর লেখায়।...এটি তাঁর রচনার একটি বড় ঐশ্বর্য বটে।'[১৪১]

ইতিহাস ও ঐতিহ্য রূপায়ণের প্রচলিত ধারাতে শওকতের স্বস্তি বা আস্থা ছিল না। কারণ তিনি ইতিহাসের বীরপূজা (cult-worship) করেননি। এ জন্য শওকত সমাজের প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস ও মিথকে ভেঙেছেন এবং এর প্রকৃত পরিচয় ও নির্যাসকে খনন করে তুলে এনেছেন। কেননা– 'ক্ষমতাবান ও শাসকশ্রেণির হাত ধরেই রচিত হয় ইতিহাস এবং তাদের নামেই মিথ গড়ে ওঠে। এ শাসকশ্রেণির হস্তক্ষেপেই মিথের প্রকৃত পরিচয় যেমন চাপা পড়ে যায়, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষ তার ভুল ব্যাখ্যাও তৈরি করা হয়।...তাই রাজায় রাজায় যে-যুদ্ধ ঘটে তা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। কিন্তু রাজায়-প্রজায় যে-নিরন্তর লড়াই চলে তার ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না'।[১৪২] তাই ত্রয়োদশ শতকে বাংলার রাজনীতির চরম অস্থিতিশীলতার সুযোগে আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলজীর আগমন এবং প্রাণ ভয়ে রাজা লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন– এমন প্রচলিত ইতিহাসকে শওকত মানতে পারেননি। এজন্য তিনি *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪) উপন্যাস রচনা করে আমাদের দেখিয়েছেন; এটি শুধু একদিনের এক রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র ছিল না। কারণ এর মূলে রাজনীতির চেয়ে সামাজিক অশান্তি, অস্থিতিশীলতা, বৈষম্য-বিভেদই অতি মাত্রায় দায়ী ছিল। তাই নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দু ও অস্তিত্বসংকটে পতিত বৌদ্ধরা বর্ণবাদী রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরিবর্তে বখতিয়ার খিলজীর দেশ দখলকে স্বাগত জানিয়েছিল। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ডামাডোলে বাংলার ইতিহাসে মানুষের পলায়ন কেবল তুর্কি বখতিয়ার খিলজীর সময়েই হয়নি। বরং শওকত দেখিয়েছেন– এধারা আর্যদের সময়ে, মোঘলদের সময়ে, ব্রিটিশদের পলাশী যুদ্ধের সময়ে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বিদ্যমান ছিল।[১৪৩] যে-অন্ধকার, যে-ভালোবাসা, যে-নির্মম হত্যাযজ্ঞ মানব সংসারে নিরন্তর বয়ে চলছে তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর সান্ধ্যবেলায়; মাটির অনেক গভীরে লুকিয়ে রাখা মুক্তোর মতো।[১৪৪] ইতিহাসের এ শাশ্বত সত্যকেই শওকত *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছেন।

ষাটের দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এক দিকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ–এই দুই মিলে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনও সহজ সরল পর্যায় থেকে ক্রমশই জটিলতর রূপ নেয়। যার অনিবার্য প্রভাব পড়ে এদেশের সাহিত্যেও। ভাব-ভাষা- বিষয় ও আঙ্গিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতাও সাহিত্যিকদের মাঝে জেঁকে বসে। কিন্তু শওকত সেই প্রথম ঢেউয়ের ঝাঁপটাতেও মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। অতি আধুনিকতার এ তরঙ্গে কিছুতেই গা ভাসাননি। শওকত নিজ পথে একাকী হয়েও অবিচল থেকেছেন। এ বিষয়ে শওকতের বন্ধু কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

> ‘ষাটের দশকের শুরুতেই আমাদের সাহিত্য আড়মোড়া ভেঙে একটুখানি মোচড় দিয়ে বুর্জোয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সে এক বিরাট ব্যাপার।...একদিকে পশ্চিমা বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের দুরন্ত হাওয়া বইছে; মধ্যবিত্ত শ্রেণি আকার নিচ্ছে, শিক্ষিত মানুষের ব্যক্তি হয়ে ওঠার চেতনা দেখা দিয়েছে– অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে দেশ তখন পশ্চিম পাকিস্তানের পেটে সেঁধিয়েছে । আইয়ুব খানের সামরিক শাসন খুঁটো গেড়ে বসেছে।...বিকৃত নাগরিক বুর্জোয়া বিকাশের প্রতিফলিত একটু খানি ধাক্কা সহজে এসে পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। তাতেই সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক ইত্যাদি নিয়ে উৎকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। শওকত আলীকে দেখি খুব কম দু-চার জনের মধ্যে আধুনিকতার তরঙ্গে কিছুতেই গা ভাসাতে গররাজি। ধরে আছেন কুলবিদ্যার মতো তাঁর সেই জনজীবনের কঠিন মাটি।’[১৪৫]

তাই দেখা যায়, সাতচল্লিশ-পরবর্তী গত চার দশক জুড়ে অস্থির-উন্মাতাল ও টানটান সময় সমাজজীবনের ভেতর-বাইরের ভাঙচুর এবং অস্তি-নেতির অনিবার্য দ্বন্দ্ব– এসব নিয়েই শওকত তাঁর নিজস্ব ঢঙে সমকালকে উপস্থাপন করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছেন– *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩), *ত্রয়ী দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫-১৯৮৬), *পতন* (১৯৯২), *অবশেষে প্রপাত* (১৯৯৬), *স্ববাসে প্রবাসে-র* (২০০১) মতো উপন্যাস। আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, বৈষম্যহীন এক মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও লাখো মানুষের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বরং কংসরূপী সামরিক শাসকেরা বাংলাদেশকে জাতিরাষ্ট্র না করে ধর্মরাষ্ট্রে রূপ দেয়, অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক মুক্তির পথকে রুদ্ধ করে এবং কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। যা লাখো মানুষের সঙ্গে শওকতকেও আশাহত করে। দেশের এ উল্টোরথযাত্রার কথা বলতে গিয়ে শওকতের মন্তব্য–

> ‘সাতচল্লিশের আগে ও পরে ধর্মের বিষয়টি শুধুমাত্র ধর্মান্ধ ও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে রাষ্ট্রবিভাজন হলে তা জাতিরাষ্ট্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভারতবর্ষে তা কখনোই হয়নি।...সাতচল্লিশের ক্ষত থাকা, বাহান্নর মতো ভাষা-আন্দোলন এবং একাত্তরের মতো স্মরণীয় ঘটনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশকে একাত্তরের পর জাতিরাষ্ট্র না করে ধর্মীয় রাষ্ট্র করার পাঁয়তারা চলেছে। পাকিস্তান ধর্মরাষ্ট্র ছিল। বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্র হওয়াটাই এখন সবচেয়ে বড় কথা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এই বাঙালি জাতীয়তার ওপরই নির্ভর করছে।’[১৪৬]

মুক্তিযুদ্ধের অসম্পূর্ণতা, মানবিক দেশগড়ার ব্যর্থতা, লাখো মুক্তিযোদ্ধা ও মানুষের হতাশা এবং সুবিধাবাদী বিত্তবান শ্রেণির স্বাধীনতার সুফল ছিনিয়ে নেবার বিষয়টিও শওকত তাঁর *অপেক্ষা* (১৯৮৪), *হিসাব নিকাশ* (২০০১) ও *ঘরবাড়ি* (২০০১) উপন্যাসে উন্মোচিত করেছেন।

ষাটের দশকে গড়ে ওঠা নাগরিক সমাজ পরবর্তী দু'দশকে ক্রমশ তার চারিত্র্যধর্ম পাল্টে বুর্জোয়া শ্রেণির দিকে ধাবিত হয়। শেকড়বিচ্ছিন্ন, প্রযুক্তিশাসিত এ শ্রেণি ক্রমাগত জীবনের আঁশ-শাঁস বর্জন করে নানা বিকার-বিকৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। শওকত ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই এ নাগরিক সমাজের মিথ্যা, মেকি, ভণ্ডামি, প্রতারণা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতাবোধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি এসবকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। তাই জীবনের পরিণত পর্বে এসে শওকত তাঁর মনোযোগ গ্রামাঞ্চল থেকে সরিয়ে আনেন। তিনি দেখেছেন স্বাধীনতার রক্ত কেমন করে দূষিত হয়ে যায়, গরীবের বুকের ওপর পা রেখে ন্যাক্কারজনক বিকৃত পন্থায় কেমন করে নতুন শ্রেণি জন্ম নেয়, কেমন করে কুকাতে কুকাতে তৈরি হয় একটা নষ্ট-দুর্গন্ধ-ক্ষতযুক্ত নাগরিক মধ্যশ্রেণি। এসব তিনি দেখেছেন আর এ নষ্টকালের ছবি তুলে এনেছেন।[১৪৭] এ লক্ষ্যেই শওকত রচনা করেছেন– গন্তব্যে *অতঃপর* (১৯৮৭), *ভালোবাসা কারে কয়* (১৯৮৮), *যেতে চাই* (১৯৮৮), *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯০), *প্রেমকাহিনী* (১৯৯২), *জননী ও জাতিকা* (২০০১), *তনয়ার স্বীকারোক্তি* (২০০১), *জোড় বিজোড়* (২০০১), *শেষ বিকেলের রোদ* (২০০১), *এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা* (২০০১), *ছবির উপরে ছাপ* (২০০২), *পাকা*

দেখা (২০০৩), *স্থায়ী ঠিকানা* (২০০৫), *দোলাচল* (২০০৬), *কাহিনী ও কথোপকথন* (২০০৭), *ঘরে যেতে চাই* (২০০৯) এবং *অস্তাচলের আলো*-র(২০০৯) মতো উপন্যাস। শওকতের জীবনব্যাপী এ সাহিত্যসাধনার কৃতি ও কীর্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহপাঠী, বন্ধু ও কথাসাহিত্যিক আবু বকর সিদ্দিক যে-মন্তব্য করেছেন,তা এ পর্যায়ে উদ্ধৃতিযোগ্য–

> 'শওকত আজ দেশের সাহিত্যজগতের শিখরে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় জীবনবাদী কথাসাহিত্যিকের মধ্যে শওকত আলী ব্যতিক্রমী একজন। সে লেখায় ও ব্যক্তিগত জীবনাচরণে কোথাও আপস করে না। সে পণ্য করে না তাঁর রচনাকে।...*সমকাল* (পত্রিকা) তাঁকে দিয়েছিলো ঢাকা শহরের থিতু হবার নিশ্চিত আশ্রয়। আমাদের ক্ষীণাঙ্গ ও ব্যবসাপ্রবণ কথাসাহিত্য শওকত আলীর মতো কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাহসী লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ।'[১৪৮]

এরূপ নির্লোভ, আদর্শবান, আপসহীন ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কথাকার ছিলেন শওকত। এমন সৎসাহিত্য রচনা করে মাটি ও মানুষের গণকল্যাণে সারা জীবন তিনি ব্যয় করেছেন। প্রায় পাঁচ দশকব্যাপী বিচিত্র বিষয় নিয়ে শওকত অক্লান্তভাবে লিখেছেন। সময় ও সমাজের সকল সংকটের চিত্রই তাঁর লেখায় জায়গা করে নিয়েছে। সমাজ ও মানবসংকটের এসব বিচিত্রমুখী প্রান্তকে শিল্পের দায় ও সততা থেকে তিনি নির্মোহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষারূপ দিয়েছেন। মানবসমাজের এ বৃহৎ পরিমণ্ডলের সঙ্গে তিনি নিজেকে সামিল করে দিয়েছেন বলেই সমাজের সর্বপ্রান্তীয় বিষয়-আশয়কে তিনি ধারণ করতে পেরেছেন। লেখকের এ দায়-দায়িত্ব প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য–

> 'লেখক হওয়া মানেই নিজেকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করা, এক থেকে বহু হয়ে যাওয়া। শুধু নিজের জন্যই কখনো কোনো লেখক লেখেন না। কিংবা বলা যায়, লেখক যাই লিখুন–তা যদি কেবল নিজের কথাও হয়, তাহলেও সে রচনাকে সবার কথা হয়ে উঠতে হয়। যদি না হয়, তাহলে সেই রচনার সাহিত্য হিসেবে কোনো দাম নেই। শুধু একের কথা না হয়ে বহুর কথা হতে গেলে রচনার শরীরে ও আত্মায় যা থাকে তারই মধ্য দিয়ে লেখক নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।'[১৪৯]

শওকত তাঁর এ দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। বলা যায় একজন ধ্যানীর মতো ধ্যানমগ্ন থেকে একধরনের সাধনার মাধ্যমে সমাজ ও মানুষের কথা বলেছেন। ব্যক্তিজীবনে দেশভাগ ও দাঙ্গার শিকার হবার ব্যথা-বেদনাকে তিনি জারিত করে লাখো ভুক্তভোগী মানুষের বেদনাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার তেভাগা আন্দোলন ও সাঁওতাল বিদ্রোহের রক্তাক্ত ইতিহাসকে তিনি হাজার বছর ধরে নিপীড়িত কৃষক ও শোষিত আদিবাসী নর-নারীর জীবন মথিত করে রূপায়ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর লেখার এ জনসম্পৃক্ততার মূলে ছিল ব্যক্তি ও সাহিত্যিক হিসেবে সততা ও অঙ্গীকারের জায়গা। একজন সৎ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের জন্য জনসম্পৃক্ততার ব্যাপারটিতে গুরুত্বারোপ করে শওকত বলেছেন–

> 'সাহিত্যশিল্পী তাঁর শিল্পীসুলভ মন ও কলাকৌশল নিয়ে এমন একটি অস্তিত্ব, যিনি মানুষের সঙ্গে অর্থাৎ তাঁর চারপাশের অধিকসংখ্যক মানুষের সঙ্গে যুক্ত।...লেখক যেন সেই গাছ, যার শিকড়গুলো অসংখ্য মানুষের জীবন থেকে রস গ্রহণ করেই তাঁর সাহিত্যশিল্পের ফুলগুলো ফুটে ওঠে।'[১৫০]

শওকত অনুরূপভাবে সমাজের বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। এজন্য তিনি যেমন বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের কৃষক, আদিবাসী ও পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তেমনি ঢাকার নাগরিক সমাজ, বস্তিবাসী, কুলিমজুর, রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। সাঁওতাল কৃষকের জমিতে শুয়ে বীজ অঙ্কুরোদ্গমের দৃশ্য তিনি যেমন দেখেছেনে, তেমনই আত্মবিক্রিত,ব্যক্তিত্বখোয়ানো রাজনৈকি নেতা, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের পতন-পচনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে শওকত তৃণমূলের নিপীড়িত,নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত শ্রমজীবীদের জাগরণ, সঙ্ঘশক্তি ও সম্ভাবনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এ শ্রেণির ওপর যেমন সমাজ টিকে থাকে, তেমনি তাদের জাগরণেই সমাজ পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে শওকতের বক্তব্য স্মরণযোগ্য-

> 'শিল্পকলার ইতিহাস নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার ইতিহাস । সে কারণেরই মানব জীবনের সেই অংশই শিল্পকলার বিষয়, যে অংশ স্থির নয়, যার বিকাশের পথ রুদ্ধ নয়, যা নিজেই নিজের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখেনি। জীবনের যে অংশে ভাঙা-গড়া ও রূপান্তরের কাজ চলছে, যেখানে জীবন ক্রমেই এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পৌঁছাবার জন্য চঞ্চল, নতুন থেকে নতুনতর বিন্যাসের কাঠামোয় নিজের গুণ ব্যাপ্তিকে বিধৃত করার জন্য তৎপর – সেখানেই লেখকের আলোকপাত। ব্যক্তি ও অচলায়তন–সমাজের বৈরী সম্পর্কটাই লেখকের প্রধান বিষয়।'[১৫১]

এভাবে শওকত সংক্ষুব্ধ সময় ও সমাজের প্রতিবাদ, দ্রোহ ও সংগ্রামী চেতনাকে শনাক্ত করেছেন এবং এর শক্তি ও সম্ভাবনাকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। শওকত বিশ্বাস করতেন–'শ্রমজীবী জনগণের জীবনই সকল

শিল্পসাহিত্যের আসল ভিত্তিভূমি।' মার্কিন দার্শনিক নোয়াম চমস্কির মতো শওকতও মনে করতেন– 'জনগণকেই কেবল তার ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব নিতে হবে।' শওকতের এ বোধ ও বিশ্বাস আমৃত্যু বলবৎ ছিল।

শওকত একুশ-বাইশ বছর বয়সে *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাস রচনা করেন এবং তা ১৯৬৩ সনে মুক্তধারা থেকে প্রকাশ পেলে তিনি পাঠক সমাজে স্থায়ী আসন পেয়ে যান।[১৫২] বারো-তেরো বছরের দীর্ঘ বিরতি দিয়ে তিনি *যাত্রা* (১৯৭৬) উপন্যাস রচনার মাধ্যমে পুনরায় উপন্যাসে ফিরে আসেন। এর মধ্যবর্তী প্রায় এক যুগ তিনি গল্প লিখে ব্যয় করেন। এরপর *উন্মূল বাসনা* (১৯৬৮) গল্পগ্রন্থ বের হয়। ধারণা করা হয় *লেলিহান সাধ* (১৯৭৮) ও *শুন হে লখিন্দর* (১৯৮৮) তাঁর এ সময়পর্বের রচনা। হয়তো পরিমার্জন করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন। বোধকরি এসময় তিনি আরো অনেক গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর অগোছালো স্বভাব এবং শেষ বয়সের স্মৃতিবিভ্রাটজনিত ব্যাধির প্রকোপে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। ছোটগল্পে মৌলিক অবদানের কারণে মাত্র একটি গল্পগ্রন্থ *উন্মূল বাসনা*-র জন্য তিনি অল্প বয়সেই বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮) পান। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্যের গল্প লিখে শওকত সবাইকে মোহিত করেন। সবার ধারণা ছিল তিনি হয়তো একজন গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু দেখা যায় ৭৬ সনে তিনি *যাত্রা* উপন্যাস রচনা করে ধীরে ধীরে গল্প ছেড়ে উপন্যাসকে আঁকড়ে ধরেন । এ সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামানের মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য:

> 'আমি শওকত আলীর *উন্মূল বাসনা*, *লেলিহান সাধ* ও *শুন হে লখিন্দর* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো পড়ে ধারণা করেছিলাম যে, এ গল্পই হয়তো তাঁর প্রিয় মাধ্যম হবে। আর গল্পকার হিসেবেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি গল্পের ধারা থেকে সরে যান এবং উপন্যাস নিয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।'[১৫৩]

শওকতের সাহিত্যচর্চা ও সাধনার এ দিক বদলের ঘটনাটি হঠাৎ করে হয়নি বরং এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি জীবনের চড়াই-উৎরাইও নিবিড়ভাবে জড়িত । এ প্রসঙ্গে শওকত নিজেই বলেছেন–

> 'কাহিনির দীর্ঘতার সম্পর্কে সচেতন হওয়া ছিল আমার জীবনের বড় একটি ঘটনা। জীবনের স্থিতিলাভ বলতে এখানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।...ভারত থেকে দেশান্তরি হওয়া, কলেজে ভর্তি, রাজনীতিতে জড়ানো, কারাবরণ, উচ্চশিক্ষায় ঢাকা গমন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ঢাকা ছেড়ে ঠাকুরগাঁওয়ে চাকরির জন্যে থাকলেও স্বস্তি ছিল না। আবারও ঢাকায় আসা এবং জগন্নাথ কলেজে চাকরি। এই চাকরির পরপরই নিজের ভেতর এক নির্ভরতাবোধ তাড়না করছিল বড় কিছু করার জন্য। ফলে ফেলে আসা পুরো ঘটনার দিকে তাকালে নিজের জীবনকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দেখতে পেতাম। দীর্ঘ জীবনের সে-অগ্রযাত্রা কর্মজীবনে খণ্ড খণ্ডভাবে দেখার সুযোগ ছিল না। হঠাৎ কাহিনিটা থেমে গেল এবং গল্প শেষ হয়ে গেল– এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। চরিত্ররা নিজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাহিনির দীর্ঘতা বাড়ালো।'[১৫৪]

এভাবে শওকত নিজেকে শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে একজন প্রথম সারির ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এ সম্মানজনক অবস্থান শুধু রচনার সংখ্যার দিক থেকে নয় বরং গুণে-মানে-উৎকর্ষতার মাপকাঠিতেও তা উত্তীর্ণ। তবে আসল কথা হচ্ছে, শওকত সমাজ ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকার থেকে সারা জীবন একধরনের সৎসাহিত্য রচনা করে গেছেন। তারপরেও নানা মহলের বিতর্ক শওকতকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এক শ্রেণি তাঁর লেখাকে 'সেকেলে' বা 'যথেষ্ট আধুনিক নয়'– বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। আরেক শ্রেণি বলেছেন, তাঁর লেখায় 'বিষয় বা কাহিনি' গুরুত্ব পেয়েছে, আর আঙ্গিক উপেক্ষিত হয়েছে। এসকল অভিযোগ আমলে নিয়ে আমরা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হব। এখানে উল্লেখ্য যে, শিল্পের আঙ্গিক বা শৈলী বলতে মূলত ভাষার কারুকাজ,অলংকার ব্যবহার ও বক্তব্য উপস্থাপনের ঢঙ বা ভঙ্গিমাকে বোঝানো হয়। তবে আঙ্গিকের শতভাগ সাফল্যের বা শীর্ষচূড়া স্পর্শেরও ধরাবাঁধা কোনো সূত্র বা নিয়ম নেই। আবার এ আঙ্গিকও যে-রচনার বিষয় বা কাহিনির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে শওকতও তাঁর *উপন্যাস প্রসঙ্গ: লেখকের অবস্থান* নামক এক প্রবন্ধে বলেছেন–

> 'প্রত্যেক লেখককেই নিজের ভাষা তৈরি করে নিতে হয়। কেননা প্রত্যেক লেখকের, শুধু ভিন্ন ভিন্ন লেখক কেন, একই লেখকের প্রতিটি আলাদা আলাদা রচনার জন্যেও একেক রকম ভাষা-নির্মাণ দরকার হয়। এর কারণ হলো প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব বিষয় থাকে, নিজস্ব উপাদান থাকে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এবং সর্বোপরি নিজস্ব কলাকৌশল থাকে। এ শুধু স্টাইল নয়। কেননা প্রতিটি রচনার মধ্যেই লেখক নতুন কিছু আবিষ্কার করেন। ওই আবিষ্কারই হলো ফর্মের, ভাষার এবং অন্যান্য উপাদানের। যা থাকে বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্ন, দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ আপতিক রেখায় যা উদ্ধারযোগ্য এবং যা থাকে বক্তব্যের উপলব্ধির মধ্যে প্রোথিত।...বক্তব্য সম্পর্কে লেখক যত বেশি নিঃসংশয়, বিষয় সম্পর্কে যত বেশি জ্ঞাত এবং নিজের কাজ সম্পর্কে যত বেশি আন্তরিক হন– তাঁর লেখার ফর্মও ততবেশি সহজ আয়ত্তসাধ্য হয়ে থাকে।'[১৫৫]

এ প্রসঙ্গেই শওকত অন্যত্র বলেছেন–

> 'উপন্যাসের ফরম সম্পর্কে আমি যেটা মনে করি, সবসময়ই বলে থাকি, সেটা হচ্ছে এই–প্রত্যেকটি শিল্পকর্মেরই ফরম আলাদা, ভাষাও আলাদা। যে বিষয়টি নিয়ে লেখক লিখবেন, সেইটির ভেতরে যদি তিনি প্রবেশ করেন, তবে ভাষা সেখান থেকেই উঠে আসবে। এবং তার যদি চিন্তা ও উপলব্ধি ঠিক থাকে, গভীরভাবে বিষয়টিকে আত্মস্থ করতে পারেন, তবে যে- ফরমটি এসে দাঁড়াবে সেইটিই হচ্ছে তার ফরম। ফরম কোনো আলাদা বিষয় নয়।'[১৫৬]

উপর্যুক্ত বক্তব্য দুটি থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, শওকতের কাছে আঙ্গিক ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প মাধ্যম। যা বিষয়ের প্রয়োজনে আপনা-আপনিই গড়ে ওঠে এবং যা কাহিনির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে থাকে। তিনি শিল্প নির্মাণের মাধ্যম, বাহন ও উপকরণ বলতে ভাষাকেই গুরুত্ব দিতেন। তাই কাহিনির প্রয়োজনেই তিনি জেনেশুনে প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে একটি স্বনির্মিত কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করেছেন।[১৫৭] এ জন্যেই তাঁর *পিঙ্গল আকাশ*, *ত্রয়ী দক্ষিণায়নের দিন*, *গন্তব্যে অতঃপর* ও *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসের ভাষা ব্যবহার ও আঙ্গিক পরিচর্যায় অনিবার্যভাবে পরিবর্তন এসেছে। এ আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে শওকত অন্যত্র বলেছেন–

> 'লেখক নতুন নিরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টের দিকে মজা করবার জন্য নিশ্চয়ই যান না। কেননা সাহিত্য ব্যাপারটা নেহাৎই মজার কোনো জিনিস নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর– শুধু শুধু মজা করবার জন্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যও লেখক ব্যয় করতে পারেন না। প্রত্যেক লেখকই একটি message নিয়ে আসেন, আর তা হল জীবন সম্পর্কিত।...তাছাড়া লেখকের নিজেরও কিছু কথা থাকে। সে- বক্তব্য এমন কিছু– যা প্রচলিত ভাষায় বললে ঠিক বোঝা যাবে না। আর চেনা ভঙ্গিতে প্রকাশ করলে বক্তব্যটি হয়তো প্রকাশই পাবে না। এই রকম অবস্থায় লেখককে এক্সপেরিমেন্টের দিকে যেতে হয়। তাঁর কাজের জন্য নতুন উপাদান খুঁজতে হয় এবং নতুন বিন্যাসে ও প্রকরণে তা ব্যবহার করতে হয়। নতুন মানেই আলাদা, নতুন মানেই স্রোতের বিপরীতে না হোক– অন্তত স্রোতের বেগ অস্বীকার করে দাঁড়িয়ে থাকা।'[১৫৮]

তাহলে দেখা যায়, সাহিত্যসৃজন এবং প্রকরণ প্রসাধনের কাজটি শওকতের কাছে নিছক শিল্পের জন্য শিল্পসৃজন (art for art sake) ছিল না কিংবা সস্তা আমুদে সামগ্রীও ছিল না। শওকত সাহিত্যকে কলাকৈবল্যবাদীদের মতো গজদন্তমিনারের (ivory tower) বাসিন্দারের জন্য নয়, কল্পনার বিষয় নয় বরং রক্তমাংসের জীবন্ত মেহনতী মানুষের সমাজবদলের শানিত আয়ুধ করেছিলেন। ফলে এ সাহিত্যসৃজন ও আঙ্গিক পরিচর্যার বিষয়টি তাঁর কাছে রীতিমতো ছিল এক সাধনার বিষয়। শওকত বিশ্বাস করতেন–

> 'প্রত্যেক লেখকই তাঁর প্রত্যেক সার্থক রচনার জন্যে নতুন ভাষা এবং নতুন ভঙ্গি তৈরি করেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি হয়তো চেনা উপাদানগুলোই তাঁর ভাষা ও ভঙ্গিতে ব্যবহার করছেন এবং এ জন্যেই মনে হতে পারে যে, তিনি পুরনো বা প্রচলিত আঙ্গিক ও ভাষার অনুসারী। আসলে তিনি যা করেন, তাহলো তাঁর সময়কালের সমস্ত চিন্তা এবং অনুভূতিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে নদীর মতো প্রবাহিত হন এবং সমগ্র স্রোতকে তিনি নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেন।...গভীর জীবনোপলব্ধি, ব্যাপক অভিজ্ঞতা আর মানুষের জন্যে অতলস্পর্শী ভালোবাসা না থাকলে এ ধরনের লেখায় সফল হওয়া যায় না।'[১৫৯]

তৃণমূলের প্রান্তজন ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এমন আন্তরিক দরদ ও ভালোবাসার তাগিদ থেকেই শওকত তাঁর সাহিত্য ভুবন নির্মাণ করেছেন। এ সাধনায় তিনি ফাঁকি দেননি, জোর করে কিছু আরোপ করতে যাননি, মিথ্যা ও মেকির দ্বারস্থ হননি এবং প্রয়োজনের মাত্রাতিরিক্ত আঙ্গিক-নিরীক্ষা করতে গিয়ে জীবনকে আড়াল করেননি। শওকত তাঁর এ দায়িত্বপালনে ছিলেন প্রায় শতভাগ আন্তরিক ও অক্লান্ত। এ পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে কয়েকজন সাহিত্যিক ও গবেষকের বক্তব্য মূল্যায়নযোগ্য–

ক. 'বিষয় বা কাহিনিকে গুরুত্ব দিলেই যে লেখার শিল্পরীতি ব্যাহত হয়ে পড়ে– এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। শওকত আলীও তা করেননি। আমি তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাস পড়েছি। তাতে ভাষার কাব্যময়তা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক, নস্টালজিয়া এবং প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া আগুন, ঝড়বৃষ্টি ও শীতের ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো। তিনি বরাবরই বলতেন, বক্তব্যকে শিল্পসম্মত করে উপস্থাপন করাই লেখকের মূল কাজ। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন কথাশিল্পীকে তার লেখার বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীন হতে হয়। তিনি শিল্পকে কখনোই শ্লোগানধর্মী বা তত্ত্বসর্বস্ব করতে চাননি।'[১৬০]

খ. 'শওকত আলীর ভাষা, বর্ণনারীতি, দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই নিজস্ব ও আলাদা। তাঁর লেখার ভেতরে একধরনের দরদ, প্রযত্ন, দায়বদ্ধতা ও সততা ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবতার কথাকার হিসেবে জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন, ভাষার স্টাইলকে নয়। তিনি ভাষার মারপ্যাঁচকে প্রশ্রয় দেননি; বরং বাংলাসাহিত্যের যে-ট্রাডিশনাল ভাষা– তাকেই গ্রহণ করেছেন। তারপরেও তাঁর লেখায়

আগুন, তীর, সাপ, অন্ধকার, শীত, চাঁদ– এসব রূপক-প্রতীকী জিনিসের শক্তিশালী ব্যবহার রয়েছে। তাঁর জীবনযাপন আর শিল্পযাপনের মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না। তিনি বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম বাস্তববাদী লেখক।'[১৬১]

গ. 'শওকত আলী আঙ্গিকের পরিচর্যা করেছেন; তবে তা প্রয়োজন মাফিক– অযথা বা অতিরিক্ত নয়। জীবন বাস্তবে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই তা উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্যের বাস্তবতা ও জীবনবাস্তবতাকে তিনি সার্থকভাবে সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি মার্কসবাদে আস্থাবান ছিলেন। কতটুকু নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও মনোভাব থাকলে এ রকম সৎসাহিত্য রচনা করা যায়– তা শওকত আলীর সাহিত্যকর্ম দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শওকত আলীর অনুসৃত এধারাই ছিল বাংলাসাহিত্যের পূর্ববর্তী প্রচলিত ঐতিহ্য। এ ধারা গ্রহণের ফলে তাঁর সাহিত্যের মান এতটুকু কমেনি এবং তা প্রাচীনপন্থী বা সেকেলে বলেও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েনি। বলা চলে এমন প্রবণতা মাঝখানে বাংলাসাহিত্যে বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত ছিল। শওকত আলী সে-অভাবটা পূরণ করে দেন।'[১৬২]

ঘ. 'আমার জানা মতে, শওকত আলী অনুমাননির্ভর বা ধার করা অভিজ্ঞতা থেকে কোনো লেখা লেখেননি। কাছ থেকে যা দেখেছেন, যেভাবে দেখেছেন–ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করেছেন। গ্রাম নিয়ে লিখলেও যে-তা গ্রাম্য বা প্রাচীনধর্মী হয়ে যায় না–শওকত তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর আঙ্গিক বলতে যা বোঝায়; তা তাঁর লেখাতেও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর লেখার সরল গদ্যের ন্যারেটিভ ও বিশ্লেষণাত্মক প্রবণতা বেশি মাত্রায় থাকায় অনেকে এ ধরনের অকারণ সন্দেহ করেন। তাঁর সমালোচনাকারী কলাকৈবল্যবাদীরা লেখার জগতে স্বল্পপ্রাণ হয়েছেন, অথচ শওকত ঠিকই টিকে আছেন। তাঁর উপন্যাস অনেকটা তারাশঙ্করীয়। তাঁর উপন্যাস উঁচু শিল্পমানের। আমার কাছে তাঁর লেখার মূল্য অপরিসীম।'[১৬৩]

ঙ. 'শব্দ নির্বাচন, বাক্যবিন্যাস, কালের ব্যবহার ও ভাষার কারুকাজ নিয়ে শওকত আলী যে চিন্তা-ভাবনা করতেন, তা আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়। গদ্যের ওপর তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, আমার মনে হয় তা বাংলাদেশের সাহিত্যে এক সৈয়দ শামসুল হক ব্যতীত আর কেউ করেননি। তিনি বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। প্রাণহীন লেখা যতই আঙ্গিকসর্বস্ব হোক তার স্থায়ীত্ব স্বল্পকালের–একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই বলে তিনি আঙ্গিককে অবহেলা করেছেন–এমনটি বলার সুযোগ নেই। কারণ তাঁর মতো এমন গীতল, কাব্যিক মনোমুগ্ধকর ভাষা বাংলাদেশের খুব কম লেখকেই লিখতে পেরেছেন।'[১৬৪]

চ. 'যেহেতু শওকত আলীর লেখার ক্ষমতা অসাধারণ, আর গদ্যও অতুলনীয়; সেহেতু লেখার সময় তিনি তাঁর বিশ্বাস-ভাবনা ও আদর্শ থেকে কখনোই বিচ্যুত হননি। প্রথম দিকের রচনাসমূহে শওকত আলী ভাষার মোহনীয় কারুকার্যে ও আঙ্গিক নিরীক্ষায় যেভাবে টগবগ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালের রচনায় অনেক বেশি প্রাজ্ঞ ও স্থিতধী হবার ফলে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে যায়। কারণ দূর ইতিহাস ও ঐতিহ্যনির্ভর গ্রামীণ আবহ ছেড়ে নিকটবর্তী নগরজীবনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে আতস্থ করায় তাঁর ভাষাও অনেকটা নিরাভরণ-নির্মেদ হয়ে যায় এবং কাহিনিও ঋজু হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্বের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রকৃতির মেঘমেদুর লাবণ্যের জায়গাটিতে সমাজ-রাষ্ট্রীয় সংকট; মানবমনের ভাঙচুর-জিজ্ঞাসা ও বিচ্ছিন্নতার বিশ্লেষণ বড় হয়ে ওঠায় অনিবার্যভাবে শৈলীর পরিবর্তন ঘটে যায়।'[১৬৫]

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে আমাদের এই প্রতীতী হয় যে, শওকতের লেখা কোনোভাবেই প্রাচীনধর্মী বা সেকেলে নয়,বরং তা আধুনিক এবং বাংলা সাহিত্যের মূলধারা বা ঐতিহ্যানুসারী। বাংলা সাহিত্যের মূলধারা ও ঐতিহ্যকেই শওকত তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময় করেছেন। তবে তাঁর প্রথম দিকের সৃজিত শিল্পের মান ও শৈলীর উৎকর্ষতার স্বীকৃতি নিয়ে সবাই সহমত পোষণ করলেও কেউ কেউ শেষ পর্বের রচনাসমূহের কিছুটা খামতির কথা বলেছেন। আসলে তাঁর শেষের দিকে লেখা কিছু নাগরিক উপন্যাস নিয়ে এমন সমালোচনার সূত্রপাত হয়। শওকত জীবনের একটা বড় অংশ নগরে পার করলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন একজন গ্রাম বা জনপদের মানুষ। শুধু মন নয়,সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীল অনুভূতি দিয়ে তিনি লোকায়ত জীবনকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন এবং বলা যায় সফলও হয়েছেন। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের উন্মূল অবস্থা, মানবীয় সম্পর্কের মেকি-কৃত্রিমতা কখনোই তাঁর কাছে স্বস্তিকর মনে হয়নি। তারপরেও এ জগৎ ও জীবনকে ধরতে এবং নতুন দিকে মোড় ফিরতে তিনি এসব লেখা লিখেছেন। আবার ঈদসংখ্যার জন্য পত্রিকায় দ্রুত লিখতে গিয়েও এমনটা হতে পারে। অনেকে একে হালকা চালের লেখা বলতে চান। কিন্তু হালকা চাল– শওকত আলীর চাল নয়। কারণ তাঁর প্রত্যেক লেখাতেই একটি আহ্বান ও অঙ্গীকারের জায়গা রয়েছে।[১৬৬] আবার অনেকের মতে, শওকত প্রথম পর্বের লেখায় অধিক মনোযোগী থাকার কারণে এ পর্বের লেখা আয়তনে যেমন বড় পরিসর পেয়েছে, তেমনি শিল্প-উৎকর্ষতা বজায় থেকেছে। কিন্তু পরবর্তীকলে তিনি দীর্ঘসময় স্মৃতিবিভ্রাট রোগে পীড়িত থাকায় লেখাগুলো ক্ষুদ্র আকার নিয়েছে এবং ভাষাও সরল, ঋজু হয়ে উঠেছে। এ স্মৃতিবিভ্রাটের কারণে তিনি কোনো উপন্যাস লিখতে গেলেও কাহিনি ঠিক রাখতে গিয়ে তাঁকে বার বার তা পাঠ করতে হয়েছে। যা একজন সিরিয়াস লেখকের জন্য খুব বড় বাধা । ফলে কাহিনি ঠিক রাখতেই তাঁকে বেশি তৎপর হতে হয়েছে; আঙ্গিক পরিচর্যায় তেমন মনোযোগ ও যত্নবান হতে পারেননি। আবার লিটল ম্যাগাজিনে কাহিনিনির্ভর লেখার বিষয়টিও এখানে

ক্রিয়াশীল হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে,আঙ্গিক পরিচর্যার জন্য যে- শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি তথা সক্ষমতার দরকার হয়-শেষপর্যন্ত তাঁর তা ছিল না। স্মৃতিবিভ্রাটজনিত সমস্যার কথাটি শওকত নিজেও স্বীকার করে বলেছেন–

> 'এখন আমার কাছে লেখালেখির ব্যাপরটা খুব কঠিন জিনিস। আমি কোনো লেখাই, যত ক্ষুদ্রই হোক, একবারে লিখতে পারিনা। চিঠি লিখলেও আমাকে তিনবার লিখতে হয়'।[১৬৭]

তাহলে দেখা যায়, এ স্মৃতিবিভ্রাটই শওকতের শেষ পর্বের সাহিত্য সৃজনের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে ভাষার সারল্য,ঋজুতা, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও অলংকার ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ায় কিছুটা শিল্পরসের খামতি থাকলেও বিষয়-বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বের ক্ষেত্রে এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও শহিদুল জহির ব্যতীত বাকি সবাই তো ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্য এবং তত্ত্ব নিয়েই কাজ করেছেন। কাঠামো পরিবর্তন তেমন করতে পারেননি। কারণ বিষয় পরিবর্তন যতটা সহজ, কাঠামো পরিবর্তন ততটা সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বড় মাপের ও বহুমাত্রিক লেখকের পক্ষেও তেরোটি উপন্যাসের মধ্যে *চতুরঙ্গ* ও *শেষের কবিতা* ব্যতীত তেমন বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের কাব্য ও উপন্যাস যেমন আকারে ছোট, তেমনি ভাষাও সহজ-সরল হয়ে উঠেছিল। তাই *গোরা*, *মানসী* ও *বলাকা* যেভাবে লিখেছেন, *চার অধ্যায়*, *পুনশ্চ* ও *জন্মদিনে* সেভাবে লিখেননি। অথচ শওকত তাঁর অনেক উপন্যাসেই একই সঙ্গে বিষয় ও কাঠামোতে বৈচিত্র্য আনতে সফল হয়েছেন। তাঁর চেয়েও বড় মাপের লেখক হয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এমন বদনাম ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। তাই শওকতের প্রতি আঙ্গিকবাদীদের আনা এমন অভিযোগ সর্বাংশে সঠিক নয়। এ পর্যায়ে আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সমকলীন বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের দুটি পরীক্ষায় শওকতকে উত্তীর্ণ হতে হয়। প্রথমটি ছিল কলাকৈবল্যবাদের ফাঁদ। আর দ্বিতীয়টি ছিল বামপন্থী সাহিত্যের যান্ত্রিক ধারা।[১৬৮] ষাটের দশকের কলাকৈবল্যবাদীদের অব্যাহত সমালোচনা (তাঁর লেখা সেকেলে ও যথেষ্ট আধুনিক নয়) সত্ত্বেও শওকত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের মতো লিখে শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজে বামপন্থী হয়েও অন্যান্যদের মতো সাহিত্যের নামে তত্ত্বীয় জঞ্জাল সৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষায় আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছেন। কারণ শওকত তাঁর সাহিত্যকে মার্কসবাদী শ্লোগান ও তত্ত্বে পরিণত করেননি। শওকত বিশ্বাস করতেন, শিল্পের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সৎসাহিত্যই সত্যিকারের মার্কসবাদী সাহিত্য।

এ পর্যায়ে শওকত-সাহিত্যের কালবিভাজনের বিষয়টিও বিবেচ্য। অধিকাংশ সমালোচকই মোটা দাগে তাঁর সৃষ্ট ষাট থেকে আশির দশক বিস্তৃত লেখাকে প্রথম পর্ব এবং নব্বই থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশক বিস্তৃত লেখাকে দ্বিতীয় পর্ব বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই প্রথম পর্ব (১৯৬৩-১৯৮৯) এবং দ্বিতীয় পর্বের (১৯৯০-২০১০) কাল বিভাজনের ক্ষেত্রে কেউ গ্রামজীবন ও নগরজীবনের বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৬৯] আবার কেউ লেখার মান বা শিল্পোৎকর্ষের যথার্থতা ও খামতির ব্যাপারটিকেই বিবেচনার মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কেউ-ই তাঁর শেষ পর্বের নির্মিত সৃষ্টিকর্মের তাৎপর্যকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন করেননি। কারণ তাঁর জীবনসায়াহ্নে বা অস্তাচলপর্বে লেখা *নাঢ়াই* (২০০৩) ও *মাদারডাঙার কথা*-র(২০১১)মতো সাড়া জাগানো উপন্যাস দুটি সমালোচক-গবেষক মহলে নতুন ভাবনা ও জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। এ উপন্যাস দুটিতে তিনি যে-জীবনের তাৎপর্য, উপলব্ধির গভীরতা ও লেখার শক্তি তথা শানকে উপস্থাপন করেছেন–– বোধ করি এ তাঁর ওপর আনীত সমালোচনার সমুচিত জবাব। তাই সার্বিক বিবেচনায় শওকতের সাহিত্যকর্মকে (উপন্যাসকে) ক. প্রস্তুতি পর্ব (১৯৬৩-১৯৭৬), খ. পরিণত পর্ব(১৯৭৭-২০০০) এবং গ. প্রান্তিক পর্ব (২০০১-২০১১)–এমন তিন পর্বে বিভাজন করা যায়।

প্রস্তুতি পর্বের উপন্যাসের মধ্যে *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩) ও *যাত্রা* (১৯৭৬) অন্যতম। এ দুটি উপন্যাস বয়নরীতিতে শওকত কিছুটা আবেগ, কাব্যময় ভাষা ও বর্ণনাধর্মী আখ্যান বেছে নিয়েছেন। এর মধ্যবর্তী প্রায় একযুগ অতিবাহিত করেছেন মূলত ছোটগল্প লিখে। কিন্তু শওকত লেখক জীবনের সূচনাপর্বের সহজাত রোম্যান্টিকতার পরিবর্তে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধিতে এবং সময় ও সমাজসংকট বিশ্লেষণে যে-শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তাই পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক পর্বের এ খামতিকে তিনি লেখনীর সহজাত শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের বলে অতিক্রম করেছেন।

পরিণত পর্বের উপন্যাস রচনায় শওকত অনেক বেশি ধীর-স্থির, সমকাললগ্ন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত। এ পর্বে তিনি নির্মোহ, নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার, বলশালী গদ্যভাষা নির্মাণ এবং চরিত্রের মানসলোক বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক রীতি প্রয়োগে অনেক বেশি দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যান নির্বাচনে তিনি যেমন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনীতিকে বেছে নিয়েছেন ; তেমনি চরিত্র হিসেবে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-জিজ্ঞাসাকে গুরুত্বের সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। রাজনীতি এ পর্বে বিরাট ক্যানভাস জুড়ে স্থান পেয়েছে। এ পর্বের উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম– *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪), *সম্বল* (১৯৮৫),*অপেক্ষা* (১৯৮৯),*ত্রয়ী দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫-৮৬), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯), *উত্তরের খেপ* (১৯৯১), *পতন* (১৯৯২), *অবশেষে প্রপাত* (১৯৯৬) ও *দলিল* (২০০০) প্রভৃতি।

প্রান্তিক পর্বের উপন্যাসে শওকত নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিত্তের বিকার-বিবিক্তি, প্রযুক্তির জ্বালা-যন্ত্রণা, ক্রমজটিল জীবন-জিজ্ঞাসা ও প্রৌঢ় জীবনের অনিবার্য নিঃসঙ্গতা নির্মাণ করেছেন। তাই *জননী ও জাতিকা* (২০০১),*তনয়ার স্বীকারোক্তি* (২০০১), *জোড় বিজোড়* (২০০১),*শেষ বিকেলের রোদ* (২০০১), *এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা* (২০০১),*ছবির উপরে ছাপ* (২০০২),*পাকা দেখা* (২০০৩), *দোলাচল* (২০০৬),*কাহিনী ও কথোপকথন* (২০০৭) *অস্তাচলের আলো* (২০০৯) ও *ঘরে যেতে চাই* (২০০৯)-তে নাগরিক নিঃসঙ্গতা ও উন্মুলিত জীবন-যন্ত্রণাই বড় হয়ে উঠেছে।কিন্তু শওকত গণমানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং মমতার জায়গায় উন্নীত হয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন । অথচ দেশের বামদলের সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যর্থতা ও দৈন্যদশা দেখে তিনি কষ্ট পেলেও কখনো হতাশ হননি। দেশের প্রচলিত গণতন্ত্রে তাঁর বিশেষ আস্থা না থাকায় গণমানুষের মুক্তির ব্যাপারে সমাজরূপান্তরমূলক রাজনৈতিক দর্শনকে উপযুক্ত বলে মনে করেছেন । এক্ষেত্রে বিরাট শ্রমজীবী মানুষের সজ্ঞচেতনা ও জাগরণকেই নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রত্যাশা করেছেন। এজন্যই শওকতকে জীবনের গোধূলি বেলায় এসে *নাঢ়াই* (২০০৩) ও *মাদারডাঙার কথা* -র(২০১১) মতো উপন্যাস লিখতে হয়েছে।

শওকত আলীর ব্যক্তিমানস ও শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমকাল এবং তাঁর প্রতিভার এই বহুমুখী বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিতে হবে। সেই সঙ্গে গভীর জীবনোপলব্ধি, ব্যাপক অভিজ্ঞতা, সমাজের প্রতি অঙ্গীকার, সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি আস্থা, আত্মপ্রবঞ্চক মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণি অপেক্ষা শ্রমজীবীদের জীবনের প্রতি পক্ষপাত ও শোষণমুক্ত মানবিক সমাজপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের দৃষ্টিসীমায় রাখতে হবে। উত্তাল চল্লিশ দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, তেভাগা-আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদের আসন্ন পতন, প্রগতিবাদের উত্থান, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের গণজোয়ার, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-উত্তর স্বপ্নভঙ্গের পটভূমিতে শওকতের বেড়ে ওঠা এবং সমাজবীক্ষার ও শিল্পদীক্ষার পাঠ তথা প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয়। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, একজন সাহিত্যশিল্পীর সমগ্র সৃষ্টিকাল জুড়ে সৃষ্টির পূর্ণ সাফল্যপ্রাপ্তি–এমন প্রজ্ঞা ও প্রতিভা খুবই বিরল। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃজনক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ-বন্ধ্যাকাল পরিলক্ষিত হয়। আর এটিই বাস্তব ও স্বাভাবিক। বিষয়টি একজন সাহিত্যশিল্পীর জীবনচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জড়িত। শওকতের জীবনাদর্শ ও চেতনারাজ্যের রূপান্তরশীলতা তাঁর উপন্যাসের সমাজচেতনা ও জীবনবাস্তবতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। তাই শওকতের প্রতিভার বিকশিত প্রান্তের সঙ্গে দীপ্তিহীন প্রান্তের তুলনা না করে তাঁর ঈপ্সিত সত্য ও সুন্দর অভিমুখী অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্বকে স্বরূপসহ চিহ্নিত করতে পারলেই এ প্রতিভার সৃজনবৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ শিল্পরস উপলব্ধি সহজতর হবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*; পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ৪র্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , পৃ. ০৪

২. গিয়াস শামীম : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস* ; বাংলা একাডেমি,ঢাকা ,২০০২, পৃ.০১

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃ. ০৩

৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; ৩নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃ. ০৪-০৫

৬. গিয়াস শামীম : পূর্বোক্ত; পৃ.০১

৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃ. ০৫

৮. সৈয়দ আজিজুল হক : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.০১

৯. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি*; ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮,পৃ. ২২

১০. ওসমান আলী সরকার : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার , ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

১১. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

১২. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

১৩. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

১৪. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

১৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩

১৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪-২৫

১৭. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

১৮. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪-২৫

১৯. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

২০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৩

২১. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

২২. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

২৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৬-৩৭

২৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১

২৫. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

২৬. শওকত আলী : *আমার লেখালেখি*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ১০ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.৩৯৫

২৭. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি*; পূর্বোক্ত, পৃ.২১

২৮. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১

২৯. আটচল্লিশের উপনির্বাচনে খোরশেদ আলী সরকার মুসলিম লীগের যে প্রার্থীর কাছে ১৫০ ভোটে পরাজিত হন, তিনি ছিলেন সা'দাত আলী আখন্দ। যিনি পূর্বে কংগ্রেস দল করলেও পরে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ সা'দাত আলীর খ্যাতিমান সন্তানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, চরমপত্রের পাঠক এম.আর.আখতার মুকুল এবং অধ্যাপিকা সামসুন নাহার ইসলাম। এ সামসুন নাহার পরবর্তীকালে শওকতের সহপাঠী(ঢা.বি-র) ও জগন্নাথ কলেজের সহকর্মী ছিলেন।-[উৎস- চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা* (শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি,

২০১৬, পৃ.১৫, **দ্বৈতীয়িক উৎস**- মির্জা হারুণ-অর-রশিদ : *স্মৃতি-বিস্মৃতির জগন্নাথ কলেজ*; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫৪]

৩০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৫-৪৬

৩১. ওসমান আলী সরকার : পূর্বোক্ত

৩২. ওসমান আলী সরকার: পূর্বোক্ত

৩৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৪৭-৪৮

৩৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৯-৪০

৩৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৩

৩৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৫-৮৬

৩৭. রাহেল রাজিব : *শওকত আলীর ছোটগল্প : বিষয় উন্মোচন ও ভাষার অন্তর্দেশ*; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,২০১৭, পৃ.৭৮

৩৮. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি*; পূর্বোক্ত; পৃ.৪৭

৩৯. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫১

৪০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫৯

৪১. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫৯

৪২. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫৯

৪৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৫

৪৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৪

৪৫. ওসমান আলী সরকার: পূর্বোক্ত

৪৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৫

৪৭. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৫-৭৬

৪৮. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৮০

৪৯. শওকত আলী : পূর্বাক্ত; পৃ.৯৩

৫০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০২

৫১. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০২

৫২. শওকত আলী : পূর্বাক্ত; পৃ.১০৪-১০৫

৫৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৬

৫৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৬

৫৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৭

৫৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৮

৫৭. শওকত আলী : *টুকরো আয়নায়*; দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

৫৮. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি*; পূর্বোক্ত, পৃ.১১২-১১৩

৫৯. মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ইতিহাস*; বিজয় প্রকাশ, ঢাকা,২০০৬ পৃ.৫৫ ও ৯৯

৬০. সেলিম কোরেশী ও কামাল লোহানী মিলে ৫৮ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ব্যঙ্গধর্মী *মিঠেকড়া* পত্রিকা বের করেন । কামাল লোহানীর আহ্বানে শওকত আলী এ পত্রিকার 'একটি প্রেমপত্র' কলামে নিয়মিত লিখতেন ।৭টি সংখ্যা বের হবার পর আইয়ুব খান সরকার এটি বন্ধ করে দেন।-[উৎস-কামাল লোহানী : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮]

৬১. সরকার আশরাফ (সম্পা.) : *নিসর্গ* (শওকত আলী সংখ্যা): বর্ষ-৭, সংখ্যা -১,বগুড়া , ১৯৯২,পৃ.৭৫

৬২. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি*; পূর্বোক্ত; পৃ.১১৩

৬৩. সরকার আশরাফ : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৫

৬৪. সরকার আশরাফ : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৫-৭৬

৬৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১৩২

৬৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১১৮

৬৭. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১১৮

৬৮. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১২৭

৬৯. ডলির পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পাটনা-হুগলির অধিবাসী। তাঁর দাদা গোলাম রসুল ঠিকেদার ও জেইলরের চাকরিসূত্রে কলকাতার ভবানীপুরের কাটুয়াকুটি লেনে বাড়ি করেন। তাঁর বাবা এমদাদ রসুলও ম্যাট্রিক পাশ করে জেইলরের চাকরি নেন । ৪৭-এর দেশভাগের সময় তিনি দাঙ্গা-আক্রান্ত পরিবার নিয়ে চাকরিসূত্রে রাজশাহী আসেন।পরবর্তীকালে রংপুর ও দিনাজপুরে চাকরি করে ৫৫-তে অবসরে যান। চাকরি শেষে তিনি দিনাজপুরের ঘাসিপাড়ায় বাড়ি করেন। তাঁর মা সাবিয়া খাতুন । তাঁর নানা জানে আলম খাঁ বীরভূম সিউড়ি রাজনগরের দু'আনার জমিদার ছিলেন। ডলিরা ছিলেন ৫ ভাই ৩ বোন। লতিফা খাতুন,কুদরত-ই রসুল, খাদেম-ই রসুল , আবুল ফজল নূরন্নবী,জিনাত আরা, মকবুল-ই-রসুল, মঞ্জুর-ই রসুল ও শওকত আরা ডলি । এ জিনাত আরার বিয়ে হয় বিখ্যাত সাংবাদিক তরিকুল ইসলামের বড় ভাই সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে। এ তরিকুল ইসলাম ছিলেন কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদের ভায়রা ভাই। আবার এ কায়েস আহমেদ ছিলেন শওকত আলীর জগন্নাথ কলেজের ছাত্র।-[উৎস-আবুল ফজল নূরন্নবী : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ৯ মার্চ ২০০৮]

৭০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১১৯

৭১. নঈম নিজাম (সম্পা.) : *বাংলাদেশ প্রতিদিন*; ঈদসংখ্যা, ঢাকা, ২০১৮,পৃ.২৬৩

৭২. সরকার আশরাফ (সম্পা.) ; *নিসর্গ;* পূর্বেক্তি; পৃ.৭৫

৭৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১৩২-১৩৩

৭৪. সরকার আশরাফ(সম্পা.) : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৬

৭৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১৩৬

৭৬. মোহাম্মদ হাননান (সম্পা.) *: শওকত আলী রচনাসমগ্র* ; ১০ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা , ২০১৮, পৃ.৪০৩

৭৭. মির্জা হারুণ- অর-রশিদ : *স্মৃতি-বিস্মৃতির জগন্নাথ কলেজ*; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০,পৃ.১২৭-১২৮

৭৮. মির্জা হারুণ- অর-রশিদঃ পূর্বোক্ত; পৃ.১২৬

৭৯. মির্জা হারুণ- অর-রশিদঃ পূর্বাক্ত; পৃ.৩৮

৮০. মির্জা হারুণ- অর-রশিদঃ পূর্বোক্ত; পৃ.২১৭

৮১. মির্জা হারুণ- অর-রশিদঃ পূর্বোক্ত; পৃ.১২৮

৮২. মির্জা হারুণ- অর-রশিদঃ পূর্বোক্ত; পৃ.১২৮

৮৩. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি* ; পূর্বোক্ত, পৃ.৬২-৬৩

৮৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৩

৮৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৩-৬৬

৮৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৮-৭৯

৮৭. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৮০

৮৮. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৮৯

৮৯. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৯৫

৯০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৯৬

৯১. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৯৩ ও ৯৭

৯২. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৯২

৯৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৪

৯৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৪

৯৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৫

৯৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৪

৯৭. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.০৫

৯৮. খোরশেদ আলীর সংসারে এসে মনোয়ারা বেগমের গর্ভে ৪ মেয়ে ৩ ছেলের জন্ম হয়। এরা হচ্ছেন– আমেনা বেগম তুলসী, জুলফিকার আলী সরকার, আমজাদ আলী সরকার দানী, জাহানারা বেগম মণি, মনসুর আলী সরকার দুলাল, রওশন আরা পলি, মমতাজ বেগম বাবু প্রমুখ।-[উৎস-ওসমান আলী সরকার : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮]

৯৯. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৬

১০০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৮
১০১. রাহেল রাজিব : *শওকত আলীর সঙ্গে কথোপকথন*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা,২০১৮, পৃ.৪৯৯, প্রথম প্রকাশ, *মাসিক উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি,ঢাকা,আশ্বিন ১৪১৮*
১০২. শওকত আলী *: আমার লেখালেখি* ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ১০ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.৩৯৭-৩৯৮
১০৩. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৯৮
১০৪. শওকত আলী : *টুকরো আয়নায়* ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বাক্ত; পৃ.৪৭৯-৮০, প্রথম প্রকাশ,প্রথম আলো পত্রিকা,২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
১০৫. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি* ; পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৯
১০৬. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১৮২
১০৭. মির্জা হারুণ- অর- রশিদ : *স্মৃতি-বিস্মৃতির জগন্নাথ কলেজ;* পূর্বোক্ত; পৃ.১২৭
১০৮. শওকত আলী : অবিস্মৃত স্মৃতি; পূর্বোক্ত; পৃ.১৮২-১৮৩
১০৯. মির্জা হারুণ- অর- রশিদঃ পূর্বোক্ত; পৃ.১১১-১১৩
১১০. মির্জা হারুণ- অর- রশিদঃ পূর্বোক্ত; পৃ.১৫৩
১১১. শফিউল আলম : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১২ মার্চ ২০১৮
১১২. শফিউল আলম : পূর্বোক্ত
১১৩. শফিউল আলম : পূর্বোক্ত
১১৪. আনু মুহাম্মাদ : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার ,২৫ এপ্রিল, ২০১৮
১১৫. শিক্ষক শওকত আলীর ২৫ বছর (১৯৬২-৮৭) জগন্নাথ কলেজের চাকরি জীবনে তাঁর সান্নিধ্য-সংস্পর্শ- স্নেহের ছায়ায় বহু কীর্তিমান ছাত্র-ছাত্রী শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ও রাজনীতির অঙ্গনে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন । এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- কবি আল মুজাহিদী ,সৈয়দ নাজিমুদ্দিন, আলী ইমাম , শাহরিয়ার কবির, হরিপদ দত্ত, ইমদাদুল হক মিলন,নাসরীন জাহান, ড. মোহাম্মদ হাননান,সাজ্জাদ শরিফ,তাপস কুমার মজুমদার , দাউদ হায়দার, মাকিদ হায়দার , কায়েস আহমেদ, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, বুলবুল চৌধুরী, কাদেরি কিবরিয়া , ফ্লোরা আহমেদ, ফেরদৌসী আহমেদ লীনা, কিরণচন্দ্র রায়,চন্দনা রায়,পূর্ণচন্দ্র বাউল,ফকির আলমগীর , মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, রাশেদ খান মেনন, রাজিউদ্দিন আহমদ রাজু, কাজী ফিরোজ রশিদ, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, এম.এ রেজা ও হুমায়ুন কবীর শেলী প্রমুখ।-[উৎস- মির্জা হারুণ-অর-রশিদ ; *স্মৃতি বিস্মৃতির জগন্নাথ কলেজ* ; পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৫-২০০]
১১৬. আলী ইমাম: পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১৬ জুলাই, ২০১৮
১১৭. মোহাম্মদ হাননান সম্পা. : *শওকত আলী রচনাসমগ্র* (*অপ্রকাশিত চিঠি*, ১৯৬২, ৩ সেপ্টেম্বর, ঢাকা) ১০ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্যভবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪০৩
১১৮. আবু বকর সিদ্দিক: *শওকত স্মৃতি* (সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ*-শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, ১৯৯৭, পৃ. ১১৫-১১৬
১১৯. শওকত আলী : *সাঁওতালরা আমাদের জাতির একটি অংশ*; শওকত আলী রচনাসমগ্র; ৭ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা, ২০১৮, পৃ.৫০৩
১২০. শওকত আলী : *আমার লেখালেখি* ; পূর্বোক্ত; পৃ.৩৯৫
১২১. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৯৫-৩৯৬
১২২. শওকত আলী পূর্বোক্ত; পৃ.৩৯৬
১২৩. শওকত আলী : *অবিস্মৃত স্মৃতি*; পূর্বোক্ত; পৃ.৪২-৪৩
১২৪. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৮২
১২৫. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.১০১
১২৬. সরকার আশরাফ (সম্পা.) : *নিসর্গ (সাক্ষাৎকার-কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর মুখোমুখি দুই সন্ধ্যায়);* পূর্বোক্ত, পৃ.৩১
১২৭. শওকত আলী : *আমার লেখালেখি;* পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৭
১২৮. সরকার আশরাফ (সম্পা.) : *নিসর্গ;* পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪
১২৯. শওকত আলী : *অনেক দিন ধরে লিখতে পারছি না;* শওকত আলী রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড ; বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা,২০১৫, পৃ.৬০৪, প্রথম প্রকাশ, *সাপ্তাহিক ২০০০, ঈদ সংখ্যা,২০১২*

১৩০. সরকার আশরাফ (সম্পা.) : *নিসর্গ;* পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

১৩১. শওকত আলী : *আমার লেখালেখি* ; পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৯

১৩২. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৯৮

১৩৩. আবু বকর সিদ্দিক: *শওকত স্মৃতি* (সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, ১৯৯৭, পৃ. ১১৪

১৩৪. শওকত আলী : *এখন প্রাধান্য পাচ্ছে রম্যলেখা* ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৮ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.৬৪৫-৬৪৬; প্রথম প্রকাশ, *প্রথম আলো* পত্রিকা, ৩১ আগস্ট ২০১৩

১৩৫. *নঈম নিজাম সম্পা. : শওকত আলীর অপ্রকাশিত চিঠি*: বাংলাদেশ প্রতিদিন: ঈদসংখ্যা-২০১৮, ঢাকা, পৃ. ২৫৯

১৩৬. শওকত আলী : *লেখকের দায়িত্ব* ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা,২০১৪,পৃ.৫০৭-৫০৮

১৩৭. রাহেল রাজিব : *শওকত আলীর সঙ্গে কথোপকথন* ; পূর্বোক্ত; পৃ.৪৮৯

১৩৮. রাহেল রাজিব : পূর্বোক্ত; পৃ.৪৯০

১৩৯. মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার (সম্পা.) : *আমাদের সময়* ; ঈদসংখ্যা-২০১৮, ঢাকা,পৃ.২৯-৩০

১৪০. শওকত আলী *: টুকরো আয়নায় ;* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৭

১৪১. কায়েস আহমেদ: *অন্ধকারের ঘোড়সাওয়ার* (মোহাম্মদ হাননান সম্পা. শওকত আলী রচনাসমগ্র; ১ম খণ্ড); বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৪ পৃ. ৫৭৮

১৪২. শওকত আলী : *মীথ: তৃণমূলে যাবার এক পথ;* শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৫ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.৫৫৮-৫৫৯

১৪৩. সরকার আশরাফ (সম্পা.): *নিসর্গ* (সাক্ষাৎকার-*শওকত আলীর মুখোমুখি দুই সন্ধ্যায়*); পূর্বোক্ত; পৃ.৩৫

১৪৪. হাসান আজিজুল হক *: শওকত আলী বন্ধু বরেষু* (সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ*) ; পূর্বোক্ত; পৃ.১১০

১৪৫. হাসান আজিজুল হক : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৯-১১০

১৪৬. রাহেল রাজিব (সম্পা.) : *শওকত আলীর সঙ্গে কথোপকথন;* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১-৪৯২

১৪৭. হাসান আজিজুল হক : *শওকত আলী বন্ধু বরেষু*; পূর্বোক্ত,পৃ.১১০

১৪৮. আবু বকর সিদ্দিক: *শওকত স্মৃতি; নিসর্গ*, পূর্বোক্ত,পৃ. ১১৫

১৪৯. শওকত আলী : *লেখকের দায়িত্ব* ; পূর্বোক্ত , পৃ.৫০৩

১৫০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫০৫

১৫১. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫০৬

১৫২. মোহাম্মদ হাননান : *শওকত আলী রচনাসমগ্র* ; ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট,বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা,২০১৪, পৃ.৫৯৩

১৫৩. আনিসুজ্জামান : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১ এপ্রিল, ২০১৮

১৫৪. শওকত আলী : শওকত আলী রচনাসমগ্র , ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত; পৃ.৪৮৭

১৫৫. শওকত আলী : *উপন্যাস প্রসঙ্গ: লেখকের অবস্থান*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড,বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৪,পৃ.৫১৪

১৫৬. সরকার আশরাফ (সম্পা.) : *নিসর্গ (কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর মুখোমুখি দুই সন্ধ্যায়)*; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭

১৫৭. শওকত আলী : পূর্বোক্ত;পৃ.২৮-২৯

১৫৮. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.২৭

১৫৯. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ.৫১৬-৫১৭

১৬০. আনিসুজ্জামান : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১ এপ্রিল, ২০১৮

১৬১. আহমদ কবির : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার , ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

১৬২. আবুল কাসেম ফজলুল হক : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

১৬৩. হাসান আজিজুল হক : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ১ মে, ২০১৮

১৬৪. শাহরিয়ার কবির : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার , ২০ জুন, ২০১৮

১৬৫. আলী ইমাম : পি-এইচ.ডি গবেষণা সাহায়ক সাক্ষাৎকার ; ১৬ জুলাই, ২০১৮

১৬৬. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : পি-এইচ.ডি গবেষণা সহায়ক সাক্ষাৎকার, ২৪ অক্টোবর, ২০১৮

১৬৭. সরকার আশরাফ (সম্পা.): *নিসর্গ (কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর মখোমুখি দুই সন্ধ্যায়)* ; পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬

১৬৮. জাকির তালুকদার : *আমাদের সাহিত্যের কালপুরুষ* (বেলাল বাঙালি সম্পা. *কথাশিল্পী শওকত আলী : ব্রাত্যজনের কথক)* ; গণপ্রকাশন, ঢাকা.২০১৮,পৃ.৩১-৩২

১৬৯. আশরাফ উদ্দিন : *শওকত আলীর দলিল : বিষয় চেতনা ও আঙ্গিক ভাবনা* (মোহাম্মদ হাননান সম্পা.*শওকত আলী রচনা সমগ্র*) ; ৮ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা,২০১৮,পৃ.৬৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক চেতনার উপন্যাস

রাজনীতির চড়াই-উৎরাই একটি জাতিকে শুধু আত্মসন্ধানের পথ করে দেয় না, সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার স্বরূপ অনুধাবনেরও সুযোগ এনে দেয়। একটি জাতির জন্মলগ্নের মৌল বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয় তার রাজনীতির জনবিস্ফোরক চেতনায়। শওকত আলী রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের আগ্নেয় উত্তাপ ও উত্তাল মুহূর্তগুলো ছেঁকে-ছেনে তৈরি করেছেন জনজীবনের কঠিন ছাঁচ। ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্মকথার সঙ্গে অগুনতি মানুষের রক্ত, জীবন-যন্ত্রণা আর মৃত্যু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দেশভাগের অভিঘাতে অপরাপর মানুষের মতো ব্যক্তি শওকতের জীবনও বিপন্ন হয়ে ওঠে। জীবন ঘষে আগুন জ্বলে ওঠা চল্লিশ দশকের দেশভাগের সংকট হতে শুরু করে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের প্রতিটি প্রান্তকেই শওকত অত্যন্ত নির্মোহ ও সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুসংকট, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (আন্দোলন), শিক্ষা আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (আন্দোলন), ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তির সংগ্রাম, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনের মতো অগ্নিঝড়া বিস্ফোরক মুহূর্তগুলো বিম্বিত হয়েছে। এ ধারার প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাস হচ্ছে– ত্রয়ী *দক্ষিণায়নের দিন–কুলায় কালস্রোত–পূর্বরাত্রি পূর্বদিন*, *ওয়ারিশ*, *উত্তরের খেপ*, *অবশেষে প্রপাত*, *দলিল*, *স্ববাসে প্রবাসে* এবং *বসত* । এ উপন্যাসগুলোতে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, দেশভাগের বেদনা, শরণার্থীর মনস্তত্ত্ব, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দানবীয় শাসন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্বৈরশাসনের সামূহিক বিনষ্টি ও দুর্বৃত্তায়নের চালচিত্র বাস্তবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ অধ্যায়ে

ত্রয়ী *দক্ষিণায়নের দিন–কুলায় কালস্রোত–পূর্বরাত্রি পূর্বদিন*, *ওয়ারিশ*, *উত্তরের খেপ*, *অবশেষে প্রপাত*, *দলিল*, *স্ববাসে প্রবাসে* এবং *বসত* উপন্যাসগুলো আলোচিত হয়েছে।

উত্তাল রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের গতিপথ

দক্ষিণায়নের দিন-কুলায় কালস্রোত-পূর্বরাত্রি পূর্বদিন

শওকত আলী ত্রয়ী-উপন্যাস [১] *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫খ্রি.), কুলায় কালস্রোত (১৯৮৬খ্রি.) ও *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৮৬খ্রি.)-এর মহাকাব্যিক বিশালতায় প্রতিকূল পরিবেশ এবং অবরুদ্ধ সময়-সমাজ-রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্রমশ হতাশা, পতন, পচন ও বিনষ্টির চিত্র উন্মোচন করেছেন। এখানে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ষাটের দশকের পূর্বপাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বপ্রস্তুতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির হতাশায় নিমজ্জমান স্বপ্নভঙ্গ ও পরাজয়ের বেদনায় বিচ্ছিন্ন-বিগলিত জীবনের ইতিবৃত্ত। অতীত ও বর্তমানের অপ্রাপ্তি ও অসংলগ্নতার মূলে ক্রিয়াশীল থাকে মধ্যবিত্ত মানসের আত্মসন্ধান ও সত্যসন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। যা ব্যক্তি,পারিবারিক,সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বগ্রাসী দুরাশা-দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত সদর্থক সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী।

বিশ শতকের বাঙালি জাতির বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জীবনদর্শনের একমাত্রিকতা এবং সভ্যতা বিকাশের অসম্পূর্ণতা। বস্তুসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার সুসমন্বয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনার্থই মানুষকে দেয় প্রকৃত মুক্তি ও পূর্ণতা।[২] কারণ সমাজের গঠনকাঠামো এবং ব্যক্তি সংবেদনার আন্তঃসম্পর্কের নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ফলেই মানবচৈতন্যে উপ্ত হয় হতাশা ও নিঃসঙ্গতার প্রাণবীজ। মানবচিত্তের নিঃসঙ্গতা সৃষ্টির মূলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আধুনিক মানুষের alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। সভ্যতার অভিশাপ, শ্রেণিবৈষম্যময় সমাজের দ্বন্দ্ব শাসিত আধুনিক মধ্যবিত্ত মানসের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, চিত্তবৈকল্যের অন্তর্চাপ ও বহির্চাপে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ।[৩] কারণ সভ্যতার ইতিহাস ও বিচ্ছিন্নতার ধারণা সমান্তরাল ও সমানবয়সী। 'The fundamental notion of alienation is at least as old as recorded time'.[৪] কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন যে, ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা থেকেই এ বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব হয়। এ বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে নিক্ষেপ করে হতাশা ও নিঃসঙ্গতার অতল গহ্বরে। জীবনের সুর ও সঙ্গতি থেকে, ব্যক্তি তথা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে এবং মানবিক সম্পর্ক থেকে বিযুক্তি ও বিচ্যুতিই হল বিচ্ছিন্নতা। উনিশ-বিশ শতক থেকে শুরু করে একুশ শতক অবধি আধিপত্যবিস্তারকারী একচ্ছত্র পুঁজিবাদ মানুষকে তার সত্তা থেকে সমাজ থেকে যেভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেভাবে ধস নামিয়ে দিয়েছে আন্তঃমানবিক সম্পর্কের বন্ধনে; তাতে ব্যক্তি মানুষের অন্তর্লোকে জন্ম নিয়েছে আত্মখণ্ডিত আর এক নতুন মানুষ। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের মধ্যে কার্ল মার্কস চার ধরনের বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করেছেন। যথা– ১. কর্ম বা কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্নতা ২. উৎপাদনসামগ্রী থেকে বিচ্ছিন্নতা ৩. আপনসত্তা থেকে

বিচ্ছিন্নতা এবং ৪. মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা।[৫] ব্যক্তিচৈতন্যে নিঃসঙ্গতার উপলব্ধিই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ পরিণতি। দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ এ বিচ্ছিন্নতাই ব্যক্তি মানসে বপন করে নিঃসঙ্গতার বীজ। আধুনিককালের ব্যক্তিমাত্রই নানাবিধ বিচ্ছিন্নতার বহুমাত্রিক রূপ দ্বারা আক্রান্ত। যেমন- ক. সত্তা বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা খ. মূল্যবোধ বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা গ. প্রেম বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা ঘ. পরিবার ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা ঙ. সমাজ বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা চ. প্রকৃতি ও মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতা এবং ছ. ঈশ্বর বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতা। বিচ্ছিন্নতার ফলে ব্যক্তিচৈতন্যে জাগ্রত হতে পারে ত্রিমাত্রিকবোধ। যেমন- ক. নৈঃসঙ্গ্যচেতনা খ. নৈরাজ্যমূলক মানসিকতা এবং গ. উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা।[৬] এ নিঃসঙ্গপীড়িত হতাশায় জর্জরিত মানুষ কখনো কখনো জাগ্রত হয় মানবিক সম্ভাবনা ও দায়িত্ববোধের চেতনায়। নিঃসঙ্গতার অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানুষ সংলগ্ন হতে চায় বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'–জেনেও অনেকেই সন্ধান করে একতা ও সংহতি। লোকপুরাণের 'ফিনিক্স পাখি' যেমন আপন দেহভস্ম থেকে পুনরায় নতুন অবয়ব নিয়ে সপ্রাণ সত্তায় জেগে ওঠে, তেমনি সময়-সমাজের নিয়ত দ্বন্দ্বে বিক্ষত-বিচূর্ণ হয়েও সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষ কখনো লাভ করে নবজন্ম। হতাশা আর নিঃসঙ্গচেতনা ব্যক্তি মনে জন্ম দেয় এক ধরনের অতীতস্মৃতিমুগ্ধতা বা নস্টালজিয়া।[৭] যা মানুষের উত্তরণ-উজ্জীবনের সোপান হিসেবে বিবেচিত।

ধর্মের জিগির তুলে সাতচল্লিশের কিম্ভূতকিমাকার পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আধা-ঔপনিবেশিক নীতি, আধা-সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণা, দীর্ঘ সামরিক শাসন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ-বৈষম্য, বাইশ পরিবার তথা কতিপয় পুঁজিপতির স্বেচ্ছাচারী মনোভাব, মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ এবং দরিদ্র জনসাধারণের নাভিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। কিন্তু মহৎ আদর্শ ও বিরাট স্বপ্নের ভিত্তি বিচূর্ণ হতে বেশি দেরি হয় না। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তির হাত ধরে মানবতাবাদী ভাবাদর্শের ঘটে অপমৃত্যু। রাজনীতির মঞ্চে আগমন ঘটে কংসরূপী সামরিক স্বৈরাচারের, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিভেদ, অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় দুর্নীতি, মজুতদারি ও কালোবাজারি। ভয়ংকররূপ ধারণ করে আমলাদের প্রভুসুলভ দৌরাত্ম্য, সহসা ফুলে-ফেঁপে ওঠা পুঁজিপতি-শিল্পপতি ও ঠিকেদারি গোষ্ঠীর বিত্তের প্রাচুর্যে নৈতিক মূল্যবোধে দেখা দেয় বিপর্যয়। গত দশ বছরের (১৯৪৭-৫৭) নড়বড়ে বাংলার সামন্ত সমাজকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয় Basic Democracy- এর শৃঙ্খলে। অখণ্ড পাকিস্তানের শ্লোগান, পরাজিত প্রায়-সামন্ত ধ্যান-ধারণা, ধর্মমোহ এবং সাম্প্রদায়িকতা হয় পুনরুজ্জীবিত।[৮] তাই দেখা যায় এদেশে বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞানে বিশ্বাস নেই; ধর্ম আছে, ধর্মের আদর্শ নেই বরং তা বিকৃত; রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্রের নীতি নেই; আইন প্রণয়নে তোড়জোড় আছে, আইনের প্রয়োগ নেই; গণতন্ত্রের প্রত্যাশা আছে, কিন্তু গণতন্ত্রের চর্চা নেই; মানবমুক্তির শ্রেণিহীন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার আছে, তবে তা তাত্ত্বিক বিতর্কে বহুধা বিভক্ত সর্বোপরি স্বপ্নের হাতছানি আছে, তথাপি প্রাপ্তিযোগ নেই। রাষ্ট্রের বিরাজমান প্রকট আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংকট, মূল্যবোধের বিপর্যয় ও সভ্যতার অসম্পূর্ণ বিকাশের ফলেই আমাদের জাতীয় জীবন হয়ে পড়ে পঙ্গু, ব্যর্থ, বিবশ, অমীমাংসিত ও নিজস্ব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন।

সময়ের এক বিরাট ক্যানভাস ও মহাকাব্যিক বিশালতাকে ধারণ করেই শওকত আলীর এ ত্রয়ী উপন্যাস গড়ে উঠেছে। বিশ পরিচ্ছেদের *দক্ষিণায়নের দিন*, চোদ্দ পরিচ্ছেদের *কুলায় কালস্রোত* এবং চোদ্দ পরিচ্ছেদের *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* অর্থাৎ আটচল্লিশ পরিচ্ছেদের বিশাল কলেবরের ত্রয়ী উন্যাসে এক ভঙ্গুর সময়ের পটে দাঁড়িয়ে ঔপন্যাসিক বাঙালি জাতিসত্তার স্ফূরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অগ্নিমুহূর্তের উত্তাপকে জারিত হতে দেখেছেন। ফলে নিকট-ইতিহাসের প্রতিটি আগ্নেয় মুহূর্ত ও জনবিস্ফোরক প্রান্তকে তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইতিহাস অপেক্ষা ব্যক্তির ভূগোলই এ কথাবস্তুর প্রাণশক্তি। বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে ঔপন্যাসিক রূপায়ণ করেছেন ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য, একাকিত্ব, বিচিত্র প্রবৃত্তির টানাপোড়েন এবং জীবনের বহুমাত্রিক চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে সদ্য এম.এ পাশ করা রোকেয়া আহমদ রাখীর ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দোলাচলের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসের শুরু হয়েছে। এম.এ পরীক্ষার প্রত্যাশিত প্রথম শ্রেণি না পাবার ব্যর্থতা, উচ্চতর গবেষণায় আত্মমগ্ন হবার আকাঙ্ক্ষা, বিয়ের ও চাকরি বাছাইজনিত সিদ্ধান্তহীনতা রাখীকে হতাশায় নিক্ষেপ করে। উপরন্তু 'রাখী কী করবে এবার...চাকরি? বিয়ে? নাকি রিসার্চ? কোনটা?'–বাবা রাশেদ আহমদ, বড় বোন বুলু, ভগ্নীপতি

হাসান, মৃত ভাই মনির অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজান, বিভাগের আগ্রহী যুবক অধ্যাপক জামান ও বন্ধুমহলের একই প্রশ্ন রাখীকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে। 'ইনোসেন্ট' আইডিয়া নিয়ে বেড়ে ওঠা রাখীর শেষপর্যন্ত ভগ্নীপতি হাসানের তদবিরে ছয়শত টাকা বেতনে ট্রাভেল এজিন্সিতে চাকরি হয়। অবশ্য এ চাকরির জন্য রাখীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির তুলনায় স্মার্টনেস ও দৈহিক সৌন্দর্যই কার্যকর ভূমিকা রাখে। এতদ্বিষয়ে অফিসকর্তা অবাঙালি মাজহার খান বলেন-

> 'এরকম একজন ডিগনিফায়েড লেডিরই দরকার ছিল। আপস্টার্ট ফাস্ট মেয়েদের যা চলাফেরা, তাতে ফার্মের প্রেস্টিজের কথা ভাবতে হয় সব সময়।'- [শওকত আলী রচনাসমগ্র; ২য় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫, দ.দি/পৃ. ৬৪]

অথচ অফিসের মানুষ, সাজানো চেয়ারটেবিল ও গোটা পরিবেশই রাখীর প্রথম থেকেই খাপছাড়া মনে হয়। ভগ্নীপতি হাসান দারুণভাবে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যোগালেও বাবা রাশেদ সাহেবের নিস্পৃহতা এবং শিক্ষক জামানের মৃদু ভর্ৎসনা রাখীকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে। 'আমরা মস্ত মস্ত ম্যালঅ্যাডজাস্টমেন্ট এর মধ্যে বাস করি; সেটাই আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় ট্রাজেডি। আর সেজন্যই আমাদের সব জায়গায় ভুল হয়।...খারাপ লাগলে এ চাকরি তুমি ছেড়ে দেবে'– বাবার এরূপ মন্তব্য রাখীর সংশয়কে আরো বাড়িয়ে দেয়। জীবনের কোনো লক্ষ্য সে স্থির করতে পারে না। একেক সময় তার সবকিছুই অর্থহীন মনে হয়। তাছাড়া রাখীর মনে জেগে ওঠে– 'সত্যিকারভাবে কোনোদিন সে কিছুই হতে চায়নি'। এমন মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত-সম্মতি থাকায় এবং শিক্ষক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কাতে জামানের দেহ-মন ও বেশভূষাতে শ্রীহীন অবস্থা দেখে রাখীর মায়ার উদ্রেক হয়। আর ক্রন্দনরত জামানকে জন্মে জন্মে চেনা-আপনজন মনে হয়। তাই- 'সে জামানের চুলভর্তি মাথার ওপর একটা হাত রাখে। একবার মনে হয়, জামান নয়, এ যেন মনি ভাই।' শিশুর অসহায়তার স্তর থেকে জামান রাখীর কাছে মৃত ভাই মনির স্তরে গিয়ে মমতায় সিক্ত হয়। রাখীও হৃদয় প্রকোষ্টের অর্গল খুলে দেয়। সে জীবনে প্রথম প্রেমের পরশ অনুভব করে। রাখী সকল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায়–

> 'বেশ তো, অধ্যাপক স্বামী–মন্দ কী। বিয়ে যদি হয় তাহলে ভালোই–একদিন না–একদিন সবাইকে তো বিয়ে করতে হয়।'- [দ.দি./পৃ.৯৬]

আসলে জামানের জীবনের বিপর্যয় ও বিপন্ন দশা রাখীর সহানুভূতি অর্জনে সহায়ক হয়। রাখীর প্রশ্রয়ে ঘটনাচক্রের লক্ষ্যহীন ও স্বপ্নহীন এ প্রণয় পরিণয়ের দিকে ধাবিত হয়। এমন হঠকারী সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালে তার জীবন বিষময় করে তোলে। অফিসকর্তা অবাঙালি মাজহারের লিবিডোতাড়িত দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্পর্শ ও প্রেমপত্র রাখীকে ভাবিয়ে তোলে। রাখী মাজহারের 'চিঠিটা হাতে নিয়ে দুমড়াল কিছুক্ষণ'–এরপর ফেলতে গিয়েও ব্যাগে রেখে দেয়। এরকম একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে রাখী পুনরায় জামানের কাছে যায়। জামান রাখীকে বুকের কাছে টেনে নিলে–

> 'রাখীর মনে হল যেন কত যুগ। একটা বিচিত্র রকমের অনুভূতি তার শরীরের ভেতর তখন ঝঙ্কার দিয়ে উঠতে চাইছে। ঘরটা কেমন অন্ধকার, হৃৎপিণ্ডের শব্দ তখন মাতাল ঘণ্টার মতো বেজে চলছে।...জামানের একটা হাত তার বুকের কাছে কিলবিল করছে। ঐ মুহূর্তে একজোড়া উত্তপ্ত ঠোঁট আগুনের টুকরোর মতো তাঁর ঠোঁটের ওপর চেপে বসল।'- [দ. দি/পৃ.১০৯]

কিন্তু এ অবস্থা ক্ষণিক মাত্র। রাখীর সম্বিৎ ফিরে আসলে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, বুকের ভেতর টের পায় অসহ্য যন্ত্রণা। কয়েকদিন পর রাখীর সন্ধানে জামানের আগমন, বর হিসেবে জামানকে বাবার পছন্দ হওয়া এবং বড় বোন বুলুর বিয়ের ইঙ্গিতময় কথা রাখীকে ভাবিয়ে তোলে। আত্মজিজ্ঞাসা হিসেবে রাখী বলে–'বিয়ে হলেই কি মেয়েদের জীবন সেটেল্ড হয়? সুখ কাকে বলে বুবু, তুমি কি সুখী হয়েছ? আব্বা কি সুখী হয়েছেন?' বিয়ে, সংসারধর্ম ও সুখ– নারী জীবনের এমন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাস্তবতা ও বঞ্চনা রাখীকে ভাবিয়ে তোলে। উপরন্তু বোন বুলু তাকে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত জানাতে বলায় রাখী আরো অস্বস্তির মধ্যে ঘুরপাক খায়। 'অধ্যাপক স্বামী, নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবন'–এর প্রশ্নে জামানকে রাখীর ভালোই লাগে। অথচ জীবনের প্রথম আরাধ্য পুরুষ জামান, না মাজহার, না বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ছেলেটা, না মৃত ভাই মনির বন্ধু সেজান, না অন্য কেউ– তাও নির্ণয় করতে রাখী ব্যর্থ হয়। সবার মাঝখানে একটি দেয়ালের অস্তিত্ব টের পায়। অথচ 'শক্তিমান কর্মচঞ্চল স্বামী, স্বাস্থ্যবান শিশু আর সম্পন্ন গৃহ'–এর প্রত্যাশা সকল মেয়েদের গড়পড়তা হিসেবের মধ্যেই থাকে। দীর্ঘ রাত জেগেও রাখী কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। সব ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে ওঠে। কারণ সুখ-সমৃদ্ধি-প্রাচুর্যের মাধ্যমে মাজহার এবং জামান কী তার দেহ ভোগ করতে চায়–না দেহাতীত অন্য আরো কিছু দিতে চায়– এমন আত্মজিজ্ঞাসায় উভয়ের চোখে মুখে সে একই সম্ভোগের চিত্র দেখতে পায়। মাজহারের তৃষ্ণা সর্বগ্রাসী হলেও জামানকে রাখীর শিশুর মতো অসহায়, অনেক বেশি কাছের ও আপন বলে মনে হয়। তাই রাখীর সিদ্ধান্ত–'জামান মাজহারের মতো নয়, মাজহার

জামানের মতো নয়।' দুই প্রেমাস্পদের তুলনা-প্রতিতুলনায় রাখীর মনে তোলপাড় শুরু হয়। এ পর্যায়ে পার্টির কাজে ব্যস্ত থেকেও সেজান রাখীর সঙ্গে দেখা করে । কারণস্বরূপ রাখীকে বলে–

> 'তোমাকে আমারও কিছু বলবার আছে বলে মনে হয়েছে, কিন্তু বলতে পারিনি কখনো। একেক সময় দারুণ ইচ্ছে হত, তোমাকে কথাটা জানাই।'- [দ.দি./পৃ.১৪৭]

তবে রাখী শেষপর্যন্ত জামানকেই বিয়ে করে। 'কোনো গয়না খুলিস না সাতদিন, খুলতে নেই'–বুলুর এমন সংস্কারজাত পরামর্শ, স্বজন ছেড়ে আসার বেদনার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্ন নিয়ে সে সংসার জীবনে প্রবেশ করে। অথচ বিয়ে ও বাসরের অনিবার্য স্বামী-স্ত্রীর শরীরী সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে রাখী বেসামাল হয়ে পড়ে। কারণ-

> 'হঠাৎ একসময় রাখীর মনে হল, জামান তার শরীরের ভেতরে ঢুকে গেল। ...সেই মুহূর্তে সে তীক্ষ্ণ আর তীব্র যন্ত্রণাটা তার মর্মমূলকে চিরে দুটুকরো করে দিল। রাখী সে যন্ত্রণার নাম জানে না।'- [কু.কা./পৃ.১৭০]

শরীরী সম্ভোগের প্রথম অভিজ্ঞতায় ও অনুভূতিতে রাখী কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়। রাখীর মনে হয় শরীরের–'ভয়ানক রাক্ষুসে এই লোভ' মানুষকে রাক্ষসে পরিণত করে। তাই রাখীও প্রথম প্রথম এর স্রোতে গা ভাসায় এবং 'বিয়েটা ভারি মজার জিনিস'–বলে বান্ধবী নার্গিসকে দ্রুত বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু এর পরপরই রাখীর জীবন ক্রমশই বিষাক্ত ও বিশ্রী রূপ নেয়। কারণ জামানের প্রেম-প্রীতিহীন সম্ভোগ বাসনা, বিছানায় যাবার ব্যগ্রতা, পৌরাণিক দুঃশাসনের ন্যায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ব্যস্ততা, লোভনীয় মাংসল শরীর দেখা ও মর্ষকামিতায় অভ্যস্ত স্বামীকে রাখী পরিপূর্ণভাবে মেলাতে পারে না। রাখীর মনে হয়-

> 'এ জামান নয়, যেন অন্য কেউ, এ যেন কোনো অচেনা লোক।... সেই মুহূর্তে চোখ বুজে প্রাণপণে নিজের উত্তেজনাকে রুখতে চাইল সে।...তখন রাখীর ভীষণ ইচ্ছে হল, জামানকে লাথি মেরে ফেলে দেয় বিছানা থেকে।...রাখীর ক্লান্ত মনের ভেতর থেকে কালো কালো ঘেন্না উঠে আসতে আরম্ভ করল। না, দুঃখ-অপমান নয়, শুধু ঘেন্না।'-[কু.কা./পৃ.১৭১-১৭২]

জামানের প্রেমহীন, প্রাণহীন শরীরী সম্পর্ককে রাখীর কাছে প্রাত্যহিক, রোজকার, একঘেয়ে ও আবেগহীন অভ্যাস বলে মনে হয়। তাই মনকে বহু প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেবার পরও স্বামীর সঙ্গে শোবার চরম মুহূর্তে তার– 'মনের গর্ত থেকে ঘেন্নার সাপ' লাফিয়ে ওঠে। জামানের নখরাঘাতে ও দন্তাঘাতে বুকের ক্ষত দেখে রাখী আরো মুষড়ে পড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয় জামানের সন্তান গ্রহণে বিতৃষ্ণাভাব ও গর্ভধারণ এড়াবার সচেতন পদক্ষেপ। এজন্যই জামানের প্রতি জন্মানো ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব সে দূর করতে পারে না। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে (যদিও ভুলবশত) গর্ভধারণ করায় রাখী প্রথমে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। তথাপি 'এবার তাহলে মা হতে যাচ্ছে সে'– এটা নিশ্চিত হয়ে কিছুটা স্বস্তি পায়। রাখী বাসায় নির্জন দুপুরে, নিঃসঙ্গ বিকেলে একাকী আলস্যে শুয়ে থাকে এবং পেটের ভেতরে নাড়িজাত সন্তানের অস্তিত্ব টের পায়। কিন্তু এসব অনুভূতির কথা স্বামী জামানকেও বলার প্রয়োজন বোধ করে না। আর এখান থেকেই–'রাখীর নিজেকে লুকানো শুরু। রাখীর আর নিজেকে মেলবার জায়গা নেই যেন।' দাম্পত্য সম্পর্কের এমন দূরত্ব এবং জামানের ঘৃণ্য মানসিকতা ও আসঙ্গলিপ্সার প্রাবল্যে রাখী অনাগত সন্তানকে ভ্রূণাবস্থায় বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য বান্ধবী ডা. সুমিতার কাছে গেলে তাকে ভর্ৎসনা শুনতে হয়। তাই রাখী গর্ভপাতের চিন্তা পরিহার করে এবং 'বাচ্চাটা তার হওয়া দরকার'–একথা স্বামীকে বলে নির্ভার হতে গিয়েও পারে না। যদিও এসময় জামান তার কাছে কিছুটা বসে, খোঁজ-খবর নেয় ও যত্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু যত্ন এক, ভালোবাসা আরেক– তা সে বুঝতে পারে। এমতবস্থায় রাখীর মনে হয় জামান অনেকটা কূটকৌশলে প্রতারণার মাধ্যমেই তাকে লুট করে নিয়েছে। তাই–

> 'জামান শুধু একটা অজুহাত মাত্র, একটা অবলম্বন মাত্র। জামান তাকে লুট করে নিয়েছে। ঘনিষ্ঠ হয়ে তার শরীরকে জাগিয়ে দিয়ে তাকে নিজের জগৎ থেকে বাইরে বার করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'-[কু.কা./পৃ.১৭৭]

রাখীর মনে হয়– 'যেন জামান কেউ নয় তার, অপরিচিত দূরের কোনো মানুষ'। বোন আর বাবা অসুস্থ রাখীকে তাদের মগবাজারের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেও সে যেতে চায় না। তাই বুলুর পীড়াপীড়িতে রাখী বলে-

> 'ও বাড়িতে আর আমাকে যেতে বোলো না বুবু। ওখানে গেলে আমি মরে যাব। ...আমার ছেলে ও বাড়িতে গেলে সত্যিই বাঁচবে না। তোমাদের মরণ দেখবার জন্যে আমাকে ও বাড়িতে আর যেতে বোলো না।'-[কু.কা./পৃ.১৮১]

প্রেম ও পরিবার বিচ্ছিন্নতা থেকেই রাখীর চিন্তাস্রোতে এ মৃত্যুভাবনা ক্রিয়াশীল হয়। তাই রাখীর মনে পড়ে ভাই মনির মৃত্যু-পরবর্তী ক্ষুধিত পাষাণের ন্যায় অভিশপ্ত বাড়ির বিপুল নিঃস্তব্ধ ও নীরব পরিবেশ। জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কোনো সমন্বয় রাখী করতে পারে না। অনাগত সন্তানের জীবন সম্পর্কে অভিশঙ্কার এক বীজ তার মনের গভীরে উপ্ত হয়। যা

পরবর্তীকালে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনে। অথচ পরদিনই জামানের কথা ও আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাখী একাই স্বামী-সংসার ছেড়ে নিজেদের অভিশপ্ত বাড়িতে চলে আসে। এসময় অপ্রত্যাশিতভাবে সেজানের আগমন এবং 'কেমন ছিলে'– সম্ভাষণে রাখী আক্রোশে ফেটে পড়ে। তাই সেজানকে বলে–

> 'আপনার কিসের এত অহংকার?...নিজেকে আপনি কী মনে করেন?... কেন আপনি আসেন এখানে? কোন অধিকারে আসেন? মনি ভাইয়ের জীবন নষ্ট করেছেন– আরো কী চান?'-[কু.কা./পৃ.১৯৯-২০০]

বামরাজনীতির সূত্রে রাখীর ভাই মনির সঙ্গে ঠাকুরগাঁওয়ের সন্তান সেজানের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পাকিস্তানি সরকারের শাসনামলের জেল-জলুম, আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন,বামদলের বিভাজন ও বিভ্রান্তি অন্য সবার মতো সেজানকেও গভীর হতাশা ও বিচ্ছিন্নতায় নিক্ষেপ করে। পত্রিকার চাকরি চলে যাওয়ায় ফ্রি ল্যান্সিং করে কোনোমতে দিন কাটানোর বিষয় তার ছন্নছাড়া জীবনেরই ইঙ্গিতবাহী। রাজনীতির লাইন ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেজানের মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক-বোদ্ধারা দলের যুবক কর্মীদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী বুর্জোয়াদের সহযোগিতা করতে বলেন। এতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে, শিল্পায়ন বিস্তৃতির পথ পাবে এবং বৃহৎ শ্রমিক শ্রেণি গড়ে উঠলে তাদের দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। কিন্তু সেজান সহকর্মীদের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। কারণ-

> 'সাম্রাজ্যবাদ কখনোই শ্রমিকশ্রেণির সংহত হওয়ার সুযোগ দেয় না– এ জন্যে ফিউডালিজম জিইয়ে রাখে, কলোনিয়ালিজম কায়েম করে। এজন্য প্রয়োজন হলে দুচারটা ভিয়েতনামও তৈরি করে ফেলে।'-[দ.দি./পৃ.১১৩]

আর ইতিহাসেও এরকম কোনো নজির নেই যে-বুর্জোয়ারা শান্তি ও সংস্কারের মাধ্যমে শ্রেণিহীন বিপ্লবের পথ করে দেয়। বরং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের কায়েম ঘটে। তত্ত্ব-দর্শনের ফাঁকাবুলি তেমন কার্যকরী হয় না। কারণ হিসেবে সেজান সহযোদ্ধাদের বলে–

> 'বইপড়া তত্ত্ব দিয়ে রাজনীতি হলে অধ্যাপকরা বড় রাজনীতিবিদ হতেন।...থিয়োরেটিক্যাল কথাবার্তা যারা তোমাদের শোনাচ্ছে, তাদের ফিল্ডে কাজ করতে বলো আগে।'- [দ.দি./পৃ.১১৩]

নেতাদের এসব তত্ত্ব-দর্শন ও 'ব্রডবেস্‌ড য়ুনিটির' কথাকে সেজান ভাঁওতাবাজি বলে উল্লেখ করায় সহযোদ্ধারা ক্ষেপে ওঠে। অনেকে পৃথক দল গড়ার, অনেকে মিলেমিশে কাজ করার, আবার অনেকে তখনই শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেজান এসব হঠকারী কথাবার্তায় গুরুত্ব না দিয়ে দেশের সত্যিকার অর্থে প্রলেতারিয়াত কৃষকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বলে। কিন্তু এতে কাজ হয় না। বরং প্রকাশ্যে তারা তার বিরোধিতা করে। আইয়ুব খানের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (basic democracy) কূটচালে বাম রাজনীতিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্তির কবলে পড়ে। সাধারণ কর্মীরা যারা বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ঝুঁকছিল, তারাও দিশেহারা হয়ে ওঠে। ফলে-

> '১৯৫৪/৫৫ সালে যারা এক পার্টিতে কাজ করত, দশ বছরের মধ্যে তারা নানান দলে ভাগ হয়ে পড়ল।... তাত্ত্বিক বিতর্ক চলতে লাগল, পার্টির ভেতরে ও বাইরে সাধারণ কর্মীরা কখনো এ-দলকে সমর্থন করতে চায়, কখনো ও দলকে–কিন্তু সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্যের ওপর কিংবা নেতৃত্বের ওপর সংহত হতে পারে না।'- [দ.দি./পৃ.১৪৩]

এসকল সুবিধাবাদী ও আপসকামী রাজনীতিকরা শুধু দলের কর্মীদের সঙ্গেই প্রতারণা করে না বরং দেশের জনগণের সঙ্গেও করে রীতিমতো ভণ্ডামি। দেশের রাজনীতির অঙ্গনে এমন বিরূপ পরিস্থিতি সেজানকে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় এনে দাঁড় করায়। কারণ পার্লামেন্টারি রাজনীতির সমর্থকরা সেজানকে সন্দেহ করে। আর বিপ্লবী রাজনীতির সমর্থকরা তাকে বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন বলে ধিক্কার দেয়। ফলে মত ও পথের বিরোধে তৎকালীন বামরাজনীতি বিভ্রান্ত হয়ে খণ্ড-বিখণ্ডের উপক্রম হয়। এ বামরাজনীতিতে বিভ্রান্ত, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত অথচ পরোপকারী-আদর্শবান ও চাপা স্বভাবের সেজানকেই রাখী বিনষ্টের প্রতীক, অভিশাপের উৎস ও শত্রু বলে সাব্যস্ত করে। আর রাগে-ক্ষোভে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে । সেজান ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষ রক্ষা করতে পারে না। রাখীকে আশঙ্কামুক্ত করা গেলেও তার গর্ভের সন্তানকে বাঁচানো যায় না। সন্তান হারিয়ে রাখী চারপাশের প্রকৃতি ও অস্তিত্বের মধ্যে বিশাল এক শূন্যতা দেখতে পায়। তাই সে–

> 'তার রক্তের নিভৃত গোপনে যে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল, তার সব ভাবনার ভিতরে যে ক্ষণে ক্ষণে ছোট ছোট পা ফেলে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যেত, যে তার সকল ইচ্ছার মধ্যে স্পন্দিত হতে আরম্ভ করেছিল, সে নেই।'- [কু.কা./পৃ.২০১]

এমন ভয়ানক অস্তিত্বহীনতা আর শূন্যতার মধ্যে রাখীর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে নমিতা দিদিমনির বাইবেল পড়ার কণ্ঠস্বর। বাইবেল সূত্রেই মনে পড়ে পুত্র যেশাসের জন্য মা মেরির উদ্বেগ-আকুল চিত্তে গোলান মরু পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে হেঁটে যাবার কথা। কিংবা জর্ডান নদীর জলে যেশাসের মৃত্যুর আশঙ্কা ও মেরির শূন্য কোল– এসব রাখীকে ভাবিয়ে তোলে। 'আসব, আমি আবার আসব'– এমন প্রতিধ্বনিও রাখী অস্ফুট সুরে শুনতে পায়। রাখী সুমিতাকে তার গর্ভপাতের বিষয়ে বলে-

> 'যখন চেয়েছিলাম ঘটাতে, তখনও বোধ হয় সত্যিকারের ইচ্ছে ছিল না আমার। আমি বোধহয় সত্যিই মা হতে চেয়েছিলাম।...মানুষ যা চায় তা বোধহয় হবার জো নেই। আমি যদি মা হতে সত্যি সত্যি না চাইতাম, তাহলে আমার ইচ্ছার উল্টোটা হয়ে আমাকে শেষ পযর্ন্ত মা-ই হতে হত, আর তাহলে এই অঘটনটা ঘটত না।'-[কু.কা./পৃ.২০৪]

আসলে দাম্পত্য জীবনে সন্তানকে আসতে হয় প্রত্যাশা ও পছন্দানুসারে; অনাকাঙ্ক্ষিত বা ঘটনাক্রমে নয়। জীবনের এ বিপ্রতীপ পরিস্থিতি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিযোগের সমন্বয়হীনতা রাখীকে একেক সময় নিয়তিবাদের দিকে টেনে নেয়। স্মৃতি ও শ্রুতিসূত্রে স্মরণে আসে তাকে নিয়ে বাবার উদ্দেশ্যে বলা মা সালমার ভবিষ্যৎবাণী–'এ মেয়ে ঠিক ভোগাবে, দেখো তুমি। দেখতে সুন্দর হলে কী হবে, ওর জন্যে শেষ পর্যন্ত কপালে দুঃখ আছে তোমার।' নিজের জীবনশূন্যতা, মনি ভাইয়ের স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশাপূর্ণ মৃত্যুতে বাবা রাশেদ সাহেবের মনে জন্মানো ভয়-আশঙ্কা রাখীকেও জেঁকে ধরে। তবে এসময় পরিষ্কার পোশাক আর পরিপাটি দেহসৌষ্ঠব নিয়ে আসা সেজানের প্রকৃতিলগ্ন গল্প ও সান্নিধ্য রাখীকে নিঃঙ্গতা থেকে ক্রমশই মুক্তি দেয়। সেজান চলে গেলেও তার উপস্থিতি রাখী বহুক্ষণ ধরে অনুভব করে। তাই-

> 'ওকে দেখে রাগ হয় না আজকাল। ও যেন সুহৃদয় বন্ধুর মতো।...সেজানের দুচোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন লজ্জা হয় রাখীর।...রাখীর মনের ভেতরে কোথায় যেন একটা স্নিগ্ধ ছোঁয়া লাগে।'- [কু.কা./পৃ.২০৪-২০৫]

সেজানের প্রতি অনুরাগ জন্মালেও রাখীর চৈতন্যজুড়ে থাকে অতৃপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যুতে তার অস্তিত্ব জুড়ে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা সে কোনোভাবেই পূরণ করতে পারে না। রাখীর মাতৃত্বের স্বপ্নভঙ্গজাত বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয় সংসার ভাঙার যন্ত্রণা। বাসায় গিয়ে বান্ধবী নার্গিসের সঙ্গে স্বামীর ব্যভিচার দেখে রাখী কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করে না। তাই বের হবার সময় দরজার কাছে দাঁড়ায় আর–

> 'পেছনে তাকিয়ে সংসারটা দেখে নিল।...বুকের ভেতরে মাথা কুটে কাঁদল, দরজার বাইরে পা দেবার মুহূর্তটাই যেন তাকে আলগা করে দিল। কেউ যেন কেটে দিল তার জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন।'-[কু.কা./পৃ.২২৬]

অনিবার্য বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় জামানের কাতরতা ও কৈফিয়তপূর্ণ কথাই রাখীকে গভীরভাবে আঘাত করে। 'যেদিন ভালো লাগবে, সেদিন হয়তো চলে আসব'–এমন একটি স্বাধীন ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে রাখী স্বামী-সংসার ছেড়ে চলে আসে। আসলে রাখীর মনোজগৎ সৃজনে তার বাবা রাশেদ আহমদের উদার জীবনদর্শন, বিপ্লবী ভাই মনির মানবিক সমাজপ্রতিষ্ঠার বিশ্ববীক্ষা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সেজানের সাম্যবাদী রাষ্ট্র নির্মাণের চেতনাদর্শ বিরাট ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে থাকে তার পারিবারিক মুক্ত চিন্তার অনুকূল পরিবেশ, প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার অবাধ সুযোগ, নিজের অধীত বিদ্যাশিক্ষা ও মার্জিত রুচিজ্ঞান। এর কোনোটিই রাখী ক্যারিয়ারসর্বস্ব, বহুগামী, লোভী, ভীতু, প্রতারক ও উদ্‌ভ্রান্তস্বভাবের স্বামী জামানের সংসারে পায়নি। যার ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *যোগাযোগ* উপন্যাসের নায়িকা কুমুর মতো রাখীও স্বামীসান্নিধ্যে, সংসারধর্মে, জীবন গড়তে ও গোছাতে মনের সায়-স্বস্তি-স্ফূর্তি পায়নি। নূরনগরের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়ির কুমু বড় ভাই বিপ্রদাসের সান্নিধ্য–সংস্পর্শে জীবনবোধের যে-অবাধ আকাশ পেয়েছিল, তা নব্যপুঁজিপতি স্বামী মধুসূদন ঘোষালের প্রাণহীন-প্রেমহীন বিত্তবৈভবের পাষাণপুরীতে এসে সেই প্রাণের সুর ও সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে। কুমু ও মধুসূদনের শ্রেণিপার্থক্য, স্বতন্ত্রমূল্যবোধ, মনোভঙ্গি ও জীবনাচরণের বিপরীত মাত্রা– সবই তাদের জীবনসংকটকে জটিলতর করে তোলে। তবে রবীন্দ্রনাথের কুমুর মতো শওকত আলী রাখীর মর্মন্তুদ পরাভবের ট্র্যাজিডি অঙ্কন করেননি। এখানেই কুমুর সঙ্গে রাখী চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য।

রাখী সংসার-সন্তান-স্বামীবিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সবাইকে পাশ কাটিয়ে চলায় পীড়া অনুভব করে। এমন পালিয়ে বেড়ানোর সে কোনো মানে খুঁজে পায় না। জীবন ও সমাজবাস্তবতা মেনে সুমিতা রাখীকে স্বামী জামানের কাছে যাবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু রাখীর জিজ্ঞাসার জায়গাটা অন্যত্র। কারণ–

‘জামানের বউ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্যেই কি তার জন্ম হয়েছিল? জামানের বিছানায় শুয়ে, তার দেখাশোনা করে সংসার গোছালেই কি জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে?’-[কু.কা./পৃ.২৩৭]

জীবনার্থের মূল্যায়নে সক্ষম রাখীকে তাই জামানের সংসার ও তার ভালোবাসা কোনো কিছুই আকর্ষণ করে না। এপর্যায়ে রাখী ও সেজানের মধ্যে ক্রমশই অনুরাগের সূচনা হয়। এ অনুরাগ থেকেই অধিকারের জন্ম নেয়। যার ফলে রাজনৈতিক গোলযোগে সেজান একটি ব্যাগ নিয়ে রাখীর ঘরে ঢুকে এবং বলে– ‘শিবপুরে আজ ভুখা মিছিল হয়েছিল–গুলি চলেছে-চারজন মারা গেছে। অল্প আগে শহরে এসেছি, লুকিয়ে বাসায় গিয়েছিলাম দু’মিনিটের জন্যে...এই কাগজগুলো সরানো দরকার। কিন্তু কোথাও ভরসা হচ্ছে না। এখন তুমি ছাড়া লোক নেই।’ মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে, পার্টির প্রয়োজনে ও সহকর্মীদের জীবন সুরক্ষায় সেজান প্রয়োজনীয় স্পর্শকাতর কাগজপত্র নিরাপদ স্থানে রাখতেই রাখীর কাছে আসে। সেজান ঢাকাতেই মাসখানেক গা-ঢাকা দিয়ে কাটায়। কারণ পার্টির উপরের সারির নেতৃবৃন্দ কেমন সিদ্ধান্ত নেবেন–তার অপেক্ষাতেই সেজান থাকে। এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত না নিয়েও আর উপায় ছিল না। আবার নেতৃত্বের মধ্যে দুই বিভাজনও প্রকট হয়ে ওঠে।[৯] এমতবস্থায় বাসায় রেখে যাওয়া সেজানের ব্যাগটা খুলে রাখী কিছু রাজনৈতিক ইশতেহারের মুসাবিদা, একটি তালিকা, কিছু নাম-ঠিকানা, কিছু চিঠি এবং কয়েকটি চটি বই দেখে। ভাই মনির রাজনীতিসূত্রেই এসবের সঙ্গে সে পূর্বেই পরিচিত ছিল। রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে রাখীর বরাবরই মনে হয়–

‘নাকি ব্যাপারটা আসলেই নেশা, মানুষ যেমন মদ-জুয়া ছাড়তে পারে না, এও তেমনি। নাকি ব্যাপারটা আর্টের মতো কিছু। একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট–কিছু উপলব্ধি ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিরতিহীন চেষ্টা।’-[কু.কা./পৃ.২৩৯]

এ রাজনীতির জন্যই অনেকে নিজের জীবন-যৌবন ও ঘর-সংসারের দিকে তাকাবার সময় পায় না। সেজানও ঠিক এদের মতোই। নীতি ও আদর্শের প্রতি প্রচণ্ড রকমের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু রাখীর কাছে মানুষের জীবনকে এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপার বলে মনে হয় না। এ পর্যায়ে পুলিশ বাড়ি সার্চ করে সেজানের ব্যাগ পেলে রাখীর ঢাকায় অবস্থান করাও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বাম দলের এ বিভাজন ও দোলাচলের কারণেই শেখ মুজিবের ছয় দফা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে চালকের আসনে সমাসীন হবার সুযোগ পায়। আর বাস্তবতাও ছিল সেজানের জন্য উভয় সংকটময়। কারণ-

‘যদি আন্দোলনের পথে যাও, তাহলে আওয়ামী লীগের মতো জাতীয়তাবাদী স্লোগান সামনে আনতে হবে– যাতে শেষ পর্যন্ত তোমারই ক্ষতি। আর যদি সরাসরি আন্দোলনের পথে না যাও, সংগঠনের দিকে ঝোঁকো, শ্রেণি সংগ্রামের লাইনে থাকো তাহলেও তোমার ক্ষতি।’-[কু.কা./পৃ.২৪৩]

অর্থাৎ বামসংগঠনের আদর্শ ঠিক রেখে শ্রেণিসংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে সমকালীন বাস্তবতাকে যেমন উপেক্ষা করা হয়, আর জনসমর্থনের সম্ভাবনাও তাতে থাকে না; তেমনি আবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলে বা আপস করলে পার্টির উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। সমকালীন রাজনীতির মঞ্চে এ ত্রিশঙ্কু অবস্থা ও ক্রমজটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সেজান ছয় দফাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথেই হাঁটে । দলীয় নেতৃবৃন্দের বাধা, সহকর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেজান নিজ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়–

‘নিষ্ক্রিয়তা বামপন্থী রাজনীতির জন্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে।...পূর্ববাংলার জন্যে স্বাধীনতার স্লোগানটাই সামনে আনা উচিত। ৪৭-এ স্বাধীন হয়নি বাঘা জাতি। তাই জাতীয় মুক্তির পর্যায় এদেশে শেষ হয়ে যায়নি–সেইটি শেষ না করে অন্য কিছু করা সম্ভব নয়।’-[কু.কা./পৃ.২৪৪]

সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সেজানের সিদ্ধান্তকেই অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী মনে হয়। কারণ জনগণের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে শুধু তত্ত্ব, মিছিল আর শ্লোগান দিয়ে বিপ্লব সফল করা যায় না। এ হঠকারী লাইন ও তত্ত্বের জন্যই বায়ান্ন ও চুয়ান্ন সনে আন্দোলন করেও বামপন্থীরা নেতৃত্বে যেতে ব্যর্থ হয়। সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সেজান এলাকায় গিয়ে পুরনো কমরেড ও তেভাগা আন্দোলনের কৃষক কর্মীদের মাঝে আন্দোলনকে চাঙা করতে মনস্থির করে। তাই খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী জেলায় ঘুরে ঘুরে সংগঠনের কাজ করে। আবার

কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে রাজনীতির লাইন নিয়ে বিশ্বাসের মিল না হওয়াতে উত্তরবঙ্গের গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় ফেরাটাও সেজানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ-

> ‘৬৫-তে এসে সংকট তীব্র হয়ে উঠল। আয়ুবি শাসনের বিরুদ্ধে যেতে হলে সাম্রাজ্যবাদের দালালদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়–আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে গেলে আয়ুবি শাসনের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়।’-[পূ.পূ/পৃ.৩১৫]

সমকালীন রাজনীতির চোরাবালি ও ত্রিশঙ্কু অবস্থা সুবিধাবাদীদের জন্য অনুকূল ছিল। কারণ এদের বিবেকের দংশন নেই, দেশপ্রেমের বালাই নেই, নীতিবিচ্যুতির গ্লানি নেই, শ্রেণিসংগ্রামের দায় নেই। উঠতি মধ্যবিত্তের সুযোগসন্ধানী ও ছলচাতুরীপূর্ণ রাজনীতি সেজানের মতো একজন সৎ ও প্রতিশ্রুতিশীল নেতার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভবপর ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে সেজান রাজনীতি নিয়ে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ে। আবার রাখীও নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার মানসিক প্রস্তুতি নেয়। ‘হতাশ হোসনে রাখী, হতাশ হওয়া পাপ। খুঁজে দ্যাখ্, ভেবে দ্যাখ্ সবকিছুর ওপর জীবন থেকে যায়।...তোর মতো মেয়ের জীবন এইভাবে অর্থহীন হয়ে যেতে পারে না।’– প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী সুমিতার এমন বক্তব্য রাখীকে জীবনার্থের মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করে। উপরন্তু রাখীর জন্য সুমিতা ঠাকুরগাঁও মহিলা কলেজে প্রভাষকের চাকরির পাকা ব্যবস্থা করে। সুমিতা বুলুর মতোই রাখীকে সামলে চলার ও নিজ সংসারে পুনরায় ফিরে আসার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ‘যদি ফিরে আসি, শুধু তোর কাছেই ফিরে আসবো’–রাখীর এমন কথা জামানের সঙ্গে তার বিচ্ছেদকেই ইঙ্গিত করে। রাখী তার শৈশবের, কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত ঢাকা শহরকে বিদায় জানিয়ে নতুন কর্মক্ষেত্র ঠাকুরগাঁও চলে যায়। ঠাকুরগাঁও কলেজে চাকরি নিয়ে রাখী নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। মেধা-মনন আর দক্ষতা দিয়ে সে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেয়। প্রথম দুই মাস রাখীর ভালো কাটলেও পরের সময় ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে। প্রথমে ছাত্রীদের ব্যাডমিন্টন খেলা ও গান-বাজনার প্রশিক্ষণ শুরু করায় এলাকায় হালকা উত্তেজনা তৈরি হয়। পরবর্তী সময় কলেজের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রী উমা ঘোষ ও আবিদাকে দিয়ে নাচ-গান করানোকে কেন্দ্র করে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা বাড়ে। আর তাই-

> ‘কলেজের দেয়ালে পর্যন্ত পোস্টার পড়ে গেল। শিক্ষার নামে বেহায়াপনা চলবে না, চরিত্রহীন অধ্যাপিকার অপসারণ চাই।’- [পূ.পূ./পৃ.২৮০]

কলেজের বিপক্ষশক্তি এ ছুতো পেয়ে বেশ হৈচৈ শুরু করে আর সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ে রাখীর ওপর। পরিবার থেকে ছাত্রী সাকিনা, শাহানা ও জোহরার কলেজে আসা বন্ধ করে দেয়। কারণ হিসেবে কলেজের বেপর্দা ও বেশরিয়তি কাজ কারবারকে দায়ী করা হয়। অথচ সাতষট্টি সন হলেও উত্তরবঙ্গের অবহেলিত ঠাকুরগাঁও শহরে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পাকা রাস্তা না থাকলেও রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি ঠিকই ছিল। আর সেজন্যই-

> ‘বড় জোতদাররাই হর্তাকর্তা। ব্যবসা–বাণিজ্য, ঠিকাদারি, ডাক্তারি, ওকালতি–এসব তাদেরই ব্যাপার। রাজনীতিতে তারাই সর্বত্র। ...ভাবখানা এরকম যে, নতুন যা কিছু হোক–সবই থাকবে আমাদের হাতে। সেজন্য আমরাই টুপি মাথায় ওয়াজে শামিল হব, আবার নাটকেও সাজ-পোশাক পড়ে রঙ মেখে আমরাই অভিনয় করব। মুসলিম লীগ আমরা হব, আমরাই আওয়ামী লীগ করব, আবার আমরাই জামাতে ইসলামীও করব।’-[পূ.পূ./পৃ.২৮৪]

অর্থাৎ সাতষট্টি সনেও পূর্বপাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদী ও সুবিধাবাদী দলগুলো স্বার্থের ক্ষেত্রে ছিল একাট্টা। সেখানে প্রগতিশীল, মানবিক ও গণমুখী বামদল, ন্যাপ ও তেভাগা কর্মীদের কোনো জায়গা ছিল না। নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও প্রভাবকে নিষ্কণ্টক করতেই এরা প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী তেভাগা-আন্দোলনের কর্মী, বামদলের কর্মী ও ন্যাপপন্থীদের চিহ্নিত করে উপড়ে ফেলার দুরভিসন্ধি আটে। সুযোগসন্ধানীরা সবকিছুর জন্য রাখীকে দোষারোপ করে। আসলে ঘটনার মূল লক্ষ্য ছিল বামপন্থী প্রিন্সিপাল করিম সাহেবকে অপসারণ; রাখী এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। এটা রাখীও বুঝতে পারে। এখানে বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতির উত্থান ও সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে সাম্রাজ্যবাদী সকল দলই চক্রান্তে লিপ্ত হয়। নিগূঢ় বিবেচনায় আঞ্চলিক রাজনীতির এই চেহারা সমগ্র পূর্ববাংলার রাজনৈতিক চরিত্রেরই যেন প্রতিরূপ।[১০] তারপরেও রাখী পুরো ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। একরাতে ফাঁকা রাস্তায় স্থানীয় কয়েকজন লোক তাকে কলেজের বিষয়ে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে চাকরি ছাড়ার হুমকি দেয়। আর ভয় দেখাতে বলে–

> ‘অত ভদ্রতা কিসের, নামিয়ে আন না মাগীকে, শুধু এঞ্জিনিয়ার কেন, ওর ছেনালি আমরাও একটু দেখে নিই। শালী দেমাক দেখায়, জানে না কোন জায়গায় এসেছে–দে শালীকে টের পাইয়ে।’-[পূ.পূ./পৃ.২৯৩]

অথচ এ ঘটনা নিয়ে থানায় জিডি করা হলেও ওসি বাসায় এসে রাখীকে অযথা গোলমাল না করে ঢাকায় ফিরে যেতে বলে। সহকর্মী জাহানারা রাখীকে তার নিজের বাড়িতে নিতে এলে তাও সে প্রত্যাখ্যান করে। বরং সেদিনও সন্ধ্যার পর সেই ব্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। রাখী মনের ভেতর প্রচণ্ড সাহস ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসির ফলে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে শহুরে নেতাদের গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি সম্ভাবনা তৈরি করে দিলেও বামদলের বিভাজনের কারণে তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই ঠাকুরগাঁওয়ের পুরনো কমরেড শিবনাথ রায় ও শফিউদ্দিন মোল্লা তাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সেজানকে গ্রামের রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করতে নিষেধ করেন। কারণ হিসেবে জানান–

> ‘তেভাগার কথা বলবেন না। মানুষ লড়াই করতে নেমে গেল, ওদিকে নেতারা সব একে একে হয় ধরা দিলেন, নয়তো কেটে পড়লেন। লড়াই-ফড়াই হবে না। যেমন আছে তেমনি চলতে দিন। ...আপনারা শহরে আছেন, শহরেই থাকুন। ওখানে আন্দোলন হবে–খবরের কাগজে আন্দোলনের খবর পেয়ে আমরাও খুশি হবো–ব্যস ঐ পর্যন্তই ভালো। মিছিমিছি কৃষক সংগঠন, কৃষিবিপ্লব–এসব কথা তুলছেন। ওসব হবে না, হওয়া সম্ভব নয়।’-[পৃ.পৃ./পৃ.৩১৭]

রাজনৈতিক জীবনে পোড়খাওয়া দুই নেতা ভাল করেই জানেন বর্তমান বামদলের নেতাদের গ্রামের কৃষকদের জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। গরুচুরি যে কৃষকের কাছে সন্তানচুরির চেয়েও ভয়াবহ আবার অনাবৃষ্টিতে জোতদারদের সঙ্গে কৃষকদেরও চোখে অন্ধকার নেমে আসে– তা নেতাদের বোধগম্য হয় না। দেশের বর্তমান রাজনীতি হয়ে উঠেছে রাজধানী আর শহরকেন্দ্রিক। তাই সেজান উত্তরবঙ্গে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের কর্মতৎপরতা চালাতে গেলে নিজ দলের নেতৃবৃন্দের দ্বারা বাধার সম্মুখীন হয়। এসবের পরিবর্তে নেতারা সেজানকে হরতাল, মিটিং-মিছিল করে লোকদের জাগাতে বলেন। যাতে করে ‘ম্যাক্সিমাম পিপলকে মবিলাইজ’ করা সহজ হয়। এসব দেখে পুরনো কমরেড শিবনাথ বাবু সেজানকে বলেন–

> ‘শহরের নেতাদের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়–বড় রকমের আন্দোলন বোধ হয় শিগগিরই একটা আসছে– যা করবেন, ভেবে চিন্তে করবেন।...ছাত্ররা এক নাগাড়ে আন্দোলন করে চলছে। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায়, বিশেষ করে য়ুনিভার্সিটি এলাকায় আশেপাশে পুলিশ আর ছাত্ররা প্রায়ই মুখোমুখী হচ্ছে।’-[পৃ.পৃ/পৃ.৩২৩]

যা সমকালীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রতিরোধ আন্দোলন এবং আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ইঙ্গিতবাহী। যার সঙ্গে সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক শিল্পীরাও ক্রমশ একাত্ম হয়। শহরের পাশাপাশি– ‘গ্রামে মিছিল নেই, সভা নেই, হরতাল নেই কিন্তু ক্ষোভ আছে, রাগ আছে, অবরুদ্ধ চিৎকার আছে। সেই রাগ ক্ষোভ এবং চিৎকার ধোয়াচ্ছে। ফুঁসে উঠছে, আর এখানে ওখানে হঠাৎ হঠাৎ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে।’ যার ফলে কৃষক মজুররা ক্ষীপ্ত হয়ে বাঁহুকা নিয়ে হাটের ইজারাদারদের তাড়িয়ে দেয়, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, নিজেদের লাগানো জোতদারের ক্ষেতের ধানে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং রাখালরা মহাজনের গরু দিয়েই মহাজনের ধান ক্ষেত বিনষ্ট করে। ফলে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসব সামাল দিতে সেজান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার সেজান, হুমায়ূন, স্থানীয় পুরনো দুই কমরেড শফিউদ্দিন মোল্লা ও শিবনাথ বাবুদের তৎপরতায় রাখী এ যাত্রায় বিপদ কাটিয়ে ওঠে। ‘এ যাত্রা টিকলে হয়’–এসময় সেজানের গুরুতর অসুস্থতার এমন কথা জেনে রাখী শীতের রাতে বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও তাকে দেখতে যায়। আত্মবিশ্বাস আর আন্তরিকতা নিয়ে সেজানের সেবা-শুশ্রূষা করে। এমন পরিস্থিতি রাখী ও সেজানকে ক্রমশই নিকটতর করে । মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ও সেজানকে বাঁচিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে রাখী কেবল ব্যক্তি সেজানকেই পুনরুজ্জীবিত করে না বরং একটি আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠাকে অত্যাসন্ন অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে। অথচ অসুস্থ সেজানের পাশে রাতকাটানো নিয়ে এলাকায় নানা অপবাদ ও মুখোরচক গল্প প্রচার পায়। কিন্তু রাখী এসব কুৎসা ও মিথ্যার সঙ্গে আপস করে না, ভয় পায় না বরং পূর্বের ন্যায় সেজানের কাছে যাওয়া অব্যাহত রাখে। অসম্ভব রকমের জেদ রাখীর মধ্যে চেপে বসে। তাই সে মনে মনে বলে–

> ‘অনেকবার ভয় পেয়েছে সে, অনেকবার পাশ কাটিয়েছে, অনেকবার আপোষ করেছে–কিন্তু এখন আর সে ওসব করতে চায় না। শক্ত পায়ে যখন একবার দাঁড়িয়েছে সে, তখন সে দাঁড়িয়েই থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাকে তা দেখতে হবে।’-[পৃ.পৃ./পৃ.৩২৮]

এমতবস্থায় বাবার পাঠানো চিঠিতে রাখী নিজেদের ‘অভিশপ্ত বাড়ি’ বিক্রির পরিকল্পনার করার কথা জানতে পারে। সে তাদের মাধবীলতার ঝাড়, শিউলি ফুল সমেত পবিত্র বাড়িটায় অভিশাপের স্পর্শ লাগার কারণ নির্ণয় করতে পারে না। বাবা রাশেদ সাহেবের নিষ্পাপ জীবন-যাপন ছিল চোখে পড়ার মতো। তারপরও রাখীর সন্দেহ–

> ‘৬৪ থেকে নাকি ৬৫ থেকে? নাকি একেবারে গোড়া থেকেই কেউ পুঁতে দিয়েছিল ধসের বীজ। সে বীজ অঙ্কুর হয়ে বেরুল। তারপর ডালপালা ছড়িয়ে বড় হয়ে এক সময় ছেয়ে ফেলল গোটা সংসারটাকে।’-[পৃ.পৃ/পৃ.৩৩১]

আসলে সমকালীন আইয়ুবী স্বৈরশাসন, পুঁজিবাদের বিকার, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আর দেশীয় রাজনীতির অবক্ষয়ের সমন্বয়ে রাখীদের সংসারে অঙ্কুরিত হয় এক সর্বনাশা বিষবৃক্ষ। যার বিষবাষ্পে গোটা সংসার ও সদস্যরা অনিবার্যভাবে দগ্ধ হয়েছে, ধসের আবর্তে জাপ্টাজাপ্টিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। কুচক্রী মহল রাখীকে সামাজিকভাবে ও প্রশাসনিকভাবে বয়কটের সকল পন্থায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে রাজনৈতিক কূটকৌশল গ্রহণ করে। কারণ বামনেতা সেজানের সঙ্গে গভীরভাবে মেশা ও যাতায়াত এবং পুরনো কমরেড ও কর্মীদের রাখীর প্রতি সমর্থন–এসবকেই বিপক্ষ গ্রুপ তুরুপের তাস হিসেবে কাজে লাগায়। ফলে রাখীর পেছনে গোয়েন্দা পুলিশ লাগে। শত্রু পক্ষের কুৎসা ও কলেজের ঝামেলায় রাখী নিজেকে নির্ভীক ও আত্মপ্রত্যয়ী রাখতে পারলেও সেজানের অপমানে সে ভেঙে পড়ে। তারপরও রাখীর কাছে এ ব্যক্তিগত সংকটের চেয়ে দেশীয় সংকটটাই বড় হয়ে ওঠে। এসময় রাজনৈতিক উত্তাপের মতো প্রকৃতির উত্তাপের ঢেউও রাখীর কলেজে এসে লাগে। তার হাতে গড়া মেয়েরা প্রাণের উল্লাসে ফাগুনের গান গায় এবং রক্তাক্ত পলাশ ছিটিয়ে রঙিন করে তোলে কলেজ প্রাঙ্গণ। যা এ উপন্যাসের এক তাৎপর্যময় প্রান্ত। এভাবে আটষট্টির ফেব্রুয়ারিতে এসে দেশের রাজনীতিতে নানা উত্তেজনা ও বাঁকবদল ঘটে । একটি বড় আন্দোলনের সম্ভাবনা সবাই আঁচ করে। এমন পরিস্থিতিতেই রাখী গুরুতর অসুস্থ সেজানকে ঢাকায় নেবার প্রস্তুতি নেয়। যা রাখীর জীবনপ্রবাহের মৌল পরিবর্তনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। ঢাকায় ফিরে বাবার ভাঙাচোরা ও বুড়িয়ে যাওয়া চেহারা, নিঝুম-নির্জন বাড়ির অন্ধকার কক্ষ ও লন দেখে তার খারাপ লাগে। রাখীর বাল্ব কিনে বাড়িকে আলোকময় করার মধ্য দিয়ে তার জীবনের এক উত্তরণের ইঙ্গিত মেলে। রাখীর মুখে চাকরি ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় আসার কথা এবং অসুস্থ সেজানের প্রতি তার দায়-দায়িত্বের কথা জেনে রাশেদ সাহেবও বিভ্রান্ত হন। তাই গম্ভীর মুখে ভাবেন-‘এ কোন রাখী, রাখী তো এমন ছিল না।’ রাখীর ব্যক্তিগত এ সিদ্ধান্ত ও স্থানান্তর তার জীবন-বাঁকবদলের সঙ্গে চেতনাস্রোতেও এক ধরনের নবজন্ম ঘটায়। আর সংক্ষুব্ধ সময়ের তাপ-চাপ এবং সেজান ও সুমিতার সংস্পর্শে রাখীও বাম রাজনীতিতে জড়ায়। তাই রাখী সমকালীন আন্দোলনের সুফল পেতে শুধু নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব-গোঁজামিলকেই অন্তরায় ভাবে না বরং নতুনরূপে নতুন শোষকের আবির্ভাবের বিষয়ে বলে–

> ‘তাতে সাধারণ মানুষের কী লাভ হবে বলো? পাঞ্জাবি প্রভুর বদলে বাঙালি প্রভু হবে। তখন বাঙালি জমির মালিক আর বাঙালি পুঁজি মালিক–এ দুই মালিক মিলে সাধারণ মানুষকে শোষণ করবে।’-[পৃ.পৃ/পৃ-৩৬০]

এসময় অসুস্থ সেজান হাসপাতালে দিনরাত বই পড়ে দেশের চলমান অস্থির সময় ও রাজনীতির বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়। নিজেকে চুপচাপ গুটিয়ে রাখাকেও সেজান এক ধরনের অন্যায়-অপরাধ বলে গণ্য করে। তাই সুমিতাকে বলে–

> ‘আমার ধারণা, সামনে একটা খুব বড় আন্দোলন আসছে–এমন আন্দোলন এদেশে আর কখনো হয়নি। এই আন্দোলনে বামপন্থীদের নেতৃত্ব দিতে হবে– কেননা এর পরই বাঙালির স্বাধীনতার প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠবে। আন্দোলন হবেই–কেউ ঠেকাতে পারবে না। অথচ আন্দোলনের নেতৃত্ব ভুল পথে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে পুরো মাত্রায়।’-[পৃ.পৃ./পৃ.৩৭০]

সেজানের এমন দূরদর্শী মতামতকে দলের নেতাকর্মীরা কোনো পাত্তা না দিয়ে বরং তাকে নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। তাই সেজান রাখীর কাছে বলে তার হতাশা-ব্যর্থতা আর পরাজয়ের কথা। সেজান জানায়-

> ‘সবার কাছে আমি গিয়েছি জানো, কিন্তু কেউ আমার কথা শুনতে চায়নি। গ্রামাঞ্চলের কথা বললে কেউ আমাকে ঠাট্টা করেছে, স্বাধীনতার কথা বললে কেউ আমাকে রি-অ্যাকশনারি বলেছে, টেবিলের তাত্ত্বিক তর্ক ছেড়ে কাজে নামার কথা বললে আমাকে পাগল বলেছে।...আমি নাকি আগাগোড়া হঠকারী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, দেশের এক নাম্বার শত্রু।’-[পৃ.পৃ/পৃ.৩৭২]

সমকালীন নষ্টসময়, অপরাজনীতি ও আপস প্রবণতার কাছে সৎ, সংবেদনশীল ও সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক কর্মী সেজানেরও শ্রম-ঘাম-ত্যাগ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নিজ দলের নেতাকর্মীরাই তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। বৃষ্টিভেজা উদভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত সেজানকে দেখে রাখীর বুকের ভেতর কান্নার স্রোত উথলে ওঠে। সেজানকে সে কাছে টানে আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করে–

> ‘এই কি তুই চেয়েছিলি? শুধুই হেরে যাওয়া, শুধুই ক্ষয়ে যাওয়া, শুধুই ধসে যাওয়া? তোর ছেলে কোথায় রাখী’?-[পৃ.পৃ./পৃ.৩৭২]

রাখী তার সংসারহীন-সন্তানহীন অপূর্ণ জীবনের দিকে তাকায়। সে নিজের নিষ্ফল জীবনের মতো প্রেমাস্পদ সেজানের জীবনটাকেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ-পরাজিত-নিঃশেষ হিসেবে দেখতে চায় না। তাই বৃষ্টির নির্জন রাতে রাখী সেজানের মুখোমুখি দাঁড়ায় আর বলে–

> 'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। আমার দাঁড়াবার কোনো জায়গা নেই; আমার ভাই অহেতুক মরে গিয়েছে, আমার বোন পাগল হয়ে মরার দিন গুনছে, আব্বার মুখের দিকে তাকানো যায় না, আমার সন্তান এসেও এল না। দ্যাখো তুমি, আমাকে ভালো করে দ্যাখো।...আমার মনকে পায়ের তলায় মাড়িয়েছে সবাই, আমার শরীরকে কলঙ্কিত করেছে, আমার নামে অপবাদ দিয়েছে– আমি এখন কী করব বলো। আমাকে দ্যাখো আর বলো। বলো আমি এই জীবন নিয়ে কী করব?'-[পৃ.প./পৃ.৩৭৩]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে রাখী কেবল ব্যক্তি সেজান, মাজহার, জামান, নিজাম উদ্দিন আর আশরাফকে নয় বরং নারীর প্রতি সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চরম ঘৃণা, দায়িত্বহীনতা, আর উদাসীনতাকেই দায়ী করেছে। নারীর জীবনপরিসরকে পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের দাপট কীভাবে দায়-দায়িত্ব না নিয়ে দলিত, মথিত, অপমানিত, উন্মুলিত করে– এমনিই এক শাশ্বত-নির্মম প্রশ্নটি রাখী ছুঁড়ে দেয়। 'শুধু জানলে হবে না। তোমাকে দেখতে হবে'–এর মাধ্যমে রাখী পুরুষতন্ত্রের কাছে ভোগ-বাসনা, আসঙ্গলিপ্সা পরিহার করে নারীর প্রতি যথার্থ দায়িত্বশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন ও জীবনাচরণে হিতাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার ওপর জোর দেয়। রাখী জীবন-যৌবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে, ভালোবাসায়-বাৎসল্যে পূর্ণতা পেতে এবং মাতৃত্বের লাবণ্যকে শতধারায় বিকশিত করতেই সেজানের বুকে ধরা দেয়। আর তাই-

> 'সেজান রাখীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। চুমু খায় কপালে, চোখে, মুখে, বুকের মাঝখানে। তারপর ঐসময় ঐ উত্তাল মুহূর্তগুলোতে রাখীর মনের মতোই শরীরও সকল দল পাপড়ি মেলে দেয়। ফুলের মতোই ফোটে রাখী সেজানের দুই হাতের মধ্যে।'-[পৃ.পৃ/পৃ.৩৭৩]

প্রেমের পরিপূর্ণ গ্রহণ-নিবেদনের মধ্য দিয়ে উভয়ে ভালবাসার এক শক্ত ঠিকানা খুঁজে পায়। যার ফলশ্রুতিতে রাখীর মাতৃত্বের জঠর জমিনে প্রেমের ভ্রূণবীজটিও সযত্নে রোপিত হয়। তবে দিনে দিনে রাখীর গর্ভধারণের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুমিতার ভর্ৎসনায় রাখী রাগ না করে বরং স্বাভাবিকভাবেই বলে–

> 'আমি কি মা হব না কোনোদিন?....সংসারে কতই তো নিয়মকানুন আছে, তাতে আমার কী?....আমার ছেলে খুব সুন্দর হবে দেখিস। এ আমার ভালোবাসার ফুল।'-[পৃ.পৃ./পৃ.৩৭৬]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে রাখীর মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রথাবিরোধী চেতনার বহ্নিশিখা আলোক-উদ্ভাসিত হয়েছে। যা যুগ যুগ ধরে প্রেম-প্রীতিহীন ও মায়া-মমতাশূন্য সমাজজীবনে জেঁকে বসা শাস্ত্রাচার ও সমাজশাসনের বিরুদ্ধে এক শানিত আয়ুধ। একই সঙ্গে রাখীর পুত্রসন্তান কামনার বিষয়টি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যাওয়া মৃত ভাই ও অপ্রাপনীয় প্রেমাস্পদের উত্তরাধিকারের ধারাকে গতিশীল রাখার ইঙ্গিতও বটে। 'রাখী তুই এভাবে আমাকে ডোবাস না'–বাবার এমন কথাতেও রাখীর তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না। আবার সুমিতা অনাগত সন্তানের পরিচয় সংকেটের কথা ভেবে গর্ভপাতের পরামর্শ দিলেও রাখী তা আমলে নেয় না। কারণ রাখীর দাম্পত্য সম্পর্কের সমাজস্বীকৃত ও বৈধ সন্তান বাঁচেনি। অথচ সমাজ-অস্বীকৃত যৌথজীবনের পরিচয় সংকটকারী সন্তানের নিরাপদে জন্মগ্রহণোন্মুখ বিপ্রতীপ বাস্তবতা পরিবারে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। যা গৌরকিশোর ঘোষের ত্রয়ী *প্রেম নেই* উপন্যাসের শফিক-বিলকিস দম্পতির বৈধ সন্তানের মৃত্যু আর দাউদ-দুলীর প্রণয়জাত সন্তানের বেঁচে থাকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যা সমকালীন দেশের বিদ্যমান দুঃশাসন, দুর্বৃত্তায়ন, অবক্ষয়ের উত্থান আর সত্য-সুন্দর-কল্যাণের ক্রমশ বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী। তাই দেশের এ রাজনৈতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকময় পরিবেশে রাখী নিজের সন্তান, সন্তানের ভবিষ্যৎ ও সত্তা-আবিষ্কারে ব্রতী হয়। 'নিজের রক্তের কাছে কি কিছু লুকোনো যায়'–এর মাধ্যমে রাখী সন্তানের পরিচয় প্রদানে কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচকে প্রশ্রয় না দেবার অবিচল সিদ্ধান্ত নেয়। আর নিজের জীবন-বিপর্যয়ের কারণ চিহ্নিত করে বলে–

> 'দোষ ছিল আমার নিজেকে চিনতে না পারার–দোষ ছিল শক্ত পায়ে না দাঁড়ানোয়, দোষ ছিল আমার নিজের কাছে যা সত্য তা দুহাত বাড়িয়ে আঁকড়ে না ধরায়।'-[পৃ.পৃ./পৃ.৩৮০]

আত্ম-আবিষ্কারের জায়গাটি বহু দেরিতে হলেও রাখী শেষ পর্যন্ত ধরতে সক্ষম হয়। তাই স্ফীত-উঁচু পেট দেখেও তার তেমন সংকোচ হয় না। বরং গর্বের সঙ্গে রাখীর মনে হয়-'দ্যাখো, আমি ফুরিয়ে যাইনি, হারিয়ে যাইনি, আমি এবার আর ভুল

করিনি।' ফলে তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে প্রবল হয়। তাই নভেম্বরের শিউলি ঝরা ও জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া রাতে ছাদে ওঠে। জ্যোৎস্না, শিশির আর মৃদু হাওয়ায় সে নিজের স্ফীত পেটের ওপরে ধীরে ধীরে হাত বোলায় । কারণ–

> 'তার মনে হয়, তার উদর আলোকিত হচ্ছে জোছনাধারায়–চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে ত্বকের ভেতর দিয়ে; পেশির ভেতর দিয়ে একেবারে জরায়ুতে–সেখানে তার ছেলের মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে জোছনার আলো'-[পৃ.পৃ/পৃ.৩৮২-৩৮৩]

প্রকৃতির জ্যোৎস্নাধারায় রাখী তার পেট, স্তন ও বাহু অবগাহন করায়। যাতে করে জ্যোৎস্নার নির্মল আলোয় তার গর্ভস্থ প্রেমের ফসল অনাগত সন্তানটি সুস্থ, সবল আর পবিত্র হয়ে ওঠে। পৃথিবী নামক গ্রহের নানা প্রথার কালিমা, সংস্কারের গ্লানি আর রাজনীতির দাবদাহে সে সন্তান যেন সুরক্ষিত থাকে। উনসত্তরের জানুয়ারিতে স্বৈরাচার আইয়ুব খানের পতনের আন্দোলনে ঢাকা শহরসহ গোটা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ আন্দোলনে ছাত্রসমাজের রুদ্ররোষের সঙ্গে গণমানুষের সমর্থন ও রাজপথে নেমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কতগুলো কারণ সক্রিয় ছিল। যেমন- ক. দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক শোষণ ও শিক্ষার বঞ্চনা খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের গ. রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা ঘ. বাংলা ভাষা সংস্কারের পুনঃপ্রচেষ্টা ঙ. আইয়ুব খানের উন্নয়নের দশক নিয়ে মাতামাতি।[১১] সতেরো জানুয়ারির ১৪৪ ধারা জারি করাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা বাড়ে এবং বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। [১২] যা দেশ ও রাজনীতির গোটা চেহারা পাল্টে দেয়। দেশব্যাপী জানুয়ারি মাসের এ উত্তাল রাজনীতিতে আসাদুজ্জামান, সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড.শামসুজ্জোহা, রুস্তম ও মতিউর পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ এলাকায় উত্তেজনা বেশি মাত্রায় বিরাজ করে। পরের দিন হরতাল ডাকা হয়। এদিনই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সেজানের মৃত্যু হয়। এতে রাখী প্রচণ্ড আঘাত পেলেও ভেঙে পড়ে না। কারণ ব্যক্তি সেজানের মৃত্যু হলেও সেজানের ধারণকৃত সংগ্রামী আদর্শের মৃত্যু নেই। এ আদর্শের দায়ভার ও রক্তঋণ সে রেখে যায় রাখীর গর্ভজাত সন্তান তথা উত্তরসূরির হাতে। সেজানের সঙ্গে প্রথমেই তার বিয়ে হলে সংসার, সুখ, সন্তান সব পাবার পরও একটি জিনিসের ঘাটতি বা অপ্রাপ্তি থাকতো। এ প্রসঙ্গে রাখী সুমিতাকে বলে-

> 'আমি তাহলে সেজানকে পেতাম না। সেজানদের কি সহজে পাওয়া যায়, বল?'-[পৃ.পৃ./পৃ.৩৮৭]

রাখী এখানে আয়ত্তের ভেতর স্বামী সেজানকে নয় বরং আয়ত্তের অতীত, বন্ধনহীন, প্রেমিক ও সংগ্রামী সেজানকেই ইঙ্গিত করেছে। কারণ এ সেজানরা কখনোই গৃহের চারদেয়ালে ও চৌকাঠের বৃত্তে বন্দি হয়ে থাকে না। মানবমুক্তির প্রশ্নে দেশ ও দশের মাঝে থাকে জাগরূক আর অস্তিত্ববান। আসাদসহ অন্যান্য শহিদদের স্মরণে পালিত শোক দিবসে রাখী সুমিতাকে নিয়ে রাস্তায় নামে। রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে রাখী তার অনাগত সন্তানের নাম রাখা প্রসঙ্গে বলে–'আমার ছেলের নাম দেব সেজান।' পিতার নামে সন্তানের নামকরণ করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রাখীর শুধু প্রথাবিরোধী চেতনাই সক্রিয় নয় বরং পিতার আদর্শ উত্তরপুরুষ সন্তানের মাঝেও যেন বর্তায় এ প্রত্যাশাও করেছে। বিপ্লবী মনির অসমাপ্ত কাজ যেমন সেজান সম্পন্ন করেছে, তেমনি সেজানের স্বপ্নের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব তারই সন্তানের মাঝে ক্রিয়াশীল থাকবে– এটি সেই নিরন্তর সংগ্রামেরই ইঙ্গিত। কারণ সংগ্রাম ও সংগ্রামীচেতনার মৃত্যু নেই এবং তা কখনো শেষ হয় না। সাতাশ জানুয়ারি গোটা দেশ উত্তাল হয়ে পড়লে ঢাকা শহর প্রবল এক ঝাঁকুনি খায়। বৃহতের ডাকে রাখীও সাড়া দিয়ে একেকদিন মিছিলের সঙ্গে রাস্তায় নামে। বিশ্ববিদ্যালয়, গুলিস্তান ও প্রেসক্লাব এলাকায় হাঁটে। আর গর্ভস্থ সন্তানকে ডেকে ডেকে বলে-

> 'দ্যাখ্, এখানে আমি হেঁটেছিলাম–তুইও হাঁটিস এখান দিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে আমি মিছিল দেখেছিলাম–তুইও দেখিস এইখানে দাঁড়িয়ে...এই রাস্তায় সেজান মিছিল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল–তুইও এই রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাস, হ্যাঁ রে, পারবিতো?'-[পৃ.পৃ/পৃ.৩৮৯]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রেণিহীন মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়, প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়ায় সেজানের যে-স্বপ্ন, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ছিল, সেই শক্তি ও শপথের সঙ্গে রাখী তার উত্তরসূরিকে পরিচয় করিয়ে দেয়। পিতার স্বপ্ন-প্রত্যাশা যেন বংশ পরম্পরায় পুত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়– এ সেই দূরসঞ্চারী পদক্ষেপেরই এক সার্থক পাঠ ও পরিণতি। এখানে রাখীর জীবন-সংকটের তিনটি পর্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। **প্রথম পর্যায়;** চাকরি-প্রেম-বিয়ের সিদ্ধান্তজনিত সংকট। ভুল চাকরি–ভুল প্রেম–ভুল বিয়ের কারণে তার বিশ্বাস ও স্বপ্নভঙ্গ ঘটে এবং জীবন উন্মুলিত হয়। সাধের সংসার-স্বামী-স্বজন ছেড়ে তাকে অনেকটা নির্বাসনের মতো ঢাকা ত্যাগ করে ঠাকুরগাঁও যেতে হয়। **দ্বিতীয় পর্যায়;** কলেজের শিক্ষকতা ও

রাজনীতিপাগল সেজানের সংস্পর্শে তার জীবনভূগোল দ্রুত পাল্টে যায়। বিগতদিনে রাজনীতিবিমুখ হলেও সে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। **তৃতীয় পর্যায়;** ভাই মনির মৃত্যু, প্রথম গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু, বোন বুলুর মৃত্যু এবং প্রেমিক সেজানের মৃত্যু–নষ্ট সময়ের নখরাঘাতে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু তাকে অসীম শূন্যতায় নিক্ষেপ করে। নষ্ট রাজনীতির আগ্নেয় উত্তাপ, আপসময় যুগধর্ম ও মানবিক সম্পর্কের সামূহিক ভাঙনের কবলে পড়ে রাখীর চিন্তাস্রোত ও জীবনভাবনায় আসে অনিবার্য পরিবর্তন। চলিষ্ণু সময়ের প্রভাবে রাখী সত্য-সুন্দর-কল্যাণের প্রতিবন্ধক স্বামিগৃহ নামক খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে, কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূলতা জয় করে, প্রেমসূত্রে রাজনীতিতে জড়ায় এবং প্রথাবিরোধী যৌথজীবন যাপনের প্রশ্নে দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। উপন্যাসের শুরুতে প্রকৃতির ঝড়-ঝঞ্ঝার কবলে পড়া রাখীকে পরবর্তীকালেও একে একে মানবসৃষ্ট রাজনীতির ঝড়, দাম্পত্যসংকটের ঝড়, কর্মজীবনের ঝড়, প্রেম ও প্রথা বিরোধিতার ঝড় মোকাবিলা করতে হয়। সময়ই রাখীর জীবনপ্রবাহের বাঁক-বদল ঘটায়, ভবিষ্যতের শক্ত-পোক্ত মাটির সন্ধান দেয় এবং বোধ-বিশ্বাসকে শানিত করে। রাখী মূলত সময়ের সৃষ্টি।

রাশেদ আহমদ তিরিশের দশকের বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তার মাধ্যমে সমকালীন শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রথা-প্রগতির দ্বন্দ্ব, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন-বাস্তবতার দ্বন্দ্বই প্রবল হয়ে উঠেছে। মুসলিম মধ্যবিত্তরা যখন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপ্রথা , অন্ধ-আভিজাত্য ও কঠিন শাসনের দেয়ালে অবরুদ্ধ কিংবা ক্ষত-বিক্ষত; তখন–'বুদ্ধদেব বসুরা *রজনী হল উতলা* লিখে ফেলেছেন'। বাঙালি মুসলমানের এ ঝিমুনির মধ্যেও কলেজ ছাত্র রাশেদ সাহেব যুগপ্রভাবে এসময়–

> 'পাঞ্জাবি ফুলশার্ট ছেড়ে হাফশার্ট পরেন। তিন ইঞ্চি চওড়া পাঁচ বকল্স লাগানো কোমরালা জিন্সের ট্রাউজার্স বানিয়েছেন। মিহি ধুতি পরতে অসুবিধা হয় না তখন। ফজরের নামাজ তখন প্রায়ই কাজা হয়ে যায়। ইংরেজি কবিতার বই বালিশের নিচে থাকত। তখনকার দিনের প্রায় নিষিদ্ধ বই ওমর খৈয়ামের সচিত্র ইংরেজি অনুবাদ অতি যত্নে লুকিয়ে রাখতেন।'-[দ.দি./পৃ.৫০]

প্রগতিশীল রাশেদ সাহেব নিজের পছন্দেই সালমাকে বিয়ে করেন। কানুনগোর চাকরি করে তিনি মাতৃহীন মনি, বুলু ও রাখীকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু যুগের অনিবার্য পাপ-পঙ্কে তার সন্তানদের জীবন সংক্রমিত হলে তিনি ব্যর্থতা-হতাশায় নিমজ্জিত হন। ছোট মেয়ে রাখীর নির্লক্ষ্য জীবন-উদ্ভূত দুশ্চিন্তার সমান্তরালে রাশেদ সাহেবের কাছে আসে জামাতা হাসানের চাকরি ছেড়ে ঠিকেদারি করার ঘোষণা। বৈধ-অবৈধভাবে রাতারাতি বিত্তশালী হবার বিনাশী নেশার যুগধর্ম ও অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী প্রবণতা চাকুরিজীবী, উদার ও প্রগতিবাদী প্রৌঢ় রাশেদ সাহেবকে ভাবিয়ে তুলে। তাই টাকার নেশার পাগলামিতে পাওয়া জামাতা হাসানকে বলেন–

> 'তোমাদের এ যুগটাই আমি বুঝতে পারি না। এ যুগটাই তো টাকার যুগ, যেমন করে হোক, যে করে হোক টাকা চাই মানুষের। মানুষ টাকা চায় শুধু টাকার জন্য, কোনোকিছু বিল্ডাপ করার জন্য নয়। প্রফেশন হিসেবে ব্যবসাকে কেউ নিতে চায় না। কোনোরকম ক্রিয়েটিভ এফোর্ড দেখি না কোথাও– সর্বত্রই গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টা।...আসলে একটা ঠিকেদারি সোসাইটি গড়ে উঠেছে এদেশে। ব্যবসা, ইন্ডাস্ট্রি, চাকরি–সর্বত্রই *ঐ ঠিকেদারি মনোভাব* দেখা যাচ্ছে। শর্টকাট পথে বড় হবার পাগলামিতে পেয়ে বসেছে সবাইকে।'- [দ.দি./পৃ.৪৫]

রাশেদ সাহেব ভাল করেই জানেন– 'মানুষকে একটি লক্ষ্য খুঁজে পেতে হয়, একটা পারপাস অব লাইফ থাকতে হয়'। কারণ– 'ফ্লোটিং রুটলেস অবস্থা শেষ পর্যন্ত পতন ডেকে আনবেই এবং মানুষের ইনসিন্সিয়ারিটির খেসারত দিতেই হয়।' এমন সচেতন আর সতর্ক থাকার পরেও রাশেদ সাহেবের একমাত্র পুত্র মনিকে রাজনীতিযজ্ঞের বলি হতে হয়। জীবনের এ ব্যর্থতা, গ্লানি ও রক্তক্ষরণ থেকেই তিনি বলেন–

> 'আমি শুধু শান্তি আর সুখ পেতে চেয়েছিলাম জীবনে। গ্লানি যেন না থাকে, অপমান যেন না থাকে, পাপ যেন না থাকে... ছেলেমেয়েরা পবিত্র হোক, সুখী হোক।'- [দ.দি./পৃ.৪৬]

কিন্তু রাশেদ সাহেবের এমন স্বপ্ন ও প্রত্যাশা অধরাই থাকে। জামাতা হাসানের চাকরি ছেড়ে ঠিকেদারি ফার্ম খোলার কথা জেনেও তিনি বুলুকে কিছু বলতে পারেন না। অথচ বুলুর অসহায়তা-অক্ষমতা দেখে তিনি ভীষণ ভয় পান। কারণ-

> 'একটা ভয়ঙ্কর সময় আসছে, প্রকাণ্ড একটা প্রলয় ঘটে যাবে আর জীবনের সেই বিধ্বস্ত চেহারা তাকে দেখতে হবে। কোনদিক থেকে, কেমন করে, সেই আঘাত আসবে তা বলতে পারেন না। কিন্তু অনুভব করেন, আসবে সেই আঘাত, কেউ ঠেকাতে পারবে না।'- [দ.দি./পৃ.৭৯]

এরপরও রাশেদ সাহেব জীবনকে ইচ্ছেমতো সাজাচ্ছিলেন এবং মন মতো গড়ে তুলছিলেন। কিন্তু তিনি সাধ্যমতো সজাগ থাকার পরেও পতনকে রুখতে পারেননি। কারণ যাদের জন্য সাবধান হবেন, তারা সবাই তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাই অসহায়ের মতো অপেক্ষা ও দর্শকের মতো দেখে যাওয়া ছাড়া তার কিছুই করার থাকে না। বাইরে পোশাক-আশাক, দালান-কোঠাসহ অবকাঠামো ঠিক থাকলেও মানুষের অন্তঃকরণে পরিবর্তনের ঢেউ লাগতে শুরু করে। তাই রাশেদ সাহেবের কাছে মনে হয়–

'আসছে সেই পরিবর্তনটা। নদীর স্রোতের মধ্যে যেমন বন্যার পানি ধীরে ধীরে এসে মিশতে থাকে, তেমনি।'- [দ.দি./পৃ.১৩৭]

যুগপ্রভাবী এ পরিবর্তনে উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণিই সবচেয়ে আন্দোলিত, উন্মুলিত ও বিভ্রান্তির শিকার হয়। মানুষের বোধ-বিশ্বাস, স্বপ্ন-কল্পনা ও প্রত্যাশার সঙ্গে যখন বাস্তবের প্রাপ্তিযোগের তেমন মিল না হয়, তখনই একটু একটু করে গরমিল শুরু হয়। এ গরমিল ও হতাশার মধ্যে ঢুকে পড়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহ। এ অবিশ্বাস ও সন্দেহই পরে প্রবল হয়ে সবকিছুকে উপড়ে ফেলে। রাশেদ সাহেবের গোটা পারিবারিক বিপর্যয়ের সঙ্গে নৈরাজ্যময় সময় খণ্ডের ক্রমাবনতি ও শূন্যতাজনিত ভয় বেশি সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। বড় মেয়ে বুলুর সন্তানহীনতা, স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব এবং ছোট মেয়ে রাখীর দুর্ঘটনায় সন্তানবিনষ্ট হওয়া, স্বামিগৃহে না যাবার সিদ্ধান্তে তিনি নানা আশঙ্কা করেন । এমতবস্থায় রাশেদ সাহেবের কেবলই মনে হয়-

'প্রকাণ্ড একটা পতন শুরু হয়েছে। কিছুই করার নেই কারুর। এখন শুধু অপেক্ষা–কখন প্রচণ্ড আঘাতটা এসে লাগবে। সেই অপেক্ষাতেই তাকে থাকতে হবে।'-[কু.কা./পৃ.২২৯]

একেকবার রাশেদ সাহেবের মনে হয় তিনি ছেলে-মেয়েদের বেশি স্বাধীনতা দিয়ে জীবনের গোড়াতেই বড় ভুল করেছেন। এত স্বাধীনতা ও মুক্ত জীবনের সুযোগ পেয়েও সন্তানেরা পূর্ণ বিকশিত ও সুখী হতে পারেনি। অথচ তারই বন্ধুরা সন্তানদের কড়া শাসনে রেখে শিক্ষিত ও সম্পদশালী করে তুলেছেন। অথচ রাশেদ সাহেব বন্ধুদের সন্তানদের মতো মনিকে কল্পনা করেননি। তার একান্ত ইচ্ছে ছিল মনি হবে সুশিক্ষিত, সৎ, সংবেদনশীল, প্রতিবাদী, আদর্শবান ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন। অথচ ন্যায়নিষ্ঠ ও সম্ভাবনাময় মনিও বামরাজনীতির বিভ্রান্তিতে পড়ে জীবনকে শেষ করে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুশোক তিনি দুই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দুই মেয়ের জীবনও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। এমন মানসিক দ্বন্দ্বই রাশেদ সাহেবকে বিপর্যস্ত করে। তার এ বিপর্যয়ের মূলে সমকালীন নষ্ট সময়, নষ্ট রাজনীতি ও নষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সমানভাবে কার্যকর রয়েছে। এ অপরাজনীতির শিকার হয়ে পুত্রপ্রতিম সেজানের মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। সেজানের শোকে সংজ্ঞাহীন মেয়ে রাখীকে তুলতে গিয়ে তিনি প্রথমে ব্যর্থ হন। শরীর কাঁপলেও পরে ঠিকই তুলে ধরেন। এসময়–

'তাঁর (রাশেদ সাহেবের) শরীর প্রকাণ্ড দেখাল, শাদা চুলে আলো, আর পিতা সন্তানকে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপর্যয়, ধ্বংস, কোলাহল, চিৎকার আর তার মাঝখানে দুবাহুর ভাঁজের মধ্যে তুলে ধরা সন্তান নিয়ে মহাকালের যেন এক পুরুষ।'-[পূ.পৃ/পৃ.৩৮৬]

শোকে নিমজ্জমান, ব্যথায় জর্জর আর হতাশায় আনত রাশেদ সাহেবকে নষ্ট যুগের অনিবার্য তাপ-চাপ রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক রাবণ ও ধৃতরাষ্ট্রের মতো সন্তান হারানোর বেদনা গ্রাস করে। সূক্ষ্মতর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের বিপ্রদাসের মতো রাশেদ সাহেবকেও এ উত্তাল-অস্থির রাজনীতির সময়বাস্তবতা এক নির্মম ট্র্যাজিক চরিত্রে দাঁড় করায়।

বিলকিস-হাসান দম্পতির মাধ্যমে ষাট দশকের উঠতি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ-বিকার,প্রেম-প্রতারণা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ সর্বোপরি নাগরিক নৈঃসঙ্গ্যের ভয়াবহ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বুলু ইন্টারমেডিয়েট পড়াবস্থাতেই বাবার বন্ধুর ছেলে বুয়েট ছাত্র হাসানের সঙ্গে প্রেমে জড়ায় এবং বিয়ে করে। ঘরজামাই হাসান পড়াশোনা শেষে সরকারি চাকরি নেয়। প্রথম দিকে বুলুর দাম্পত্যজীবন বিত্তবিলাসে মোড়া না থাকলেও গড়পড়তা সুখের ছিল। কিন্তু হাসানের ক্রমশই জীবনের উচ্চাভিলাষ এবং যেনতেন উপায়ে বিত্তবান হবার প্রবণতা বুলুর সুখের সংসারকে নষ্টনীড়ে পরিণত করে। এরূপ পরিস্থিতিতে বুলু জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্রতী হয় এবং স্বামী হাসানের মুখোমুখি হয়ে বলে–

'তোমার কাছে লাইফ যা, আর সবার কাছে তা নাও হতে পারে। তুমি ফার্ম খুলেছ, টাকা রোজগার করে বড়লোক হবে...কিন্তু তাতে আমার কী?'-[দ.দি./পৃ.৯৯]

আসলে বুলু দাম্পত্য জীবনের প্রথমাবস্থার প্রেম-প্রীতি ও সুখ-স্বপ্ন আঁকড়েই বেঁচে-বর্তে থাকতে চেয়েছিল। জীবনকে সে টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করতে চায়নি। কিন্তু হাসান ততোদিনে অন্য মেরুর বাসিন্দা হয়ে ওঠে। বুলুর কাছে দাম্পত্যকলহ সারা জীবনই অশ্লীল বলে মনে হলেও তার জীবনেই এসবের পালা শুরু হয়। সন্তান বিনষ্টজনিত শূন্যতা ও নিষ্ফলা জীবন তাকে আরো বেশি তাড়িত-পীড়িত করে । অথচ বুলুর এসব বক্তব্য ও ভাবনায় বিরক্ত হয়ে হাসান বলে-

> 'সামান্য একটা ব্যাপার, একে এত বড় করে দেখছ কেন?... ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে না পারলে চলবে কেন? কে ঘুষ নেয় না বলো? ... আমি যদি ঘুষ না নেই তো আমার ওপরঅলা নেবে। আমার কাছ থেকে যদি ওপরঅলা বাধা পায়, তাহলে কি আর আমার চাকরি করা সম্ভব হবে?'- [দ.দি./পৃ.১২৭]

এভাবে তার দাম্পত্য জীবনের ছন্দ হারায় এবং উভয়কে নিক্ষেপ করে অশান্তি, অবিশ্বাস, বিকার-বিকৃতি ও ব্যভিচারের পাপ-পঙ্কে। মানবীয় প্রেম-প্রীতি, বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে অবিশ্বাস ও অভিশঙ্কার চোরাবালিতে রূপ নেয়। হাসান দ্রুত বড়লোক হবার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে ডেল্টা কর্পোরেশন নামের এক ঠিকেদারি প্রতিষ্ঠান চালু করে। ব্যবসায়িক স্বার্থ উদ্ধারে হাসান স্ত্রী বুলু, শ্যালিকা পারভিন, পারভিনের বান্ধবী বন্দনা ও চন্দনা, মিসেস সোহেল ও কর্মচারী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কেটি ইভান্সের রূপ-যৌবন ও টাকা ব্যবহার করে। আবার সুযোগ ও সুবিধা বাগাতে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নেতা বনে যায়। এভাবেই গোটাদেশ ও সমাজদেহেও এ রোগের ভ্রূণ সংক্রমিত হয়। তাই হাসানের সিদ্ধান্ত–

> 'সমৃদ্ধির পথ ঐ একটাই। বহু ঠেকে সে শিখেছে–টাকাই হল জীবনের সারবস্তু। একেক সময় আক্ষেপ করে সে চারদিকের অবস্থা দেখে। অতি তৃতীয় শ্রেণির মূর্খলোক দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে উঠেছে। অর্থবান মূর্খ লোকেরাই সর্বত্র সম্মান পাচ্ছে। তাদেরই দাপট।... শুধু সে-ই মিছিমিছি সময় নষ্ট করেছে এতকাল চাকরি করে।'-[দ.দি./পৃ.৯৭]

তারপরও বুলু ক্রমাগত মানিয়ে চলতে চেয়েছে, ঘৃণার কুটিল আবর্ত থেকে উঠে আসতে চেয়েছে, পূর্বের ন্যায় হাসানের হাতে হাত রেখে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছে। কিন্তু ভয়ানক এক শূন্যতা তার বুকে বাসা বাঁধে। তাই তাকে-

> 'দিনে দিনে, ধাপে ধাপে, অলক্ষ্যে-অগোচরে সরে আসতে হয়েছে। এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে হয়তো বা পরস্পরকে দেখা যায়, কণ্ঠস্বরও শোনা যায়, কিন্তু হাতে হাত রাখা যায় না। একের হৃদয়ের ধ্বনি অন্যের হৃদয়ে আর বাজে না।'- [দ.দি./পৃ.১৩০]

হাসানের প্রতি বুলুর অতিমাত্রায় বিশ্বাস আর নির্ভরতার কারণে এ ভাঙন-বিপর্যয়ই তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে। হাসানের সঙ্গে মামাতো বোন পারভিনের ব্যভিচার দেখে বুলুর দেহমন বিষিয়ে ওঠে। জেদের বশবর্তী হয়ে বুলুও উগ্র সাজসজ্জা করে স্বামী হাসানের ব্যবসায়কি পার্টনারের সঙ্গে সিনেমা ও ক্লাবে ঘুরে বেড়ায়। সমকালীন উঠতি ঠিকেদারি সমাজ বিত্ত উপার্জনে ঘরের বউকেও ভেট হিসেবে হাত ফেরিতে পরিণত করে। হাসানও স্ত্রী বুলুকে অর্থ-বিত্ত উপার্জনের সিঁড়ি বানায়। এ উঠতি পুঁজিবাদী সমাজে শুধু ঘরের বউ নয় বরং যেকোনো নারীই বাণিজ্যিক উপকরণ বা পণ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। তাই–

> 'নারীর শরীর; শরীরের উপর শুধু নয় ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও, নারীর ঘর, নারীর প্রকাশভঙ্গি, হাঁটাচলা, নারীর পোশাক, নারীর যৌনতা, যৌনক্ষমতা ও অক্ষমতা–সবকিছুই তাই কঠোর মনোযোগের আওতায়। এর প্রতিটি ক্ষেত্র বাণিজ্য সম্ভাবনায় ভরপুর, প্রতিটি ক্ষেত্র নানামাত্রার সহিংস আক্রমণের লক্ষ্য, তার উপাদানে পূর্ণ।'[১৩]

বুলুও স্বামীর বিরুদ্ধকূলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্ব ধরে রাখতে পারেনি। ঠাণ্ডা মাথায় হাসান বুলুকে এ সর্বনাশা পতনের পথে এনে দাঁড় করায় এবং ব্যবসায়কি প্রয়োজনে একে একে কামরান ইলাহী, মাজহারসহ বহু পুঁজিপতির শয্যাসঙ্গিনী হতে উৎসাহ দেয়। কারণ হাসানের 'জীবনকাঠি-মরণকাঠিওয়ালা' ব্যবসায়ী কামরানকে ম্যানেজ করা ভীষণ প্রয়োজন ছিল। আবার স্বামীর ব্যভিচার- লাম্পট্য জীবনের ওপর প্রতিশোধ নিতে বুলুও কামরান ইলাহীর শয্যাসঙ্গিনী হয়। আর–

> 'সেই রাতেই বুলু যেন খেপে উঠেছিল। সাফল্যের আনন্দে হাসান যখন তাকে আদর করছিল, তখন সে হাসানকে ছাড়েনি। জীবনে বোধহয় সেই প্রথম সে স্বামীর কাছ থেকে সেক্স আদায় করে নিয়েছে। সেই থেকে যতবার কেউ তার শরীরে হাত দিয়েছে, ততবার হ্যাঁ, গুনে গুনে ঠিক ততবারই সে হাসানকে বাধ্য করেছে তার শরীর গ্রহণ করতে।'- [কু.কা./পৃ.২৫৩]

বুলু স্বামীর পাপকে নিজের কৃত পাপ দ্বারা প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। তাই স্বামীকে ঐ পাপের পথে সাহায্য করতে এসে সে স্বামীকে তো পায়ই না, বরং হারায় । এ ঠিকেদারি সমাজের সর্বগ্রাসী ভোগ-বাসনা, আসঙ্গলিপ্সা ও বিকার শুধু দাম্পত্য জীবনেরই ভাঙন তরান্বিত করেনি বরং সেই সঙ্গে আত্মীয়তার মানবীয় সম্পর্ককেও কলুষিত করে। এ দূষণ ও বিষের

সংক্রমণে সুস্থ বুলু ক্রমশই অসুস্থ-বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে স্বামীর বিত্তের বিকারের দাবদাহে বুলু ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে যায়। পাবনার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় তার করুণ মৃত্যু ঘটে। বুলু সমকালীন উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্রুত বিত্তবান হবার বলির শিকারে পরিণত হয়। আর এটাই হয়ে ওঠে তার নিয়তি। অন্যদিকে বিত্ত বানানোর উদগ্র বাসনা হাসানের সুখের সংসারকে শ্মশানে পরিণত করে । স্ত্রীর মৃত্যুতে, বাঞ্ছিত পারভিনের পলায়নে ও ব্যবসায়িক ক্রমাবনতিতে হাসানও শেষ পর্যন্ত হতাশায় নিমজ্জিত হয়। তবে পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় বাঙালি হাসানের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী পদক্ষেপও বটে। হাসান মূলত ষাটের দশকের উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে নব্যপুঁজিপতি শ্রেণিতে অভিষেক ঘটানো শরবিদ্ধ মানুষ। তাই বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা হয় তার নিত্যসঙ্গী।

দক্ষিণায়নের দিন–পর্বে রাখীর ব্যক্তিকথা ও বাবা রাশেদ সাহেবের নস্টালজিয়ার মধ্য দিয়ে 'রাজনীতির প্রচণ্ড ঝড়' ও 'উত্তাল অস্থির' সময়খণ্ডের সমান্তরালে মনির মৃত্যু প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। রাখী যে-বৃক্ষের বীজ, সেই বৃক্ষপ্রতিম রাশেদ সাহেবের মধ্যে অস্থির সময় ও তীক্ষ্ণ কাতর জীবনোপলব্ধির যন্ত্রণার অঙ্কুশ গোচরীভূত হয়। জামানের সঙ্গে রাখীর বিয়ে এবং ক্রমশ প্রেমহীন-প্রাণহীন-আবেগহীন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে নষ্ট সময়খণ্ড রাখীর মানসলোকে নিশ্চুপে রোপন করে এক সর্বনাশা অভিশাপের বীজ। বল-ভরসাহীন, বিশ্বাসহীন ও শূন্যতার আবর্তে রাখী নিজেকে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। *কুলায় কালস্রোত*–পর্বে অতিদ্রুত রাখীর ব্যক্তিভূগোল সঙ্কুচিত হয়। বিগত দিনের রাজনীতিবিমুখ রাখী নিজের অজান্তেই সেজানের প্রেমের টানেই রাজনীতির জটিল আবর্তে জড়ায়। আলোকিত, ক্ষতবিক্ষত বিলাসী ঢাকা শহর থেকে মুক্তির ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রাখী ঠাকুরগাঁও মফস্বল শহরের যাত্রী হয়। *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন*–পর্বে রাখীর অভিজ্ঞতালোকের ক্রমশ বিস্তার সত্ত্বেও সময়ের বৃত্ত অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। নেতিবাচক সময়স্বভাব পুনরায় তাকে পরিত্যক্ত ঢাকা শহরে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। বিশ্বাস ও স্বপ্নভঙ্গের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী সেজানের আশ্রয়ে তার মৃত সত্তার পুনরুজ্জীবন ঘটে। সেজানের সন্তান সে গর্ভে ধারণ করে ঠিকই। কিন্তু জীবন ও রাজনীতির অসুস্থ থাবা চিরদিনের জন্য গ্রাস করে সেজানকে। শেষ পর্যন্ত অবলম্বনহীন শূন্যতায় এক নিভৃত স্বপ্নের বীজ লালন করাই হয়ে ওঠে রাখীর নিয়তি।

দক্ষিণায়নের দিন মানে শীতকাল আসছে। অন্যভাবে বলা যায় বৈরী প্রকৃতির ইঙ্গিত। ঋতুবৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখলে এ সময়টা ঝড়-ঝঞ্ঝামুখর বর্ষাভাসা জোয়ারের পানিতে থইথই অবস্থা বোঝায়। প্রকৃতির এ বৈরী পরিস্থিতিতে মানুষকে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। এ নামকরণের মাধ্যমে সমকালীন রাজনীতির ক্রান্তিকালকে প্রতীকী তাৎপর্যে অভিব্যঞ্জিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আলোর দীর্ঘ বিস্তার বা বিষুব রেখা থেকে সূর্যের ক্রমাগত দক্ষিণে গমনকাল বা সরে (২১জুন-২২ডিসেম্বর/শ্রাবণ–পৌষ) যাওয়র মতো এ উপন্যাসের চরিত্রসমষ্টিও ক্রমাগত জীবনের এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে উপনীত হয়েছে। জীবনের এই রূপান্তর *দক্ষিণায়নের দিন* খণ্ডের মৌল প্রতিপাদ্য।[১৪] আবার *কুলায় কালস্রোত* মানে পরিবর্তন যেখানে আঘাত করছে। 'কুলায়'– শব্দের আভিধানিক অর্থ–নীড়, পাখির বাসা ও বাসস্থান। 'কালস্রোত'– মানে বৈরী হাওয়া বা কুলভাঙা স্রোত। যা জামানের সঙ্গে রাখীর সংসারবাঁধা ও সংসার ভাঙনকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ এটি একটি বিপন্ন আশ্রয়ের উপাখ্যান। বৈরী সময়ের ঝঞ্ঝায় তছনছ হয়ে যাওয়া এক গৃহ বিনষ্টির কথা। অন্তর্গত উপলব্ধিতে সমষ্টি অপক্ষো ব্যক্তিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখণ্ডে প্রত্যেক চরিত্রই জীবনকুলায় তৈরি করে নেয় আপন আপন পৃথিবী এবং সেই আত্মনির্মিত পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে তারা লিপ্ত হয় দ্বন্দ্বে ও মীমাংসায়। *কুলায় কালস্রোত* খণ্ডের নানা বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তির মনোভূগোলের নিঃসঙ্গ তটভূমি। সেই তটভূমিতে জেগে ওঠে তাদের স্বপ্ন-বেদনা, দেখা দেয় তাদের আনন্দ-বিষণ্নতা এবং তীব্র হয়ে ওঠে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের টানাপোড়েন। *কুলায় কালস্রোত* জীবনের ভেঙে যাওয়া ছকের কথা বললেও নতুন সময়পটে ভিন্ন জীবন নির্মাণের ইশারাও রেখে যায়।[১৫] আর *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* মানে নতুন সময় আসার ঠিক একেবারে আগের সময় বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মজাগরণ ও সত্তাসন্ধানী প্রবণতায় স্বাধীকার আন্দোলনের স্ফূরণ এবং রাজনীতির দ্রুত বাঁকবদল তথা উত্তাল তরঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ের জঠরজ্বালাকে ইঙ্গিত করে। যা একই সঙ্গে ব্যক্তি ও জাতির সংকট-উত্তরণের পরিচিহ্নবাহী। এ ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাখী হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের নিরন্তর আশাবাদের প্রতীরূপক। রাখীর অনাগত সন্তান স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যেরই যেন বাহক; তার হাতেই ধরা থাকবে বাঙালির মুক্তির পতাকা। পাকিস্তানি বেনিয়াদের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির যে-প্রতিবাদ গর্জে উঠেছে; প্রতিবাদী সেই মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেজান-রাখীর গর্বিত অকুতোভয় সন্তান– এমন

দীপ্ত প্রত্যয় এ খণ্ডের গৌরবময় প্রান্ত।[১৬] এ খণ্ডটি রাখীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাপর্বেরও শুভসংকেত। ঔপন্যাসিক রাখী চরিত্রের সমান্তরালে পূর্ব বাংলার সমগ্র ভূ-খণ্ডকেই প্রতীকায়িত করেছেন। নানা প্রতিকূলতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতরেও রাখীর গর্ভধারণের স্থির সিদ্ধান্ত বহু প্রত্যাশিত বাংলা মায়ের জঠরজ্বালার ওঙ্কারস্বরূপ। যা বাংলাদেশের অনিবার্য অভ্যুদয়েরই প্রতীকী ইঙ্গিত।

শওকত আলীর এ ত্রয়ী উপন্যাসের সমান্তরালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*, সেলিনা হোসেনের *গায়ত্রী সন্ধ্যা* ও জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* উল্লেখ করা যায়। *চিলেকোঠার সেপাই*-এর হাড্ডি খিজির ও আনোয়ার, *গায়ত্রী সন্ধ্যা*-র প্রদীপ্ত, প্রতীক ও মঞ্জুলিকা এবং *অগ্নিসাক্ষী*-র বুলন ও মধুরীনার মাধ্যমে মূলত কংসরূপী আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটকেই উপস্থাপন করা হয়েছে। *চিলেকোঠার সেপাই*-এ আনোয়ারের মাধ্যমে গ্রামের জনপদ এবং হাড্ডি খিজিরের মাধ্যমে ঢাকার মধ্যবিত্তসহ নিম্নবিত্তের আন্দোলনে একাত্ম হবার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আর *গায়ত্রী সন্ধ্যা*-তে স্বৈরাচারী শাসকের ইসলামি ভাবাদর্শের বিষয়টি রূপায়ণের পাশাপাশি ঢাকার রাজপথের প্রসঙ্গটি এসেছে অনিবার্যভাবে। এখানে প্রদীপ্ত, প্রতীক ও মঞ্জুলিকা যথাক্রমে মনি, সেজান ও রাখীর মতোই পথ অনুসরণ করেছে এবং সবাই মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্রের প্রতিভূ। পক্ষান্তরে *অগ্নিসাক্ষী*-তে রাজনীতির বিষবাষ্পে বুলনের মৃত্যুতে রাজনীতিতে নিস্পৃহ মধুরীনার মানসলোকের রূপান্তর ঘটে এবং সে পতাকা হাতে রাজপথে নেমে পড়ে– যা রাখীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তবে শওকতের এ ত্রয়ী উপন্যাসে ঢাকা শহরে মধ্যবিত্তের জাগরণের মতো উত্তরবঙ্গের (ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও দিনাজপুরের) নিম্নবিত্ত কৃষক-মজুরদের সাড়া জোরদার হয়ে ওঠেনি। তারপরও বিপ্লবী সেজানের সন্তান রাখীর গর্ভে রেখে যাওয়া এবং সে- অনাগত সন্তানের মাধ্যমে সংগ্রামকে রাজপথে বলবৎ রাখার যে-দূরসঞ্চারী ইঙ্গিত শওকত দিয়েছেন– এতেই তাঁর প্রতিভার প্রাতিস্বিকতা, শিল্পের শক্তি ও সুষমার পরিচয় মেলে। এ ত্রয়ীতে দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা ও হাহাকার রাশেদ সাহেবের সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ আর বিনাশী রূপ ধারণ করেছে। কিছুটা প্রথা ও প্রগতির দ্বন্দ্বে শাসিত, রাজনীতির রাহুগ্রাসে শাপিত, স্বজনহারা-স্বপ্নহারা রাশেদ সাহেবকেই যুগযন্ত্রণা বুকে ধারণ করতে হয়েছে। এর বাইরে মাজহার, হাসান, জামান, নার্গিস, বুলু, পারভিন ও ইভা মরিস– এরা সবাই পুঁজিবাদী বিত্তের বিকারে নিমজ্জিত। হাসানের অর্থপিপাসার সর্বগ্রাসী রূপ লোকপুরাণের রাজা মিডাসের এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজা* নাটকের রাজার প্রাণহীন-প্রেমহীন স্বর্ণসংগ্রহ বা ঐশ্বর্য আহরণের পৈশাচিক স্বরূপকেই উন্মোচিত করে। তবে হাসানের এই একরোখা ব্যবসায় চেতনার মধ্য দিয়ে ষাটের দশকে ব্যবসায় পুঁজির ক্ষেত্রে বাঙালির দুর্বল অবস্থান থেকে নিজস্ব শক্তি অর্জনের আভাস বিম্বিত হয়েছে। হাসান যেন অশক্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের সেই সাহসী পূর্বপুরুষ; যে কিনা ব্যবসায়িক পুঁজি বিকাশের মধ্য দিয়ে ষাটের দশকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বয়ম্ভূতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।[১৭] ক্যারিয়ারিস্ট জামান প্রচণ্ড লোভ, লালসা আর লাম্পট্যে দিক্‌ভ্রান্ত। তবে পারভিনের শেষপর্যন্ত ঢাকা ছেড়ে পলায়ন, বিচূর্ণ-বিগলন ও পরিশোধন শেষে নবজন্ম এবং বিয়ে করে থিতু হবার বিষয়টি ইতিবাচক উত্তরণকে ইঙ্গিত করে।

মানবমুক্তির জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মনি ও সেজানের ছায়া রাখীর মনোজগৎ নির্মাণে প্রণোদনা যুগিয়েছে। উভয়ে মানবমুক্তির ইউটোপিয়ান স্বপ্নে বিভোর দুই অপচিত তরুণের অকাল বিনষ্টির নাম। সুবিধাবাদী ও আপসকামী হতে পারেনি বলেই মনি অকালে প্রাণত্যাগ করে, সেজানের স্বপ্নও ধূসর হয়ে যায় তিল তিল করে। সেজানের দৈহিক মৃত্যু হলেও সে রাখীর গর্ভে রেখে যায় তার উত্তরাধিকার।[১৮] কারণ বিশ্বব্যাপী উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনারাশির অভিঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ষাটের দশককে নিক্ষেপ করে নতুন অস্তিত্বসংকট, আত্মজিজ্ঞাসা ও সংবেদনার পরিপ্রেক্ষিতে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ক্রমসম্প্রসারণ এবং অন্যদিকে সামরিক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন বিস্তারের সূত্রপাতও এই দশকের অভিজ্ঞান। তৎকালীন পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়ক সামরিক রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানও বৈশ্বিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উত্তাপে নির্দ্বন্দ্ব ছিল না।[১৯] আর এ অনিবার্য অভিঘাতে পরিস্থিতি এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয়ে জাতীয় জীবনের এক উন্মাতাল সময় পরম্পরায় ব্যক্তিসত্য ও সমাজসত্যে রূপ লাভ করেছে। হতাশা-পরাভব-মৃত্যুর পরিবর্তে জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনা, মুক্তি

ও জয়যাত্রার উদ্বোধনই লেখক শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা করেছেন। যা শওকতের সকল রচনার মতো এ ত্রয়ীরও দীপ্তিময় প্রান্ত। এ পর্যায়ে স্মর্তব্য-

> 'মধ্যবিত্তের কুণ্ডলায়িত সময়ের চালচিত্র হিসেবে শওকত আলীর ট্রিলজি: *দক্ষিণায়নের দিন-কুলায় কালস্রোত-পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* পরিশ্রমী সৃষ্টি। শওকত আলীর চরিত্রগুলি সমাজের নির্ধারিত ছাঁচে মিল খায় না। তাই বিচ্ছিন্নতা তাদের অস্থিগত; ক্রমাগত জীবন জিজ্ঞাসায় তারা অস্তিত্ববান। শওকত আলীর গল্প কথন ন্যারেটিভ, আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।তাঁর উপন্যাসে উপকরণের প্রাচুর্য কম, তাই অপচয়ও যৎকিঞ্চিৎ।'[২০]

শওকত আলীর উপন্যাসবিধৃত সময় বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা জটিল, দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত চারিত্র্যধর্মে বিশিষ্ট। তিনি সেই সময়স্বভাবকে বিভিন্ন চরিত্রের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের যুগল identity সন্ধানের তীব্রতা, অস্থিরতা অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। যে-মিলনবিন্দুর অপর নাম টেনশনদীর্ণ অপেক্ষা। ফলে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেও তাঁর চরিত্ররা নিঃশেষিত নয়। মধ্যবিত্তের জীবনস্বরূপের নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যকে এপিক শৈলীতে ধারণ করার সক্ষমতায় শওকত আলীর ত্রয়ী স্বাধীনতা-উত্তরকালের উজ্জ্বল শিল্পসৃষ্টি।[২১] এই ত্রয়ী উপন্যাসে ষাটের দশকের ব্যক্তি ও সমষ্টির কুণ্ডলায়িত, দীর্ণ, রক্তাক্ত এবং রূপান্তরকামী চেতনার সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক জীবনের অন্তঃশীলা সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।পয়ষট্টি-ঊনসত্তর কালপর্বের ঘটনাপ্রবাহ মুখ্য অবলম্বন হলেও তার পশ্চাদ্‌বর্তী বিশাল সময়ের আয়তনও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এ ত্রয়ী উপন্যাসে। আপাতদৃষ্টিতে সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও এ উপন্যাসের কথক এবং দ্রষ্টা আসলে সময়। সময় স্বভাবের অনিবার্য সংকর্ষে-সংঘর্ষে মানব-অস্তিত্বের টানাপোড়েনকে অন্তর্ময় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন ঔপন্যাসিক।[২২] যা শওকতকে একজন সময়সচেতন, প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রথিকৃৎ লেখকের প্রতিমূর্তিতে উন্নীত করে।

শওকত আলী তাঁর এ ত্রয়ী উপন্যাসের শেষে সুকৌশলে এক ধরনের উন্মুক্ত পরিণতি রেখে দিয়েছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, বিপ্লব-সংগ্রাম সর্বদা একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের মুক্তির আন্দোলন কারো মৃত্যুতে কখনোই নিঃশেষ হয়ে যায় না। আর তা কোনো নির্দিষ্ট কালখণ্ডেও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না। তাই দেখা যায় বিপ্লবী মনির মৃত্যুর পর তার মতাদর্শী সহযোদ্ধা বন্ধু সেজানের চৈতন্যের মধ্যে সেই সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়। সেজান তা রেখে যায় তার অনাগত উত্তরসূরির হাতে। যারা দৃপ্ত সাহসে, মুষ্টিবদ্ধ হাত উচিয়ে ও বুক চিতিয়ে রাজপথের মিছিলে শামিল হবে এবং সকল অন্যায়-অনাচার-আগ্রাসন-আধিপত্যের অবসানে শপথ-সংকল্পে হয়ে উঠবে এক এক জন সংশপ্তক সেনা। কারণ জীবন যেমন মূল্যবান-অনিঃশেষ, তেমনি জীবনের সম্ভাবনাও অসীম। জীবনের হাজারো ব্যর্থতা, বিনষ্টি, নৈরাশ্য, গ্লানি এবং মৃত্যুর মধ্যেও অযুত স্বপ্ন-সম্ভাবনা থেকে যায়। এ সদর্থক চেতনায় শওকত আলী সর্বদাই ছিলেন সরব ও উচ্চকিত। আলোচ্য এ ত্রয়ী উপন্যাস একই সঙ্গে সময়সত্য, সমাজসত্য ও জীবনসত্যের বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে।

ওয়ারিশ

শওকত আলী *ওয়ারিশ* (১৯৮৯খ্রি.) উপন্যাসের মাধ্যমে সময়-সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চার প্রজন্মের আত্মসন্ধান ও উত্তরাধিকারকে শতাব্দীর ক্যানভাসে ভাষারূপ দিয়েছেন। দুটি ভূগোলবিস্তৃত ঘটনা পরম্পরায় উত্তরপুরুষের ওয়ারিশ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যে-প্রত্যাবর্তন–তা নিছক অর্থ-সম্পদের উৎস অনুসন্ধান নয় বরং ফেলে যাওয়া জন্মভূমির জন ও জনপদের সঙ্গে একাত্ম হবার অনিঃশেষ অভিপ্রায়ও বটে। যা রাজনীতির রাহুগ্রাসে মাতৃভূমি হারানোর হাহাকার, শেকড় ছেঁড়ার শোক, ভেজা পলল মাটির ঘ্রাণ সর্বোপরি স্মৃতিরোমন্থনের প্রতিটি প্রান্তকে সরব ও সজীব করে তুলেছে। সমাজ, রাজনীতি ও জীবনধারায় ভাঙচুর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। এ ধারাতেই ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নিজেকে আবিষ্কার করে। *ওয়ারিশ* উপন্যাসের বিষয়-ভাবনার সঙ্গে এ ধারাটিও প্রাসঙ্গিক। এখানে স্মরণযোগ্য–

> ' Time present and time past
> Are both perhaps present in time future
> And time future contained in time past
> If all time eternally present
> All time is unredeemable.
> What might have been is an abstraction
> Remaing a perpetual posibility
> Only in a world of speculation'.–[T.S.Eliot: *Burnt Norton]*

ওয়ারিশ উপন্যাসে চার প্রজন্মের চিন্তাস্রোত ও জীবনযাপনের অনুষঙ্গে একটি আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ উপন্যাসে জওহর আলী প্রধান, মুর্শেদ, রায়হান ও রঞ্জু–এই চার প্রজন্মের জীবনাচার-জীবনদর্শন, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বময়, জটিল ও ক্ষতবিক্ষত সত্যস্বরূপ ও তার আত্ম-আবিষ্কারের যন্ত্রণা বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের যে-রূপান্তর এবং তার অভিঘাতে প্রজন্মান্তরের চেতনার যে-ব্যবধান তারই বিশাল সময়ের আয়তন এই উপন্যাসে কখনো ফ্লাশব্যাকে আবার কখনো বর্তমান সময়-স্বভাবের চারিত্র্যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।[২৩] বাংলার ইতিহাসে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী পীড়নে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের ইসলামগ্রহণ, সমাজ-স্বজাতি রক্ষায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাদ, সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে ইংরেজদের ক্ষমতা দখল, ইংরেজদের সংস্পর্শ ও সুনজরে এসে হিন্দুদের আধুনিক শিক্ষা ও সুযোগগ্রহণ, মুসলমানদের সাবেকি ধ্যান-ধারণায় বন্দি থাকা, হিন্দুদের স্বদেশি-আন্দোলন, মুসলমানদের (জিন্নাহর) দ্বিজাতিতত্ত্ব-আন্দোলন ও বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন– এসবের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বীয় ফর্মুলায় সাতচল্লিশের দেশভাগের ইতিহাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে-বাঙালি জাতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, সেই বঙ্গভূমিকে বিভক্ত করে তথাকথিত স্বাধীনতা আসে। ফলে বিরাট সংখ্যক বাঙালি রাতারাতি অস্তিত্বহীন, অনিকেত, উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। মাতৃভূমির গভীরে প্রোথিত জন্ম শেকড়টি আকস্মিকভাবে উন্মূলিত হয়। আর অগুনতি মানুষ হঠাৎ করে নামহীন, গোত্রহীন ও আত্মপরিচয়হীন হয়ে পড়ে । এ দেশভাগে মানুষ বিতাড়নই মুখ্য ছিল না; মুখ্য ছিল ধর্মের রাজনীতি ও মানুষের বিভাজনকরণও। তা ছিল অদ্ভুত এক রাজনৈতিক খেলা।

শওকত আলীর *ওয়ারিশ* উপন্যাসটি অস্তিত্বহীন, পরিচয়লুপ্ত ও বিপন্ন নর-নারীর অন্তর্গত যন্ত্রণার শিল্পভাষ্য। উপন্যাসের নামকরণ ' ওয়ারিশ' হলেও ভারতবিভাগ এই উপমহাদেশের বিপুল সংখ্যক নর-নারীকে 'বেওয়ারিশ' নাগরিকে পরিণত করে। চার প্রজন্মের ইতিহাস ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সন্ধান করেছেন ব্যক্তির মৌলিক অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা এবং অবলোকন করতে চেয়েছেন তাদের মানসিক সংকটের মূল কারণসূত্রকে।[২৪] এ উপন্যাসে এক মুসলমান পরিবারের চার প্রজন্মের ভাবনা, জীবন-দর্শন বর্ণনার সূত্রে আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের টুকরো টুকরো ছবি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। শতবর্ষব্যাপী সময় এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। কাহিনি ছুঁয়ে যায় কোম্পানি আমলের (১৭৫৭-১৮৫৮খ্রি.) কথাও। কিন্তু এসবের মাধ্যমে যে-মূল চিন্তাসূত্রটি উন্মোচিত হয়, তা হল বাঙালির ইতিহাস ও আত্মজিজ্ঞাসা। তাই শওকত আলীর *ওয়ারিশ* উপন্যাস যোগান দেয় চিন্তার এক নতুন রসদ।[২৫] শওকত আলীর উপন্যাস 'ওয়ারিশ' একটি ব্যাপ্ত পরিধির ক্রোনলজি ও সময়ের দলিল। চার প্রজন্মের ইতিবৃত্ত জাঁকালো প্রতিবেশ নিয়ে উপন্যাসে উপস্থাপিত। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতরকার উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংক্ষোভ-উত্তেজনাকে শওকত আলী বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে এনেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের প্রথমাবধি এদেশের গ্রামজীবন ছিল প্রায় গতিহীন, সামন্ত আদর্শ-ভিত্তিক। বিশ শতকের প্রথম ক'টি দশকেই রাজনীতি, অর্থনীতি এদেশের মানুষের মূর্তমান বিশ্বাসকে দিয়েছে প্রচণ্ড ধাক্কা, তুলোট কাগজের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে পুরনো মূল্যবোধ, মানুষের ভেতরে জেগেছে অস্থিরতা আর সংশয়। তারই অনেকখানি আছে 'ওয়ারিশ'-এ।[২৬] 'ওয়ারিশ' ও 'শরিক' নামের দুটি খণ্ডের মোট ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদ মিলে *ওয়ারিশ* উপন্যাসটির অবয়ব গড়ে উঠেছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি ও শ্রুতিসূত্রই এর বুনন বিন্যাসের নিয়ামক শক্তি।

জালাল প্রধান ছিলেন মোহনগঞ্জের প্রধানবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব-পুরুষ। তার সম্পর্কে এলাকায় নানা কিংবদন্তি প্রচার পায়। নবাবী আমলের পাট্টা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি দুটি তালুক বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। আশেপাশের ছোটখাটো জমিদারদের তিনি পাত্তা দিতেন না বরং শত্রুতার সম্পর্কের জন্য হাঙ্গামায় জড়াতেন। তিনি ভয়ানক নিষ্ঠুর আর খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আর-

> 'অসম্ভব আকর্ষণ ছিল বিবাহে। জাত-গোত্রের বিচার ছিল না তাঁর–মেয়েটি সুশ্রী আর যুবতী হলেই হল।...তিনি এক সাঁওতাল সরদারের মেয়েকে ঘরে এনেছিলেন।...তাঁর ফিরিঙ্গি উপপত্নীও ছিল। তাঁর দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল ঘোড়া। প্রতি বছরই কুড়ি-পঁচিশটি ঘোড়া কিনতেন। বিবি ছিল চারটি সার্বক্ষণিক।'-[*ওয়ারিশ*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০১৭/ পৃ.১০৩]

তারপরেও তিনি কোনো পুত্রসন্তানের পিতা হতে পারেননি। কন্যা থাকলেও তিনি পুত্রের আশায় ক্রমাগত বিয়ে করেন। জালাল প্রধানের জমি, জরু (নারী), পুত্র, আর জন্তুর (ঘোড়ার) প্রতি তীব্র নেশা– যা সামন্তবাদী মানসিকতারই নামান্তর। তবে স্বাধীনচেতা মনোভাব জালাল প্রধানের ব্যক্তিত্বে যোগ করে এক ভিন্ন মাত্রা। ফকির বিদ্রোহের (১৭৬০-১৮০০খ্রি.) প্রাণপুরুষ মজনু শাহর সাগরেদ ভবানী পাঠক ও চেরাগ আলী ফকিরের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। জালাল প্রধানের

আশ্রয়-প্রশ্রয়েই চেরাগ বাহিনী মোহনগঞ্জে অবস্থান করে আর থানা লুট ও সরকারি অর্থের চালান কব্জায় নিতে হাঙ্গামায় জড়ায়। পরবর্তীকালে এমন কিংবদন্তি ছড়ায় যে, প্রধানবাড়ির হুজরাখানায় অগাধ ধনসম্পদ রয়েছে এবং এক ফকির তা আগলে রেখেছেন। আসলে এ হুজুরাখানাটি ছিল ফকির বাহিনীর গোপন মন্ত্রণাকক্ষ, ধনভাণ্ডার ও আত্মগোপনের আশ্রয়স্থল। এছাড়া প্রধানবাড়ির নানা দুর্যোগকালে এ ফকিরকে বাড়ির আশেপাশে হাঁটতে দেখা যায় বলে জনশ্রুতি প্রচার পায়। কিংবদন্তি সরিয়ে ইতিহাসের পাতায় নজর দিলে দেখা যায়, কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে বৃহৎ বাংলায় যে ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। এ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তৃণমূল স্তর থেকে। রাজা-নবাবরা নয়, ফকির-সন্ন্যাসীদের মতো সাধারণ ধর্মসংলগ্ন মানুষেরাই এ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরিক হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল গোঁড়া ইসলাম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের বাইরের সম্প্রদায়। এ আন্দোলন সফল না হলেও বৃহৎ বাংলা অঞ্চলে ধর্ম পরিচয়ের চেয়ে সামাজিক শ্রেণিচেতনা জাগ্রত হয়। যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দারুণভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়।

জওহর আলী প্রধান ছিলেন প্রধানবাড়ির পরবর্তী কর্তা। তিনি ছিলেন প্রধান বাড়ির এ্যাস্টেটের ম্যানাজার ও জামাতা। চাচাশ্বশুর মুস্তোফা আলী প্রধান জীবিত থাকতেই তিনি মালেকা বিবিকে বিয়ে করেন। তখন এ্যাস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন শ্যালক আসগর প্রধান। তিনি ভোগ-বিলাসী হয়ে ওঠেন এবং দুর্বল শরীর ও নেশার ঘোর নিয়ে কখনো জেলা সদর, কখনো গোঁসাইদের বাগান বাড়িতে পড়ে থাকতেন। ঋণের বোঝা আসগর প্রধানই তৈরি করে যান। হঠাৎ আসগর প্রধান মৃত্যুবরণ করায় স্ত্রী সমিরন্নেসা সন্তানহীন অবস্থায় বিধবা হন। পরবর্তীকালে স্ত্রী মালেকা বিবি ও নিঃসন্তান চাচাশ্বশুরের অনুরোধে জওহর আলী শ্যালকপত্নী সমিরন্নেসাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। কারণ-

> 'স্ত্রীর সন্তানহীনা বিধবা যুবতী ভ্রাতৃজায়া যদি স্বামীর সংসার ত্যাগ করে যেতে না চায়, তাহলে তার আর কী উপায়। বাপের সম্পত্তি থেকে মোটা একটি অংশ বেরিয়ে যাবে, মালেকা বিবি সেটি মানতে রাজি নন। স্ত্রীর এবং নিঃসন্তান চাচা-শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে জওহর আলী প্রধান রাজি হয়েছিল এবং তার ফলে এক মধ্যরাতে সমিরন বিবির সঙ্গে তাঁর নিকাহপড়ানোর অনুষ্ঠানটি মঙ্গলমতোই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.৩৬-৩৭]

জওহর আলী ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক। যুগের প্রভাব ও পরিবর্তনের ঢেউ দেখেই তিনি এইটুকু বুঝতে সক্ষম হন যে-জমি থেকে পুঁজি ও জীবনমান ধীরে ধীরে ব্যবসায়, শিক্ষা আর প্রযুক্তির দিকে যাচ্ছে। চোখের সামনে মোহনগঞ্জে পোস্ট অফিস, মুন্সেফ কোর্ট, রেলস্টেশন, বার্মা তেল কোম্পানির গুদাম, র‍্যালি ব্রাদার্সের পাটের গাঁইট বাঁধার কারখানা স্থাপন এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্যবসায়ী বাবুদের আগমন জওহর আলীকে অনেক বেশি সমকাল সতর্ক, বাস্তববাদী ও দূরদ্রষ্টায় পরিণত করে। আর তাই-

> 'রেলগাড়ি চালু হওয়ার জন্যই যে এতসব কাণ্ড ঘটছে তা প্রধান সাহেব ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছিলেন। বাইরের দুনিয়া বদলে যেতে থাকলে ভেতরের দুনিয়াকেও বদলাতে হবে তা তিনি জানতেন।...এটুকু জ্ঞান তাঁর ছিল যে, সময়ের পালা-বদলের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে লেখাপড়ার একটা সম্পর্ক আছে। উদাহরণ চোখের সামনেই ছিল। যে উকিল বাবুদের তাঁর শ্বশুর মুস্তোফা আলী প্রধান বসবাস করার জায়গা দিয়েছেন, বলা যায় তারা তাঁর একরকম প্রজাই। সেই উকিল বাবুদের কী রমরমা অবস্থা এখন। সব কাজে এখন তাদেরই ভূমিকা।...জোতদার জমিদারদের হাত থেকে ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যাচ্ছে। জোতদার জমিদাররা দুর্বল হওয়ায় এই নতুন বাবুরা সবল হয়ে উঠেছে।...লেখাপড়া আয়ত্তে না আনতে পারলে টিকে থাকবার উপায় নেই।'-[ওয়ারিশ/পৃ.৪৪-৪৫]

তাই তিনি সন্তানের আধুনিক শিক্ষার জন্য জমি ও অর্থ ব্যয় করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মোহনগঞ্জের এ পালাবদল ও শিক্ষিত-ব্যবসায়ী শ্রেণির অনিবার্য উত্থানের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জলসা ঘর* গল্পের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। সাত পুরুষের জমিদারির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে জমিদার বিশ্বম্ভর রায় যেখানে নিঃস্ব-নির্বিকার ও আনত; এর বিপরীতে এককালের নায়েবপুত্র ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলী সেখানে বিত্তশালী, সরব ও উদ্ধত। ভূমিনির্ভর ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবসায়-পুঁজিনির্ভর কাগজী নোটের দোর্দণ্ড প্রতাপের ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুগের এ চারিত্র্যধর্ম ও পালাবদলকে ধারণ করতেই জওহর আলী প্রস্তুতি নেন এবং ছেলে মুর্শেদকে শিক্ষা-রাজনীতিতে পোক্ত হবার অবাধ সুযোগ করে দেন।

মুর্শেদ আলী প্রধান ছিলেন প্রধানবাড়ির দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি। শৈশব থেকেই মুর্শেদের স্বভাবে অতিমাত্রায় জেদ প্রকাশ পায়। বংশের একমাত্র ছেলে হবার কারণে পিতা জওহরের অবাধ স্বাধীনতা আর দুই মা মালেকা বিবি ও সমিরন বিবির অন্ধস্নেহে মুর্শেদ ধীরে ধীরে জেদি, একরোখা ও খেয়ালি স্বভাবের হয়ে ওঠে। মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে পোলাও খাবার বায়না, যখন-তখন ঘোড়ায় চড়ার শখ এবং অষ্টপ্রহর ছোট মা সমিরন বিবিকে গল্প-কিচ্ছা বলাতে বাধ্য করা–শৈশবের এমন কর্মকাণ্ড মুর্শেদের জেদি স্বভাব উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। তাকে প্রথমে যদু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি

করা হয়। বাল্যশিক্ষা ও যুক্তক্ষর বিষয়ে মুর্শেদের ভাল দখল ও সুন্দর হাতের লেখা দেখে বৈষ্ণব যদু পণ্ডিত স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলেন-

> ‘হবে রে, শালা, তোর লেখাপড়া হবে, আসবার সময় মাকে প্রণাম করে এসেছিস তো?’-[ওয়ারিশ/পৃ.৪১]

এমন পরিবেশ ও পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে মুর্শেদের লেখাপড়া চলে। তবে থার্ড ক্লাশে (বর্তমান অষ্টম শ্রেণির সমপর্যায়) ওঠার আগেই মুর্শেদের ইংরেজি, বাংলা, ফারসিসহ সব বিষয়ে দখল চলে আসলেও গণিতে দুর্বলতা থেকে যায়। গণিতের প্রতি ভীতি তাকে পরীক্ষায় নিরুৎসাহিত করে । ম্যাট্রিকুলেশনে ডিস্টিংশন পাবার উপযুক্ত মুর্শেদ পরীক্ষার পড়া ও প্রস্তুতি বাদ দিয়ে স্কুল লাইব্রেরিতে বঙ্কিম, ভুদেব, রবীন্দ্রনাথ পড়ায় মগ্ন হয়। বাড়ির আশ্রিত জিটি ট্রেনিংপ্রাপ্ত পণ্ডিত আফাজ মুর্শেদকে গণিতের সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েও ব্যর্থ হয়। প্রতিউত্তরে মুর্শেদ জানায়-

> ‘সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, আমাকে দিয়ে অঙ্ক হবে না। ...ম্যাট্রিক পাশ না করলেও আমার চলবে; অঙ্কের হিসেব শেখা আমার জন্য জরুরী নয়, আমার অন্য কাজ আছে।’-[ওয়ারিশ/পৃ.৪৭]

স্বভাবজাত গোঁয়ার্তুমি ও জেদের কারণেই মুর্শেদ ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া থেকে বিরত হয়। বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন বাবার উপস্থিতি, আর্থিক নিরাপত্তা ও খাবার-দাবারের একটি নির্ভরযোগ্য পারিবারিক ভিত্তি থাকায় যুবক মুর্শেদ জীবনবাস্তবতা ও জীবনার্থের মূল্যায়নে অনভিজ্ঞ থেকে যায়। আবার সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিবেশও যুব সম্প্রদায়ের মানসলোককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্বাধীন স্বদেশভূমির প্রত্যাশায় স্বদেশি-আন্দোলন তখন বেশ চাঙা হয়ে ওঠে। ছাত্র-যুবকদের কাছে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর মতো বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনোৎসর্গ করে প্রেরণা-পুরুষে পরিণত হয়েছেন । আর কংগ্রেস দলের কর্মকাণ্ডও বেশ তোড়জোড়ের সঙ্গে চলে। দেশের এমন পরিস্থিতিতে হাজারো দামাল ছেলের মতো মুর্শেদও দেশব্রতে দীক্ষাগ্রহণ করে। কারণ-

> ‘সময়টা ১৯২০। এক বছর আগে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটেছে। মহাত্মা গান্ধী কী করেন সে দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। সকলের আশা লোকটি কিছু করবে। ওদিকে ইয়োরোপের যুদ্ধ-পরবর্তী ডামাডোল এখনো থিতিয়ে আসেনি। রুশ-দেশে নাকি শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমনি সব খবরে কাগজ ভর্তি। ফলে খবরের কাগজ তখন দারুণ আগ্রহের বস্তু।... মুর্শেদের তর সয় না। একখানা ইংরেজি আর একখানা বাংলা, দুখানা কাগজ যতক্ষণ পড়া শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ইস্কুলের পড়া তার শিকেয় তোলা থাকে। খবরের কাগজ তাকে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল করে তোলে। একবার বিদায় দে মা গানটি...শুনলে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।... কংগ্রেস গঠন হয়েছে মোহনগঞ্জের মতো ছোট জায়গাতেও।’-[ওয়ারিশ/পৃ.৪৭]

বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতে গ্রামীণ জীবনে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে সঙ্গে সত্তাসন্ধানী মধ্যবিত্তের মানসিক স্তরটি যে-ক্রমশই অগ্রসরমান সময়কে আবাহনের প্রস্তুতি নেয়-এ তারই সাক্ষ্যবাহী। এসময় সহপাঠী বিভুরঞ্জনের সঙ্গে মুর্শেদের বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিভুর মানসিকতায় এবং বাড়িতে অস্পৃশ্যতার প্রকট ভাব না থাকায় মুর্শেদ নিয়মিত যাতায়াত করে। আর বেদান্তসহ নানা সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে পড়ে। কিন্তু বেদান্ত গ্রন্থটি ফেরত দিতে এসে বিভুর কাকা কট্টরপন্থী উকিল নিরঞ্জন বাবুর সঙ্গে মুর্শেদের তুমুল বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে নিরঞ্জন বাবু বলেন-

> ‘এ জন্মে তুমি ম্লেচ্ছ যবন, সুতরাং শাস্ত্রে তোমার অধিকার নেই। বুঝেছ এবার? দু’পাতা শিখলেই অধিকার জন্মায় না। কখনো আর শাস্ত্রের বই পড়তে চেষ্টা করো না–চাষাবাদ করো গিয়ে, তাতেই তোমার মঙ্গল–এ জন্মে ঐটিই তোমার সাধনা।’-[ওয়ারিশ/পৃ.৬১]

এমন অপমানে মুর্শেদ দারুণভাবে হতাশ হয়। তবে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে। স্কুলের ছেলেরা কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ার হবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। মুর্শেদও পিছিয়ে থাকে না। চৈত্র মাসের বিকেলে বাসন্তী হাওয়ায় মোহনগঞ্জে কংগ্রেসের জনসভায় বিভুর বোন দীপান্বিতা গুহ দীপুর ‘বন্দে মাতরম’ গান, স্বরাজের জন্য সত্যাগ্রহ, বিদেশি পণ্য বর্জনে চরকা কাটার আহ্বান মুর্শেদের চেতনারাজ্যে দারুণ আলোড়ন তুলে। সভা শেষে দীপুর– ‘আপনার চরকা সেই কবে দাদা আলাদা করে রেখেছে-আজ নেবেন?’ এমন আহ্বানে মুর্শেদ পূর্বেকার অপমান ভুলে যায়। দীপুর হাত থেকে চরকা নেবার সময় মনে হয়– ‘জীবনের পরম পাওয়া সে পেয়ে গেছে–আর কিছু তার দরকার নেই।’ জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে প্রেমানুরাগের অভিষেকে মুর্শেদ আত্মিক ঔদার্যে, মুক্তচিন্তার বিশালতায় ও প্রগতিশীল মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে। তার এই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বন্ধু বিভুর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুসলিম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির উর্ধ্বে ওঠে কংগ্রেসের আদর্শকে মেনে নেওয়ার মধ্যে মুর্শেদের সর্বভারতীয় চিন্তার দৃষ্টান্ত মেলে।[২৭] মুর্শেদের বাড়িতে বসে চরকা কাটা, আমোদ-ফূর্তিতে না গিয়ে সারাক্ষণ বইপড়া, আল্লাহ-নামাজ-রোজায় আস্থা না রেখে সৎকাজ মাত্রই এবাদত– এমন কর্মকাণ্ড ও আচরণে জওহর আলীসহ সমিরন বিবির আশঙ্কা জাগে। স্কুলের

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুর্শেদ ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেও ছেলের চালচলনে জওহর আলী চিন্তিত হন। কারণ–

> ‘ছেলের (মুর্শেদের) আচরণ ক্রমেই অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। কথাবার্তাও ছেলে অন্যরকম বলতে আরম্ভ করেছে। যেমন সে বাপের সঙ্গে কোথাও বেরুতে চায় না। তহসিলে না, খামারবাড়িতে না, উকিলের কাছে না।...বলে, সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না।’-[*ওয়ারিশ*/পৃ.৫৫]

মুর্শেদের জীবনে এই জমি এবং জমি থেকে সরে যাওয়ার পালাটি নিয়েই মূলকাহিনি গড়ে উঠেছে। কৃষি জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রক্রিয়াটি ব্যক্তি জীবনে কীভাবে কাজ করে অথবা ব্যক্তির স্বভাবসূত্র আর সময়ের অন্তর্চাপ থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ঘটে কিনা– এই দ্বৈততাকে লেখক উপন্যাসে দাঁড় করিয়েছেন। কারণ মুর্শেদের কৃষি জমি রক্ষার ও প্রসারের দিকে কোনো মনোযোগই ছিল না।[২৮] সংসারবিবাগী মুর্শেদকে সংসারে মনোযোগী করতেই জওহর আলী বিয়ে করানোকেই একমাত্র উপশম বিবেচনা করেন। ফলে ভরতপুরের চৌধুরীদের মেয়ে দেখা ও বিয়ের কথা চলে। এসব বোনদের মুখে শুনলেও প্রথমে সে আমল দেয় না। বরং বন্ধু বিভুর সঙ্গে মুর্শেদও পরীক্ষার চিন্তা বাদ রেখে মিটিং-মিছিল ও চরকা নিয়ে ব্যস্ত হয়। বিলেতি দ্রব্য বর্জন ও সত্যাগ্রহ সফল করতে মেতে ওঠে। মুর্শেদ নিয়মিত বিভুদের বাড়িতে যায় আর দীপুর দেয়া বঙ্কিমের *আনন্দমঠ*, *চন্দ্রশেখর* ও *দুর্গেশনন্দিনী* পাঠের সমান্তরালে চলে সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে দুই বন্ধুর বিতর্ক। কারণ-

> ‘বিভুর ধারণা, গান্ধিজি যখন বলেছেন দেশ স্বাধীন হচ্ছে, তখন অবশ্যই স্বাধীন হতে যাচ্ছে দেশ। মুর্শেদের বিশ্বাস হয় না। তার ধারণা, এখনো বহু ধাপ পার হতে হবে। স্বাধীন হব বললেই স্বাধীন হওয়া যায় না; তার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে। প্রতিটি মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত না হলে চরম আত্মত্যাগ সম্ভব নয়–আর তা না হলে স্বরাজও অসম্ভব।’-[*ওয়ারিশ*/পৃ.৬৩]

সমকালীন রাজনীতি বিশ্লেষণে বিভু অপেক্ষা মুর্শেদকেই অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী মনে হয়। কারণ জনগণের মাঝে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত না হলে, মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে, জাগরণের শক্ত ভিত্তি না থাকলে কোনো আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। এসময় ব্যক্তিগত কিছু সিদ্ধান্তহীনতা ও পারিবারিক বিরূপ পরিস্থিতির কারণে মুর্শেদ নিজেই রাজনীতি ও জীবন থেকে ছিটকে পড়ে। দীপুর বিয়ে ঠিক হবার ঘটনায় মুর্শেদ দুটি টেস্ট পরীক্ষা দিলেও তৃতীয় দিন সে উধাও হয়। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে পড়ালেখা না করার সিদ্ধান্ত বাবাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু দু-একদিন পর ভরতপুর থেকে মেয়েপক্ষ তাকে দেখতে আসবে– এমন সংবাদ পেয়ে সে রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। মনের অশান্তি আর বাড়ির লোকদের জোর-জবরদস্তিতে মুর্শেদ চৈত্রের দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়। আমবাগানে দীপুর সাক্ষাৎ ঘটে এবং রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* বইটি ফেরত না নিয়ে মুর্শেদের কাছেই রেখে যায়। যাবার সময় অনুরোধ করে বলে-

> ‘এমন করবেন না মুর্শেদ দা, তাহলে আমার খুব চিন্তা হবে, কিছু তো করা যাবে না, শুধু শুধু কষ্ট।’-[*ওয়ারিশ*/পৃ.৭০]

সমকালীন সমাজবাস্তবতায় ভিন্নধর্মী দুটি নর-নারীর মাঝে রোপিত প্রেমবীজটি অঙ্কুরিত হবার মতো উপযুক্ত আলো-জল-ভূমি খুঁজে পায় না। তাই ধর্মের জাঁতাকলে ও সমাজের রক্তচক্ষুর কোপানলে পড়ে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। একরোখা ও জেদি মুর্শেদ মনের অশান্তিতে অজানার উদ্দেশ্যে বের হয়। তার উধাও হবার ঘটনায় বাড়িতে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। কারণ-

> ‘মুর্শেদ উধাও হয়ে গেলে জওহর আলী প্রধান ভয়ানক মুষড়ে পড়েন। ভরতপুরের চৌধুরী বাড়ির লোকদের সামনে লজ্জায় পড়তে হবে– সে একটা কারণ বটে। কিন্তু...নিজের সন্তানকে তিনি চিনতে পারেননি। শুধু তিনি নন, যার উদরে সে জন্ম নিয়েছে, সেই মায়ের কাছেও সে দুর্বোধ্য বিস্ময়।’-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১০৬]

মুর্শেদের শোকে সমিরন বিবি শেষপর্যন্ত বিছানায় পড়েন এবং একমাস পর তিনি মারা যান। আবার মামলায় হেরে জওহর আলীর একটি তালুক চলে যায় মহাজন বেনীমাধব গোসাইয়ের দখলে। তাই শীতের আবাদের প্রস্তুতি নিতেও তিনি উৎসাহ বোধ করেন না। বাধ্য হয়ে মালেকা বিবি সংসারের হাল ধরেন। প্রায় দুই মাস পর এলাহাবাদের হাসপাতাল থেকে প্রতিবেশী মনতোষ ডাক্তার একটি পোস্টকার্ড পান। সাতদিন পর মুর্শেদকে নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে জওহর আলী মনতোষ বাবুকে যা খুশি চেয়ে নেবার অনুরোধ করেন। চতুর-কৌশলী মনতোষ বাবু শান্তস্বরে বলেন-

> ‘আপনার কাছে আর কী চাইব, এমনিতেই আপনি অনেক দিয়েছেন–খোরাকির ব্যবস্থাটা আপনারই দয়ায় হয়েছে। এখন শুধু একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার।’-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১০৯]

এভাবে মনতোষ ডাক্তার জওহর আলীর কাছ থেকে মোহনগঞ্জ বাজারের ওপর দুই বিঘার দামি প্লট এবং দশ বিঘার একটি জোত উপহার নেন। প্রধান বাড়ির দিকেও ডাক্তারের প্রচণ্ড লোভ ছিল। কিন্তু জওহর প্রধানের মৃত্যুর দিন শেষরাতে এ

বংশের ফকিরের ছায়ামূর্তি দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে কোনো রকমে লোভকে সংবরণ করেন। পরবর্তীকালে মুর্শেদও মনতোষ ডাক্তারের হাতের মুঠোয় চলে যায়। মনতোষ ডাক্তারের আগ্রহেই 'খুব লম্বা চশমা পরা, নাকের নিচে পুরু গোঁফ রাখা ও স্বদেশি করা' মুর্শেদ খুশহালপুরের ষোল বছর বয়সী মাতৃহারা স্বশিক্ষিতা সালমাকে বিয়ে করে। কিন্তু মুর্শেদ–সালমার দাম্পত্য জীবনও সুখের হয়নি। কারণ মুর্শেদের ফুলশয্যার রাতে নিরুদ্দেশ হওয়া, বউভাতের দিন হিন্দু বন্ধুদের কটাক্ষে নববধূর মাথার ওড়না ও শরীরের সমস্ত অলংকার খুলে ফেলা এবং লেখাপড়া না জানায় ভর্ৎসনা করা–এসব খ্যাপাটে কর্মকাণ্ডে স্বামী- স্ত্রীর দূরত্ব বাড়ে। তাই বাসররাতই তার কালরাত হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু মুর্শেদের -

> 'জোচ্চুরি করেছ আমার সঙ্গে– ছি ছি এভাবে আমাকে ঠকাল তোমার বাবা।...আমার স্ত্রী হতে হলে তোমাকে লেখাপড়া জানতে হবে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৫৯]

এমন শ্লেষ ও বিদ্রূপপূর্ণ বাক্যবাণে সালমা ভেতরে ভেতরে জেদি আর অভিমানী হয়ে ওঠে। নিজের পড়ালেখা জানার বিষয়টি সে গোপন রাখে। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে অদৃশ্য এক দেয়াল তৈরি হয়। তাই নিরুদ্দেশ হওয়া স্বামীর ভরসায় বসে না থেকে বউভাতের পর একাই বাবার বাড়ি চলে যায়। দুইদিন পর মুর্শেদ বাড়ি ফিরে স্ত্রী সালমার ট্রাঙ্কটা উঠানে ছুঁড়ে ফেলে। ডালা খুলে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে পাঁচটি বই ছড়িয়ে পড়তে দেখে মুর্শেদ অবাক হয়। বই কুড়াতে গিয়ে-

> 'বিবি আয়েশার জীবনী দেখে, বিষাদ সিন্ধু নজরে পড়ে, কাছাছোল আম্বিয়া হাতে তোলে এবং একখানা দুর্গেশনন্দিনীও আবিষ্কার করে সে। সীতার বনবাস খানা ট্রাঙ্কের ভেতরে ছিল। পরিষ্কার হাতে সুন্দর নাম লেখা–এই বহির মালিক মোসাম্মৎ সালমা খাতুন, সাং খুশহালপুর, জিং দিনাজপুর।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৬১]

বিয়ের প্রথম রাত থেকে সালমার দাম্পত্য জীবনের যে-দূরত্ব ও সংকট তৈরি হয়, তা কমেনি বরং ক্রমশই বেড়ে চলে। প্রথম ঝামেলা বাঁধে প্রধান বাড়ির লক্ষ্মীখ্যাত বুড়ির বিলের জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয় ঝামেলা হয় সালমার কাছ থেকে প্রধান বাড়ির বংশীয় ঐতিহ্যের নয়মতির হার হারিয়ে। এ নিয়ে শুরু হয় সালমার ওপর অপমান আর লাঞ্ছনা। শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্ক গিয়ে দাঁড়ায় ভীষণ তিক্ততায়। তাই মালেকা বিবি সালমাকে কটাক্ষ করে বলেন-

> 'বেয়াই সাহেব নিকাহ বিয়ে করবেন বলে মালাখানা রেখে দিয়েছেন। তাঁকে ফেরত দিতে বোলো। বহুযুগের পুরনো জিনিস– জালাল প্রধানের সময় থেকে মালাখানা এ বাড়িতে আছে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৮১]

এরূপ কটাক্ষ শুনে সালমাও নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। প্রতিউত্তরে বলে– 'মা, কেন ঐ এক কথা বার বার শোনান? যাদের জিনিস তারাই নিয়ে গেছে।...কোম্পানির কাগজে তো জালাল প্রধানের আসল পরিচয়টা ভালোভাবেই দেওয়া আছে।...জালাল প্রধান আপনার পূর্বপুরুষ হতে পারেন। কিন্তু তিনি আমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ নন।' সালমার মুখে বাবার পূর্বজীবনের আপত্তিকর কথা শুনে মালেকা বিবি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তারপরেও আত্ম-অহংকারে বলেন-

> 'আমার বাপের পূর্বপুরুষ ডাকাত হতে পারেন, কিন্তু তোমার বাপের মতো চোর-ছ্যাঁচর ছিলেন না।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৮২]

এসব নিয়ে মুর্শেদও মাঝে মধ্যে সালমাকে ভর্ৎসনা করে। কিন্তু পরবর্তীকালে সালমার পড়ালেখার কথা জানতে পেরে স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েও সে ব্যর্থ হয়। মুর্শেদের এমন দায়িত্বহীনতা, পাগলাটে স্বভাব, আদর্শের মাতামাতি ও মনোভাবের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পয়লানম্বর* গল্পের অনাদি বাবুর সাদৃশ্য দেখা যায়। যারা সমাজ ও জীবনবাস্তবতাকে অস্বীকার করে আদর্শের চোরাবালিতে হাবুডুবু খেয়েছে, বৈঠকখানার আড্ডায় বিতর্কের ঝড় তুলেছে; অথচ তারাই সংসার, স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ ও দায়-দায়িত্বের প্রশ্নে দেখিয়েছে চরম অবহেলা। তাই মুর্শেদের পক্ষেই বলা সম্ভব হয়-

> 'তুমি জানো না, তোমার স্বামী দেশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত? দেশ স্বাধীন হলে মানুষ সুখী হবে, ইংরেজরা চলে যাবে এ দেশ থেকে, আমরা নিজেরাই নিজেদের শাসন করব।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৯২]

অথচ শেষ পর্যন্ত মুর্শেদের রাজনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবন কোনোটিই সফল ও সার্থক হয় না । সাংসারিক বিষয়জ্ঞান না থাকায় অর্থাভাবে সকল জোত-জমি মনতোষ ডাক্তারকে দলিল করে দিতে হয়। স্ত্রী সালমাকে শিক্ষকতার চাকরি নিতে হয়। টাকা ধার দিতে দিতেই ডাক্তার–

> 'দু'বিঘে জমি ডাক্তার আড়াইশ টাকায় কিনে নিয়েছেন। ....মনতোষ ডাক্তারের লম্বামতো একখানা খাতা ছিল। ঐ ধারের খাতার হিসাবের মধ্যেই একে একে তলিয়ে গেছে দাদার হাতের লাগানো প্রকাণ্ড বাগান। পিরের দিঘির দশ বিঘা জোত এবং শহরের হাটখোলার পাশে তিন বিঘা বাস্তু জমি।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.৮২]

মুর্শেদের এমন সংসারবিমুখ, নিষ্কর্মা স্বভাব ও অবিমৃষ্যকারী প্রবণতাই অভাব-অনটনকে স্থায়ী রূপ দেয়। অথচ প্রধান বাড়ির এ বিপর্যয়ের মূল কারণ হিসেবে সালমার অলক্ষ্মী-অপয়া প্রভাবকে দায়ী করা হয়। শাশুড়ি মালেকা বিবি তাই বলেন-

> 'আর কেউ নয়-দায়ী ঐ অপয়া বউ। কিছু থাকবে না। তোমরা দেখে নিও–এই আমি যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিনই–তারপর আর প্রধানবাড়ির নাম-নিশানা খুঁজে পাবে না তোমরা।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১০৯]

এসময় হিন্দু প্রতিবেশী মধুসূদন বাবুর মায়ের–'অ বউমা চেয়ার দুখানা গঙ্গাজলে ধুয়ে তারপর ঘরে তুলো বাছা'এমন অপমানজনক বক্তব্যে ও স্বামী মুর্শেদের উৎসাহে সালমা পড়ালেখা করতে জেদি হয়ে ওঠে। এজন্য বাড়িতে খ্রিষ্টান শিক্ষিকা সুশীলা সরকারের আগমনকে কেন্দ্র করে সমাজে ও বাড়িতে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এলাকার ধনী ও প্রভাবশালীরা উত্তেজনা তৈরি করেন। আর ননদ আকিমুন্নেসার স্বামী আজগর হাজিকে ক্ষেপিয়ে দেয়। ইংরেজি শেখা ও খ্রিষ্টান শিক্ষিকার আগমনের জন্যই সমস্ত দোষ সালমার ওপরে চাপানো হয়। তাই মুর্শেদ গান শেখার ব্যবস্থা করলেও সালমা রাজি হয় না। লেখাপড়ার ব্যাপারে মুর্শেদের এ আন্তরিক ভূমিকার জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর পর স্বামীকে সালমার খুব কাছের অনুভব হয়। অথচ এ সময় বাড়ির পাঁচটি গরুর মৃত্যু ও পুকুরের মাছ বন্যার পানিতে বেরিয়ে গেলে সমস্ত দোষ সালমার ওপর চাপানো হয়। সংসারে অভাবের কারণে সালমা প্রতিবছরের মতো মহরমের তাজিয়া মিছিল, লাঠিখেলা, মর্সিয়া গান ও খাবারের আয়োজন এড়ানোর সুপরার্শ দিলেও সে শাশুড়ির রোষানলে পড়ে। 'এ বাড়ির এতকালের রেওয়াজ তুমি বন্ধ করে দেবে'– এমন আভিজাত্যের অহংকারে অন্ধ মালেকা বিবি জমি বন্ধক রেখে এ আয়োজনের উদ্যোগ নেন। তখন সালমা নিজের বিয়ের স্মৃতিবিজড়িত বিশটি সোনার মোহর বের করে দিয়ে প্রধান বাড়িকে সম্ভাব্য বাড়তি ঋণের বোঝা থেকে রক্ষা করে। সালমা তিন ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ তদারকি করে এবং গোটা সংসার দেখভালের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। একেক সময় সে নিজের বলতে আলাদা অস্তিত্ব দেখতে পায় না। কারণ-

> 'মেয়েদের জীবনের অর্থই হল শুধু দিয়ে যাওয়া, সবাইকেই দিতে হয়–যুগ যুগ ধরে মেয়েরা দিয়েই যায়। আর দিয়ে যায় বলেই সংসার আছে, সন্তান আছে, স্বামী আছে, জীবন আছে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৯০]

এরপরেও সালমার সংসারে সুখ-সচ্ছলতা আসেনি। কারণ শ্বশুরের মতো স্বামীরও বেহিসেবি জীবন,ঋণগ্রহণ ও বিক্রির প্রবণতায় বিপর্যয় শুরু হয়। যার শুরু করেছিলেন জওহর আলী প্রধান। তিনি খেয়ালি স্বভাবের কারণে করতেন দান, আর ছেলে করে বিক্রি। তারপরেও সালমা নিজের ডিপ্লোমা পড়তে সংসার ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে শ্রীরামপুরে যায়। আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন নিয়ে দেবর জমশেদের সঙ্গে পারিবারিক ঝগড়া ও অত্যাচারকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। তবু জমশেদ সালমাকে বাড়ি ছাড়া করতে নানা অপচেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে বাঘা কুকুর ছেলে আরমানের ওপর লেলিয়ে দিলেও মুর্শেদ এর প্রতিবাদ করে না। তখন সালমা মেজো ভাইকে বন্দুকসহ খবর দিয়ে এনে নিজ হাতে জমশেদের কুকুরকে গুলি করে মারে। 'তুমি বন্দুক দেখিয়ে শাসাও'–মালেকা বিবির এমন কথার জবাবে সালমা বলে–

> 'মা আমার বন্দুক দেখাবার ক্ষমতা আছে, তাই দেখাচ্ছি–দরকার হলে আরো দেখাব।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৪৮]

সংসারে আর্থিক অনটন এবং স্বামী মুর্শেদের রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি ও দায়িত্বহীনতা দেখে বাধ্য হয়ে সালমা খ্রিষ্টান শিক্ষিকা সুশীলার সহায়তায় মেয়েদের প্রাইমারি স্কুলে চাকরি নেয়। এতে দেবর জমশেদ, ভাগ্নে আফাজ মোহাম্মদ ও মৌলভী ইন্তেজার আলী বিরোধিতা করে। বড় ছেলে আরমানকে সেভেনের আরবি ক্লাস থেকে ইন্তেজার আলী বের করে দিয়ে বলেন– 'মোনাফেকের পোলা আরবি পড়ব ক্যান–বাইরাও কেলাস থিকা।' আবার সালমা ছেলে রায়হানকে মুসলিম লীগের লেবাস পরিয়ে সংস্কৃত ক্লাস করার জন্য পাঠালে পণ্ডিত বলেন– 'এই পোশাকে সংস্কৃত পড়া চলবে না–তুই বেরো।' নিজের ও সন্তানদের ওপর এমন প্রাত্যহিক অপমানে সালমা দুঃখ পেলেও ভেঙে পড়ে না। এসময় জমশেদ কূটকৌশলে সালমা-মুর্শেদকে সমাজচ্যুত করে বলে-

> 'আপনি বেগানা পুরুষ মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন–আপনার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে–সমাজে আপনার কোনো জায়গা নেই।...সমাজ থেকে আপনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৩৪-২৩৫]

জমশেদের এমন ভয়-ভীতি ও হুমকিতেও সালমা দমে যায় না বরং এলাকায় 'মহিলা সমিতি' গঠন করে সামাজিক কর্মকাণ্ড চালায়। এ সমিতির কাজ করতে গিয়ে জ্ঞাতি শত্রু ভাগ্নে আফাজ মোহাম্মদের সঙ্গে বিরোধিতা চরমে ওঠে। তাই স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আফাজ সালমাকে হুমকি দিয়ে বলে-

> 'আপনার বয়স তো খুব বেশি হয়নি। আপনি যে অল্প বয়সী ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন–সে মেলামেশার তো বহুরকম অর্থ হতে পারে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৩৭]

আফাজের এ হুমকিকে সালমা–'যদি ঐ হেঁদো সম্মানের পরোয়া আমি না করি' বলে উড়িয়ে দেয়। এতে প্রধান বাড়ির ওপর আফাজের জমে থাকা আক্রোশ আরো বেড়ে যায়। তাই মালেকা বিবির মৃত্যুতে জানাজা ও দাফনের জন্য সমাজের কাউকে আফাজ ঘেঁষতে দেয় না। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সমর্থনের কারণে নিজ ঘরে সালমা ও মুর্শেদের দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য চরমে ওঠে। রাজনৈতিক উত্তাপ ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প সালমার সংসারকে নষ্টনীড়ে পরিণত করে । রাজনীতিতে এ অশুভ উত্তাপও এসে লাগে প্রধান বাড়িতে। কারণ সালমা মুসলিম লীগের সমর্থক আর মুর্শেদ আগাগোড়াই কংগ্রেসী। নির্বাচনের পূর্বে এ নিয়ে বাড়িতে মুর্শেদ ব্যতীত অন্য সবাই পাকিস্তানের সপক্ষে মেতে ওঠে। কিন্তু ছেচল্লিশের নির্বাচনে প্রধান বাড়িতে মুসিলম লীগের সেন্টার খোলাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর বাক্য বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। মুর্শেদ-সালমার বাড়িতে এ আদর্শিক বিরোধ ও বিভাজন মূলত পরবর্তীকালে সাতচল্লিশের দেশভাগের রক্তাক্ত ট্র্যাজিক নাটকের আগাম মঞ্চায়ন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশভাগ হয়ে গেলেও এবং মুসলিম লীগের সমর্থক হবার পরও সালমার পূর্বপাকিস্তানে যাবার আগ্রহ দেখা যায় না। কারণ রাজনীতির নগ্নরূপ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবল দেখে তার মন ভেঙে যায়। আবার মুর্শেদের রাজনৈতিক জীবনের পরাজয়-পরাভব ছিল আরো করুণ ও ভয়াবহ। ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও হাঙ্গামায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তের হলিখেলা শুরু হয়। ধর্মের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার ভয়ংকর নগ্নরূপ দেখে মুর্শেদ সত্যিই মর্মাহত হয়। রক্তস্রোত ও লাশের মিছিল দেখা গান্ধীবাদী ও সত্যাগ্রহী মুর্শেদের কাছে মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব অযৌক্তি ও অন্যায় মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণই ভিন্ন। এ সম্পর্কে সচেতন করতেই মার্কসবাদী বন্ধু বিভু পূর্বেই তাকে বলেছিল-

> 'রাজনীতি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে মুর্শেদ, দেখে নিও। কংগ্রেসের আর মুসলিম লীগের রাজনীতিতে পার্থক্য থাকবে না।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১১৩]

সাতচল্লিশের দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর রাজনীতিতে আদর্শ ও মূল্যবোধের পচন ধরে। স্বার্থ ও ক্ষমতার নতুন মেরুকরণ শুরু হয়– তাতে অর্থবিত্ত, বাহুবল ও লোকবলই প্রভাববিস্তারী ভূমিকা পালন করে। আদর্শের জলাঞ্জলি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয়। তাই নির্বাচনে সৎ, অসাম্প্রদায়িক, ত্যাগী ও জনগণের আস্থাবান মুর্শেদকে কংগ্রেস দল থেকে মনোয়ন দেয়া হয় না। মুর্শেদ প্রথমে অবাক হলেও সবার অনুরোধে তা মেনে নেয়। কিন্তু আটচল্লিশে মুসলিম লীগের এম.এল.এ মারা যাওয়াতে উপনির্বাচনে মুর্শেদ দল থেকে মনোনয়ন চায়। এ নির্বাচন নিয়ে দলের লোকদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাঁধে। আর ছেচল্লিশের নির্বাচন নিয়ে পূর্বেই স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের এক পর্যায়ে বাক্য বিনিময় ও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সালমা মুসলিম লীগে ভোট দেয়ায় 'আজ থেকে তোমাকে আমি ত্যাগ করলাম–তুমি আর আমার স্ত্রী নও'–এমন কথায় মুর্শেদ ঘরে-বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুর্শেদও প্রচণ্ড জেদ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে নামে এবং সাম্প্রদায়িক কূটচালে পরাজিত হয়। এভাবে সব দিক দিয়েই মুর্শেদের জীবন বিষিয়ে ওঠে। স্বামীর এমন গর্হিত কথা ও অপমানে সালমা নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। সালমা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারে না। পারিবারিক লাঞ্ছনা, অপমান, উপক্ষো সত্ত্বেও জেদের বশে শিক্ষা অর্জন করে ও সাবলম্বী হয়ে ওঠে। আর রাজনীতির সংস্পর্শে এসে সালমা স্বামীর সমকক্ষ হয়ে ওঠে। সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিকূলতা-রক্ষণশীলতারব্যূহ ভেদ করে সালমা যে-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা অভিনব। তাই স্বামী মুর্শেদের অখণ্ড-অবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন-প্রত্যাশায় পাল্টা যুক্তি দিয়ে সে বলে-

> 'আমি নিজের পরিবারের কথা বুঝি, জাতভাই বুঝি, গ্রাম বুঝি, সমাজ বুঝি। যে স্বাধীনতা আমার পরিবারের কাজে লাগবে না, সমাজের কাজে লাগবে না, জাতভাইয়ের কাজে লাগবে না–সে স্বাধীনতায় আমার কোনো আগ্রহ নেই।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৫১]

তারপরেও চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনীতির রাহুগ্রাসে জন্মভিটা, বসতবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অত্যন্ত দীনহীনভাবে স্বদেশ ত্যাগ করতে দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তাই বলে– 'যা হবার হয়ে গেছে আমাদের জীবনে, ভবিষ্যতের বংশধরেরা যেন বেঁচে থাকতে পারে– তারা যেন পথে ভেসে না যায়। আমি যা করেছি সব কি ভুল?' মুর্শেদও বর্তমান রাজনীতির বাস্তবতা ও পর্যবেক্ষণ করে নির্বাক হয়ে যায়। এপর্যায়ে সালমা বলে-

> 'মানুষকে তার নিজের মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া অন্যায়। ...কতযুগ ধরে, বংশ বংশানুক্রমে ভালোবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে, মানুষ একটা জায়গায় স্থিতি লাভ করে...তার কত রকমের সম্পর্ক, ফসলের সঙ্গে, পানির সঙ্গে, রোদের সঙ্গে...প্রত্যেকটা মানুষের ছেলেবেলা আছে...স্মৃতি আছে, গান আছে, প্রেম আছে, সন্তানের জন্ম দেয়া আছে–এতসব সম্পর্ক নিয়ে মানুষের অস্তিত্ব, সব কি একদিনে কেটেছেটে বাদ দেওয়া যায়?'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৫৯]

সালমার এ পর্যবেক্ষণ থেকে শুধু দেশভাগের বাহ্যিক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, অসংখ্য মানুষের জন্মভূমি ত্যাগের চিত্রই উন্মোচিত হয়নি বরং মানুষের নিজস্ব শেকড় থেকে উন্মুলিত হওয়া, সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং গোত্রপরিচয় অবলুপ্তির অনুষঙ্গগুলো গভীর তাৎপর্য পেয়েছে। যা কংগ্রেসের 'অভিন্ন ভারত-আত্মা বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এবং মুসলিম লীগের 'এক ইসলাম ধর্মের ঐক্য'-এর মধ্যে ব্যক্তি মানুষের পরিচয় ও জীবনের মূল্য গুরুত্ব পায়নি। তাই সালমা বলে-

> 'নিজের ভালোর জন্যে মুসলমানরা এক হবে, নতুন দেশ পাবে, নিজেদের উন্নতি করবে–এই চিন্তায় আমার ভুল ছিল বলে মনে হয় না। আমি ভেবে দেখিনি, মুসলমানরা এক হয়ে নতুন একটা দেশ করলে কারা সেই দেশটি চালাবে? ভুল আমার এইখানে। আর নতুন দেশ হলে পরিচয়টা যে আমার পাল্টে যেতে পারে...ভুল আমার সেইখানে।'-[ওয়ারিশ/পৃ.২৬০]

সালমার পর্যবেক্ষণ প্রকৃত অর্থেই ছিল বাস্তবসম্মত। কারণ ব্রিটিশ শাসকদের দীর্ঘমেয়াদী ও উদ্দেশ্যপূর্ণ শোষণ-বৈষম্যের শিকার হয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানরা গরীব, অশিক্ষিত, প্রথাবদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল ও অদূরদর্শী জাতিতে পরিণত হয়। তাই ধর্মের জিগির তুলে দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠিত হলেও এর শাসন ক্ষমতা চলে যায় পুঁজিপতি আধাসামন্তবাদী পাঞ্জাবিদের হাতে। ফলে শুরু হয় বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন। সালমার এই স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে মিশে রয়েছে সমগ্র বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামূহিক ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত। কারণ পাকিস্তান নামক দেশটির জন্ম-সম্ভাবনার মধ্যে এর ধ্বংসের বীজও যে-নিহিত আছে, তা উপলব্ধি করে সালমা। শেকড় বিচ্ছিন্ন বৃক্ষের মতই জন্মভূমি উন্মুলিত মানুষেরও যে-কোনো নাম-ঠিকানা-পরিচয় কিংবা আশ্রয় থাকে না– সালমা তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে। এ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের কারণেই সালমার মতো আরো অনেকেই জীবন, পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমন রাজনীতির কারণেই সালমা বলে–

> 'আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল, মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, তারপর মুখের ভাষাও আমার থাকল না।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৬০]

রাজনীতির রাহুগ্রাসের মতো দুরারোগ্য ক্যান্সারের সংক্রমণে সালমার জীবন পরিসর ক্রমশই সীমিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পূর্ববর্তী দিনগুলোতে সালমা মধ্যরাতে কলাপাতায় শিশির পতনের শব্দে জীবনপতনের ইশারা ও ইঙ্গিত পায়। তাই সে ছেলে রায়হানকে তার জীবনের বঞ্চনা, সংগ্রাম, একাকীত্ব ও শূন্যতার বিষয়সমূহ পরবর্তীকালে দেশবাসীকে লিখে জানাবার অসিয়ত করে যায়।

এসময় স্থানীয় সুজিত শিকদারের ইশারায় বাংলাদেশি কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার মুর্শেদের বাড়ি দখল করে। মুর্শেদ কংগ্রেস সভাপতি, সেক্রেটারি ও থানা পুলিশকে জানালেও কোনো সুরাহা হয় না। বাধ্য হয়ে গান্ধীবাদী মুর্শেদ লাল সালুতে 'আমরণ সত্যাগ্রহ' লিখে গাছতলায় মাদুর বালিশ নিয়ে বসে। প্রতিবেশী মনিমোহন ও পূর্ববাংলার তিন উদ্বাস্তু নিখিল বাবু, অবিনাশ চৌধুরী ও ব্রজমোহন সাহা মুর্শেদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে দখলকারীরা বাড়ি ছাড়ে। কিন্তু উৎপাত বন্ধ হয় না। সুজিত শিকদারের ছোট ভাই রণজিৎ তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মুর্শেদের কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে নানাভাবে উক্ত্যক্ত করে। আবার হোলির দিন জনসম্মুখে মেজো ছেলের প্যান্ট খুলে শিশ্নের মুসলমানী চিহ্ন দেখা নিয়ে তামাশা করে। সন্ধ্যা হলেই ঘরের চালে ও উঠানে ইটের টুকরো এসে পড়ে। তখন দরজা জানালা বন্ধ করে মুর্শেদ চিৎকার করে বলে-

> 'তোমরা যত পারো আঘাত করো, আমি সহ্য করে যাবো। ...কারণ আমি মহাত্মাজির শিষ্য। আমি সত্যাগ্রহী সত্যের সৈনিক। অহিংসা দিয়ে আমি তোমাদের পরাস্ত করব–ভূত পিশাচের দল। তোমাদের আমি ভয় পাই না–সাহস থাকে আলোতে এসো, এসে সামনে দাঁড়াও, যতসব কাপুরুষের দল।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১১৭]

তারপরও এমন উপদ্রব বন্ধ হয় না। একদিন মাতৃহারা দুই বছরের ছোট ছেলের পায়ে ইট এসে আঘাত করে এবং তাতে পা থেঁতলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনাথ শিশুর প্রতি এমন বর্বর আক্রম দেখে মুর্শেদ সত্যিই ভেতরে ভেতরে মর্মাহত হয়। বাইরে এটি প্রকাশ না করলেও নাটকীয়ভাবে সে-

> 'পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে বহু যত্ন এবং পরিচর্যা করে রাখা তার আদরের পুরু গোঁফজোড়াকে বিসর্জন দিল এবং ধুতি ছেড়ে পায়জামা ধরল।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১১৮]

এর মাধ্যমে মুর্শেদ দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়। যা নষ্ট রাজনীতির প্রতি তার এক ধরনের নীরব প্রতিবাদও বটে। সে রাগে-ক্ষোভে সকল জমি-জমা জলের দামে জমি বিক্রি করে। আর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে মোটামুটি গোছের এক নতুন বাড়ি তৈরি করে। যাতে তার দেশত্যাগের বিষয়ে কেউ সন্দেহ না করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ নতুন বাড়িতে আগুন দেবার চেষ্টা করলে মুর্শেদ পরদিন-

'ছেলে মেয়েদের ভোররাতের ট্রেনে চাপিয়ে দেয়। রায়হানের কোমরে পট্টির মতো করে বাঁধা কাপড়ের থলেটা বেঁধে দিয়ে বলে, এই সতেরো হাজার দিলাম, তুমি ভাইবোনদের নিয়ে যাও, আমি আসছি–যা পারি, যতটুকু পারি, নিয়ে আসছি, মোহনগঞ্জে কিছুই রাখব না আমি।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১২০]

নিজ দেশ, স্বজন ও প্রতিবেশীদের এমন আচরণে মুর্শেদ প্রচণ্ড আঘাত পায়। তাড়াহুড়ো করে জমি-জমা ও বাড়ি বিক্রি করতে গিয়ে ন্যায্য দাম থেকে সে যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতারিতও হয়। পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানের দক্ষিণ দিনাজপুরে এসেও মুর্শেদের শেষ রক্ষা হয় না। তার পূর্ব জীবনের কংগ্রেসের রাজনীতি ও সন্তান রায়হানের বাম মতাদর্শ একাত্তরে এসে কাল হয়ে দাঁড়ায় । দিনাজপুরের শহরবাসী পাকিস্তানপন্থী বন্ধু হেকিম আলাউদ্দিনের ছেলে বিহারি সালাউদ্দিনের চক্রান্তে বৃদ্ধ বয়সে পাকসেনা ও দোসরদের হাতে তাকে শহিদ হতে হয়। কারণ মুর্শেদ 'কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন বটে–কিন্তু রাজনীতি ত্যাগ করেননি।' আদর্শের প্রাণপুরুষ গান্ধীর মতো তাকেও সহিংসতার কবলে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। দিনাজপুর কালীতলার সবাই শহর ছেড়ে পালালেও বৃদ্ধ মুর্শেদ বাড়িতেই রয়ে যায়। নিজ বাড়ি ত্যাগ না করার মধ্যেও মুর্শেদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কারণ মুর্শেদ বারবার জন্মভূমি থেকে, বসতভিটা থেকে, নিজ জীবন থেকে পালাতে চায়নি। মুর্শেদ একজন পোড়খাওয়া মানুষ। রাজনীতির ঝড়-তাণ্ডব ও তীব্র তরঙ্গের উন্মাতাল ঢেউ এসে তার অন্তরকে আঘাত করেছে। তারপরও যে-আদর্শের অমৃতধারা সে নিজের পরিশ্রমে তৈরি করেছে তার প্রতি আস্থা শেষপর্যন্ত অবিচল ছিল। মাঝে মাঝে সন্দেহ, অভিমান, আবেগ এসে আদর্শের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে বটে, তবে তাতে কোনো ঘুণ ধরাতে পারেনি।[২৯] মুর্শেদ আলীর চরিত্রের প্রবল আদর্শানুরাগ, গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং কর্মের সঙ্গে ত্যাগের সমন্বয়কে অনেক সময় অতিরেক বলে মনে হয়। একজন মুসলমান যুবকের পক্ষে সেই সময় সর্বভারতীয় আদর্শে আপাদমস্তক নিবেদিত হওয়া সম্ভব হলেও মুর্শেদের মতো হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। তার আচার-আচরণ, কার্যকলাপ দেখে তাকে একজন কট্টরপন্থী আইডিয়ালিস্ট না ভেবে উপায় থাকে না। সে না পেরেছে সংসারকে গড়তে, না পেরেছে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা। বরং ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী প্রধান পরিবারে যে-অবক্ষয়ের স্রোতধারা কয়েক পুরুষ ধরে শুরু হয় মুর্শেদ তারই উত্তরসূরি।

সালমা মুর্শেদের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, আত্মনিমগ্ন, আগুনে পুড়ে পুড়ে দগ্ধীভূত বেদনার নীলপিণ্ড। বিয়ের রাতেই স্বামীর প্রত্যাখানের মাধ্যমে শুরু হওয়া লাঞ্ছনা, অপমান ও উপেক্ষা তাকে পাথরে পরিণত করে। তারপরও সালমা অপরিমেও আত্মশক্তির প্রেষণায় তিলে তিলে ব্যক্তিত্বের ঘাটতিটুকু পূরণ করেছে। অর্ধশিক্ষিত, অসচেতন গ্রাম্যবধূ থেকে ধীরে ধীরে পড়ালেখা শেষে স্কুলে শিক্ষকতা করে অশিক্ষিতের বদনাম ঘুচিয়েছে। স্বামীর সমীহ জোর করে আদায় করে নিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা রাজনীতির মৌল নির্যাসটুকু ও প্রকৃত সত্যটুকু সে অনুধাবন করতে শিখেছে। রাজনীতি যে-জনসেবা ও দেশসেবার নামে এক ধরনের নোংরামি– তা সে স্বচ্ছদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে শিখেছে আপন অভিজ্ঞতা ও লব্ধদূরদৃষ্টি দিয়ে।[৩০] রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার আন্দোলনের সমান্তরালে এ উপন্যাসে ব্যক্তিগত একটি লড়াইও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং সে-লড়াইটি সালমার ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্যের লড়াই। শ্বশুরবাড়ির রক্ষণশীল প্রথাবদ্ধ অমানবিক উৎপীড়ন ও সমাজের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে সালমা শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ন রেখেছে তার অনমনীয় প্রতিবাদ।

সাংবাদিক রায়হান প্রধান বাড়ির তৃতীয় প্রজন্মের পুরুষ। সে কিশোর বয়সে দেশভাগের উন্মাদনায় আটচল্লিশ সনে ভাইবোন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে পালিয়ে আসে। বাবার দেয়া টাকায় বাড়ি কিনে জীবনসংগ্রাম শুরু করে। পরবর্তীকালে সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে থিতু হয়। তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি রায়হান ব্যক্তিজীবনেও তিনটি রাষ্ট্রব্যবস্থার (বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) পতন ও পত্তন অবলোকনের দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করে। স্ত্রী বীথি এবং তিন ছেলে (রঞ্জু, মঞ্জু ও টুকু) নিয়ে রায়হান মধ্যবিত্তশ্রেণির একক পরিবারের কর্তাব্যক্তি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য অনুবাদ, আর্টিকেল ও ফিচার লিখেও ভাড়া বাড়িতে তার সংসারে টানাটানি শেষ হয় না। বাসা ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে দুই-আড়াই হাজার টাকা চলে যায়। আবার তিন ছেলের পড়াশোনার খরচ মেটাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। তাই প্রয়োজনীয় ভালো খাবার ও প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করা যায় না। এসময় মোহনগঞ্জ থেকে রায়হানের ফুপাতো ভাই শাহাবুদ্দিন চিঠি লিখে ওয়ারিশসূত্রে কিছু পাবার ভরসা দিলে বীথি নিজস্ব বাড়ি করার স্বপ্ন দেখে। কারণ-

'২৫/২৬ বছর ধরে সংসার পেতেছে, কিন্তু এত দিনেও নিজের বলতে কোনো মাথাগোঁজার ঠাঁই জোটানো গেল না। শাহাবুদ্দিনের কথায় কেমন আশা জেগেছিল বীথির মনে। টাকাটা পাওয়া গেলে সে বহু দুর্যোগের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখা গয়নাকখানা বেচে দিত। ভরি দশেক গয়না বেচলে কি আর হাজার চল্লিশেক টাকা পাওয়া যেত না? জয়দেবপুর কিংবা সাভারের দিকে, শুধু জায়গা নয়, চাইকি দু-একখানা টিনের ঘরসুদ্ধ কেনা যেত।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১২৭]

বীথির এমন চিন্তায় রায়হান আজকাল সমর্থনও দেয়। যদিও আগে বাড়ি করার বিষয়ে রায়হান বেজায় উদাসীন ছিল। একটু তদবির ও আপস করে চললেই রায়হান আরো আগেই বাড়ি করতে পারতো। কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে বহু সুযোগ সে নষ্ট করে। তাই শাহাবুদ্দিনের ভরসাপূর্ণ চিঠি পেয়ে রায়হান বড় ছেলে রঞ্জুকে নিয়ে বাপ-দাদার বাস্তুভিটা দেখতে মোহনগঞ্জ যায়। মোহনগঞ্জের উকিলপাড়ায় গেলে সাবেক প্রতিবেশী নিখিল নাথ সেনের ছেলে সুশীল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের প্রধান বাড়ির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দেখায় এবং স্মৃতিচারণে মেতে ওঠে। মনতোষ ডাক্তারের ছেলে মনিমোহন প্রধান বাড়ির বসতভিটা, বাগান ও জমিজমার কথা উল্লেখ করে রঞ্জুর উদ্দেশ্যে বলেন-

> 'বাবা রঞ্জু, এসেছ যখন ভালো করে দেখে যাও; তোমার পিতৃপুরুষের বাসভূমি ও জায়গাটা, মনে রাখবে, মোহনগঞ্জের যেখানেই দাঁড়াবে, সেই মাটিটুকুর মালিক মনে করো, একদা তোমরা ছিলে।'-[ওয়ারিশ/পৃ.৫৮]

এ ডাক্তার বাড়ির সঙ্গে প্রধান বাড়ির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শুধু গাছের আম, বিলের মাছ ও ক্ষেতের গুড়ের কলসই যেত না বরং মনিমোহনের পিসির সঙ্গে রায়হানের ফুপু নসিমনের সই পাতানোও হয়েছিল। কথায় কথায় রায়হান তার বালিগাঁওয়ের ফুপাতো ভাই শাহাবুদ্দিনের জমি ভোগদখল ও দলিলের বিষয়টি উল্লেখ করে। এ কুড়ি বিঘা জোতের কোনো সুরাহা মুর্শেদ দেশ ত্যাগের পূর্বে করে যেতে পারেননি। অথচ আটচল্লিশের আগ পর্যন্ত তা রায়হানদের অধীনেই ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে জমির দলিল করা নিয়ে রায়হানের নানা আশঙ্কা তৈরি হয়। কারণ-

> 'জমি না হয় রেজিস্ট্রি করে দিল ওরই (শাহাবুদ্দিনের) কথা মতো, পুরনো দলিলে এবং পুরনো তারিখে কিন্তু তারপর? যদি টাকাটা না দেয়? যদি ফাঁসিয়ে দিতে চায়? থানায় খবর পাঠিয়ে দেয় যে এ লোকটা বিদেশি এবং এর চালচলন সন্দেহজনক, তাহলে?'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.৬০]

এমন আশা ও আশঙ্কার মধ্যেই রায়হান বন্ধু চিন্ময় বাবুর বাড়ি যায়। এখানে এসে রঞ্জুর সঙ্গে চিন্ময় বাবুর কলেজ পড়ুয়া মুখরা স্বভাবের মেয়ে স্বাতী ওরফে খুকুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। স্বাতীর পিসি বীণার সঙ্গে এক সময় রায়হানের বিশেষ জানাশোনা ছিল। ঘুরে-বেড়িয়ে রায়হানের দিন কেটে যায় ঠিকই কিন্তু কাজের কাজ টাকার বন্দোবস্ত কিছুই হয় না। কারণ দলিল হবার পর থেকেই শাহাবুদ্দিন নিজের বিশ হাজার টাকার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। শাহাবুদ্দিনের চাতুর্যপূর্ণ কথায় রায়হানের হতাশা বাড়ে কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারে না। পূর্বের পাওনা টাকা চাইতে গেলে সুশীল বাবু বলেন-

> 'মাথা খারাপ তোমার? তিরিশ বছর আগের হিসেব নিয়ে এসেছ তুমি! আমার বাবা টাকা কম দিয়েছিলেন, তার কোনো প্রমাণ আছে?...কী পেয়ছ তোমরা? কে তোমরা? বিদেশি সিটিজেন কেমন করে প্রপার্টির মালিক হয়?'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১২০]

এ ঘটনার পর রায়হান ও রঞ্জুরা বেশিদিন মোহনগঞ্জে থাকতে পারে না। কারণ শাহাবুদ্দিনের ইন্ধনে সুশীল, চিন্ময়সহ আরো কয়েকজন পুলিশ লেলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তাই তাকেও বাবা মুর্শেদের মতো ছেলে রঞ্জুকে নিয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে হয়। অর্থ ও সময় নষ্ট ছাড়া রায়হানের লাভ কিছুই হয় না। খালি হাতে স্বামী ও সন্তান ফিরে আসায় বীথি হতাশ হয় এবং তার নিজস্ব বাড়ি করার স্বপ্নটাও ভেঙে যায়। সাধ ও সাধ্যের মাঝে চিড় ধরে এক দীর্ঘশ্বাস বের হয়। তাই ধীর পায়ে ব্যালকনির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালে-

> 'ঢাকার দক্ষিণদিকের আকাশরেখা অনেকখানি চোখে পড়ে। লম্বা লম্বা দালান উঠছে শহরের মাঝখানে। জায়গাটা বোধ হয় মতিঝিল। এক সময় সত্যি সত্যিই ঝিল ছিল ওখানে।...পঁচিশ বছরে কত বদলে গেল শহরটা।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১২৯]

দেশ স্বাধীনের আগে বীথি বাড়ি করার ব্যাপারে রায়হানকে কয়েক বার বললেও তেমন চাপাচাপি করেনি। রায়হানেরও বাড়ি করার ক্ষেত্রেও কোনো নজর ছিল না। বরং-

> 'পীড়াপীড়ি করলে বিরক্ত হতো। বলত, কী যে অদ্ভুত মধ্যযুগীয় চিন্তা তোমাদের, বাড়ির মালিক হতেই হবে, না হলে চলবে না? পৃথিবীতে বহুলোক ছিল এবং এখনো আছে, যাদের নিজেদের কোনো বাড়িঘর নেই। জেনারেশনের পর জেনারেশন তারা ভাড়াটে বাড়িতেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।'-[ওয়ারিশ/পৃ.১৩০]

কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর রায়হানের নিজের কাছেই সবকিছু কেমন ঘোরালো হয়ে ওঠে। কারণ যে-ঘর ভাড়া ছিল বারোশত টাকা। এখন দিতে হয় আড়াই হাজার টাকা এবং বাসার ফ্রিজ, টিভি বিকল হয়ে পড়লে আর মেরামত করা যায় না। তিন ছেলের পড়াশোনার খরচ চালাতেও বায়হানকে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়। একাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় রায়হান চার-পাঁচবার চাকরি বদল করতে বাধ্য হয়। বি-গ্রেডের সাংবাদিকতার চাকরি জোটাতেও আজকাল হিমশিম খেতে হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা ও সময়ের দ্রুত পালাবদল দেখে রায়হানও ঘাবড়ে যায়। তার অবর্তমানে স্ত্রী-সন্তানের ভাসমান অবস্থার কথা মনে করতেও ভয়ে শিউড়ে ওঠে। মনে পড়ে পিতা মুর্শেদ আলীর ভিটেমাটি ফেলে নতুন দেশে নতুন বাড়ি করে জীবন শুরুর কথা। তাই রায়হানের যুক্তি-

> ‘তাহলে আর দেরি কেন? এবার মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, শিকড় মেলে দাও মাটির নিচে। তারপর দাঁড়িয়ে থাকো বংশ-বংশানুক্রমে।’-[*ওয়ারিশ*/*পৃ*.১৩৪]

এজন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে গিয়ে রায়হান স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। তবুও স্ত্রী বীথি ও বড় ছেলে রঞ্জুর কড়া দৃষ্টি এড়িয়ে সে অর্থ উপার্জনে রাত জেগে অনুবাদ, ফিচার লেখে। কিন্তু যে-ঢাকা শহরে সে সন্তানদের জন্য স্থায়ী আবাস বা ঠিকানা গড়বে, সে-ঢাকার জনজীবন দিনে দিনে কলুষিত হয়ে ওঠে। মঞ্জুদের মহল্লাতেই গড়ে ওঠে ‘টাটা-নীলা-বাবুল’ নামক তিন মাস্তানের গ্যাং বা চক্র। এরা মহল্লায় গুণ্ডামি, মাস্তানি, চাঁদাবাজির মতো অপকর্ম করে জনমনে ত্রাস ছড়ায়। যার প্রভাব পড়ে নম্রভদ্র কলেজ ছাত্র মঞ্জুর ওপর। মহল্লার কামালকে নীলা ও বাবুল হত্যা করলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য মঞ্জুর মনে স্থায়ী আতঙ্কের প্রভাব ফেলে। যার ফলে মঞ্জু-

> ‘চোখ বুজলেই ছুরিখানা দেখতে পায়।...একজন তাকে ধরে রেখেছে আর একজন ছুরিসুদ্ধ হাতখানা ওপরে তুলছে–দুপুরের রোদ লেগে ভয়ানক ঝকঝক করে উঠল আট ইঞ্চি লম্বা ফলাটা।’-[*ওয়ারিশ*/*পৃ*.১৪৩]

মঞ্জু তার আতঙ্কের এ ঘটনা কাউকে বলতেও পারে না। মঞ্জুর বন্ধু ফেরদৌস কলেজের ভয়ংকর ক্যাডার আনোয়ারের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়ায়। ফেরদৌস সম্পর্কে রঞ্জু জানায়-

> ‘মিছিলের ওপর মোটর সাইকেল চালিয়ে দিয়েছে কয়েকটা ছেলে–দুজনের অবস্থা খুব খারাপ–হাসপাতালে আছে। দ্যাখ্ তোর বন্ধু ছিল কিনা ওর মধ্যে।’-[*ওয়ারিশ*/*পৃ*.১৬৭]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে চুরাশি সন বিভিন্ন দিক থেকেই ছিল ঘটনাবহুল।[৩১] এর একুশ দিন পূর্বে তিরাশির দশ ডিসেম্বর স্বৈরাচার এরশাদ নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। লোভ ও ভয়ভীতির মাধ্যমে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রগতিশীল ছাত্রনেতাদের কিনে দলে ভেড়ান। স্বার্থ ও অর্থের প্রভাবে রাজনীতি কলুষিত হয়ে ওঠে। মিছিলের এ ঘটনা নিয়ে ঢাকা শহর গরম হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার ক্রমশ দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দমন-পীড়ন ও যুব সমাজের অবক্ষয় দেখে রায়হান শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বীথি বাসা পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে রায়হান জানায়-

> ‘যে পাড়ায় যাবে, সেখানেও যে ফেরদৌসের মতো ছেলে নেই, তা কি কেউ বলতে পারে?’-[*ওয়ারিশ*/*পৃ*.১৬৯]

আশির দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অধিষ্ঠিত কংসরূপী সামরিক শাসক এরশাদ গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের সুস্থ ধারাকে সরকারি গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে নির্মূলের অপচেষ্টা চালান। ফলে উত্থান ঘটে টাটা-নীলা-বাবুলদের মতো মাস্তানদের এবং সম্ভাবনার পথ থেকে বিচ্যুত হয় হাজারো ফেরদৌস। এ নষ্ট রাজনীতির তাপ-চাপে দগ্ধ হয় মঞ্জুর মতো সুবোধ-শান্ত যুবসম্প্রদায়। মঞ্জু তার দাদা মুর্শেদ আলীর মতো চেহারা পেয়েও বর্তমানে রাজনীতির গুণ্ডাবাজিতে জড়িয়ে নষ্ট হবার ধাপগুলোর সামনে দণ্ডায়মান হয়। অথচ ত্রিশ বছর পূর্বে ছেলে মঞ্জুর বয়সে বাবা মুর্শেদের রাজনীতি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রায়হান রাজনীতি জড়িয়ে ছিলো। রায়হানের মনে পড়ে–

> ‘ঐ বয়সে বাবা কংগ্রেস করেছেন, অসহযোগ করেছেন–স্বপ্ন দেখেছেন নতুন জীবনের। সে নিজেও স্বপ্ন দেখেছিল। রাজনীতির সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়েছিল। ঐ সতেরো বছর বয়সেই জেলখানায় বসে পুরনো কমরেডদের আলোচনা শুনতে শুনতে প্রশ্ন করেছিল; কমরেড, বাংলাদেশ নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করা যায় না? ভারতবর্ষ ভেঙে যদি পাকিস্তান আলাদাভাবে স্বাধীন হতে পারে, তাহলে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ কি স্বাধীন হতে পারে না?’-[*ওয়ারিশ*/*পৃ*.১৬৯]

সময়ের ব্যবধানে তিন প্রজন্মের রাজনৈতিক ভাবনা ও মানসিকতায় দুস্তর ব্যবধান ঘটে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে পরাধীন দেশে মুর্শেদ ও রায়হান যে-দেশপ্রেম, গণকল্যাণ, মানবিক মুক্তি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মুক্তচিন্তা ও জীবনার্থের শানিত বোধ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন–স্বাধীন দেশের স্বৈরতন্ত্রের নাগপাশে মঞ্জু তা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ভাষা আন্দোলন ও স্বজাতির স্বার্থে রায়হান যেখানে চুয়ান্নতে ৯২/ক ধারায় জেলবরণ করে, সেখানে ত্রিশ বছর পর এসে তারই ছেলে মঞ্জু রাজনীতির দুষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। তাই মনের অজান্তেই রায়হান প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়-

> ‘তিরিশ বছর পর ১৯৮৪-তে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারই ছেলে রাজনীতির গুণ্ডাবাজির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই কি দেশের ভবিষ্যৎ?’-[*ওয়ারিশ*/*পৃ*.১৬৯]

পূর্ব পুরুষের বয়ে বেড়ানো রাজনৈতিক ক্ষত, রোপিত বিষবৃক্ষের বিষে সংক্রমিত হয়ে পড়ে উত্তর পুরুষ। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ক্ষমতার পালাবদল, ধর্মের বাতাবরণে একে একে স্বৈরাচারের অভিষেক, আধা-সামন্তবাদী মানসিকতায় সত্তাবিচ্ছিন্ন, বসতভিটাচ্যুত নামহীন-পরিচয়হীন মানুষগুলো নিক্ষিপ্ত হয় আরো অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রক্ত-অশ্রু-দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে বয়ে চলছে প্রায়শ্চিত্তের পালা। তারপরেও ঔপন্যাসিক মঞ্জুর ঘর থেকে বের

হওয়া, পরীক্ষার পড়ায় মনোনিবেশ করা এবং বৃষ্টি-পরবর্তী রাস্তার বিবর্ণ অশ্বত্থ গাছের নতুন পাতা গজানো, সাহাবাবুদের উঠানের আমগাছের সবুজ আমের দোল খাওয়া, কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলের সমারোহ ও দোয়েলের তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন ও সদর্থক চেতনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শাহাবুদ্দিন যে-বুড়ির বিলের জমিটি দখল করে রেখেছিল এবং যা রায়হান পুরনো দিন-তারিখে দলিল করে দিয়ে আসে-এর প্রকৃত মালিক ছিলেন তার নানা ওয়াদা মোহাম্মদ। তাই দেশত্যাগের সময় মুর্শেদ সব জমি-জমা বিক্রি করতে পারলেও এ বুড়ির বিলের বিশ বিঘা জমিটি বিক্রি করতে পারেনি। কাগজপত্রের জটিলতা থাকায় দলিল যথার্থ হয়নি। তাই সাত দিন পর দ্বিতীয়বার সাহাবুদ্দিনের আরেক চিঠি আসে। সঙ্গে আসে মনিমোহনের একটি চিরকুট। চিরকুটে লেখা-

> 'তুমি শিগগির না এলে শাহাবুদ্দিনের বিপদ হয়ে যেতে পারে। ...টাকা পয়সার অসুবিধা থাকলে জানাও, হুণ্ডি করে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৩৫]

মনিমোহনের আশ্বাসে রায়হানের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। দুই সপ্তাহ পড়ে আরেকটি চিঠির সঙ্গে পাঁচশত টাকাও সে পায়। রায়হান রঞ্জুকে নিয়ে পুনরায় মোহনগঞ্জে যায়। সবার মধ্যে তারা এক ধরনের শীতল ভাব লক্ষ করে। চিন্ময় রায়হানকে নিয়ে দলিলপত্র ঘেঁটে যাবতীয় পাওনা-দাওনা বুঝে নিতে বলেন। কারণ হিসেবে জানান–

> 'খুব বদনাম আমাদের। বাবা মারা গেছেন সেই কবে, তবু এখনো লোকে বলে, মনতোষ ডাক্তার মুর্শেদ প্রধানের বিষয়-সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এই কথা, ছেলেপুলেরাও জিজ্ঞেস করে, কিছু বলতে পারি না।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৯৫]

উপরন্তু চিন্ময় বাড়িতে সংরক্ষিত প্রধানবাড়ির জিনিসপত্রের একটি গতি বা সুব্যবস্থার অনুরোধ করেন। কারণ মুর্শেদ দেশত্যাগ করার আগের দিন গরুর গাড়ি ভরে বহু জিনিসপত্র ডাক্তারের কাছে রেখে যান। এর মধ্যে চারটি লোহার ঢাল, দশটি তলোয়ার, বারোটি ডাব্বা হুকা, একটি হেমতালের লাঠি, একটি চিঠিপত্রের ঝাঁপি এবং একটি কাঠের সিন্ধুক প্রভৃতি। সবই ডাক্তার সংরক্ষণ করেন। তার ধারণা ছিল হয়তো মুর্শেদ ফিরে আসবেন। কিন্তু তিনি আর ফেরেননি। এসবের মাধ্যমে একটি যোগসূত্র দুই পরিবারের মধ্যে স্থাপিত হয়। তাই চিন্ময় বলেন-

> 'তোদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা বোধহয় জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে চলবে... আমাদের বাবা-মা যা রেখেছেন, আমরা রাখছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা রাখছে–তিনটা জেনারেশন তো এখানেই হয়ে গেল।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১৯৬]

পারিবারিক মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নগুলো চিন্ময় রায়হানকে মিউজিয়ামে দান করতে অথবা নিজের কাছে নিয়ে যেতে বলেন। 'ফিউডাল ভ্যালুজের মরা গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে বলিস'?-এ কথার ছলে রায়হান তা প্রত্যাখ্যান করে। অথচ সামন্তবাদী পিতৃপুরুষের সম্পত্তির ওয়ারিশ বাবদ প্রাপ্ত টাকা সে আগ্রহভরে গ্রহণ করে। প্রথা ও প্রগতির দ্বন্দ্বে আক্রান্ত রায়হান সমকালকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। এটিই হয়ে ওঠে তার নিয়তি।

রাজীব রায়হান রঞ্জু প্রধান বাড়ির চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধি। বাবার সঙ্গে ওয়ারিশের জন্য পূর্ব-পুরুষের ভিটেবাড়ি গমনে সে অনেকটা দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দাদি সালমা খাতুনের প্রতি একটু বাড়তি মনোযোগ এবং পিতৃবন্ধুর মেয়ে খুকুর সঙ্গে হার্দ্যিক সম্পর্ক গড়া ছাড়া তার তেমন কিছুই অর্জন হয় না। ঢাকায় ফেরার পূর্বে খুকুর সঙ্গে রঞ্জু স্থানীয় কুলীক নদীর ধারে বেড়াতে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে ব্রিজের প্রথম থামের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। যেখানে-

> 'তার দাদা বাড়ি থেকে পালাবার সময় এই থামটার ওপর দাঁড়িয়ে একবার পেছনে ফিরে দেখে নিয়েছিলেন মোহনগঞ্জকে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৬৪]

পিতামহ মুর্শেদ আলীর ব্যর্থ-প্রেমের মতো তারই দৌহিত্র রঞ্জুরও একই পরিণতি হয়। তাই এ ব্রিজের থাম শুধু প্রজন্মের পদাঙ্কিত স্মৃতিচিহ্নই বহন করে না বরং একই সঙ্গে তা অভিশপ্ত সময়েরও ইঙ্গিতবাহী। বিদায় নেবার পূর্বে রঞ্জুর অনুরাগপূর্ণ কথার ইঙ্গিতে খুকু বলে-

> 'আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকাই ভালো।...তোমার আমার যদি সেই সম্পর্কই হয়, তাহলে কি ভয়াবহ কাণ্ডটা হবে–চিন্তা করলেই ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে আসে।'-[*ওয়ারিশ*/পৃ.২৬৫-৬৭]

এখানে রঞ্জু-খুকুর হার্দ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধর্ম ও সামাজিক বাধাই কেবল প্রতিবন্ধক নয় বরং বিশ্ব নামক ছেলের সঙ্গে খুকুর প্রণয়ের সম্পর্কটাও প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। রঞ্জুর তখন মোহনগঞ্জে অবস্থান করাটাও নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়।

ওয়ারিশ উপন্যাসে রাজনীতি আর প্রজন্মের জীবন ও মনস্তত্ত্বের ধারাবাহিক অন্তর্বয়নের মধ্যে যতটা প্রখর বাস্তবতা, টানাপোড়েন তৈরি করেছে; ততটা মনঃকল্পিত রোম্যান্টিকতার প্রবাহ স্বতোশ্চল হয়নি। আর হয়নি বলেই *ওয়ারিশ*

একদিকে শওকত আলীর জীবনাভিজ্ঞতার বিনির্মাণ; আরেকদিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের উত্তরাধিকার চিহ্নিত করার আলেখ্য। একে বলা যেতে পারে প্রজন্মের পরম্পরায় দেশকাল ও বাস্তবসত্যের মুখদর্শন এবং একটি জাতির আত্ম-আবিষ্করণ। একই সঙ্গে দেশভাগের নির্মমতায় নৃতাত্ত্বিক উৎস হারিয়ে ফেলার কথকতাও।[৩২] বিরাট কলেবরের *ওয়ারিশ* উপন্যাসে রায়হান অনুঘটক চরিত্রে ক্রিয়াশীল হিসেবে যতটা প্রাণবন্ত, রঞ্জু ততটা নয়। অপরদিকে নারী চরিত্রের মধ্যে সালমা খাতুন বোধ ও ব্যক্তিত্বে সবচেয়ে উজ্জ্বল, প্রাগ্রসর ও প্রতিবাদী। এছাড়া মালেকা বিবি ও সমিরন বিবি সামন্তবাদী মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের যথার্থ প্রতিনিধি। প্রধানবাড়ির প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান চিত্রিত করে শওকত নারীর ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতায়নের একটি দিক দেখিয়ে দেন। গ্রামের ভূস্বামীদের স্ত্রীরাও একধরনের ক্ষমতার অধিকারী ছিল–অন্তত শাশুড়ি ও বধূদের মধ্যে তো বটেই। মুর্শেদ আলীর মা মালেকা এবং স্ত্রী সালমার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবলভাবেই বিদ্যমান। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে অন্তঃপুরের নারীর এই সচেতনতা সময়েরই ভাঙাগড়া থেকে উত্থিত এবং তা মুসলিম নারীর অগ্রগতির ইঙ্গিতবহ।[৩৩] রায়হানের স্মৃতি ও শ্রুতিসূত্রেই লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মোহনগঞ্জের প্রধানবাড়ির ঘটনাসূত্রে উল্লিখিত হাতেখড়ির বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠান, কুহুলীর সিরনি দান, ভেলা ভাসানো, মেলা, মহররমের তাজিয়া উৎসব, মর্সিয়া গান, লাঠিখেলা, পিরের থানে ঘোড়া মানত, পিরের দিঘির গজার মাছভীতি, জ্বিন-ভূতের ভয়, সাপের উপদ্রব নিরাময়ে হেমতালের লাঠি ব্যবহার, চাঁদ বিবির কিচ্ছা, স্বামী-শ্বশুরের পাশে ও পা বরাবর নারীর কবরস্থ করা ও বউ-শাশুড়ির চিরন্তন বিবাদ–এসব লোকাচার ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমকালীন সামন্তবাদী সমাজের জীবন্ত চিত্রটি লেখক উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রের বোধ-বিশ্বাস, আচার-আচরণ-উচ্চারণে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অনুষঙ্গগুলো তাৎপর্যের সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। এমন নরম ভেজা মাটির গন্ধ, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্তের বৈচিত্র্য, পরিচিত প্রতিবেশের অঙ্গন ছেড়ে প্রধানবাড়ির মুর্শেদের সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমাতে হয়। পেছনে পড়ে থাকে জন্মভূমি, বসতবাড়ি ও দীপান্বিতা গুহ নামক এক তরুণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু-একটি অনুরাগের স্মৃতি। এসবই আজ রায়হানের উত্তরাধিকার। তাই সে বলে–

> ‘ধানক্ষেতের আলের ধারে আমার কিশোরী ফুফু ডালায় চেরাগ সাজিয়ে ভুলাভুলকির আলো দেখাচ্ছে, মাঝরাতে পুকুর পাড়ে কুহুলীর শিরনি রান্না এবং খাওয়া হচ্ছে। পেছন থেকে ডাকা-ডাকি সত্ত্বেও আকালু শেখ পীর সাহেবের ঘোড়া, গজাল মাছটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে–এইসব। তারপর আবার জালাল প্রধান বিদ্রোহী ফকিরদের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে অ্যাকশনে যাচ্ছে–এই রকম সব ঘটনা। মানে ধানের, মাছের, লড়াইয়ের অসংখ্য প্রসঙ্গ আমাদের রক্তের ভেতরে আছে।’-[*ওয়ারিশ*/পৃ.১২৪]

ঔপন্যাসিক যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি মানবিক বাঙালি সমাজের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রচনা করেছেন– এর প্রমাণ মেলে কুহুলীর শিরনি রান্না, কুহুলীর জন্য উৎসর্গ করা উপাচার, ছোট্ট আসন ঘরে সারা রাত নামাজ পড়ে শিরনি বণ্টন ও ক্ষীর-কালো মোরগের মাথা-প্রদীপসমেত ভেলা ভাসানোর মাধ্যমে। লাল শাড়ি পরা অবিবাহিত কিশোরীর সূর্যাস্তের সময় জমির আলে দাঁড়িয়ে ধান-দূর্বা-প্রদীপের ডালা নিয়ে অনাগত শস্যকে ডাকা আর ভুলাভুলকির আলো দেখানোর মাধ্যমে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে শস্যপূর্ণ মাঠের প্রত্যাশা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গভূমির লোকধর্মের এ আচারের সঙ্গে তৌহিদি ইসলাম ও বৈদিক হিন্দু ধর্মের আচারের কোনো যোগসূত্র নেই। এসব মূলত বঙ্গদেশের আবহমান কাল ধরে গড়ে ওঠা নিজস্ব লোকাচার।

উত্তরাধিকারীরাই বহন করে অতীত প্রিয়জনের রক্তের প্রবাহ। সেই সঙ্গে বয়ে বেড়ায় একটি জনপদের, মাঠঘাটের, আকাশ-বাতাস, বৃক্ষলতা, জীবনযুদ্ধ, বিদ্রোহ ও লড়াইয়ের ইতিহাসও। এগুলোকেই ঔপন্যাসিক চিহ্নিত করেছেন ওয়ারিশ হিসেবে– শুধু বিষয়-বিত্তসম্পদকে নয়।[৩৪] অন্যদিকে শওকত মোহনগঞ্জ ও ঢাকার ভূগোলে সংঘটিত ফকিরবিদ্রোহ, খেলাফত-আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতছাড় আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ, ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের সংকটকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকেও বাস্তবমণ্ডিতভাবে রূপায়ণ করেছেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুর্শেদ আলীর হত্যার মধ্য দিয়ে লেখক আবার পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকেও ইতিহাসের সত্য হিসেবে প্রতীকায়িত করেন। এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আশির দশকের বিভ্রান্তি, অপবাস্তবতা আর রাজনীতির ভণ্ডামির চিত্রও আঁকেন। এসবই তো প্রজন্মের বাস্তবতা– যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকারস্বরূপ। এসময় ভারতের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার তাৎপর্য অপমূর্তিতে দেখা দেয় দুই দেশেই। এপর্যায়ে ঔপন্যাসিক social realism-এর পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।[৩৫] শওকতের *ওয়ারিশ* উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে এর

অতিলৌকিক ঘটনাপুঞ্জের সংযোজন। ইতিহাস, রাজনীতি, কূটনীতির পাশাপাশি লোকবিশ্বাসের সন্নিবেশ এ উপন্যাসের শিল্পবোধের গভীরতা বাড়িয়েছে। গ্রামজীবনের গভীরে এর শেকড় প্রোথিত। সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম-নীতি যেমন জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অতিলৌকিকত্বও তেমনি জনবিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ। শওকত বেশ দক্ষতার সঙ্গে এসব লোকবিশ্বাসের ব্যবহার করেছেন।

শওকত আলীর *ওয়ারিশ* উপন্যাসের মুর্শেদ চরিত্রের ভাব-ভাবনা ও বিশ্বাসের সমান্তরালে আবুল ফজলের *রাঙা প্রভাত*-এর কামাল এবং সরদার জয়েনউদ্দিনের *অনেক সূর্যের আশা*-এর রহমতের বেশ সাযুজ্য পাওয়া যায়। এ তিনজনই সমকালীন রাজনীতি সচেতন, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অবসানে হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশী। তবে ধর্মের জিগির তুলে ভারতবিভাজন, ক্ষমতার মসনদে পুরনো শকুনদের চেহারায় স্বদেশি-স্বজাতির কট্টরপন্থী দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য-দাপট দেখে এ তিনজনেরই স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। আবার মুর্শেদ ও রহমতের সঙ্গে সার্বিক সাদৃশ্য থাকার পরও ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম ও তার পরিণয়ের ক্ষেত্রে কামাল অনেক বেশি প্রাগ্রসর। কারণ মুর্শেদ হিন্দু মেয়ে দ্বীপান্বিতাকে এবং রহমত খ্রিষ্টান মেয়ে সাইপ্রিনকে ভালোবাসলেও সমকাল ও সমাজকে অতিক্রম করে বিয়ে করতে পারেনি বরং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কামাল হিন্দু মেয়ে মায়াকে বিয়ে করে থিতু হয়েছে। আবার মুর্শেদ ও রহমতের স্বদেশত্যাগের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যও প্রকট। কারণ মুর্শেদ যেখানে উগ্রবাদী হিন্দুদের উপদ্রব-উৎপাতে টিকতে না পেরে নিরুপায় হয়ে স্বদেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর বিপরীতে রহমত সাময়িকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় মোহগ্রস্ত হলেও পরে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে চলে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত সমকালীন রাজনৈতিক ক্রমজটিল আবর্তে জড়িয়ে এ তিনজনেরই লালিত বোধ-বিশ্বাস-আদর্শের স্খলন ও বিচ্যুতি ঘটে। ব্যক্তির এ পরাভব, পরাজয় ও রক্তক্ষরণের বিনাশী বাস্তবতা রূপায়ণে শওকত অনেক বেশি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। কোম্পানি আমলের ফকিরবিদ্রোহ থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের আশির দশকের স্বৈরশাসনের ক্রমজটিল অভিঘাতে চার প্রজন্মের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, প্রেম-বিরহ এবং উন্মুলিত-অনিকেতময়তার মধ্যে নীড়সন্ধানী প্রবণতাকে শতাব্দীর বিরাট ক্যানভাসে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন– তা নিঃসন্দেহে পরিশ্রমী সৃষ্টি।

ওয়ারিশ উপন্যাস এক অর্থে মুর্শেদ আলী প্রধানের জৈবনিক ট্র্যাজেডির ভাষ্য। অন্যদিকে সালমা অন্তর্দর্শী দ্রষ্টা যিনি ঐ সময়ই বুঝে নিয়েছিলেন যে-পাকিস্তান আন্দোলনে ভুল ছিল। জওহর আলী প্রধান, মুর্শেদ আলী প্রধান, রায়হান এবং রঞ্জু–চার প্রজন্মের এই ভাঙাগড়া এবং স্বপ্ন ও ব্যর্থতার ফ্রেমে অঙ্কিত হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক ভাঙন, পাকিস্তান সৃষ্টি এবং সদ্যোজাত পাকিস্তানের আসন্ন বিপর্যয়ের সংকেতধ্বনি।[৩৬] চার প্রজন্মের ইতিবৃত্তের মধ্যে জওহর আলী ও মুর্শেদ আলী মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও রায়হান ও রঞ্জুর সংশ্লিষ্টতা স্বল্প, খুব সরব নয়। যদিও এর মূল উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় ধারা-উপধারা পরিপুষ্টি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; বাংলাদেশে নয়। ঢাকাবাসী রায়হান পূর্বপুরুষের অতীত ঘটনা পরম্পরার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করলেও পিতামহ ও পিতার তুলনায় নিরুত্তেজ-নিষ্প্রভ। ফেলে যাওয়া ভিটেমাটি ও বসতবাড়ির জন্য আকর্ষণ-আবেগ-উচ্ছ্বাস আরো প্রগাঢ় হওয়া উচিত ছিল। রঞ্জুর ভূমিকাও হালকা চালের। শুধু দাদি সালমা বেগমের প্রতি আকর্ষণ ছাড়া সে বাবার সফরসঙ্গী হিসেবে অনেকটা দর্শকের ভূমিকায় সীমিত হয়ে পড়ে। আর পিতামহের মতো তার প্রেমও সার্থকতার পথ খুঁজে পায় না। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে এসে রঞ্জু ও খুকুর সংলাপ অনেকটা খাপছাড়া মনে হয়। এর মূলে হয়তো ইতিহাস সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষত ও সংক্রমণ কার্যকর রয়েছে। কারণ এপার ও ওপার বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমনে ও মানসিকতায় পারস্পরিক যে-ঘৃণা ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল তা আজ অবধি নির্মূল হয়নি। তাই এমন নির্মম বাস্তবতায় প্রেম-প্রশান্তি, স্বপ্ন ও সম্প্রীতি দুর্লভ হয়ে উঠেছে। তারপরও এ উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা, চরিত্রের যোগসূত্র, এর শিল্পশৈলী পাঠককে আকৃষ্ট ও মোহগ্রস্ত করে রাখে। এর পাঠ শুরু করলে পথে মৃত্যুর আশংকা নেই বরং পাঠের দীর্ঘ বিরতির পরিবর্তে বার বার বাস্তবে ফিরিয়ে আনবে এতে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের ভাষা খুবই মার্জিত ও কাঠামোগত। অহেতুক ডালপালার বিস্তার নেই। পাঠক যাতে সরল পথে যাত্রা করতে পারে সে-দিকটি খুব পরিকল্পিত মনে হয়। পুরো লেখাটি অর্থাৎ এর কনটেন্ট যেভাবে উপস্থাপিত–সেখানে বাস্তবতা ও সত্যের বাইরে যাওয়া যায় না।[৩৭] বস্তুত মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মধ্যবিত্তমানসের অস্তিত্বসংকটের সংরাগে আত্মরতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসন্ধানী তথা আত্মসত্তা অন্বেষণের সূত্রেই শওকত *ওয়ারিশ* উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তাই রাজনৈতিক জীবনের ক্রম-অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি পূর্ব পুরুষের কাহিনিতে খুঁজেছেন উজ্জীবনের প্রেরণা, সময় পরম্পরায় ব্যক্তিসত্য ও সমাজসত্যের সামগ্রিকতা।[৩৮] কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার পরও *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর পাশাপাশি উল্লেখ করবার মতো শওকতের আরেকটি উপন্যাস হলো এ *ওয়ারিশ*। বিশাল পটভূমিতে ইতিহাস, রাজনীতি-সমাজনীতি, সংস্কার-অর্থনীতি-লোকবিশ্বাস, অতীত-বর্তমান, সমাজপরিবর্তনের ধারা– সবকিছুর সমন্বয়ে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা

হয়েছে। সম্প্রদায়গত বিভাজনের দ্বান্দ্বিকতার উপর এমন সার্থক লেখা বাংলাসাহিত্যে বোধ করি অল্পই আছে। সততায় ও সত্যতায় এই বিশিষ্ট কীর্তির জন্য শওকত প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।[৩৯] এখানেই শওকত-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির অনিঃশেষ প্রাসঙ্গিকতা।

উপরন্তু *ওয়ারিশ* উপন্যাসে প্রতিফলিত যুগ-মানস, যুগ-জীবন, যুগ-জিজ্ঞাসা ও যুগ-যন্ত্রণার মাধ্যমে ব্যক্তির ভূগোল-বিচ্ছিন্নতার সংকট বড় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি রায়হান-রঞ্জুদের পিতৃভূমির অধিকার বা ওয়ারিশ বঞ্চনার যন্ত্রণাময় অঙ্কুশ সামষ্টিক চেতনায় হয়েছে পরিব্যাপ্ত। এ বেওয়ারিশ, উদ্বাস্তু, উন্মূলিত, শেকড় হারানো জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় অন্বেষায় এখানে উত্তরণ দেখানো হয়েছে। যেখানে *ওয়ারিশ* কেবল রক্তসম্পর্কীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদে সীমিত নয় বরং একটি জনপদ ও জনগোষ্ঠীর অস্থিমজ্জায় প্রবহমান পরিবেশ-প্রতিবেশ, লোকাচার, যাপিত-জীবন, সংগ্রাম-লড়াইয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই যুগের পীড়নে প্রতিবাদী প্রত্যেক বাঙালিই এ *ওয়ারিশ*-এর বৈধ উত্তরাধিকার। সমাজ বদলের রূপরেখায় *ওয়ারিশ* আজো প্রাসঙ্গিক, বিশিষ্ট, ব্যতিক্রম ও বৈভবমণ্ডিত।

উত্তরের খেপ

শওকত আলীর *উত্তরের খেপ* (১৯৯২খ্রি.) বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন। এ উপন্যাসের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু জনজীবনে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন রাজনৈতিক অভিঘাত যে-গভীর ক্ষত, রক্তক্ষরণ ও অস্তিত্বসংকট তৈরি করে–তারই বস্তুনিষ্ঠ বয়ান উন্মোচিত হয়েছে। এখানে শওকত ব্যক্তির জীবনসংগ্রাম, জীবনের ভাঙাগড়া ও রক্তক্ষরণের নেপথ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতাকে। দেশভাগের প্রবল ধাক্কায় অগণন নরনারীর জীবনে নেমে আসে মর্মন্তুদ বিপর্যয়। আজন্মের ভিটেমাটি ছেড়ে এক মুহূর্তেই উদ্বাস্তু শরণার্থীতে পরিণত হয় সীমান্তের দুইপারের মানুষ। এতে ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার ছায়াও দুর্লক্ষ্য নয়। *উত্তরের খেপ* দুটি খণ্ডে বিভক্ত এক বৃহৎ কলেবরের উপন্যাস। চোদ্দ পরিচ্ছেদের *উত্তরের খেপ* এবং ষোলো পরিচ্ছেদের *দক্ষিণে মোহনা* নিয়ে *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে। *উত্তরের খেপ* অংশে পর্যায়ক্রমে বর্তমান ও অতীত ঘটনা হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়েছে। এখানে হায়দারের উত্তরের খেপের ভ্রমণ এবং তার পিতামহ, মাতামহ, মা ও বাবার জীবনের ঘটনাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে দাঙ্গা, দেশভাগ, নিশাত-সবদরের দাম্পত্য জীবন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রাধান্য পেয়েছে। আর *দক্ষিণে মোহনা* অংশে রয়েছে বর্তমান সময়ের হায়দার-মরিয়ম-আজহার কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মরিয়মের দাম্পত্যসংকট, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংগ্রামী জীবনই এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

উত্তরের খেপ উপন্যাসের কাহিনির উৎস সৃজনের মূল প্রোথিত রয়েছে ভারতবিভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রে। ট্রাকচালক হায়দারের ছন্নছাড়া জীবনের ট্রাজিক ইতিহাস উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। এ উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত বিস্তৃত হয়েছে ভারতবিভাজন থেকে শুরু করে পাকিস্তানসৃষ্টি এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ জন্মের সংগ্রামী কাললগ্নে।[৪০] শওকত তাঁর *উত্তরের খেপ* উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূগোলের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার পাঁকে উন্মুল ক'জন ব্যক্তিমানুষের গল্প লিখেছেন । আর প্রেক্ষাপট হিসেবে রয়েছে দেশভাগ, দেশভাগের যন্ত্রণা, বাঙালির জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতা। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর জনপদের উন্মুল; পরাজিত মানুষের অনিঃশেষ ব্যক্তিগত যাত্রার গল্প *উত্তরের খেপ*।[৪১] যমুনা নদীর পশ্চিমে ও পদ্মানদীর উত্তরে অবস্থিত বিশাল এলাকা উত্তরবঙ্গ হিসেবে পরিচিত। সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে এর গুরুত্ব অশেষ। কারণ সাতচল্লিশের দেশভাগের মস্তবড় আঘাতটি এসে এখানেই লাগে। বিহার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদাহ, আসাম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকা থেকে পাকিস্তান নামের তৎকালীন ভূখণ্ডে বিহারি ও বাঙালি মুসলমানদের একটি বড় অংশের অভিবাসন ঘটে। এমন অভিবাসনের পেছনে রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল ধর্মীয় উন্মাদনা। রাজনীতির প্রতারণা ও পাকচক্রে পড়ে এ সকল উন্মূলিত-উদ্বাস্তু অভিবাসী নর-নারী শেকড় ও নীড়সন্ধানে সিসিফাসের মতো হয়েছে গলদঘর্ম।

নিশাত বানু বর্ধমান জেলার আসানসোলের কাপড়ের দোকানদার মাজহার খান-দরিয়া বিবির ছোট মেয়ে এবং ইরশাদ বানুর বোন। সাতচল্লিশের দেশভাগের হাঙ্গামা শুরু হলে প্রতিবেশী ও পরিচিতরা অনেকেই নতুন দেশ পাকিস্তানে চলে গেলেও নিশাতের বাবা দোকান ও বাড়ি ঘরের টানে মাটি কামড়ে থাকেন। কিন্তু পঞ্চাশের মাঝামাঝি এসে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা চরম রূপ নিলে এবং দুপুর বেলা দোকান লুট হলে নিরুপায় মাজহার খান দুই মেয়ে ও বিবিসহ কাঁঠালগাছি গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু এখানেও এসে দেখেন–

> ‘সাজ সাজ রব–বহুলোক পাকিস্তানে রওনা হবে। মুসলমানদের জন্য নাকি আপনামুলুক আদায় করে নিয়েছেন জিন্নাহ সায়েব। ইসলামের ঐ আপনামুলুকে একবার যেতে পারলে মুসলমানদের আর চিন্তা নেই।’-[উ.খে. শওকত আলী রচনাসমগ্র; ৭ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/ পৃ.৩২]

চারদিকের ভয়ংকর পরিস্থিতি ও মানুষের পাশবিক উল্লাস দেখে মাজহার খান রুটি-রুজির চিন্তা বাদ দেন এবং জীবন বাঁচানো ও বিবি-বেটির ইজ্জত রক্ষার চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন। কাঠাঁলগাছি রেলস্টেশন থেকে রীতিমতো যুদ্ধ করে ট্রেনে ওঠেন। সকরিগলি ঘাটের ফেরিতে গঙ্গা পার হয়ে মধ্যরাতে হিন্দুস্থানের শেষ সীমানা রাধিকাপুর পেড়িয়ে রংপুরে নামেন। মোহাজের হিসেবে নাম তালিকাবদ্ধ হবার পর সবাইকে দুই দিনের মধ্যে সৈয়দপুর বিহারি ক্যাম্পে পাঠানো হয়। কিন্তু মাজহার খান ‘হামলোগতো বিহারী নেহি’ বলে প্রতিবাদ করায় রিফিউজি ক্যাম্পের কর্তা কড়া ভাষায় বলেন-

> ‘এঁহা সব কোই বিহারী, বিহারী হোনা তো কোই বুরী বাত নেহী। সব মুহাজির বিহারী হায়।’-[উ.খে./পৃ.৩৪]

দেশভাগের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ডামাডোলে রাতারাতি বিহারি না হয়েও নিশাতের পরিবারসহ অনেকেই বিহারি খেতাব পেয়ে যায় এবং সৈয়দপুরের বিহারি এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। এখানে-

> ‘প্রকাণ্ড ক্যাম্প, চাটাই দরমার বেড়া আর টিনের চালার সার সার ঘর। ...ইরশাদ বানু ও নিশাত বানুকে নিয়ে মা দরিয়া বিবি ঘরে থাকে আর মাজহার খান ব্যবসা খোলার ধান্দায় ঘুরে ফেরে।... সরকার খাওয়া-দাওয়ার জন্য রেশন দেয়, কিন্তু ব্যবসার পুঁজি।’-[উ.খে./পৃ.৩৪]

এমন অনিশ্চয়তা আর দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে মাজহার খান পুনরায় আসানসোলে যান। খুব কষ্টে দোকান ও বাড়ি বিক্রির দশ হাজার টাকা নিয়েই তিনি সৈয়দপুরে ফিরেন। বন্ধু আলী ইব্রাহীমের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় রংপুর স্টেশন রোডের কাছে ‘আলী অ্যান্ড খান কোম্পানি’ নাম দিয়ে এক প্রকাণ্ড মনিহারী দোকান খুলেন। বছর খানেক রমরমা ব্যবসায় চলে। কিন্তু এ ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য বেশি দিন মাজহারের ভাগ্যে সয়নি। দোকানের ভেতরেই আলী ইব্রাহীম খুন হন এবং দোকানের মালামাল লুট হয়ে যায়। মামলা ও জেলের হাঙ্গামায় নিশাতের বাবার মৃত্যু হলে দরিয়া বিবি প্রকৃত অর্থেই দুঃখের দরিয়ায় নিমজ্জিত হন। নিরুপায় হয়ে দরিয়া বিবি রেলওয়ে চাকুরে ভাই আফজাল খানের শরণাপন্ন হন। বোনের আহ্বান, লাভ ও লোভের সম্ভাবনা দেখে আফজাল খান-

> ‘রংপুরে বদলি নিয়ে এল এবং আলী অ্যান্ড খানের হাল ধরল। এটি তার প্রথম কাজ। আর দ্বিতীয় কাজটি করে সে বোনকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে। একই দিনে সেই ইরশাদ বানু ও নিশাত বানু দুই বোনের শাদী মুবারক সম্পন্ন করে দুজনকেই স্বামীর ঘর করতে পাঠিয়ে দিল। বড়ো বোনকে যেতে হল ঈশ্বরদী আর ছোটোটি গেল পার্বতীপুর।’-[উ.খে./পৃ.৩৭]

হঠকারী সিদ্ধান্তের এ বিয়ে ইরশাদ ও নিশাতের জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে। কারণ ইরশাদের দুর্নীতিপরায়ণ রেলওয়ের টিকিট কালেক্টর স্বামী প্রথম স্ত্রীর সাত মেয়ে থাকার পরও শুধু ছেলের প্রত্যাশায় দ্বিতীয় বিয়ে করে। তাই বছর না ঘুরতেই গর্ভপাতের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ইরশাদ মারা যায়। আর নিশাত বানুর স্বামী মাহবুব এসফেন্দিয়ারও রেলওয়েতে চাকরি করতো। সেও ছিল দুর্নীতিপরায়ণ, জুয়াড়ি আর মদ্যপ। জুয়া আর নেশার টাকা সংগ্রহে মাহবুব স্টোরের মালপত্র বিক্রি করে। মামালা ও পুলিশের ভয়ে সে বউ ও বাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। স্বামীর অবর্তমানে নিশাত বাধ্য হয়ে সৈয়দপুরে মায়ের কাছে আসে। কিন্তু কিছু দিন পর দরিয়া বিবিও মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে বাবা-মা ও স্বামী হারিয়ে নিশাতবানু অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হয়। বাধ্য হয়ে মামা আফজাল খান সপরিবারে রিফিউজি কলোনিতে বোন দরিয়া বিবির বাড়িতে এসে ওঠেন। এখান থেকেই শুরু হয় নিশাত বানুর দুঃখ ও দুর্দশাময় জীবন। কারণ-

> ‘নিশাত বানু দিন গোনে আর দিন গোনে। তার বিশ্বাস হতে চায় না যে স্বামী তাকে ভুলে থাকতে পারে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাসও দেখতে দেখতে ফুরোয়–বছর ঘুরে আসার সময় হয়।...মামি গালাগাল করে, মামাতো ভাইবোনেরা লাথি ঝাঁটা মারে কিন্তু নিশাত বানুর বিকার নেই। দিনের পর দিন সে জানালার কাছে দাঁড়ায় আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে।’-[উ.খে./পৃ.৩৯]

জানালার পাশে স্বামী মাহবুবের প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকাকে কেন্দ্র করে নিশাতের জীবনে নতুন দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। তাকে নিয়ে বাড়ির বিপরীতে গুলজার খানের ওয়ার্কশপ থেকে নানা ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত, হাসি-ঠাট্টা ও মুখরোচক গল্প প্রচার পায়। এ ওয়ার্কশপে গাড়ি মেরামত করতে আসা চালচুলোহীন ট্রাকড্রাইভার সবদর আলীর চোখেও তা এড়ায় না। সবদরও দেশভাগের অভিঘাতে জলপাইগুড়ি থেকে আসা দিনাজপুরের অভিবাসী। তার বাবা আসগর এক বিধবা বোনকে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুরের আমবাগান সংলগ্ন মিশনরোডের কাছে বাড়ি করেন। কিন্তু মা কর্তৃক পরিত্যক্ত সবদর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠেনি। বরং খেয়ালি, জেদি আর গোঁয়ার স্বভাব তার সহজাত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। কর্মসূত্রে মদ-মেয়ে-জুয়া খেলা হয়ে ওঠে তার নিত্য সহচর। তারপরেও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিশাত বানুর প্রতি তার যেমন আগ্রহ বাড়ে, তেমনি মমতাও জাগে। ওয়ার্কশপ মালিক গুলজার খানের মধ্যস্থতায় নিশাতের মামা আফজাল খানের নিকট বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়াতে তিনি এক বাক্যে রাজি হন। আর সেদিনই বিয়ের দিন-তারিখ পাকা করেন। অথচ ভাগ্নি

নিশাতের মতামতও তিনি শোনার প্রয়োজন মনে করেন না। আর তার প্রথম স্বামী মাহবুবের সঙ্গে আইনানুগভাবে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও গুরুত্ব দেন না। মামার এ হঠকারী সিদ্ধান্ত জানার পরই নিশাত-

> 'দানাপানি ছেড়ে দেয়। কিন্তু মামা-মামি কেউ পাত্তা দেয় না তাকে। যথারীতি বিয়ের আয়োজন হয়। ফলে কাজী নিকাহ পড়াতে এলে মেয়ে সেই যে দাঁত কপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তো ঐভাবেই পড়ে থাকে।...যতক্ষণে তার জ্ঞান ফেরে, ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। সবদর আলী ড্রাইভারের বিবি এই পরিচয় তার অস্তিত্বের সঙ্গে পোক্ত রকম সেঁটে দিয়েছে তার মামা'-[উ.খে./পৃ.৪১]

এভাবেই নিশাত বানু সবদরের সঙ্গে জড়ায় এবং তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। সবদর নতুন বউ নিশাতকে নিয়ে একটি ভুতুড়ে ভাঙা-পোড়োবাড়িতে ওঠে। এমন ভুতুড়ে পরিবেশে এসে মানসিকভাবে নিশাত আরো মুষরে পড়ে। আর তখন-

> 'নিশাত বানু বারান্দায় সিঁড়িতে বসল। তার তখন চিন্তা–এবার কী হবে? মামু বিদায় করে দিল তাকে। সে কি মরবে এবার? স্বামী তাকে তালাক দেয়নি, তবু কেমন করে তার ফের বিয়ে হয়? ঐ লোকটাকে সে কেমন করে মাহবুব এর জায়গায় বসাবে? একবার মনে হল পালাবে সে? কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, কোথায় পালাবে সে? কার কাছে যাবে? দুনিয়ায় তো যাবার জায়গা নেই তার? সে আল্লাহ আল্লাহ করল আর বসে বসে কাঁদল।'-[উ.খে./পৃ.৪১]

নিশাত বানুর এ ভাবনার মধ্য দিয়ে তার অসহায়ত্ব, অস্তিত্বসংকট, অনিকেতময়তা এবং পাপবোধের পাশাপাশি প্রথম স্বামী মাহবুবের প্রতি সযত্নে লালিত ভালোবাসা উন্মোচিত হয়েছে। তাই নিশাত প্রথম দিন গৃহকাজে মনোযোগ দেয় না এবং কিনে আনা দুপুরের খাবারও খায় না। হেমন্তের কুয়াশা মেশানো জোৎস্না রাতে সবদর নিশাতের হাত ধরলে সে দ্রুত হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে যায় এবং মুখে শুধু উচ্চারণ করে 'না'। সবদর একে নারীর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের সহজাত লজ্জা ও ভয় ভেবে সান্ত্বনার সুরে বলে– 'রাগ করিস কেন বল তো? স্বামী-স্ত্রী না এখন আমরা?' একথা বলার পরও নিশাত 'না' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কথায় কথায় সবদর নিশাতের প্রথম বিয়ের ব্যাপারে জানতে পারে। রাতে দুজন পৃথক বিছানায় ঘুমায়। তবে সহানুভূতির সুরেই নিশাতকে তার সঙ্গে অবস্থান করতে বলে। কারণ সবদর ব্যতীত নিশাতের আর কোনো আশ্রয় অবশিষ্ট নেই। তারপরও নিশাত 'আমি জহর খেয়ে নেবো'–এমন ঘোষণা দিলে সবদর তাকে প্রথম স্বামী মাহবুবকে খুঁজে বের করার আশ্বাস দেয়। আর তখন–

> 'নিশাত লোকটাকে ভালো করে দেখে এবার। দেখে, তার আশা হয়।...সবদর আলী লোকটা বোধ হয় আসলেই দয়ালু।...তাহলে সে এই লোকের আশ্রয়ে থেকেই সে একদিন স্বামীকে খুঁজে বার করতে পারবে। সে কৃতজ্ঞবোধ করে এবং ঐ কারণে সবদর আলীর সংসার গোছানোর কাজে লেগে যায়।'-[উ.খে./পৃ.৪৬]

নিশাত বানুর দ্বিতীয় স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করে প্রথম স্বামীকে ফিরে পাবার স্বপ্ন ও একাগ্রতা দেখে সবদর পুনরায় নেশার জগতে পা বাড়ায়। মধ্যরাতে মাতাল হয়ে বাড়িতে ফেরে এবং বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ দূরত্ব নিশাত প্রথম দিন থেকেই সুকৌশলে তৈরি করে নেয়। রাতে নিশাত একা থাকতে ভয় পায় বিধায় সবদর অনাথ কিশোরী বুলবুলিকে কাজের মেয়ে হিসেবে আনে। আর এভাবেই-

> 'ক্রমে দিন যায়, সপ্তাহ কাটে, মাস ফুরিয়ে নতুন মাস আসে। একই ভাবে দিন কাটে দুজনের, স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে এবং একই ছাতের নিচে।'-[উ.খে./পৃ.৫৬]

প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সবদর-নিশাত বানুর দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়ের পালা চলে। দুই মাস পর মাহবুবের পালিয়ে করাচি যাওয়া এবং সেখানে নতুন বিয়ে করে সংসার পাতার খবর পাওয়া যায়। এরপরেও নিশাত বানু বলে 'আমি করাচি যাব' এবং পথ খরচ যোগাতে হাতের বালাজোড়া খুলে দেয়। কিন্তু করাচি গিয়েও মাহবুবের খোঁজ পাবার নিশ্চয়তা না পাওয়াতে নিশাত নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলে-

> 'ইয়া খোদাওন্দ করিম, তুমি আমাকে বাঁচাও–আমার স্বামীকে পাইয়ে দাও–এভাবে থাকলে আমি মরে যাব।'-[উ.খে./পৃ.৫৭]

সবদর 'একখানা ঘরের দুদিকে দুখানা মাদুর পাতা' বিছানায় ছয় মাস কাটিয়ে দেয় এবং পাশের বিছানায় আতঙ্কগ্রস্ত নির্ঘুম রাত যাপনকারী নিশাতের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে তাকে আশ্বস্ত করতে বলে-

> 'তোকে দেখে যে আমার লোভ লাগে না–তা বলব না।...কিন্তু মানুষ বিয়ে করে কেন বল? খালি শরীরের গরম ঠাণ্ডা করার জন্য? আমার মনে হয়–না। আমি ড্রাইভার মানুষ, জানি কোথায় গেলে পয়সা খরচ করলেই শরীরের গরম ঠাণ্ডা করতে পারব। কিন্তু আমার তো সংসার দরকার একটা। সংসার পেতে হলে বউ লাগে একটা–সে বউয়ের আবার শরীর থাকলেই চলে না–তার মনটাও দরকার, সেই মন না পেলে সংসার কোত্থেকে হবে?...তুই আমার বউ হবি অথচ তোর মনটা থাকবে অন্যের কাছে পড়ে–এমন বউ দিয়ে আর যাই হোক, আমার সংসার চলবে না। তাই তোর গায়ে আমি হাত দেব না; তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।'-[উ.খে/পৃ.৫৫-৫৬]

এ উক্তির মাধ্যমে সবদর প্রকৃত সংসার গড়ায়, সুখের নীড় রচনায় স্ত্রীর শরীর-মন-প্রাণ-প্রেমপূর্ণ যে-ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়েছে– তা একান্তই বাস্তবসম্মত ও গভীর ব্যঞ্জনাদীপ্ত উপলব্ধি। এভাবে জীবনে পোড়খাওয়া,বাউণ্ডুলে ও অনিকেত সবদরের সংসারের প্রতি অদম্য আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে। সবদর-নিশাত বানুর দাম্পত্য জীবনের এ যোজন যোজন মানসিক দূরত্ব ঘুচানোর যখন কোনো মানুষ বা মাধ্যম অচিন্ত্যনীয়-অভাবনীয় ছিল, ঠিক তখনই এক রাতের তুমুল বৃষ্টিতে ভাড়া বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে। কাজের মেয়ে বুলবুলিসহ নিশাত চাপা পড়ে। সবদর কিছুলোক জুটিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরায়। আর রক্তাক্ত-অজ্ঞান নিশাতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয় এবং সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলে। এভাবেই-

> 'কষ্টের ভেতর দিয়ে, কান্নার ভেতর দিয়ে একটু একটু করে...আহত, রক্তাক্ত নিশাত বানু সেদিন সেই ঝপঝপে বৃষ্টির মধ্যে সংসারের দিকে যাত্রা করে।'-[উ.খে/পৃ.৫৯]

এ প্রাকৃতিক দুর্যোগই সবদর-নিশাতের দাম্পত্য জীবনের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে। তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝার অভিঘাত দুর্লঙ্ঘ্য বাধার দেয়ালকে নিমেষে ভেঙে ফেলে। ফলশ্রুতিতে সবদর-নিশাতের মাঝে বিদ্যমান দূরত্ব ঘুচে যায় এবং সুখের ঘরকন্নার শুভসূচনা ঘটে। এক সময় ছেলে হায়দারের জন্ম হয়। ছোট সংসার হলেও সাংসারিক কাজ, স্বামীর সেবাযত্ন, খাবারের বন্দোবস্ত, জেদি সন্তান হায়দারের বায়না মেটানো এবং তাকে উর্দুর পহেলা কিতাব ও আরবি আমপারার সবক দিতেই নিশাতের ব্যস্ত সময় কাটে। খেয়ালি, জেদি, গোঁয়ার ও একরোখা স্বামী সবদরও নিশাতের ভালোবাসার কাছে বন্দি হয়। ফলে নিশাতের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে-

> 'এখন তো সুখ হয়েছে তার। সংসার আছে, স্বামী আছে, সন্তান আছে–মেয়েদের জিন্দিগী তো একেই বলে।...এক জিন্দিগী থেকে আরেক জিন্দিগী–বাপ থেকে সন্তান–মাঝখানে সে।'-[উ.খে/পৃ.৬৮-৬৯]

তাই নিশাত স্বামীকে দিয়ে পুরাতন বাড়ি সংস্কার করায় আর সংসারের নিয়ম-কানুন সবাইকে মানতে বাধ্য করে। সবদর মাঝে-মধ্যে মদ পান করে দেরিতে বাড়ি ফিরলে নিশাত ঘরে ঢুকতে দেয় না। আবার আমুদে সবদর অনেক সময় বাড়িতে বন্ধু আব্দুল, সুলেমান, মকবুল ও আমানুল্লাহদের নিয়ে আসলেও প্রকাশ্যে স্বামীকে কিছু না বললেও সুলেমানের অশ্লীল ইঙ্গিত ও রসিকতা সম্পর্কে সে সবর্দা সজাগ থাকে। কারণ-

> 'সংসারটা প্রাণ থাকতে সে কখনো ভেঙে যেতে দেবে না। নিয়ম-কানুনগুলো সে নিজে মানে এবং স্বামী, সন্তানকে দিয়েও মানায়।'-[উ. খে./পৃ.৭১]

যেহেতু নিশাত বর্তমানে বেশ পরিণত, পোড়খাওয়া এবং পূর্বের সংসার ভেঙে যাবার যন্ত্রণায় পরিশোধিত; সেহেতু জান-প্রাণ দিয়ে সে স্বামী-সন্তান ও সংসারকে আগলে রাখে। কিন্তু স্বামীর বন্ধু সুলেমানের ছেলে লোকমানের খৎনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিশাতের সুখের সংসার নষ্টনীড়ে পরিণত হবার উপক্রম হয়। কারণ সুলেমান খবর দিয়ে নিশাতের প্রথম স্বামী মাহবুবের বন্ধু আনসারকে আনে। নিশাত কৌশলে আনসারকে এড়াতে গিয়েও পারে না। আনসার নিশাতকে বলে-

> 'মাহবুব শায়দ ওয়াপস আয়গা, আগর উত্তআ যায়তো তুম কেয়া করোগী?...বাঙ্গালন বনকে তুমেন খারাপ কাম কিয়া, আঁখির দেখ লেনা নাতিজা বহুত খারাপ হোগা।'-[উ.খে./পৃ.৭৮]

প্রথম স্বামীর আগমনের ইঙ্গিত শুনে বর্তমান স্বামী-সন্তান-সংসার টিকিয়ে রাখার চিন্তায় সে মরিয়া হয়ে ওঠে। চঞ্চল-মুখরা-সংসারী নিশাতের নিস্পৃহতা সবদরের নজরও এড়ায় না। তাই সবদর কুচক্রী বন্ধু সুলেমানকে শায়েস্তা করে। আর স্ত্রী নিশাত বানুকে বুকের কাছে টেনে চুমুর পর চুমু খায় এবং বলে-

> 'আমি বহু গুনাহগার–কিন্তু সেসব পথ আমি ছেড়ে দিয়েছি তোর জন্য–আমার সংসার হয়েছে, সংসারে সুখ হয়েছে–এটাই এখন আমার জীবন–এসব থাকলে আমি আছি, না থাকলে নাই। যদি আমাকে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে আমাকে লড়াই করতে হবে। আমি মরতে চাই না, কারণ জিন্দিগিটা বড়ো সুখের। আমি বাঁচার জন্য শেষপর্যন্ত লড়াই করব।'-[উ.খে/পৃ.৮৭-৮৮]

বাউণ্ডুলে, খ্যাপাটে, খেয়ালি আর গোঁয়ার প্রকৃতির সবদরকে একমাত্র নিশাত বানুই তার প্রেমের মাধ্যমে সংসারে ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু এরপর থেকে সবদরের জীবনটা প্রকৃত অর্থেই সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠে। আটষট্টি-উনসত্তরের রাজনৈতিক ডামাডোলে প্রথমে সুলেমান লোক লাগিয়ে সবদরের ট্রাক জখম করায়। আবার

আক্রোশবশত সুলেমান মাহবুবকে খবর দেয়। মাহবুব নিশাতের মামা আফজাল খানের কাছে চিঠি লিখে শ্বশুরের রংপুরের দোকান এবং সৈয়দপুরের বাড়ির মালিকানা দাবি করে। এ চক্রান্ত ও কূটচালে নিশাতের মামা আফজাল খানও যুক্ত হন। তিনি নিশাতকে মাহবুবের পাঠানো দুটি চিঠি, মামলার ভয় ও দাবিকৃত পাঁচ হাজার টাকার কথা জানান। কিন্তু নিশাতও সাহসিকতার সঙ্গে মামাকে বলে-

> 'আপনি মামলার ভয় দেখাচ্ছেন যখন, তখন ঐ একই ভয় তো আমরাও দেখাতে পারি। আর বলে দেবেন আপনার সেই চিঠি লেখনে অলাকে যে, তার বিরুদ্ধে সরকারি মামলা ঝুলছে, সেটা যেন ভুলে না যায়।'-[উ.খে./পৃ.৯৮]

নিশাত হতাশায় নিমগ্ন না হয়ে বরং গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সে স্বামী-সন্তান ও সংসারের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হয়। স্বামীর ট্রাক মেরামত করতে–

> ‘নিশাত মুরগির সংখ্যা বাড়ায়–পাটনাই ছাগলের বাচ্চা কেনে দুটো, সেলাইয়ের কাজ জুটিয়ে আনে। তার কেমন ঝোঁক চেপে যায় যে, সংসারের আয় সে বাড়াবেই।’-[উ.খে./পৃ.৯৮]

এভাবে নিশাত কিছু টাকা জমিয়ে এবং হাতের বালাজোড়া বিক্রি করে ট্রাক মেরামত করায়। একসময় সবদর নিজেই ট্রাকের মালিক হয় এবং তরতর করে বাড়ি পাকা হয়, নিশাতের গহনা হয়, ঘরের আসবাবপত্র হয় এবং ছেলে হায়দার ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়। সব দিক মিলিয়ে নিশাতের সংসার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে ওঠে। প্রায় রাতেই স্বামী সবদর যুবকের মতো আদর-সোহাগে তাকে সিক্ত করে এবং ‘বউ এবার একটা ছেলে দে’– বলায় নিশাত স্বামীর গালে ঠুকনো মেরে বলে-

> ‘এখন কেন চাও? আগে চাইতে পারনি? দেখছ না, ছেলে বড়ো হয়ে গিয়েছে?....এইসব মিলিয়েই তখন নিশাতের সুখ। শরীরে সুখ, মনে সুখ, স্বপ্নে সুখ, কল্পনায় সুখ।’-[উ.খে./পৃ.১০০]

নিশাত বানুর এমন সুখ কপালে বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ব্যক্তিগত শত্রুতা, সবদর ও হায়দারের নৌকা মার্কার পক্ষে সমর্থন থাকায় বাঙালি-বিহারির দ্বন্দ্বে পড়ে নিশাতের সুখের সংসার তছনছ হবার উপক্রম হয়। কারণ সত্তরের নির্বাচনকে ঘিরে গোটা সৈয়দপুরে বাঙালি ও বিহারিরা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মানসিকতায় স্থানীয় ও অভিবাসী বাঙালিদের সঙ্গে বিহারিদের মিল খায় না। বিহারিরা পাকিস্তানি সরকারের পক্ষে সমর্থন দেয় আর বাঙালিরা থাকে সরকারের বিপক্ষে। এমন পরিস্থিতিতে সবদর উভয়সংকটে পড়ে। কারণ বিহারি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করায় ‘বাঙালিরা তাকে বিহারী বলে এড়িয়ে থাকে, আর বিহারিরা তাকে বাঙালি মনে করে’। কিন্তু কলেজ পড়ুয়া ছেলে হায়দার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তাকে শেখ মুজিবের ডাকে আহুত হরতালে ট্রাক চালাতে নিষেধ করলে সে তা না মেনে পারে না। এমন পরিস্থিতিতেই সবদর তার ট্রাকে নৌকা চাপিয়ে আওয়ামী লীগের প্রচারণা চালায়। কিন্তু সুলেমান ও আনসারের চক্রান্তে এবার ট্রাকটা এমনভাবে ভেঙে চুরমার করা হয় যে, তা আর চলার উপযোগী থাকে না। তিন হাজার টাকার জন্য সবদর ট্রাক মেরামত করতে পারে না। ফলে-

> ‘সবদর আলী বিশ্রী ঝামেলায় পড়ে যায়। ট্রাক-বাসের ব্যবসাটা পুরোপুরি বিহারীদের হাতে। সে কারো কাছ থেকেই কোনোরকম সাহায্য পায় না।...কেউ কেউ ঠাট্টাছলে বলেও ফেলে–সালে তুম লোক কওম কি দুশমন, তমুহারা সাথ হামলোগকা কোই রিশতা নেহি রহেগা।’-[উ.খে/পৃ.১০২]

কিন্তু পঁচিশ মার্চ পাকবাহিনী বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে অনেক প্রতিবেশী পালালেও সবদর-নিশাত বাড়ি ছাড়ে না। সাতচল্লিশের যে-ভোটের রাজনীতি নিশাতের বাবা-মায়ের সংসারকে একদিন ধ্বংস করেছিল, সেই একই রাজনীতি একাত্তরে এসে নিশাতের হাতে গড়া স্বামী-সন্তান-সংসারকে নস্যাৎ করার উপক্রম হয়। হায়দার ও সবদর সৈয়দপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়। এ ভোটের রাজনীতি সম্পর্কে নিশাত খুব সতর্ক হয়। তাই নিশাত-

> ‘থেকে থেকে ঘরের দেয়ালে হাতটা রেখে আস্তে আস্তে বোলায়। ছেলেকে বলে, বাবু ডরাও কেনো-দেখে দুদিন, সবর করো...সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।’-[উ.খে./পৃ.১১২]

তিল তিল করে গড়া সংসারের মায়ায় ছেলে হায়দারের হুঁশিয়ারির পরেও নিশাত-সবদর বাড়ি ত্যাগ করে না। ছেলের বার বার তাড়া দেবার পরেও সবদর তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। চেনাজানা-প্রতিবেশীদের পালাতে দেখেও সবদর এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছায় আর নিজেই নিজেকে বলে-

> ‘কোথায় পালাবি সবদর আলী? এ তোর নিজের ঘরবাড়ি কেন পালাবি? এই ঘরবাড়ি সংসার কে দেখে রাখবে, যদি তুই ছেড়ে পালাস? ঘর সংসার কি একদিনে হয়?’-[উ.খে./পৃ.১১৩]

এমন সিদ্ধান্তের জন্য সবদরকে চরম মূল্যও দিতে হয়। কারণ এপ্রিলের তেরো/চোদ্দ তারিখে সন্ধ্যার পূর্বে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং-‘নারায়ে তকবীর’ ধ্বনি দিয়ে মাহবুব, আনসার, আফজাল খান, কুদরত ও ইসমাইলরা এসে সবদরকে গুলি করে মারে এবং বাড়িঘর লুটপাটসহ নিশাত বানুকে নিয়ে যায়। নিশাত নিজের বিপদ জেনেও একমাত্র পুত্র হায়দারকে বাঁচাতে দূর থেকেই চিৎকার করে বলে-

> ‘মেরে বাচ্চা কো মাত মারো–ও মেরে লাল তু ভাগ যা, তেরা জান বাঁচা।’-[উ.খে./পৃ.১১৬]

একাত্তরের এ রাজনৈতিক সংকটে পড়ে বহু মানুষের মতো নিশাত বানুরও স্বামী-সংসার ধ্বংস হয় এবং তার নিজের ভাগ্যেও জোটে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনা। নিশাত বানুর শেষ পর্যন্ত কী পরিণাম হয়–তা ঔপন্যাসিক জানাননি। তবে তার পরিণতি যে-নির্মম হয়েছিল–এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মামার আশ্রয়, প্রথম স্বামীর প্রতারণা ও প্রত্যাবর্তন

প্রত্যাশা এবং দ্বিতীয় স্বামীকে মানিয়ে নেয়া–জীবনের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠে নিশাত সংসার সাজিয়েছে, স্বামীকে রোজগারে উদ্যমী করেছে এবং সন্তানকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। এসব কিছুই নিশাত বানুর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসী ভূমিকাকেই উন্মোচিত করে। নিশাত নিজে না বাঁচুক অথচ নিজের সন্তানকে সে বাঁচিয়েছে। এভাবে আপন অস্তিত্ব সন্তানের মাঝে সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে নিশাত নিজের অসমাপ্ত যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যায়। উপন্যাসের মাঝ পথে এসে নিশাত বানু হারিয়ে গেলেও তার আত্মসংগ্রামের অনুসন্ধান ও জবাব নির্দেশ করা হয়েছে ‘উত্তরের খেপ’ ও ‘দক্ষিণে মোহনা’ অংশে। তাই নিশাত বানুর নিজের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যতিক্রমী সংশ্লেষ এই উপন্যাসের প্রধানতম আকর্ষণ।[৪২] দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাতে নিশাত বানুর পিতা, পতি ও পুত্রের জীবন-সংসার বিপন্ন হয়। তার আজন্ম সুখ ও স্বপ্নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়ায় শুধু রাজনীতির সংকট নয় বরং শত্রুর মতো প্রেম, পতি ও প্রতিবেশী।

অন্যদিকে নিজের জন্মস্থান থেকে ভেসে আসা সবদর পূর্ব পাকিস্তান নামক নতুন ভূখণ্ডে আশাহত হয়েও বেঁচে থাকতে পারতো। কিন্তু তা না হয়ে সেও এ উপমহাদেশের অমীমাংসিত রাজনীতির শিকার হয়েছে। সবদর পূর্ব পাকিস্তান নামের নতুন ভূখণ্ডে শেকড় বসানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বহু ঝড়ঝাপ্টার পরও সংসার সাজিয়ে বসেছে। প্রথম জেনারেশনের অভিবাসী সবদরের ভেতরে কিছুটা হলেও নিরাসক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল। তারপরও সবদরের ভেতরে টিকে থাকার জন্য অসম্ভব এক প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৩] সবদরের এমন নির্মম পরিণতির জন্য রাজনীতির অভিঘাতের পাশাপাশি এক ধরনের মনোবৈকল্যজাত ট্রমাও দায়ী। সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় দেখা যায়, জন্মভূমি পরিত্যাগের পরপরই অভিবাসীদের মনে নানা ধরনের ট্রমা তৈরি হয়। প্রচণ্ড ট্রমার কারণে অভিবাসীদের মনে মনোবৈকল্য ও বিকার দেখা দেয়। জলপাইগুড়ি থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা সবদরের মানসলোকেও এ ট্রমাজাত বিকার বিস্তার লাভ করে। ফলশ্রুতিতে সে অনেকটা সজ্ঞানেই নিজের করুণ পরিণতিকে বরণ করে নেয়।

ম্যাট্রিক পাশ করা কলেজপড়ুয়া হায়দার একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। হায়দার ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদে নিজেকে ঋদ্ধ করে তোলে। এ জন্যই বিহারি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করেও সকল ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে আত্মনিয়োগ করে। এর পরিণাম হিসেবে পরিচিত জনদের মাধ্যমেই চোখের সামনে বাবা সবদরের নির্মম মৃত্যু এবং মা নিশাত বানুকে প্রথম স্বামী কর্তৃক অপহৃত হতে দেখে। এমন চরম বিপদের মুহূর্তে– ‘সে বারান্দা থেকে লাফ দেয় উঠোনে, তারপর মুরগির খোঁয়ারের মাথায় পা রেখে পাঁচিল ডিঙায়। পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কচুবন–ঐ কচুবনের ভেতরে কাদামাটির ওপরে সে শুয়ে থাকে কয়েক মিনিট।’ পরে হায়দার বাড়ির পাশের আমবাগানে লুকায় এবং আমগাছ থেকে দেখে বাড়িঘর লুটপাট ও মা নিশাত বানুকে টেনে-হিঁচড়ে অপহরণের দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখে তার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে । আর তাই-

> ‘সে গাছ থেকে নেমে সেই আবছা আলোর মধ্যেই ইটের টুকরো বার করে কয়েকটা। তারপর একের পর এক ছুঁড়তে থাকে লোকগুলোকে লক্ষ্য করে।’-[উ.খে./পৃ.১১৬]

হায়দার মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যেও প্রতিবাদস্বরূপ ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারে। কিন্তু এর জবাবে গুলি চললে মা নিশাত বানুর কথায় হায়দার পিছিয়ে যায়। পরবর্তীকালে সে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়। জুলকারনাইন, শহীদুল ও সুবিনয়ের সঙ্গে নয় মাস লড়াই করে দেশস্বাধীনের পর বাড়ি ফিরে। কিন্তু নিজের বাড়ি সে চিনতে পারে না। এক বিহারি বাড়িটা তখনো দখল করে রেখেছিল। যুদ্ধে যাবার সময় বাবার ফুলে ওঠা লাশ রান্নাঘরের টিনখুলে চাপা দিয়ে নিশানা করে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসে দেখে-

> ‘মা নেই, ট্রাকখানাও নেই।...টিনগুলো চুরি হয়ে যায়, আর বাবার হাড়-হাড্ডি পথে পথে পড়ে থাকা অসংখ্য লাশের হাড্ডির সঙ্গে মিশে যায় একাকার হয়ে। হাতের রাইফেল সে তখনো ছাড়েনি। সুলেমানের মাকে সে খুঁজে বার করে।’-[উ.খে./পৃ.১১৭]

কিন্তু সুলেমানের মা ও আফজাল খান নিশাত বানুর কোনো সন্ধান দিতে পারে না। হতাশ হায়দার এবার ট্রাক ফিরে পাবার উদ্যোগ নেয়। ভারতীয় হাবিলদার মনোরঞ্জনের সহযোগিতায় ট্রাকখানা সে ফিরে পায়। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মানসিক অশান্তি দূর করতে বাবার পেশা ট্রাকড্রাইভারিতেই আত্মনিয়োগ করে। বাবা-মা ও একমাত্র আশ্রয় বাড়িঘর হারিয়ে হায়দার মীর আবেদের গ্যারেজে ট্রাক রেখে ট্রাকের ভেতরেই রাতে ঘুমায়। কিন্তু তা মীর আবেদের নজর এড়ায় না। হায়দারের প্রতিভা, ভেতরের তেজ ও সততায় মুগ্ধ হয়ে মীর সাহেব তাকে মীরমঞ্জিলে আশ্রয় দেন। একবছর ঘুরতে না ঘুরতেই নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া নাতিন সুন্দরী মরিয়মের সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু মরিয়ম এ বিয়েকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। কারণ একমাত্র বাবা-মা হারানো ব্যতীত আর কোনো বিষয়ে দুজনের মিল ছিল না। ফলে দ্রুত দাম্পত্যসংকট প্রবল হয়ে ওঠে। মরিয়মও পূর্ব প্রেমিক খালাতো ভাই আজহারের প্রতি অনুরক্ত হয় । এর জন্য হায়দারের উদাসীনতাও অনেকাংশে দায়ী।

হায়দারের প্রশ্রয়েই গানের বই উপহার, সিনেমা দেখা ও বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে কূটকৌশলে চতুর আজহার জ্যোৎস্না রাতে ছাদের উপরে মরিয়মকে প্রথম চুমু খায়। আর এভাবে-

> 'আজহারের হাত মরিয়মের শরীরের পথ চিনে গেছে। যেমন সন্তর্পণ, তেমনি কুশলী তখন আজহার।...ভয়ানক এক নিষিদ্ধ খেলায় শরিক হতে হতে মরিয়মের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি বদলে যেত।'-[উ.খে/পৃ.১৩৫]

শেষে দাদার মৃত্যু ও ছেলে মিঠুর জন্মের পর প্রতারক-লম্পট আজহারের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর এক প্রখর চৈত্রের নির্জন দুপুরে মীর মঞ্জিলের অন্দর মহলে সুযোগসন্ধানী আজহার-

> 'দু'বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে ধরল মরিয়মকে।...তারপর চুমু খেল। মরিয়ম একসময় বলল, না। তারপরও বলল, না। তারপরও বলল, না। কিন্তু সেই না, এর এমন কি সাধ্য আছে যে এক বছর ধরে তৈরি করা আয়োজনকে বাধা দিতে পারে?'-[উ.খে./পৃ.১৬৪]

ফলে আজহারের ভোগের বাসনায় মরিয়মকে সিদ্ধ হতে হয়। প্রথম দু-একদিন মরিয়ম নিজেকে গুটিয়ে রাখলেও আজহারের জন্য ক্রমশই মরিয়া হয়ে ওঠে। আজহার সিনেমার কায়দায় বিষের পুরিয়া মরিয়মের হাতে দিয়ে তার মুখে ঢেলে দিতে বলে। চতুর আজহারের আত্মঘাতী হবার অভিনয়কে সত্য মনে করে মরিয়মও ফাঁদে পা দেয়। হায়দারও সিনেমার পোকা সুন্দরী স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ নিতে ব্যর্থ হয়। স্ত্রী সম্পর্কে তার ধারণা হয়-

> '৭৩-৭৪ সালের কথা। ...তখন মনে হত মরিয়মের মনের ভেতরে আরাম-বিলাসের লোভ ছিল আসলে। আর ছিল বেপরোয়া হবার সাধ। সংসারের নিয়ম কানুন ভাঙতে পারাটাকেই মনে করত বড় কাজ। পোশাকে-আশাকে, চলনে অন্যের চোখে আলাদা হবার ইচ্ছেটা তার দুরন্ত হয়ে উঠেছিল ঐ সময়।'-[উ.খে./পৃ.৬৫]

হায়দারের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। মরিয়ম দুই বছরের ছেলে মিঠুকে জোর করে নিজের কাছে রাখে এবং ছেলের পিতৃত্বের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। হায়দারকে তীব্র আঘাত করতে মরিয়ম বলে-

> 'আর কখনো এ বাড়িতে...কোনো দাবি নিয়ে আসতে পারবে না। ছেলেকে চাইতে হলে কোর্টের মারফত চেয়ো। ...ও ছেলে তোমার নয়–ইডিয়ট, যদি চোখ থাকত, তাহলে ঠিকই দেখতে পেতে।'-[উ.খে/পৃ.১২৪]

আহত, পরাজিত হায়দার মারখাওয়া কুকুরের মতো মীর মঞ্জিল থেকে বেড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর কাছ থেকে চরম আঘাত আর অপমানের এক শেষ হয়ে হায়দার তুমুল বৃষ্টির রাতেই ঢাকায় আসে। আর মরিয়ম প্রেমিক খালাতো ভাই আজহারকে বিয়ে করে পুনরায় সংসার শুরু করে। দীর্ঘ সাত বছর পর উত্তরের খেপ নিয়ে রংপুরে এসে হায়দারের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভেসে ওঠে। এখানে এসেই গাড়িতে রাখা লাল্টু মহাজনের পাঠানো সেরখানেক 'নারকোটিকস' মাদক পাচারের সন্দেহে হায়দার ও সহকারী ফোকলা গফুরকে পুলিশ থানায় নেয়। হায়দারকে যে পুলিশ কর্মকর্তা এরেস্ট করেন, মুক্তিযুদ্ধে-

> 'হিলি থানা দখল করার সময় এই লোকই সারেন্ডার করেছিল। লোকটার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ছিল। সুবিনয় খতম করার জন্য বন্দুক তুললে হায়দারই বাধা দেয়।'-[উ.খে./পৃ.৯৩]

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মুক্তিযোদ্ধা হায়দারকে পাকিস্তানপন্থী রাজাকার সরকারি কর্মকর্তার হাতে বন্দি হতে হয়। যাকে দয়াবশত হায়দার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। যা একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আমলা, সরকারি চাকরিজীবীদের পুনর্বহাল ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাপটকে ইঙ্গিত করে। হায়দার সাবেক স্ত্রী মরিয়ম ও তার চাচাশ্বশুর মীর জাহানের ব্যবস্থাপনায় জামিনে মুক্তি পায়। সাবেক স্ত্রীর বাসস্থান সৈয়দপুরে এসে হায়দারের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাত বছর পূর্বের যেসব বিষয় সে কবর দিয়ে রেখেছিল, তা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। যা জড়িয়ে আছে– 'ঘৃণার সঙ্গে ভালোবাসার, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রলোভনের'। জীবনের এ বিচ্ছেদ-বিরহ-বেদনার জন্য এককে বার হায়দার নিজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পিতা-মাতার বেআইনি-বেশরিয়তি বিয়ের পাপ ও রাজনীতির পাপকে দায়ী করে। তার সন্দেহ হয়-

> 'নাকি পাপ ছিল কোথাও? পাপ ছিল তার বাপ আর মায়ের মিলনে?...নাকি সেটাও নয়? আরো দূর থেকে পাপের সূচনা হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতারা যে পাপ করেছিলেন...হায়দারেরও কি তাহলে পাপ ছিল? হ্যাঁ, পাপী সে, অবশ্যই পাপী। পাপ তার জীবন বাঁচানোর কৌশল।'- [উ.খে./পৃ.১১৫]

হায়দারের এ দাম্পত্যবিচ্ছেদ, পারিবারিক বিপর্যয় ও বাবা-মায়ের নির্মম পরিণতির জন্য ধর্মীয় পাপাচারের চেয়ে রাজনৈতিক পাপাচারই বেশি দায়ী। কারণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই এ ধরনের অশুভ-অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের পথকে সুগম করে দেয়। এমন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েই তার মা নিশাত বানু ট্রাকড্রাইভার সবদরকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। হায়দারকেও লাঞ্ছনার কবলে পতিত মাকে ফেলে জীবন বাঁচাতে পলায়ন করতে হয়। তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মরিয়মের উদ্যোগে সাত বছর পর হায়দার ও মরিয়ম পুনরায় মুখোমুখি হয়। মরিয়মের কথায় সাত বছর পূর্বের সেই ঝাঁজ নেই বরং সমর্পণের আনত ভঙ্গিতেই সে কথা বলে। সে তার মিশন রোডের বাড়ি ও ছেলে মিঠুর দায়-দায়িত্ব বুঝে নেবার আহ্বান

জানায়। দ্বিতীয় সংসারে মরিয়ম একদিনের জন্যও সুখী হয়নি। কারণ– 'প্রথম দিন থেকেই শুরু। সুখের সংসার পাতার প্রথম রাতেই আজহার বিছানা ছেড়ে ওঠে যায়। বলে বাচ্চাকাচ্চা ঘরে থাকলে আমার ঘুম আসে না।' আসলে একে উপলক্ষ করে আজহার ঘর থেকে তিন বছরের মিঠুকে সরিয়ে দেয় এবং নিজের ভোগের বিছানাকে নিরবচ্ছিন্ন-নিরুপদ্রব করে। প্রথম রাতেই মরিয়মের কাছে আজহারের মুখোশ উন্মোচিত হয়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিশুপুত্র মিঠুকে পাশের কক্ষে রাখতে বাধ্য হয় এবং স্বামী আজহারের ভোগের কাছে নিজেকেও সমর্পণ করতে হয়। কারণ-

> 'নিজের জেদ আর খেয়ালের বশে তার প্রথম ঘর ভেঙেছে, দ্বিতীয়বার ঘর ভাঙলে সে কোথায় দাঁড়াবে?'-[উ.খে/পৃ. ১৩১]

তাই এমন পরিস্থিতিতে কূটকৌশলী আজহার মীর ট্রান্সপোর্ট ও মীর ওয়ার্কশপের মধ্যে বিবাদ লাগালেও মরিয়ম মুখ বুজে সহ্য করে। হায়দার তার মিশন রোডের বাড়িটি ছেলে মিঠুর পক্ষে চাচাশ্বশুর মীর জাহানের নামে পাওয়ার অব এটর্নি করায় আজহার আরো মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই সন্তান মিঠু ও সাবেক স্বামী হায়দারের জীবনের আশঙ্কায় মরিয়ম তার চাচাকে বলে-

> 'চাচা, ওকে আপনি এ শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন না?...আমি ওকে ত্যাগ করতে চাই।'-[উ.খে./পৃ. ১৮৫]

তারপরেও আজহার টাকার জন্য নিজের মেয়ে মুন্নিকে অপহরণ করে। পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে মরিয়ম মেয়েকে উদ্ধার করে। এসব নিয়ে মরিয়মকে উভয় সংকটে পড়তে হয়। কারণ-

> 'প্রশ্নটা তো শুধু সন্তানদের নিরাপত্তারই নয়, সেই সঙ্গে আবার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার। যদি একটা পেতে চায়, তাহলে আরেকটা হারাতে হয়। সে নিজেকে প্রশ্ন করে, তুই কী মরিয়ম? স্ত্রী না মা?'-[উ.খে./পৃ. ২০২]

জায়া ও জননী সত্তায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে মরিয়ম অথৈ সাগরে পতিত হয়। আবার আজহারের চক্রান্তে হায়দার গুরুতর দুর্ঘটনার কবল থেকে বেঁচে উঠলে এবং বান্ধবী রোমেনার মাধ্যমে পুনরায় সংসার পাতার প্রস্তাব দিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়। এ অবস্থায় মরিয়ম আজহারকে তালাকের ভয় দেখালেও সে ভীত হয় না। বরং আজহার জোর করে স্বামীর অধিকার আদায় করে নেবার এবং একই বিছানায় ঘুমানোর ঘোষণা দেয়। যেহেতু পরস্পর পরস্পরকে চিনে ফেলেছে, তাই আজহার আর লুকোচুরি না করে বলে–

> 'শরীর-মন, বাড়িঘর, ধনসম্পদ সব আমার দরকার।...আর মানুষ চিনতে যদি আমার ভুল না হয়, তাহলে ওকে (মিঠুকে) তুমি বেশি ভালোবাস এবং ওর (মিঠুর) বাবাকে তুমি এখনো ভালোবাস।'-[উ.খে./পৃ. ২০৮]

মানুষের মনকে চেনা ও উপলব্ধিতে ধরার ক্ষেত্রে লোভী-পাপাত্মা আজহার একেবারে জহুরির পরিচয় দেয়। তাই সে মরিয়মের মানসিকতা প্রসঙ্গে বলে-

> 'স্বামীকেও চাও, আবার নাঙকেও চাও। শরীরের গরম মেটাবার জন্য তুমি আমাকে মনে ঠাঁই দিয়েছিলে। শরীর তৃপ্ত থাকলে তুমি আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে–তারপর শরীর যখন শান্ত হল তোমার, তখন দেখলে বড়ো ভুল করে ফেলেছ। তাড়িয়ে দেওয়া স্বামীর জন্য তোমার দরদ উথলে উঠল।'-[উ.খে./পৃ. ২০৫]

মরিয়মের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক হলেও আজহারের এসব কথা অনেকটাই ছিল যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক। বয়সের কৌতূহল, উচ্চাভিলাষী মনোভাব, বেপোরোয়া জীবন-স্বপ্নে মগ্ন থেকে শরীরী উত্তাপকে প্রাধান্য দেয়াতে মরিয়মের জীবন নরক হয়ে ওঠে। সাধের প্রেম ও প্রেমিকই তার প্রাণের শত্রুতে পরিণত হয়। তাই রাতের বেলা আজহার মরিয়মকে জোর করে তার কক্ষে নিতে গেলে ঝগড়া ও টানাহেঁচড়া শুরু হয়। শক্তি ও শারীরিক জোরে মরিয়ম আজহারের সঙ্গে পেরে ওঠে না। সে মরিয়মকে প্রথমে বিবস্ত্র করে, তারপর মেঝের ওপর ফেলে বলাৎকার করে। এক বিরাট বাধা অতিক্রম করার আনন্দে আজহার ঘুমিয়ে পড়লে অপমানিতা-লাঞ্ছিতা মরিয়ম ওঠে দাঁড়ায় আর-

> 'নিজের ঘরে গিয়ে খাটের তলায় বাকসে রাখা ছুরিখানা বার করে। ঐসময় চোখে পড়ে তার দুই সন্তান ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার তখন কান্না পায়। ছুরিখানা বাকসে রেখে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদে। তারপর বিছানায় উঠে গিয়ে দুই ছেলেমেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে সে।'-[উ.খে/পৃ. ২০৮]

এখানে মরিয়মের জননী সত্তার কাছে জায়া সত্তা পরাভূত হয়। অবুঝ সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বর্বর-পাষণ্ড আজহারকে হত্যা করা থেকে বিরত হয়। এমন পরিস্থিতিতে মরিয়ম হায়দারকে পুনরায় মিঠুর দায়িত্ব নিতে বলে। একমাত্র ছেলে মিঠুর জীবনের আশঙ্কার কথা শুনেও হায়দার পূর্বের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকে। নিজের বাড়ি ও ছেলে মিঠুকে দেখে হায়দারের মাঝে অতীত স্মৃতিমুগ্ধতা বা নস্টালজিয়া ভর করে। তার মনে পড়ে-

> 'এই শহরের মাটিতে মিশেছে তার মা আর বাবার রক্তমাংস হাড়হাড্ডি। এই শহরের রাস্তায়, আমের বাগানে, খেলার ময়দানে, তার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের হাজারটা স্মৃতি হাজারভাবে ছড়ানো।...একি শিকড়ের টান?'-[উ.খে./পৃ. ১১৫]

নিজের শহরে এসেও হায়দার নির্বিঘ্নে সময় কাটাতে পাড়ে না। কারণ স্বার্থহানি ঘটায় আজহার হায়দারকে শায়েস্তা করতে স্থানীয় মাস্তান বন্ধু রাজাকার সলিমুল্লাহকে লেলিয়ে দেয়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এ সলিমুল্লাহর মতো রাজাকারেরাই

স্বাধীনতার সুফল পুরোটা দখল করে নেয়। আর একাশি-বিরাশি সনের স্বৈরশাসনের প্রেক্ষাপটে এসে এ স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের দুর্নীতি, দাপট ও ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধা হায়দার ও জুলকারনাইনদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। দুই বন্ধু চা খেতে খেতে একাত্তরের এনামেলের ডাব্বা মগের প্রসঙ্গ তুলে। আর আক্ষেপ করে বলে-

> 'এই তাহলে আমাদের পরিণতি? যুদ্ধ করেছিলাম তার প্রমাণ এখন একটা ফুটো মগ। সে তো সেই প্রথম দিকেই। যুদ্ধ শেষ হলে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাদের হাতে ফুটো মগ ধরিয়ে দেওয়া হল।'-[উ.খে./পৃ. ১৬৬]

তাই মুক্তিযুদ্ধে দুই পা হারানো জুলকারনাইন দোকান দিয়ে সংসারী হয়েছে। আর হায়দার ঘরবাড়ি হারিয়ে, সংসার ছেড়ে অবশেষে ট্রাকড্রাইভার হয়েছে। জুলকারনাইন হায়দারকে আবার সংসারী হতে অনুরোধ করলে সে জানায়-

> 'সবার ঘর হয় না জুলু। আমার বাবা-মার শেষ পর্যন্ত হয়নি–আমারও হল না।...ব্যাপারটা লড়াইয়ের। লড়াই করলে কেউ হারে, কেউ জেতে। কিন্তু আমরা সংসারে এসে লড়াইটাই করলাম না, আর তাতেই দেখছি, আমরা হেরে গেছি। যারা পথে ছিলাম, তারা পথেই রয়ে গেলাম–ঘরে গিয়ে ঢুকবার মতো আর আমাদের সময় নেই।'-[উ.খে/পৃ. ১৯৩]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুষ্ট ক্ষত, ক্ষমতার পালাবদল ও স্বৈরতন্ত্রের অভিঘাতে হায়দারের মতো হাজারো মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সংগ্রামে জয়ী হলেও জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়। মৃত্যুর দোরগোড়ায় থেকে ফিরে মানুষের মৃত্যুর স্বরূপ নিয়ে হায়দারের উপলব্ধি হয়-

> 'যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, ঝড়, বন্যা–এসব থাকলেও না থাকলেও মানুষ স্রেফ মরে যায়। কোনো কারণ থাকার দরকার পড়ে না।'-[উ.খে./পৃ. ১৭৮]

এমন পরিস্থিতিতে মরিয়মের পূর্বেকার কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, আজহারকে তালাক দিয়ে পুনরায় তাকে বিয়ে করে সংসারী হবার প্রস্তাব শুনেও হায়দার তেমন অবাক হয় না। 'ব্যাপারটা অতই সোজা'–বলে হায়দার তার নেতিবাচক মনোভঙ্গির কথা জানায়। আর সাবেক স্ত্রী মরিয়মের প্রসঙ্গে বলে-

> 'এক সময় ওকে আমি ভালোবেসেছিলাম। স্ত্রী বলে নয়, এমনিতেই বোধ হয় ও জানেও না–কিন্তু এখন?...মনের ভেতর তেমন কিছু আর অনুভব করি না। ওর জীবন একদিকে, আমার জীবন অন্যদিকে। মাঝখানে অবশ্য আজহার আছে। কিন্তু ও যদি নাও থাকে, তবু আমার মনে সে আবেগ আর জাগবে না। ওকে এখন পরস্ত্রী বলেই আমার মনে হয়।'-[উ.খে./পৃ.১৯৪]

সময়ের আবর্তে মরিয়মের প্রতি হায়দারের প্রেম-ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। যা *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র শশী ডাক্তারের প্রতি কুসুমের প্রেমানুরাগের অনুরূপ। মরিয়ম হায়দারকে ছেলে মিঠুর পড়াশোনার দায়িত্ব ও সম্পত্তি দেখভালের অনুরোধ করলেও প্রতিউত্তরে সে বলে-

> 'ওর বাবার কোনো আশ্রয় ছিল না, ওরও রইল না, তাতে কিছু আসবে যাবে বলে আমি মনে করি না, ওকে আঘাত খেতে দাও, আঘাত খেতে শিখলে ও বেঁচে যাবে।...আমাকে হিসেবের মধ্যে ধরো না, আমি বেঁচে নেই।'-[উ.খে./পৃ.২১০-১১]

জীবনে পোড়খাওয়া হায়দার শারীরিকভাবে বেঁচে থাকলেও বহু পূর্বেই তার মানস-মৃত্যু ঘটে। তাই হায়দার ছেলের দায়-দায়িত্ব না নিয়ে বরং সহকারী ফোকলা গফুরের মৃত্যু নিয়ে কাতরতা প্রকাশ করে। আর মরিয়মকে কষ্ট হলেও দ্বিতীয় স্বামী আজহারের সঙ্গে মানিয়ে নেবার পরামর্শ দেয়। আর ছেলের দায়িত্বভার গ্রহণের প্রশ্নে বলে-

> 'সংসারে থাকাটা খুব মুশকিল, ওর ভেতরে ঢুকতে আমার একদম ইচ্ছে করে না, বোধ হয় পারবও না।...আমাকে ভুল বুঝো না, মিঠু তার মায়ের কাছেই থাকবে...মরিয়মের ছেলে মরিয়মেরই থাকবে।'-[উ.খে./পৃ.২১৩]

এ কথার মাধ্যমে কেবল ছেলের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতিই হায়দারের উদাসীনতা প্রকাশ পায়নি বরং ঘর-সংসারের প্রতি নিরাসক্তি-বিবাগীভাবও পুরো মাত্রায় উন্মোচিত হয়েছে। আবার হায়দার নিজেকে-'দুনিয়ার দল ছুট মানুষ' বলে অভিহিত করে। ছেলে মিঠু তাকে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে আসলেও হায়দার সম্মত হয় না। কারণ তার মতো– 'মানুষের পক্ষে কারোর দয়া নেওয়া অসম্ভব।' তাছাড়া একই জায়গায় বসবাস করলে পুরনো প্রেম-ভালোবাসা জেগে উঠবে এবং মিলিত হবার ইচ্ছে হলেও মাঝখানের বিদ্যমান দেওয়াল ভাঙা সম্ভব হবে না। আর ভাঙতে গেলেও তা হবে পাপের নামান্তর। তাই সে জীবনে বার বার পাপ করে প্রায়শ্চিত্ত ও বিবেকের দংশনে দ্বগ্ধ হতে চায় না। এসময় ভারতে দুই ট্রাক চোরাইমালসহ ধরা পড়ায় আজহারের দশ বছরের জেল হয়। এতে মরিয়ম প্রথমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও পরক্ষণে নিজেকে নিঃস্ব, নিরবলম্ব, নির্লক্ষ্য ও নির্বান্ধব বলে মনে। কারণ-

> 'শেষ পর্যন্ত কি কেউ-ই তার আপন বলে থাকবে না? যে লোকটিকে ভাগ্য তার কাছে এনে দিয়েছিল, তাকে সে নিজে তাড়িয়ে দিয়েছে। যাকে সে নিজে দুহাতে কাছে টেনে নিয়েছে, সে এখন শত্রুরও বড়ো।'-[উ.খে/পৃ.২২১-২২২]

জীবনের চরম এ ক্রান্তিলগ্নে মরিয়মের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটতে চায় না। কারণ একসময়ের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি আজ বাঞ্ছিততে পরিণত হয়েছে, আর বাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়েছে অবাঞ্ছিত। এর জন্য একেক সময় মরিয়মের মনেও পাপ চিন্তার উদয় হয়। কারণ-

> 'তার কেবলি মনে হয়, পাপ ছিল শুরুতেই, সেই পাপেরই অনিবার্য ফল এসব। এখন পাশ কাটানোর কোনো উপায় নেই–এসবের সংশোধনও আর সম্ভব হবে না। এক এক করে সবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচতে থাকবে।'-[উ.খে/পৃ.২২২]

বহুদিন পর মরিয়ম যৌবনের প্রথম প্রহরের দিকে ফিরে তাকায় আর প্রেমের নামে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ব্যভিচারবৃত্তির আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের জন্য অনুতপ্ত হয়। তবে এ ঘোর পরিস্থিতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এসময় নিজেদের মীর ট্রান্সপোর্ট ও মীর ওয়ার্কশপের কর্মচারীরা বকেয়া বেতন-ভাতার জন্য আন্দোলনে নামলে মরিয়ম সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। দুটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলে-

> 'কাল মাইনে পাবেন সবাই। আপনারা কাজ করুন।'-[উ.খে/পৃ.২২৪]

মরিয়মের উদ্যোগ ও তৎপরতায় তিন দিনে মীর ট্রান্সপোর্ট ও ওয়ার্কশপে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। মরিয়ম সশরীরে অফিসে গিয়ে সমস্ত কাজ তদারক করায় সে নিজের মধ্যে এক ধরনের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কারো মা, কারো বউ, কারো প্রেমিকা পরিচয় ছাপিয়ে মরিয়ম এক নতুন কর্তৃত্ববাদী সত্তায় অভিষিক্ত হয়। তাই মরিয়ম-

> 'তার যে কিছু ক্ষমতা আছে, সেটা সে দিব্যি টের পায় আজকাল। তার হুকুম মতো দুদুটো প্রতিষ্ঠান চলছে। নিজের এই ক্ষমতাটা যে তারই মধ্যে ছিল সেটা কি সে জানত?'-[উ.খে./পৃ.২২৫]

'গিন্নী মরিয়ম' থেকে 'কর্ত্রী মরিয়ম'-এ উত্তরণের বিষয়টি সমকালীন সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের দিকটি ঔপন্যাসিক নিপুণভাবে ইঙ্গিত করেছেন। যা নারীর জাগরণ, আত্মশক্তিতে বলীয়ান, আত্ম-আবিষ্কার ও সত্তাসন্ধানী প্রবণতার শুভ সংকেতস্বরূপ। বিদায় নিতে এসে হায়দার মরিয়মকে বলে-

> 'তোমাকে দেখার সাধ হয়েছিল–অফিসে বসলে তোমাকে কেমন দেখায়, সেটা দেখতে ইচ্ছে করছিল।...আমি আবার আসব, তুমি ভালো থেকো; মানুষের জীবন এমনই–কখনো নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না।'-[উ.খে./পৃ.২৩৯-২৪০]

নিজেকে খুঁজে পাবার দায় ব্যক্তির একার নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রকেও এর কিছু দায় নিতে হয়। হায়দার হয়তো এ পরিস্থিতে নিজেকে খুঁজে পেতে পারে, আবার নাও পারে। ঘটনা পরম্পরায় আমাদের মনে এই আশঙ্কা জাগে যে, মিঠুও হয়তো হায়দারের মতো এক ছিন্নমূল জীবন যাপন করবে। সেও নিজেকে খুঁজে ফিরবে সারাজীবন। মানবিক এই সংকটের কারণে মানসিকভাবে হয়তো আরোও বহু প্রজন্ম উন্মূল থেকে যাবে। নেতিবাচক এ বহমানতা মঙ্গলজনক নয়।

প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী বাবা ও মায়ের মতো দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসী হায়দারও দিনাজপুর শহরে এসে ভেসে বেড়ায়। অভিবাসনজাত প্রচণ্ড ট্রমার কারণেই মুক্তিযোদ্ধা হায়দার স্বজনহীন শূন্য বেহাত হয়ে যাওয়া বাড়িটি উদ্ধার করে না, স্ত্রী মরিয়মের সঙ্গে দাম্পত্যসংকট তৈরি হলেও প্রতিকারস্বরূপ কোনো উদ্যোগ নেয় না, একমাত্র উত্তরাধিকার পুত্র মিঠুকে রেখে ঢাকায় চলে গেলেও সাত বছরে কোনো খোঁজ নেয় না এবং সাত বছর পর সাবেক স্ত্রী মরিয়ম পুনরায় ঘরবাঁধা, বাড়ি ও পুত্রের দায়িত্ব বুঝে নেবার প্রস্তাব দিলেও এড়িয়ে যায়– এসবকে পর্যায়ক্রমে হায়দারের জীবনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নিরাসক্তি হিসেবে শনাক্ত করা যায়।[৪৪] মানসলোকের এ নিরাসক্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিস্পৃহতার কারণেই হায়দার নিরন্তরভাবে শেকড় ও ঠিকানা সন্ধান করে হয়রান হয়। ফলে দেশে থেকেও হায়দারের দেশহীনতা, ঘরে থেকেও ঘরহীনতা কিংবা পরিচয় থাকা সত্ত্বেও পরিচয়হীনতার সংকট মজ্জাগত হয়ে ওঠে। এ কারণেই নিজের সন্তান মিঠুর প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা-স্নেহ লালন করেও সে অনায়াসে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে।

যদিও উপন্যাসের শেষে দেখা যায় শরীরের দিক থেকে হায়দার বেঁচে রইলেও তার মনটি আর বেঁচে নেই। এখানে সে যেন *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র শশীর দোসর।[৪৫] একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের সমান্তরালে হায়দারের ব্যক্তিজীবনের যুদ্ধ–সংগ্রামও সংঘটিত হয়েছে। বাবা-মা হারিয়েও বিচলিত হায়দার দেশের প্রয়োজনে পরিণত হয় মুক্তিযোদ্ধায়। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধার প্রকাশ বা পরিচয় কোথাও তেমন আড়ম্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়নি। আবার উত্তরের মাটিতে হায়দারের যে-নাড়ি প্রোথিত সেখানেও সে আজ নিরবলম্ব। স্মৃতি ও স্বপ্নের উত্তরপ্রান্ত যখন হায়দারকে ধরে রাখতে পারে না, তখন দক্ষিণের স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না।[৪৬] তাই হায়দারকে ঔপন্যাসিক নিছক ট্রাকচালক হিসেবে সীমিত করে রাখেননি বরং তার শিক্ষা, রুচি, মনস্তত্ত্ব ও জীবনদর্শনের পশ্চাৎপটটিও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। তাই ট্রাকচালক প্রতীকে হায়দার একজন দলছুট মানুষ। ফলে সে তার জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেবল দৌড়ে বেড়াতে চায়। ট্রাকটি তার এ জীবনপথের সঙ্গী।[৪৭] হায়দারের এই একা পথে এগিয়ে চলার সঙ্গে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী-অপরাজিত* উপন্যাসের অপু চরিত্রটির। অপু যেমন কাজলের মাঝেই নিজের শৈশবকে খুঁজে পেয়েছিল, আবার কাজল থেকে সে সরে গিয়েছিল অন্য পৃথিবীর পথে। অনুরূপভাবেই হায়দার পুত্র মিঠুর দায়িত্ব তার মায়ের কাছে দিয়ে জীবনের খোঁজে সে পথে বেরিয়ে পড়ে। অপু চরিত্রের বিপুল দার্শনিকতা হায়দারের চরিত্রে অনুপস্থিত থাকলেও এ চরিত্র নির্মাণে শওকত আলী বোধ হয় অপুর দ্বারা

অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কারণ উভয় চরিত্রেই আবেগময়তা প্রবল। কিন্তু শেকড় সংলগ্নতা কম। ঔপন্যাসিক মূলত হায়দার চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজেকে খোঁজার প্রয়াস চালিয়েছেন।

উত্তরের খেপ-এর কাহিনি বিস্তৃতির দিক থেকে সেলিনা হোসেনের *গায়ত্রী সন্ধ্যা*-র সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। *উত্তরের খেপ*-এর কাহিনি সাতচল্লিশ সন থেকে আশির দশক জুড়ে গড়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে *গায়ত্রী সন্ধ্যা*-র কাহিনি সাতচল্লিশ সনে শুরু হলেও পঁচাত্তর সনে এসে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উভয়েই দীর্ঘ কাল পরিসরের রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সমাজবাস্তবতা ও জীবনচেতনার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে সেলিনা হোসেন যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে মূল ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন, সেখানে শওকত আলী গুরুত্ব দিয়েছেন মূলত অভিবাসী নিম্নবিত্ত শ্রেণির নানা সংকটকে। সমকালীন উত্তপ্ত রাজনীতির সমান্তরালে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসংকট ও জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবিই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ন্যারেটিভ ফর্মে রচিত উপন্যাসটিতে হায়দারের চেতনাকোণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আন্তরিক প্রতিচ্ছবি। সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে পঞ্চাশের দাঙ্গা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এমনকি কোরিয়া যুদ্ধের প্রভাব পর্যন্ত হায়দারের তিন পুরুষের ইতিহাস ধরা পড়েছে এ উন্যাসে। জীবনবাদী লেখকমাত্রই উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে বেশি নিরীক্ষাপ্রবণ হন না। শওকত আলীর *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটিও জীবনের অনিবার্য উত্তাপে ব্যঞ্জিত।[৪৮] সময় ব্যবহারে শওকত বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চলিষ্ণু সময় *উত্তরের খেপ* উপন্যাসের এক নিয়ামক শক্তি। ঔপন্যাসিক একজন দার্শনিকের মতো অতীতের কথা বলতে বলতে বর্তমানে এসেছেন, আবার বর্তমানের কথা বলতে বলতে গেছেন অতীতের ফেলে আসা দিনের এক ভাবমেদুর নস্টালজিয়ায়। এই উপন্যাসের নিয়ামক যেন সময়। সেই সময় অতীতের ছবির সঙ্গে বর্তমানের রেখার টান দেখাতে দেখাতেই ভবিষ্যতের চিহ্ন দেখিয়ে যায় অনায়াসে। কারণ– Time present, time past both perhaps present in time future. অর্থাৎ বর্তমান সময়, অতীত সময় দুটোই একসঙ্গে অবস্থান করে ভবিষ্যৎ সময়ের সাথেই। আর তাই 'Time talks. It speaks more plainly than words. The massage it conveys comes through loud and dear. Because it is manipulated less consciously, it is subject to less distoration that the spoken language go. It can shout the truth where words lie.' ই.টি হলের সময় সম্পর্কিত এ উক্তির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় শওকত আলীর *উত্তরের খেপ* উপন্যাসে।[৪৯] *উত্তরের খেপ* উপন্যাসের খণ্ড বিভাজন ও নামকরণের ক্ষেত্রেও শওকত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরো উপন্যাসটি অস্পষ্ট দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটির কোনো নাম আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না; তবে মনে হয় উপন্যাসের নামেই এই অংশের শিরোনাম 'উত্তরের খেপ' নির্ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। দ্বিতীয় অংশের নাম 'দক্ষিণে মোহনা' অংশের পরিচ্ছেদ বিন্যাস স্বতন্ত্র। তবে দুই অংশের কাহিনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলেছে। 'উত্তরের খেপ' ও 'দক্ষিণে মোহনা' শিরোনাম দুটির দিক নির্দেশক প্রতীকের তাৎপর্যও আমাদের কৌতূহলী করে । এর 'উত্তর' 'দক্ষিণ' 'মোহনা' ও 'খেপ' শব্দগুলোও গভীর ইঙ্গিতবাহী। সাধারণভাবে ক্ষণস্থায়ী কোনো সফরকে 'খেপ' আর বহুস্রোতধারার মিলনস্থলের উপমান হিসেবে ব্যবহৃত 'মোহনা' ওই ক্ষণিক সফরের চূড়ান্ত রূপ প্রদান করে। *উত্তরের খেপ* অংশে সবদর-নিশাত বানু-মাহবুবের গল্প; যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হায়দার যুক্ত। আর *দক্ষিণে মোহনা* অংশে রয়েছে হায়দার-মরিয়ম-আজহারের কাহিনি। যা হায়দারের জীবনোপলব্ধির ভিত্তি।[৫০] নাম ও উপন্যাস নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক তাঁর অভীষ্টের শিল্প-ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এভাবেই নিজের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষদের কথা এবং তাদের পরিণতির কথা ঔপন্যাসিক তুলে ধরবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'–সুধীন্দ্রনাথ দত্তের তাৎপর্যবাহী বক্তব্যের এমন ভবিতব্য মানুষের জন্য নির্দিষ্ট বলেই দক্ষিণের মোহনার টানে তার জীবননৌকাটি ছুটে চলে। উপন্যাসের বিষয়ের ওপর শওকত জোর দিলেও সমসাময়িক উত্তাল রাজনীতির আঁচটুকুকেও উপেক্ষা করেননি। আজকের মানুষ অধিকতর অন্তর্দ্বন্দ্বে তাড়িত, সিসিফাসের মতোই তার শ্রম। সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে বিচার করেছেন শওকত আলী।[৫১] *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটি পাঠকের কাছে বিবিধ সংগ্রামের সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হলেও তা আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধারণ করার মতো তেমন কোনো চরিত্র গড়ে উঠেনি। মুক্তিযোদ্ধা হায়দারের বলিষ্ঠ ভূমিকার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। নিশাত বানুর সম্ভাবনা থাকলেও তাকে রহস্যময় চাদরে মুড়ে অন্তর্হিত করা হয়েছে।

এসব সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও *উত্তরের খেপ* উপন্যাসের মাধ্যমে শওকত আলী সমকালীন অভিশপ্ত যুগসন্তানকে তুলে ধরেছেন। ধর্মকর্মে আস্থাহীন অধার্মিক রাজনীতিবিদগণ ক্ষমতার জন্য ধর্মকেও রাজনীতির হাতিয়ার বানায়। জনগণের ভাগ্য ও ভবিষ্যতের কথা না ভেবে শুধু ব্যক্তিস্বার্থের জন্য ধর্মভিত্তিক জাতিগঠনে যে-দেশভাগ করা হয়– এ পাপের ফলেই

সম্প্রীতির গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। নৈরাজ্য, হানাহানি, রক্তপাত, মৃত্যুর জাঁতাকলে পড়ে অগণন মানুষ মুহূর্তের মধ্যেই পতিত হয় নামহীন, পরিচয়হীন, দেশহীন এক অভিশাপের সংকটে। এ অভিশাপ ও পাপের ফল বয়ে চলছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। যুগযন্ত্রণায় কাতর এ তিন প্রজন্মের স্বদেশ-স্বজন-সম্বল হারানোর নির্মম অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি বিশ্বাসের নিষ্ঠুর ভাঙন, মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ প্রতিবেশ–সর্বোপরি বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রক্তিম ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে *উত্তরের খেপ* উপন্যাস এক ব্যতিক্রমী সংযোজন।

অবশেষে প্রপাত

অবশেষে প্রপাত (১৯৯৬খ্রি.) উপন্যাসের মাধ্যমে শওকত আলী ষাটের দশকের উত্তাল-সংগ্রামমুখর ও ক্রমজটিল সময়ের প্রেক্ষাপটকে ব্যক্তির সমান্তরালে উপস্থাপন করেছেন। শওকতের প্রায় উপন্যাসেই একটি আহ্বান থাকে। কোনো সময় এসব আহ্বানে সরব বিপ্লব লুকিয়ে থাকে, আবার কিছু ক্ষেত্রে থাকে নীরব বিপ্লবের ইঙ্গিত। শওকত বিপ্লবের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক– এমন তিনটি বিশেষ প্রেক্ষাপটকে গুরুত্বের সঙ্গে ধরার বা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বরাবরই থাকেন যত্নশীল। *অনিশ্চিত দিনরাত্রি* ও *অবশেষে প্রপাত* নামক দুটি খণ্ডে বিভাজন করে এ উপন্যাসকে চব্বিশ পরিচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। *অনিশ্চিত দিনরাত্রি*– অংশে স্থান পেয়েছে আনিসের জেলমুক্তি থেকে প্রেমিকা রীনার মোবারক খান কর্তৃক বলাৎকারের শিকার হয়ে বিয়ের ঘটনা। আর*অবশেষে প্রপাত*– অংশে রীনা-মোবারকের দাম্পত্যসংকট, এন.এস.এফ-এর গুণ্ডা বাহিনী কর্তৃক বীণার ধর্ষণ ও মৃত্যু, ছাত্রনেতা আসাদ, মতিউর, ইফতিখারের মৃত্যু এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি জহুরুল হকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানের বিষয়। এ উপন্যাসের মূল কাহিনিস্রোত সাতষট্টি থেকে উনসত্তরের ঘটনাপ্রবাহে সরব থাকলেও তা বাষট্টি হয়ে তৎপূর্ববর্তী বায়ান্ন পর্যন্ত বিস্তার ঘটেছে।

ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময় এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে শওকত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় মুড়ে রূপায়ণ করেছেন। শোষণ, বঞ্চনা আর কুক্ষিগত ক্ষমতায়নের খণ্ডখণ্ড চিত্র এ উপন্যাসের মূল রসদ যুগিয়েছে।[৫২] *অবশেষে প্রপাত* ষাটের দশকের বিক্ষুব্ধ সময় ও ঐতিহাসিক কালপর্বের এক শিল্পভাষ্য। সাতচল্লিশের দেশবিভাগোত্তর কালে পূর্ববাংলা নতুনভাবে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পড়ে। দুই শতাব্দীব্যাপী কলোনিয়াল শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে এ অঞ্চলের মানুষ অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি ও স্বাধীনতা। কিন্তু নব অর্জিত পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডে আজন্ম বিপ্লবী বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের লালিত স্বপ্নের কোনো বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে না। ব্রিটিশ উপনিবেশের কবল থেকে মুক্ত হবার অব্যবহিত পরেই বাঙালি পাকিস্তানের নব্য উপনিবেশের বেড়জালে বন্দি হয়। ফলে বাঙালিকে এক লড়াই শেষ হতে না হতেই আরেক নতুন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়।[৫৩] ধর্মের জিগির তুলে নবপ্রতিষ্ঠিত দেশটির যে-ইসলামি লেবাসের নামকরণ করা হয়, তা ছিল বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই যে-বিনাশের বীজ লুকিয়ে ছিল, তা এক বছরের শেষেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং দ্রুত বিষবৃক্ষে রূপ নেয়। পাকিস্তানিরা বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে বিনাশের অপকৌশল নিয়ে মাঠে নামে। এ কূটকৌশল ও পেশীশক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শারীরিক বিকলাঙ্গতা, অপূর্ণতা ও অক্ষমতার কথা ভুলে স্বজাতি-সংখ্যাগরিষ্ঠ-সুস্থ-সবল-সাহসী বাঙালি জাতিকে গিলে ফেলার অপচেষ্টায় তৎপর হয়। এটা যে-কত বড় হাস্যকর আর অবাস্তব ছিল, তার প্রমাণ পাকিস্তানিদের তেইশ বছরের ইতিহাসে একটি সিদ্ধান্তও বাঙালি মেনে নেয়নি। বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে একটিতেও পাকিস্তানিদের বিজয় নেই।[৫৪] এদিক থেকে শওকত আলীর *অবশেষে প্রপাত* উপন্যাসটি অপরাজেয় বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন-সংগ্রামের গৌরবময় শিল্পভাষ্য।

আনিস মাহমুদ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক ছাত্র, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ও সাংবাদিক। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আনিস স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের ঢাকা সফরের সময় তার গাড়ির বহরে ইট ছুঁড়ে গ্রেফতার হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেলেও সরকার তাকে আইনের মারপ্যাঁচে পাঁচ বছরের সাজা দেয়। দেশপ্রেমিক, আদর্শবান ও আপসহীন বিপ্লবী আনিস বন্ডসই পরিহার করে পাঁচ বছর জেলবন্দি থেকে সাতষট্টিতে মুক্তি পায়। কারাগারে সহযোদ্ধা কাইয়ুম, বেলাল, আহসান, শিবেন বাবু ও দীপনারায়ণদের রেখে রিক্‌শাযোগে নিজেদের ধানমন্ডির নতুন বাড়িতে ওঠে। যাত্রাপথে আনিসের এ অন্যায় শাস্তি ও জেল-জুলুমের কথা শুনে একজন সাধারণ বাঙালি রিক্‌শাচালক যে-মন্তব্য করে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রিক্‌শাওয়ালা ক্ষোভের সঙ্গে বলে-

‘পাঁ-চ বছর– হালায় মানুষ, না জানোয়ার?...এইডা কুনো মানুষের কাম হইলো– ভালো লোকের পুলাপান, চুরি করে নাই, ডাকাইতি করে নাই– পাঁচ পাঁচটা বছর জেলের ভিতর আটক কইরা রাখল। হালাগো ধইরা পিটানোর কাম– দ্যাশে বিচার আছি নি।...স্যার চিন্তা কইরেন না– এ্যারা কইলাম বেশিদিন আর নাই।’-[অ.দি,শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৫/পৃ. ১৫]

রিক্‌শাচালকের এমন মন্তব্যের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের প্রতি বাঙালির জমাটবদ্ধ ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আনিস খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সৎ অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি বাবা আবিদ হাসানের তৈরি বাড়িতে এসে অস্বস্তিবোধ করে। সাজানো-গোছানো বাড়ি, কাজের মহিলার বিস্ময় ভাব, দুই ভাতিজার কাছে না ঘেঁষা, বড় ভাবী নীরুর কৃত্রিম সম্ভাষণ, বড় ভাই আমিন ও ছোট ভাই আতিকের অতি সাবধানী বাক্য বিনিময় এবং বৃদ্ধ বাবার সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তববাদী দিকনির্দেশনায় আনিস নিরাশ হয়। নিজেকে তার একজন আগন্তুক বলে মনে হয়। তাছাড়া বাবা, ভাই, ভাবী ও বন্ধুদের– ‘এখন কী করবে ভাবছ?’ সবার কাছ থেকে একই কথা শুনে আনিস দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে। আবার চোখের সামনেই আনিস একসময়কার সিংহের মতো জাদরেল আমলা বাবার মানসিক দুর্বলতা দেখতে পায়। এ বাবাই তার মামলার ওয়ারেন্টের খবর পেয়ে ও জেল হাজতের সময় বলেছিলেন-

‘ওসব পাগলামি ছাড়তে হবে, নইলে বাড়ি ছাড়তে হবে। কোনটা পারবে বেছে নাও।... বন্ডসই করে বেরিয়ে এসো, যদি না পারো, তাহলে কুনো দিন আমার বাড়িতে ঢুকবে না।’-[অ.দি./পৃ. ২২]

সময়ের আবর্তে রাশভারী বাবার আমূল পরিবর্তন দেখে আনিস অবাক হয়। ‘আমি আজকাল নিজের ওপর ভরসা পাই না’– আবিদ সাহেবের এ রূপান্তর ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পেছনে নষ্ট যুগধর্ম ও রাজনীতির সংকটও সমানভাবে দায়ী। তার দৃষ্টিতে ম্যাট্রিক ফেল করা, নায়ক হবার প্রত্যাশায় করাচি যাওয়া বড় ছেলে আমিন এবং বুয়েটে থার্ড ইয়ারে পড়াকালীন বন্ধুর বোনের প্রেমে উন্মাদ ছোট ছেলে আতিক সকল ঝামেলা পেড়িয়ে জীবনের স্থিতি পেলেও সবচেয়ে মেধাবী, আদর্শবান ও সৃজনশীল মানসিকতার মেজো ছেলে আনিস বামরাজনীতিতে জড়িয়ে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়। অর্থাৎ নষ্ট সময় ও রাজনীতির আবর্তে পড়ে বিরাট সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে আর পতনশীলদের ঘটে উত্থান। সময়খণ্ডের এ বিপ্রতীপ প্রভাবে দগ্ধ আবিদ সাহেব মেজো ছেলে আনিসকে বলেন-

‘ক্যারিয়ার পলিটিশিয়ান হওয়ার মতো টেম্পারামেন্ট তোমার নেই– ও তুমি কোনোদিনই হতে পারবে না।...তুমি ক্রিয়েটিভ টাইপের মানুষ আর সেজন্যই তুমি বেশি রকম কমিটেড।...ডিউচ্‌ড হতে না পারলে কেউ কখনো রাজনীতিতে সাইন করতে পারে না।...এদেশের রাজনীতিতে ম্যানুভারিং-এর ব্যাপারটাই বড়কে চালাকি করে ছোটকে বেকায়দায় ফেলে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এটাই এদেশের রাজনীতির ধারা। কিন্তু ম্যানুভারিং জিনিসটাই তোমার মধ্যে নেই।...রাজনীতির পথ তোমার জন্য নয়।’-[অ.দি./পৃ. ২০-২১]

বাবার এমন পর্যবেক্ষণ ও সাবধানী কথায় আনিস নিজের বল-ভরসার জায়গায় ঝাঁকুনি খায়। এর সঙ্গে ঢাকা শহরের কিছু কাঠামোগত বাহ্যিক পরিবর্তন, রাজনীতিতে আদর্শের জায়গায় আপসনীতি এবং বড় ভাই আমিনের বামরাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণাভাব–এসব মিলিয়েই আনিস এক বিরূপ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। যে আমিন পূর্বে বামদলের জন্য চাঁদা তুলে দেয়াসহ নানা রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতেন, সেই আমিনই বর্তমানে সতর্কবাণী হিসেবে বলেন-

‘ওদের সঙ্গে মেলামেশাটা আপাতত বন্ধ রাখ– ওরা যেন কেউ এ বাড়িতে না আসে– সামনেই একটা চান্স আছে– পুলিশ যদি রিপোর্ট করে, তাহলে আমার প্রমোশনের বারোটা বেজে যাবে।’-[অ.দি./পৃ. ২৩]

এককালের বামরাজনীতির হিতাকাঙ্ক্ষী আমিনও নিজ স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে নীতি-আদর্শ থেকে সরে এসে আনিসের সঙ্গে আপস-রফা করেন। এছাড়া নীরু ভাবী পারিবারিক সংকট ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উত্থাপন করায় আনিস আরো দুশ্চিন্তায় পড়ে। আবার ছোটভাই বুয়েট ছাত্র আতিকের রাজনীতি ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়ে কথাবার্তা শুনেও আনিস মর্মাহত হয়। আতিকের অভিমত-

‘ধর্ম যেমন এক্সপ্লয়েট করেছে মানুষকে, এই রাজনীতির ব্যাপারটাও তেমনি। আগাগোড়া এক্সপ্লয়েটেশন ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই নেই। দেখ তুমি, ছেলেরা পলিটিক্স করতে নামে, বড় বড় কথা বলে, তারপর সুযোগ বুঝে একটা ওভারসিজ স্কলারশীপ বাগিয়ে নিয়ে বিদেশে চলে যায়। সেখানে থেকে ফিরে ভালো চাকরিতে ক্যারিয়ার বিল্ড আপের কাজে লাগে– শুধু তোমার রাজনীতির অর্থটাই বুঝলাম না।’-[অ.দি./পৃ. ২৫]

আতিক শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না, বরং আনিসের অবহেলার কারণেই সি.এস.পি-র চাকরি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হবার মতো সুযোগও হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করে। জবাবে আনিস– 'সবাইকে দিয়ে কি সব কাজ হয় আতিক?' বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। অথচ আতিকের আপসনীতির এ পরামর্শকেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। যদিও আপস করে শেষপর্যন্ত নিজেকে বাঁচানো যায় না– তথাপি ঢাকা শহরের মানুষের মাঝে সর্বত্র সে এ আপসনীতির প্রবণতা দেখে। এতে সহযোদ্ধা বেলাল, কাইয়ুম, শিবেন বাবু, ফরিদ, খলিল, আনসার, দীপনারায়ণদের-'মনে থাকবে তো আমাদের কথা'– এমন অনুরোধের বাণী স্মরণ করেও বিব্রতবোধ করে। আবার জেলজুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক নেতাকর্মী দল ত্যাগ করে সরকারি দল ও এন.এস.এফ ছাত্র সংগঠনেও নাম লেখাতে শুরু করে। এ বিষয়ে জেলবন্দি আরেক সহযোদ্ধা কাসেমের কথা মনে পড়ে। কারণ-

> 'আবুল কাসেম পাটোয়ারি কী দুর্দান্ত সাহসী ছেলে, কত দুঃসাহসী কাজ করেছে। জেলে আসবার মাসদুয়েক পরই জেল গেটে ওর ডাক পড়ত কয়েকদিন পরপর।...কিন্তু গোপন থাকেনি ব্যাপারটা।...শুধু রাজনীতি না করার বণ্ডসই সে দেয়নি– জেল থেকে বেরুবার পরদিনই সে এন.এস.এফ দলে নাম লিখিয়েছে।'-[অ.দি./পৃ. ২৮]

এভাবে ব্যক্তিস্বার্থে দল ও দেশের প্রয়োজন ভুলে, আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু কাসেম পাটোয়ারি নয়, বরং তার পূর্বে মুঈদ, শফিক ও মনসুরদের মতো প্রথম সারির ছাত্র নেতারাও দলত্যাগ করেছে। আর সরকারের সঙ্গে আপস করে ব্যবসায় ও ক্যারিয়ার গড়ে বিত্ত-বৈভবের মালিক বনে গেছে। তাই এককালের আদর্শবাদী নেতা মুঈদ ভাই এখন–

> 'মস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট–পারমিট লাইসেন্স দিয়ে শুরু, এখন জুটমিল বানিয়েছেন।...শফিক ভাই ব্যারিস্টারি পাস করে এসে প্রাকটিস করছেন– সম্ভবত মন্ত্রী হবার জন্য ইলেকশনে দাঁড়াবেন।...আর মনসুর ভাই এখন লন্ডনে বসবাস করছেন এবং সিলেটী লেবারদের টাকা-পয়সা দেশে পৌঁছানের নামে ফরেন এক্সচেঞ্জের বেআইনি ব্যবসা চালান।'-[অ.প্র./পৃ. ১৮৮-১৮৯]

এমন স্বার্থবাদী ও আপসকামী নেতাদের বিপরীতে ঠাকুরগাঁওয়ের দীপনারায়ণ, বিক্রমপুরের নরেন বাবু, পাবনার মাহমুদ ও শিবেন বাবুরা আদর্শ, দল ও দেশের জন্য জীবন-যৌবন, ঘর-সংসার, স্ত্রী-সন্তান সবই জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শিবেন বাবুর স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী অভিমান করে ভারতে চলে যান। আর একমাত্র ছেলে মাহমুদ দীর্ঘদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকায় বিধবা মা ও মেডিকেল ছাত্রী বোনের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে আনিসের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবনও নানা সংকটে জড়িয়ে যায়। সে পাঁচ বছরের বন্দি জীবন কাটিয়ে জেলের বাইরে এসে তাল মেলাতে পারে না। আবার গ্রামে গ্রামে গিয়ে আন্দোলনের বেস গড়তে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। জেল থেকে বিদায়ের পূর্বে সহযোদ্ধা কাইয়ুম হাত ধরে বলেছিল–'ফরগেট লাস্ট নাইট, উই উইল ওয়েক আপ টুমরো অ্যান্ড মিট অ্যাট দ্য ফ্রন্ট।' অথচ দলের কেন্দ্রীয় অনেক নেতাই বর্তমানে ফ্রন্টে যেতে চায় না। এ পর্যায়ে আনিসের মনে পড়ে সহযোদ্ধা খলিলের কথা। সে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল–

> 'দোস্ত এবার ফিরে গিয়ে প্রথমে বিয়ে কোরো মেয়েটিকে, কোনো কলেজে চাকরি নিও, আর লিখো আমাদের কথা, দেশের কথা, দেশের মাটির কথা– লেখাই তোমার আসল কাজ, রাজনীতির লাইন তোমার নয়, ওরা যাই বলুক।'-[অ.দি./পৃ.৩১]

খলিলের এ কথায় আনিস তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে নানা সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হয়। তার রাজনীতি সম্পর্কেও একধরনের অনীহার ভাব জাগে। এমন মানসিক পরিস্থিতিতে পূর্ব পরিচিত জামালের সঙ্গে দেখা হলে সেও অজানা আশঙ্কায় দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কারণ আনিসের মতো বিখ্যাত আসামির সঙ্গে কথা বলতে বা সম্পর্ক রাখতে অনেকেই আতঙ্কবোধ করে। এমনকী দীর্ঘ দিনের সহযোদ্ধা ও প্রেমিকা রীনাও তিন বছর পূর্বে চাকরি হারাবার আশঙ্কায় ও লোকলজ্জায় আনিসকে চিঠি দিয়ে তার উদ্দেশ্যে কোনো চিঠি লিখতে বারণ করেছিল। তাই আনিস নিজের বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিচিতির জন্য প্রতীক্ষারত প্রেমিকার কাছেও চিঠি লিখতে পারেনি। সে চায়নি তার জেলখানার ছাপমারা চিঠির কারণে বাবা-মা ও ভাই-বোনদের সংসারে হালধরা রীনার একমাত্র উপার্জনের পথ শিক্ষকতার চাকরিটা নিয়ে ঝামেলা হোক।

'হোম অর নো হোম'–এর সংকট দ্বারা তাড়িত-পীড়িত রীনাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রী এবং ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। ষাটের দশকের শিক্ষা আন্দোলন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে রীনারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এ আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়েই সহযোদ্ধা আনিসের সঙ্গে রীনার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবার অবসর নেয়াতে পরিবারের আট সদস্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হলে সে রাজনীতি ছেড়ে চাকরিতে মনোনিবেশ করে। প্রথমে মতিঝিল

বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি করলেও পরে সোশাল ওয়েলফেয়ারের সরকারি কর্মসংস্থানে থিতু হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে বাবা-মা, বোন বীণা-নীনা-নীলু এবং ভাই মন্টু-নিন্টুর গুরুদায়িত্ব রীনার ওপর এসে বর্তায়। রীনাও এ দায়িত্বভারকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। আর জেলবন্দি প্রেমিক আনিসের মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকে। তাই রীনা নিজের চাকরিকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে কষ্ট হলেও আনিসকে জেল থেকে চিঠি লিখতে বারণ করে এবং 'যত দেরি হোক, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি' বলে জানায়।

অথচ জেলমুক্ত আনিসের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দেখা হলেও ব্যস্ততার অজুহাতে রীনা আরামবাগের অফিসের ঠিকানা বলে চলে যায়। রীনার এভাবে চলে যাবার পেছনে আনিস বর্তমান সময় প্রভাবকে দায়ী করে। মধ্যবিত্ত মানুষের আপসকামী মানসিকতা, গাড়ি-বাড়ি করার নেশা ও আয়েশি জীবনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দেখে আনিস ঘাবড়ে যায়। নিজের পরিবার, প্রেমিকা ও পরিচিত জনদের গ্রামের গেঁয়ো গন্ধ শরীরে বিদ্যমান থাকার পরেও নাগরিক সমাজের কৃত্রিমতা ও ভদ্রলোক সাজার নেশা দেখে আনিস রীতিমতো শঙ্কিত হয়। কারণ ঢাকার এ উঠতি মধ্যবিত্তরাই-

> 'রাজনীতি করবে, পার্লামেন্টে বক্তৃতা করবে, এরাই এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসায়ে যাবে, এরাই হবে নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রির এন্টারপ্রেনিওরে। এদের হাত ধরেই হাজার মাইল দূরে থেকে পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করবে।'-[অ.দি./পৃ. ৩৮]

এরকম মানসিক অবস্থা নিয়েই নিউমার্কেটে রীনার সঙ্গে আনিসের সাক্ষাৎ হয়। রীনা আনিসকে রাজনীতি ছেড়ে চাকরি ধরতে বলে। প্রয়োজনে তার পরিচিত মালেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এবং দ্রুত বিয়ের আয়োজনের জন্য তাগিদ দিয়ে বলে-

> 'লাইফকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। এসব সবার জন্য নয়। যাদের সব কিছু গড়ে নিতে হয়, তাদের জন্য রাজনীতি নয়।...তুমি তোমার রাজনীতিটা বাদ দাও; ওতে বড় রিস্ক, অত রিস্ক নিয়ে আমি সংসার পাততে চাই না।...অনেক তো হল, পাঁচ বছর আমি অপেক্ষা করেছি।'-[অ.দি./পৃ. ৩৯-৪১]

আনিসও রাজনীতি না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও নিজের কাছে, পরিচিত জনের কাছে এবং প্রেমিকার কাছে সহজ হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বার বার ব্যর্থ হয়। তাই নিজের এ মানসিক বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে আনিস জানায়-

> 'বিশ্বাস করো, স্থিতি আমিও খুঁজছি। আমিও একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে চাই। কিন্তু মুশকিল কী জানো? ঐ জায়গাটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।...চাকরি হয়তো পেয়ে যাব আর তোমাকে নিয়ে সংসারও হয়তো পাতবো...কিন্তু তাতে আমি মরব না, বাঁচব সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।'-[অ.দি./পৃ. ৪১-৪২]

আনিসের জীবন সম্পর্কে অহেতুক ভয়-ভীতি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখে রীনা তার মন থেকে 'পুরনো সেন্টিমেন্ট আর বাজে আদর্শ'-ঝেড়ে ফেলার পরামর্শ দেয়। রীনার কথা মতো আনিস মালেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, পুরনো বন্ধু ও পরিচিত হিতাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, চাকরির তদবির করেও নিজের তকদির পরিবর্তন করতে পারে না। তারপরেও রীনা তাকে একটি চাকরি খুঁজে পেতে জোর তাগিদ দিয়ে বলেন–

> 'তুমি একটু সিরিয়াস হও প্লিজ, দোহাই তোমার, আর কতদিন এভাবে চলবে?...আমার ভারি ক্লান্তি লাগে আজকাল, আর দেরি সহ্য হয় না। চলো, এবার আমরা ঘর বাঁধি, তুমি একটা চাকরি নাও কোথাও। আমি ঘর সাজাব মনের মতো করে। আমার বড় সাধ আনিস।'-[অ.দি./পৃ. ৪১-৪৩]

পাঁচ বছর বাবা-মায়ের সংসারের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত রীনাও শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে ওঠে। নিজের ঘর-সংসার সাজানোর উদগ্র বাসনা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু আনিসের জীবনে কোনো স্থিতি না দেখে রীনা ক্রমশই হতাশ হয়। আনিসের বাবাও পুরনো বন্ধুদের কাছে ধরণা দিয়েও ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেন না। তাই বড় ছেলে আমিনের ব্যবস্থা করা সানরাইজ কর্পোরেশনের ঠিকেদারির কাজ করতে বলেন। চাকরি না হবার কারণ সম্পর্কে বলে-

> 'তোমার পরিটিক্যাল এন্টিসিডেন্ট সবাই জানে। তোমার বিরুদ্ধে যে কেস হয়েছিল, সেটার পাবলিসিটি এত বেশি হয়েছিল যে তা ভুলার কথা নয়। দেখলাম, অনেকেই তোমার নাম স্মরণ করল।'-[অ.দি./পৃ. ৪৬]

আনিসের রাজনৈতিক পরিচিতি ও স্পর্শকাতর মামলার বিষয়টি তার চাকরি পাবার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর বহুকষ্টে চাকরি পেলেও তা হয়তো শেষপর্যন্ত টিকবে না। কারণ সরকারি তো নয়ই, বরং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও কড়া নোটিশ করা হচ্ছে যাতে কোনো রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের চাকরি না দেওয়া হয়। তাই সার্বিক বিবেচনায় বড় ভাই

আমিন তারই বন্ধু ও দিল্লির মানুষ আখতার লালওয়ানীর অর্থায়নে গড়া সানরাইজ কর্পোরেশনের ঠিকেদার হিসেবে কাজ করার পরামর্শ দেয়। বাবা ও ভাইয়ের এমন প্রস্তাব শুনে আনিসের মনে উদ্রেক হয়–

> 'কন্ট্রাক্টর হতে হচ্ছে অবশেষে। ইট কাঠ সিমেন্ট বালি আর লেবার মিস্ত্রি নিয়ে আসতে হবে তাকে। বিল পাস করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের দোরে দোরে হেঁদিয়ে মরতে হবে। তাদের বউ-এর জন্য শাড়ি আর বাচ্চার জন্যে মিষ্টি নিয়ে ধরণা দিতে হবে।'-[অ.দি./পৃ. ৪৭]

মন সায় না দিলেও আনিস এতে সম্মতি দেয়। আনিস তার এ কর্মহীন, ভিত্তিহীন জীবনসংকটের জন্য একেক সময় নিজেকেই দায়ী করে। আদর্শ ও আপসহীনতার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। কারণ বর্তমান সময়ে সে যাই করতে যাবে, তাকে-

> 'কোনো না কোনো রকম আপস করতেই হবে। সবই তো সেই পুরনো ছকের ব্যাপার। জীবন মানেই ছক। ঐ ছকের মধ্যে ঢোকাকেই গুরুজনেরা বলে সেটেলমেন্ট।'-[অ.দি./পৃ. ৪৯]

এমন হতাশা নিয়েই আনিস দীর্ঘদিন পর প্রেসক্লাবে যায় এবং পুরনো সাংবাদিক বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের মধ্যে রহিম, মিন্টু, সায়ীদ, ইফতিখারের সঙ্গে দেখা হয়। আনিসের রাজনীতি ছেড়ে ঠিকেদারি শুরুর কথা জেনে সবাই অবাক হয় এবং ইফতিখার জোর প্রতিবাদ করে বলে-

> 'কী বললি? তুই কন্ট্রাক্টরি করবি?...কেন, তুই লিখবি। রাজনীতি তোকে করতেই হবে, এমন তো কেউ দিব্যি দিয়ে রাখেনি।...কিন্তু তোর নিজের ক্ষেত্র যেটা, সেটা তুই ছাড়বি কেন? তোর মতো ধারালো কলম সব লেখকের আছে?...যে লেখা রক্তের স্পন্দন দিয়ে লেখা হয়। যে লেখা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, সেই লেখাই আসল লেখা।'-[অ.দি./পৃ. ৫৩-৫৪]

আনিসের কাছে এসব আবেগ-উত্তেজনা, মাতামাতি ও ছেলেমানুষি আর ভাল লাগে না। কারণ তারা জেলে বসে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে যেসব পরিকল্পনা করেছিল; জেলমুক্ত হয়ে বাইরে আসার পর দেখে-'সব কিছু উল্টেপাল্টে গেছে, সময়ের বাঁক এখন অন্যদিকে'। এসব চিন্তাকে কাজে লাগাবার নেতাকর্মী খুঁজে না পাওয়াতে নিজেকেই আনিসের বেকুব মনে হয়। তাই আনিস নতুনদের ওপর নেতৃত্বের ভার ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু ইফতিখার এর জোরালো প্রতিবাদ করে বলে-

> 'য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররা ছিনতাই, ডাকাতি, রেপ– এইসব করে...ছাত্ররা আজকাল বই পড়তে চায় না। বিপ্লবের কাহিনি শুনে মুখ টিপে হাসে। আদর্শের কথা বললে ঠাট্টা করে। পরীক্ষায় নকল করার দাবি জানায় প্রকাশ্যে।'-[অ.দি./পৃ. ৫৯]

ছাত্রদের মানসিকতা ও মূল্যবোধের এমন পতন-পচনের কথা শুনে আনিস আরো হতাশ হয়। আবার সুবিধাবাদী বামপন্থী নেতা হায়দার খানের ধানমন্ডির বাসায় গিয়েও সে ভীষণ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। বাকচতুর হায়দার খানের লোক দেখানো আন্তরিকতা, অতিমাত্রায় প্রশংসা, জেলমুক্ত হওয়া উপলক্ষে সংবর্ধনা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে মিথ্যাচারে তার বিরক্তি লাগে। বামপন্থী নেতার গায়ে কাশ্মিরি সার্জের পাঞ্জাবি, মুখে দামি সুগন্ধি সিগ্রেট এবং হাতে হীরার আংটি দেখে সে অবাক হয়। আবার অর্থ সাহায্যপ্রার্থী দলের ত্যাগী নেতা মাহবুবের বোন ও মেডিকেল ছাত্রী লীলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার দেখে আনিস কষ্ট পায়। তবে এসবের চেয়েও আনিসের জন্য বড় অবাক করার বিষয় ছিল হায়দার খানের দেয়া ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রস্তাবে। 'তুমি যদি থাকো পার্টিতে, কাজ করতে চাও, তাহলে তোমাকে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করতে হবে– নইলে সরকারের সমর্থনে কাজ করতে হবে সোজা হিসাব।' হায়দার খানের এমন সুবিধাবাদী ও চাতুর্যপূর্ণ অবস্থানের কথা শুনে আনিস সত্যিই বিস্মিত হয়। কারণ– 'যারা বিপ্লব-টিপ্লব মানে না, যারা ভোট আর নির্বাচনের ভিত্তির ওপর থাকতে চায়' সেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে রাজনীতি করার কথা বলা হয়। অথচ দশ বছর আগেও বামদল এ আওয়ামী লীগকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের এজেন্ট এবং স্বায়ত্তশাসনের ঘোরবিরোধী বলে অভিযুক্ত করতো। এদের সঙ্গেই আজ বামদলের নেতাকর্মীরা রাজনীতি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আনিসের এমন প্রতিবাদে হায়দার খান বলেন-

> 'দেখো ভায়া, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই– সবকিছু বদলায়– তাছাড়া সে আওয়ামী লীগ ছিল সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের। কিন্তু এ আওয়ামী লীগ আমাদের ঘরের ছেলে শেখ মুজিবের– কথাটা খেয়াল করো।'-[অ.দি./পৃ. ৬৫]

আনিসের কাছে এ প্রস্তাব দুঃখজনক হলেও হায়দার খানের এ পর্যবেক্ষণ ছিল বাস্তবসম্মত ও সর্বাংশে সত্য। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শেখ মুজিব তার একুশ দফার আদলে তৈরি করা ছয় দফার দাবি উত্থাপন করে খুব সহজে পূর্ব

বাংলার জনগণের মন জয় করতে সক্ষম হন। যা বামদলের নেতাকর্মীরা পারেনি। তারপরেও আনিস হায়দার খানের এ প্রস্তাবে রাজি হয় না। এসময় আনিস লীলার মায়ের চিকিৎসার ব্যাপারে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। রাত বারোটার মধ্যে চারশত টাকা সংগ্রহ করার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয়। আনিস প্রথমে নীরু ভাবীর কাছে গিয়ে বিফল হয়। পরে সাংবাদিক বন্ধু রহিমের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা এবং বন্ধু ইফতিখারের কাছ থেকে তিনশত বাষট্টি টাকা নিয়ে রাস্তায় বের হয়। তখন আনিসের মনে হয়–

> ‘সামরিক শাসক আইয়ুব খানের দিকে আবেগের বশে ইট ছুঁড়ে মারার চাইতে এই টাকা জোগাড়ের কাজটা তার কাছে অনেক বড় বলে মনে হয়। মৃত্যুর বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে, সে মনে করে, সেই লড়াইয়ে সেও একজন সৈনিক।’-[অ.দি./পৃ. ৭৩]

একজন ত্যাগী, আদর্শবান, দেশপ্রেমিক ও আত্মগোপনে থাকা ছাত্রনেতার মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় মায়ের জীবন বাঁচাতে আনিস যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা একই সঙ্গে তার মানবিক-কল্যাণমুখী রাজনীতিতে পুনরায় সম্পৃক্ত হবারও ইঙ্গিত দেয়। আনিসের এই মানবিক দায়িত্ববোধে সাড়া দেওয়ার বিষয়টি এক অর্থে তার মানসলোকের পুনর্জন্ম ঘটায়। একলা আমি-র বলয় ছেড়ে আনিস বেরিয়ে পড়ে বহু আমি-র প্রাঙ্গণে। এভাবে শুরু হয় তার জীবনের নতুন পথচলা। লীলার মাকে নিয়ে ব্যস্ততায় এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় আনিস আর সানরাইজ কর্পোরেশনের ঠিকেদারিতে যোগ দেয় না। কোনো চাকরির ব্যবস্থা করতে না পারায় প্রেমিকা রীনার অফিসে গিয়েও তাকে ভর্ৎসনা শুনতে হয়। তাই রীনা সোজাসুজি আনিসকে বলে-

> ‘একটা চাকরিতে তোমাকে জয়েন করতেই হবে, তা সে যেখানেই হোক।...যত কম টাকারই হোক, কেরানির চাকরিও যদি হয়, তবু তোমাকে করতে হবে, আমি আর রিস্ক নিতে চাই না...তোমার ওপর নির্ভর করার মতো মনের জোর খুঁজে পাই না আজকাল।’-[অ.দি./পৃ. ৮৩]

কিন্তু এরপরেও আনিস নিজের কোন চাকরি ব্যবস্থা করতে পারে না। অথচ ক্রমশই সে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের ছয় দফার ওপর প্রেস কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে আনিস, সায়ীদ ও মিন্টু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তর্কে জড়ায়। সায়ীদ ও মিন্টু আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রতি তেমন গুরুত্ব না দেয়াতে আনিস প্রতিবাদ করে এবং যুক্তি দিয়ে বলে-

> ‘আমার তো মনে হচ্ছে, ছয় দফার স্লোগান ভয়ানক পপুলার হয়ে উঠবে।...আসলে এদেশের পলিটিক্সকে পিপলস বেসে নিয়ে যাওয়ার জন্য বামপন্থীরা যে গ্রাউন্ড তৈরি করেছেন এতকাল, সেই গ্রাউন্ডটা আওয়ামী লীগের কাজে লাগবে এখন। লেফটিস্টরা প্রিম্যাচিওর কল দিয়েছিলেন। এখন সময় হয়েছে, অথচ এখন তাঁরা পলিমিক্সে ব্যস্ত। সুতরাং আওয়ামী লীগ মাটির কাছাকাছি থেকে পলিটিক্স করতে চাইছে, এটা গুণগত পরিবর্তন।-[অ.দি./পৃ. ১১৩]

দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে আনিসের ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়টি পরবর্তী দুই-তিন বছরে বাস্তবে রূপ নেয়। দীর্ঘদিন ধরে বামদলের গড়ে তোলা রাজনৈতিক চেতনার মশালে বঙ্গবন্ধু তার ছয় দফার যৌক্তিক দাবি তুলে মুহূর্তেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বালিয়ে দেন। দেশের সর্বস্তরের মানুষও বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দেয়। আর ঊনসত্তর-সত্তর সনে এসে এদেশের রাজনীতিতে বাম দলের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাজনীতি সম্পর্কে আনিসের পর্যবেক্ষণ অব্যর্থ রূপে ফলে যায়। এসময় রীনা আনিসকে চাকরির তাগাদা দিলেও আনিস হতাশা প্রকাশ করে। কারণ আখতার লালওয়ানী ব্যবসায়ের স্বার্থে বহুবার দল পাল্টে পুরনো ইমেজ পুনরুদ্ধার করতে সাবেক প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আনিসকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চান। এর বাইরে সাপ্তাহিক পত্রিকার দেড়শত টাকা বেতনের চাকরির কথা জানালেও রীনা হতাশ হয়। আনিস রীনাকে বলে– ‘আমার কোনো চেষ্টাই কাজে আসছে না। একের পর এক হাত বাড়াচ্ছি আর বিফল হচ্ছি।’ আনিসের এ অসহায় বেকার অবস্থা এবং লীলার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে সন্দেহ রীনাকে এক নিদারুণ হতাশায় নিমজ্জিত করে। তবে নগরজীবনের বাস্তবতায় রীনার এ মনোভাবও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ চাকরির ব্যস্ততার জন্যও রীনা আনিসকে যথেষ্ট সময় দিতে পারে না। কারণ হিসেবে বলে–

> ‘তুমি আমার দিকটা একেবারেই বুঝতে চাও না– আমার চাকরিটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার, একটা পুরো ফ্যামিলি বেঁচে আছে এই চাকরিটার জন্যে; সেটা তুমি একেবারেই বোঝো না।’-[অ.দি./পৃ.৮৮]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে রীনার পারিবারিক তীব্র অসচ্ছলতা, অস্তিত্বসংকট ও টানাপোড়েনের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। তাই চাকরিটা রীনার কাছে কেবল সম্মান আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম নয় বরং তা জীবন সুরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় অবলম্বনও

বটে। জীবনযুদ্ধে সংগ্রামমুখর, শ্রমে-ঘামে ক্লান্ত, পোড়খাওয়া রীনা হয়ে উঠেছে নিখাদ বাস্তবতার এক প্রতিমূর্তি। এজন্য রীনা প্রেম-অনুরাগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বাস্তবের বেলাভূমিতে অবস্থান করে। রীনা চাকরি জীবনের পাঁচ বছরে বহু স্থানে একাকি রাত যাপন করেছে। অথচ সহকর্মী শফিউল-হাফিজুল- আহসানের মতো প্রেমপ্রার্থীদের আবেগী আহ্বানেও সাড়া দেয়নি। নিজের বড় শত্রু আপন রূপযৌবনকেও কঠিন শাসনের অর্গল দিয়ে আগলে রেখেছে। 'যত বিপর্যয়ই আসুক জীবনে, আনিসের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেছে'–এ বোধ ও বিশ্বাসই রীনার জীবনপথের পাথেয় ও প্রেরণা হয়ে তার সতীত্বের সাধনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আর তাই-

> 'এমনি করে দিনের পর দিন সাধের ইচ্ছার খুশির সিঁড়িগুলোকে ডিঙিয়ে অতি কষ্টে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে পাঁচ পাঁচটা বছর অপেক্ষা করেছে সে। পাঁচ বছরে কত দিন, কত ঘণ্টা, কত মুহূর্ত?'-[অ.দি./পৃ.৯১]

তার এ সাধনার একাগ্রতার পেছনে যেমন প্রেমের পূর্ণতা, স্বপ্নকে বাস্তবে দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল, তেমনি প্রেমিক ও পরিবারের কাছেও একধরনের দায়িত্ববোধ-প্রতিশ্রুতিও ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু জেলফেরত প্রেমিক আনিসের জীবনসম্পর্কে উদাসীনতা, নির্লক্ষ্য-নিস্পৃহভাব, দায়িত্বহীনতা ও সংসারবিবাগী মানসিকতা দেখে রীনা ভেঙে পড়ে। তাই রীনার মনে হয়-

> 'তার উন্মুখ সাধ, ব্যাকুল বাসনা, তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন–সমস্ত কিছু একটা কঠিন পাথুরে দেওয়ালে মাথা কুটে মরছে। তার অস্তিত্বের মূল থেকে উঠে আসা আবেগ, তার শরীরের মত্ত রক্তস্রোত, তার দিনানুদিনের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা এসবের কোনো কিছুই আনিসকে স্পর্শ করছে না।...আনিসকে মনে হয় ঠাণ্ডা, স্থির একটা পাথর। তার লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে, তার আঙুলের ঠাণ্ডা স্পর্শে মনে হচ্ছিল একটা রোবটের পাশে সে বসে আছে।'-[অ.দি./পৃ.৯৩]

আনিসের এ পাথর ও রোবটসুলভ আচরণ রীনার বল-ভরসার জায়গায় ক্রমশই ভাঙন ধরায়। এসময় মুসলিম লীগ নেতা, মিনিসিউপ্যাল কমিশনার, চতুর ও লম্পটপ্রকৃতির মোবারক খানের সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি ও আসঙ্গলিপ্সা দেখে রীনা রীতিমতো ভয় পায়। তখন প্রাণপণে আনিসকেই–'তুমি আমার, শুধুই আমার– আর কারো নও' ভাবতে গিয়েও সম্পূর্ণভাবে সাড়া পায় না। ফলে তার রক্তিম কৈশোর, প্রথম যৌবনের লজ্জা, প্রথম ভালোবাসা-ভালোলাগা– এসবই ভয়ের কান্নায় ও বেদনায় একাকার হয়ে যায়। তারপরও রীনা তার লালিত স্বপ্ন-সাধ ও বাসনার সঙ্গে আপস করে না। তাই সে–

> 'জীবনকে পুরোপুরি চায়-সম্ভোগে চায়, কান্নায় চায়, আনন্দে চায়, কষ্টে চায়। শুধু একটি এবং সারাজীবনের একমাত্র সাধ তার, সে অতীতকে মেলাবে বর্তমানের সঙ্গে....সে প্রেমিকা হবে, সে মা হবে, সে স্ত্রী হবে।...আর সেজন্যেই তার অপেক্ষা।'-[অ.দি./পৃ.৯৬]

রীনা তার বহুপ্রতীক্ষিত এ প্রেমিকা, স্ত্রী ও মা হবার পথে কোনো কান্না, দীর্ঘশ্বাস, নিঃস্বভাব, আর্থিক দীনতাকে রাখতে চায় না। অসচ্ছলতার অভিশাপমুক্ত হয়ে শক্ত পায়ে দীর্ঘস্থায়ী সুখের জীবন গড়তে চায়। কিন্তু আনিসের উদাসীনতায় রীনার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়–বাস্তবে রূপ নেয় না। উপরন্তু লীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া দেখেও রীনা আর ভরসা করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় রীনা নিজের বাড়িতেও সবার সঙ্গে সহজ-স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। কারণ তার চাকরির টাকায় পরিবারের ভরণ-পোষণ হওয়াতে সবাই তাকে সমীহ করে এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ফলে ছোট বোন নীনার জন্মদিনের কথা, অবসরে যাওয়া বৃদ্ধ বাবার টিউশনি করার কথা, ভাই মন্টুর ফাইনাল পরীক্ষার আগেই চাকরি খোঁজার কথা সে জানতে পারে না। এছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোনদের অপরাধী মনের অবস্থাও রীনাকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। তার ভাবনায় জেগে ওঠে–

> 'তবে কি সে সত্যিই আলাদা হয়ে গেছে আর সবার কাছ থেকে? নিজের ভাইবোন, বাবা-মা সবার কাছে সে কি আলাদা একটা অস্তিত্ব?...সে এখন সংসারের বাইরের মানুষ। একটা জটিল আর জন্মের বাঁধন কোথায় যেন আলগা হয়ে গেছে আর সে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।...আর সবাই তাকে আলাদা করে দিয়েছে মনের ভেতর থেকে।'-[অ.দি./পৃ.১০১-১০৪]

এভাবে বাড়ির আপনজনদের কাছ থেকে রীনা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর প্রেমিকের নাগাল না পেয়ে ক্রমশই হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এমন পরিস্থিতিতেই মোবারক খানের খপ্পড়ে পড়ে রীনা বলাৎকারের শিকার হয় এবং তাকে বিয়ে করতেও বাধ্য হয়। এ বলাৎকার আর বিয়ের মতো দুটি ঘটনাই রীনা-আনিসের প্রায় এক দশকের প্রেম সাধনায় করুণ পরিণতি ডেকে আনে। এসময় ভিয়েতনাম দিবস পালন ও রাজবন্দিদের মুক্তির মতো মানবিক ইস্যুতে কর্মসূচি পালন করে রাজনৈতিক দলগুলো চাঙা হতে চায়। কারণ–

> 'তখন আওয়ামী লীগের নেতারা জেলে, মাওলানা ভাসানীর দল সংগঠনে ব্যস্ত। তাঁর দলে মেলা বিরোধ, ছাত্ররা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। সরকারি দলের চাঁইরা যত্রতত্র খুন-জখম করে বেড়াচ্ছে।'-[অ.দি./পৃ. ১৩৮]

আনিস কেন্দ্রীয় নেতাদের দায়সাড়া ভাব,মিথ্যাচার এবং ভোট-বিপ্লবের আগে ভাতের দাবিতে আন্দোলনে অনীহার ভাব দেখে হতাশ হয়। সে রীনার খোঁজে বাসায় গিয়ে তার বোন বীণার ভর্ৎসনার সম্মুখীন হয়। বীণা রূঢ়ভাষায় বলে-

> ‘আপনি ভেবেছেন কী? এমনি খেয়াল খুশি মতো ঘুরে বেড়াবেন, কোনো ব্যাপারে সিরিয়াস হবেন না আর একটি মেয়ে শুধু আপনার জন্যে সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করে যাবে?...পলিটিক্সই যখন আপনার জীবন, এখন আর অন্য কোনো সম্পর্কের কথা ভাবেন কেন? কোনো মেয়ে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি কেন খেলবে বলুন?’-[অ.দি./পৃ. ১৪২]

এখানে প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন ও ব্যতিক্রম হলেও আনিসের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য*-এর হেরম্ব, *চতুষ্কোণ*-এর রাজকুমার ও *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র শশীর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যুগধর্মের প্রভাবে প্রেমাবেগ ও জীবনবেগ ফিকে হয়ে তাদের মতো আনিসকেও নিক্ষেপ করে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা আর নৈঃসঙ্গ্যের অতল গহ্বরে। আনিস রীনার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে একাকী উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। বিয়ের ব্যাপারে এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাইলে রীনা ক্ষোভের সঙ্গে বলে–

> ‘জীবনকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার মতো সাহস আমার কোনোকালে ছিল না।...তুমি কোনোদিন আমার সম্বন্ধে সিরিয়াসলি কিছু ভাবোনি। আমার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু আমাকে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হল। জীবনকে উৎসর্গ করার মতো সাহস আমার নেই। আর তাতে বিশ্বাসও করি না।’-[অ.দি./পৃ. ১৪৪]

রীনার এ অভিমানী বক্তব্যের মাধ্যমে একজন নারীর জীবনবাস্তবতায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাই বলে বিবাহ পূর্বপর্যন্ত আনিসের প্রতি তার প্রেমেও চিড় বা ফাটল ধরাতে পারেনি। তবে আদর্শবান, বাস্তববুদ্ধিহীন ও জীবনবিবাগী মানসিকতাসম্পন্ন আনিসের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিতে না পারায় বাধ্য হয়ে রীনাকে এ বিয়ে করতে হয়। সমকালীন সমাজবাস্তবতায় একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীকে মন বা হৃদয়ের চেয়ে জীবনকে গুরুত্ব না দিয়েও উপায় ছিল না। একজন পুরুষ হয়ে আনিস জীবনকে অবহেলা-অবজ্ঞা করতে পারলেও নারী হয়ে রীনার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। বিয়ের পর রীনা অতীতের সকল স্মৃতিকে ভুলে নতুন জীবন শুরু করতে গিয়েও পারে না। স্বামী মোবারক খান মুসলিম লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হতে স্পিকার, মন্ত্রী ও পার্টির কর্তাব্যক্তিদের বাড়িতে এনে আপ্যায়ন, হোটেলে আমোদ-ফূর্তির ব্যবস্থাস্বরূপ মদ ও নারী সরবরাহ করে। এমনকী নিজের পোষা গুণ্ডাদের দিয়ে প্রতিপক্ষ দলের সভা পণ্ড করে। এসব বিষয়ে রীনার-

> ‘আগে অবিশ্য ঘৃণা হত, এখন হয় না। সরকারি দলের কাজে এসব দরকার। এমনই হয়ে থাকে।’-[অ.প্র./পৃ.১৬৪]

রীনা প্রথমে হালকা আপত্তি করলেও মোবারক সুন্দরী স্ত্রীকে অন্য কাজে লাগায়। সাবেক ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী স্ত্রীকে দিয়ে মোবারক উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনামূলক বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে সংবাদপত্রে ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা করে। এতে পার্টির কর্তাব্যক্তিদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। এ পথেই রীনা–

> ‘তিনটে মহিলা সমিতির সদস্য, একটি শিশু সংগঠনের উপদেষ্টা এবং একটি নাইট স্কুলের অনারারি টিচার হয়। এ জন্যে মোবারক উদারহস্ত। তার অ্যাকাউন্টে বাড়তি পঁচিশ হাজার টাকা জমা দিয়ে রেখেছে।’-[অ.প্র./পৃ.১৬৫]

এভাবে রীনা পার্টি ও সমাজসেবামূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও সংসারে তার কোনো কাজ ও দায়ভার না থাকায় সে ভয়ানক নিঃসঙ্গ ও অস্বস্তির মধ্যে পড়ে। তার সন্তান না থাকায় যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা কোনোভাবেই দূর হয় না। বরং স্বামীর সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি হিসেবে সেও ক্রমশই ব্যবহৃত হয় । ফলে পাঞ্জাবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আফসার বাজাজকে খুশি করতে রীনাকেও সঙ্গ দিতে হয়, পছন্দের জায়গায় একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হয় এবং শরীরের সংস্পর্শেও যেতে হয়। বাজাজ ঢাকা ত্যাগের পূর্বে রীনাকে সম্ভাব্য ‘খান অ্যান্ড রেমান কোম্পানির’ ডিরেক্টর করার প্রস্তাবস্বরূপ টোপও দিয়ে যান। এতে লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে মোবারক আনন্দে আত্মহারা হয়। আর বাজাজকে না চটিয়ে আয়ত্তে রাখার অনুরোধ করে। রীনা কিছুটা আপত্তি করলে মোবারকই সকল সংকোচ দূর করতে খোলাখুলি বলে-

> ‘তোমাকে কিছুটা বিরক্ত করেছে বোধ হয়। কিন্তু ওকে মানিয়ে চলতে পারলেই দেখবে, ওর মতো লোক আর হয় না। কত লোককে সে লাখপতি বানিয়ে দিয়ে গেল।...ওপরে উঠবার জন্যে কিছু সিঁড়ি দরকার। বাজাজকে এমনি একটি সিঁড়ি ভেবে নাওনা কেন।...ওরা ওমন ছেলেমানুষি করেই থাকে। আর তুমি তো পুরুষ মানুষের সঙ্গে আগেও মেলামেশা করেছ।’-[অ.প্র./পৃ.১৬৯]

স্বামী মোবারকের কাছ থেকে সরাসরি এমন নোংরা ইঙ্গিত পাবার পর রীনা ক্ষেপে ওঠে। তাই নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করতে প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে-

> ‘যদি তোমার ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে আমাকেও একটা সিঁড়ি ভেবে থাকো, তাহলে ভুল করেছ।’-[অ.প্র./পৃ.১৭০]

রীনার এমন কথায় চতুর মোবারক রাগ করে না বরং পাঁচ বছর টাকা কামিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখী-নির্ঝঞ্ঝাট-বিত্তশালী-আভিজাত্যের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু রীনা স্বামীকে এসব ছাড়তে বলে এবং নিজের ভীষণ ক্লান্তি লাগার কথা জানায়। এসময় বান্ধবী বিলকিস আফসার বাজাজের খোঁজে রীনার বাড়িতে এলে এবং তার এ ক্যারিয়ার ও টাকা উপার্জনের বেপোরোয়া, ব্যভিচারী ও ভাসমান জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে রীনাকে বিলকিস বলে–

> 'আসলে আমরা সবাই স্বপ্ন দিয়ে জীবন গড়তে চেয়েছিলাম– যখন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম, আমাদের সেই স্বপ্নের জীবন কোথাও নেই। ফল হল– না গ্রহণ করলাম বাস্তবকে, না গড়তে পারলাম স্বপ্নকে। আমরা সবাই স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে হারিয়ে গিয়েছি।'-[অ.প্র./পৃ.১৭১]

পোড়খাওয়া জীবনাভিজ্ঞাতায় ঋদ্ধ বিলকিসের এ উপলব্ধি ও বোধের জায়গাটি প্রকৃত অর্থেই ছিল যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক। সাধ ও সাধ্য এবং প্রত্যয় আর প্রত্যাশার সমন্বয় না হওয়াতেই বিলকিস ও রীনার জীবন হতাশা, গ্লানি, বিপর্যয় ও বিচ্ছিন্নতায় জর্জর হয়ে ওঠে। তাই পয়সা ও ভোগের পেছনে ছুটে উভয়ে জীবন থেকে হারিয়ে যায়। বাজাজকে শিকার করতে এসে বান্ধবী রীনার কাছে ব্যর্থ-পরাজিত হলেও বিলকিস যে-সতর্কবাণী শোনায় তা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। বিলকিস রীনাকে বলে-

> 'তোমার নিজের দিক থেকে ডিসিশন নেবার সময় এসেছে। এবার হোম অর নো হোম। যদি বাজাজের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও, তাহলে তোমার ঘর কিন্তু ভাঙল। আর যদি না হও, তাহলে পাবলিক লাইফ থেকে তুমি বাদ পড়লে।...অ্যাম্বিশনের বেলুন ফুটো হয়ে মাটিতে পড়বে, সো ইউ মাস্ট ডিসাইড নাও।'-[অ.প্র./পৃ.১৭৩]

এমন নির্মম বাস্তবতা আর উভয় সংকটের মুখোমুখি হয়ে রীনা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। জীবন তার কাছে ক্রমশই জটিল ও যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রাজনীতি ও জীবনের পদে পদে বিপর্যয় ও ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আনিস ভেঙে পড়ে না। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে জাহিদ, বিনয় ও মিন্টুদের শ্লোগানসহ মিছিল নিয়ে যেতে দেখে। মিছিলে যোগ দিতে গিয়েও তেমন উৎসাহ পায় না। সবকিছুকেই অর্থহীন এবং পুরনো ছকে বাঁধা মনে হয়। কিন্তু মিন্টুর ডাকে ও কথায় আনিসের সম্বিত ফেরে এবং সেও মিছিলে শামিল হয়। তখন মনে হয় মানুষের জীবনে কোনো কিছুই অর্থহীন-মূল্যহীন নয়। আজকের এই ক্ষুদ্র মিছিল থেকেই হয়তো আগামী দিনের বৃহৎ আন্দোলনের সূচনা হবে। এসবই একদিন অর্থময় ও সার্থক হয়ে উঠবে। মিছিলের সংস্পর্শে এসে আনিসের ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা হালকা হয় এবং সহযোদ্ধা কাইয়ুম, খলিল ও মনিময়দের সদ্য জেলমুক্তির খবর পেয়ে মনটা আরো চাঙা হয়ে ওঠে। হাতে অফুরন্ত সময় থাকায় আনিস নিজেকে মিছিলে পুরোপুরি একাত্ম করে। তারপরও নিজের প্রেম, দেশের রাজনীতি, বিপ্লবের বিষয়ে নিয়ে এলোমেলো ভাবনা তাকে জর্জরিত করে। কারণ বেলাল, শিবেনবাবু ও দীপনারায়ণদের মতো ত্যাগী নেতারাই আন্দোলন গড়তে গিয়ে মার খাবে, জেল খেটে হারিয়ে যাবে। আর ক্ষমতায় যাবে, নেতৃত্বে বসবে সুবিধাবাদী হায়দার খানের মতো নেতারা। বিপ্লব সম্পর্কে আনিসের পর্যবেক্ষণ-

> 'বিপ্লব আসলে মায়াহরিণী, কেবলি পবিত্র যৌবনকে তা ডাক দিয়ে ফেরে। ঐ ডাক শুনে হতাশা আর ব্যর্থতার সঙ্গে লড়াই করে করে যৌবন কেবলি মৃত্যুর অমোঘ দরজার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়।...হৃদয় শুধু যন্ত্রণার আধার। হৃদয় থাকা মানেই বিপর্যয় ডেকে আনা।'-[অ.প্র./পৃ. ১৫৬]

যুগের প্রভাব আর আপসনীতি শুধু রাজনীতিকেই দূষিত-বিকৃত করেনি, বরং মানবিক সম্পর্কের জায়গাগুলোকেও সংক্রমিত করে। আনিস জেলবন্দি সহযোদ্ধা অসুস্থ শিবেন বাবুকে পুলিশ প্রহরায় দেখতে পায়। একই সঙ্গে পুরনো কমরেডদের ব্যাপারে দলের হাইকমান্ডের এরূপ অবহেলা দেখেও সে ক্ষুব্ধ হয়। তাই প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের দিয়ে রাজবন্দিদের ওপর রিপোর্টের ব্যবস্থা করে এবং সবান্ধব নেতাদের হুঁমকি দিয়ে বলে-

> 'পুরনো কমরেডদের দায়িত্ব যদি আপনারা না নিতে চান, তাহলে সেটা খোলাখুলি বলতে হবে; যদি না বলেন, আমরা আপনাদের মুখোশ খুলে দেব– তখন দেখবেন, রাজনীতি কাকে বলে?'-[অ.প্র./পৃ. ১৮৩]

আনিসদের এ সাহসী পদক্ষেপে কিছু কাজ হয়। হায়দার খানদের আগ্রহে এবং সাংবাদিকদের লেখালেখিতে রাজবন্দিদের মুক্তির আন্দোলন কিছুটা চাঙা হয়। আলোচনায় রাজবন্দির মুক্তির আন্দোলনে সব পার্টির ঐক্যস্থাপন, গ্রামাঞ্চলে কৃষক মহাজনদের লড়াই, শ্রমিক আন্দোলন, ভুখামিছিল, সরকারের খাদ্যনীতি, আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসি নিয়ে আলোচনা শেষে ঘোষণা আসে– 'দেশে বড় রকমের আন্দোলন আসছে– সেই আন্দোলনে আমাদের হাতে (বামদলের) নেতৃত্ব নিতে হবে।' আনিস ছাত্র-যুবকদের আদর্শ, আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখে ব্যথা পায়। কারণ অতীতে তাদেরকেও নেতারা

এভাবে বোঝাতো আর নিজেরাও এমনিভাবে স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত ছিল। বিপ্লব ও ক্ষমতা দখল অত্যাসন্ন বলে বাকচতুর ও তাত্ত্বিক নেতা, বড় ভাই(মুঈদ, শফিক ও মনসুর) ও কমরেডরা কর্মীদের বিভ্রান্ত করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। স্বার্থের জন্য-

> 'এরাই রাজনীতির পথে টেনে এনেছেন অনেক ছেলেকে। নিজেরা ঘরের ছেলে ঘরে গেছে– আর যারা তাদের কথায় ঘর ছেড়েছে, তাদের ঘরে ফেরার পথ নেই।'-[অ.প্র./পৃ. ১৮৯]

রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের এ ধারা শুরু হয়েছে বায়ান্ন সনের পর থেকেই। দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব বামদলের না আওয়ামী লীগের হাতে থাকবে–এমন দোলাচলের মধ্যে আনিসকে দলে টানতে বিভিন্ন দলের লোক আসে। লীগের এক নেতা আনিসকে সরাসরি তাদের দলে যোগ দেবার লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আনিস আদর্শরক্ষা, নিজ দলের বহু নেতাদের জেলবন্দি ও কর্মীদের আত্মগোপনে থাকায় রাজি হয় না। তাই রাগের সুরে লীগ নেতা বলেন-

> 'আপনি উঁচু ক্যালিবারের লোক। আপনাকে যোগ্য মর্যাদা দেব।...আমাদের পার্টিই ঠিক পথ দেখাচ্ছে। আমরা বাঙালির মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছি। আজ হোক, কাল হোক, সমস্ত বাঙালি আমাদের সমর্থন করবে দেখবেন।...আমাদের পাবলিক সাপোর্টের চিন্তা নেই– ওটা আমরা পাব। আমাদের সমস্যা হয়েছে ইন্টেলেকচুয়ালদের সাপোর্ট, আমরা তেমন পাচ্ছি না।'-[অ.দি./পৃ. ১৯১]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে সমকালীন রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের অবস্থা ও অবস্থানের চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে। যা লীগের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রভাব-প্রতাপের সঙ্গে এর উত্থানকে ইঙ্গিত করে। সুবিধাবাদী বাম নেতা ও সাবেক মন্ত্রী হায়দার খান আনিসকে দেশের স্বার্থে সকল দলের মধ্যে ঐক্য গড়ার দায়িত্ব নিতে বলেন এবং ছাত্রদের সংগঠিত করতে প্রয়োজনে টাকার লোভ দেখান। কিন্তু-'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক অধিকার কীভাবে আদায় করবেন' আনিসের এমন প্রশ্নের জবাবে হায়দার খান বলেন-

> 'আমাদের যা দেশ, তাতে কম্যুনিস্টদের শ্লোগান তুললে বিপদ হয়ে যাবে শেষে। বিদেশি সাহায্য ছাড়া আমরা এক পাও কি চলতে পারবো...আপনি নতুন সংগঠন করুন, টাকা পয়সার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি–একটা আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে। ছাত্র ছাড়া এদেশের রাজনীতি অচল।'-[অ.প্র./পৃ. ১৯৩]

হায়দার খানের এ বক্তব্যে তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হিসেব-নিকেশ থাকলেও সমকালীন রাজনীতিতে ছাত্রদের অনিবার্য ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের যে-ইঙ্গিত করা হয়েছে তা অনস্বীকার্য। এসময় সায়ীদ ও ইফতিখার আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করায় বিদ্যমান অস্থিরতা আর নৈরাজ্যে গ্রামে ও শহরের মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের কথা জানায়। তবে ইফতিখার পুলিশ, চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহাজন ও চোরদের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষক-শ্রমিক ও জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে আশার বাণী শোনায়। ইফতিখারের বিশ্বাস গ্রামের মতো অচিরেই-

> 'শহরেও তাই হবে দেখো। আর তাছাড়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলেই দেখবে কীরকম মার খায় এরা (এন.এস.এফ)। আসলে এরা কোনো ফ্যাক্টরই নয়। যখন বন্যা আসবে, তখন এদের নাম নিশানা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।'-[অ.প্র./পৃ. ১৯৪-১৯৫]

ইফতিখারের এমন যৌক্তিক কথায় আনিস দেশের রাজনীতি নিয়ে আশাবাদী হয়ে ওঠে। এসময় হায়দার খান পাঁচশত টাকা বেতনের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদক পদের প্রস্তাব দিলে এবং অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলে আনিস তা গ্রহণ করে। চাকরিসূত্রে জীবনের একটা স্থিতি পেয়ে আনিসের মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। সাংবাদিকতাকেই সে জীবনের পেশা হিসেবে বরণ করে নেয়। তবে এ চাকরিসূত্রে আনিসকেও কিছুটা আদর্শের সঙ্গে আপস করতে হয়। এসময় রীনার বোন বীণাকে এন.এস.এফ-এর রাহাত চৌধুরীর সাঙ্গপাঙ্গরা দিনে-দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করে। রাহাত চৌধুরীর এ দলকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন মুসলিম লীগের এক নেতা। এ ঘটনা ঢাকা শহরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে সাংবাদিক, বামদলের নেতাকর্মী ও বীণার ভগ্নিপতি মোবারক খানের তৎপরতায় রাহাত চৌধুরী পরদিন বীণাকে বাসায় পৌঁছে দেয়। সরকারের মদদে এদের কিছুই হয় না। পুলিশও কেস নিতে টালবাহানা করে। আর বীণার এ ঘটনাকে নিছক বন্ধুদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় আনন্দভ্রমণ বলে বিবৃতিদানের কথা বলা হয়। আনিস পত্রিকায় ক্ষুরধার ভাষায় এর তীব্র প্রতিবাদ করে লেখা ছাপায়। বোনের এ চরম অপমান-লাঞ্ছনায় নিজের অসহায়ত্বে মন্টু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে– 'একেক বার ভাবছি ওদের খুন করি। নইলে নিজে মরে যাই ওদের হাতে'। আনিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে–

> 'জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করতে...আয়োজন দরকার, অস্ত্র দরকার, তুমি একলা ওদের সঙ্গে পারবে কেন?...দেখা যাক না, কী হয়, মানুষের বিবেক জেগে ওঠে কিনা। মানুষ পশুর আক্রমণ-প্রতিরোধ করে কিনা।'-[অ.প্র./পৃ. ১২১]

রাজনৈতিক বিবেচনা আর ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভেবে মোবারক রীনাকে এবং হায়দার খান আনিসকে আপসের কথা বলেন। স্বামীর অসহায়তা, পুলিশের পক্ষপাতিত্বের কথা শুনে রীনা চুপচাপ বসে থাকে। কারণ-

> 'যখন বিনুর উপর অত্যাচার হচ্ছিল তখন সে বাজাজ এর বিছানায় শুয়ে ধন্য হচ্ছে। সিলেট যাওয়া বৃথা যায়নি। বাজাজ...করাচি যাবার সময় বলে গেছে, আগামী বিদেশযাত্রায় সে রীনাকে সঙ্গে নেবে, রীনা যেন তৈরি থাকে।'-[অ.প্র./পৃ.২০৯]

এভাবে রীনার ক্রমশ পতন শুরু হয় এবং বাজাজসহ বিল প্যাটার্সন ও বব হার্ভের কামনার ভাটিতে সিদ্ধ হতে হতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর বোনের এমন অপমান-লঞ্ছনার প্রতিকারস্বরূপ কিছুই করতে পারে না। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও জেদি বোন বীণার ওপর চার নরপশুর বর্বর আক্রমণের কথা ও ছোট দুই বোন নীনু ও নীলুর ভবিষ্যৎ ভেবে রীনার দেহ-মন অবশ হয়ে পড়ে। উপরন্তু ফোর্সড অ্যাবর্শনে হাসপাতালে বীণার করুণ মৃত্যু, বাবা-মায়ের করুণ বিলাপ-আহাজারি ও ভাইবোনদের নির্বাক অবস্থা–সবকিছুর জন্য রীনা নিজের পাপকেই দায়ী করে। মদ খেয়ে রীনা এসব দুঃসহ স্মৃতির তাড়না ভুলতে চেষ্টা করেও পারে না। এমতবস্থায় মনকে হালকা করতে মোবারক সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের প্রস্তাব দিলে সে খ্যাপা বাঘিনীর মতো বলে ওঠে-

> 'আর কত, বলো আরো কী করাতে চাও আমাকে দিয়ে? আমার কি মন আছে যে হালকা হবো? আমি মরে গিয়েছি, দোহাই তোমার আমাকে এবার রেহাই দাও।'-[অ.প্র./পৃ২২৪]

নিজের সতীত্বের বিসর্জন, নারীত্বের অপমান ও বোনের চরম লাঞ্ছনাজাত মৃত্যুই রীনাকে তার জীবন সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলে। এ প্রতিকারহীন অসহায়ত্বের অবস্থানই রীনাকে ক্রমশই বিদ্রোহী–প্রতিবাদী করে। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে রাহাত চৌধুরীর এন.এস.এফ বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি ঘটায় রীনার ভাই মন্টু বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে খুনোখুনিতে জড়ায়। ভাইয়ের বিপদে রীনা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তখনই আলোচনার জন্য ব্যবসায়ী বিল প্যাটারসন ও বব হার্ভে আসে। রীনার এসব লোকদের ঝাড়ু মেরে বিদায় করার ইচ্ছা হলেও সে পারে না। কারণ-

> 'মাত্র তিন মাস আগেই সে তাদের তোয়াজ করেছে, বিছানায় শুয়ে খুশি করেছে...এসব লোককে তো সেই ডেকে এনেছে এতকাল।'-[অ.প্র./পৃ.২৩৪-২৩৫]

একদিকে নৈতিকতার পতন-পচন, অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তি মিলে রীনার মানসিক বিপর্যয় ঘটে। তাই নিদারুণ দুঃখ-বেদনায় রীনা হেসে ওঠে আর মনে মনে বলে–'এইবার ষোলোকলা পূর্ণ হতে চলেছে।...সে এখন ঘরেও নেই, বাইরেও নেই। মাঝখানে সে ঝুলে আছে।...রীনা তুই না সুখ খুঁজছিলি, বড়লোক হতে চেয়েছিলি? এইবার দ্যাখ সুখ কাকে বলে?' রীনার বিপর্যয়ের পাশাপাশি মোবারকের বহু টাকায় ও শ্রমে গড়া ছাত্রফ্রন্ট ভেঙে গেলে সেও হতাশায় ডুবে। স্বামীর এ বেদনা ও হতাশায় রীনা তাকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে। ফলে দাম্পত্য কলহ চরমরূপ নেয় এবং স্ত্রীকে– 'মাতাল মেয়েমানুষ কোথাকার' বলে গালি দিলে রীনা প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে-

> 'অত সহজ নয় মোবারক খান। আমি সিঁড়ি নই যে আমার ঘাড়ে পা রেখে ওপরে উঠে ঠেলে আমাকে ফেলে দেবে। আই'ম নট দ্যাট ইজি। আমি তোমাকে খোঁচাব, সারাজীবন ধরে খোঁচাব। পাবলিক লাইফে তোমার মুখোশ টেনে খুলে ফেলে দিতে আমার দু-মিনিটও লাগবে না।'-[অ.প্র./পৃ.২৩৯]

জোকের মুখে নুন পড়ার মতো জবাব পেয়ে মোবারক খান ধৈর্য হারিয়ে রীনাকে চুলের মুঠো ধরে পেটায় ও গৃহবন্দি করে রাখে। সমস্ত সংসার তার নরকে পরিণত হয়। তারপরও খুনের ফেরারি আসামি ভাই মন্টুর নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়-প্রশ্রয়ের কথা স্বামীর কাছে উত্থাপন করে বিদ্রূপের শিকার হয়। রীনা তবুও দমে যায় না বরং হুমকি দিয়ে বলে-

> 'যাও তুমি পুলিশের কাছে, আমিও কাগজপত্র নিয়ে অ্যান্টিকরাপশনের কাছে যাচ্ছি, সেখানে কিছু না হলে খবরের কাগজের অফিসে যাব–তোমাকে আমি দেখে নেব।'-[অ.প্র./পৃ.২৫১]

এতে মোবারক রীনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। স্বামীর ওয়ারীর বাসা থেকে বের হয়ে রীনা বাবার বাসা মোহাম্মদপুরের দিকে যায়। এসময় স্বামীর বাড়িতে পুনরায় না ফেরা, সোজা এয়ারপোর্ট গিয়ে বাজাজের কাছে করাচি চলে যাওয়া, প্যাটার্সনের কাছে গিয়ে চাকরি চাওয়া কিংবা নিজের অ্যাকাউন্টের টাকার কথা– এমন এলোমেলো ভাবনা রীনাকে ঘিরে ধরে। কোনো সিদ্ধান্তে সে পৌঁছাতে পারে না বরং 'আমি কি আবার যাবো মোবারকের কাছে'– এমন আত্মজিজ্ঞাসার

পর রীনার উত্তেজনা আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সে ক্রমশই অবসন্ন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে ভাই মন্টুর সার্বিক সুরক্ষার দায়িত্ব সাবেক প্রেমিক আনিসের হাতে অর্পণ করে।

বীণার ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র ও থানা পুলিশের কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি হয়। 'বিনু যদি নোংরা হয়, তাহলে সংসারে পবিত্র কে'– এ কথা বলে আনিস হায়দার খানের কথার তীব্র প্রতিবাদ করেও ব্যর্থ হয়। এসময় রাহাত চৌধুরীর দল ঢাকা শহরের আরো কয়েকটি মেয়ের ওপর হামলা, কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতি আর দুটি ছেলেকে গুম করে। মানুষ প্রতিবাদ না করায় আর পুলিশ নীরব থাকায় আনিস তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। নিজেদের অক্ষমতায়-অসহায়ত্বে তার মনে একধরনের অপরাধবোধ ও গ্লানির উদ্রেক হয়। নিজের চাকরিসূত্রে আপসনীতিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হবার বিষয় এবং বীণার পাপের প্রতি ঘৃণার অনমনীয় ভাব দেখে আনিস নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং আত্মজিজ্ঞাসায় অনুভব করে-

> 'প্রেম দেখলাম, মৃত্যু দেখলাম, লোভ-হিংস্রতা-লাঞ্ছনা সব একের পর এক দেখলাম। আরো কি বাকি থাকে দেখার। কেন আমি সেই আগের মতো অস্থির হতে পারি না, কেন আমার বুকে জ্বালা ধরে না? তাহলে কি আমি মরে গিয়েছি?'-[অ.প্র./পৃ. ২১৮]

মনের এমন হতাশা ও বিপর্যস্ত অবস্থায় বন্ধু ইফতিখার গ্রাম থেকে ফিরে এসে যে-খবর দেয়, তা রীতিমতো ভয়ংকর। কারণ– 'গ্রামে ঘন ঘন গোরু চুরি হচ্ছিল। থানা পুলিশ জানিয়ে লাভ হয় না। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সঙ্গে চোরেরা প্রকাশ্যে গ্রামের হাটে ঐসব গরু বিক্রি করে দিত।...শেষে এক গোরুচোর হাটে ধরা পড়ল।...তাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলল মানুষ। আরেক জনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।' সমগ্র পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সঙ্গে প্রশাসনিক দুর্নীতি আর স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের আশি হাজার ধামাধরা মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্বৃত্তায়ন মিলে অবস্থাকে আরো নাজুক করে তোলে। এর সঙ্গে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা লোপাট, ব্রিজ ধসে যাবার ঘটনা, গরুচোরের শাস্তি, রিলিফ চুরি, হাটের খাজনা বন্ধ নিয়ে হাঙ্গামা–এসব বিষয় নিয়ে সারা দেশে উত্তেজনা বাড়ে। সেই সঙ্গে ছাত্রদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা ও এগারো দফার সম্ভাব্য খসড়া করার জোর প্রস্তুতি চলে। দেশের বিরাজমান উদ্বেগ-অস্থিরতা সম্পর্কে ইফতিখার আনিসকে বলে-

> 'কিছু একটা হচ্ছে, আমারও অনুমান। এদেশে সেপ্টেম্বর থেকে যদি নড়াচড়া শুরু হয়, তাহলে ডিসেম্বরে গিয়ে তা কিছু একটা ঘটাবেই। তুঙ্গ অবস্থায় যাবে মার্চ এপ্রিলে।'-[অ.প্র./পৃ. ২৩০]

আনিস বন্ধু ইফতিখারের এ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণীকে যৌক্তিকভাবে মেনে নিলেও আন্দোলনে সুবিধাবাদীদের উত্থান ও ক্ষমতা দখলের বিষয়ে আশঙ্কার কথা জানায়। দেশের নৈরাজ্য, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে ন্যাপের পক্ষে মওলানা ভাসানী ঊনসত্তরের ছয় জানুয়ারি গভর্নর হাউস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি এবং সাত জানুয়ারি হরতালের ডাক দেন। এ হরতালের সাড়া ও সাফল্য নিয়ে আনিসের মনে কিছুটা দ্বিধা-সংশয় থাকলেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখে–

> 'পথঘাট খাঁ খাঁ করছে। আর তাই দেখে চমক লাগল তার। হাঁটল কিছুক্ষণ রাস্তা ধরে। রাস্তায় একটা রিকসা নেই, গাড়ি নেই... কোথাও কাউকে দেখল না যে পিকেটিং করছে।'-[অ.প্র./পৃ. ২৪৪-৪৫]

জনগণের এ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়াতে এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের গঠন ও তাদের সিদ্ধান্ত খবরের কাগজে ছাপা হতে দেখে আনিস আশাবাদী হয়ে ওঠে। সাত তারিখের মতো আট তারিখেও ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। পুলিশের হামলা ও দমন-পীড়ন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জেদ ও প্রতিরোধও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে। ফলে–

> 'আগরতলা মামলার কেস যেদিন ট্রাইবুনালের কোর্টে ওঠে, সেদিন সারা ঢাকা শহর থমথম করে।'-[অ.প্র./পৃ. ২৪৭]

এ মামলার সত্য-মিথ্যা নিয়ে মানুষজন মাথা না ঘামিয়ে বরং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জেগে ওঠে। আসামিদের ত্যাগে ও বীরত্বে সারা দেশের মানুষ আরো উজ্জীবিত হয়। এ আন্দোলনে পুলিশি জেল-জুলুম ও দমন-পীড়নেও ভাটার ভাব না আসায় আনিস রীতিমতো অবাক হয় এবং নতুন কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখতে পায়। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের স্থানীয় খুঁটিগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। তারপরও আনিস ইফতিখারকে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার বিষয়কে খাটো করে দেখতে বারণ করে। কারণ ছয় দফার লক্ষ্য ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে ভীত হয়েই যে-আইয়ুব খান শেখ মুজিবসহ অনেককেই আগরতলার মামলা দিয়ে ফাঁসাতে চাইছেন– আনিসের এ পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি ছিল যথার্থ ও বাস্তবসম্মত। এসময় প্রেসক্লাবের পাশে কয়েকজন তরুণ বক্তৃতা করে এবং শ্লোগান তুলে-

> 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'-[অ.প্র./পৃ. ২৫০]

এ শ্লোগানকে মন্টু 'নতুন' বলায় আনিস প্রতিবাদ করে এবং বহুপূর্বে ভাসানীর ঘোষণা দেয়া– 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা চাই– স্বাধীন পূর্বপাকিস্তান চাই' এমন শ্লোগানের কথা উল্লেখ করে। তবে ছয় দফাভিত্তিক বর্তমান সময়ের– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো' শ্লোগানের স্পিরিটকে আনিস অস্বীকার করতে পারে না। উনসত্তরের বিশ জানুয়ারি আনিস ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে এসে ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যুর খবর পায়। আবার জাহিদের মুখে শুনে পরদিন একুশ জানুয়ারি ধর্মঘটের বিষয়। সব দেখে আনিসের মনে হয়, যে-সময়ের জন্য শিবেন বাবু, দীপনারায়ণ, রহিম, খোকন ও মিন্টুরা প্রতিনিয়ত কামনা করতো, সেই প্রহর এখন দ্বারপ্রান্তে। এ প্রহরের অর্গল আসাদ তার বুকের রক্তে খুলে দিয়েছে এবং এতে বীণার সম্ভ্রম তথা প্রাণদানের অবদানও রয়েছে। এসবের বিনিময়েই আজ-

> 'ঢাকার বাতাসে বারুদের গন্ধ।...রাস্তায় রাস্তায় সতর্ক সন্তর্পণ পদক্ষেপ। দেয়ালের পাশে কারা পোস্টার সেঁটে যাচ্ছে।...ঢাকা আর সে ঢাকা নেই। ঢাকা এখন বিক্ষুব্ধ, ঢাকা এখন রক্তাক্ত, ঢাকা এখন রাস্তায় ব্যারিকেড তোলা বিদ্রোহের নগরী।'-[অ.প্র./পৃ. ২৫৩]

পরের দিন ঢাকার রাজপথে নীরবে মিছিল শুরু হলেও তা বেশিক্ষণ শান্ত থাকে না। কারণ মিছিলের সামনে বাঁশের মাথায় ঝোলানো আসাদের ধূলিধূসরিত, ছোপ ছোপ কালচে লালরক্তের শার্ট দেখে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইফতিখারের শ্লোগান আর রহিম-খোকনদের মুষ্টিবদ্ধ দৃপ্ত শপথের হাত উঁচিয়ে বুক চিতিয়ে চলা মিছিল ক্রমশই মারমুখী হয়ে ওঠে। কারণ-

> 'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
> জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
> উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।
> ... ...
> ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
> মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট
> শহরের প্রধান সড়কে
> কারখানার চিমনি-চূড়ায়
> গমগমে এভেন্যুর আনাচেকানাচে
> উড়ছে উড়ছে অবিরাম
> আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
> চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
> আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্রমানবিক,
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'-[শামসুর রাহমান/*আসাদের শার্ট*]

বুকে ক্রোধ, মুখে শ্লোগান আর চোখে শপথের বিদ্যুৎচ্ছটা নিয়ে ঢাকাবাসী রাজপথে নামে। অসংখ্য পুলিশের অবস্থান ও মাথার ওপর দিয়ে সামরিক হেলিকপ্টারের প্রদক্ষিণও মানুষকে দমাতে পারে না। এর মধ্যে মিছিলে পুলিশের গুলিতে নবকুমার স্কুলের ছাত্র মতিউরকে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করলে আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। তাই মানুষ সকল ভয়-ভীতি-আশঙ্কা ভুলে জলপ্রপাতের মতো রাজপথে নেমে আসে। সেনাবাহিনী,পুলিশ ও সরকারের গুণ্ডাবাহিনী দিয়েও এ জনস্রোতের ঢলকে থামানো যায় না। কারণ-

> '...পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
> বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
> কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?'-[মাইকেল মধুসূদন দত্ত/*মেঘনাদবধ কাব্য*]

মিছিলে বহুকণ্ঠে বজ্রের মতো ঘোষিত হয়– 'জেলের তালা ভাঙব– শেখ মুজিবকে আনব, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো– বাংলাদেশ স্বাধীন করো'– এসব শ্লোগান। সরাসরি বাংলাদেশকে 'স্বাধীন' করার ঘোষণা বারুদের পিণ্ডের মতো চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুলে। পল্টন ময়দানে ভাসানীর পড়ানো গায়েবানা জানাজা শেষে উত্তেজিত মানুষ বক্তৃতায় মনোযোগ না দিয়ে মিছিল নিয়ে প্রথমে হাজি আব্দুল গণি রোডের এক মন্ত্রীর লালবাড়িতে আগুন দেয়। তারপর সরকারি বাস ও পত্রিকা অফিসে আগুন দিয়ে মিছিল কার্জন হল ও হাইকোর্টের মাঝখান দিয়ে যাবার সময় উত্তেজিত জনতা রাস্তার দুপাশের লোহার গ্রিল ভেঙে বল্লমের মতো বানিয়ে বাংলা একাডেমির কাছে পৌছায়। আর তুমুল শ্লোগান তুলে আগরতলা মামলার প্রধান

বিচারপতির বাড়িতে আগুন দেয়। ঢাকার সচিবালয়, প্রেসক্লাব, তেজগাঁও, বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউমার্কেট এলাকায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আর সব জায়গায় পাল্লা দিয়ে উপস্থিত থাকতে গিয়েও আনিস পারে না। কিন্তু-

> 'তার বড় সাধ সব জায়গায় থাকবার। একখানা সাইকেল যোগাড় করেছে সে, তবু পারে না।...সাইকেল চেপে শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে।'-[অ.প্র./পৃ. ২৫৫]

বিপদের আশঙ্কায় জাহিদ, রহিম, হাসান, সায়ীদরা প্রেসক্লাবের দিকে চলে আসলেও ইফতেখার মিছিলের সামনেই থাকে। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশের গুলির শব্দ, চিৎকার ও হল্লা শোনা যায়। তখন-

> 'চারদিক থেকে স্লোগান হচ্ছে হুঙ্কারের মতো, মানুষের পদভারে রাস্তা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওরই মধ্যে আবার শীতের বাতাস থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তাতানো শহরের গায়ে।'-[অ.প্র/পৃ. ২৫৮]

এমন পরিস্থিতিতে আনিস ইফতিখারকে না দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে। তাকে খুঁজতে ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা ইফতিখারের তাজা রক্তে রাঙানো লাশ দেখতে পায়। ইফতিখারের মুখকে আনিসের কাছে 'বাংলাদেশের মুখ' বলে মনে হয়। একে একে মনে পড়ে ইফতিখারের রাজপথের দিনগুলো, তার পরিবারের কথা, বীণা, রীনা, লীলা, লীলার মায়ের কথা। তারপরও আনিস পুরাতনকে বিদায় দিয়ে–'মিছিল, স্লোগান, বারুদের গন্ধ আর ধোয়াচ্ছন্ন আকাশের মুখোমুখি' হয়েও সামনের পথে পা বাড়ায়। কারণ বাকি কাজ সমাপ্ত করতে যে-সহযোদ্ধার প্রয়োজন, এ পথেই তাদের সাক্ষাৎ মেলবে। এ মুহূর্তেই আনিসের আত্মজিজ্ঞাসায় স্থান পায়-

> 'এই জন্যেই কি অপেক্ষা করে থাকে মানুষ? এই রকম বাঁধ ভাঙা প্রপাতের ঢল হয়ে নামবার জন্যে? এই জন্যেই কি এতো আয়োজন, এতো বেদনা, এতো কান্না মানুষের?'-[অ.প্র./পৃ. ২২৪]

সামষ্টিক শোক মানুষকে কাতর করে না, বরং এ শোক থেকেই শক্তির উদ্বোধন ঘটে। সঙ্ঘশক্তির সাধনা ও জনপ্রপাতের ঢলে শোষকের লৌহ দুর্গের পতন ঘটবে এবং শোষণমুক্ত এক মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে– এমন শপথ ও বিশ্বাস নিয়েই আনিস রাজপথে নামে। ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বপ্নের চেয়ে দেশ ও দশের মুক্তি ও মঙ্গলভাবনাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে।

শওকত আলীর *অবশেষে প্রপাত* উপন্যাসের সঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* এবং জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* উপন্যাসের চেতনা ও ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। *চিলেকোঠার সেপাই*-তে ওসমান যেমন রাজপথের সকল ঘটনা অবলোকন করে এবং শেষে চিলেকোঠার ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বের হয়ে বৃহৎ আন্দোলনে শরিক হয়, তেমনি *অবশেষে প্রপাত*-এ আনিসও জেল থেকে বের হয়ে ঢাকা শহরের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন শেষে আন্দোলনে একাত্ম হয়। দুটি চরিত্রই সমগ্র উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ তাদের প্রেক্ষণবিন্দু (point of view) দ্বারা অবলোকন করেছে। এ পর্যবেক্ষণ সূত্রে ওসমান যেমন ভিক্টোরিয়া পার্ক, নবাবপুর রোড, ওয়ারী এলাকা মারিয়ে চিলেকোঠায় ফেরে; তেমনি আনিসও সচিবালয়, প্রেসক্লাব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঢাকা মেডিকেল ও নিউমার্কেট এলাকার গণআন্দোলনের চিত্রপট দেখে ধানমন্ডির বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। আবার *চিলেকোঠার সেপাই* এর বামকর্মী আনোয়ার যেমন উত্তরবঙ্গের গ্রামে গিয়ে রাজনীতিতে জড়ায়, তেমনি *অবশেষে প্রপাত* উপন্যাসেও ইফতিখার আর মাহমুদও পাবনা-যমুনার চরাঞ্চলে গিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে *চিলেকোঠার সেপাই*-তে ঢাকা শহরের সঙ্গে গ্রামের চিত্র বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হলেও *অবশেষে প্রপাত*-এ তা বিস্তৃত রূপ পায়নি। এতে ঢাকাকেন্দ্রিক রাজনীতির চালচিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। *চিলেকোঠার সেপাই-তে* যেমন হাড্ডি খিজির ও চেংটু নষ্ট রাজনীতিতে বলির শিকার হয়; তদ্রূপভাবে *অবশেষে প্রপাত*-এ ইফতিখার ও আসাদের করুণ মৃত্যু হয়। ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক কর্মীদের চেতনাস্রোত, মৃত্যু ও আন্দোলনের যে-গণজোয়ার সৃষ্টি হয়– তা উভয় উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়।

আবার জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী*-র মতো কয়েকটি পরিবারের ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে শওকত আলীও *অবশেষে প্রপাত* উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন এবং আইয়ুব খানের পতনকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই *অগ্নিসাক্ষী*-র মধুরিনা, সাদেক, মুনির সুলতান ও বুলনের সঙ্গে *অবশেষে প্রপাত*-এর যথাক্রমে রীনা, মোবারক, আনিস ও ইফতিখারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। জহিরুল ইসলাম তাঁর উপন্যাসে যেমন বামকর্মী আসাদ, মতিউর ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের আত্মদানের প্রসঙ্গ এনেছেন, অনুরূপভাবে শওকত আলীও তাঁর এ উপন্যাসে এসকল চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এরূপ সাদৃশ্য থাকার পরেও শওকত

তাঁর এ উপন্যাসের শেষে আইয়ুব খানের পতনকে বাধভাঙা প্রপাতের ন্যায় রাজপথে এনে জনজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু অপর লেখকদ্বয়ের উপন্যাসে তা তেমন জোরালোভাবে দেখা যায় না। এখানেই শওকতের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার প্রাতিস্বিকতা। দুই দশকব্যাপী পাঞ্জাবি গোষ্ঠীর সীমাহীন শোষণ-বঞ্চনায় অতিষ্ঠ বাঙালির পুঞ্জিভূত বেদনা-ক্ষোভ ও আক্রোশ ঊনসত্তরে এসে যে-গণবিস্ফোরণে রূপ নেয়– এ গণজাগরণের সম্মোহনী দুর্বার শক্তি-সাহসকে তিনি বাধভাঙা জলপ্রপাত বা ঢলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উঁচু স্থান থেকে জলধারা বা ঢলের সবেগে পতনের মতোই সজ্ঞবদ্ধ মানুষের বিপ্লব তথা জনস্রোতের তাণ্ডবে উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত মহাশক্তিধর স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের ক্ষমতার মসনদ ভেসে যায়। জন অসন্তোষের এ রুদ্রমূর্তির কাছে আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং যার ফলশ্রুতিতে তার পতন ঘটে। সার্বিক বিবেচনায় উপন্যাসের এ নামকরণ যথার্থ, প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অধিকার আদায়ে কীভাবে মানুষ সজ্ঞবদ্ধ হয়– তা দেখানোই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের এই সজ্ঞবদ্ধ হওয়াকে শওকত প্রপাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এ আহ্বান একটি জনগোষ্ঠীকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখায়। আর এ উপন্যাসে যে-বিপ্লব বা গণআন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তা একটি জাতির আত্মপ্রকাশের পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ।[৫৫] *অবশেষে প্রপাত* উপন্যাসটি বাঙালির ঐতিহাসিক পথচলার বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে তুলে ধরেছে এদেশের গৌরবময় সংগ্রামের কথা। পাকিস্তানি স্বৈরাচারের লৌহনিগড় ভেঙে অপরাজেয় বাঙালির মুক্তির শিল্পভাষ্য হয়ে উঠেছে এ উপন্যাস। বায়ান্ন, বাষট্টি, ছেষট্টি, ঊনসত্তর, সত্তর ও একাত্তরের সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে-অগ্রযাত্রা– এ উপন্যাসে শওকত আলী সেই মহাকাব্যিক যাত্রার উজ্জ্বল পরিসমাপ্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।[৫৬] যা সার্বিক বিবেচনায় হার না মানা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের এক সতর্কসংকেত।

অবশেষে প্রপাত একটি রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস। লেখক মূল আখ্যানের সঙ্গে ছোট ছোট কাহিনি জুড়ে দিয়েছেন মূলত স্বৈরাচারী শাসকের শোষণ কালকে চিহ্নিত করতে। এ শোষণ মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিশৃঙ্খল করে তোলে। তাই মানুষ বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্যক্তির হতাশা ও নৈরাজ্যই শেষ পরিণতি নয় বরং এ নৈরাজ্যের গহ্বর থেকে এক সময় নবজন্ম হবে বিপ্লবের, প্রজ্বলন ঘটাবে চেতনার আর দেবে উজ্জীবনের প্রেরণা। যখন একলা আমি-র ভুবন ছেড়ে যখন বহু আমি-র প্রাঙ্গণে এসে ব্যক্তির সজ্ঞশক্তির অভিষেক ঘটে, তখনই অর্জিত হয় বিরাট সাফল্য। ব্যক্তির স্তর পেরিয়ে সমষ্টির চেতনায় উপনীত হতে পারলেই যেকোনো মহৎ অর্জনই সম্ভব– শওকত আলীর *অবশেষে প্রপাত* এমন শুভসংকেতেরই এক অনবদ্য শিল্পভাষ্য।

দলিল

শওকত আলীর *ওয়ারিশ* (১৯৮৯খ্রি.) এবং *দলিল* (২০০০খ্রি.) যুগল উপন্যাস। *ওয়ারিশ*-এ যে-কাহিনিবৃত্তের বিস্তার ও বিকাশধারা বর্ণিত হয়েছে; তারই শৈল্পিক পরিণতি ঘটেছে *দলিল* উপন্যাসে । *ওয়ারিশ*-এর সাংবাদিক রায়হান, ছেলে রঞ্জু, মঞ্জু ও স্ত্রী বীথি চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও ঘটনার ধারাবাহিক যোগসূত্র উপস্থাপিত হয়েছে *দলিল* উপন্যাসে। আত্মজৈবনিকতার অনুষঙ্গও মাঝেমধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে *ওয়ারিশ*-এ যেখানে ফ্লাশব্যাক করে সাতচল্লিশের দেশভাগ-পূর্ববর্তী ভারতের মোহনগঞ্জের প্রধানবাড়ির বিষয়-আশয় প্রাধান্য পেয়েছে, এবং আশির দশকের ঢাকার চিত্র ছিল যৎসামান্য; সেখানে *দলিল*-এ স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলের গোটা আশির দশক জুড়ে চলমান অপশাসন ও নৈরাজ্যের চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ দুই উপন্যাসের প্রকাশকালের মধ্যে প্রায় এক দশকের ব্যবধান থাকলেও কাহিনির সঙ্গে চরিত্রের সমন্বয় ও সাযুজ্য বেশ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। *ওয়ারিশ* যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে *দলিল* উপন্যাসের হয়েছে শুরু। এরূপ যুগলবন্দি উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণদেবতা* ও *পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে। এ যুগলবন্দি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন- 'These two books are in reality, one novel in two parts.'[৫৭] এ কথাটি *ওয়ারিশ* ও *দলিল* উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ *দলিল* *ওয়ারিশ*-এর অনুবর্তী উপন্যাস। তাই সকল বিবেচনায় বলা যায়, *ওয়ারিশ* ও *দলিল* অভিন্ন একটি উপন্যাসেরই দুটি অংশ।

দলিল উপন্যাসের সাংবাদিক রায়হান *ওয়ারিশ* উপন্যাসে মোহনগঞ্জের পৈতৃক বাড়ির ওয়ারিশ বাবদ ফুপাতো ভাই শাহাব উদ্দিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা, চাকরির অগ্রিম বেতন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে উত্তোলিত টাকার সমন্বয়ে এক লক্ষ টাকায়

সাভারের ফুলবাড়িয়ার চার শতাংশ জমি ক্রয় করে। জমি ক্রয় করা, দখলে নেয়া, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নে এ জমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হবার ঘটনাসমূহ এখানে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের এ কাহিনির উপর প্রভাব পড়েছে লেখকের জীবনে ঘটে যাওয়া অনুরূপ আরেক ঘটনার[৫৮]। সে-প্রেক্ষাপট থেকেই শওকত রচনা করেছেন *এ দলিল* উপন্যাস। শওকতের *দলিল* উপন্যাসটি ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব, উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ এবং আবহমানকালের দলিল হয়ে জীবনধারায় গতিশীল। ভাঙচুর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনের তাবৎ সঞ্চয় এই প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হয়। এখানে ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ-রাষ্ট্রকাঠামোকেও বোঝানো হয়েছে; বোঝানো হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈপরীত্যের অনুভবের ধরনকে, সে-ধরনে কতখানি ব্যবধান–তার রূপান্তর প্রত্যক্ষ করি গভীরভাবে। এক্ষেত্রে *দলিল* অনিবার্য এক অধ্যায়।[৫৯] অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলায় জন্মগ্রহণকারী এই ত্রিকালদর্শী (ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামল প্রত্যক্ষকারী বিবেচনায়) কথাসাহিত্যিকের অন্যতম নিবেদন *দলিল* উপন্যাসখানি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের একটি মাইলফলকস্পর্শী আন্দোলনের পূর্ব-পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধকে ছুঁয়ে যাওয়া বৃহৎ কলেবরের এই উপন্যাসটি একই সঙ্গে কতিপয় মানুষ ও তাদের সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে।[৬০] উপন্যাসের শুরু হয়েছে চার প্রজন্মের ভোগদখলকৃত একটি দলিল পাঠের মধ্যে দিয়ে। সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণে ব্রিটিশ শাসনামল, ছেচল্লিশের দাঙ্গা,সাতচল্লিশের দেশভাগ, পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়ন, একাত্তর ও একাত্তর-পরবর্তী প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ দলিলের অবয়বে। বাংলার সব চেয়ে খাঁটি যে-জিনিস, সেই মাটির মালিকানার দলিল; এমন দলিল পাঠ এবং তার ব্যাখ্যা ও প্রতিব্যাখ্যায় সমকালীন সমাজজীবনের সংকট বিশ্বস্ততার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে।

রায়হান রাজধানী ঢাকার দৈনিক *গণ একতা* পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক। তিন ছেলে ও স্ত্রী বীথিকে নিয়ে গুলিস্তানের পার্শ্ববর্তী ওয়ারী এলাকায় ভাড়া বাসায় তার টানাটানির সংসার। অনিশ্চিত সাংবাদিকতার উপার্জন দিয়ে বাসা ভাড়া মিটিয়ে বড় ছেলে রঞ্জুর মেডিকেল কলেজের, মেজো ছেলে মঞ্জুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ছোট ছেলে টুকুর ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। বাসা ভাড়া এড়ানোর পাশাপাশি পরিবারের একটি শক্ত ভিত্তির জন্য স্ত্রী বীথির পীড়াপীড়িতে রায়হান সাভারের ফুলবাড়িয়ার চকে জমি কিনতে সম্মত হয়। সঙ্গে থাকে স্থানীয় জমির দালাল বাহারউল্লাহ মুনশি। মুনশি কেবল এক কালের জমিদার চন্দ্রমোহন ঘোষের হাতফেরি হয়ে বৃন্দাবন কামারের ভোগদখলে আসা জমিই দেখায় না, বরং অত্যন্ত মোহনীয় ভঙ্গিতে আশেপাশের প্রত্যেক জমি ও জমির মালিকের ইতিবৃত্তও তুলে ধরে। জমির বর্তমান ও অতীত মালিকদের পরিচিতি সূত্রে বের হয়ে আসে এই ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও নানা ঘটনাপ্রবাহ। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় জমির মালিকশ্রেণি তথা জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচার-অনাচার, শোষণ-জুলুম ও সুখ-দুঃখের টুকরো টুকরো কাহিনি। জমিদার চন্দ্রমোহন ঘোষ, ললিতমোহন ঘোষ ও মহাজন নন্দগোপাল সাহার পারিবারিক কাহিনির ভেতর দিয়ে উন্মোচিত হয়ে আসে উত্তাল ব্রিটিশ আমল, সিপাহিবিদ্রোহ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ ও সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের ঐতিহাসিক দলিলের ঘটনাসংকেত। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের কারণে পূর্ববাংলার হিন্দু জমিদার-জোতদার-মহাজনরা জলের দামে জমিজমা বিক্রি করে। জমি বিক্রির হিড়িক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মন্থর হয়ে আসে। কারণ স্থানীয় মুসলমানরা তা পয়সা দিয়ে না কিনে বরং বিনামূল্যে জবর-দখল করার ফন্দি-ফিকির করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মুসলিম লীগের রাজনীতি ও নেতাকর্মীদের লোভ-লালসা। এমন পরিস্থিতি সমগ্র পূর্ববাংলার মতো সাভার-ফুলবাড়িয়ার ক্ষেত্রেও ছিল প্রযোজ্য। এ বিষয়ে রায়হানকে বাহারউল্লাহ জানায়-

> 'হ্যাষে পাকিস্তান হয়-হয় স'ম বাবু বাইরাইলো।...বাবু আইজ কইলকাতা যায়, কাইল ঢাকা যায়, পরশু মৈমনসিংহ যায় আর ঘুইরা ফিরা সম্পত্তি ব্যাচে। জমিদারি তো নাই। খাস জমি গণি বেইচ্যা দেয়। তয় পরথম কিছু বেচতে পারলো–হ্যাষে আর পারে না। ঐ স'ম কে কার জমি কিনে কন, সব বাবু খালি জমি বেচতে চায়। বাবুগো উত্তর চকের ব্যাকটি জমি বেইচ্যা দিল পানির দামে। কিন্তু পাকিস্তান হইয়া গেলে তাও পারে না। মাইন্ষে কয় হিন্দুগো জমি ট্যাহা দিয়া ক্যান্ কিনতে হইবো, এ্যাম্নেই পাওয়া যায় কতো।'- [*দলিল*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৮ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/পৃ.২৮-২৯]

দাঙ্গা ও দেশভাগের হুজুগে হাতি-ঘোড়া-ফিটন-বজরার ঐশ্বর্য এবং দুর্গাপূজায় কলকাতা থেকে আগত যাত্রা পার্টির ঐতিহ্যে মোড়া জমিদার ললিতমোহনদের ঘোষবাড়ির পতন শুরু হয়। নায়েব চণ্ডীচরণ দে-র শোষণ-স্বেচ্ছাচারিতা, ছোট দুই জজ-ব্যারিস্টার ভাইয়ের কলকাতায় বসবাস এবং দেনার দায়ে জমিদারির বহু অংশ নিলাম হওয়ার ঘটনা বহুপূর্বেই আসন্ন পতনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। বাকি যতটুকুই অবশিষ্ট ছিল তাও দাঙ্গা ও দেশভাগের অভিঘাতে শেষ হয়ে যায়। এ করুণ অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে বাহারুউল্লাহ বলে-

'হঠাৎ একদিন ভোরবেলা হুনি, বাবু নাই, পাঁচ মাইয়া আর পরিবার লইয়া কইলকাতা ভাগছে। ক্যাম্নে গেল, কী বিত্তান্ত, কুনো মানুষ ট্যারও পাইলো না–চিন্তা কইরা দ্যাহেন; বিষয়টা কেমুন! চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি হালাইয়া মানুষ ক্যাম্নে পলায়?...রায়ট টায়ট শান্ত হইয়া গেলো কিন্তু বাবু আর ফিরত আইলো না।'-[*দলিল*/পৃ.২৯]

রাজনৈতিক অভিঘাত ছাড়াও জমিদার, জোতদার ও মহাজন শ্রেণির সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচারের কারণে গরিব প্রজা ও প্রতিবেশীর সহানুভূতি লাভেও এরা ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক এ অস্থিরতা ও মানবিক বিপর্যয়ের অভিঘাতে শুধু ঘোষ বাবুরা নয়, বরং নন্দগোপাল সাহারা, রাজবাড়ির নগেন দত্তরা, বিক্রমপুরের হালদাররা, দিনাজপুর-সাভার-ধামরাই-মানিকগঞ্জের মতো অন্যান্য হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক ও বহু পেশাজীবীর মানুষ চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে রাতারাতি দীনহীন হয়ে ভারতে যায়। এমনি দুঃসহ বেদনার কথা ও হৃদয়ের রক্তক্ষরণের পরিচয় পাওয়া যায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড*, কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রা*, প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকা*, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, রমাপদ চৌধুরীর *বনপলাশীর পদাবলী*, মহাশ্বেতা দেবীর *আঁধার মানিক*, আবদুল মান্নান সৈয়দের *ভাঙা নৌকা* ও *ইছামতির এপার-ওপার*, মাহমুদুল হকের *কালো বরফ* এবং হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসে। সাধারণত বিত্তবানেরা সবকিছু গুছিয়ে, সুযোগ বুঝে দেশত্যাগ করে। কিন্তু মধ্যবিত্তরা হঠাৎ করে গিয়ে বিপদে পড়ে। আর নিম্নশ্রেণির মানুষেরা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও বসতভিটাতেই পড়ে থাকে। বিত্তবানদের দেশত্যাগের নানাবিধ কারণ সম্পর্কে বাহারউল্লাহ বলে-

'ক্যাম্নে থাকে কন্? পাকিস্তানে মুসলমানগো রাজত্ব, হিন্দু হইয়া কি থাকতে পারে? সমাজ-সামাজিকতা আছে, মরণ-বাঁচন আছে, পোলামাইয়ার বিয়াশাদি আছে–খুব মুশকিল অগো এই দ্যাশে থাকা।'-[*দলিল*/পৃ.৩০]

এ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ঘৃণা আর অবিশ্বাস মানুষকে বর্বর পশুতে পরিণত করে। তাই ধর্মের নামে শুধু ঘরবাড়ি, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আর জমি-জিরাত দখল করেই উগ্র মানুষজন ক্ষান্ত ছিল না বরং নির্বিচারে হত্যার সঙ্গে জাতিনাশ করতে চলতো ধর্ষণের মচ্ছব। ফলে পরিবারের সম্মান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে বিত্তবানেরা পৈতৃক ভিটেমাটি ও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। সাভারের বনমালী দত্তের মতো বহু হিন্দু মানুষ এসব কারণে আর টিকতে পারেনি। বাহারউল্লাহর মুখে এসব শুনে রায়হানের স্মৃতিতেও জেগে ওঠে ফেলে আসা পৈতৃকভিটা মোহনগঞ্জের কথা। নব্যসৃষ্ট পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সংখ্যাগুরু মুসলমানরা যে-বিরূপ ব্যবহার ও মনোভাব পোষণ করে, ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপরও হিন্দুরা ঠিক অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় দেয়। ফলে রায়হানের বাবা মুর্শেদ আলীকে যেমন পালিয়ে পূর্বপাকিস্তানে আসতে হয়, তদ্রূপভাবে ললিতমোহনকেও পালিয়ে ভারতে যেতে হয়। কারণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও দেশ-ভূগোল নির্বিশেষে সকল সংখ্যালঘুরই কোনো স্বদেশ কিংবা আত্মপরিচয়ের গৌরব ও মর্যাদা থাকে না। তাই মোহনগঞ্জের মতো কিষণগঞ্জ, ইব্রাহিমপুর, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতেও মুসলমানদের তাড়াতে, বাড়িঘর-জমিজিরাত দখলে নিতে লুটপাট, হত্যা ও ধর্ষণের হোলিখেলা চলে। রায়হানের মনে পড়ে নিজেদের মোহনগঞ্জের প্রধানবাড়ির দুর্গতি, মুংগের আর কাটিহার রেলওয়ে কলোনির দাঙ্গার বীভৎস রূপ ও নারকীয় উল্লাস। সেদিন মনু সিপিমা রায়হানকে চিলেকোঠায় না লুকালে তারও নির্মম মৃত্যু ঘটতো। স্মৃতিসূত্রে রায়হান-

'স্পষ্ট দেখতে পায় সামনের একটি বস্তি ঘিরে বহু লোকের ভিড়–চিৎকার আর থেকে থেকে হুঙ্কারের মতো স্লোগান–জয় মা কালী, জয় শিব শঙ্কর, হর হর মহাদেব–এইসব।...ঐ ধোঁয়া, চিৎকার আর মানুষের ছুটোছুটির মধ্যে সে হঠাৎ দেখে, একটি বাচ্চা ছেলের দুই পা ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে লোহার ল্যাম্পপোস্টে মাথাটা আছড়ানো হলো।...আর কাটিহার রেলওয়ে কলোনির পাশের বস্তিটা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।'-[*দলিল*/পৃ.৩৩-৩৪]

ভারতীয় হিন্দুদের 'জয় মা কালী, জয় শিব শঙ্কর'– এমন শ্লোগানের বর্বর কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পূর্ববাংলার নবগঠিত পাকিস্তানি মুসলমানদের 'আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবির'– শ্লোগানের মাধ্যমে। মানুষ হত্যার এমন বর্বর ও নারকীয় বীভৎস ঘটনা শৈশবকালে দেখে বাহারউল্লাহও স্বাভাবিক থাকতে পারেনি। তাই সে বলে-

'স্যার কী কমু, কী অবস্থা মাইন্ষের ওইস'ম। আহ্হারে–দূর থিকা দ্যাখছি ইস্টিমার ঘাটে ভিড়ে না...আগুন দেহি, আর দেহি মানুষ পলায়, পলাইন্যা মানুষের পিছ থিকা ক্যাম্নে কোপায় দ্যাকছি স্যার। পিচ্চি পোলাপানের গলায় কোপ ঝাড়ে আর নারিকেলের মতন মাটিতে পইড়া গড়াইয়া যায়।...স্মরণ হইলে শরীলের পশম খাড়াইয়া যায়। একটা কথা স্যার অহনও মনে আছে–একজন আরেক জনরে কইতাছে এক কোপে কাটবি জবাই করবি না।'-[*দলিল*/পৃ.৩৩]

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মতো জাপানি সৈন্যরাও চীনের নানকিংবাসীদের (১৯৩৭) উপরও এরূপ গণহত্যা চালায়।[৬১] রায়হানের মনে মানুষের এমন প্রতিকারহীন করুণ মৃত্যু ও শিকড়বিচ্ছিন্ন হবার পেছনে শুধু দাঙ্গা আর দেশভাগকেই দায়ী মনে হয় না। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞানের পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত-

'মানুষের ঠাঁইবদলের ঘটনা কি একবার-দুইবার? মহামারি, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ, দুঃশাসন–সবই তো ভিটেমাটি ছেড়ে পালাবার কারণ। কখনো পুব থেকে পশ্চিমে, কখনো পশ্চিম থেকে পুবে–উত্তরের মানুষ দক্ষিণে নেমে এসেছে, কখনো আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরেও চলে গেছে।...খালি তো ঠাঁই বদলের ঘটনা।'-[*দলিল*/পৃ.৪০]

এ কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের পর পূর্বপাকিস্তানের সকল স্থানের মতো ঢাকা-সাভার এলাকাতেও মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা হিন্দুদের ঘরবাড়ি, জায়গাজমি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জাল দলিল করে দখলে নেয়। আর সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। আবার পয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রভাবে স্বৈরাচার আইয়ুব খান হিন্দুদের সম্পত্তিকে 'শত্রু সম্পদ' (enemy property) ঘোষণা করায় মুসলিম লীগের নেতাকর্মী ও সুযোগসন্ধানীরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ঘোষ বাবু আর সাহা বাবুদের ঘরবাড়ি ও জমি আইদর আলী, নকুল বোষ্টম, জনৈক মারোয়ারী, কফিল উদ্দিন, আইয়ুব আলী ও সবদর আলীরা লিজ কেটে ও জাল দলিল করে জবর দখলে নেয়। একাত্তরের যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দেশত্যাগের পালা পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। তারা মিয়া ক্যাপ্টেনের মতো সুযোগসন্ধানীরা এসব হিন্দুসম্পত্তি নতুন করে দখলে নেয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সর্বহারা পার্টির তাণ্ডব, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন, স্বৈরশাসক এরশাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির কারণে এক শ্রেণির ভূমিদস্যুর উদ্ভব ঘটে। যারা প্রশাসন ও উঠতি পুঁজিপতিদের সঙ্গে আঁতাত করে জমি দখলে মেতে ওঠে। সেই সঙ্গে শুরু হয় হত্যা, গুম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্যের মচ্ছব। এসব খবরের মধ্যে প্রাধান্য পায়-

'কোনো এক মাতবরের ছেলে নাকি ছ'মাস ধরে লাপাত্তা–নয়ারহাটের ওষুধ কারখানায় (গণস্বাস্থ্য) যেসব মেয়েরা কাজ করে, তারা নাকি সাইকেল চেপে গাঁয়ের পথে ঘোরাঘুরি করে।...ওদিকে সাভার কলেজে ছাত্রদের ইলেকশন নাকি সামনের মাসে। এবার নাকি রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। কারণ জমির চেয়ারম্যানের ছেলে জসিম নাকি এবার ভিপি হবেই।'-[*দলিল*/পৃ.২৬]

এরশাদের স্বৈরশাসনামলে একদিকে যেমন হত্যা, ধর্ষণ, খুন-গুম, আতঙ্ক ও নৈরাজ্য বাড়ে, তেমনি নারীদের সংসারবৃত্ত থেকে বেরিয়ে সাবলম্বী হবারও ইঙ্গিত মেলে। এ দুঃশাসনকালে পোড়খাওয়া রায়হান নাগরিক জীবনে একটি নিরাপদ ঠিকানার জন্য সাভারের ফুলবাড়িয়াতে জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই বৃন্দাবন কর্মকার ও আব্বাস উদ্দিনের জমির দলিলে ভেজাল থাকায় কুতুবউদ্দিনের জমির (ঢাকার শাজাহানপুরের সাদেক খানের বায়না করা অংশ থেকে) চার কাঠা কিনতে সম্মত হয়। তাই সে জমির অপর অংশীদার সাদেক খানের বাসায় যায় এবং মোট দশ কাঠা জমি থেকে চার কাঠার বন্দোবস্ত করে। সাদেকের স্ত্রী মেরির সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় পা ফসকে গেলে রায়হান জড়িয়ে ধরে তার পতন ঠেকায়। ফলে-

'একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তার। চল্লিশোর্ধ্ব ভারী শরীরের মাংসল স্ফীতি যে দেহের স্নায়ুকোষে ঝঙ্কার তুলতে পারে সেটা তার জানা ছিল না।'-[*দলিল*/পৃ.৯০]

এমন ঘটনা এবং সুন্দরী-প্রাণোচ্ছল মেরির পুনরায় বাসায় বেড়ানোর আহ্বান–সব মিলিয়েই রায়হানের মনে আলোড়ন তুলে। উপরন্তু মেরির কৌশলে বাসে চেপে জমি দেখার জন্য ফুলবাড়িয়ায় যাওয়া, মেরির আগ্রহে বাসে ঘনিষ্ঠ হওয়া, কুতুবউদ্দিনের বাড়িতে যেচে বেড়াতে যাওয়া এবং একান্তে সময় কাটাতে নৌকায় ঘুরে বেড়ানো– এসব রায়হানকে ভেতরে ভেতরে ভাবিয়ে তুলে। এজন্য সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে-

'বুড় বয়সেও নিজেকে তুই লুকোতে চাস? ভেতরে ভেতরে তুই লম্পট; মেরির সঙ্গ উপভোগ করিস তুই! ওর আকর্ষণ তোর কাছে ক্রমেই বাড়ছে আর সেই জন্যেই গোপন রাখছিস সবকিছু।'-[*দলিল*/পৃ.১৪১]

মরিয়ম খান মেরি ফরিদপুরের মেয়ে এবং টেক্সটাইল কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষক সাদেক খানের স্ত্রী। চল্লিশোর্ধ্ব মেরি দুই ছেলে দুই মেয়ের জননী। বড় মেয়ে চন্দনা ঢাকা মেডিকেল কলেজে রঞ্জুর সহপাঠী। বিত্ত-বৈভব আর আভিজাত্যে মোড়া থাকলেও মেরির দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। তাই সে জীবনের অপ্রাপ্তি-অতৃপ্তির কথা রায়হানকে জানাতে অকপটে বলে-

'আমার ছেলেমানুষিটাই আপনাদের চোখে পড়ে, ভেতরে যে আমার কী জ্বালা, সেটা কেউ দেখে না–গত দুটো বছর একটা রোগী নিয়ে পড়ে আছি...আমার জীবনটা শেষ করে দিল। পুরুষ মানুষ, মানুষ না, বুঝলেন?...সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছে।'-[*দলিল*/পৃ.১৩৬-১৩৭]

মেরির এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেমন তার জীবনের দুঃখ-বেদনা, অতৃপ্তি-বঞ্চনার কথা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সমকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্দয়-নির্মমতার প্রতি একধরনের ঘৃণা ও প্রতিবাদের সুরও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। দুই বছর যাবত শয্যাশায়ী স্বামীকে দেখভাল করতে করতে মেরি হাঁপিয়ে ওঠে। তাই সে হাঁফ ছাড়তে জমি দেখার নাম করে চলে আসে

এবং ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। মেরি নিজের অতৃপ্ত ও বঞ্চিত যাপিত দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ উন্মোচনে দুঃখের ঝাঁপি খুলে দেয়। তাই স্বামী সম্পর্কে বলে-

> ‘খারাপ ভাবলে ভাববে–জীবন আমাকে কী দিয়েছে? কিছু দেয়নি, বরং নিয়েছে। এমন এক স্বামী পেয়েছি, যে চাকরির উন্নতির জন্য আমাকে বারবার ব্যবহার করেছে। কতজনের বিছানায় যে আমাকে যেতে হয়েছে, আমি নিজেই এখন বলতে পারব না। আমাকে নষ্ট করেছে ও, আবার ও-ই আমাকে ছুঁতো না। এখন তো মুরোদই নেই–কিন্তু আমার তো বয়স আছে, আমি রক্ত মাংসের মেয়ে মানুষ, আমি খারাপ হব, বেশ করব। আমার যা ভালো লাগে, তা আমি ছিনিয়ে নেব। তোমরা পুরুষ মানুষেরা যা খুশি ভাবতে পারো।’-[*দলিল*/পৃ.১৫৮-১৫৯]

মেরির এ বক্তব্যে কেবল তার জীবনের দুঃখ-বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনাই উন্মোচিত হয়নি বরং হৃদয়হীন স্বামী তথা পুরুষতন্ত্রের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা ও তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। যা সমকালীন উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাতারাতি বিত্তবান হবার নেশায় ঘরের বউকে সমৃদ্ধির সিঁড়ি বানাবার চরম অবক্ষয়েরও ইঙ্গিতবাহী। স্বামীর প্রতি সীমাহীন ঘৃণা, আক্রোশ আর ক্ষোভ থেকেই মেরি নিজের চাহিদা ও বাসনাকে উদ্দাম করে তোলে। রায়হানের প্রতি তার এ প্রেম ও দৈহিক আকর্ষণের ব্যাপারটি শুধু অতৃপ্তি চরিতার্থ করা নয় বরং স্বামী সাদেকের প্রতি এক ধরনের প্রতিশোধ তোলাও বটে। বিয়ের প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মেরি জানায়-

> ‘প্রথম রাতে এমন জন্তুর মতো ব্যবহার করল যে আমার রীতিমতো ভয় ধরে গেল। ভাবীকে বলে ফেললাম, এমন মানুষের সঙ্গে কেমন করে সারাটা জীবন কাটাব? শুনেছিলাম, নতুন বিয়ে হওয়ার পর মেয়েরা নাকি স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু আমার বেলায় হলো উল্টো।...যতদিন বাপের বাড়ি ছিলাম, ততদিন এটা ওটা ছুঁতো দেখিয়ে দূরে সরে থাকতাম। কিন্তু যখন ঢাকায় নিয়ে এলো, তখন কোনো ছুতোই আর টিকল না–প্রত্যেক রাতে মনে হতো, আমাকে রেপ করা হচ্ছে।’-[*দলিল*/পৃ.২০১]

বিয়ের প্রথম রাত থেকেই স্বামী, শারীরিক সম্পর্ক ও দাম্পত্যজীবন বিষয়ে মেরির এক বিরূপ ধারণা জন্মায়। এর জন্য সাদেকের প্রেমহীন-প্রীতিহীন স্বভাব, মর্ষকামী মনোভঙ্গি এবং স্ত্রীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রী ভাবার মানসিকতাই দায়ী। উপরন্তু সাদেক তার চাকরির উন্নতি ও সাফল্যের জন্য মেরিকে যে কর্তাব্যক্তিদের কাছে ভোগের ভেট হিসেবে পাঠাতো, সেখানেও মেরি অনুরূপ জান্তব আচরণেরই মুখোমুখি হতো। সব মিলিয়েই মেরির দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন ছিল নরকের সমতুল্য। তাই মেরি অর্থপিশাচ-ঘৃণ্য মানসিকতার স্বামী ছাদেককে ডিভোর্স দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রায়হান সন্তান-সংসার ও স্বামীর অসুস্থতার কারণে এসব করতে নিষেধ করায় মেরি প্রতিহিংসার হাসি হেসে জানায়-

> ‘ও তো ওর বস্-এর কামরায় রাত বারোটার সময় আমাকে রেখে আসতে পেরেছিল, কত বয়স তখন আমার? আঠারো, নয়তো উনিশ। মফস্বল শহরের মেয়ে কীইবা বুঝতাম।...খুলনা সার্কিট হাউসে প্রথম আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।...শুধু কি ঐ একবার? বহু বস্-এর কাছে আমাকে যেতে হয়েছে। ছোট ছেলেটার বাপ সাদেক কিনা এ ব্যাপারে এখনো আমার সন্দেহ হয়। আর একাত্তরের কথা? ঐ সময়ের কথাও কি ভুলে গেছি আমি? একবার শুধু কিছু বলে দেখুক–একটা একটা করে সব ঘটনার কথা আমি বলে দেব।’-[*দলিল*/পৃ.৩২৬]

মেরি স্বামী সাদেকের কাছে থেকে কোনো প্রেম-ভালোবাসা ও সম্মান তো পায়-ই নি বরং তাকে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং একাত্তরের মতো দুর্যোগকালীন সময়ে স্বার্থ-হাসিল ও নিরাপত্তার সিঁড়ি হতে হয়েছিল। ভোগের ভাটিতে সিদ্ধ হওয়া মেরির মনে তাই স্বামীর প্রতি কোনো মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জন্মায়নি বরং বারবার আঘাত-আক্রমণ করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। আবার রায়হানও তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে সাড়া না দেয়াতে কটাক্ষ করে বলে-

> ‘তোমার কি বাইরে মুখ দেখাতে লজ্জা হবে? একি অদ্ভুত কাণ্ড তোমাদের–ফূর্তি করার সময় এক পা এগিয়ে থাকো, কিন্তু দায়িত্ব নেবার বেলাতে নেই।’-[*দলিল*/পৃ.৩২৭]

মেরির কথায় নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এ নিরন্তর প্রতারণা, ভণ্ডামি, দায়িত্বহীনতা, লোভ ও লালসার যে-ইঙ্গিত মেলে–তা শুধু সমকালীন নয় বরং সর্বকালিক। পুরুষ, পুরুষের মনস্তত্ত্ব ও পুরুষের সমাজের প্রতি মেরির এ পর্যবেক্ষণ, সীমাহীন ঘৃণা ও প্রতিবাদী চেতনা তার বোধের দীপশিখা জ্বালিয়ে দেয়। তার এ প্রাগ্রসর চেতনার সঙ্গে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও শরৎচন্দ্রের *চরিত্রহীন*-এর কিরণময়ী ও সাবিত্রী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চতুষ্কোণ*-এর মালতী ও সরসী এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র কুসুমের বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। রায়হান বহু চেষ্টা করেও মেরির সঙ্গ ও সংস্পর্শ এড়াতে পারে না। সামাজিক সম্মান ও অবস্থানের চাপ-তাপ থাকার পরেও কিছুটা লিবিডোতাড়িত হয়ে *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র কুমুদ আর *পদ্মানদীর মাঝি*-র কুবেরের মতো রায়হানও মতিঝিল পত্রিকা অফিসে না গিয়ে মেরির বাসায় যায়। আষাঢ়ের ঝড়-বৃষ্টির অন্ধকারময় অনুকূল পরিবেশে এবং মেরির আগ্রহে উভয়ের দৈহিক সম্পর্ক ঘটে। রায়হান বাধা দিয়েও মেরিকে এড়াতে পারে না। কারণ-

> ‘ঐ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বিচিত্র একটা উষ্ণ, স্ফীত, মাংসল-দলন-মলনের মধ্যে পড়ে যায়, আর তাতে তার গলার স্বর গাঢ় ক্বাথ-ভর্তি অন্ধকার কূপের মধ্যে কোথায় যে ডুবে যায় সে নিজেই বুঝতে পারে না।...দুজনে বয়স্ক অভিজ্ঞতা দিয়ে হঠাৎ জেগে ওঠা শরীরের ঝড়ো আবেগটাকে নিপুণভাবে উপভোগ করে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি তখন।’-[*দলিল*/পৃ.১৫৮]

স্ট্রোকের রোগী রায়হানের বুকের ব্যথার আশঙ্কার মধ্যেই এমন ঘটনা ঘটে। তবে মেরির কণ্ঠে তার অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা শুনে রায়হানের মনে রাগ-ক্ষোভের পরিবর্তে একধরনের সহানুভূতির সঞ্চার হয়। এরপরও রায়হান তার চাকরির ক্যারিয়ার, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের স্বার্থে চার সন্তানের জননী মেরির পরকীয়ার মোহ ও পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়। এ জন্য সে মেরিকে পাশ কাটায়। তাই মতিঝিল পত্রিকা অফিস থেকে ওয়ারীর বাসা পর্যন্ত ইচ্ছে করেই বৃষ্টিতে ভিজে। কারণ হিসেবে রায়হান নিজেকে বলে– ‘নামুক আমার ওপর আরো বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাক আমার পাপ।’ কিন্তু মেরির কূটকৌশলের সঙ্গে সে পারে না। ফলে একাধিকবার শরীরী সম্পর্ক ঘটে। যার ফলস্বরূপ মেরির কাছ থেকে রায়হানকে শুনতে হয় এক চরমবার্তা। মেরি রায়হানকে বলে-

> ‘আমি তোমার বার্ডেন হব না...আমি একরকম রেডি, সাদেককেও গত রাতে বলে দিয়েছি...ডিভোর্স করব।...তোমার বউকে জানিয়েছ?...তুমি যদি না পারো, আমি যাই তাহলে আজ সন্ধ্যার পর তোমার বাসায়।’-[*দলিল*/পৃ.৩৩৭-৩৩৮]

মেরির গর্ভবতী হবার কথা শুনে রায়হান বাস্তবিকই দুশ্চিন্তায় পড়ে। কারণ মেরিকে বিয়ে করাও যেমন তার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি পরিত্যাগ করাও দুরূহ ব্যাপার। একদিকে পারিবারিক অশান্তি, মান-মর্যাদা যাবার ভয় আবার অন্যদিকে মামলা, জেল ও চাকরি যাবার আতঙ্ক। এসময় দেশব্যাপী নৈরাজ্য, হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, খুন ও গুমের ঘটনায় স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন চাঙা হয়ে উঠলে ঘরে-বাইরে রায়হানের অশান্তি বেড়ে যায়। কারণ সরকারের সঙ্গে আপসনীতি না বিরোধনীতি গ্রহণ করা হবে– তা নিয়ে পত্রিকা অফিস দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে। আপসকামী সিদ্ধান্তকে রায়হান মেনে নিতে পারে না। কারণ বাম দলের প্রতি আগাগোড়াই রায়হান আস্থাবান ও আপসহীন। অথচ এ সাংবাদিকতার পেশা বেছে নেবার পর রায়হানের উপলব্ধি হয়; সংবাদপত্র ছোট আর বড় বলে কথা নয় সবগুলোই ছদ্মবেশী আর আপসকামী। সামরিক স্বৈরশাসকগণ রাজনীতির পাশাপাশি ব্যক্তির আদর্শ ও নৈতিকতার ভিত্তিকেও কলুষিত করে। তাই ব্যক্তিজীবনের এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় রায়হানকে ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ ও একাকী করে তোলে। ‘সে কি এই অন্ধকার থেকে আর কখনো বের হতে পারবে’–এমন আত্মজিজ্ঞাসা ও ধিক্কারে রায়হান শেষ পর্যন্ত কুলোতে পারে না। তাই স্ত্রী বীথিকে চরম সত্যটি জানিয়ে বলে-

> ‘আমাকে আবার বিয়ে করতে হবে।...মেরি ওর হাজবেন্ডকে ডিভোর্স করবে। তারপর বিয়ে হবে আমাদের–এখন ও প্রেগন্যান্ট এছাড়া আর উপায় নেই।’-[*দলিল*/পৃ.৩৪৯-৩৫০]

একথা জানানোর পরেও রায়হান স্বস্তিবোধ করে না বরং অব্যাহত বিবেকের দংশনে সে পুনরায় স্ট্রোক করে। হাসপাতালে যাবার সময় বীথির হাত ধরে বলে– ‘আমি মারা যাচ্ছি, তুমি আমাকে মাফ করে দিও। আমি সব কিছু হারিয়েছি, আমার কোনো স্মৃতিও থাকবে না।’ একদিকে স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কা এবং অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনের অনিবার্য সংকট বীথিকে মর্মমূলে কশাঘাত করে। সেই সঙ্গে সংসারের মায়া আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে–

> ‘বিশ্বাস কত ঠুনকো জিনিস, সংসার কী রকম অর্থহীন একটা ব্যাপার...প্রয়োজনেই সম্পর্ক হয়, প্রয়োজন ফুরোলে সম্পর্কও আর থাকে না।’-[*দলিল*/পৃ.৩৩৫]

এ জন্যই তার মনে পড়ে মীরা-খায়রুল, মাজেদা আপা ও তার সাংবাদিক স্বামী এবং বান্ধবী নাশিদ ও তার প্রবাসী স্বামীর মধ্যেকার দাম্পত্যজীবনের ফাঁকি-বিশ্বাসভঙ্গের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এ ঘটনা থেকেই রায়হান-বীথির দাম্পত্যসংকট ও দূরত্ব বাড়ে। রায়হান সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে আসলেও দূরত্ব ঘুচে না বরং রাতযাপনের শয্যা বিচ্ছিন্ন হয়ে তা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়। তারপরও বীথি স্বামীর এ পরকীয়া ও ব্যভিচারী জীবনের কথা নিজের ছেলেদের কাছে ক্ষুণাক্ষরেও প্রকাশ করে না। উপরন্তু সেবা-শুশ্রূষায় রায়হানকে সুস্থ করে তুলে। কিন্তু সে–

> ‘এখন স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে থাকে না। ছোট ছেলের সঙ্গে আলাদা এক ঘরে শোয়। কিন্তু কাউকে সে কিছু বুঝতে দেয় না।’-[*দলিল*/পৃ.৪০৪]

এভাবে বীথির সংসার চলে। তাই বলে সে সংসারকে অবহেলা করে না। রায়হানের অসুস্থতার জন্য ছেলেরা টাকা-পয়সার বিষয়ে চিন্তিত হলে বীথি তার সোনার গহনা দেখিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেয়। আবার কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় সে ওয়ারী মহিলা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিও জুটিয়ে ফেলে। এভাবে বীথি তার সাংসারিক নৈপুণ্য, দক্ষতা, ধৈর্য আর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে পারিবারিক বিপর্যয়কে সামলে নেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মধ্যবর্তিনী* ছোটগল্পের নিবারণ-হরসুন্দরীর মতো রায়হান-বীথির মাঝখানে এক অদৃশ্য বাধার দেয়াল ও দূরত্ব বিদ্যমান থাকে। তাই– ‘বিছানার ধারে সেই আগের জায়গা থেকে কখন যে- সে সরে যায় নিজেই তা বুঝতে পারে না।’ তবে এ পরিস্থিতি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কারণ ফুলবাড়িয়ার

জমিতে টিনের ছাপরা তৈরি করা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর দূরত্বের বরফ গলতে শুরু করে। আবার বড় ছেলে রঞ্জুর এম.বি.বি.এস পাশ করার ঘটনায় অবশিষ্ট দ্বিধা ও সঙ্কোচ দূর হয়। জীবনের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং প্রত্যাশা-প্রাপ্তির সমন্বয়হীনতার জন্য বীথি শেষ পর্যন্ত নিজের নিয়তিকেই দোষারোপ করে। অথচ তার এ স্বপ্নভঙ্গ ও মনোবেদনার মূলে মন্দভাগ্য নয় বরং স্বৈরশাসনামলের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, দস্যুবৃত্তি, দুর্নীতি, কালোবাজারি ও দুর্বৃত্তায়নের বিষফলই সার্বিকভাবে দায়ী।

এ দাম্পত্যসংকটের সঙ্গে এসে যোগ হয় ছেলেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি মাস্তান বাহিনী ছাত্রসমাজের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের ত্রিদলীয় সংঘর্ষের উত্তাপ। মঞ্জু একাধিক বার সন্ত্রাসী হালার শিকার হয় । আর ছোট ছেলে টুকু সহপাঠীদের সঙ্গে নেশায় জড়ায়। কিন্তু জীবনবাস্তবতার প্রতি অতি সচেতন, চৌকস আর বুদ্ধিদীপ্ত রঞ্জু সম্পর্কে বাবা-মা ও ভাইদের পর্যবেক্ষণ বেশ স্বচ্ছ ও স্বস্তিকর। সুযোগ থাকার পরেও এক বছর অপেক্ষা করে পরিবেশ বুঝে তারপর রঞ্জু মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ওঠে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীন ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে রঞ্জুর অভিমত-

> 'ওরা নিজেদের পার্টি নিয়ে দলাদলি করে। হয় শেখ মুজিব, না হলে জিয়া, নয়তো এরশাদ–এইসব লিডারদের গ্রুপে গ্রুপে কম্পিটিশন।'-[*দলিল*/পৃ.৭০]

রঞ্জুর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাতাশি সনের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রসমাজ ও বামদলীয় ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গ্রুপিং-বিভাজন, অস্ত্রের মহড়া, হল দখল, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, ভাড়া খাটার বিষয়গুলো উন্মোচিত হয়েছে। তবে রঞ্জু ছাত্রদল নেতা মনিরের কক্ষে ওঠাতে তার সম্পর্কে সকলের মধ্যে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। এ জন্যই এরশাদের মাস্তানবাহিনীর সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের ক্যাডার ফেরদৌস তার বন্ধু মঞ্জুকে বলে-

> 'রঞ্জু ভাইকে হোস্টেল থেকে বাড়ি চলে যেতে বলবি– ওদের হোস্টেলে জোর গোলমাল হবে–ওখানে আমরা সুবিধা করতে পারছি না বলে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে...আমি শুনেছি রঞ্জু ভাই ছাত্রদলের সাপোর্টার–ঐ দলের একপাণ্ডা ওর রুমমেট। দুজনের নাকি খুব বন্ধুত্ব।'-[*দলিল*/পৃ.৭৩]

সরকার দলীয় ছাত্রক্যাডার ফেরদৌসের বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রসমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্বল অবস্থান, অস্ত্র ও পেশীশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, গুণ্ডা-মাস্তান বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতাসহ শিক্ষাঙ্গনের চরম নৈরাজ্যের ইঙ্গিত মেলে। রঞ্জুর এ দায়িত্ববোধ শুধু পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যশোরের ঝিকরগাছার মেয়ে সহপাঠী শাহনির দুর্দিনেও সে তাকে সাaনা দেয়, নিজেদের বাসায় নিয়ে আশ্রয় দেয়। কারণ শাহনির মেজো ভাইকে তারই সর্বহারা পার্টির লোকজন অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। সমকালীন বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রীদের ভুল লাইন, ভুল তত্ত্ব আর নেতাদের ক্ষমতা ও স্বার্থের বলি হয় অসংখ্য সম্ভাবনাময় তরুণ। এদের হারিয়ে সে-পরিবার ও স্বজনদের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শাহনির পরিবারের এ বিপর্যয়ের সূত্রেই রঞ্জু-শাহনির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে রঞ্জুর পরিবারের মৌন সমর্থনও দেখা যায়। কিন্তু তা বাস্তবে রূপ নেয় না। শাহনি ঢাকা শহরের বিত্তবান সহপাঠী আরমানকে বিয়ে করে। প্রেমিকা শাহনির এমন প্রবঞ্চনাপূর্ণ ব্যবহারেও রঞ্জুর তেমন প্রতিক্রিয়া বা ভাবাবেগের প্রকাশ পায় না। বরং সে বেকার ডাক্তারদের চাকরির দাবিতে বি.এম.এ-র আহ্বানে ডাকা ধর্মঘট আন্দোলনে শামিল হয়, আটাশির বন্যায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করে এবং ঝুঁকি নিয়ে বামপন্থী বিপ্লবীদের চিকিৎসা করে। সমকালীন বাংলাদেশের বামদলের স্বরূপ, ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে রঞ্জুর পর্যবেক্ষণ-

> 'অন্যসব আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির মতো সর্বহারা পার্টিতেও বহু রকমের ভাঙচুর হয়েছে।...শ্রেণিশত্রু খতমের লাইন থেকে অনেক গ্রুপই সরে এসেছে। তবে অনেক গ্রুপ আবার ঐ লাইন ধরে রেখেছে। অবশ্য কোনো কোনো গ্রুপ স্রেফ লুটপাট করে চাঁদা তুলে মানুষের ওপর জুলুম করে।...একসময় গণবাহিনী আর জাসদের সঙ্গে সর্বহারাদের খুব খুনোখুনি হতো।'-[*দলিল*/পৃ. ৪৪৫-৪৪৬]

রঞ্জু ডাক্তারি পাশ করে ইন্টার্ন-এর সময় আবার রাজনীতিতে জড়ায়। স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সহযোদ্ধা ডা. মিলনের মৃত্যুতে–

> 'রঞ্জু ছুটে বেরুল পিজির বি.এম-এ অফিসের দিকে।...শাহনি কাছে ছিল, সে হাত ধরে টেনে থামায়।...রঞ্জু কোনো কথা না বলে জোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দেয় একটা।'-[*দলিল*/পৃ.৫৯৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহিদ জিহাদের লাশ ছুঁয়ে আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলের নেতাকর্মীরা স্বৈরাচার এরশাদের পতন ঘটানোর জন্য শপথ নেয়। জিহাদ হত্যার ঘটনাই আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় আর ক্রমশ তা মারমুখী হয়ে ওঠে। ছাত্রনেতা আতিক এবং ওসমানদের ঠেলাগাড়িতে বাঁশের লাঠি নিতে দেখে রঞ্জু আরো উজ্জীবিত হয়। অন্যান্য মানুষের মতো রঞ্জুও দেশ ও দশের কল্যাণে, মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারে রাজপথের মিছিলে নামে।

স্বৈরশাসনের কুফলজাত এ সন্ত্রাসবাদ, লুটপাট, দুর্নীতি ও জবরদখলের শিকারে পরিণত হয় রায়হানের স্বপ্নের বাড়ি করার জমিটি। দুষ্কৃতিকারী ফাতু আমিন ও সেতু মিয়া মহুরির সহযোগিতায় গরীবুল্লাহর নাতজামাই প্রভাবশালী হারিস আলী ঘরসহ জায়গাটি দখল করে। রায়হান প্রথমে একা মোকাবিলা করতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। যা রায়হানের কাছে-

'গুলিস্তানের মোড়ে তাকে কান ধরে একবার ওঠবস করিয়েছিল পাকিস্তান আর্মি। এ যেন তার চাইতেও বেশি।'-[*দলিল*/পৃ.৪৮৭]

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রায়হান সাভার থানার ওসি, এস.পি,চেয়ারম্যান ও এম.পি-র কাছে দৌড়াদৌড়ি করেও বিফল হয়। উপরন্তু থানার হাবিলদার ও চেয়ারম্যানের যেচে আশি হাজার টাকার বিনিময়ে আপসের প্রস্তাব শুনে রায়হান রীতিমতো বিস্মিত হয়। আবার দখলকারী হারিস আলী আগ বাড়িয়ে ইনজাকশন মামলা ঠুকে দিলে রায়হানের মতো একজন সিনিয়র ও প্রভাবশালী সাংবাদিকের পক্ষেও করার কিছু থাকে না। এসব অন্যায়, অনাচার আর হাতাশার কথা শুনে রায়হানকে তার উকিল বন্ধু মাহফুজ জানায়-

'অবশ্য এ দেশে এখন সবই সম্ভব।...নানান কৌশল করে ছোট ছোট হোল্ডিঙের জমি লোকাল গুণ্ডাপাণ্ডার সাহায্য নিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে একশ্রেণির নব্যধনী। পদ্ধতিটা খুব সোজা। উল্টা পাল্টা কাগজপত্র তৈরি করে মামলা মোকদ্দমা চাপিয়ে দিচ্ছে গরিব মানুষদের ওপর। তখন বাধ্য হয়ে তারা আপোশ করছে। আপোশ মানে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে জমিটা ছেড়ে দেওয়া। ল্যান্ড গ্র্যাবিঙের এই এক কায়দা দেশজুড়ে চলছে।...বাংলাদেশের নতুন দুই ক্লাস...নিও-বুর্জোয়া আর লুম্পেন প্রলেতারিয়াত হাত ধরাধরি করে বেড়ে উঠেছে।'-[*দলিল*/পৃ.৪৯৭]

মাহফুজের এ পর্যবেক্ষণ সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর ক্ষেত্রে ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ স্বৈরাচার এরশাদের দুঃশাসনে চোর-ডাকাত, মজুতদার, ব্লাকমার্কেটিয়ার, স্মাগলার, ড্রাগট্রেডার ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে কালোটাকার পাহাড় জমে সবাই ফুলে ফেঁপে ওঠে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন জেঁকে বসে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় উঠতি পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের ভূমিদস্যু মানসিকতা। সমকালীন এ নষ্টরাজনীতির তাপ-চাপ রায়হান মেজো ছেলে মঞ্জুকেও দগ্ধ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াসূত্রেই মঞ্জু প্রেম-বিরহ ও বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে জড়ায়। স্বৈরাচার এরশাদের অপশাসন ও অনাচার তাকেও বিপর্যস্ত ও বিপথগামী করে। কারণ স্বৈরশাসনের লোভ, ঘুষ-দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের বিনাশী টানে সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও আমলারাও পতন-পচনের তলানিতে নামে। তাই-

'সাংবাদিকরা...কেউ কেউ সরকারের দালালি করছে...কেউ কেউ আবার সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর কর্তাদের কাছে থেকে ব্ল্যাকমেইল করে ঘুষের বখরা আদায় করে আর বিদেশি দূতাবাসগুলোতে ঘুরঘুর করে বেড়ায়...ইউনিভার্সিটির টিচাররা...এনজিও প্রজেক্টে কাজ করছে...ছাত্রনেতাদের আর্মড ক্যাডার বানানো...পরে তারা চাঁদা তুলে, লাইসেন্স হাতায়, কন্ট্রাক্ট বাগায়। ৬৮/৬৯-এর খোকা আর পাঁচ-পাত্তুর-এর মতো ২/৩টি নাম শোনা যেত–এখন তো গণ্ডায় গণ্ডায় এমন নাম শোনা যায়।'-[*দলিল*/পৃ.৬১]

মঞ্জুর দীর্ঘদিনের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফেরদৌস এস.এস.সি পরীক্ষায় লেটারসহ পাস করেও পারিবারিক অশান্তিতে এরশাদের গুণ্ডাবাহিনীতে নাম লেখায় এবং মিছিল পণ্ড, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। ফেরদৌস সরকারি নির্দেশে বিশেষ সুবিধায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং হলে অবস্থান করে ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়ায়। আবার মধুর ক্যান্টিনে বসে চিহ্নিত সন্ত্রাসী টাটা ও নীলাকে দেখে মঞ্জু অবাক হয়। উত্তপ্ত ক্যাম্পাসে চলার পথেই মঞ্জুর সঙ্গে সহপাঠী রাখি মিত্রের পরিচয় ঘটে। উভয়ের পিতার বন্ধুত্ব ও একই দিনে হাসপাতালের একই কেবিনে জন্মানোর পরিচয়সূত্র মঞ্জু ও রাখীর প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু চাঁদা ও বখরার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং গোলাগুলির তাণ্ডবে মঞ্জু ক্লাস করতে পারে না। এসময় টাটা আর বাবুল ফেরদৌসকে হত্যা করে। পুলিশি ঝামেলার কারণে বড়ভাই রঞ্জুর সঙ্গে মঞ্জুকেও রংপুরে বড় চাচার বাড়িতে আত্মগোপনে থাকতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশে, বন্ধু ফেরদৌসের নির্মম মৃত্যু, টাটা-নীলা-বাবুলদের ভয়ংকর চেহারা, পুলিশের তৎপরতা ও মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে মঞ্জু জটিল অবস্থায় পড়ে। ফলে জেলখানা, ফাঁসির মঞ্চ, রাস্তায় রক্তাক্ত ফেরদৌসের লাশ মনের ভেতর উঁকিঝুঁকি মারলে মঞ্জু স্বাভাবিক থাকতে পারে না। তাই মঞ্জু-

'মনের ভেতরে ফেরদৌসের মুখ দেখে। আর দেখে ওই মুখের পেছনে আরো কয়েকজনের মুখ– তবে এ মুখগুলো অস্পষ্ট– টাটা, বাবুল আর নীলার মুখ–তিনখানাই সে চিনতে পারে।...আর তার বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।...ফেরদৌসের মৃত্যুর কারণে তাকেও মরতে হবে।'-[*দলিল*/পৃ.২২৯]

মৃত্যুভয় ও খুনের বিষয়টি প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণায় মঞ্জু ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হয়। সেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *চাঁদের অমাবস্যা*- উপন্যাসের খুনের প্রত্যক্ষদর্শী যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর মতো শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পায় না। তবুও সকল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতেই একদিন খুব ভোরে মঞ্জু ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে। প্রথম কয়েকদিন গৃহবন্দির মতো

থাকলেও পরে রাস্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যায়। এ ক্যাম্পাসেই মঞ্জুর সামনে রাখিকে সরকারি দলের নেশাগ্রস্ত মাস্তানরা তুলে নিতে গেলে মঞ্জু বাধা দিয়ে গুরুতর আহত হয়। আবার নিউমার্কেট এলাকায় দুই মাস্তান আবু আর সাবু রাখিকে দিনে দুপুরে তুলে নিয়ে যায়। মঞ্জু প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে পিঠে রদ্দা লাগায়। মঞ্জু মাঝরাতে জানাতে পারে-

> 'আবু আর সাবু দুই বন্ধুর কাজ ওটা। না, পুলিশ কেস হয়নি–কেন হবে? ওরা তো সরকারি দলের ছেলেদের সঙ্গে ঘোরে, রাখিকে ওরা ঠিক মতো বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছেও দিয়েছে।'-[*দলিল*/পৃ.৩১০]

স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে মানুষের শুধু মৌলিক অধিকারই অপহৃত হয়নি বরং মানবিক মর্যাদাও চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়। সরকারি দলের গুণ্ডা-মাস্তান বাহিনীর আবু-সাবুর হাতে কেবল রাখি-ই ধর্ষণের শিকার হয় না, বরং ভিকারুন্নিসার ছাত্রী সুমীকে বাবুল গুণ্ডা তুলে নিয়ে ধর্ষণ করায় সে পাগল হয়ে যায়। আর খিলগাও কলেজের ছাত্রী সাজেদাকেও মাস্তান হাবিবুল্লাহ আলম তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে ফেরত পাঠালে তারও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু দেশে আইনের শাসন না থাকায় এসবের কোনো মামলা বা বিচার হয় না। আবার চাপ থাকায় পুলিশ এ ঘটনাকে 'বন্ধুর সঙ্গে বেড়ানো'– বলে প্রচার করে। কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলে তাকে শরীরিকভাবে লাঞ্ছিত হবার পাশাপাশি দেশত্যাগ করতেও বাধ্য করা হয়। তাই রাখিকেও তার বাবা-মা কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে গজিয়ে ওঠা মাস্তান আবু-সাবুদের দ্বারা প্রেমিকা রাখির সম্ভ্রমহানি আর টাইগার কামাল, লায়ন হাসেম ও সুন্দর আলী কর্তৃক নিজেদের জমি বেদখল হবার ঘটনায় মঞ্জু ভেতরে ভেতরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এসব দুরাত্মা-নরপিশাচদের মোকাবিলা করতেই সে উগ্রবাদী সর্বহারা পার্টির সঙ্গে জড়ায়। এ পার্টির পুরনো ঘাঁটি বরিশাল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রাজধানীর পার্শ্ববর্তী নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ এলাকায় উত্তেজনার খবর শুনে মঞ্জু চাঙা হয়ে ওঠে। আবার বার্মা, মালদ্বীপ ও নেপালে বুর্জোয়া নেতৃত্বের টালমাটাল দশা দেখে তার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু দেশের জাতীয় আন্দোলনে চিহ্নিত দুর্বৃত্ত, চাঁদাবাজ, মাস্তানদের সামনের সারিতে দেখে মঞ্জু রীতিমতো হতাশ হয়। কারণ মঞ্জু-

> 'একদিন আবু-সাবু দুই বন্ধুকেই দেখল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ব্যানার হাতে নিয়ে মিছিল করছে।...অল্প কিছুদিন আগেও ওরা ছাত্রদলের সঙ্গে মিছিল করত। দৃশ্যটা দেখে তার খারাপ লাগে।'-[*দলিল*/পৃ.৪৫০]

এসব দুর্বৃত্ত, দুরাচার, দালাল আর সুবিধাভোগীরা জাতীয় আন্দোলনে শামিল হয়ে আন্দোলনকে বারবার ব্যাহত করেছে, নিজেদের স্বার্থ বাগিয়ে নিয়েছে এবং জাতে ওঠার সিঁড়ি পেয়েছে। যার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা, আদর্শের বিচ্যুতি ও আপসনীতিই মূলত দায়ী। এসব ভুলের কারণেই দেশ ও জনগণকে বার বার চড়া মাসুল দিতে হয়েছে। নিজেদের জমি উদ্ধারে ব্যর্থ এবং দেশের রাজনীতিতে হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত মঞ্জু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনায় মনোযোগী হয়। কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করতে পারে না। কারণ–

> 'ক্লাস কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না। খালি মিছিল আর মিছিল, কখন যে কে কারা মিছিল বের করছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সব সময় কানে শ্লোগান এসে লাগে; স্বৈরাচার নিপাত যাক–গণতন্ত্র মুক্তি পাক, আমাদের এক দাবি–এরশাদ তুই কবে যাবি? আপোশ না সংগ্রাম-সংগ্রাম সংগ্রাম।'-[*দলিল*/পৃ.৫৩৫]

রাজনীতির এ উত্তাপ ও শাপিত সময়ের অভিঘাতে মঞ্জু রাখি ও তিমলিকে হারায়। তবে এ রাখি ও তিমলির প্রণয়াবেগ মঞ্জুকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কারণ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করা মারমুখী বিশাল মিছিলের শ্লোগান আর পদভারের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে মঞ্জুর ঘোর কাটে। আর তাই–

> 'মুহুর্মুহু স্লোগানের আওয়াজ আর অসংখ্য লোকের পদপাতের শব্দে মঞ্জুর চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যায়। তার পায়ের পেশিতে পেশিতে বিচিত্র ধরনের টান লাগে, রক্ত ধারায় স্পন্দনও কেমন যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে, গলার স্বরতন্ত্রীতেও কাঁপন লাগে। ফলে গলা দিয়ে যেমন আপনা থেকে স্লোগান বেরিয়ে যায়, তেমনিই পা দুখানিও অসংখ্য পায়ের পদপাতের সঙ্গে তাল দিতে দিতে মিছিলে শামিল হয়ে যায়।'-[দলিল/পৃ.৫৯২]

সমকালীন স্বৈরশাসনের নষ্ট রাজনীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি ও মূল্যবোধের পতন-পচন ব্যক্তি মানুষকে বিচ্ছিন্ন, একাকী, অনিকেত ও হতাশাগ্রস্ত করে তুললেও শেষপর্যন্ত শুভবোধ, সত্তাসন্ধানী চেতনা এবং দ্রোহের জায়গা থেকে সমূলে বিনাশ করতে পারে না। তাই ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা, বিরহ, স্বপ্নভঙ্গ, অপ্রাপ্তি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সামষ্টিক চেতনার সজ্ঞশক্তিতে মঞ্জু নিজেকে সম্পৃক্ত করে।

জমি বেহাত ও সন্তানের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে রায়হানের ধারণা জন্মায়– 'আগে টাকা জোগাড় হলেই সব হয়ে যেত। কিন্তু এখন সম্পত্তি বলতে শুধু টাকাই বোঝায় না। টাকার সঙ্গে আরো কিছু বোঝায়।' ফলে রায়হানের দেশবিতাড়িত বাবা মুর্শেদ আলী দিনাজপুরে এসে বাড়ি করতে পারলেও রায়হান ফুলবাড়িয়ায় জমি কিনেও বাড়ি করতে পারে না। এ কারণেই রায়হান তার মামলার সাক্ষ্য দিতে সাদেক খানকে রাজি করাতে পারে না। আর জমির মালিক কুতুবউদ্দিন ও তার ছেলে আইনুদ্দিন সম্মত হলেও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ভয়-ভীতিতে শেষপর্যন্ত তারা আদালতে যেতে পারে না। এ সময় সাদেক

খানের সুস্থ হয়ে ওঠা এবং মেরির দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঘটনা ঘটে। যা শাপিত সময়খণ্ডে দুর্বৃত্তায়নের উত্থান এবং শুভচেতনার পরাভবের ইঙ্গিতবাহী। মেডিকেল কলেজে জীর্ণ-শীর্ণ মেরিকে দেখে, মেরির বেঁচে থাকার আকুতি শুনে এবং স্বামী সাদেকের প্রতি বঞ্চনাজাত ক্ষোভ দেখে তার প্রতি রায়হানের সহানুভূতির উদ্রেক হয়। রায়হানের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে-

> 'টাকার জন্য, প্রমোশনের জন্য...স্বামী যদি বউকে ব্যবহার করে, তাহলে সেই বউয়ের মন কি স্বাভাবিক থাকতে পারে? থাকা সম্ভব?...ওটা কান্না ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবনে প্রভাবিত হওয়ার কান্না, ব্যর্থ হওয়ার কান্না; জীবনে পূর্ণ হতে না পারার কান্না...একটা মেকি জীবন আর মেকি সংসারই তার ভাগ্যে লেখা ছিল।...শেষ পর্যন্ত মেরির জীবন বলে আসলে কিছুই ছিল না। ওর মরণ আরো আগেই হয়ে গিয়েছিল, অসুস্থ হয়ে পড়ার অনেক আগে থেকেই।'-[*দলিল*/পৃ.৫৪৬-৫৪৮]

জীবন মেরিকে সুখ দেয়নি, শান্তি দেয়নি, স্বপ্ন পূরণের আনন্দ দেয়নি। নারীত্বের অপমান,ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় আর বিবেকের দংশনে তার জীবন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। জীবনের বহু সম্ভাবনার হাতছানি থাকলেও তাকে এক বুক বেদনা নিয়ে পৃথিবী ছাড়তে হয়। রায়হান জমি উদ্ধারের জন্য মামলায় না লড়ে, পুলিশ-গুণ্ডাদের সঙ্গে আপস না করে সার্বিক বিবেচনায় এক লক্ষ টাকায় কেনা চার কাঠা জমি দুই লক্ষ টাকায় বিক্রির বায়নাপত্র করে। কারণ তার কাছে মনে হয়–'জমির টুকরোটাই জীবনের সমস্ত কিছু নয়।' দেশের চলমান নৈরাজ্য ও অব্যাহত সন্ত্রাসবাদের কারণে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মাথাগোজার ঠাঁইস্বরূপ জমিটাও তিন বছরের মধ্যেই (১৯৮৭-১৯৯০) রায়হানের হাতছাড়া হয়ে যায়। জমি বিক্রির কারণ এবং এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে দুঃখ করে স্ত্রীকে বলে-

> 'মামলায় জিতলেও জমির দখল সহজে পাওয়া যাবে না। কারণ গুণ্ডা, মাস্তান তো রয়েছে সামনে, কিন্তু তাদের পেছনে আছে পলিটিক্যাল ফোর্স, পুলিশ আর ব্লাক মানিঅলারা। এদের দাপট কখনো কমবে বলে মনে হয় না।...আর আমাদের মতো লোকদের এইসব হিনিয়াস বাস্টার্ডদের পাল্লায় পড়তে হচ্ছে।...যতবারই জমিটা ছেড়ে দেবার কথা ভাবছি, ততবারই নিজেকে অপমানিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন রাস্তার মোড়ে লোকজনের সামনে আমার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে।'-[*দলিল*/পৃ.৫৫৫-৫৫৯]

একথার মাধ্যমে সমাজের বিদ্যমান অনাচার-অপরাধ প্রতিরোধে রায়হানের একধরনের অক্ষমতা, পরাভব এবং আপসের চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে অতীতেও যেমন রায়হান কিছু করতে পারেনি, তেমনি বর্তমানেও তাকে তা মেনে নিতে হয়। এ জমি বিক্রির দিনেই আকস্মিকভাবে মেরির মৃত্যু ঘটে। তবে মেরির মৃত্যুশোক ও বিরহ রায়হানের মনে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ স্বৈরাচার এরশাদের পতন আন্দোলনে উল্লাপাড়ার কলেজ ছাত্র জিহাদ এবং বিএমএ-র ডা. মিলনের নির্মম মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এবং 'এক দফা এক দাবি, এরশাদ তুই কবে যাবি'– এমন শ্লোগান আর হাতে বাঁশ নিয়ে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা রাস্তায় নামে। পল্টন মোড়ের কাছে মিছিলে রায়হান তার নবম শ্রেণির ছেলে টুকুকেও বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে পায়। তাই রায়হানও তার সহকর্মী সাংবাদিকদের নিয়ে মিছিলে যোগ দেয়। আর-

> 'মাথা নিচু করে পা ফেলে আর রাস্তার পীচ দেখে। ৬৯-এও সে মিছিলে ছিল–একই রকমভাবেই তখন সে একা মিছিলে ছিল, আজ তার কিশোর ছেলেও মিছিলে আছে, ওর বড় দুইভাইও নিশ্চয়ই মিছিল করছে।'-[*দলিল*/পৃ.৫৯৭]

দেশ ও দশের মঙ্গল তথা মুক্তির জন্য রায়হান উনসত্তর-একাত্তরে একা রাজপথে মিছিল করলেও নব্বইতে এসে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তারই তিন ছেলে। পিতা-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, দলীয় সহযোদ্ধা, সহকর্মী এবং সাধারণ মানুষের জাগরণের ফলেই এ জনজোয়ারের সৃষ্টি হয়। এসব দেখে রায়হানের মনে এক ধরনের উচ্ছ্বাস দেখা দিলেও পরক্ষণেই তার মনে নানা সন্দেহ ও সংশয় দানা বেঁধে ওঠে। কারণ দুই প্রজন্ম ধরে তার মতো মানুষেরাই আন্দোলন-সংগ্রাম ও মিছিল করে আসছে। অথচ মিছিলের প্রয়োজনও ফুরাচ্ছে না। কেননা যাদের হটানোর জন্য মিছিল করা হয়, সেই স্বার্থন্বেষী-সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাভোগীরাই কায়দা-কৌশলে নানা রূপে খোলস পাল্টে ঠিকই ক্ষমতার আসনে জেঁকে বসে। এজন্যই বুড়ো বয়সে এসেও রায়হানের মতো মানুষকে আজোও মিছিলে শামিল হতে হয়। এর প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে সহকর্মী সালেহউদ্দিন রায়হানকে বলে–

> 'যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন করতে হবে। আপনার পর আমরা আছি, আমাদের পরে আমাদের ছেলেরা আছে, আমাদের কিন্তু মিছিল থামানো যাবে না। মিছিল থামিয়ে দিলে কি আমরা বাঁচব?'-[*দলিল*/পৃ.৫৯৮]

'না বাঁচব না'– এমন কথা সহকর্মীদের বলে এবং 'রোগের ভার, মিথ্যাচারের ভার, ভণ্ডামির ভার, অনিশ্চয়তার ভার ও আপসকামিতার ভার'–থাকা সত্ত্বেও রায়হান ডান পা বাড়িয়ে মিছিল নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিদ্যমান অন্যায়-অবিচার-জুলুম ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে-আন্দোলন চলে আসছে, তা ভবিষ্যতেও

অব্যাহত থাকবে। কারণ শোষণমুক্ত , অসাম্প্রদায়িক, সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় আন্দোলোন-সংগ্রাম ও প্রতিবাদের বিকল্প নেই।

তবুও দেখা যায়, রায়হান নীতিবাদী অথবা কঠিন বাস্তবতার চাপ সহ্য করতে পারে না। মোহনগঞ্জের জমিজমা যেমন সে ধরে রাখতে পারেনি, তেমনি সাভারের কেনা জমিও ধরে রাখতে পারে না। অসাধু জমি ব্যবসায়ীদের কাছে এক লাখ টাকায় কেনা জমি দুই লাখ টাকায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এতটুকুই তার লাভ।[৬২] তারপরেও বলা যায়, রায়হানই এই উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্র; যাকে লেখক একটি বিশ্বাসযোগ্যতায় উপস্থাপন করতে পেরেছেন। অন্যদিকে সাদা-কালো, ভালো-মন্দ নিয়েই মেরির সামগ্রিক জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। বেঁচে থাকার জন্য মেরির কাছে দেহের মূল্যটিও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ।...দোষ-গুণ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, চাওয়া-পাওয়ার বিপ্রতীপ সমীকরণে মেরি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। মেরি সুন্দরী, প্রাণবন্ত, কিন্তু দুঃখী। কেননা স্বামী তার ভালোবাসার মূল্য কখনো দেয়নি বরং নিজের চাকরির উন্নতির জন্য তাকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে।[৬৩] যা নিয়ে মেরির কষ্টের-বেদনার শেষ নেই। তবু এ ক্ষেত্রে সে আপস করতে শেখেনি। নারীর উপর চেপে বসা পুরুষতন্ত্রের প্রবল ছায়াটিকে মেরি অস্বীকার করেছে নিজস্ব তেজে ও শক্তিতে।[৬৪] এ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র যেখানে বিবরবাসী, আপসকামী এবং পলায়নপর; সেখানে মেরি চরিত্রটিই জীবনের স্বাভাবিক দাবিতে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত এবং অকপট। মধ্যবিত্তের সংকোচ ও স্ববিরোধিতাকে সে অনায়াসে পাশ কাটাতে সক্ষম হয়। আবার বীথি চরিত্র রূপায়ণে ঔপন্যাসিক বাস্তবতাকে মুখ্য করে দেখেছেন। স্বামীর অনৈতিক সম্পর্কের কথা বীথির জীবনে সৃষ্টি করে এক অনতিক্রম্য ফাটল। সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থির দুঃসময়ের মতোই বীথির সংসারেও তৈরি হয় অনিশ্চিত বৈরী সময়ের স্রোত। সমাজ ও পরিবার যেন সমান্তরালভাবে বহমান। সমগ্র উপন্যাসে বীথি চরিত্রটি ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ও স্পষ্টভাষী হিসেবে ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে।[৬৫] স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় বীথি কষ্ট পায় ঠিকই কিন্তু জমি কেনার ক্ষেত্রে যেভাবে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে বসেছিল তার তুলনায় স্বামীর পরকীয়ার ঘটনায় সে শান্ত; ধীর-স্থির। স্বামীর প্রতি ক্ষোভ থেকেই সে একটি স্কুলে চাকরি নেয় কিন্তু তাতে করে স্বামী সংসার ছেলেপুলেদের প্রতি তার সে দায়িত্ববোধ এতে একটুও হেরফের হয় না। সংসারের সবকিছুই পূর্বের ছন্দে চলে। কেউ কিছু টের পায় না।[৬৬] বীথি বাস্তবিক অর্থেই চিরন্তন বাঙালি গৃহলক্ষ্মী নারীর প্রতিনিধি। সে স্বামীসোহাগী, সন্তানবৎসল, সংসারের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। এমনকী নারীর চিরশত্রু সপত্নীসদৃশ মেরির প্রতিও সহানুভূতিতে সিক্ত। স্বামী, সন্তান ও সংসারই তার প্রাণস্বরূপ। আর রঞ্জু মোহনগঞ্জে গিয়েও যেমন প্রেমে পড়ে, তেমনি এখানেও সহপাঠী শাহনির সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। তাও বেলোয়ারি কাচের মতো ভেঙে যায়। কিন্তু মনে হয় কাউকেই সে ভালোবাসে না। বড় ভাই হিসেবেও সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে চায়, পরিবারের বড় সন্তান হিসেবেও। কিন্তু কোনোভাবেই নিজের পরিচয়ে দাঁড়াতে পারে না।[৬৭] কিন্তু দেশের প্রশ্নে, জনগণের মুক্তির প্রশ্নে, স্বৈরাচারের অবসানের প্রশ্নে এবং কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে রঞ্জু ভুল করে না। নিজের ক্ষুদ্র আমি-র প্রাঙ্গণ ছেড়ে বহু আমি-র প্রাঙ্গণে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে। এখানেই রঞ্জু চরিত্রের অনিঃশেষ প্রাসঙ্গিকতা।

সমকালীন সমাজের এমন নিখুঁত, নিবিড় ও আকাঁড়া বাস্তবতার সমাবেশ ঘটিয়ে লেখক উপন্যাসের যে-নামকরণ করেছেনে, তাও সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত। কারণ একটি জাতির অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের সংকট ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এখানে স্থান করে নিয়েছে। *দলিল*-এর ব্যাপ্তি তাই শুধু আশির দশকে সীমিত না হয়ে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র গঠনের পূর্বাপর ইতিহাসেও ক্রমবিস্তার ঘটেছে। কারণ *দলিল*-এর গায়ে শুধু জমিনের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয়নি বরং সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংকট ব্যক্তির মানবিক সম্পর্কের মধ্যেও যে-ভাঙন ও ধস নামিয়ে দেয়–এর প্রমাণ মেলে বীথি-রায়হান-মেরি, রঞ্জু-শাহনি-আরমান, রাখি-মঞ্জু-তিমলি, নীহার-মনির-শায়লা, মীরা-খায়রুল, মাজেদা-তার সাংবাদিক স্বামী এবং নাশিদের দাম্পত্য বিচ্ছেদ, অবিশ্বাস এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারের আকাঙ্ক্ষায়। স্বৈরাচার এরশাদের দুঃশাসন প্রতিটি নর-নারীর সুখের সংসারকে একেকটি নষ্টনীড়ে পরিণত করে।

শওকত ছয়শত পৃষ্ঠার *দলিল*-এর গতর জুড়ে বিশ শতকের আশি ও নব্বই দশকের বাস্তবতায় মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংকট ও সম্ভাবনার ইতিবৃত্তকেই উপস্থাপন করেছেন। এখানে ভূমি ও মানুষের সঙ্গে অনিবার্য আত্মিক যোগ ও শেকড়েরর সত্তাসন্ধানী প্রবণতার সমান্তরালে ভূরাজনীতির নৃশংস রূপটিও আরো নিবিড় ও গভীরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ উপন্যাসের অতিরিক্ত আকার ও আয়তনের কারণে সর্বত্র টানটান উত্তেজনা ও আগ্রহের ভাব ব্যাহত হয়েছে। আবার বহু শাখা কাহিনিও এতে সংযুক্ত হওয়ায় এর গতর ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। শওকত আরেকটু সচেষ্ট হলে হয়তো এর আকার আরো কমিয়ে আনতে পারতেন। আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে তাঁর *The Oldman*

and the Sea উপন্যাসটি একশত পাতার কম আয়তনেই লিখেছেন। যা দুনিয়াজুড়ে ব্যাপক পরিচিতি পায়। এ উপন্যাসটি তিনি হাজার খানেক পৃষ্ঠায় লিখতে পারতেন; আর কীভাবে তা করা যেত সে-সম্পর্কেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এ অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া বা পাঠককে নিজের অভিজ্ঞতার অংশীদার করা–এসব খুব সহজ কাজ নয়। বরং তা কঠোর শ্রম, অনুশীলন আর পরিমার্জনের ভেতর দিয়ে করতে হয়। হেমিংওয়ে তাঁর লেখা *A Farewell to Arms* উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠাটি মোট ঊনচল্লিশ বার সংশোধন করেছেন। কিন্তু এরকম পরিমার্জন বা সংশোধন হয়তো শওকতের *দলিল*-এর ভাগ্যে জোটেনি। তবে কাহিনি বা শিল্পের প্রয়োজনে উইনস্টন চার্চিলের *War and Peace* এবং ফিওদর দস্তয়ভস্কির *Crime and punishment*-র মতো বৃহৎ আকারের গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজকেন্দ্রিক এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ-জাসদ, ছাত্রদলের উপস্থিতি, ভূমিকা ও কার্যাবলির বর্ণনা থাকলেও সমকালীন রাজনীতিতেও ডাকসুতে প্রভাবশালী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মতো বামদল ও ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তাছাড়া এ উপন্যাসে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শহিদ নূর হোসেন, জিহাদ হোসেন ও ডা. মিলনের নাম শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হিসেবে দেলোয়ার, ইব্রাহীম সেলিম, তাজুল ইসলাম ও রাউফুন বসুনিয়ার মতো বিশিষ্ট শহিদ ছাত্রনেতার নাম উল্লেখ করা যেতো। ঊনসত্তরের স্বৈরাচার আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের মতো নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনেও প্রায় ষাট জনের মতো বিশিষ্ট ছাত্রনেতা, শ্রমিক নেতা, ডাক্তার, জনপ্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষের নির্মম মৃত্যু ঘটে।[৬৮] আবার নব্বইয়ের ছয় জুন ডাকসু নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উপেক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে মঞ্জু ও রাখির ঊনসত্তর সনে হাসপাতালের একই দিনে একই কক্ষে জন্ম হবার ঘটনা ও পারিবারিক সুসম্পর্ক থাকার পরেও এ বিষয়টি উভয়ের কাছে দীর্ঘদিন অজানা থাকাটা রহস্যময় লাগে। প্রেমের ব্যর্থতা ও বিরহের জন্য সাধারণত প্রেমিকার ধর্ষণ ও দেশত্যাগের ঘটনাকে উপজীব্য করাটাও দৃষ্টিকটু মনে হয়। তারপরেও পাঠকের *ওয়ারিশ* পাঠের প্রত্যাশা থেকেই *দলিল* পাঠের প্রত্যাশাটি ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখা যায় *দলিল* যেন *ওয়ারিশ*-এর কাহিনি টেনে নিয়ে চলছে; যদিও পটভূমি ভিন্ন। আর তাতেই উপন্যাসটি যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে। কারণ লেখকের কোনো রচনাই তার পূর্ববর্তী রচনার পুনরাবৃত্তি নয়; পাঠকও সে পুনরাবৃত্তি পড়তে চায় না। কিন্তু প্রত্যেকটি রচনার মৌলিকতার মধ্যেও পাঠক একটা যোগসূত্র রচনা করে যেতে পারে। তবে উপন্যাসের শেষে বেঁচে থাকার যে-দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রায়হান সামনের দিকে পা ফেলে অগ্রসর হয়, এ রায়হানের কারণেই উপন্যাসটির গুরুত্ব ও আবেদন হারিয়ে যায় না। শুধু নিজের সংসারের ভার নয়, লেখকের হয়ে পুরো উপন্যাসটির যাবতীয় ভারও যেন রায়হান একাই বহন করেছে।[৬৯] এখানেই শওকতের কৃতিত্ব।

শওকত আলী নিয়ত দ্বন্দ্বমুখর চরিত্রের জীবনবাস্তবতা ও অবরুদ্ধ সমাজচেতনার স্বরূপটি রূপায়ণ করতে বেশ মনোযোগী ছিলেন। যদিও তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন–'এখন লিখছি *ওয়ারিশ*-এর চরিত্রগুলো নিয়ে *দলিল* নামে একটি উপন্যাস। লেখাটা মাঝপথে আটকে গেছে। শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণের জন্যেই শেষ করতে পারলেই মনে করব যে, না; কাজটা শেষ হলো'।[৭০] এসব রোগ-শোকজনিত সমস্যা থাকার পরেও সময় ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ শওকত *দলিল* নামক উপন্যাসের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এ সৎসাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, শ্রম ও সাধনা বরাবরের মতোই থাকে সক্রিয়। তাই দেখা যায়, শওকত জীবনকে কতখানি আপনভাবে ছুঁতে পারেন, তারই সার্থকরূপ এ *দলিল*। মৃত্তিকাসংলগ্ন গণমানুষের জীবনচরিত্রকে, তাদের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ-বেদনাকে, বঞ্চনা-পীড়নকে, ক্ষোভ ও দ্রোহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শওকত তাঁর এ উপন্যাসে অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্র চিত্রণে সেই সঙ্গে সমাজচিত্র অঙ্কনে তাঁর দক্ষতার পরিচয় সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট। আর ভাবকল্পের কথা যদি ধরতে হয়–কি নতুন ভাবনা, কি বেদনা, কি প্রবঞ্চনা, কি প্রেম, কি সংগ্রাম, কি তৃষ্ণা, জীবনের কোনো নতুন আকুতি ও সম্ভাবনার কথা বলবেন; সবখানেই যেন নতুন জিজ্ঞাসার সমাবেশ ঘটেছে।[৭১] এ জন্যই শওকত রায়হান চরিত্রের মাধ্যমে শুধু স্বৈরাচারের পতনকে দেখাতে তাকে মিছিলে সম্পৃক্ত করে ক্ষান্ত হননি। বরং ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স নীতির মাধ্যমে শাসক,ক্ষমতাবান, পুঁজিপতি ও দুর্বৃত্তদের নানা রূপে ও খোলসের পরিবর্তিত চিরস্থায়ী প্রভাব ও প্রতাপের বিষয়টির পাশাপাশি গরিব মানুষের ভাগ্যের অপরিবর্তিত অবস্থারও ইঙ্গিতদান করেছেন। এখানেই শওকতের সময়-সমাজ ও জীবনোপলব্ধিতে শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মেলে। শ্রেণিসচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন সমাজের বিদ্যমান শোষণের বহুমাত্রিক চিত্র, বিনির্মাণ করেছেন মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের জয়গাথা। চরিত্রের শুদ্ধসত্তায় উত্তরণ, শুভবোধের চেতনায় উজ্জীবন ও পরিশোধনের সদিচ্ছাকে তিনি খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। শাসন নামক শোষণ যেন এক প্রকার নিপীড়ন–সে-কথা বোঝাতেই তাঁর প্রতিবাদী বাক ও কণ্ঠস্বর অপ্রতিরোধ্য।

কিছু সীমাবদ্ধতা ও শিল্প রস-রুচির খামতি থাকার পরেও বলা যায়, *দলিল* জীবনঘনিষ্ঠ এক উপন্যাস। সেই সঙ্গে প্রবহমান থাকে সময় ও সমাজ অন্তর্গত জীবনের রূপকল্প। এর সমগ্র অবয়বে এক শ্রেণির মানব-মানবী যে-যন্ত্রণায় ও বিপন্নতায়

কাতর, যে-মানুষের অন্তরিক চেতনায় রয়েছে শোধন আর বঞ্চনার হাহাকার—*দলিল* তাদেরই জীবনালেখ্য। লেখক ব্যক্তি হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে যেমন পারঙ্গম, তেমনি সমাজবাস্তবতার নানান আবর্তকেও গভীরভাবে পরখ করতে সদা আগ্রহী। একই সঙ্গে তিনি হৃদয়সচেতন, সমাজসচেতন ও ইতিহাসসচেতন ঔপন্যাসিক। তাই নয় বছরের এরশাদের স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর, অপমানজনক, অমানবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার দুরন্ত শপথের কথা সমান্তরাল সত্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।[৭২] শওকত আলী মধ্যবিত্ত নাগরিকের ভূমি লাভের ব্যাকুলতা, নিজস্ব বাড়ি করার বাতিক, ভূমির মালিকানা থেকে উদ্ভূত জটিলতা, প্রভাবশালী মহলের অবৈধ চাপে ভূমি হারানোর বেদনাকে ব্যক্তি-পরিবার- দেশ-কাল-রাজনীতির বৃহত্তর পরিসরে উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন—বাংলাদেশের ভূমি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কত নিবিড়। কিন্তু বর্তমানকালে ভূমির মালিকানা লাভ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন খুবই দুরূহ।[৭৩] তাই *দলিল* উপন্যাসে উঠে এসেছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় মানুষের বিচিত্র সংগ্রাম-জিজ্ঞাসা ও জীবনযাপনের ইতিহাস। সময় ও সমাজের প্রতি আজন্ম দায়বদ্ধ ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির বহুমাত্রিক জীবন-যাপন এবং এরই সমান্তরালে বহমান রাজনীতি তথা ইতিহাসের বাঁক বদলকে প্রত্যক্ষ করেছেন। পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদী সময় থেকে নব্বইয়ের দশকের সামরিক অন্ধকারের পটভূমিকায় বিধৃত হয়েছে মানুষের সুবিধাবাদ, আপস, ভণ্ডামির চিত্র। সেই সঙ্গে এটি হয়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির সচেতন রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার শিল্পিত প্রকাশ।[৭৪] যা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

পরিশেষে বলা যায়, শওকত আলীর *দলিল* উপন্যাস শুধু প্রধান চরিত্র রায়হানের জীবনের স্থিতির ঠিকানাস্বরূপ ক্রয়কৃত জমির দলিল নয় এবং তার চারপাশের এ জমি-সম্পৃক্ত মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় টানাপোড়েনের সঙ্গে বাংলার জাতীয় ভূ-রাজনীতির উত্তাল সময়ের তাৎপর্যবাহী দলিল। দাঙ্গা, দেশভাগ ও পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদের ওপর এর ছায়াপাত পড়লেও স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক জান্তা এরশাদের স্বৈরশাসনামলের এক দশকের নৈরাজ্য, নিপীড়ন, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, অস্ত্রের মহড়া, অর্থের দাপট, আপস ও ভণ্ডামির চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। এর প্রমাণ রয়েছে উপন্যাসের পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাল বর্ণমালায়। এ উপন্যাসটি নিছক জমির দলিলে সীমিত না হয়ে এক ক্রান্তিকালের সমাজসত্য ও জীবনবাস্তবতার বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

স্ববাসে প্রবাসে

স্ববাসে প্রবাসে (২০০১খ্রি.) শওকত আলীর ক্ষুদ্র কায়া-কলেবরের এক উপন্যাস। তবে এ উপন্যাসের গতর ক্ষুদ্র হলেও এর গন্তব্য সুদূরপ্রসারী। এ উপন্যাসে সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে অগণন মানুষের দেশত্যাগ, উদ্বাস্তুসংকট, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নয়া উপনিবেশবাদী আগ্রাসন, পয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের উত্তেজনা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন নাভিশ্বাস এবং একাত্তর-পরবর্তী সময়ের সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের নানা টানাপোড়েনের চিত্র অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক অনেকটা চিত্রশিল্পীর মতো তুলির একেক আচড়ে ওপার বাংলার রায়গঞ্জ এবং এপার বাংলার দিনাজপুরের রামনগর-পাহাড়পুরের অসংখ্য নর-নারীর প্রেম-অপ্রেম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, মিলন-বিরহ এবং আনন্দ-বেদনার উপাখ্যানকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মুড়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তবঘনিষ্ঠভাবে বয়ান করেছেন। সাতচল্লিশের ভারতভাগ ও বঙ্গবিভাজনের ফলে হৃদয়ভাগ ও বিপন্ন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা বাঙালি জীবনকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। পাঞ্জাব ও বিহারের মতো বৃহৎ বাংলার পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সর্বমানবিক জীবন যে-অনভিপ্রেত পরিস্থিতি অবলোকন ও অতিক্রম করে; সে-রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা-অনুভূতি নির্মাণ করে যারা বাংলাসাহিত্যে খ্যাতিমান হয়েছেন, তাদের মধ্যে শওকত আলী অন্যতম। কারণ দেশভাগের সঙ্গে উন্মূল ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কসূত্রে কথাকার শওকত আলী সেইসব কতিপয় লেখকদের অগ্রগণ্য, যাঁদের রচনায় দেশভাগ গোপনে পুষে রাখা ক্ষতের মতো বারবার গভীর মমতায় মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। *স্ববাসে প্রবাসে* উপন্যাসও এ দেশভাগের পরিণাম ও বেদনাকে তীব্রভাবে স্পর্শ করেছে।

'আধিপত্যবাদ' রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা বা রূপকল্প। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের রাষ্ট্রভাবনার উৎসমূলেই সুপ্ত ছিল এ আধিপত্যবাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিচ্ছিন্ন জনপদকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কিংবা যুক্ত জনপদকে ভেঙ্গে টুকরো করার ক্ষেত্রেও এই আকাঙ্ক্ষাসমূহ বেশ শক্তি ও জোর নিয়ে হাজির হয়েছে। রাষ্ট্রের একটি অভিমুখ সম্প্রসারণের দিকে, অপর অভিমুখ ভাঙনের দিকে। খুব মনোযোগ দিয়ে 'দেশভাগ' রূপকল্পটির অর্থ ও প্রবণতা লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানেও রয়েছে সেই আদিম ইচ্ছা তথা আধিপত্যবাদ।[৭৫] সাতচল্লিশের ভারতবিভাগের প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়েছে এভাবে। ভারতবর্ষের দ্বিধা-বিভক্ত স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে এখানে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা পারস্পরিক অবিশ্বাসের প্রতিবেশে অনিবার্য ও

অবিরাম সংঘাতের আবর্তে নিপতিত হয়ে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবিভাগের ফলে ভেঙে যায় অখণ্ড বঙ্গদেশ। দেশভাগের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির শিকার বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষকেই ভাঙনের মুখে বিক্ষত ও বিপর্যস্ত হতে হয়েছে অধিক সংখ্যায়। ধর্মের প্রভাব ভাষার চেয়ে এমনকী কখনো কখনো রাষ্ট্রের চেয়েও বড় হয়ে ওঠার কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাগুলো রাষ্ট্র প্রতিরোধ করতে পারেনি। তাই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পূর্ববঙ্গে অভিগমনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ তারা কেবল সংখ্যালঘুত্বের কারণেই নিজেদেরকে স্বভূমে নিরাপদ ভাবতে পারেনি। উন্মুল-উদ্বাস্তু-শরণার্থী হয়ে প্রায় দেড়কোটি মানুষের এই অভিগমন তাই শুধু গমন ছিল না, এটি ছিল জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন ছিন্ন করার শোকে বিধুর। এ বিভাজন সম্পর্কে উর্বশী বুটালিয়া বলেছেন-

> 'Partition was not only a division of properties, of assets and liabalities. It was also to use a phrase that partition victims use repeatedly, a division of hearts. It brought untold suffering, tragedy, trauma, pain, violence to communities who had hither to lived together in some kind of social contrantact. It separated families across an arbitrarily drawn border, sometime over night, and made it practically impossible for people to know if their parents, sisters, brothers, children were alive or dead, and these aspects of the partition how people coped with the trauma how they rebuilt their lives, what resoures both physical and mental, they drew upon, how their experience of dislocationand trauma shaped their lives, and indeed the cities and towns they settled infind little reflection in written history'.[৭৬]

সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় যে-নির্মম অভিজ্ঞতা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য মানুষ অর্জন করেছিল, সে-অভিজ্ঞতার ভাষিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তবু বাংলাসাহিত্যের অনেক লেখক চেষ্টা করেছেন উদ্বাস্তু মানুষের শারীরিক দুর্ভোগ, মানসিক উদ্বেগ, জীবনধারণের সংকট, নিজস্ব সাংস্কৃতিক আবহ, আবেগের স্থান থেকে বিচ্যুতি, এমনকী পরিচয় সংকটের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিজনিত অভিজ্ঞতার শিল্প রূপায়ণের। এরূপ অসংখ্য শিল্প প্রয়াসের মধ্যে শওকতের *স্ববাসে প্রবাসে* উপন্যাসটি একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংযোজন।

স্ববাসে প্রবাসে উপন্যাসের কাহিনি মূলত সাতচল্লিশের দেশভাগকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্র জামিল, মানস, অনীতা, নমিতাসহ আরো অনেককেই নিজ দেশে পরবাসীতে পরিণত করে। এ উপন্যাসকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে দুই বন্ধু জামিল ও মানস দত্তের স্মৃতিচারণা বা নস্টালজিয়া। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে এদের ছেলে-মেয়ে আফসান ও অরুন্ধতীর প্রেম। তবে এ দুটি পর্বেই তথাকথিত রাজনীতি ও ধর্মকে ঘটনার নির্ণায়ক ভূমিকায় উপস্থিত হতে দেখা যায়। তারপরও *স্ববাসে প্রবাসে* উপন্যাসের তাৎপর্যের দিক হল– *ওয়ারিশ*, *উত্তরের খেপ* ও *বসত* উপন্যাসে জন্মভূমির নাড়িমাটি থেকে উন্মুল হবার বেদনাই যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে *স্ববাসে প্রবাসে* দেশত্যাগের বেদনা ও হাহাকারের সঙ্গে মিলনের আশাবাদও যুগপৎভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

জামিল হোসেন ও মানস দত্ত পরস্পর বন্ধু। সাতচল্লিশের পর জামিল হোসেনরা পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জ ছেড়ে যখন দিনাজপুরের পাহাড়পুর এলাকায় এসে বাড়ি করে তখনো মানস দত্তরা এদেশ ছেড়ে ভারতে যায়নি। পড়াশোনা এবং বামপন্থী রাজনীতিসূত্রে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মানস দিনাজপুর রামনগরের সম্ভ্রান্ত দত্তবাড়ির মেজু ছেলে। মানসের বড় ভাই তাপস দত্ত ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের নেতা। চিরকুমার তাপস দত্ত স্বদেশের টানে পূর্ববাংলার পৈতৃক ভিটেবাড়িতে পড়ে থাকলেও রাজনৈতিক উত্তেজনায় মানস তার ছোট ভাই কৌশিকসহ ভারতে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরবর্তীকালে তাপস দত্ত হার্ট এ্যাটাকে অসুস্থ হয়ে পড়লে সে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে ভাইকে স্থায়ীভাবে নিতে দিনাজপুরে আসে। মানস দত্তের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত; পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করা। দ্বিতীয়ত; অরুন্ধতীর মায়ার বন্ধনে ফেলে তাপস দত্তকে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া। দীর্ঘদিন পর স্বদেশে ফিরে মানস বন্ধু জামিলের সঙ্গে অতীতের স্মৃতিচারণ এবং বর্তমান জীবনবাস্তবতার নানা দিক নিয়ে আলাপ করে। এ আলাপসূত্রেই জানা যায় মানসের ব্যক্তিজীবন ও উদ্বাস্তুজীবনের নানা সংকটের ইতিবৃত্ত। উদ্বাস্তুজীবন সম্পর্কে মানস বলে-

> 'এখান থেকে আমরা...রায়গঞ্জে গিয়ে সেটল্ হই। এখানকার বাড়িটা পুরো বিক্রি করা যায়নি। কারণ দাদা (তপু দা) এখানেই থাকবেন বলে জেদ ধরেন। আমরা ওদিকে যে যার সুযোগ-সুবিধা আর সাধ্যমতো লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে ঢুকি; তার ফলে আমি শ্রীরামপুরে চাকরি করতে করতে ওখানেই থেকে গেছি। আমার ছোটো ভাই কৌশিক থাকে আসামের ডিব্রুগড়ে। শুনেছি, ওখানেই নাকি ও থেকে যাবে।'-[স্ব.প্র. শওকত আলী রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/পৃ. ১৫৪]

দেশভাগের অভিঘাত, ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে মানস দত্তের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। রাজনীতির বিষবাষ্প শুধু তাকে জন্মভিটার শেকড় থেকেই বিচ্ছিন্ন করেনি, বরং স্বজন থেকেও ছিটকে ফেলে যোজন যোজন দূরে। জীবনের নিরাপত্তার জন্য মানস দত্ত ভারতে গিয়ে মানসিক স্বস্তি কিছুটা পেলেও উদ্বাস্তু-জীবনসংগ্রাম, টিকে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, স্বজন-স্বদেশ ত্যাগের বেদনা–সবমিলিয়ে তার মনে যে-শূন্যতা, হাহাকার ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, তা থেকে কখনোই পরিত্রাণ পাননি। দেশত্যাগী প্রবাসবন্ধু মানসের প্রতি জামিলের উপলব্ধি-

'অতীন তোমাকে, প্রবাসী আপনজন ডাকে
" আমার হৃদয়ে এসো, শান্তি দাও,
জড়াও আমাকে
পাখীর ডানার মতো স্নিগ্ধতর
মুগ্ধ বাহুপাশে
দুর্জয় বিশ্বাসে ,
হে বন্ধু সুজন।
কতোদিন অতিক্রান্ত কতোদিন
শুনিনি কুজন–
প্রাণের কপোতকণ্ঠে !
জনারণ্যে পড়ে আছি একাঃ
যেন দিগন্তের কোলে ঘোলাটে সূর্যের
ক্ষীণ রেখা !"
...
সবিতার হাত ধরে সম্মিলিত
মৈত্রী আসে ফিরে,
আপনজনের ডাক ক্রমে ব্যাপ্ত
সৌরলোক ঘিরে। '– [দিলওয়ার/ *অতীন তোমাকে*]

পরবর্তীকালে সাংবাদিকতার চাকরিসূত্রে জামিল ঢাকায় সপরিবারে থিতু হওয়াতে যোগাযোগ কমে গেলেও আত্মিক বন্ধন অটুট থাকে। দুই বন্ধু রেলবাজার হাট, কামারপাড়া, মালিপাড়া, কালীতলার কালীমন্দির, ছুতোরপাড়া, কান্তজির মন্দির, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এবং ঘাগড়া (ঘর্ঘরা) নদীর কাঠের ব্রিজের মতো স্মৃতিবিজরিত এলাকা ঘুরে দেখে। বহু পরিবর্তন দেখে এক সময়কার স্থানীয় মানস অনেক জায়গা, স্থাপনা-অবকাঠামো চিনতে পারে না। রেলবাজার হাটের মতো পার্শ্ববর্তী কামারপাড়ার অস্তিত্ব না দেখে মানস অবাক হয়। কারণ হিন্দু কামারেরা ভারতে চলে গেলেও মুসলমান কামারদের এখানে থাকার কথা। কামারদের অনুপস্থিতি ও অবলুপ্তির কারণ হিসেবে জামিল যা শোনায় তাতে মানস রীতিমতো অবাক হয়। কামারদের দুরবস্থা সম্পর্কে জামিল বলে-

> 'শহর ছেড়ে অনেকে গ্রামের দিকে গেছে বটে। কিন্ত আজকাল গ্রামেও ওদের খুঁজে পাওয়া যায় না।...কামারের হাতে গড়া জিনিসের চাহিদা নেই।...আর চাষাবাদের জন্য লাঙলের ফালেরও দরকার পড়ে না। পাওয়ার টিলার, হ্যান্ডটিলার, ট্রাক্টর এসব চালু হওয়াতে বলদ টানা লাঙল আর কয়জন চাষি ব্যবহার করে। আর চাষিও তো নেই। ছোটোখাটো জমি যাদের ছিল, তারা উঠতি ধনীদের কাছে জমি বেচে দিয়েছে। এ কেনা জমি দিয়ে ফার্মিং করছে এখন নব্য ধনীরা। আর জমি বেচা চাষিরা তাদের সেইসব ফার্মে করছে দিনমজুরি।'-[স্ব.প্র. /পৃ.১৫৩-১৫৪]

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে শুধু কামারদের অবস্থাই বিপন্ন হয়নি, একই সঙ্গে কৃষক-চাষিদের অবস্থাও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা নব্য পুঁজিপতিদের পুঁজি তৈরির কারখানার গহ্বরে চলে যায় কৃষকের ফসলি জমি। জীবনদায়িনী জমি ও ফসল হারিয়ে সেই কৃষক তারই জমির ওপর গড়ে ওঠা কলকারখানায় এক রকম শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে। যা এক সময়কার স্বাবলম্বী কৃষকদের সুখের সংসারে শ্মশানের ইঙ্গিত এবং উঠতি পুঁজিপতিশ্রেণির সর্বগ্রাসী প্রভাব-প্রতাপের অশুভসংকেত দেয়। নাগরিক সভ্যতার টানে চিরচেনা গ্রাম ও বসতভিটাকে ভুলে থাকার কারণ হিসেবে মানস বলে–

> 'আমরা ভদ্দরলোকেরা আসলে খুবই বোকা, বুঝলি?...কলোনিয়ালদের তৈরি কালচারে আমরা মানুষ–দেশের যা কিছু সবই খারাপ, আর যা কিছু বিদেশি সায়েবসুবাদের, তার সবই ভালো–এই রকম একটা মানসিকতা গড়ে তুলেছি, আর তার মধ্যে এখনো আমরা রয়ে গেছি।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৫৫]

আসলে যান্ত্রিক প্রযুক্তির আগ্রাসনে লোক প্রযুক্তিকে পরিত্যাগ করা, কৃত্রিম-মেকি নাগরিক সভ্যতার মোহে অকৃত্রিম-খাঁটি গ্রামীণ সমাজজীবন থেকে দূরে চলে যাওয়া এবং ভদ্রলোকী কায়দা-কানুন আত্মস্থ করতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নানা টানাপোড়েনের কানাগলিতে বন্দি হতে হয়। ঢাকায় বসবাস করেও জামিলের প্রথম আবাসভূমি দিনাজপুরের পাহাড়পুর

এলাকায় তেমন আসা হয় না। 'তিন তিনটা জেনারেশন এখানে...যেখানে প্রথম ঠাঁই গেড়েছিস'– মানসের এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে জামিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে-

> 'শুধু ঠাঁই গাড়া নয়। এখানে আমার বাবার দেহ মাটির সঙ্গে মিশে আছে, ছোটো ভাই প্রাণ দিয়েছে এদেশটাকে স্বাধীন করার জন্য। ছোটো বোনের সম্ভ্রম লুট হয়ে গেলে সে আত্মহত্যা করে এ মাটিতেই দেহ বিছিয়ে দিয়েছে...এখানকার মাটির নিচে আমাদের জীবনের মূল শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৫৭]

এভাবে পঞ্চাশ বছর আগে সপরিবারে শরণার্থী হয়ে আসা জামিল ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে মৃত্যু, ত্যাগ-তিতিক্ষার স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারেনি। নিজেদের এক সময়কার বিদ্যাপীঠ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে এসে দাঁড়াতে জামিলের মনে একাত্তরের প্রেক্ষাপট আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কলেজেরই জনপ্রিয় সাবেক অধ্যক্ষ জি.সি দেব (গোবিন্দ চন্দ্র) ও অর্থনীতির প্রফেসরকে পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে অবস্থানকালে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অথচ এমন শহিদ শিক্ষকদের স্মৃতিবিজরিত কলেজটিকেও সাম্প্রদায়িক সরকার স্বনামে-স্বমহিমায় থাকতে দেয়নি। শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে সম্প্রীতি-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও মানবীয় সম্পর্কের বন্ধনে খড়গ চালিয়েছে। স্মৃতিসূত্রেই জামিলের মনে পড়ে পূর্বপাকিস্তানের নতুন গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার কথা। এ সময়েই ষড়যন্ত্র করে পূর্ববাংলার নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং গভর্নরের দুঃশাসন কায়েম করা হয়। পূর্বপাকিস্তানের কম্যুনিস্ট, বিপ্লবী ও বামপন্থীদের দমন করতেই ৯২/ক ধারা জারি করে পাইকারি দরে নেতাকর্মীদের জেলে ঢোকানো হয়। তৎকালীন সময়ের দমন-পীড়ন ও জেলজুলুম প্রসঙ্গে জামিল বলে-

> 'গভর্নরও হয় নতুন, ইস্কান্দার মির্জা নামের এক আর্মির লোক। মওলানা ভাসানী তখন ইউরোপ গিয়েছিল বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে। এদিকে ইস্কান্দার মির্জা হুংকার ছাড়ে। ভাসানী দেশে ফিরলে তাঁকে নাকি গুলি করে মারা হবে। ব্যাপক ধড়পাকড় চলে। এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে তা চলতেই থাকে।...অতীতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যেসব হিন্দুর সামান্যতম যোগাযোগ ছিল তাদেরও ঠিক ঐসময় জেলখানায় পাঠানো হয়।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৫৮]

এমন ধরপাকড়ের সময় বহু সংখ্যালঘু হিন্দু নেতাকর্মী ও তাদের পরিবার ভারতে চলে যায়। আবার অনেকে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। এসময় মানস দত্তসহ জামিলের বন্ধুদের মধ্যে রশিদ, কায়সার ও হামিদরাও বর্ডার পার হয়, আবার অনেকে আত্মগোপন করে। রাজনীতির এ উত্তেজনায় দেশত্যাগ প্রসঙ্গে মানস বলে-

> 'ঐ সময় আমাদের পালাতে হয়। রাতের অন্ধকারে রাধিকাপুর বর্ডার ক্রস করে ওপার চলে যাই। পাসপোর্ট পাওয়া তখনো খুব ঝামেলার ব্যাপার ছিল।...এখানে ছিলাম বি.এ ক্লাশের ছাত্র। ওখানে গিয়ে উঠেছিলাম কালিয়াগঞ্জে। আমার মামারা তখন ওখানে সবে ঘরবাড়ি করেছেন। বড় মামা একটা মুদির দোকানও একই সঙ্গে খোলেন। আমাকে লাগিয়ে দিলেন দোকান-দারির কাজে।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৫৯]

এমন জীবনবাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানস দত্ত ছয় মাস কালিয়াগঞ্জে অবস্থান করে। মানস দত্তের এ পলায়নের পেছনে অবশ্য আরেকটি কারণও ছিল। এসময় ইন্টারমেডিয়েট কলেজ ছাত্রী প্রেমিকা অনীতাকে এক অবাঙালি ছেলে শিস দিয়ে উত্যক্ত করে। এটা কোনোমতেই মানস মেনে নিতে পারেনি। ঘুষি দিয়ে বিহারি ছেলেটির নাক ভেঙে দেবার ঘটনায় পুলিশ কেস হয়ে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতেই পঞ্চান্ন সনে জামিলের প্রেমিকা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নমিতা এবং তার ভাই রঞ্জনরাও দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। জামিল নিজের কারাবরণ সম্পর্কে বলে-

> 'আমি তখন বাড়িতে থাকতাম না। লুকিয়ে ছিলাম কসবার দিকে, ওখান থেকে সেতাবগঞ্জের দিকে যাবার সময় ধরা পড়ে যাই।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৩০]

সাম্প্রদায়িক দুঃশাসন ও ধর্মীয় রাজনীতির কবলে পড়ে জামিল ও নমিতার প্রেমের মাঝে এক অদৃশ্য দেয়াল দাঁড়িয়ে যায় এবং অনিবার্য এক ফাটল দেখা দেয়। কারণ ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে তখন জামিলের মন ও মস্তিষ্ক জুড়ে বসে জাতীয় রাজনীতি ও গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই জেলবন্দি অবস্থার কথা বলতে জামিল জানায়-

> 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তখন! আমরা জেলের ভেতরে বসে তর্ক করছি পাকিস্তানের ভেতরে পূর্ববাংলা থাকা উচিত, নাকি পূর্ববাংলার আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত? পুরনো কমরেডরা বলছেন এটা তোমাদের হঠকারী চিন্তা, আর আমরা তরুণরা বলছি, না, এটাই বাঁচার একমাত্র পথ।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৬০]

এতে জামিল-নমিতার প্রেমের ছন্দ হারায়। তারপরেও একবার জামিল কলকাতায় দেখা করতে গেলে নমিতার ভাই রঞ্জন তাকে অপমান করে বিদায় দেয়। এ ঘটনায় নমিতা বড় আঘাত পায়। তাই এম.এ. পাশ করার পরেও সে গান গাওয়া ছেড়ে দেয় ও নিজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তার গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ে। সুযোগ থাকার পরেও সে অন্য কাউকে বিয়ে করে সংসারী হয়নি। পয়ষট্টি সনের দিকে মৃত্যুর পূর্বে পাঠানো চিঠিতে নমিতা জামিলকে জানায়-

‘তোমার সঙ্গে আমার একবার অন্তত দেখা হওয়া দরকার। একবার এসো, শুধু একবার। আমার জীবনকে আমি অর্থহীন ভাবতে আর পারি না। আমি তোমার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে চাই। তারপর কী হবে জানি না। এটাই আমার শেষ চাওয়া।’-[স্ব.প্র./পৃ.১৬৫]

কিন্তু স্বামী-সংসার-সন্তানপ্রত্যাশী নমিতার শেষ ইচ্ছেটাও পূরণ হয়নি। একদিকে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি, অন্যদিকে পয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধজনিত বর্ডার এলাকার কড়াকড়ি। তাই এ চিঠি তার মৃত্যুর দুই মাস পরে জামিলের কাছে পৌঁছায়। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভূখণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে এরা প্রেমের প্রারম্ভে দুঃসাহসের পরিচয় দিলেও সমকালীন ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কবলে পড়ে তা কাঙ্ক্ষিত পরিণতি পায় না। প্রেমিকা নমিতাকে হারিয়ে, পরম বন্ধু ডাক্তার দেবব্রত, মনিমোহন ও মানস দত্তকে ছেড়ে সাংবাদিকতার মতো উৎকণ্ঠার চাকরি নিতে হয়। আর বগুড়ার সামিনাকে বিয়ে করে জামিলকে রাজধানী ঢাকায় থিতু হতে হয়। অন্যদিকে মানস দত্ত ও অনীতা একই সঙ্গে বি.এ পাশ করে। চৌষট্টি সনের দিকে অনীতারা জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে যাবার পর মানস দত্তও এদেশে থাকেনি। কিন্তু তারপরও মানস-অনীতার প্রেম টিকেনি। এ প্রেমের ফাটল অবশ্য আগেই শুরু হয়েছিল। যদিও–‘খুব সাহসী মেয়ে ছিল অনীতা। প্রাইভেট টিউশনি করে সংসার চালিয়েছে। একই সঙ্গে আবার লেখাপড়াও করেছে।’ অথচ এমন সংগ্রামী, জীবনসাধনায় অবিচল অনীতাকেও মানস শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। প্রেমের সম্পর্ককে অনেকটা অস্বীকার করে, মাঝে মধ্যে দু-একটি দায়সাড়াগোছের পত্র লিখে দায়িত্ব-কর্তব্য এড়িয়ে যায়। উপরন্তু সংসার গড়ার প্রত্যাশায় মেদিনীপুর থেকে শ্রীরামপুরে আগত অনীতা-

‘ওখানেই নদীর ঘাটে মানস দত্তের সঙ্গে মাধবী ঘোষকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখে। মিশনের লোকেরাই জানায় যে ঐ দুটি কপোত-কপোতী বেশ কিছুদিন ধরেই নদীর ঘাটে ঘুরে বেড়ায়।’-[স্ব.প্র./পৃ.১৬২]

এসব ঘটনায় বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়ি জমানো মানস-অনীতার প্রেম গাঢ়-নিবিড় না হয়ে নিজেদের অজান্তেই সম্পর্ক শিথিল হয়, দূরত্ব বাড়ে ও বিশ্বাসে ছেদ পড়ে। এক পর্যায়ে এসে সম্পর্কের শেষ সুতোটাও ছিঁড়ে যায়। মানস এটি টের পেলেও তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। কারণ-

‘ও (অনীতা) মিশনারি স্কুলে বরাবর চাকরি করতো।...তারপর আর দেরি হয়নি অনীতার। সে ঝাড়গ্রামের মিশনারিতে ব্যাপটাইজড হয়, তারপর ওখানেই নান হয়ে যায়। বাধা দেওয়ার জন্য বাইরে কেউ ছিল না, মনের ভেতরেও কেউ ছিল না।’-[স্ব.প্র./পৃ.১৬২]

প্রেম ও প্রেমিকের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে, রাগে, ক্ষোভে ও দুঃখে অনীতা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। নিজের প্রেম, জীবন, যৌবন, স্বপ্ন-সুখকে অপ্রাপনীয় জেনে ধর্মান্তরের অর্গল দিয়ে সে তা মাটি চাপা দেয়। কারণ অনীতার জীবনে কোনো পিছুটান ছিল না। পরপর বাবা-মায়ের মৃত্যু, প্রেমিকের প্রতারণা ও উপেক্ষায় সে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা-সঙ্কোচ করেনি। এভাবে অনীতা আরাধ্য প্রেমকে বুকে চাপা দিয়ে দুঃসহ যন্ত্রণাকে আমৃত্যু একা বয়ে বেড়ায়। অথচ মানস দত্ত খুব সহজে প্রেম ও প্রেমিকার দায়িত্ববোধ ভুলে মাধবী ঘোষকে বিয়ে করে এবং মেয়ে অরুন্ধতীকে নিয়ে বিদেশি জুটমিলের হিসাবরক্ষক হয়ে ঘরকন্নায় মগ্ন হয়। সমকালীন বৈরী সময়বৃত্তের ঘুরপাকে পড়ে জামিল ও মানসের প্রেমও পরিণতির পথ খুঁজে পায় না। অনিবার্য বিচ্ছিন্নতাই হয়ে ওঠে এদের নিয়তি। মানস দত্তকে কেবল ব্যক্তিজীবনের শিকড়বিচ্ছিন্ন-উন্মুলিত-উদ্বাস্তুদশা, অভিশপ্ত প্রেমের গ্লানি এবং শরণার্থী ‘বাঙ্গাল’ পরিচয়ের অস্বস্তিকর অবস্থাই উদ্বেগগ্রস্ত করে না; একই সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা যায়। তাই বন্ধু জামিলকে বলে-

‘আমরা তো এক দিক থেকে তাড়া খেয়ে আর এক দিকে চলে গেছি–এরা যে তাড়া খেয়ে কোন দিকে যাবে কে জানে।’-[স্ব.প্র./পৃ.১৬৭]

এ অনিকেতময়তার ভাবনা মানস দত্তের মনে জেঁকে বসে। দেশভাগের অমানবিক সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বে যে-গভীর রক্তক্ষরণের সৃষ্টি করে, তার উপশম বা নিরাময় অর্ধশতাব্দীতেও সম্ভব হয়নি। যা প্রকৃত অর্থেই বিচ্ছিন্নতার বিষাদে শরবিদ্ধ অবস্থারই পরিচিহ্নবাহী।

আদর্শবান বিপ্লবী চিরকুমার তাপস দত্ত বহু ঝড়ঝাপ্টা সত্ত্বেও জন্মভূমি রামনগরের পৈতৃকভিটা ছেড়ে যাননি। অথচ বর্তমান শারীরিক অসুস্থতায় তাকে দেশত্যাগে রাজি হতে হয়। ফলে চৌদ্দপুরুষের রামনগরের বনেদি বসতভিটা বিক্রির বিষয়টি অনিবার্য হয়ে ওঠে। যদিও তাপস দত্ত মনের দিক থেকে এটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। এর মূলে শুধু নাড়িমাটির প্রতি মায়া-মমতা, স্বদেশপ্রেম আর স্বাজাত্যবোধের বিষয়টিই জড়িত নয় বরং দত্তবাড়ির মূল্য বাবদ চল্লিশ লক্ষ টাকা দাম হাঁকা গ্রাহক-ক্রেতাদের সম্পর্কে তার নেতিবাচক ধারণাও কার্যকর। তাই তিনি বলেন– ‘এইসব অল্প বয়সি যুবকদের হাতে অত টাকা এল কোত্থেকে? ওরা বলে ওদের নাকি বিজনেস আছে। কিন্তু কিসের বিজনেস? ওদের মধ্যে দু’জনের বয়স তো মনে হলো, পঁয়ত্রিশও হয়নি। এরই মধ্যে ওদের অত টাকা যে, চল্লিশ লাখ টাকা দাম হাঁকে বাড়িটা

কেনার জন্য?' ফলে এসব কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদারি এবং উঠতি পুঁজিপতিদের কাছে তাপস দত্ত তাঁর পৈতৃক বসতভিটা বিক্রি করতে চান না। কারণ হিসেবে বলেন-

> 'ওরা কেউ স্মাগলার, কেউ ড্রাগ ডিলার, ওদের কাছে কীভাবে বাড়ি বিক্রি করি? যে বাড়িতে একজন বিপ্লবী পুরুষের জন্ম হয়েছে, সেই বাড়ির পুণ্যভূমি আমি বিক্রি করব ঐরকম লোকের কাছে? অসম্ভব।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৬৮]

এজন্য যেনতেন লোকের কাছে তাপস দত্ত পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করতে নারাজ। কারণ তারই এক কাকা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। যিনি অনুশীলন-যুগান্তর দল করতেন, হিলির ডাকাতি মামলায় একবার তাকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। এমন বিপ্লবী পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত এ পুণ্যভূমির বসতবাড়ি তাপস দত্ত তাই সৎ-সজ্জন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে চান–যা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও। ফলে বীরগঞ্জের এক সময়ের জোতদার হাজি সলিম উদ্দিনের ছেলে হাজি কলিমউদ্দিন চৌধুরীর কাছে বাড়িটি বিক্রি করতে সম্মত হন। কারণ এ হাজি সাহেব নিজে জোতদার হয়েও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন। যা সমকাল বিবেচনায় একেবারেই ছিল ব্যতিক্রম। তবে হাজি সাহেব চৌদ্দ কাঠার দত্তবাড়ির দাম পঁচিশ লক্ষ বলাতে বিক্রির বিষয়ে কিছুটা ভাটা পড়ে। তাই ভাইয়ের সঙ্গে আসা আদরের ভাইঝি অরুন্ধতী (যে নাম তাপস দত্তের রাখা) এবং ভাইয়ের বন্ধু ঢাকাবাসী জামিলের সঙ্গে আসা ছেলে আফসানের সঙ্গে দিনাজপুরের দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ান। এ যুবক-যুবতীর খুনসুটি ও আবেগঘন মুহূর্তকে বিপজ্জনক মনে হলেও তিনি প্রশ্রয় দেন। কারণ উদার-অসাম্প্রদায়িক তাপস দত্ত আফসানের ইতিহাসজ্ঞান, রাজনীতি, বাংলাসাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে ভালো দখল ও ধারণা দেখে মুগ্ধ হন। তাই কথাপ্রসঙ্গে অরুন্ধতীকে আফসান সম্পর্কে বলেন-

> 'তুই যদি এখানে থেকে যেতিস আমার কাছে, তাহলে জীবনের শেষ কটা দিন আমার বড়ো শান্তিতে কাটত।...বড় ভালো ছেলে আফসান, অমন যদি একটা হিন্দু ছেলে পেতাম, তাহলে তোকে এখানেই রেখে দিতাম।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৯২]

ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চ দেখতে গিয়ে তাপস দত্ত আদিবাসী সাঁওতাল ছেলেদের হোস্টেল খোলার অনুমোদনের খবর শুনে খুব খুশি হন। যদিও এসব চার্চের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মের সুযোগ প্রদানের কৌশলে নিম্নবর্ণের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। যার ইঙ্গিত মেলে কাজী নজরুল ইসলামের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস এবং শওকত ওসমানের *সৌদামিনী মালো* গল্পে। একজন কম্যুনিস্ট হবার পরেও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তাপস দত্তের এমন খুশির ভাব দেখে অরুন্ধতী আপত্তি তোলায় তাপস দত্ত জানান-

> 'কম্যুনিজম কি শিক্ষার প্রসার চায় না? ওটাই তো সবার আগে দরকার–না হলে কুসংস্কার তো থেকেই যাবে–তাহলে শেষপর্যন্ত বিকাশ লাভ করবে কী? কুসংস্কার দিয়ে বাধা ধর্ম, না মানুষের প্রগতি, দেখ চিন্তা করে।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৭৫]

প্রগতিবাদী তাপস দত্ত মানুষকেই সবচেয়ে বড় মনে করেন। তাই ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত-ধনী-নির্ধন বিবেচনা না করে একই থালা থেকে আফসানের সঙ্গে মুড়ি খান, আবার বাড়ির ড্রাইভার ও ঠিকেঝি হরিমতির জন্য রান্না ও খাবারের আলাদা ব্যবস্থা রাখতে দেননি। এসব কারণে পরিবারের লোকজনের কাছে তাপস দত্ত অনেকটা পাগলাটে স্বভাবের বলে পরিচিতি পেলেও তিনিই মূলত সর্বমানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নিজেকে ঋদ্ধ করে তুলেছেন। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও ধর্মীয় রাজনীতির কালো থাবা তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ফলে কয়েকবার ভারতের শ্রীরামপুর ও রায়গঞ্জে ভাইয়ের সংসারে গিয়েও তিনি থাকতে পারেননি। বরং শেকড়ের টানে দ্রুত পৈতৃক ভিটায় চলে এসেছেন। তাই জ্যাঠা তাপস দত্তের এমন মানসিকতা সম্পর্কে অরুন্ধতী বলে-

> 'জ্যাঠামণি নিজে চিরকুমার। সংসারে আসক্তি তার থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু কেন যে, এই বাড়িটার ওপর তার এত মায়া, বোঝা যায় না।...তিনি বাড়ি বিক্রি করবেন না। তিনি এই বাড়িতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করবেন একটা।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯০]

তাই যখন ক্রেতা কলিমউদ্দিন চৌধুরী দত্ত বাড়িটি ত্রিশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করতে সম্মত হন এবং জামিল ও মানসের তৎপরতায় বায়নার দিন ধার্য করা হয়, তখন তাপস দত্ত বেঁকে বসেন। কারণ বাস্তবে বাড়ি বিক্রির মুখোমুখি হয়ে তিনি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। সারা রাত ঘুমাতে না পেরে ভাই মানসের সঙ্গে তর্কবিতর্ক পর্যন্ত করেন। আবার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রয়াত ঠাকুরদা, ঠাকুর মা, মেজো পিসির স্বামী ও পিসির আত্মঘাতিনী হবার বিষয়সহ বহু ঘটনার স্মৃতিরোমন্থন করেন। বসতবাড়ি হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনায়, চিরচেনা বন্ধনের শেকড় থেকে ছিন্ন হবার আশঙ্কায় এবং ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাবার ভয়েই মূলত তাপস দত্তের অন্তরাত্মা বার বার কেঁদে ওঠে। পরে জামিলের যৌক্তিক ও মানবিক আপস রফায় তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হন। বায়নার শর্তে বলা হয়–

> 'সম্পূর্ণ দাম শোধ এবং বিক্রির দলিল সম্পাদিত বা রেজিস্ট্রিকৃত না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির পূর্বতন মালিক বসবাস করবেন।...এ বাড়ি এভাবেই থাকবে দু'তিন বছর।'-[স্ব.পৃ./পৃ.১৯০]

এ ব্যবস্থাপত্রটি তাপস দত্তের মনঃপুত হয়। কারণ তিনি শ্রীরামপুরে ভাই মানস দত্তের বাসায় একটানা থেকে হাঁপিয়ে উঠলে পুনরায় রামনগরের পৈতৃক ভিটেবাড়িতে এসে থাকতে পারবেন। রূপলাল আগের মতই বাড়িটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত

থাকবে। এতসবের পরেও মানস দত্ত বাড়ি বক্রি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি এ বেদনা ভুলতেই বাড়ি বিক্রির বায়নার দিন রামসাগরে পারিবারিক পিকনিকের আয়োজন করেন। তাপস দত্তের এ উদ্যোগ মূলত পিকনিকের আনন্দের আবহে বাড়ি বিক্রির বেদনাকে ভুলে থাকার কর্মকৌশল। চার-পাঁচ দিনের ভ্রমণে আফসানের সংস্পর্শে অরুন্ধতীও আকৃষ্ট হয়। ক্যাথলিক মিশনারী চার্চ দেখতে গিয়ে মুখরা অরুন্ধতী আফসানের উদ্দেশ্যে বলে-

> 'ঝগড়াই করব, কিন্তু গলা খুলে করব, ভদ্রতার ঢং রেখে নয়।...ভদ্দরলোকি 'আপনি' কেন, ঐ সম্বোধনটুকু বাদ দেওয়া যায় না? তুমি বা তুই বললে ঝগড়াটা বেশ তেজি শোনাবে, রাজি?'-[স্ব.প্র./পৃ.১৭৪]

এভাবেই আফসানের সঙ্গে অরুন্ধতীর কারণে-অকারণে খুনসুটি, তর্ক, মান-অভিমান চলে। কাঞ্চন নদী, কসবার আমবাগান, ক্যাথলিক চার্চ, চেহেল গাজীর মাজার এবং রাজবাড়ি বেড়াতে গিয়ে উভয়ে আরো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়। একারণেই-

> 'তখন মুখ দেখলেই অরুন্ধতী বুঝতে পারে; আফসান বিরক্ত হয়েছে, না রাগ করেছে, না কি মজার কোনো কথা বলার জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৭৫]

এভাবে পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে এবং অন্তরের টান অনুভব করতে সক্ষম হয়। এভাবে একত্রে চলা, কথা বলা, মান-অভিমান ও ঝগড়া ক্রমশই ভালো লাগা থেকে ভালোবাসায় রূপ নেয়। এদের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারে ঔপন্যাসিক জানান-

> 'প্রথম দিনের একত্র ভ্রমণে ঐভাবেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি আর তরুণ-তরুণী দুটি একে অপরের কাছাকাছি চলে যায়। দুদিন পর তিন জন মিলে হাঁটতে যায় কাঞ্চন নদীর পাড়ে, তারপর যায় কসবার আমবাগান আর ক্যাথলিক চার্চ দেখতে, চতুর্থ যাত্রায় তারা চেহেলগাজীর মাজার দেখতে যায়। তারপর পঞ্চমবারের এই ভ্রমণ, রাজবাড়িতে। পাঁচবার মানে পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করা।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৭]

এভাবে আফসানের সঙ্গে অরুন্ধতীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে গিয়ে বিচিত্র বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক দানা বেঁধে ওঠে। উভয়েই মুখর স্বভাবের হওয়াতে যে-অনুরাগ-বিরাগের ভাব জন্মায়, তা দেখে তাপস দত্তও আনন্দ উপভোগ করেন। অরুন্ধতী তাপস দত্তকে নিজের কাছে নিয়ে রাখার কথা বলে এবং সারা জীবন যাতে সঙ্গে রাখা যায় সেজন্য নিজের বিয়ের ব্যাপারে জ্যাঠাকে নিঃসঙ্কোচে জানায়-

> 'তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। সেই কন্ডিশন আগে থেকেই দিয়ে রাখব।...না হলে হবে না। এমন জায়গায় আমি বিয়েই করব না।...তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তাহলে কিন্তু আমি এখানেই থেকে যাব, আর যা বললাম তাই করব (খ্রিষ্টান/মুসলমান বিয়ে করব)।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৭৬]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে অরুন্ধতী জ্যাঠামশায়কে আসলে তার অসমবর্ণ ও বৈরীধর্মের ছেলে আফসানের সঙ্গে গড়ে ওঠা প্রেমের ইঙ্গিত-ই প্রদান করে। অরুন্ধতী ও আফসানের মাঝে গড়া সম্পর্ক নিয়ে তাপস দত্তও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাই আফসানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে অরুন্ধতীর উদ্বেগ, অস্থিরতা আর ছটফটানি দেখে তাপস দত্তের মনে সন্দেহ জাগে। আবার আফসানের আসার খবর হরিমতির কাছে পেয়েই দ্রুত ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজার পাল্লার আঘাতে অরুন্ধতীর কপাল রক্তাক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। আফসান নিজ হাতে অরুন্ধতীর কপালে মলম লাগিয়ে দেয়। 'এদেশে পুনরায় আসবে কিনা'– এমন কথা আফসান জানতে চাইলে জবাবে অরুন্ধতী বলে-

> 'আমি জানি না আফসান, তবে আমি চাইব, তোমার সঙ্গে যেন আমার আবার দেখা হয়।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৮২]

তাই আফসানকে সে পাসপোর্ট করতে তাগিদ দেয়। যাতে এদেশ থেকে সে তাদের দেশে অন্তত বেড়াতে যেতে পারে। যা আফসানের প্রতি অরুন্ধতীর অকৃত্রিম প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। দত্তবাড়ির ঝি হরিমতি বাটিতে হলুদ ও তুলসীবাটা আনলে আফসান তা দ্রুত অরুন্ধতীর কপালে লাগিয়ে দেয়।এ দৃশ্য দেখে হরিমতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে– 'রাম! রাম! দিদি এটা কি হচ্ছে, তমার কপালত হলদি লাগাছে তুরুক পুরুষ-হায় হায়, তমার পাপ হোবি দিদি– ও দাদা, কামটা তমরা ঠিক করেন নাই, লোকে দেখিলে খুব হাসাহাসি করিবে।' এভাবে হরিমতি আপত্তি তুললে এবং আফসানকে 'তুরুক পুরুষ' হিসেবে চিহ্নিত করলে প্রতিবাদস্বরূপ অরুন্ধতী বলে-

> 'এ্যাই কী বল, পাগলের মতো। ওষুধের মধ্যে আবার তুরুক বামুন কী? যখন ডাক্তার বাবুর কাছে যাও, তখন কি জিজ্ঞেস কর ডাক্তার বাবু কোন ধর্মের লোক? যখন ওষুধ কিনে আনো, তখন কি খুঁজতে যাও দোকানদারটা পূজা করে, না নামাজ পড়ে।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৮৩]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে অরুন্ধতীর অসাম্প্রদায়িক, উদার, সংস্কারমুক্ত ও আধুনিক মন-মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। উপরন্তু অরুন্ধতী বখতিয়ার খিলজীর সতেরো জন অশ্বারোহী নিয়ে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী দখল করার ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যবিভ্রাট বা বিকৃতির কথা উল্লেখ করে। তবে আফসান এ বিষয়ে তর্ক না করে বরং ইতিহাসের

প্রেক্ষাপটে তুর্কিদের আগমন এবং বাঙালি সমাজে 'তুর্কি' বা 'তুরুক' শব্দের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে যে-তথ্য প্রদান করে তা গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে বলে-

> 'শব্দটা (তুরুক) গাল হিসেবে ব্যবহার করা হতো; যেমন ভদ্দর লোকেরা ছোটোজাতের মানুষদের ছোটোলোক, চাঁড়াল, ডোম-এইসব বলে গাল দিত, ঠিক সেই রকমের একটা গাল ছিল তুরুক। আমার আব্বা যখন স্কুলে পড়তেন, তখনও গালটা প্রচলিত ছিল, সেই ফরটিজের দিকে।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৮৫]

এই 'তুরুক' শব্দটি বর্ণবাদী হিন্দুরা মুসলমানদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে ব্যবহার করতো। এমন বহু শব্দ রয়েছে যা সমকালীন বাঙালি সমাজে সাম্প্রদায়িকতার হুল ও হলাহলে পরিপূর্ণ ছিল। কথাপ্রসঙ্গে অরুন্ধতী আফসানকে ধর্মপালন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাইলে আফসান ধর্মপালনের আনুষ্ঠানিকতায় অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসে সম্মতি এবং অনাড়ম্বর-অনানুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি যে-আনুগত্যবোধ ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে তাও তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আফসান বলে-

> 'আমি মনে করি, জগতের সমস্ত মঙ্গল-কল্যাণ, সমস্ত শক্তি-সৌন্দর্য, সমস্ত সত্য ও ন্যায় এবং সমস্ত প্রেম ও ভালোবাসার একত্রিত অস্তিত্বই ঈশ্বর। প্রতিদিন তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করা উচিত। যাতে নিয়মিতভাবে সুন্দর আর কল্যাণের সঙ্গে সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকতে পারি।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৮৬]

এর মধ্য দিয়ে আফসানের ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনায় সর্বমানবিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক, সত্য-সুন্দর আর কল্যাণের প্রতিশ্রুতিই প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম ও ঈশ্বরভাবনায় আফসানের গোঁড়ামি না দেখে বরং সর্বমানবিক, সম্প্রীতির বাণী শুনে অরুন্ধতী আরো আকৃষ্ট হয়। রামসাগরে পারিবারিক পিকনিকের দিন মান-অভিমানের একপর্যায়ে আফসান বলে-

> 'আমাদের ঝগড়াই করে যেতে হবে জীবনভর।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৯২]

'জীবনভর ঝগড়া করা'- তো দাম্পত্য জীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। যা অরুন্ধতীকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। অরুন্ধতী নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আফসান অকপটে বলে-

> 'জীবন যা দেয় তাই গ্রহণ করার চেষ্টা করি। জীবনে নির্মাণ বলে অবশ্যি একটা কথা আছে কিন্তু আমাদের জীবনে ঐ নির্মাণের সুযোগ পাওয়া যায় না।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৯২]

তাই আফসান জীবনবাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে- 'অন্যদের যেমন হয়, আমারও তেমনিই হবে। লেখাপড়া শেষ করে কোনো কাজ করবো, তারপর অন্য সবার মতোই মা-বাবার পছন্দ মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতব।' এসময় 'একটা ঢিল কুড়িয়ে রামসাগরের পানিতে ছুঁড়ে'-আফসান স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের যে-কথা বলে, তা আদৌও তার মনের কথা নয়। উপরন্তু অরুন্ধতী নামের স্বরূপ ও ব্যঞ্জনার বিষয়ে আফসান জানায়-

> 'আসলে অরুন্ধতী একটি তারার নাম।... কেউ বলে শীত আরম্ভের দিকে আকাশের ছায়াপথে মাথার ওপর দুই তারার মাঝখানের তারাটি অরুন্ধতী। আবার কেউ বলে মাথার উপরে দেখা যায় যে নিঃসঙ্গ তারাটি ওটাই অরুন্ধতী।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯৩-১৯৪]

আসলে- 'এ তো তারা খোঁজা নয়, এ একেবারে চিরকালের প্রিয় মনের মানুষটিকে খোঁজা।' অরুন্ধতীকে কেউ-ই হয়তো আফসানের মতো খুঁজেনি, বুঝতে চায়নি। তারপরও অরুন্ধতী আফসানের কাছে জানতে চায়, সে তাকে মনে রাখবে কী না। প্রতিউত্তরে আফসান জানায়-

> 'আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছ, এ ভালোবাসার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তবু ভালোবেসেছ, এতেই আমার জীবন ভরে থাকবে, যদি বেঁচে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই দেখবে তুমি, আমিও শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।...ভবিষ্যতে কী হবে, কেউ তা বলতে পারে না। তবে এখন যে জীবন আমরা যাপন করছি, সেটাই সত্য। এই জীবনে দুজনের ইচ্ছার মিল হওয়াতে যা হয়ে গেছে, সেটাই সত্য-সেই সত্যটিকেই এখন আমাদের রক্ষা করতে হবে।...আমরা দুজন দুজনকে চাই...আর তো কিছুর দরকার নেই।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯৯]

প্রেমের ক্ষেত্রে যে-ধর্ম, বর্ণ ও ভূগোল কোনো বাধা নয়, বরং এ ক্ষেত্রে দরকার ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বাস, সত্য রক্ষার অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি- এমন সত্যই আফসানের বক্তব্যে প্রকাশ পায়। তাই ঝড়বৃষ্টি আর লোডশেডিংময় শান্ত পরিবেশে অরুন্ধতী আফসানের হাত ধরে বলে- 'তোমাকে আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে আমার সঙ্গে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে।' অরুন্ধতী তার জীবনভাবনা সম্পর্কে বলে-

> 'তোমার চিন্তা বারবার মনে আসে আর বারবার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিই।...চাইলেই কি মনের চিন্তাভাবনা জোর করে ঠেলে সরিয়ে দেয়া যায়? কষ্ট পেতে হবে আমাকে। কী করব, এটা আমার ভাগ্য।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯২-১৯৩]

অরুন্ধতী বৈরীধর্ম ও রাজনীতির দুই মেরুর মধ্যে গড়ে ওঠা এমন প্রেম নিয়ে অনিবার্য দুঃখকেই মেনে নেবার কথা জানায়। তাই তাড়াহুড়ো করে বিয়ে না করে পরস্পরকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য কিছুটা সময় আফসান চেয়ে নেয়। এরপরও অরুন্ধতী কেউ কাউকে পাশ কাটিয়ে অন্যজনকে গ্রহণ করার আশঙ্কা প্রকাশ করলে আফসান জানায়-

> 'তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের ভালোবাসা খাঁটি ছিল না, ভেজাল ছিল কোথাও।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৯৯]

এসব আলাপচারিতা ও ঘনিষ্ঠভাবে দুজনের বসে থাকার বিষয়ে অরুন্ধতী জ্যাঠা তাপস দত্তের কথা উত্থাপন করলেও আফসান তা গ্রাহ্য করে না। আবার আফসানাকে 'তুরুক পুরুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও জবাবে আফসান বলে -

> 'নিজেকে কেন ভুলব আমি! ইটস মাই আইডেনটিটি। মাই হেরিটেজ, মাই রিলিজন–ওরা আমাকে যা মনে করে, আমি তাই। আমার অন্য পরিচয় আমি দেব না।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯৯]

আসলে আফসান নিজের ধর্মীয় পরিচয় ও ঐতিহ্য রক্ষা করেও বাঙালি পরিচয়কে বড় করে তুলে ধরে। এ বাঙালিত্বের মাঝে হিন্দু-মুসলিমের কোনো বিভেদ নেই। তারপরও আফসান অরুন্ধতীকে সমাজবাস্তবতা সম্পর্কে বলে-

> 'আসলে আপাতত ওরা কিছুই বলবেন না...দুদিন পরই যখন চলে যাচ্ছ, তখন ঐসব ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেনো করতে যাবেন? তাতে বদনাম বাড়বে বৈ কমবে না। তাঁদের দুচোখ যা দেখছে দেখুক, মুখ তারা খুলবেন না।'-[স্ব.প্র./পৃ.১৯৯]

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে-সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে– তা সর্বকালিক ও সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। আবার 'আমাকে তুমি মনে রাখবে?'–অরুন্ধতীর এমন প্রশ্নে আফসান বলে– 'আমি জানি অরু, বলতে পারব না'। এমন জবাবে অরুন্ধতী অবাক হয় না। তাই ধীর স্থিরভাবেই অরুন্ধতী বলে-

> 'আমরা চুমু খাইনি, বুকে বুক লাগিয়ে জড়াজড়ি করিনি, অনেক সুযোগ ছিল, তবু কখনো সেক্স করার কথা মনে হয়নি- আমি মেয়ে, পুরুষ মানুষের চোখের দৃষ্টির ভাষা সহজেই বুঝতে পারি। তোমার দৃষ্টিতে আমি কোনো লালসা দেখিনি, কামনা দেখিনি, বলা যায় মেয়ে আর পুরুষে সম্পর্ক হতে গেলে যা ফিজিক্যাল ঘটনা ঘটে থাকে, তার কোনোটাই আমাদের দুজনের মধ্যে ঘটেনি। তাহলে বল, কীভাবে আমাকে মনে রাখবে?'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯৮]

অরুন্ধতী-আফসানের প্রেমের লক্ষ্য অপরাপর প্রেমের মতো গড়পড়তা নয়, কামনা-বাসনায় সীমাবদ্ধ নয় বরং ভবিষ্যৎ-মৈত্রীর নতুন দিগন্ত প্রতিষ্ঠায় এবং সর্বমানবিক এক সমাজ সৃজনে অঙ্গীকারবদ্ধ। দত্তবাড়ি বিক্রির ফয়সালা হলে এবং মানস দত্তের অফিসে ফেরার জোর তাগিদ আসাতে উভয়ে তাদের প্রেমের পরিণতির বিষয়ে চিন্তিত হয়। তাই বিদায়ের প্রহর সামনে অবধারিত জেনে এবং প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে অরুন্ধতী জোর গলায় বলে-

> 'তুমি হচ্ছ আমার জীবনে প্রথম পুরুষ, যে মমতা দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে আমার আহত কপালে হাত বুলিয়েছ। ছুটে গিয়ে কিনে এনে সেই ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়েছ, হলুদ তুলসী বাটা লাগিয়েছ, আর যতক্ষণ ধরে লাগাচ্ছিলে, ততক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলে–আমি সেই মুহূর্তগুলোর অনুভব কীভাবে ভুলব, আর সেইসব দৃশ্যই বা কীভাবে ভুলব।'-[স্ব.প্র/পৃ.১৯৮]

ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভূগোলের ভেদবুদ্ধির সীমানা পেড়িয়ে অরুন্ধতী তার প্রেমকে আফসানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। এ প্রেমের জন্য প্রয়োজনীয় দায়ভার, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকারের কথা আফসান দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলে অরুন্ধতী আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। নিজেদের প্রেমের মর্যাদা রক্ষায় আর সফল পরিণতির জন্য, বৈরীধর্ম ও রাজনীতির রাহুগ্রাসকে মোকাবিলার জন্য উভয়ে শপথ নেয়। কারণ ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তাদের দুজনকে দুই বাংলায় ছিটকে দিলেও এর অভিন্ন মাটির মমতা, একই প্রকৃতির পরশ, একই ঐতিহ্যের সুতো, একই মনের গড়ন ও একই ভাব-ভাষা-ভাবনার অনুভব থেকে আলাদা করতে পারবে না। কারণ-

> 'তোমার শীতলক্ষ্যা আর আমার ময়ূরাক্ষী
> তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ
> তোমার কর্ণফুলী আর আমার শিলাবতী
> তোমার পায়রা আর আমার পিয়ালী
> এক জল এক ঢেউ এক ধারা
> ... ...
> আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
> ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক
> এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা
> পরস্পর আমরা পর নই আমরা পড়শী
> আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল
> আমরা ভাষায় এক ভালবাসায় এক মানবতায় এক
> বিনা সুতোয় রাখীবন্ধনের কারিগর
> আমরা একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ
> মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
> আমরাই চিরন্তন কুশল সাধক।'-[অচিন্ত্যকুমার সেন/*পুব-পশ্চিম*]

এ দুই তরুণ-তরুণীর পূর্ব পুরুষেরা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বানিয়ে পরস্পরের স্ববাসকে তারা প্রবাস করেছিল। অর্ধশতাব্দী পর এদেরই উত্তর প্রজন্ম ভালোবাসার অধিকারে হিন্দু মেয়ে অরুন্ধতী মুসলমান যুবক আফসানের হাত ধরে বৃষ্টির জলে

ভিজে নির্মল-নিষ্কলঙ্ক-নিষ্পাপ হয়। এ ঘটনা দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত পাঠক সমাজকে এমন বার্তা শোনাতে চান যে, পূর্বপুরুষেরা ব্যর্থ হলেও উত্তরপুরুষেরা ব্যর্থ হবে না। ধর্মের গোঁড়ামি নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ নয়, বরং প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার মাধুর্য দিয়ে, সম্প্রীতি দিয়ে,বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে, সত্য-সুন্দর-কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার দিয়ে তারা অভিন্ন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে। যারা ভক্তিতে, ভালোবাসায়, বিশ্বাসে ও ভাবনায় হবে পরস্পর হৃদয়ের কাছাকাছি, আপনজন ও আত্মার আত্মীয়স্বরূপ। এমন পরিস্থিতিতে বিদায় বেলা হিলি স্থলবন্দরের বাসে বসা অরুন্ধতীর উদ্দেশ্যে আফসান হাত নাড়ায়। এভাবে দুই বৈরী ধর্মীয় সম্পর্কের মধ্যে অঙ্কুরিত প্রেমের প্রাণবীজকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আফসানকে আপাতত প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে হয়।

কিছু বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও *স্ববাসে প্রবাসে* উপন্যাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কম নয়। কারণ ঔপন্যাসিক হয়তো এ উপন্যাসে সচেতনভাবেই নিজের সমবয়সীদের হতাশা ও অনিশ্চয়তাকে ঝেড়ে ফেলে একটি আশাবাদী ও সম্ভাবনাময় আগামী রচনা করতে চেয়েছেন। এ উপন্যাসে সুস্পষ্টরূপে তাঁর আত্মজৈবনিকতার ছাপ পড়েছে। কারণ তাঁকেও ষোলো-সতেরো বছর বয়সে দেশভাগের ডামাডোলের শিকার হয়ে বায়ান্ন সনে পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ছেড়ে সপরিবারে পূর্বদিনাজপুরের কালীতলায় এসে নতুন বসতি গড়তে হয়। এখানকার স্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শেষে প্রথমে সাংবাদিকতা ও পরে শিক্ষকতার পেশায় ঢাকাতে থিতু হতে হয়। হয়তো তিনি এ ব্যর্থতার কথা মনে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের আফসান-অরুন্ধতীর মধ্যেকার প্রেম নির্মাণ করেছেন। কারণ এরা দুজনেই ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমান জীবন ও ইচ্ছার ঐক্যকে সত্য মনে করে এবং এ সত্যকে প্রাণপণে রক্ষা করতে চায়। তাই শুধু অভিভাবকদের অনুমতি আদায় নয়, বরং নিজেদের বোঝাপড়া ও প্রেমের স্বরূপ (খাঁটি না ভেজাল) বোঝার জন্য তারা আপাতত বিয়ে করে না। তবে পাসপোর্ট করে শ্রীরামপুরে আফসানকে বেড়াতে যাবার আহ্বান এবং 'আমাদের ঝগড়াই করে যেতে হবে জীবনভর'–এরূপ মন্তব্যের মাধ্যমে এদের পুনরায় সাক্ষাৎ ও বিয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত মেলে।

অমানবিক ও ত্রুটিপূর্ণ দেশভাগের রাজনীতিতে একদিন ধর্ম জিতে গিয়ে মানস দত্ত ও জামিল হোসেনের আজন্ম আবাসকে মুহূর্তেই প্রবাস বানিয়ে দিয়েছিল। তাদেরই উত্তরপ্রজন্ম আফসান-অরুন্ধতী সেই ধর্মকেই বুড়ো আঙুল দেখানোর শক্তি অর্জন করে। শওকত আলীর আফসান ও অরুন্ধতী আসলে নতুন বিশ্বের আধুনিক মানুষ। যারা ধর্মকে অবজ্ঞা করে না, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামিকে ভালোবাসা দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারে। এ ভালোবাসাই *স্ববাসে প্রবাসে*-র মূলশক্তি।[৭৭] বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের উপর বাঙালির নৈতিক ভিত্তি দণ্ডায়মান। তাই ধর্মীয় রাজনীতি একদিন বাংলাকে, বাংলার মাটি ও মানুষকে ভাগ করতে পারলেও বাংলার সুমহান ঐহিত্য ও আত্মাকে ভাগ করতে পারেনি। বাঙালির শাশ্বত এ সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সেতুবন্ধই এ কথা বস্তুর প্রোজ্জ্বল প্রান্ত।

যে-রাজনীতি ও ধর্মোন্মাদনা একদিন ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলা ভূখণ্ডের অগণন মানুষের স্ববাসের অধিকার কেড়ে নিয়ে পরদেশে-পরবাসে নির্মমভাবে ঠেলে দিয়েছিল। কিংবা যার জন্য মুহূর্তেই স্ববাস হয়ে উঠেছিল প্রবাস, আর প্রবাস হয়েছিল স্ববাস– সেই ঘৃণ্য-গ্লানিময় রাজনীতির শিকারে অঙ্কুশবিদ্ধ বেদনায় নীল হওয়া মানুষের জীবনালেখ্য এ উপন্যাস। জাতিগত দাঙ্গা আর ধর্মীয় বিদ্বেষ-বিভেদ মানুষের মধ্যে বাঁধায় যুদ্ধ, ঝরায় রক্ত আর প্রাদুর্ভাব ঘটায় প্রতিহিংসার হলাহল। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির সত্য সাধনার মাধ্যমে অর্জিত সর্বমানবিক ও মঙ্গলময় যে-প্রেম– এর কোনো ক্ষয়-লয়-বিনাশ নেই। বরং সত্য-সুন্দর আর কল্যাণ সাধনাই এমন লক্ষ্য অর্জনের এবং সম্প্রীতির সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। *স্ববাসে প্রবাসে* এমন সাহস-সদিচ্ছা-সম্ভাবনার এক বার্তাবাহী ও ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস।

বসত

বসত (২০০৫খ্রি.) শওকত আলীর দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত এক বিশিষ্ট ও বাস্তবমণ্ডিত উপন্যাস। লেখক ব্যক্তিজীবনের নির্মম অভিজ্ঞতার আলোকে দেশভাগের অভিঘাতে অগণন মানুষের দেশত্যাগ, উদ্বাস্তুসংকট, নতুন বসত গড়ার সংগ্রাম, আত্মপরিচয়ের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এবং সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের যে-রূপায়ণ করেছেন; তা একেবারেই জীবন্ত ও সমকালের দলিল হয়ে উঠেছে। লেখক এ আখ্যানে রক্তাক্ত বর্ণমালা দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভাষারূপ দিয়েছেন। এ উত্তাল-উন্মথিত সময়কে শওকত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছেন। আর তা হলো রাজনৈতিক সংকটকে নির্মোহভাবে চিহ্নিত করা এবং মানবিক প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে এ সংকট উত্তরণের প্রয়াস। সমাজদ্রষ্টা ও সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসেবে কালের বিপর্যয়কে তিনি যে-নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন; তাতে যুগ-মানস, যুগ-জীবন, যুগ-জিজ্ঞাসা ও যুগ-যন্ত্রণা নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে।

সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতার স্বাদ ও সাধ নিমিষেই নোনতা ও ফিকে হয়ে যায় ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হবার নির্মম ঘটনায়। শত শত বছর হিন্দু-মুসলিম জনগণ পাশাপাশি বসবাস করার পরেও এ সম্পর্ক সম্প্রীতিতে-বিশ্বাসে-আস্থায় বলিষ্ঠরূপ পায়নি বরং তা শেষপর্যন্ত পারস্পরিক অবিশ্বাস-প্রতিহিংসার হলাহলে রূপ নেয়। প্রায় দুইশত বছর খ্রিষ্টান ইংরেজদের শাসন-শোষণের অধীনে থেকেও দেশীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী এদের সম্পর্কে আগ্রহ, কৌতূহল ও শ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করেছে। অথচ সাড়ে পাঁচশত বছর মুসলমান শাসকদের বহু অনুগ্রহ পাবার পরেও এদের সম্পর্কে মনে সীমাহীন ঘৃণা, অনাগ্রহ ও নিস্পৃহভাব পোষণ করেছে। এ স্বীকৃত ঐতিহাসিক বাস্তবতায় মুসলমানদের আর্থিক পশ্চাৎপদতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্পে পিছিয়ে পড়ার বিষয়টিও ক্রিয়াশীল ছিল।[৭৮] হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতিতে ভারতবর্ষে ইতোপূর্বে বহুবার দাঙ্গার মতো রক্তক্ষয়ের ঘটনা ঘটলেও, তা ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও সাতচল্লিশের দেশভাগের ধন-জন-জান-মাল ক্ষয়ে, জমি-জিরাত-বসতভিটা হারানোর পরিসংখ্যানে সকল বেদনা ও বিপর্যয়কে ছাড়িয়ে যায়। কারণ এ বিতাড়নে দেশভাগ মুখ্য ছিল না; মুখ্য বিষয় ছিল ধর্মের নামে রাজনীতি ও মানুষের বিভাজন। ছেচল্লিশের দাঙ্গা দেখিয়েছিল রাজনীতির রঙ লোহিত, রক্তের রঙ ধর্তব্যে ছিল না। কলকাতা, বিহার, মুম্বাই, পাঞ্জাব ও নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলিম মিলে দুই লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। ধন-সম্পদ-স্থাপনার বিনাশ ঘটে বহুল পরিমাণে, যা টাকার অঙ্কেও ছিল অবাক হবার মতো। এ ছিল অদ্ভুত এক রাজনীতির খেলা। আর খেলেছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, স্বদেশি বিপ্লবী, ভারতীয় কম্যুনিস্ট কিংবা আন্তর্জাতিক ভারতীয় কম্যুনিস্ট শাখার সকল নেতাকর্মীরা মিলেই।[৭৯] দেশভাগের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলা, বিহার আর পাঞ্জাব। এছাড়া ভারতের আর কোনো রাজ্য ভাগ হয়নি। তবে বিপর্যয় ও বেদনায় বাংলা অঞ্চল সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে যায়। ভারত সরকারের সাহায্য ও পরিকল্পনায় পাঞ্জাব ও বিহার এ ধকল কাটিয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চল, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার দিক থেকে পেছানো এ বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিহিংসার কোপ বাংলারাজ্যে ভালভাবেই পড়ে এবং পূর্ববাংলার হিন্দু জোতদার-জমিদার, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পেশাজীবী-মধ্যবিত্তের যে-মানব ঢল পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে, তা ছিল অকল্পনীয়। আবার পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকেও মুসলমানদের যে-শরণার্থী মোহাজেররা পূর্ববঙ্গে চলে আসে, তাও হিন্দুদের তুলনায় কম হলেও একেবারে নগণ্য ছিল না।

দেশত্যাগের প্রথম ধাক্কায় বিপর্যস্ত হওয়া মানুষের মধ্যে গরিব-অসহায়দের তুলনায় ধনী ও মধ্যবিত্ত সচ্ছল পরিবারের সংখ্যাই ছিল বেশি। এ অভিজাত শ্রেণি সামাজিক সম্মান, সন্তানের ভবিষ্যৎ ও জীবনের সুরক্ষার জন্য দেশত্যাগ না করে স্বস্তি পায়নি। যদিও সমকাল বাস্তবতায় শরণার্থীদের এ ধরনের স্বস্তি ও শান্তির বিষয় ছিল সুদূরপরাহত। এ উদ্বাস্তু জনস্রোত দুই বঙ্গে এসে আছড়ে পড়ে এবং নতুন জীবনসংসার শুরু করতে গিয়ে আত্মপরিচয়ের (বাঙ্গাল ও ঘটি) সংকট, বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনা ও মানসিক পীড়নের শিকার হতে হয়। উদ্বাস্তুদের ফেলে আসা চৌদ্দপুরুষের ভিটেবাড়ি, বিষয়-সম্পদ ও জীবনের গল্প শুনে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা ব্যঙ্গ করে বলতো–'মাসিমা, আপনারা (উদ্বাস্তুরা) যত জমিজিরাত ছেড়ে এসেছেন বলেন, তা যোগ করলে সারা ভারতের মোট জমির চেয়েও বেশি হয়ে যাবে।'[৮০] এরূপ ঘটনা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। মানুষ কখনোই তার ফেলে আসা শৈশবস্মৃতি, পূর্বপুরুষ, বসতভিটা, গ্রামীণ-পরিবেশ ভুলতে পারে না। তাই বহু হিন্দু এখনো বিনিময় করে আসা পূর্ববঙ্গের বাড়ি খুঁজেন, বসতভিটায় গিয়ে আবেগে ঘর-দরজা-জানালায় হাত বুলান। কেউবা একমুঠো মাটি ব্যাগে করে নিয়ে আসেন এবং ফেরার সময়েও বারবার ফিরে তাকান। দীর্ঘ সত্তর বছর এ ঘটনা অতিক্রম করে গেলেও ভুক্তভোগী মানুষ আজও এর যন্ত্রণাজর্জর দুঃসহস্মৃতি বহন করে চলছে।

বসত উপন্যাসটি *সীমান্তের যাত্রী*, *বসত* এবং *স্খলন*–এমন তিনটি অংশের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে। এ উপন্যাসের শুরুই হয়েছে দেশত্যাগের এক বিষাদময় ছবি দিয়ে। বায়ান্নর সেপ্টেম্বরে রাতের শেষ প্রহরে মোহনগঞ্জের প্রধান বাড়ির রায়হান আলী হেনু ভাই-বোনসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বিশ্বস্তগৃহভৃত্য আকালু শেখের গরুর গাড়িতে রেলস্টেশনের দিকে রওনা দেয়। বিদায় নেবার পূর্বে হেনুকে তার বাবা যাত্রাপথের বিষয়ে নানা সাবধানী বাক্য, ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব, নিজের লেখাপড়া ও নতুন বাড়ি কেনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-

> 'দেখো বাবা, তুমি পুরুষ ছেলে–এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে। তোমার ভাইবোনদের সব দায়িত্ব আমি এখন তোমার ওপর দিলাম...কারও ওপর ভরসা করবে না–যা করবে সব নিজে। বড় বোনের মত নিয়ে। আর যে টাকা তোমার কোমরে বাঁধা রয়েছে, তাই দিয়ে একটি বাড়ি কেনার চেষ্টা করবে।'-[সী.যা. বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫/পৃ.৯]

সংসারবিমুখ বড় ভাই আরমানের অনুপস্থিতিতে তরুণ বয়সী হেনুকেই এসব গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে হয়। বাড়ির সীমানা পেড়িয়ে হেনু নিজেদের প্রধানবাড়ির দিকে ফিরে তাকায়। একে একে নজরে আসে বুড়ো তেঁতুল গাছ, মায়ের হাতে লাগানো সুপারি গাছ, ফলন্ত শরিফা আতাগাছ, বাতাবি লেবুর গাছ, কলাগাছের ঝাড়, কাঁঠাল গাছ, পুকুরঘাট, প্রকাণ্ড মেটে কোঠাঘর, ঢেঁকিশালা, শস্য মাড়াইয়ের খোলান এবং দাদা-দাদি-সেজো ফুপু-ছোট ফুপু ও মায়ের কবর। এ সূত্রেই হেনুর স্মৃতিতে ভর করে-

> ‘পুকুর ঘাটে বসে হুইলের ছিপ ফেলে মাছ ধরা, রেলওয়ে ব্রিজের ওপর থেকে বর্ষায় উত্তাল কুলিক নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া, উজানির কৈ মাছ ধরার জন্য পীরের দীঘির পাড়ে বর্ষাকালে ছ্যাপা নাসিরের সঙ্গে বসে থাকা। তারপর ব'লো ভাই এর পালাগান শুনে দলবেঁধে শেষ রাতে ভোরের তারা দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরা।...গরুর গাড়ি চেপে নানা বাড়ি যাওয়ার ঘটনা, ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে শীতকালে স্কুলের মাঠে সারাদিন ক্রিকেট খেলা বা দলবেঁধে রাজার দীঘির পাড়ে বনকুল খেয়ে বেড়ানো। দীপালি উৎসবে মাঝরাত অবধি নাটক দেখে কার্তিকের রাতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফেরা।’-[সী.যা./পৃ.১১]

হেনু একে একে তার শৈশবস্মৃতি থেকে বিদায় নেয়। এভাবে জন্মভিটা, বসতবাড়ির প্রিয় প্রাঙ্গণ, খেলার সাথী, পরিচিত ও মৃত স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন বসতের জন্য সামনে এগিয়ে যায়। যা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *উদ্বাস্তু* ও *কাল মধুমাস* কবিতায় অনুরূপভাবে বিদায় নেবার বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। স্মৃতি আর শেকড় থেকে বিদায় নেয়া যে-কত কঠিন, নির্মম ও বেদনার– তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ-ই উপলব্ধি করতে পারে না।

হেনু ম্যাট্রিক পাশ করা ষোলো বছরের তরুণ। সে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হলেও দেশভাগের অভিঘাতে ভাই বোনদের নিয়ে এক রকম পালিয়ে পূর্বপাকিস্তানের দিনাজপুরে আসতে বাধ্য হয়। বাবা ডাক্তার মুর্শেদ এক সময় কংগ্রেস রাজনীতি করায় তিনি বাংলাভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি পাকিস্তানে যেতে চাননি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করলে এবং ঘনিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা নিগ্রহ-নির্যাতন ও জান-মালের হুমকি দেখে তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টান। প্রথম পর্যায়ে মেজু ছেলে হেনু ও বড় মেয়ে মনি'র তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় মালামাল ও টাকা পয়সা দিয়ে অন্যান্যদের পাঠিয়ে দেন। কারণ হিসেবে মানিকগঞ্জ থেকে আগত শরণার্থী বন্ধু নিখিল সেন তাকে বলেন-

> ‘মাইনরিটি মানে বুঝো? মাইনরিটি হইল, অন্ধকারের জীব। আসল চেহারা নিয়া কুনোদিন বাইরাইতে পারবা না। আমি নিজে পারি নাই বুঝছ? পোলাপানগো কথা ভাইবা সিদ্ধান্ত নাও, গোঁয়ার্তুমি কইরো না–এখানে থাকতে হইলে অন্ধকারে থাকতে হইবো–তুমি না থাকো, তোমার পোলাপান গিনি থাকবো, বুঝলা, নর্মাল জীবন ওরা কুনোদিন পাইবো না।’-[সী.যা/পৃ.১৩]

পূর্ববঙ্গের মানিকগঞ্জ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থী নিখিল সেন যে-কথাগুলো মুর্শেদকে বলেছেন, তা একান্তই তার জীবন থেকে নেয়া। কারণ তিনিও মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা আর সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বিষয়-সম্পদ, বসতভিটা ফেলে মোহনগঞ্জে চলে এসেছেন। সঙ্গে জ্ঞাতি বোনের এক ননদ এসেছে; যাকে স্থানীয় মুসলমান ছেলেরা গণধর্ষণ করায় সে বর্তমানে উন্মাদ হয়ে পড়েছে। এসব শুনে মুর্শেদের মনের জোর অনেক কমে আসে। এসময় একদিন-

> ‘মাঝরাতে হঠাৎ দেখা গেল, বাড়িতে গোয়াল ঘরখানা দাউদাউ করে জ্বলছে। দুটো বকনা বাছুর আর দুটো দুধেল গাই ছিল, একটা গাই আগুনে পুড়ে মরে গেল।’-[সী.যা/পৃ.২৭]

এমন ঘটনায় থানায় মামলা দিতে গেলে পুলিশ ক্রিমিনাল কেস দিতে বলে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম জানাতে বলে। এতে আরো বিপদের সম্ভাবনা দেখে মুর্শেদ একটি জি.ডি করেন। কারণ পাড়ার আজহার মাস্টার গরুচুরির মামলা দেয়াতে তার শোবার ঘর দুর্বৃত্তরা জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়া প্রধানবাড়ির বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, জমির শস্য লুটপাট হওয়ায়, কলেজ ছাত্রী বড় মেয়ে মনিকে রাস্তায় বখাটেরা উত্ত্যক্ত করায় এবং ছেলে সমু ও শান্তর প্যান্ট খুলে নাজেহাল করায় ডাক্তার মুর্শেদ দেশত্যাগে বাধ্য হন। বাড়ির পাশে বড় রাস্তার ধারের এক জমির ওপর স্থানীয় মোহিত শিকদারের চ্যালরা নতুন ক্লাবের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে তা দখল করে নেয়। এতে লেখা হয়-‘মহাজাগরণী ক্লাব এর জায়গায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।’ অথচ মুর্শেদ এ দামি জমিটা বিক্রি করে টাকা সংগ্রহের জন্য ক্রেতাও দেখিয়েছিলেন। তাই-

> ‘কাচালু শেখকে সঙ্গে নিয়ে সাইনবোর্ডটা নামাতে গেলে কোত্থেকে এসে দুজন লোক যে লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, বুঝতেই পারলেন না। কাচালুর পায়ে লাঠির একটা বাড়িও মেরে বসলো একজন।’-[*বসত*/পৃ.৮৭]

এর প্রতিকারে মুর্শেদ মামলাও দিতে পারেন না। কারণ এ ক্লাবের পেছনে স্থানীয় প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা শিকদার বাবুরা রয়েছেন। ছেলে-মেয়ে পাঠানোর বিষয়ে বন্ধু শশধর ভৌমিকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক পর্যন্ত হয়। মুর্শেদের বিষয় এলেই শিকদার বাবুরা হাসাহাসি করে বলে বেড়ান-

> 'মুর্শেদ ডাক্তার না পারে কি? এতোকাল কংগ্রেস করার শেষে কী দেখা গেল; তোমরাই বলো? আমরা তো দেখলাম তলে তলে সে মুসলিম লীগই করতো। লুকিয়ে লুকিয়ে জমি বিক্রি করেছে, আর টাকা-পয়সা সবই সরিয়ে ফেলছে পাকিস্তানে।...এখন যেটুকু আছে সব বেচে দিয়ে সটকে পড়ার তালে আছে।'-[*বসত*/পৃ.৮৭-৮৮]

ঘনিষ্ঠ হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়ে তার মনে জেদ চাপে। তাই কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটি, এম.এল.এ নিশীথ বাবু এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেন। তারপরেও পুলিশের তদন্ত পর্যন্ত হয় না। বরং তিনি ঠাট্টা ও হাসির পাত্রে পরিণত হন। আবার উগ্রবাদী স্থানীয় হিন্দুরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ ঘটনা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শরণার্থী নিখিল সেন জানতে পেরে তাকে সতর্ক করে বলেন-

> 'মানুষ বেশি আইবো না, মাত্র দুইজন, কুনসুম আইবো তারও ঠিক নাই, যে কুনোসম আইতে পারে, বুঝছ?...তুমি কইলাম ঐ বাড়িতে রাইতে থাকবা না। যারা আইবো, তারা তো জানে তোমার লগে বহুত টাকা আছে। তারা জানে, তোমারে মারলে হাজার হাজার টাকা পাইবো, সিন্ধুক ভর্তি টাকা রইছে তোমার ঘরে।'-[*বসত*/পৃ.৮৮]

এমন কথা মুর্শেদের কাছে প্রথমে হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু নিখিল বাবুর বার বার হুঁশিয়ারি উচ্চারণে তার মনে ভয় ও সন্দেহ জন্মে। তাই সন্ধ্যার পর সিন্ধুক খুলে কিছু গয়না এবং জমি বায়না বাবদ কিছু টাকা ডাক্তারি ব্যাগে ভরে ফার্মেসিতে আসেন। রাতে বন্ধু নিখিলের বাড়ির ছাদ থেকে চৈত্রের ভাঙা চাঁদের আলোতে দেখেন কালো মুখোশপড়া দুজন লোক ধারালো অস্ত্রসহ বাড়ি ঢুকে। আর ডাক্তারকে না পেয়ে হম্বিতম্বি করে বেরিয়ে আসে। এমন পরিস্থিতিতে নিখিল সেন মুর্শেদকে বলেন– 'আর দেরি না, তুমি পালাও, ভোরের ট্রেন ধইরা কাইটা পড়ো। বাড়িঘর যা রইলো, আমি দেইখা রাখুম। তোমার এইখানে থাকা সেফ না।...মাইনরিটির বহুত ফ্যাকড়া, আমি দ্যাখছি না? ওইদিক যা, এইদিকও তাই।' এভাবে রাতের অন্ধকারে নিখিল সেনের সঙ্গে মুর্শেদ চৌদ্দপুরুষের চিরচেনা পৈতৃক প্রধান বাড়ি জনমের তরে বিদায় জানান। 'যাচ্ছিস তাহলে, জানিস কি, ফিরতে পারবি কি না? ফিরতে পারবি কি?'– এমন প্রশ্নে মুর্শেদের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। মুর্শেদ নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারেন না। কারণ এর মূলে রয়েছে সর্বকালীন সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের অনুষঙ্গ। আর তাই-

'কই যাও চন্দ্রমোহন?
তোমার ক্ষ্যাত, তোমার পষ্কুন্নী, তোমার
আম-জাম, কাঁঠাল, কলা, নারকেল ঘেরা
বাড়ি, উঠোন, হলুদ গাঁদা, নীল
সন্ধ্যামালতি, তোমার রাজ্যপাট
ফালাইয়া রাইতের আন্ধারে
কই যাও? ক্যান
যাইতে হয়!
… … … …
তবে; কই যাও চন্দ্রমোহন? রাইতের আন্ধারে
রাজ্যপাট ছাইড়া কোন নির্বাসনে
যাও নদীর জলে চক্ষের জল মিশাইয়া।
চন্দ্রমোহন, ইংরাজ গেল, কিন্তু
তোমারে ক্যান নির্বাসনে যাইতে অয়।
দ্যাশ অইলো জননী। জননী ক্যান
সন্তান বিসর্জন দেয়।
… … … …
চন্দ্রমোহন, এখনো এত কিছুর
পরও ক্যান নিজের শিকড়ে টান

পড়ে। এখনো ক্যান সন্ত্রস্ত
থাকতে হয় সদা, দ্যাশ তো স্বাধীন।
তবু ক্যান তুমি হও ভীত।
কেবল এই জন্য যে–তোমার
নাম চন্দ্রমোহন।'-[কায়েস আহমেদ/*কুষ্ঠব্যাধি*]

অর্থাৎ সংখ্যালঘুর কোনো নির্দিষ্ট নাম-পরিচয়-ধর্ম-বর্ণ-ভূগোল নেই বরং তা সর্বকালিক ও সর্বজনীন বিষয়। একারণেই পূর্ব পাকিস্তানের মানিকগঞ্জবাসী হিন্দু নিখিল সেনকে এবং হিন্দুস্থানের মোহনগঞ্জবাসী ডাক্তার মুর্শেদকে সংখ্যালঘুর তকমা পড়ে নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে আসতে হয়। যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুর্শেদ বিরোধিতা করেছিলেন, জীবন বাঁচাতে সেই পাকিস্তানেই তাকে একরকম পালিয়ে যেতে হয়। ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাসকে তিনি মেনে নিতেও বাধ্য হন।

পশ্চিম দিনাজপুর, কাটিহার, মুর্শিদাবাদ, মুংগের, এলাহাবাদ, বারাসাত, পুর্ণিয়া, বিহার, পাটনা থেকে আগত বাঙালি ও অবাঙালি মুসিলম যাত্রীদের সঙ্গে হেনু ট্রেনে ওঠে। এদের সকলেরই যাত্রা রাধিকাপুর বর্ডার ক্রস করে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুরের দিকে। হেনুর পাশে বসা বয়স্ক এক হিন্দু লোকের–'তোমরাও কি রাধিকাপুরে যাবে পাকিস্তানের ট্রেন ধরতে?' এমন জিজ্ঞাসায় হেনু না শোনার ভান করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এতে হেনুর-

> 'খারাপ লাগে, খালি লুকানো আর লুকানো। সব সময় মানুষের নজরের আড়ালে থাকার চেষ্টা। কতোদিন চলবে এমন জীবন? এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবে, তাতেও লুকানো! মানুষকে কি অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে?'-[সী.যা./পৃ.১২]

এমন প্রশ্নের কোনো সদুত্তর হেনু খুঁজে পায় না। কারণ যারা হিন্দু অধ্যুষিত মোহনগঞ্জে রয়ে যায় আর তাদের মতো যারা নতুন দেশ পূর্বপাকিস্তানের দিনাজপুরে আসে– এরাও কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। পূর্বপাকিস্তানের মানিকগঞ্জ থেকে আসা নিখিল সেন যেমন পারেননি, তেমনি তারা দিনাজপুরে এবং আকালুরা দুই ভাই ঠাকুরগাঁও-এর হরিপুরের মাশানগাঁও-এ গিয়েও পারবে না। বাবার মুখে শোনা শক-হূনদল-মুঘল-পাঠান-আর্যদের সভ্যতার শুরু থেকেই এমন অভিবাসনের বিষয় জেনে হেনু নিজের মনকে শক্ত করে। তাছাড়া তাদের মতো অপরাপর সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়েও সে অনেকটা আশ্বস্ত হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ট্রেন রাধিকাপুর স্টেশনে পৌঁছালে যাত্রীদের মাঝে যেমন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে, তেমনি আবার ট্রেন ডাকাতি, দাঙ্গা ও রেলকর্মকর্তাদের মালামাল জব্দের কথা শুনে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা বাড়ে। স্টেশনে নেমে দাঙ্গার তেমন আলামত দেখা যায় না। তবে দুই বঙ্গের শরণার্থীদের বিপরীতমুখী যাত্রার শশব্যস্ততা দেখে হেনু রীতিমতো অবাক হয়। কারণ-

> 'পাকিস্তানের যাত্রী যাবে পূর্বদিকে আর হিন্দুস্থানের যাত্রী যাবে পশ্চিম দিকে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! হিন্দুর লক্ষ্য পশ্চিমে, যেদিকে মুসলমানদের কাবাঘর। আর মুসলমানদের লক্ষ্য পূর্বদিকে, যেদিকে মাথা নুইয়ে হিন্দুরা সূর্য প্রণাম করে।'-[সী.যা/পৃ.৩১]

দেশভাগের এমন হুজুগ-হাঙ্গামায় সংখ্যালঘু মানুষেরা অনেকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে রেলকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লোভ ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে হেনুদের কৌশলও ব্যর্থ হয়। রেলকর্মচারীরা জোর করে সুটকেস, তরঙ্গ ও ডেগগুলো জব্দসহ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলে হেনু প্রতিবাদ করে বলে-

> 'এগুলো কেন নিয়ে যাচ্ছেন? যা দেখার এখানেই তা খুলে দেখতে পারেন, আর এ ডেগ দুটো কী দোষ করলো?...আমি তো এক মাস আগেও গিয়েছি, তখন তো এমন নিয়ম ছিল না।'-[সী.যা/পৃ.৩৮-৪০]

কিন্তু হেনুর এমন প্রতিবাদে কাজ হয় না, বরং দেশের টাকা-পয়সা ও সোনাদানা পাচারের জন্য এবং কাজে বাধা দানের অভিযোগে উল্টো গ্রেফতারের ভয় দেখানো হয়। কাস্টমসের অফিসে মালামাল চেক করার নামে তাদের দামি বেতের ঝাঁপি, সোনার আশরফি, দাদির ব্যবহৃত বহু ওজনের এক জোড়া সোনার পটরি, সাতনরী হার, সোনার তারের নকশাদার পছরা এবং দুটি পিতলের ডেগ আত্মসাৎ করে। সঙ্গে আনা এ ডেগের দিকে তাকিয়ে মনি'র বহু অতীতস্মৃতি মনে পড়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্র হবার পরেই সংসারের টানাটানির মধ্যেও তার দাদির জেদ ও ইচ্ছার কারণে মনি'র মা মহররমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। যাতে এসব ডেগ শেষ বার ব্যবহৃত হয়েছিল। মহরমের চাঁদ ওঠার পর থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত খিচুড়ি আর মোরগ-পোলাওয়ের আয়োজন পুরোদমে চলে। গ্রামবাসী এসব খেয়ে রাত জেগে *বিষাদ-সিন্ধু* ও *জঙ্গনামা* শোনে। আর চলে হায়দোস বা লাঠিখেলা এবং তাজিয়া মিছিল। অথচ সেই আটচল্লিশ সনেই মনি'র দাদি মারা যান এবং দেশভাগকে তিনিও মেনে নিতে পারেননি। তাই বড় ছেলে ও ছেলের বউয়ের হাত ধরে বলেছিলেন–

'তুই কিন্তু বাবা এই বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবি না।...বৌমা তুমি সংসারের লক্ষ্মী, তুমি আছো বলেই সংসারটা আছে, এ বাড়িঘর ছেড়ে তুমি অন্য কোথাও যেও না।...কোন গোলামের ব্যাটা করলো অমন আইন? আমার বাড়িঘর, ভূঁই, ফসল, বাগবাগিচা, পুকুর-দীঘি, গোয়ালঘর, গোলাঘর–এসবের কী হবে? এসব ছেড়ে চলে যাবো? এতো সোজা?'-[সী.যা/পৃ.২১]

দাদির মতো মনি'র স্কুল শিক্ষিকা মা-ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে যেতে চাননি। অথচ তিনি নিজে মুসলিম লীগ করতেন এবং নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট চেয়েছেন। কিন্তু দেশভাগের তাণ্ডব দেখে তিনি হতাশ হন। তাই উনপঞ্চাশ সনে ক্যান্সারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশত্যাগ না করার জন্য স্বামীকে বলেছিলেন-

'যে পাকিস্তান হয়েছে, এমন পাকিস্তান আমি চাইনি, ও পাকিস্তান আফাজ মোহাম্মদের পাকিস্তান। ওখানে তুমি ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ো না।...বাঁচি মরি এখানেই যা হবার হবে। বিদেশ বিভূঁইয়ে অন্যের লাথি গুঁতো খাওয়া কি ভালো?'-[সী.যা/পৃ.২২-২৮]

অথচ মনি'র মা মারা যাবার তিন বছরের মাথায় তার অনিচ্ছার-অপছন্দের পাকিস্তানে তারই সন্তানদের যেতে হয়। ছোট ভাই-বোনদেরকে নিয়ে দেশত্যাগের সময় মনি'র বারবার মায়ের কথা মনে পড়ে। মায়ের এ জেদি স্বভাব, উপস্থিত বুদ্ধি, ধৈর্য ও সংযম সবই উত্তরাধিকারসূত্রে মনি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই সে বিপদের দিনে হতাশ হয় না বরং সাহস নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। কথা প্রসঙ্গে পাশের বিহারি সহযাত্রী মহিলা তার কাছে দেশত্যাগের কারণ জানতে চায়। ফলে মনি'র একে একে প্রতিবেশী উগ্রবাদী হিন্দুদের দ্বারা বাড়ির ফল-ফসল, মাছ লুটপাট, জমি ও বাড়ি দখল, গোয়ালঘরে আগুন, ছোট ভাইদের নিপীড়নের কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে পড়ে শেষ দিন কলেজে যাবার পথে বখাটে হিন্দু ছেলেরা অশ্লীল ইঙ্গিত করে তাকে বলেছিল-

'ও-ই মুসলার বেটি, একটু আমাদের দিকে তাকা। কলেজে গিয়ে আর কি শিখবি? চুলার ভিতরে লাকড়ি ঢুকাতে জানিস? আয় আমরা শিখিয়ে দেবো। আমার কাছে আয়।... আমার বল দুটো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বের করে দে।'-[সী.যা/পৃ.২৭]

এভাবে অপমানিত-লাঞ্ছিত হবার পর মনি'র কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। দেশত্যাগের আগমুহূর্তে গ্রামবাসী হিন্দুদের দ্বারা এমন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে মনি'কে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে হয়। ভারতীয় রেল কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মালামাল জব্দ করে। এতেও প্রতিবাদ করায় মনি'কে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। অপমানে-ব্যর্থতায়-লজ্জায় তার কান্না আসে। সহযাত্রীদের অনেকেই তার মতো দুর্ভাগ্যের শিকার হলেও তাদের সান্ত্বনা দেবার লোকজন কেউ না কেউ সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু মনি'র তেমন কেউ নেই। সহযাত্রী আখতার কামাল তাদের সান্ত্বনা দিতে বলেন-

'পাসপোর্ট-ভিসা চালু হলে তখন শুরু হবে আসল মজা।...এখন মালের জন্য পয়সা আদায় করে, তখন মানুষের জন্য পয়সা আদায় করবে।...ভয়ের কিছু নেই; গেলে যাবে কিছু জিনিস, মনে করবে ওসব রাস্তায় হারিয়ে গেছে।'-[সী.যা/পৃ.৩০-৩৯।

যাত্রাপথের নির্মম বাস্তবতায় হেনুও যেন দ্রুত তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ছেড়ে যৌবনের দায়িত্বভারে নিজেকে অভিষিক্ত করে। 'নাড়ায়ে তাকবীর–আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জাগ উঠা মুসলমান–কায়েম কিয়া পাকিস্তান'–এমন শ্লোগান দিয়ে ট্রেন পাকিস্তানে প্রবেশ করলেও ধানক্ষেতময় জলাভূমি দেখে অন্যান্যদের মতো হেনুর মনেও হতাশার ভাব জাগে। আসলে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় দেশেই কিছুলোক রাজনীতি ও ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার বানিয়ে রাতারাতি ধনী হয়ে উঠলেও বাকি সকল মানুষ গরিব-ই রয়ে যায়। দিনাজপুরের পাহাড়পুর এলাকার পূর্বে ভাড়াকৃত ছোট বাড়িতে ওঠে হেনুসহ ভাইবোনদের নতুন দেশে আগমনের উৎসাহ ফিকে হয়ে যায়। তারপরেও বড় বোন মনি'র বলিষ্ঠ ভূমিকায় হেনু সহজেই নিজেদের সামলে নেয়। ছোট ভাইদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে নিজেও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হয়। ইতোমধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে প্রতিবেশী হেডমিস্ট্রেস মনীষা চক্রবর্তীর আগ্রহে মনি'র গার্লস হাই স্কুলে চাকরি হওয়াতে হেনু কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। প্রথম দিনের পরীক্ষামূলক ক্লাসে মনি নিজের যোগ্যতারও প্রমাণ রাখে। আঠারো বছর বয়সী মনি'র এটি প্রথম অভিজ্ঞতা হলেও-

'সে ঘাবড়ায় না। আর ঘাবড়াবে কেন? মা মারা যাবার পর তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। মোহনগঞ্জের বাড়ির ঝামেলা সামলে নিতে হয়েছে। কলেজে যাওয়ার পথে ফাজিল হিন্দু ছোকরাদের কতোরকমের টিটকারি আর বিদ্রূপ, আত্মীয়-স্বজনদের বাঁকা বাঁকা কথা, সহপাঠীদের উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য–সবই তাকে সইতে হয়েছে। তবু সে উদ্যম হারায়নি।'-[*বসত*/পৃ.৬৯]

তাই জীবনের পাঠশালায় দীক্ষিত, পোড়খাওয়া শক্ত-পোক্ত মনি না ঘাবড়ে নিজের গুণ ও দক্ষতায় একশত বিশ টাকা বেতনের চাকরিতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পায়। বিদেশ-বিভূঁইয়ের দুষ্কাল-দুর্দিনের সংসারে এ চাকরির মূল্যও মনি'র কাছে ছিল অনেক। তার এ চাকরি করার বিষয়টি সমকাল বিবেচনায় নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ইঙ্গিতবাহী।

দিনাজপুরের পাহাড়পুর এলাকার মনীষা-মুকুলদের এ চক্রবর্তী পরিবারও দেশভাগের অভিঘাতে দগ্ধ হয়। মুকুলের দুই ভাই কলকাতার বারাসাতে চাকরি করে সেখানেই সম্পদ ও বাড়ি বিনিময়ের (exchange) চেষ্টা করে। কিন্তু সাতচল্লিশের প্রেক্ষাপটে বিনিময় ব্যবস্থাটিও সহজ সাধ্য ছিল না। এক্ষেত্রে সম্পদের দামের সামঞ্জস্য ছাড়াও উভয় পক্ষের বিশ্বাস-আস্থার ব্যাপারটিও কার্যকর ছিল। তাই আফাজ দিনাজপুরে, আকালু-কাচালুরা ঠাকুরগাঁওয়ে exchange করতে পারলেও মুকুল ও মধুসূদন ঘোষরা করতে পারেনি। বসতবাড়ি বদল, সম্পত্তি বিক্রি ও চাকরির সুরাহা না হওয়াতে মানসিক প্রস্তুতি থাকার পরেও চুয়ান্ন পর্যন্ত মুকুলদের ভারত যাওয়া হয় না। এ চক্রবর্তী পরিবারের সকল সন্তানই শিক্ষার সঙ্গেই সঙ্গীত, নৃত্যসহ নানা সাংস্কৃতিক চর্চাতেও যত্নশীল ছিল। ফলে ম্যাট্রিক পরিক্ষার্থী মুকুলও নাচ-গানে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠে। এতে বোঝা যায় সাধারণ মানুষের মনে ধর্মান্ধতা ছিল না। তাই মুকুল ও হেনুদের দুই পরিবারের মধ্যে সহজেই সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হেনুর তৎপরতায় কালীতলার ঘোষদের ক্রয়কৃত বাড়িতে মনি ভাইবোনদের নিয়ে সংসার গুছিয়ে বসে। নতুন বাড়িতে ওঠে ছোট ভাই খোকার-'বুবু আমরা মোহনগঞ্জে কবে যাবো?' এমন প্রশ্নের মনি কোনো উত্তর দিতে না পেরে অন্যত্র সরে যায়। হাসান আজিজুল হকের *আগুন পাখি*-র নায়িকার মতো দেশ আবার কীভাবে ভাগ হয়– এমন কথা সেও বলতে পারে না। নিজস্ব বাড়িতে ওঠে হেনু অনেকটা স্বস্তি পায়। সে কলেজমুখী হয় এবং পড়াশোনায় জোর দেয়। কলেজের সমৃদ্ধ লাইব্রেরি হেনুর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কারণ-

> 'মোহনগঞ্জের স্নেহলতা লাইব্রেরিতেও সে প্রায় নিয়মিতই যেতো; কিন্তু ওখানে যা বই ছিল, তা কলেজ লাইব্রেরির শতভাগের এক ভাগও হবে কিনা সন্দেহ। বাড়িতে প্রবাসী আর ভারতবর্ষ আসতো। ঐ দুই পত্রিকায় যে-লেখকদের বই দেখা যেতো, তাঁদের বই এখানে একের পর এক র‍্যাকে সাজানো।'-[*বসত*/পৃ.৭৪]

হেনু প্রিয় লেখকদের বইয়ের সান্নিধ্য পায় এবং বইপড়ার নেশায় মেতে ওঠে। এ বই পাঠের নেশায় শুধু নিজেই জড়ায় না বরং সহপাঠী রিয়াজ, মঈন ও আসাদকেও যুক্ত করে। এ বইপড়াকে কেন্দ্র করে হেনুর জীবনে প্রেমের পরশ লাগে। আই.এ পরীক্ষার্থী হেনু এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী মুকুলের মাঝে ক্রমশই প্রেমের অঙ্কুরোদ্‌গম শেষে তা ডালপালা-পত্র-পল্লব মেলতে শুরু করে। তাই দেখা যায়-

> 'মফস্বল শহরের সদ্য কৈশোর ছাড়ানো দুই তরুণ-তরুণী লুকিয়ে দেখা করে আমবাগানে সন্ধ্যার অন্ধকারে। হাসে, কাঁদে, দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে হৃদস্পন্দন শোনে...তারপর আবার দুজন দু'দিকে ছুটে পালায়। রোজ পারে না।...তবু মুকুলের মনের ভেতরকার মেয়েটি আনন্দের নাচ নেচে যায় আর গায়–মম চিত্তে নিতি নৃত্যে তা-তা-থৈ থৈ।'-[*বসত*/পৃ.১০৩]

এভাবে দুজনের প্রেম ভরা ভাদ্রের নদীর মতো কানায় কানায় ভরে ওঠে। কৌশলে আমবাগানে দেখা হলে মুকুল হেনুকে বলে- 'আমাকে তুমি ভালোবাসো? বারবার বলো, একশো বার বলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' মুকুলের এমন বাঁধভাঙা আবেগ ও প্রতিশ্রুতি চাওয়ার পেছনে কারণও ছিল। কেননা তার নাটোরের মাসিমা পড়াশোনার জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মুকুলকেও কলকাতায় পাঠানোর প্রস্তাব করে। তাই মুকুলও হেনুকে সেখানে গিয়ে দেখা করার আহ্বান জানায়। তাছাড়া সে দেখতে সুন্দরী হওয়াতে এবং সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায় মুকুলকে তার বাবা-মা দিনাজপুরে রাখতে সাহস পায় না। কিন্তু এসব শুনেও হেনু তেমন বল-ভরসা ও প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। এ সময় কলেজে 'নজরুলকাব্যে বিদ্রোহ' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে হেনুর প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া এবং তা স্থানীয় পত্রিকা 'নতুন দিন'-এ প্রকাশ হবার আনন্দ ছোট ভাই শান্তর মৃত্যুতে ফিকে হয়ে যায়। স্থানীয় রমেন ডাক্তারের অবহেলা ও স্বেচ্ছাচারিতায় মাতৃহীন শান্ত অকালে মারা যায়। শান্তর আকস্মিক মৃত্যুতে মনি ঠিক থাকতে পারে না। কারণ এগারো মাসের এ শান্তকে মৃত্যুর পূর্বে তার মা মনি'র হাতে সমর্পণ করে যান। কোলেপিঠে লালন-পালন করা আদরের ভাইয়ের মৃত্যুতে-

> 'বাইরে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে দেখা গেল শুধু একজনকেই।...মনিরা খাতুনের কান্নার আওয়াজ তখনও রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে চিরে দিচ্ছিলো।'-[*বসত*-পৃ.৯৬]

ছেলের লাশ বহন করার সময় মুর্শেদ ডাক্তার কেঁদে বলেন-'এটা কি আমার পাকিস্তানে আসার প্রথম পুরস্কার, ছেলের লাশ?' নতুন দেশ পাকিস্তানে এসে প্রথমত তিনি ছোট ছেলেকে হারান। দ্বিতীয়ত তিনি নতুন সঙ্গী জোটাতে পুনরায় বিয়ে করেন। এই হারানো ও পাওয়ার হিসেব-নিকেশে তিনি নিজ সন্তানদের কাছ থেকে দূরে সরে যান। তারপরেও হেনু পাকিস্তান সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে। কলেজে গড়ে ওঠা প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়নের শাখায় সে নাম

লেখায় এবং অফিস খুলে কার্যক্রম শুরু করে। ভাষাসৈনিক আব্দুল মতীন, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, কমরেড অনিল রায় ও মওলানা ভাসানী মিটিং করতে আসলে হেনু দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়। আবার তেভাগা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কমরেড হাজী মোহাম্মদ দানিয়েল, বরদা চক্রবর্তী, অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করে ইতিহাস ও রাজনীতি-তত্ত্বের গূঢ়ার্থ মীমাংসা করে। এদের বক্তব্যও হেনু সমর্থন করে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তির ক্ষেত্রে সে বিশ্বাস করে–

> ‘সাম্প্রদায়িকতাই সব চেয়ে বড় বাধা। শুধু সাম্প্রদায়িকতা হঠানোর জন্যই বিরোধী দলগুলোর জোট বাধা উচিত। মুসলিম লীগই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার আসল খুঁটি। ওটাকে সরাতে না পারলে মুক্তি নেই।’-[*বসত*/পৃ.১০৪]

ফলে পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে, মর্যাদা নিশ্চিত করতে ও শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে হেনু নিজের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠে। হেনু রাজনীতির ময়দানে সফল হলেও পরীক্ষার যুদ্ধে আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারে না। তবে এ পরীক্ষার বিপর্যয়ের চেয়ে বাবার পুনরায় এক বিধবাকে বিয়ে করায় হেনু মর্মাহত হয়। সে কোনোভাবেই বাবার এমন হঠকারী কর্মকে মেনে নিতে পারে না। তার কেবলই মনে হয়-

> ‘এটা অন্যায় করলেন বাবা।...নতুন দেশে এসে বাবা আসলেই কিছু কি পাচ্ছেন? না কি হারাচ্ছেন?...বাবা নতুন কিছু পেয়েছেন, আর পুরনো সবই হারিয়েছেন। এমনকি একান্ত আপন জনদেরও।...তারা ছোট ভাইটিকে হারালো, তার সঙ্গে হারালো সংসারের আসনটিকেও। পাকিস্তানে আসায় এই তাহলে তাদের পাওয়া আর হারানোর হিসাব।’-[*বসত*/পৃ.১০৮-১০৯]

সংসারের নির্মম বাস্তবতায় হেনুর জীবন আরো পোক্ত হয়ে ওঠে। হাত খরচের টাকা সংগ্রহে হেনু প্রাইভেট পড়ায়। আবার পয়সার অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে স্থানীয় সুন্দ্রেনাথ কলেজেই বি.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এ সময় মুকুলদের পরিবার দেশত্যাগ করে বারাসাতে যাবার উদ্যোগ নিলেও হেনু কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। কারণ নিজের পরনির্ভরশীল অবস্থা, প্রেমিকার ভিন্নধর্ম, নোংরা রাজনীতি, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে হেনু অস্বীকার করতে পারে না। ফলে হতাশাগ্রস্ত হেনুর মনে উদয় হয়-

> ‘জীবনে তার প্রেম এলো, কিন্তু এত অল্প সময়ের জন্য? মনের মিলন হতে না হতেই বিচ্ছেদ।’-[*বসত*/পৃ.১১৭]

তবে রাজনৈতিক উত্তাপে হেনুর বিরহ-ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ সরকার ও মুসলিম লীগের চক্রান্তে পূর্বপাকিস্তানের অবাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত সৈয়দপুর, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোর ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা লাগাবার গুজব ছড়ানো হয়। ছাত্র ইউনিয়নের তৎপরতায় এবং দলীয় অবাঙালি নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় দিনাজপুরে এ সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভম হয়। তবে সরকারি মদদে নারায়ণগঞ্জ জুট মিলের দাঙ্গা এবং কলকাতায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের এক বক্তব্যের অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। ফলে শুরু হয় বামপন্থী নেতাকর্মী ও পুরনো কমরেডদের গণগ্রেফতার। পালিয়েও কেউ রক্ষা পায় না। হেনু প্রথমে ফুপাতো ভাই আমিরের বাসায় আত্মগোপনে থাকে। আত্মগোপনে থাকাটাও হেনুর অসহ্য লাগে। মধ্যরাতে হেনু কালীতলার বাড়িতে গেলে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে এবং বাবা তাকে পালাতে বললেও সে ধরা দেয়। হেনু সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজবন্দি হিসেবে কারাবরণ করে। তার সঙ্গেই কমরেড হাজী দানিয়েলসহ সাতজন তরুণকেও জেলে ঢোকানো হয়। কোমরে দড়ি বাঁধা ও হাতে হাতকড়া নিয়ে তারা শ্লোগান দেন-

> ‘ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ।...রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই–একুশ দফা কায়েম করো–লাঙল যার,জমি তার।’-[*বসত*/পৃ.১৩০]

দিনাজপুর জেলা কারাগারে শুধু হেনুদেরই নয় বরং যারা রাজনীতিতে সক্রিয় নন, অথবা রাজনৈতিক প্রোগ্রামে তবলা-হারমোনিয়াম বাজিয়ে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন– এদেরকেও ৯২/ক ধারা জারি করে গণহারে গ্রেফতার করে। ফলে প্রথম দিনেই বামদলের বয়স্ক হাজী দানিয়েল, বরদা চক্রবর্তী, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনিল রায়, হরিদাস তালুকদার, সুনীল রায়, যোগেন রায়, বেনু মিত্র, মনিশঙ্কর, দীপনারায়ণ, টোমা সিং, জামান, খায়রুলসহ আঠারো জনকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে আনে। কারণ সরকার মনে করে বামপন্থীরাই পাকিস্তানের শত্রু। আর সরকারও বোঝাতে চায়-‘মুসলিম লীগ বিরোধী কার্যক্রম অন্য কেউ করে না, হিন্দুরাই করে’। সুতরাং ‘হিন্দুদের আগে ধরো’। তাই হিন্দুগন্ধ থাকলেই জেল জুলুম শুরু হয়। অথচ পুঁজিবাদ সমর্থিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের এ সময় সরকার তেমন কিছু বলে না। শুধু সাবেক মুসলিম লীগের তেজি নেতা এবং বর্তমানে লীগপন্থী কবিরুল ইসলামসহ তিনজন কর্মীকে আটক করে। জেলবন্দি অবস্থায় হেনু দেশের বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসঙ্গতি, রাজনীতির লাইন নিয়ে বামদল-আওয়ামী লীগ-মুসলিম লীগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, তেভাগা আন্দোলনে আদিবাসী পুরুষের সঙ্গে নারীর প্রশংসনীয় ভূমিকা এবং নিজের লেখক সত্তার জাগরণের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। তবে তরুণ কর্মীদের বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে আওয়ামী

লীগ, মুসলিম লীগ ও বয়স্ক কমরেডদের যে-মতপার্থক্য রয়েছে, তার কাছে তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈধ নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করায় পাকিস্তানি শাসক ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে সহযোদ্ধা জামাল ও মাদল বলে-

> 'পাকিস্তান হওয়াতে পূর্ব বাংলার মানুষের কোনো লাভ হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না, এমন পাকিস্তান থাকার দরকার নেই।...আগে ছিলাম ব্রিটিশরাজ আর তার দালালদের পায়ের তলায়, এখন থাকতে হচ্ছে পাঞ্জাবি আর উর্দুঅলা শাসকদের পায়ের তলায়।...তাই আমরা পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে চাই।'-[*স্খলন*/পৃ.১৫৫]

এ কথাগুলোকে হেনুর নিজের কথা বলেই মনে হয়। তবে এমন কথা শুনে সাবেক মুসলিম লীগ নেতা কবিরুল ইসলাম তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন আর বলেন-

> 'হিন্দুস্থানের সঙ্গে মিলে যেতে চাও। তাই না? ...হিন্দু কম্যুনিস্টরা এইটা চায়। তারা চায় না পাকিস্তান টিকে থাকুক...পাকিস্তান তো একটা নতুন কনসেপ্ট, একটা নতুন আইডিয়া, এর বেসিস হচ্ছে ইসলাম...থাক না কেন হাজার মাইলের ব্যবধান।...এ্যাই ছোকরা চোপ...দেশের শত্রু, ইসলামের শত্রু, হিন্দুর পা-চাটা কুত্তা কোথাকার।'-[*স্খলন*/পৃ.১৫৫-১৫৬]

জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের এমন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আর বামদলের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অব্যাহত ভুল ও ব্যর্থতার কারণেই যেমন কমরেড দীপনারায়ণ, যোগেন রায় দেশত্যাগ করতে চায়; তেমনি প্রহসনের বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বৈরাগী ও হোসেন আলীও পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে চায় না। আর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ধরে আনা বিষ্ণুপ্রসাদ তো ফাঁসি কার্যকরের দুশ্চিন্তায় পাগল হতে বসেছে। এমন অন্যায়-অবিচার, ন্যায়-নীতিহীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে এরা থাকতে না চাইলেও হেনু এ প্রস্তাবকে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ ওখানে গিয়েও যে-ভালো কোনো সুরাহা হবে না– তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর নতুন বিয়ে করা বীর কমরেড যোগেন রায়কে তিন বার অন্যায়ভাবে জেলবন্দি করায় বীর্যবতী স্ত্রী মেঘমালার বিরহে সে কাতর হয়ে পড়লে তাকেও উৎসাহ দিয়ে হেনু বলে-

> 'প্রেম মানে তো জীবনকে নতুন সৃষ্টির দিকে নিয়ে যাওয়া। প্রেমও তো একধরনের বিপ্লব। আপনাকে তো মনের দিক থেকে শক্ত হতে হবে। না হলে ঐ বিপ্লবে আপনি সফল হবেন কীভাবে?'-[*স্খলন*/পৃ.১৭৪]

এসময় মুকুল বেনামে হেনুর উদ্দেশ্যে চার-পাঁচ লাইনের একটি চিরকুট পাঠালে এবং তা কারাধ্যক্ষের হাতে ধরা পড়লে বিশ্রী ঘটনা ঘটে। কারণ মুকুলদের আপাতত ভারতে না যাবার কথা ও হেনুর বি.এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবার তথ্যসংবলিত এ চিরকুটকে জেলকর্তৃপক্ষ প্রেমপত্র বলে চালিয়ে দেয়। আবার হেনুর বাবাকে ডেকে এনে তা দেখালে তিনি মুকুলদের বাড়ি গিয়ে যা-তা গালমন্দ করেন। তাছাড়া ডেপুটি জেইলরের মুখে মুকুল সম্পর্কে বিব্রতকর কথা শুনে হেনু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। ডেপুটি জেইলর জানান–

> 'ওদের ব্ল্যাকমেইলিংও করা হচ্ছে। মুকুল ভালো নাচতে পারে তাতো জানো, এখন বাইরে থেকে গেস্ট এলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে রাতে নাচগানের আসর বসে; আর সেই আসরে মুকুলকে নাচতে যেতে হয়। না গেলে ভয় দেখায়। বলে, পলিটিক্যাল লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারো আর গভর্নমেন্টের লোকদের মিটিং এ আসতেই যতো আপত্তি।'-[*স্খলন*/পৃ.১৯৬]

এসব শুনে হেনুর বুকটা ফেটে যেতে চায়, গা জ্বালাপোড়া করে, হাত-পা নিশপিশ করে আর চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। জেলবন্দি অসহায় হেনুর করার কিছুও থাকে না। এমন মানসিক অবস্থায় বড়বোন মনি দুটি সাদা কাগজে হেনুর সই নিতে আসে। কিন্তু জেলমুক্তির জন্য অবমাননাকর বন্ডসই দিতেও হেনু রাজি হয় না। 'না মনিবু আমি এভাবে নাম সই করবো না'–হেনুর এমন কথায় মনি কেঁদে ওঠে। বড় ভাইয়ের বাড়িত্যাগ আর বাবার অসুস্থতায় শেষ পর্যন্ত ছোট ভাইবোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে হেনু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সই করে। তাই-

> 'বোনের কান্না দেখে হেনুরও কান্না পায়। ছোট ভাই আর বোনদের মুখগুলো মনের মধ্যে ভাসে। আর সে বোনের হাত থেকে কাগজ দুইখানা টেনে নিয়ে বোনেরই এগিয়ে ধরা কলমটা দিয়ে নামটা স্বাক্ষর করে দেয়। তারপর আর কোনো কথা বলে না। বোনের মুখের দিকে মুখ তুলে পর্যন্ত তাকায় না। মাথা নিচু করে ডেপুটি জেলারের অফিস রুম থেকে বেরিয়ে আসে।'-[*স্খলন*/পৃ.২০১]

এমন নীতিবিরুদ্ধ ও ব্যক্তিত্বহীন কাজ হেনু মেনে নিতে পারে না। তাই মনের যন্ত্রণায় একা একাই দগ্ধ হয়। এসময় কমরেড বরদা বাবু হেনুর ভেতরকার লেখকসত্তা নির্ণয় করেন। জোর দিয়ে হেনুকে বলেন-

> 'রাস্তার রাজনীতি তোমার কাজ নয়, বুঝেছো? তোমার কাজ রাজনীতির কথাগুলো লিখে প্রকাশ করা–রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে পারবে না, তুমি লেখালেখি করে যাও।'-[*স্খলন*/পৃ.১৫০]

এসময় লীগ নেতা কবিরুল ইসলাম মুক্তি পান। তবে কিছু বামপন্থীদেরও মুক্তি দেয়া হবে আর বাকিদের রাজশাহী জেলে পাঠানো হবে বলে গুজব শোনা যায়। পরে দেখা যায় আঠারো জনের মধ্যে হেনু, খায়রুল, শহীদুল, বেলাল, মনিশঙ্কর বাবু ও হামিদকে বদলি করা হয় না। নিজের নাম বদলির তালিকায় না পেয়ে হেনু মর্মযাতনায় দগ্ধ হয়। কারণ-

> 'খবরটা শোনার পর থেকেই থ হয়ে যায় হেনু। কেন তাকে বাদ দেওয়া হলো? তাকে কি শিগগির ছেড়ে দেয়া হবে? যদি সেটা করা হয়, তাহলে সে মুখ দেখাবে কেমন করে। সবাই ভাববে দালালি করে সে দাসখৎ দিয়ে বেরিয়েছে।'-[*স্খলন*/পৃ.২০৪]

হেনুর মানসিক বিপর্যয়ে হাজী দানিয়েল এসে তাকে সান্ত্বনা দেন। আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা হিসেবে বলেন– 'মনে হচ্ছে, তোমাকে শিগগির ছেড়ে দেবে। বোধ হয় তোমাকে সারেন্ডার করতে বলবে। সরকারি দলের পক্ষে কাজ করার প্রস্তাবও দিতে পারে, তুমি কিন্তু রাজি হয়ো না, খবরদার না। যদি এমন কিছু করো, তাহলে সারা জীবন তোমাকে মাথা নিচু করে থাকতে হবে। ও কাজ কিছুতেই করো না।' এভাবে মনের সঙ্গে বিবেকের দ্বন্দ্ব ও কশাঘাতে হেনু রক্তাক্ত হয়। যাবার সময় কমরেড সুনীল রায় হেনুকে তার 'রাজনীতির সঙ্গে লেখালেখি'-র কাজ চালিয়ে যাবার বিষয়টি পুনরায় মনে করিয়ে দেন। কমরেডরা বিদায় নিলে হেনু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এসময় ডেপুটি জেইলর তৈয়বুর রহমান হেনুর উদ্দেশ্যে বলেন-

> 'এখন এ অবস্থায় আপনার বোন কীভাবে সামাল দেবেন? আপনি কেমন সন্তান? কেমন ভাই? নিজের বাড়ির দায়িত্ব পালন করেন না, দেশের মানুষের দায়িত্ব কীভাবে পালন করবেন?'-[*স্খলন*-পৃ.২১০]

ডেপুটি জেইলরের এমন যৌক্তিক কথা, মানসিক আঘাত ও ফাঁসির মঞ্চে যাবার প্রতীক্ষায় নির্দোষ বিষ্ণুপ্রসাদের সর্বধর্মের ঈশ্বরের নাম নিয়ে বাঁচার গগনভেদী তীব্র আর্তনাদ– সব মিলিয়েই হেনু জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে শুরু করে।ডিআইবি-র মমতাজ মিয়া হেনুকে তার রাজনীতি করার কারণ ও ভবিষ্যতের ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে–

> 'আমি রাজনৈতিক দলের লোক নই, আমি রাজনীতি করিনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। ...ভবিষ্যতের কথা এখন বলতে পারবো না। তবে অন্যায় হলে তার প্রতিবাদ করা মানুষের কর্তব্য।'-[*স্খলন*-পৃ.২১১]

তৈয়বুর রহমানের প্রচেষ্টা আর বড সইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে নভেম্বর মাসের শুরুতে হেনুর জেলমুক্তি হয়। তারপরেও এমন অনৈতিক, আপসময় মুক্তির জন্য হেনুর অস্বস্তি দূর হয় না। তার মনে প্রশ্ন জাগে-

> 'কাজটা কি ঠিক করেছি? এমন কাজ কেন করলাম? যা অন্য কাউকে বলতে পারি না? আমি কোন মুখে মাদল, জামান আর ওয়াসিমদের সামনে দাঁড়াবো।'-[*স্খলন*/পৃ.২১৪]

এমন দোলাচল নিয়ে জেলখানা থেকে বেড়িয়ে হেনু চারদিকের প্রচুর আলো-বাতাস দেখে খুশি হয়। কিন্তু জেলে ঢোকার সময় সঙ্গে বহু সঙ্গী ছিল, শ্লোগান ছিল; অথচ বের হবার সময় তাকে একা এবং নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে হয়। রিকশা নিয়ে বাড়ির অভিমুখে চলতে গিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় চলাচলকারী বহু মানুষ তাকে রাজবন্দি হিসেবে সালাম জানায়। তরুণ মামুন, স্কুলের দারোয়ান সুন্দরলাল ও ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে সালাম জানিয়ে আন্তরিকভাবে বরণ করে। মানুষের এমন বরণ ও ব্যবহারে হেনুর নিজেকে আর একা মনে হয় না। সকল সহবন্দি কমরেডদের উপস্থিতিও নিকটেই অনুভব হয় । নিজেকে আর আগন্তুক না ভেবে দেশেরই একজন বলে প্রতিভাত হয়। তাই হেনু মানুষ, গাছপালা, আকাশ ও মেঘকে সঙ্গে করে নতুন দেশের ও মানুষের কথা লিখে যাবার অঙ্গীকার করে।

ওয়ারিশ ও *দলিল* উপন্যাসের মতো এ *বসত* উপন্যাসেও শওকত আলীর আত্মজৈবনিকতার ছাপ প্রবলভাবে পড়েছে। তিনি উপন্যাসের শেষে এক ঘোষণা-বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন– 'এ উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র সবই কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে যদি কোনো মিল কেউ খুঁজে পান, তাহলে তা লেখকের অনভিপ্রেত বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।' এটি পড়ার পর একে কোনোভাবেই কাল্পনিক-অবাস্তব মনে হয় না, বরং গোটা আখ্যানটাই যে-তাঁর পারিবারিক ইতিহাস– সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। আর চরিত্রগুলো শুধু বাস্তব নয়, বলা যায় অতি বাস্তব। তাই লেখক রায়হান আলী হেনুকে অসীম মমতা ও মানবিক সহানুভূতি দিয়ে নির্মাণ করেছেন। রায়হান তাঁরই প্রতিচ্ছবি ও প্রতিনিধি। তাই রায়হানের যে-উদ্দেশ্য– 'রাজনীতি করা নয় বরং সাধারণ মানুষের পাশে থাকা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা' তা লেখকেরও অভিপ্রায়। আর জেলমুক্ত রায়হান শেষপর্যন্ত লেখার মাধ্যমে রাজনীতির বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেবার যে-অঙ্গীকার করে, তা লেখকেরও সারাজীবনের অঙ্গীকার ছিল। এছাড়া সন-তারিখসহ রায়হানদের বাড়িত্যাগ, মায়ের মৃত্যু, বাবার মতের পরিবর্তন কিংবা দ্বিতীয় বিয়ে, নতুন বাড়ি ক্রয়, কারাবরণ ও বড়সইয়ের জামিন– এসব কিছুই শওকতের জীবনবাস্তবতার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিলে যায়। এ জীবনযোগ তাঁর শিল্পভাষ্যের পরিচর্যা ও প্রযত্ন-প্রচেষ্টায় সমকালের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

শওকত আলীর বসত উপন্যাসের সঙ্গে আবু রুশদ-এর *নোঙর* এবং শওকত ওসমানের *আর্তনাদ* উপন্যাসের সাদৃশ্য দেখা যায়। *নোঙর* উপন্যাসের নায়ক কামাল দেশভাগের পর ঢাকা শহরে এসে ইনকামট্যাক্সের কর্মচারী হিসেবে জীবন শুরু করে। সে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও রাজনীতি সচেতন মানুষ। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ-পীড়ন-জেল-জুলুম, দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের পাপ পঙ্কে দেশজুড়ে নাভিশ্বাস ওঠে। যাতে কামালও অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে *আর্তনাদ* উপন্যাসের নায়ক ম্যাট্রিক পাশ করা আলী জাফরও সপরিবারে ঢাকায় এসে নতুন বসত গড়ে। সংসারের অভাব থাকায় সে টিউশনি করে এবং হোস্টেলে থাকাসূত্রে নগীবউদ্দিন ও সালামদের সংস্পর্শে রাজনীতিতে উজ্জীবিত হয়। ভাষার দাবিতে রাজপথের মিছিলে অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে আলী জাফরের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু ব্যতীত আর বাদ বাকি বিষয়ে *বসত* উপন্যাসের রায়হান আলী হেনুর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। তাই পাত্র-পাত্রী ও কিছু ঘটনার পরম্পরা ভিন্ন হলেও দেশত্যাগের বেদনা, নয়াবসতের নির্মমতা, পাকিস্তানের প্রতি মোহভঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় এবং এর অবসানে প্রগতিশীল রাজনীতিতে একাত্মতা ঘোষণার মধ্যে এ তিন উপন্যাসে অভিন্ন যোগসূত্র বিদ্যমান।

এ উপন্যাসের মূলে রয়েছে দেশভাগ-উত্তর সময়ে পশ্চিমবঙ্গের এক বাঙালি মুসলমান পরিবারের স্বদেশ ছেড়ে নতুন স্বদেশে (পূর্বপাকিস্তানে) বসত গড়ার কাহিনি। উপন্যাসের প্রয়োজনে অনেক চরিত্র এসেছে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাদের কোথাও কোনো উপস্থিতি নেই। লেখকের সংযম ও পরিমিতিবোধও অতি সূক্ষ্ম এবং তা শিল্পসুষমায় উজ্জ্বল। অন্য কোনো লেখকের হাতে পড়লে এ উপন্যাসে কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা দেখা যেতো। এটি স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে উঠে আসা বাঙালি জীবন নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস পশ্চিম বাংলায় লেখা হলেও পশ্চিমবাংলা ছেড়ে যে-মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় চলে গেলেন, তাদের জীবনযন্ত্রণা ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনের পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে তেমন কোনো ভালো সৃষ্টি এর আগে নজরে পড়েনি।[৮১] সাধারণত উদ্বাস্তু বলতেই পূর্ববাংলার 'বাঙ্গাল' হিন্দু উদ্বাস্তুর সমস্যার কথা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও পশ্চিম বাংলা থেকে 'ঘটি' মুসলমানরাও যে-অনেকে নতুন স্বদেশের সন্ধানে দেশ বদল করেছিলেন–ইতিহাস ও সাহিত্যের দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে যাওয়া এ ভাগ্যহত মানুষদের নিয়ে শওকত আলী *বসত* রচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের যেদিকে দৃষ্টিপাত করান; তা প্রকৃত অর্থেই বাংলা সাহিত্যের এক নতুন বাঁক ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। যা বাংলাহিত্যের ইতিহাসে প্রচলিত ডিসকোর্সের নতুন পাঠ ও প্রবণতার দ্বার উন্মোচন করে ।

শেকড় থেকে বিদায় নেওয়া যে-কত কঠিন-নির্মম ও বেদনার–তা এ উপন্যাস পাঠ করলে বোঝা যায়। 'সীমান্তের যাত্রী' পঞ্চাশের দশকের উদ্বাস্তু মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ের এক অনন্য দলিল। লেখক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ছবি আঁকতে থাকেন, তাঁর যেনো কোনো পক্ষপাত নেই– রেলযাত্রীদের এ Journey জীবনের অনন্য এক প্রতীক হয়ে ওঠে। অচেনা, অজানা এবং অনিশ্চিত জীবন সহজে মানিয়ে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা যে-কেবল মানুষেরই রয়েছে, তা নিপুণভাবে মেলে ধরেছেন শওকত আলী।[৮২] ধর্মের আড়ালে 'মাইনরিটি' শব্দটির ভূমিকা ইতিহাস নির্মাণের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। যার রেশ থেকে জাতি এখনো মুক্তি পায়নি। অথচ মানুষের উপলব্ধিতে মানুষই সবচেয়ে বড়। ধর্ম বা মাইনরিটি মানুষকে ছাপিয়ে কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের বসত গড়ে ওঠে মাতৃভূমি, মাটি, মানুষ আর চারপাশের আলো-বাতাস ও পরিবেশকে ঘিরে। এসবের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সুখ-দুঃখের সঙ্গে একীভূত হবার ভেতরেই শেকড় লুকানো থাকে। আর যে-মাটির সংস্পর্শে জীবন বয়ে চলে তাকে ভালোবাসা মানেই তো বসতের শেকড় মজবুত করা। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ভারত-পাকিস্তানের বসবাসরত মানুষের এ বসত পরিবর্তনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস *বসত*। মাইনরিটির কারণে এ দু'দেশের জনগণের মানসচিত্র, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, দেশ ও সমাজ পরিবর্তনের চিত্র এবং সেই সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে *বসত* হয়ে উঠেছে দেশভাগ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটের এক বাস্তব আলেখ্য। মুর্শেদ ডাক্তারের বসতের প্রতি তথা দেশের প্রতি যে-ভালোবাসা ছিল, প্রজন্মান্তরে ছেলে হেনুর মধ্যে নিজ বসতের প্রতি সেই ভালোবাসরই স্ফূরণ ঘটে। [৮৩] এ ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালির স্বাধীনতা আর আত্মনিয়ন্ত্রণের যে-দাবি উঠে এসেছিল, তারই প্রতিফলন দেখা যায় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দি থাকা রাজবন্দিদের তর্ক-বিতর্ক ও আচার-আচরণ-উচ্চারণে। পশ্চিমবাংলা থেকে আগত কিশোর রায়হান অল্প সময়ের মধ্যেই সেই নবজাগৃতির লিপিকার হয়ে ওঠার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবার স্বপ্ন দেখে। যেমন পূর্ববাংলা থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ উদ্বাস্তু শিরোপা নিয়ে এপারে এসে সাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে ওপার-এপারের সীমানা ভেঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। কৃত্রিম সীমারেখা রাজনীতির খণ্ডিকরণ সম্পন্ন করেছে, কিন্তু আত্মিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে বা ভাঙতে পারেনি। সাধারণের জীবনসংগ্রাম যে-এক এবং চিত্রপটও যে-অভিন্ন–এটিই শওকত আলী স্মরণ করিয়ে দেন। বাংলা ভাগ হয়েছিল রাজনীতির কুচক্রীদের গভীর ষড়যন্ত্রে। কিন্তু ভাগ হয়নি তার মহান ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। শওকত আলী তাঁর অসামান্য দক্ষতায় *বসত* উপন্যাসে এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং বলা যায় সফলও হয়েছেন।[৮৪] এ উপন্যাসে নিখিল সেনের কথামতো রাতের আঁধারে সশস্ত্র মুখোশধারীর আগমন দেখে ডাক্তার মুর্শেদের পলায়নের ঘটনাকে অনেক সময় সাজানো নাটক বলে মনে হয়। আবার জেলখানায় বরেণ্য কমরেড হাজি দানিয়েল ও মনিশঙ্কর বাবুকে ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা হবার পরেও জেলখানায় ধর্মকর্মের প্রতি যে-যত্নবান একনিষ্ঠ হতে দেখা যায়, তাও তাদের আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে উঠেছে। এছাড়া হেনুর যে-জেলমুক্তি ঘটে; তা বন্ডসইয়ের মাধ্যমে হয়, না স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে হয়– সেটিও লেখক স্পষ্ট করেননি। আবার নতুন দেশ ও মানুষের অধিকার আদায়ের কথা লিখে প্রচার করার বিষয়ে হেনু যে-অঙ্গীকার করে, তাতে তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও প্রেমের পরিণামী বিষয়ের কোনো ইঙ্গিত মেলে না।

এসব বিষয়ে কিছু খামতি থাকার পরেও বলা যায়, *বসত* শওকত আলীর প্রাতিস্বিক প্রতিভার এক শিল্পভাষ্য। এ উপন্যাসের মাধ্যমে শওকত তাঁর ব্যক্তিজীবনের বেদনাজর্জর অভিজ্ঞতার আলোকে শুধু উদ্বাস্তু মানুষের দেশত্যাগের মর্মজ্বালা, নতুন বসত গড়ে তোলার সংগ্রাম ও সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের নানা সংকটকেই উপস্থাপন করেননি বরং সেই সঙ্গে পাকিস্তানি মোহ ভেঙে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ, মানবতার শেকড়সন্ধান এবং ধর্ম-বর্ণের সীমানা পেড়িয়ে সম্প্রীতির এক স্বদেশ বিনির্মাণের বার্তা দিয়েছেন। যে-নতুন *বসত* হবে ধর্মীয় রাজনীতির নাগপাশ ও সাম্প্রদায়িকতার হলাহল থেকে মুক্ত। যেখানে সকল মানুষ হবে মানবিক-উদার-অসাম্প্রদায়িক; পরধর্মের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল-বিনয়ী-সহানুভূতিশীল ও নাড়িমাটির শেকড় প্রোথিত থাকবে পবিত্র প্রেমে। শওকত আলীর *বসত* সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং সেই সত্যের আশা-উদ্দীপনার আলোকবর্তিকাস্বরপ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. *দক্ষিণায়নের দিন* , *কুলায় কালস্রোত* ও *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন*-এ উপন্যাস তিনটি যথাক্রমে ১৯৭৬, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সনে প্রথমে *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*-র ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে শুধু *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* অংশটি মুক্তধারা (১৯৮৬), *দক্ষিণায়নের দিন* শিরোনামে *বিদ্যাপ্রকাশ* (১৯৮৬) এবং তিন খণ্ডে *এশিয়া পাবলিকেশন্স* (২০০০,২০০১ ও ২০০৭) গ্রন্থাকারে এগুলো পৃথকভাবে প্রকাশ করে। উপন্যাস তিনটি আলাদা হলেও চরিত্র ও কাহিনির সাদৃশ্য থাকায় এবং ক্রমবিকাশ অভিন্ন হওয়ায় *বিশ্বসাহিত্য ভবন* থেকে শওকত আলী রচনাসমগ্র প্রকাশ করার সময় (২০১৫) এগুলোকে ত্রয়ী উপন্যাস হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ ত্রয়ী উপন্যাস লেখক ১৯৬৮-৬৯ সনের দিকে লেখা শুরু করেন। যা এক দশক ধরে লেখা ও পরিমার্জনের পর প্রকাশিত হয়।-[উৎস- ড. মোহাম্মাদ হাননান সম্পা. শওকত আলী রচনাসমগ্র ; দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ.৬৯৫-৬৯৬]

২. সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.২৪৮

৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.১৯

৪. Ephraim H. Mizaruchi : *An Introduction to the Notion of Alienation in Franjohnson (ed.); Alienation: Conecpt, Term and Meanings,* (New York, Seminar, press, 1973, P.111). **দ্বৈতীয়িক উৎস**- বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯

৫. Karl Marx : Op. cit. Note. No-11, P.66-80. **দ্বৈতীয়িক উৎস**- বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত,পৃ.২৩

৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *পূর্বোক্ত*; পৃ.২৯

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *পূর্বোক্ত*; পৃ.৩৫

৮. সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য;* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.১০৪

৯. এ দেশের বামরাজনীতিতে বিভাজনের সূত্রপাত ঘটে ১৯৬০ সনে রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত দুনিয়ার ৮১টি কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির মহাসম্মেলনে। মতাদর্শগত বিরোধই রাশিয়াপন্থী ও চীনপন্থী বিভাজনকে তরান্বিত করে। পরবর্তীকালে ১৯৬৫-তে এসে রাশিয়াপন্থী মতিয়া গ্রুপ ও চীনপন্থী মেনন গ্রুপ নামে বামরাজনীতি বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবার ৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করলে ন্যাপের মাওলানা ভাসানী আইয়ুব খানের আস্থা অর্জন করেন। ফলে মেনন গ্রুপ ভারতের বিরোধিতা করে। আর মতিয়া গ্রুপ স্বভাবতই ভারত-রাশিয়ার পক্ষাবলম্বন করে।- [উৎস- মোহাম্মদ হাননান : *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*: ১৮৩০-১৯৭১; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.২৯৬-৩০৫]

১০. চঞ্চল কুমার বোস : শওকত আলীর কথাসাহিত্য: জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ; বিশ্বসাহিত্য ভবন,ঢাকা,২০১৫, পৃ.৮৩

১১. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৬১-৩৬২

১২. ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের লাঠি মিছিলের শেষ ভাগে থাকা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয় এবং তিন দিনের কর্মসূচি হিসেবে ২১ জানুয়ারি ঢাকা শহরে হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোকদিবস ও ২৩ জানুয়ারি মশালমিছিল পালন করা হয়। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে দীর্ঘমিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে এবং মশাল মিছিলে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। পরবর্তীকালে এ গণঅভ্যুত্থান-আন্দোলন ক্রমশ মারমুখী হয়ে ওঠে এবং ২৪ জানুয়ারিতে রুস্তম ও মতিউর, ১৫ ফেব্রুয়ারিতে জেলবন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৮ ফেব্রুয়ারিতে ড. শামসুজ্জোহাসহ অনেকেই শহিদ হন। এভাবে ৬০-এর দশকে (১৯৬০-১৯৬৯) সারা দেশে মোট ১৭৯জন ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ও নেতাকর্মী বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মাহুতি দিয়ে আন্দোলনের অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করে। -[উৎস- মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৭০-৩৭৯]

১৩. আনু মুহাম্মদ : *নারীর জগৎ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্ত;* (সুস্মিতা চক্রবর্তী সম্পা. *চন্দ্রাবতী*); ঢাকা, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ.১২

১৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৫-৭৬

১৫. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৬

১৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৮৮

১৭. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৪

১৮. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৮৮

১৯. আবু হেনা মোস্তফা এনাম : *শওকত আলীর ত্রয়ী: কালের সিসিফাস* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী, ২০১৬,পৃ.১৮১

২০. সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য*; পূর্বোক্ত, পৃ.১২৫

২১. রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৩৬৪

২২. রফিকউল্লাহ খান : পূর্বোক্ত; পৃ.৩০৬ ও ৩৬২

২৩. মিল্টন বিশ্বাস : *শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস: প্রসঙ্গ রাজনীতি*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৮০

২৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.১১৬

২৫. রূপদত্তা রায় : *ওয়ারিশ: ইতিহাসের ভিন্নপাঠ*(চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.২৫০

২৬. শোয়েব শাহরিয়ার : *ওয়ারিশ: সময় ও প্রেক্ষিত* (সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, ১৯৯২, পৃ.৯৮

২৭. মিল্টন বিশ্বাস : পূর্বোক্ত; পৃ.৮১

২৮. বেগম আকতার কামাল : *ওয়ারিশ: সময়-গাঁথা জীবনের উত্তরাধিকার* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া*); সংখ্যা- ১৬, সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ২০১২, পৃ.২১০

২৯. শোয়েব শাহরিয়ার : পূর্বোক্ত; পৃ.১০১

৩০. শোয়েব শাহরিয়ার : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৩-১০৪

৩১. ১৯৮৪ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি স্বৈরশাসক এরশাদের নির্দেশে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে ট্রাক তুলে দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ারকে হত্যা করে। ১ মার্চ সরকারি গুণ্ডাবাহিনী ছাত্র ইউনিয়নের শ্রমিক নেতা কমরেড তাজুলকে আদমজিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় অব্যাহত মিটিং-মিছিল-হরতাল কর্মসূচি চলাকালে প্রকাশ্যে কালিগঞ্জে লীগনেতা আযম খান ও সাবেক এম.পি ময়েজউদ্দিনকে হত্যা করা হয়। এসবের প্রতিবাদে ৮৪-এর অক্টোবরে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ১৫ দলের উদ্যোগে স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্বৈরাচার এরশাদ এ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামকে নস্যাৎ করতে সেনা, পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে খুন-গুম-জেল-জুলুমের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।-[উৎস-মোহাম্মদ হাননান: *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*: ১৯৭২-২০০০; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.৪৯৪-৫০০]

৩২. বেগম আকতার কামাল : পূর্বোক্ত; পৃ.২১৪

৩৩. বেগম আকতার কামাল : পূর্বোক্ত; পৃ.২১৩

৩৪. বেগম আকতার কামাল : পূর্বোক্ত; পৃ.২১২
৩৫. বেগম আকতার কামাল : পূর্বোক্ত; পৃ.২১৪
৩৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.২১৯-২২০
৩৭. পিন্টু ভৌমিক : *ওয়ারিশ: কালের যাত্রাধ্বনী* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত; পৃ.২৬০-২৬১
৩৮. মিল্টন বিশ্বাস : পূর্বোক্ত; পৃ.৮৪
৩৯. শোয়েব শাহরিয়ার : পূর্বোক্ত; পৃ.১০৬
৪০. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.১১০
৪১. ফয়জুল ইসলাম : *শওকত আলীর উত্তর জনপদ* (বেলাল বাঙালি সম্পা. *কথাশিল্পী শওকত আলী : ব্রাত্যজনের কথক*; স্মারক গ্রন্থ); গণপ্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮,পৃ.৭৬
৪২. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান : *উত্তরের খেপ: নিজের সঙ্গে যুদ্ধ নিরন্তর* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া); পূর্বোক্ত*, পৃ.২২৩
৪৩. ফয়জুল ইসলাম : পূর্বোক্ত; পৃ.৭৮-৭৯
৪৪. ফয়জুল ইসলাম : পূর্বোক্ত; পৃ.৮০
৪৫. সিদ্ধার্থ সেন : *জীবনের জলছবিতে ভেসে থাকা বেদনার রঙ: উত্তরের খেপ* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.২৭৪
৪৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.১১৫
৪৭. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান : পূর্বোক্ত; ২১৬
৪৮. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.১১৫
৪৯. বর্ণশ্রী বক্‌সী : *উত্তরের খেপ: সময়ের ভাঙা-গড়া এবং অস্তিত্ব* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.২৬৭-২৬৯
৫০. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ.২১৫-২১৬
৫১. সিদ্ধার্থ সেন : পূর্বোক্ত; পৃ.২৭৫
৫২. তুষার তালুকদার : অবশেষে প্রপাত: কান্নায় লুকিয়ে থাকা স্বপ্ন (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৪
৫৩. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৪
৫৪. চন্দন আনোয়ার : *অবশেষে প্রপাত: বাঙালির মুক্তির প্রপাত*; পরিশিষ্ট-১, শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.৪৯৫
৫৫. তুষার তালুকদার : পূর্বোক্ত; পৃ.২৮৫-২৮৬
৫৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৭-৬৯
৫৭. Mahasveta Devi : *Tarasankar Bandyopadhyay* [Markers of Indian Literature]; New Delhi, Sahitya Akademi, 1975, p.31. **দ্বৈতীয়িক উৎস**-ভীষ্মদেব চৌধুরী: *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*;বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.১২২
৫৮. ষাটের দশকে মির্জা হারুণ এবং শওকত আলী ঢাকার গোরান এলাকায় মির্জার এক আত্মীয়ের কিছু জায়গা উভয়ে কিনে ছিলেন। শওকত আলী এক হাজার টাকা করে তিন কাঠা জমি কিনেন। পরে মির্জা হারুণের জমি স্যুয়ারেজ লাইনের জন্য সরকার অধিগ্রহণ করলেও শওকত আলীর জায়গা বহাল থাকে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর এ জমির আশেপাশের বহু জায়গা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী ও রাজনীতিবিদরা জবর-দখল শুরু করে। বাধ্য হয়ে শওকত আলী নিজের জায়গায় টিনের ছাপরা ঘর তুলে এক রিকশাওয়ালার কাছে ভাড়া দেন। কিন্তু কয়েকদিন পর এলাকার মাস্তানরা ভাড়াটে লোককে মেরে টিনখুলে নেয় এবং জায়গাটি দখল করে। বাধ্য হয়ে শওকত আলী সে-এলাকার যুবক ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেও ব্যর্থ হন। পরে তিনি লীগের নেতা আসাদুজ্জামান নূরকে সঙ্গে নিয়ে সে-এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং আশ্বাস দেবার পরেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে শওকত আলী সে এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর (যিনি তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু সাহেবের ঘনিষ্ঠ হতেন) কাছেই মির্জা হারুণের সহায়তায় তিন কাঠা জমি বারো লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। আমু সাহেবের নাম শুনে সেই কমিশনার ও সন্ত্রাসীরা কেউ আর ঝামেলা করতে সাহস পায়নি।-[উৎস-মির্জা হারুণ-অর-রশিদ : *আমার অবিস্মরণীয় এক সহকর্মী* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪-৩৫]
৫৯. আশরাফ উদ্দিন : *শওকত আলীর দলিল: বিষয় চেতনা ও আঙ্গিক ভাবনা*; পরিশিষ্ট-১, শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৮ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা,২০১৮, পৃ.৬৬৪
৬০. কুমার দীপ : *মানুষ ও তার সময়ের দলিল* (চন্দন আনোয়ার সম্পা.*গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা);পূর্বোক্ত; পৃ.২৯১

৬১. চীনের নানকিং গণহত্যার সময় (১৯৩৭)মুকাই তোশিয়াকি ও নোডা তাকেশি নামক দুই জাপানি সৈনিক দ্রুত ১০০ জন নানকিংবাসীর শিরশ্ছেদ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তারা উভয়ে তরবারি দিয়ে যথাক্রমে ১০৬ ও ১০৫ জনের শিরশ্ছেদ করে।- [উৎস- আইরিশ চ্যাঙ : *দি র‍্যাপ অব নানকিং* (অনুবাদ : দাউদ হোসেন); সংঘ প্রকাশন, ঢাকা, ১ম বাংলা সংস্করণ ২০১৪, পৃ.১৬৩]

৬২. সৌভিক রেজা : *দলিল: নড়বড়ে উপন্যাসে নব্বুইয়ের জীবনাবর্তন* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা.*উলুখাগড়া*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.২৩২

৬৩. সৌভিক রেজা : পূর্বোক্ত; পৃ.২৩৩

৬৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৫২

৬৫. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৫৭

৬৬. সৌভিক রেজা : পূর্বোক্ত; পৃ.২৩৩

৬৭. সৌভিক রেজা : পূর্বোক্ত; পৃ.২৩৩

৬৮. মোহাম্মদ হাননান : *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: এরশাদের সময়কাল;* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.২১০-২১২

৬৯. সৌভিক রেজা : পূর্বোক্ত; পৃ.২৩২ ও ২৪২

৭০. সৌভিক রেজা : পূর্বোক্ত; পৃ.২৪২

৭১. আশরাফ উদ্দিন : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৭১-৬৭২

৭২. আশরাফ উদ্দিন : পূর্বোক্ত; পৃ.৬৬৯-৬৭৫

৭৩. গাজী সাইফুজ্জামান : *শওকত আলীর দলিল;* পরিশিষ্ট-১, শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৮ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, ২০১৮, পৃ.৬৬৩

৭৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ.৬১-৬২

৭৫. সৈকত আরেফিন : *নিজভূমে পরবাস কিংবা যৌথযাপনের স্বপ্ন* (চন্দন আনোয়ার সম্পা.*গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত; পৃ.৩০২

৭৬. Urvashi Butania : *Partition: The Long Shadow;* VKG2, India,18 March, 2015, P.15, **দ্বৈতীয়িক উৎস-** সৈকত আরেফিন; পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৩

৭৭. সৈকত আরেফিন : পূর্বোক্ত; পৃ.৩০৬

৭৮. সৌমিত্র লাহিড়ী : *বসত: স্বদেশ ছেড়ে নতুন স্বদেশ নির্মাণের কাহিনি* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪৯

৭৯. শামীম সাঈদ : *শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাস: বাস্তবতা, বাংলার সমাজবাস্তবতা ও শওকত আলীর স্বপ্নবাস ও অবভাসবাস্তবতা* (চন্দন আনোয়ার সম্পা.*গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.২০৬

৮০. সৌমিত্র লাহিড়ী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৫০

৮১. সৌমিত্র লাহিড়ী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৫২

৮২. সৌমিত্র লাহিড়ী : পূর্বোক্ত; পৃ.৩৫৩

৮৩. পারভীন আক্তার জেমী : *বসত: শেকড়ের সন্ধানে* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৪

৮৪. সৌমিত্র লাহিড়ী: পূর্বোক্ত; পৃ.৩৫৭-৩৫৮

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক উপন্যাস

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনা বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অর্জন এবং এক যুগান্তকারী অধ্যায়। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন দেশবাসীর মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয় । যা ষাটের দশকের রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সঙ্গে বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরো বেগবান হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পীড়নে ও প্রতারণায় বিক্ষুব্ধ বাঙালির রক্তিম স্বপ্ন পূর্ণতা পায় একাত্তরের বিজয়ের মাধ্যমে। কিন্তু বহু অশ্রু, রক্ত, জীবন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধীনতা অর্জিত হলেও বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক মুক্তি অধরাই রয়ে যায়। একাত্তরের অব্যবহিত পরেই স্বাধীন দেশের মানুষ এক নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হয় । সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বিপ্রতীপে গড়ে ওঠে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণি। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির নখরাঘাতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রগতিশীল মানুষের স্বপ্ন ভেঙে যায়, বাঁচার অবলম্বন ও নিশ্চয়তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অথচ সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীগুলো একে একে দখল করে নেয় রাষ্ট্রকাঠামোর সকল উৎস। এ শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক্রমশই মুক্তচিন্তার মত-পথ ও সুস্থ জীবন ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে। সময় ও সমাজকাঠামোর এ উল্টোরথযাত্রা ও ভয়াবহ সংকট অমোঘ নিয়তির মতো ধরা পড়েছে শওকত আলীর বিভিন্ন উপন্যাসে। এ ধারার মূল প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস হচ্ছে– *যাত্রা, অপেক্ষা, উত্তরের খেপ, হিসাব নিকাশ* ও *ঘরবাড়ি*। *যাত্রা* ও *উত্তরের খেপ*–এ মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধের প্রথম প্রহর এবং *অপেক্ষা, ঘরবাড়ি* ও *হিসাব নিকাশ*–এ মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নানা সংকট ও বাস্তবতার চালচিত্র প্রবল হয়ে উঠেছে। এ অধ্যায়ে *যাত্রা, অপেক্ষা, উত্তরের খেপ, হিসাব নিকাশ* ও *ঘরবাড়ি* উপন্যাসগুলো আলোচিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও গন্তব্য

যাত্রা

শওকত আলীর *যাত্রা* [১] (১৯৭৬খ্রি.) উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এক বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী সংযোজন। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনাটি বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কেবল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেনি, সেই সঙ্গে এ দেশবাসীর বহুকালের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ-পীড়নের হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াটিও সম্পন্ন হয়। কারণ এ–'মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির আত্মজাগরণের চূড়ান্ত সময়। বাঙালির স্বাধিকারবোধ,শাসকশ্রেণির প্রতি দীর্ঘকালের ঘৃণা, বাঙালির দ্রোহ-চেতনা, মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা, জীবনপ্রীতি, সংগ্রামী মানসিকতা; বাঙালির নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি আর অনিন্দ্য প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যবোধ ইত্যাদির যূথবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ এ মুক্তিযুদ্ধ। তাই...মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে, তার সমগ্র সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।'[২] ফলে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির চেতনাকে কেবল শানিত আর প্রাণিতই করেনি, বরং বাংলাদেশের সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্টি দান করেছে। এ মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র ও বহুমাত্রিক বিষয় যেমন এক দিকে সৃষ্টিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের শিল্প-সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

সাহিত্যে ঐতিহাসিক বাস্তবতার অনুপ্রবেশ বহুকালের পুরোনো এক প্রবণতা। ঐতিহাসিক বাস্তবতা যদি একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, বিশ্বমানচিত্রে সার্বভৌমত্বের প্রতীকতা ও একটি জাতির নব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়– তবে সে ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রাম সাহিত্যকে যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করবে বিশেষত উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরের পক্ষেই তাকে ধারণ করা সম্ভব। মাত্র নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কিন্তু এর পশ্চাতে যে- প্রস্তুতি ও জীবন ঘষে আগুন জ্বালানোর প্রচেষ্টা–তাই আমাদের যূথবদ্ধ মানবিক অর্জন। এর অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে নয় মাসের ঐক্যে, সংগ্রামে, ত্যাগে ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে। এখানে যাত্রা কেবল বাইরে নয়, ব্যক্তি ও জাতির ভেতরেও, আত্মাপরিচয়ের যাত্রা যাকে বলে। মুক্তিযুদ্ধ একটি জাতিকে পরিচয়ের পথ করে দিতে পারে, চলবার দায়িত্ব সমকালীন বা উত্তর প্রজন্মের।[৩] এ বোধ থেকেই সমকালীন অনেক ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। এদের মধ্যে শওকত ওসমানের *জাহান্নম হইতে বিদায়*, *নেকড়ে অরণ্য*, *দুই সৈনিক*, *জলাংগী*, আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত*, সৈয়দ শামসুল হকের *নীলদংশন*, *নিষিদ্ধ লোবান*, শওকত আলীর *যাত্রা*, রশীদ করিমের *আমার যত গ্লানি*, রাবেয়া খাতুনের *ফেরারী সূর্য*, মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন*, *খেলাঘর*, *অশরীরী*, রশীদ হায়দারের *খাঁচায়*, *অন্ধ কথামালা*, আহমদ ছফার *ওঙ্কার*, সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় ক্রান্তিকাল, সময়ের জঠরযন্ত্রণা, মানুষের জীবনসংকট, আত্মমর্যাদার সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং প্রতিরোধের প্রথম প্রহরের অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই শওকত আলী রচনা করেছেন *যাত্রা* উপন্যাস। এ মুক্তিযুদ্ধের তাপ-চাপ তাঁর পরিবারকেও দগ্ধ করে এবং তাঁর বাবাও ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। তাই নিজের জীবনাভিজ্ঞতা, রক্তক্ষরণ ও রক্তঋণের আলোকেই তিনি এ উপন্যাস রচনা করেন। এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়ে লেখকের ভাষ্য–

> 'আমি এই উপন্যাসের যাত্রা নামটা দিয়েছিলাম এই কারণে যে, বাড়ী থেকে ২৭ শে মার্চ চলে গেল মানুষগুলো। প্রতিরোধ করতে পারছে না বলে পালিয়ে গেল।...কিন্তু আমি দেখলাম যে, এই মানুষগুলো কিছু দূরে যাওয়ার পরে যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, তখন তারা প্রতিরোধের চেতনায় গিয়ে পৌঁছালো। এই পলায়নটা শুধু চেতনাগত পলায়ন ছিল না, মানসিক পলায়নও বটে। আত্মরক্ষার তাগিদটাই বড়। আমার উপন্যাসের বিষয়টা তাই। তিনদিন পরে মানুষ পিছনে ফিরে তাকাল।'[৪]

বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করতেই জল্লাদ শাসক কংসরূপী ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি হায়েনার দল পঁচিশ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর মাধ্যমে ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নরমেধযজ্ঞে মেতে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন এলাকায় কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে উঠলেও তা একসময় ভেঙে পড়ে।

হত্যা, ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগ করে ঢাকা শহরকে শ্মশানে পরিণত করা হয়। ছাব্বিশ মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সাতাশ মার্চ কারফিউ কিছুটা শিথিল হলে ঢাকার মানুষ প্রাণ বাঁচাতে সদরঘাট-বুড়িগঙ্গার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুঁটে। হৈহুল্লড়ের মধ্যে নৌকায় নদী পার হয়ে কেরানীগঞ্জের দিকে পালায়। প্রাণে বাঁচতে এ পলায়নপর-ভয়ার্ত-আতঙ্কিত মানব ঢল ও মিছিলের যন্ত্রণাজর্জর যাত্রার কথাই এ উপন্যাসে প্রবল হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক রায়হান অন্যান্য আক্রান্ত ঢাকাবাসীর মতো জীবন বাঁচাতে সাতাশ মার্চ সকাল বেলা স্ত্রী বিনু ও দুই কিশোর ছেলে টুটুল ও মিঠুকে নিয়ে মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে পালিয়ে সদরঘাটের বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে আসেন। অসংখ্য ভয়ার্ত মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আর্তচিৎকার, নদীপারাপারের ব্যস্ততা এবং পেছন থেকে তাড়া করা মৃত্যুর থাবা থেকে বাঁচার আকুতি– এসব দেখে রায়হান বিচলিত হন। কারণ দেখা যায়–'মানুষ চলে আসছে–আহত, শোকার্ত, বিভ্রান্ত আর ভীত মানুষ। উর্ধ্বশ্বাসে নদীপার হয়ে ছুটে চলেছে সবাই। সবাই চলেছে গ্রামের দিকে, গাছপালার আড়ালে, বিলজলার ওপারে। আরো ভেতরে এমন জায়গায় চল, যেখানে পথঘাট নেই। যেখানে বাইরের মানুষের নজর পৌঁছাবে না।' সব বয়সের নর-নারীর এ মানব ঢল দেখে রায়হান ঢাকা আক্রমণের নির্মমতা সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম হন। 'হুড়োহুড়ি আর পাড়াপাড়ি'– করে নৌকায় উঠে মানুষজন বুড়িগঙ্গা পার হতে ব্যস্ত হয়। স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের 'কেউ পয়সা বেশি নেবে না। যা রেট তার এক পয়সাও বেশি নয়'– এমন সতর্কবাণী ও তৎপরতার পরেও দেখা যায় বেশি মানুষের চাপ আর ভয়ের কারণে কিছু নৌকা নদীতে ডুবে যায়। এভাবে হৈহুল্লড়, চ্যাঁচামেচি, হাঁকডাকের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ করে রায়হান স্ত্রী ও সন্তানসহ নদী পার হন। নদীর এপারে এসে রায়হান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হাসান, আসগার, লীলা, সাকিনা ও মঞ্জুর সঙ্গে মিলিত হন।

এ হাসান আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। মার্চ মাসের শুরু থেকেই হাসানরা প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। তিন মার্চ অবস্থা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠাতে সে বইপত্র বাক্সবন্দি করে বন্ধু তওফিকের সঙ্গে পরামর্শের জন্য ভিপি জামানের কক্ষে যায়। তখন তওফিক বলেছিল–'একি একটা জীবন হলো? রোজ রোজ ইনোসেন্ট মানুষ মারবে আর আমরা চুপ করে থাকব? না সারেন্ডার করে কোনো লাভ নেই। রেজিস্ট, বাই এনি মিনস, উই মাস্ট রেজিস্ট। আর অন্য পথ নেই; নো সারেন্ডার।' তওফিকের এ সিদ্ধান্ত হাসানেরও মনে ধরেছিল। তাই পঁচিশ মার্চ সন্ধ্যাবেলা থেকে তারা ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হলে) প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। অনেকে এসব করতে নিষেধ করলেও হাসানরা তা আমলে নেয়নি, বরং গভীর রাতে পাক বাহিনীর কামান–গোলাবারুদের বিরুদ্ধে তারা সামান্য রাইফেল ও থ্রি-নট-থ্রি বন্দুক নিয়ে এক অসমযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এক সময় হাসানের হাতে ও পায়ে গুলি লাগায় তওফিক তাকে অন্যত্র টেনে নিয়ে যায়। তারপর রেললাইন ও বস্তির পাশ ঘেঁষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বখশি বাজারের এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। হাসান এখানে দুদিন লুকিয়ে থাকে। খুব গোপনে দুজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তার চিকিৎসা করে। কিন্তু এমন আপদকালে তার পায়ের বুলেট বের করা সম্ভব হয় না বলে ব্যান্ডেজ করে রাখা হয়। সাতাশ মার্চ দিনের বেলা কারফিউ শিথিল হলে অন্যান্যদের মতো হাসানও জখম পা নিয়ে লালবাগ হয়ে শত্রুর নাগালের বাইরে যেতে একাকী বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রায়হানদের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু গুরুতর জখম পা নিয়ে সে বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। একদিকে পায়ের ব্যথার টাটানি, আরেক দিকে জ্বর। পায়ের কর্দমাক্ত ভেজা ব্যান্ডেজের ভেতর থেকেই হাসান বোঝতে পারে তার পা ফুলে উঠেছে। ফলে এক সময় হাসানের চোখে সর্ষেফুল দেখার মতো অবস্থা হয় এবং জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। রায়হানের স্ত্রী বিনু এবং সহপাঠী লীলার সেবা শুশ্রূষায় হাসান কিছুটা সুস্থ হয় এবং আসগারের সংগ্রহ করা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। আর বিড়বিড় করে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে নিজেকে বলে–

> 'স্টেডি পড়ে যেও না, ফেইল করো না। মৃত্যুর কাছে সারেন্ডার করে কোনো লাভ নেই।...মাথা ঠিক রাখো হাসান আহমদ, ডোন্ট ফেইল, হাত গেছে, পা গেছে কিন্তু মগজ যেন চলে না যায়।'-[*যাত্রা*, শওকত আলী রচনাসমগ্র; প্রথম খণ্ড,বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা,২০১৪ /পৃ.১৬৪-১৬৫]

শারীরিক অক্ষমতার জন্য হাসান নিজেকে গালি দেয় এবং অক্ষম-অকেজো হাত-পা তার কাছে বোঝার মতো মনে হয়। 'চারদিকে পলায়নপর মানুষ, সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর পেছনে মৃত্যুর তাড়া'– এর মধ্যে তার অসুস্থতার জন্য

সহযাত্রীদের যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটায় সে নিজেকে অপরাধী ভাবে। তার সহপাঠী লীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী এবং ঠাকুরগাঁওয়ের মেয়ে। লীলাও পঁচিশ মার্চ রাতে পাক আর্মির 'অপারেশন সার্চ লাইট মিশন' শুরু হবার আগ মুহূর্তে খবরটা শুনেই সোজা ঢাকা মেডিকেল কলেজের নার্সদের কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকে। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে কামান মারার শেলিংয়ের শব্দে লীলা ও তার অন্যান্য বান্ধবীরা সিঁড়ির নিচে গিয়ে লুকায় এবং আতঙ্কে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। পরে সাতাশ মার্চ ভোর বেলা কারফিউ শিথিল হলে বখশিবাজার লালবাগ দিয়ে পালিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে এপার চলে আসে। তার সঙ্গে আসতে পারে কেবল মাদারীপুরের সাকিনা আর কুষ্টিয়ার মঞ্জু নামক দুই বান্ধবী। সবার উদ্দেশ্য এক, আর তা হলো– 'শুধু দূরে চলে যাওয়া। শহর থেকে শুধু চলে যাওয়া। যেখানে হোক, উদ্দেশ্যহীন হোক, ঠিকানাহীন হোক, শুধু হেটে চলা। দাঁড়াবার মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই।' এক কাপড়ে বান্ধবীদের সঙ্গে লীলাকেও পালিয়ে আসতে হয় । কারণ হলের গেইট ভাঙার সময় দারোয়ানের বাচ্চা ছেলে ও মিনুর নির্মম মৃত্যু দেখে সে কোনোভাবে দেয়াল টপকে পালাতে সক্ষম হয়। আর রাইফেল উঁচিয়ে আসা সৈন্যদের ভয়ংকর মূর্তি দেখে লীলার মনে হয়েছিল–'যেন অন্ধকার পাতাল থেকে উঠে আসা কোনো জানোয়ার।' তাই লীলা জীবন বাঁচাতে বুড়িগঙ্গা পার হয়। আর পূর্ব পরিচিত অধ্যাপক রায়হান ও সহপাঠী হাসানের সাক্ষাৎ পায়।

ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। রায়হানের দিনাজপুরে,লীলার ঠাকুরগাঁওয়ে, সাকিনার মাদারীপুরে ও মঞ্জুর কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়িতে ফেরার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই পালিয়ে শত্রুর নাগালের বাইরে ছুটছে। 'এ পারে ওরা আসতে সাহস পাবে না–আমরা প্রিপেয়ার্ড'–বলা আমগাছ তলায় দাঁড়ানো লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা শটগান ও থ্রি-নট-থ্রি হাতে কয়েকজন যুবকদের কথায় রায়হানের হাসি পায়। তাছাড়া যাত্রাপথের সহযাত্রীদের–'সব জ্বালাইয়া দিছে, আহারে! হালারা জানোয়ার না কী! ঢাকা থুইবো না। আল্লায় বিচার করব– আল্লার মাইর দুনিয়ার বাইর, দেইখ্যান। শ্যাক সাহেবের খবর জানেন কিছু? ছাত্রগো সবাইরে কি মাইরা ফালাইছে?' এসব কথায় অনেকের মতো রায়হানও বিচলিত হন। তারপরেও ক্লান্ত-শ্রান্ত স্ত্রী ও জ্বরে আক্রান্ত দুই ছেলেকে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেন।

এমন দুর্যোগ আর দুরবস্থার মধ্যেও রায়হান এক তরুণীর পাউডারের প্রলেপমাখা মুখ, কারো হাতে মুরগি, কারো হাতে-মাথায় ব্যাগ-সুটকেস,কারো হাতে পূর্ণগর্ভা ছাগল এবং কারো সঙ্গে আনা সংসারের শেষ সম্বলটুকু দেখতে পান। এ ছাগল ও তার বৃদ্ধা মালিককে নিয়েও মানুষের রস-রসিকতা রায়হানের কানে আসে। আবার চলার পথেই দেখতে পান কয়েকজন মহিলা মিলে বিছানার চাদর ও কাপড় ঘিরে চৌখুপী বানিয়ে এক নারীর সন্তান প্রসবের ঘটনাও। এভাবে মৃত্যুর তাণ্ডব ও তাড়ার সমান্তরালে মানব শিশুর নবজন্মের ঘটনাপ্রবাহ রায়হানকে আলোড়িত করে। সেই সঙ্গে কানে আসে রেডিওতে বেজে ওঠা– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গান, মেজর জিয়ার পরিচয়, জনযুদ্ধের স্বরূপ, যুদ্ধের নেতৃত্ব, প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত ও কৃষক-শ্রমিকদের ভূমিকার বিষয়-আশয়। ইকবাল হলের প্রতিরোধ যুদ্ধের আহত হাসান, আসগার, লীলা, সাকিনা, মঞ্জুদের সঙ্গে রায়হান রুইতপুরের বাজারের কাছে পৌঁছান। এ বাজারের মেলা থেকে কেউ কান্নারত বাচ্চাদের বাঁশি-বেলুন কিনে দেয়, সাকিনা টমেটো ক্ষেতে গিয়ে তা ছিঁড়ে এনে বান্ধবীদের নিয়ে খায় এবং গ্রামের মহিলারা পালিয়ে আসা মানুষের মিছিল দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এসময় আকাশে এক যুদ্ধ বিমানের আওয়াজ শুনে মানুষের মাঝে চিৎকার ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এতে রায়হানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা মনে পড়ে। 'হালারা পলাইতাছে, দেহ ভুট্টো ইয়াহিয়া চোরা কেমনে পলাইতাছে'– সহযাত্রীদের এমন কথায় হাসির রোল ওঠে। এভাবে পথ চলতে চলতে অসুস্থ হাসান একসময় রাস্তায় বসে পড়লে বিনু তাকে পানি খাওয়ায়। বুদ্ধি করে সঙ্গে থাকা নোভালজিনের দুটি ওষুধের বড়ি খাইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নিজের অসুস্থ দুই ছেলেকে ভুলে অপরিচিত হাসানকে নিয়ে বিনুর ব্যতিব্যস্ত হবার ঘটনায় রায়হান মনে মনে বিরক্ত হন আর ভাবেন–

> 'সে কেন মিছিমিছি একটা জখম রোগীর বোঝা ঘাড়ে নিতে যাচ্ছে।...তার কি দায় পড়েছে যে পথের একটি অপরিচিত রুগ্ন মানুষের দেখাশোনা করতে হবে। চারদিকে এমনি অসহ্য অবস্থা–তার নিজেরই সবকিছু অনিশ্চিত...তবু তাকেই কেন এ দায়িত্ব নিতে হবে?'-[*যাত্রা*/ পৃ.১৬৭]

সংঘটিত এ দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও অস্তিত্বসংকটে নিপতিত রায়হান পরিবারের নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার জন্যই মানবতার প্রশ্নকে পাশ কাটাতে চান। তাই–'চলো আমরা এগোই ও-বিশ্রাম নিয়ে পরে আসুক' বলে তিনি স্ত্রীকে সামনে চলার কথা বলেন। এ সময় যোসেফ ফার্নান্দেজ নামক এক প্রৌঢ় খ্রিষ্টানের আগমন ঘটে। যোসেফ ফার্নান্দেজ করিম অ্যান্ড কায়সার কর্পোরেশনের এমডি এবং নিয়াজ করিম খানের ব্যক্তিগত সহকারী। এদেশের মুড়াপাড়ায় তার পূর্বপুরুষেরা বসবাস করতেন। কিন্তু তার জন্ম হয় কলকাতায়। একমাত্র মেয়ে স্বামীর সঙ্গে কলকাতাতেই থাকে। অফিসকর্তা নিয়াজ করিম খান তাকে দেশভাগের ডামাডোলে পঞ্চাশ সনে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ফলে দীর্ঘ বিশ বছর ঢাকায় থেকে তিনিও বাঙালির সুখ-দুঃখের সাথী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। একজন খ্রিষ্টান হয়েও তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার দানবীয় রূপ দেখে হতভাগ্য বাঙালির প্রতি সমব্যথী হয়ে ওঠেন। পঁচিশ মার্চ ঢাকায় পরিচালিত গণহত্যার কবল থেকে তিনিও কোনো রকমে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন এবং নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে এসে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রায়হানদের সঙ্গে মিলিত হন। মুখর, ফূর্তিবাজ ও স্পষ্টবাদী প্রৌঢ় ফার্নান্দেজ ঢাকা-গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি নিজের পাকিস্তানি অফিসকর্তা এবং পাকসেনাদের জঘন্য মানসিকতার বর্ণনা দিতে বলেন–

> 'আমি ক্রিশ্চান বলে আমার বিপদের আশঙ্কা নাকি কম।...শালারা ভাবে কি জানেন, ক্রিশ্চানরা বাঙালি হতে পারে না। আমার বাড়ির সামনে মশাই, নীলরতন ভট্টাচার্য, অ্যান ওল্ডম্যান, তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলল! আনবিলিভেবল।'-[*যাত্রা*/পৃ.১৭০-১৭১]

ফার্নান্দেজেরও যাবার কোনো জায়গা নেই। জীবন বাঁচাতেই অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতি ফার্নান্দেজের মায়া-মমতা ও সহানুভূতি জাগ্রত হবার কিছু কারণও রয়েছে। পঁচিশ মার্চ গণহত্যার সময় তার ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিতে আসা কয়েকজন লোককে পাকসেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে এবং দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। অথচ সে খ্রিষ্টান হবার কারণে তাকে কিছুই বলে না। এ ঘটনায় ফার্নান্দাজের উপলব্ধি– 'ওরা আমাকে মানুষ বলে গণ্যই করল না। আর আমিও শালা নির্বোধ জানোয়ারের মতো শুধু তাকিয়ে দেখলাম।' ফলে তখনই তিনি পাকিস্তানিদের অধিকারে যাওয়া ঢাকা শহর ত্যাগ করে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজের এ বোধ সম্পর্কে বলতে রায়হানকে জানান–

> 'এরই নাম বোধ হয় রিয়েলাইজেশন। ওইসব দেখার পর জীবনে আমি প্রথম ফিল করলাম আমার ফোর ব্রাদার্স–এখানেই জন্মেছে–তাদের শরীরের দেহাবশেষ এই মাটিতেই মিশেছে এবং ওই চিন্তা এসে যাওয়ার পর এখন আমার আর কোনো সংশয় নেই।'-[*যাত্রা*/পৃ.১৭৩]

এমন বোধের কারণেই ফার্নান্দেজ খুনী-ঘাতকদের শহরের বিলাস-ব্যসনের জীবনকে ত্যাগ করে দুঃখ-দুর্দশার জীবনকে বেছে নেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও দ্বিধাবোধ করেননি। পথে রায়হান-হাসানদের সঙ্গে জড়িয়ে তিনি শুধু কথা বলেননি বরং নৌকা যোগাড়ের জন্য তৎপর হন। সন্ধ্যার সময় ধলেশ্বরী নদীর কাছে পৌঁছালে গ্রামের কিছু স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের তৎপরতায় নৌকা সংগ্রহ করা হয়। নদী পার হয়ে রায়হানরা সৈয়দপুর নদী সংলগ্ন এক স্কুল ঘরের ক্যাম্পে ওঠেন। এখানে রায়হানের সঙ্গে তার কলেজ ছাত্র কাদেরের ভাই তরুণ উকিল শাকের এবং গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী যুবক সিরাজ ও সিকান্দারদের পরিচয় হয়। শাকেরদের বদান্যতায় রায়হান স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্কুলের হোস্টেল সুপারের ঘরে থাকার জায়গা পান। লীলা-সাকিনা-মঞ্জুদের মতো মেয়েদের থাকতে দেয়া হয় স্কুলের হোস্টেলে। আর সাধারণ মানুষদের থাকার জন্য স্কুলঘর, স্থানীয় চেয়ারম্যানের বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী গ্রামেও ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়। রাতের খাবারের জন্য খিচুড়ি রান্না করা হয়। পরদিন ঘুম থেকে জেগেই রায়হান এলাকার পথঘাটের খোঁজ-খবর নেন এবং স্কুলের কক্ষে টাঙানো একটি ম্যাপ নিয়ে ধলেশ্বরী দিয়ে যমুনা হয়ে কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা দিয়ে নিজ এলাকা দিনাজপুরে যাবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সিরাজ ও সিকান্দাররা নৌকা পথে যাবার ঝুঁকি ও সৈয়দপুর-পার্বতীপুরের অবাঙালি-বিহারিদের তৎপরতার কথা বলায় তিনি হতাশ হন। তাছাড়া পকেটে পর্যাপ্ত টাকা না থাকাতেও তিনি এ পরিকল্পনা আপাতত বাদ দেন। 'স্যার, ঢাকা কিন্তু শেষপর্যন্ত সারেন্ডার করেনি–তাই না? এখনোও লড়াই হচ্ছে– দেখবেন শেষপর্যন্ত আমরাই জিতব'–সিকান্দারের এ উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাতেও রায়হান তাকে হতাশ করেন না। বেলা দশটার সময় সিকান্দার হতশ্রী চেহারার ধূলি-ধূসরিত জামা কাপড় পরা বুয়েটের এক টেকনিশিয়ানকে নিয়ে আসে। তার মুখে শুনেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গণহত্যা এবং আজিমপুরের কাছে রাস্তার ড্রেনে সারা দিন লুকিয়ে থেকে পালিয়ে আসার কথা। তিনি বকশিবাজারে থাকা স্ত্রী-সন্তানদের না পেয়ে জিঞ্জিরা হয়ে এখানে চলে এসেছেন। এসময় পাশ দিয়ে নির্যাতিতা এক মহিলাকে বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে

যেতে দেখেন। আবার এক স্বেচ্ছাসেবক এসে আবেগে উত্তেজিত হয়ে রায়হানকে জানায়–'স্যার কুষ্টিয়া স্বাধীন, যশোর স্বাধীন।' সেই সঙ্গে শোনা যায় ঢাকার উপকণ্ঠে প্রতিরোধ যুদ্ধ, চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াবার কথা, মেজর জিয়ার ভাষণ এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে টিক্কা খানের মৃত্যুর খবর। সবাই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলেও নিজের কোনো কাজ না থাকায় বেকার রায়হানের বেশ অস্বস্তি লাগে। ফলে রায়হান নদীর ঘাট আর স্কুল ঘর পর্যন্ত অযথা হাঁটাহাঁটি করেন। কিন্তু তারপরেও রায়হানের–

> 'কেমন অদ্ভুত লাগে। বারবার বুক ভরে নিশ্বাস নিতে ইচ্ছে করে। স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী লড়াই শুরু করেছে। নিরীহ মানুষ হত্যার বদলা নিচ্ছে। রুখে দাঁড়িয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে। সমস্ত চৈতন্য আলোড়িত করে দেয় ওইসব খবর।...একেক সময় নিজেকে দেখতে পায়– গেরিলার পোশাকে, মাথায়...খাকি টুপি, ঘাড়ে কারবাইন ঝুলছে, মুখে ঘন দাড়ি। ওই চেহারাটা সে বারবার মনের ভেতরে দেখতে পায়।'–[*যাত্রা*/পৃ.১৮৬]

অর্থাৎ ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী বীর চেগুয়েভারার ছবিটি মনের মধ্যে আঁকা থাকলেও তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। উপরন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের ঢাকা ত্যাগ করে বর্ডার পার হওয়া, বর্ডার এলাকায় ইপিআর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা ও ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে সুযোগ বুঝে 'হিট অ্যান্ড রান' করার কথা শুনে রায়হানের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যায়। আবার ঢাকায় ফেরার পথও বন্ধ। কারণ– 'ইন্টেলেকচুয়ালদের ওপরই ওদের নজরটা বেশি'। ফলে সামগ্রিকভাবে রায়হান এক ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পড়ে। যেমনটা হয়েছিল তার মোহাম্মদপুরের বাসায় পঁচিশ মার্চের রাতে। তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাসা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও প্রতিবেশী সরকারি চাকুরে রহিম সাহেবের–'আর্মির বাপের সাধ্য আছে কিছু করে? কেন আমরা কি তৈরি নই মনে করেন?...নাখালপাড়ায় আমাদের পাঁচ হাজার ফৌজ মোতায়েন, মীরপুর বাজারের ওপারে দশ হাজার রেডি, কাঁঠাল বাগানে দুহাজার...প্যানিক সৃষ্টি করলে শত্রুদের লাভ হয়' এমন বক্তব্য শুনে তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টান। আর তাতেই পঁচিশ মার্চ রাতের গণহত্যার কবলে পড়েন এবং অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ছাব্বিশ মার্চ গোটা দিন-রাত অবুঝ সন্তানদের নিয়েই তাকে বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে মানুষের করুণ মৃত্যু অবলোকন করতে হয়। পরে প্রতিবেশী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায় গিয়ে ওঠেন এবং ইঞ্জিনিয়ারের ছেলের সঙ্গে মলোটভ ককটেল বানান। চারদিকের প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেই তিনি সবাইকে ডেকে বলেন–

> 'এখন আমাদের প্রাণ বাঁচানোই হলো একমাত্র কর্তব্য– প্রথমে নিজেকে বাঁচানো–তারপর পাল্টা আঘাত হানা। এখন বোকামি করা মানে নিজেদের সর্বনাশ করা।...এখন শুধু বেঁচে থাকা, পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পাওয়া।'-[*যাত্রা*/পৃ.১৯১]

এ বেঁচে থাকা আর শক্ত মাটির সন্ধানেই রায়হান বউ-বাচ্চা নিয়ে সময় বুঝে পালিয়ে আসেন। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকর্ম বাছাই করতে পারেন না। আবার জীবন বাঁচাতে এমন পালিয়ে বেড়ানোকেও তাঁর কাছে অপমানজনক বলে মনে হয়। এমন পরিস্থিতিতে রাগের সুরে ফার্নান্দেজ রায়হানকে বলেন–

> 'শুনলাম আপোশ হচ্ছে আর সেই আনন্দে আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোলাম।...ভাবুন তো ব্যাপারটা, আচ্ছা বলুন, আমরা কেন তৈরি হলাম না? আমাদের যদি অস্ত্র থাকতো–তাহলে কি আমাদের পালাতে হতো? পিপল কি পালায় কখনো? ভিয়েতনামের পিপল কি পালাচ্ছে?'-[*যাত্রা*/পৃ.১৭৭]

এভাবে ভীরু-কাপুরুষের মতো না পালিয়ে ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনতার মতো যুদ্ধ করাকেই ফার্নান্দেজ শ্রেয় বলে মনে করেন। তাই কোনো কাজকর্ম না করে শুধু শুয়ে বসে থাকা, দিল্লি-মস্কো-অস্ট্রেলিয়া-বিবিসি-ভয়েস অব আমেরিকার খবর শোনা, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং জাতিসংঘসহ মোড়ল রাষ্ট্রের করুণার আশায় রায়হানকে অপেক্ষা করতে দেখে ফার্নান্দেজ বিরক্ত হন। তাই রায়হানকে বলেন–

> 'কী লাভ এভাবে বসে থেকে?...দিনের পর দিন কাজকম্মো নেই, শুধু মানুষের মুখের কথা শুনে বেড়ানো।... ঘেন্না ধরে গেল মশাই...পিটুনি খেয়ে শুধু পালিয়েই আসছে। আমি আর এখানে থাকছি না।...মানুষ মেরে দেশটাকে ফ্লাট করে দিল–কিন্তু দুনিয়ার মোড়লরা এখনো ঘুমুচ্ছে–কখন হাই তুলবে, কখন শুনবে আর কখন ব্যবস্থা নেবে? তদ্দিনে আমরা মরে ভূত হয়ে যাবো।'-[*যাত্রা*/পৃ.২০৪]

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ফার্নান্দেজের কাছে এভাবে পরের ভরসায় বসে থাকাকে স্রেফ সময়ের অপচয় বলেই মনে হয়েছে। এসময় মানব ঢলের সঙ্গে আসা বাষট্টি ও ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের ডাকসাইটে নেতা আনিস আহমেদের সঙ্গের রায়হানের দেখা হয়। দেশের অবস্থা এবং যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে-মন্তব্য করেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

'রেজিস্টের কথা ভাবছে কেউ কেউ।...এই অবস্থাতেই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে দেখবেন।... কেউ চাক বা না চাক তবু প্রতিরোধ হবে।...পিপল এক ধাপ এগিয়ে গেল।...বাংলাদেশ স্বাধীন হচ্ছে–এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না।'–এমন কথা শুনে রায়হান মানসিকভাবে কিছুটা উজ্জীবিত হন। এপর্যায়ে সিকান্দারদের কয়েকটা বন্দুক ও রাইফেল হাতে টহল দিতে দেখে আরো আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এ দুর্বল প্রতিরোধ যে-বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না–তা বুঝতে পেরেও তিনি বলেন–'শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই এভাবেই শুরু হয়–শুরুতে এরকমই ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। লড়তে লড়তেই সংগঠন গড়ে তোলে বিপ্লবীরা'। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর্মি আসার গুজব শুনে সবাই পালাতে শুরু করে। সিকান্দার-সিরাজরা সবাইকে থামাতে গিয়েও পারে না। ভীতু-দুর্বলচিত্তের মানুষের এভাবে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দেখে ফার্নান্দেজ বিরক্ত হয়ে বলেন– 'দেশের এ ইসব পচা মাল সাফ হয়ে যাওয়া ভালো। ভীতুর ডিম যতসব ইডিয়ট–মরে যাওয়াই তোদের ভালো।' এরকম পরিস্থিতিতে রায়হান নীরব ও নিশ্চুপ হয়ে যান। রায়হানের এমন মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পেরেই স্ত্রী বিনু স্বামীকে জানায় 'আমাদেরও বোধ হয় চলে যাওয়া উচিত–এ জায়গাও সেফ থাকবে না কদিন পর।' এ পরামর্শকেও রায়হান অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কারণ ঢাকার শত্রু ঘাঁটি থেকে তারা মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থান করছেন। রায়হান ব্যাংক থেকে টাকা তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তাব দিলে বিনু নিজের হাতের চুড়ি আর বালা খুলে বিক্রি করতে বললেও তিনি তা নেন না। কারণ এমন বিপদের দিনে সোনার গহনা বিক্রি করাও যেমন সহজ নয়, তেমনি আবার নানা বিপদেরও আশঙ্কা রয়েছে। ফলে রায়হানকে–'সুদিনের জন্যে অপেক্ষা, পথের সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষা'-য় থাকতে হয়। এসময় প্রতিরোধ যুদ্ধে আগ্রহী কিছু যুবককে শাকের ধমকাতে থাকলে রায়হান এগিয়ে যান। শাকের রায়হানকে বলে–

> 'এই মাথা গরম ছেলেদের জন্যই শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ হয়ে যাবে দেখবেন–এরা ইতোমধ্যে ডুবিয়েছে, আরো ডোবাবে।...বন্দুক নিয়ে কি কামান-প্লেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়?...এদের জন্যেই, এদের এই রকম চাপ সৃষ্টির জন্যেই শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।'-[*যাত্রা*/পৃ.২০৬-২০৭]

সুযোগসন্ধানী তরুণ উকিল শাকের নিজের ক্যারিয়ারের চিন্তায় এ যৌক্তিক যুদ্ধের বিষয়টিকেও উটকো ঝামেলা হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু সিরাজ-সিকান্দাররা শাকেরের কথাকে প্রশ্রয় না দিয়ে রায়হানকে নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানালে তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান। আর যুক্তি হিসেবে বলেন–

> 'ভালো লোক খুঁজে বার করেছ তোমরা–আমি বন্দুক ছুঁয়ে দেখিনি জীবনে–আর আমি দেব যুদ্ধের নেতৃত্ব? তোমাদের মাথা খারাপ নিশ্চয়ই।...আমাকে দিয়ে অতবড়ো কাজ হবে না, বরং ছোটোখাটো কাজ দাও। আর খুঁজে বের কর আর্মি ট্রেনিং কার আছে। এক্স আর্মি নয়ত পুলিশের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'-[*যাত্রা*/পৃ.২০৭-২০৮]

রায়হানের এমন কথায় সিরাজরা হতাশ হয়। একজন ইন্টেলেকচুয়াল ও অপরিচিত লোক হবার কারণে সিরাজরা রায়হানকে শুধু সঙ্গে থেকে এলাকাবাসীকে প্রভাবিত করার আহ্বান জানিয়েও ব্যর্থ হয়। রায়হান তার বই পড়া বিদ্যা, বউ ও বাচ্চাদের নিরাপত্তার অজুহাতে এ যুদ্ধে জড়ানোর বিষয়কে এড়িয়ে যান। সিরাজরা হতাশ মুখে ফিরে গেলে রায়হান বিবেকের দংশনে–

> 'ফিরে আসতে আসতে দাঁড়ালো। একবার ভাবল ডাকে ওদের। বলে, আমি যেসব ছেঁদো যুক্তি তুলে পাশ কাটালাম, ওসবই মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদ। বলে, গেরিলার সংসার জনগণের সংসারের সঙ্গে মিশে থাকে। বলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি, দেশের জনগণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকব।'-[*যাত্রা*/পৃ.২০৯]

কিন্তু মনের এ কথাগুলো রায়হান মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন না। আবার মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে স্পেনের বহু বুড়োলোকদের মতো যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেবার চমকপ্রদ ইতিহাস এবং স্পেনের ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গিয়ে কমিউনিস্ট সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েলের জীবন-উৎসর্গের কথা জানা থাকলেও তিনি উদ্যোগী হতে পারেন না। অথচ এমন অসহায়তায় নিজের মনে প্রচণ্ড গ্লানিবোধ ও বিবেকদংশন অনুভব করেন। রায়হানের মানসিক অবস্থা *হ্যামলেট* নাটকের নায়ক হ্যামলেটের দোলাচল প্রবৃত্তি 'To be or not to be'-র মতো হয়ে ওঠে। রায়হানের এ অবস্থার জন্য মূলত মধ্যবিত্ত-মানসই দায়ী। এদেশের– 'সমাজগঠনের প্রক্রিয়ার কারণেই মধ্যবিত্ত মূলত অস্থিতিশীল। এদের যেমন সুযোগ থাকে বিত্তবান শ্রেণিতে নিজেকে যোগ করার আবার আশঙ্কা থাকে সব হারিয়ে নিম্নবিত্ত কিংবা বিত্তহীনের কাতারে যুক্ত হওয়ার। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে এরা সচেতন। উর্ধ্বমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন এবং নিম্নমুখি পতনকে রোধ করার জন্য এরা সবসময় সতর্ক থাকে। ফলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত যেকোনো ইস্যুতেই মধ্যবিত্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তাদের বর্তমান অবস্থান সংরক্ষণেও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। আবার সমাজ বা দেশের আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক বাহক যেহেতু মধ্যবিত্ত, সেহেতু এ দেশ-জাতি-রাষ্ট্র,

সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন তাই সব থেকে বেশি আভিঘাত সৃষ্টি করে এ মধ্যবিত্তের ওপর।'[৫] সিরাজ-সিকান্দারদের মতো বহু যুবক যুদ্ধে যাবার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পরেও নেতৃত্ব ও অস্ত্রের অভাবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। তাই ফার্নান্দেজ নেতাদের পালিয়ে যাবার তীব্র সমালোচনা করেন। আবার রায়হানকে নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানিয়েও সিরাজরা ব্যর্থ হলে ফার্নান্দেজ বলেন–

> 'আপনার সঙ্গে ঢাকা থেকে ঘুরে এসে ওদের সঙ্গে জুটে যাবো আমি। ভাবুন তো, দোজ কিডস–ওই বাচ্চারা বন্দুক খুঁজে বেড়াচ্ছে–লড়াই করার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে–আর আমরা বুড়োরা শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছি। দেখবেন, এদেশ স্বাধীন হবেই, পাকিস্তান আর্মির বাপেরও সাধ্যি নেই যে এদেশের মানুষকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পরাধীন করে রাখবে।' -[*যাত্রা*/পৃ.২০৯]

মার্চ মাস শেষ হলে এপ্রিল মাসের শুরুতেই রায়হান ঢাকার পরিস্থিতি জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। অনেকের ধারণা ছিল হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে রাজনৈতিক এ সংকট দূর হবে এবং একটি সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় সরকার ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পৌঁছাতে পারবেন। কিন্তু দেশের অবস্থা দিনে দিনে জটিলতর হয়ে ওঠে। লীলার তৎপরতায় সিকান্দাররা স্থানীয় এক বয়স্ক ডাক্তারকে ডেকে আনে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপদ বুঝে ডাক্তার সেই গভীর রাতেই হ্যাজাক জ্বালিয়ে হাসানের অপারেশন করেন। আর তাতেই–

> 'ভয়ানক চিৎকার করতে করতে যখন হাসানের গলা একেবারে মিইয়ে এসেছে ক্লান্তিতে, তখন অপারেশন শেষ হলো। হাত থেকে একটা বুলেটে বের হলো, পায়ের শিন বোন ফ্রাকচার। দশ-বারোটা স্টিচ, গোটা চারেক ইনজেকশন এবং লম্বা লম্বা কাঠের স্প্রিন্টরে হাত পা বেঁধে ডাক্তার বিদায় হলেন।'–[*যাত্রা*/পৃ.১৮০]

ফলে কোনো রকম নড়াচড়া না করে চিৎ হয়ে হাসানকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। এসময় লীলাই হাসানকে দেখভাল ও সেবাযত্ন করে। এভাবে হাসানের সঙ্গে লীলারও প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বান্ধবী সাকিনা ও মঞ্জুরা যার যার বাড়ি গেলেও লীলা অসহায়-অসুস্থ হাসানকে ফেলে যেতে পারে না। এ যুদ্ধ ও মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে হাসান লীলাকে বলে–

> 'আমি রাজনীতির সঙ্গে ছিলাম না, বুঝিও না ওসব। কিন্তু মনে হচ্ছে, পালিয়ে বেড়ানোটা অর্থহীন। সবাইকে বিপদের মুখোমুখি একদিন না একদিন হতেই হবে। বাইরের কেউ এসে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে না। লড়তে হবে নিজেদেরই।'-[*যাত্রা*/পৃ.২০১]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে হাসানের প্রখর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়েছে। তাই সে মৃত্যুর ভয় না করে, কারো অস্ত্রবল-জনবলের ওপর ভরসা না করে নিজের শক্তি-সাহসকে সম্বল করেই প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে এ আপদকালে হাসানের নিষ্কর্মার মতো শুয়ে থাকতে মনে সায় দেয় না। কিন্তু নিরুপায় হাসানের এছাড়া কোনো উপায়ও থাকে না। শারীরিক অক্ষমতায় তার মনে প্রচণ্ড আক্রোশ আর অপরাধবোধ কাজ করে। আবার টাকা ফুরিয়ে যাবার কারণে রায়হান ফার্নান্দেজের সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ ব্যাংকে বাঙালিদের টাকা জমা দিতে দিলেও কোনো টাকা উত্তোলন করতে দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে ফার্নান্দেজের সাহায্য তাকে নিতে হয়। স্ত্রী বিনুর নিষেধ সত্ত্বেও রায়হান ফার্নান্দেজকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা(২ এপ্রিল রাত ৯ টার সময়ে) করেন। যে-ঢাকার রাজপথে রায়হান যৌবনকালে সহযোদ্ধা ছাত্রনেতা মমতাজ ও জাহিদদের নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়ে বুক চিতিয়ে হেঁটেছিলেন, সেই চিরচেনা ঢাকায় আজ তাকে লুকিয়ে ঢুকতে হয়– এমন পরিস্থিতি রায়হানকে পীড়া দেয়। জিঞ্জিরা থেকে নৌকাযোগে লালবাগে পৌঁছানোর পরিকল্পনা নিয়ে দুজনে যাত্রা শুরু করলেও ধলেশ্বরী পার হয়ে রুইতপুরের সড়কের কাছে গিয়েই পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের মুখে পড়ে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হন। গুলি আর আগুনের তাণ্ডবে দূরবর্তী গ্রামের মানুষের আর্তচিৎকার ভেসে আসে। তখন– 'রায়হান তবুও পেছনে তাকায়। সকাল হচ্ছে, গ্রাম পোড়ানো আগুনের লাল রং আর সূর্যোদয়ের রং একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে আকাশে। পেছনে ঘাতকের দল তাড়া করে আসছে।' এভাবে পালিয়ে ফেরার পথে রায়হান এক গ্রাম্য লোককে বাঁশ নিয়ে দুই পাকিস্তানি সৈন্যকে আক্রমণ করা এবং অস্ত্রের ব্যবহার না জানায় করুণ মৃত্যু দেখে হতাশ হন। ছাব্বিশ মার্চের মতো অসহায় মানুষের নির্মম মৃত্যু দেখে রায়হান মনে মনে আফসস করে বলেন–

> 'শুধুই মার খাওয়া–শুধুই মৃত্যু–অমোঘ, বিশাল সর্বগ্রাসী। ঘাতকেরই জয়-জয়কার শুধু। একজন উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সেও তো অস্ত্রের ব্যবহার জানে না– হায়রে।'-[*যাত্রা*/পৃ.২৩৪]

সশস্ত্র দুইজন পাক আর্মিকে এভাবে আক্রমণ করার সাহস দেখে ফার্নান্দেজও উজ্জীবিত হন।আর ভবিষ্যতে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেবার স্থির সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে স্বজাতির মৃত্যুদর্শন ও শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে রায়হানকে সৈয়দপুর আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে পালিয়ে আসতে হয়। অথচ এ রাতেই পাকিস্তানি বাহিনী নৌপথে গানবোট নিয়ে চারপাশের গ্রাম ও

জনপদ ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসায় রায়হানের স্ত্রী বিনু বাধ্য হয়ে সন্তানসহ নিরাপদ স্থানের আশায় অন্যত্র চলে যায়। রায়হান তিন এপ্রিল টাকা উত্তোলন করে চার এপ্রিল সকালবেলা উত্তর দিকে অর্থাৎ দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল–' ভেতরে চলে যাবেন। ভবিষ্যতের মানুষ এই ইতিহাস জানবে কিনা কে জানে। কেউ লিখে রাখবে কিনা–তাও কেউ বলতে পারে না। কিন্তু তবু নিঃশব্দে, ইতিহাসের অগোচরে, পৃথিবীর অলক্ষ্যে যাত্রা শুরু হবে। শেষ কোথায় জানি না।' যদিও রায়হানের বাড়ি ফেরা আপাতত আর সম্ভব হবে না, তথাপি নীরবে-নিশ্চুপে একটি জাতির জন্মযাত্রার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জোর তাগিদ অনুভব করেন। যা প্রচলিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অথচ এসময় সিরাজ-সিকান্দাররা অস্ত্র নিয়ে হাসানের কাছে আসলে সে বিনা বাক্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। একটি মাত্র সচল হাত দিয়েই হাসান গুলি ভরা, বোল্ট ওঠানো-নামানোর কায়দা-কানুন দেখায় । আর সেই সঙ্গে একজন গেরিলার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে বলতে উৎসাহে তার দুচোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাই সে ভবিষ্যৎ যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলে-

> 'গেরিলা কি শুধু সৈনিক? না, গেরিলা একজন সুশিক্ষিত দেশপ্রেমিক, একজন রাজনৈতিক যোদ্ধা। গেরিলার পেশা বলতে নির্দিষ্ট কিছু নেই।...শত্রুকে সে মারে, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। গেরিলার নিজের কোনো অস্ত্র নেই, কোনো রসদ নেই কিন্তু আবার অভাবও নেই... গেরিলার দুটিই সম্পদ থাকতে হয়–শুধু দুটি শক্তিশালী হাত এবং বুকের ভেতরে জনগণের জন্য ভালোবাসা।'-[*যাত্রা*/পৃ.২২২]

এভাবে মনের মতো এক কাজ পেয়ে হাসান যোদ্ধাদের কাছে নিজেকে মেলে ধরে। সিরাজ-সিকান্দারদের বিদায় দিয়ে এবং একটি রাইফেল নিজের বিছানায় রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। এসময় লীলা তার কক্ষে ঢুকে–'যদি রায়হান স্যার এসে খবর দেন যে- ঢাকায় সব ঠিকঠাক চলছে, আর্মি শহর থেকে ব্যারাকে ফিরে গেছে–তাহলে কী হবে বলতে পারেন?' এমন জিজ্ঞাসায় হাসান নির্ভার কণ্ঠে বলে–

> 'রাজনৈতিক নেতারা যা খুশি ভাবতে পারেন কিন্তু পিপল এখন স্বাধীনতার পক্ষে। আর সব চাইতে বড়ো কথা পেট্রিয়ট আর্মি আর্মস পিপলের সঙ্গে মিশে গেছে। এটা একেবারে গুণগত পরিবর্তন। দেখবেন, দেশ স্বাধীন হবেই।'-[*যাত্রা*/পৃ.২২৩]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যে-শেষপর্যন্ত জনযুদ্ধে রূপ নেয়–তারই বাস্তবসত্য এ বক্তব্যের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে। নেতাদের দিক-নির্দেশনার অপেক্ষায় না থেকে সাধারণ মানুষ যে-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জাগতে শুরু করেছে এবং দেশপ্রেমিক বাঙালি সেনাদের সঙ্গে মিলেমিশে রণাঙ্গনে নেমে পড়েছে–এ বিষয়টিকেই হাসান সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। 'আপনি দারুণ আশাবাদী'– লীলার এ কথার জবাবে হাসান জানায়–

> 'আশাবাদী না হয়ে যে আমাদের গত্যন্তর নেই। দেখছেন না, দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে–আমাদের কাছে এখন দুটি মাত্র পথ–হয় মৃত্যু নয়ত লড়াই। যেহেতু একটি জাতি মরে যেতে পারে না– যেহেতু তাকে লড়াই করতেই হবে।...এখন আমাদের জীবনের আরেক নাম হয়ে ওঠেছে স্বাধীনতা।'-[*যাত্রা*/পৃ.২২৪]

হাসানের এ কথায় লীলা সামনের দিনে যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝতে পারে। হাসান লীলার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তার মায়ের মৃত্যুর তথ্য জেনে বলে– 'মা থাকলে শুধু মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, একাকী থাকা যায় না কখনো।' অর্থাৎ হাসান সব রকম মায়ার বন্ধন পেড়িয়ে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। এভাবেই লীলা হাসানের হিতাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হয় । হাসানের বর্তমান অবস্থার জন্য লীলাও মনে বেদনা অনুভব করে। রাতের তারা ভরা আকাশ আর নদীর ঝড়ো শীতল বাতাসে–

> 'লীলা বারান্দায় এসে বসেছিল।...ভয়ানক শূন্যতা বোধ করছিল তখন।...লীলা অন্ধাকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।'-[*যাত্রা*/পৃ.১৮০]

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লীলার সাবেক প্রেমিক সি.এস.পি বেলালের কথা মনে পড়ে। ক্যারিয়ার সচেতন বেলাল নিজের ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ে তুলতে দেশের স্বাধীনতা ও দেশবাসীর মুক্তির কথা না ভেবে একুশ মার্চ ঢাকা থেকে পিণ্ডি চলে যায়। যা লীলার কাছে স্বাভাবিক ও শোভন মনে হয়নি। 'পিণ্ডি যাওয়া বন্ধ রাখলে হয় না?'– লীলার এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বেলাল নিঃসঙ্কোচে জানায়–

'গোলমাল অবিশ্য হবেই–তাহলে ওখানেই তো সব চাইতে সেফ। কেন্দ্রীয় রাজধানী, গোটা পাকিস্তানে গোলমাল হলেও পিণ্ডি ইসলামাবাদ শান্ত থাকবে।... এখন দারুণ চান্স আসছে। বাঙালিরা এবার ক্ষমতায় যাচ্ছে।...তাহলে ওখানে থাকাই তো আমার ভালো, সুযোগ সুবিধাগুলো ঠিক মতো ধরতে পারবো।'-[*যাত্রা*/পৃ.১৮১]

সুবিধাবাদী-সুযোগসন্ধানী বেলালের এমন নিখুঁত ছকবাঁধা জীবনকেও সে-সময় লীলা বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ বেঁধে যাওয়াতে লীলার মানসভুবন পাল্টে যায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা, মৃত্যুর বিভীষিকা, জীবনের অপচয় আর মানুষের আত্মত্যাগ–এসবই লীলাকে রাতারাতি পাল্টে দেয়। তাই তারা ভরা আকাশে নির্ঘুম রাতে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে–'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।' অর্থাৎ অগাধ বিত্ত আর অসীম সুখই যে-জীবনের শেষ কথা নয়–এই বোধই তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। তাই স্বেচ্ছাসেবক শাকেরের প্রস্তাবে লীলাও শরণার্থী শিশুদের শুশ্রূষা, নারীদের দেখভাল, বিপন্নদের সান্ত্বনা এবং গ্রামের নারীদের সচেতন করার দায়িত্ব সানন্দে বরণ করে। এভাবে কাজ করতে গিয়ে বড়লোকের ছেলে শাকের লীলার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। চাঁদনী রাতের শেষ প্রহরে রাত জাগা পাখির ডাকে লীলা নিজেকে শুধায়–

'কে জানে, আরো কেউ থাকবে কি না। কে জানে থাকবে কি না ভালোবাসা আর প্রতিশোধ।...থাকবে কি বিদ্রোহী আর প্রেমিক? সাহসীযোদ্ধা আর মায়ের আদুরে সন্তান? লীলা বলতে পারে না। কিন্তু অস্পষ্ট কেমন মনে হয়– পেছনে কারা যেন থেকে যাচ্ছে। শপথ, অঙ্গীকার, ঘৃণা, প্রেম, জিঘাংসা–সব যেন থেকে যাচ্ছে।'–[*যাত্রা*/পৃ.১৯৯]

কক্ষে দুই বান্ধবীকে না দেখে লীলা শূন্যতা অনুভব করে। 'কার জন্যে অপেক্ষায় থাকবি তুই? স্বদেশ, নাকি সংসার, নাকি তোর প্রেম?'– এমন আত্মজিজ্ঞাসারও সে কোনো জবাব দিতে পারে না। সেই সঙ্গে বিছানার ওপর শাকেরের মায়ের পাঠানো দুটি শাড়ি দেখে তার গত ছয় দিন ধরে গোসল না করা, মাথায় চিরুনি না দেয়া এবং পোশাক না পাল্টানোর কথা মনে পড়ে। আবার শাড়ি পাঠালেও পেটিকোট না পাঠানোয় তার চিন্তা হয়। এর সঙ্গে আবার মানথলি কোর্সের মতো নারী জীবনের অনিবার্য ঝামেলার কথা ভেবেও লীলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কারণ–

'মেয়ে হয়ে জন্মানো ঝামেলার–কথাটা জানা ছিল, কিন্তু অনুভব করেনি কখনো। এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছে।'-[*যাত্রা*/পৃ.২০৩]

যুদ্ধের মতো এ আপদকালে নারী শুধু দৈহিকভাবে দুর্বল হয়েই বিপদে ভেঙে পড়ে না, বরং একই সঙ্গে তার রূপ-যৌবন এবং মাসে মাসে ঋতুস্রাবের মতো শরীরী বিষয়ও তার জীবন ও চলার পথে বড় বিপদ ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যা কোনো নারীর পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয় না। এসময় শাকের সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিলে লীলা অবাক হয়। যদিও শাকেরের মতো সুপুরুষ, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানকে বিয়ে করতে কোনো মেয়েরই আপত্তি থাকার কথা নয়। তারপরেও লীলা বলে–

'চারদিকে এই রকম অবস্থার মধ্যেও আমার সম্বন্ধে ওই রকম চিন্তা আপনি কেমন করে করতে পারলেন–এটাই আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।'-[*যাত্রা*/পৃ.২১৪]

এভাবে সে শাকেরের প্রস্তাবকে এড়িয়ে যায়। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ের টাঙ্গনের ব্রিজ, দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা, নদীর ঝকঝকে জল, পিতার মুখ ও সুইট হোম। এসব পুরনো স্মৃতি বর্তমানে তার উন্মূল অবস্থায় 'তাকে যেন আবার মূলের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।' অথচ এ যুদ্ধের হত্যালীলা ও ধ্বংসযজ্ঞকে সে কোনোভাবেই মানতে পারে না। তাই লীলার আত্মজিজ্ঞাসা –

'তবে কি এইভাবেই চলতে থাকবে? শুধুই হত্যা? একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার একটা স্থূল প্রক্রিয়া?...ইতিহাস কি তাহলে শুধু হিসেব–শুধুই তথ্য? তার বেশি কিছু নয়?'-[*যাত্রা*/পৃ.২১৫]

পাক বাহিনী বুড়িগঙ্গা পার হয়ে জিঞ্জিরা থেকে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে এবং শেলিং করতে করতে রুইতপুর পর্যন্ত চলে আসে। এমতবস্থায় লীলা হাসানের কাছে এসে– 'আমি সত্যিই চলে যাচ্ছি' বলে বিদায় নিতে আসলেও পারে না। 'কাউকে না কাউকে তো শেষ পর্যন্ত থেকে যেতে হবে'–হাসানের এমন কথায় লীলা গম্ভীর হয়ে যায়। আর তাই সে–

'ওই অন্ধকারে বুকের ভেতরে ভারি কষ্ট অনুভব করল। হাসানের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করল ওর। কেমন যেন মনে হলো, সে নিজেই হাসানের মা। কিছুই বলতে পারল না–শুধু হাসানের শুকনে লম্বা চুলভর্তি মাথায় হাত বুলালো।'-[*যাত্রা*/পৃ.২২৬]

যুদ্ধের এ ক্রান্তিকালে লীলা মনের অজান্তেই প্রেমিকার স্তর থেকে প্রাণদায়িনী জননীর স্তরে উন্নীত হয়। আর হাসানকে সর্বাবস্থায় আগলে রাখার তাগিদ অনুভব করে। তাই একদিকে পথে গড়ে ওঠা প্রেমের বিষয়কে সে যেমন অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে অসুস্থ-অসহায়-নির্বান্ধব হাসানকে ফেলে যেতেও মন সায় দেয় না। এসময় মানুষের চিৎকার আর গুলির আওয়াজ নিকটতর হলে লীলা হাসানের ঘরে ছুটে যায়। এসে দেখে 'হাসানের হাতে কাল রাতের সেই রাইফেলটা। নলটা জানালার ওপর রাখা–হাসান উপুড় হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে আছে।' অর্থাৎ চলতে অক্ষম হাসান রাইফেলকেই একমাত্র সঙ্গী ও সম্বল করে শত্রুকে মোকাবিলা করতে জানালার কাছে পজিশন নেয়। লীলা তাকে পালাতে বা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে যাবার জন্য জোর করলেও হাসান তাতে সাড়া দেয় না। বরং বলে –'আমি এ এলাকাতেই থেকে যাব। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে; ভেতর থেকে রেজিস্টেনস শুরু হবে' তাই সে লীলাকে চলে যেতে বলে। তবে শেষপর্যন্ত লীলাও হাসানকে ফেলে যেতে পারে না। বাইরে সিকান্দার-সিরাজরা প্রতিরোধের অবস্থান নিলেও হাসান শরণার্থী ক্যাম্পের স্কুল ঘরের ভেতরে অবস্থান করে। মৃত্যু ভয়কে মাড়িয়ে লীলাকে সঙ্গে নিয়েই সে এক হাত আর এক পায়ের ওপর ভরসা করেই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তাই দেখা যায়–

> 'হাসান উপুর হয়ে শুয়ে রয়েছে। জানালায় রাইফেলের নল রাখা আগের মতোই...দুজনে তাই অপেক্ষা করে থাকে। জখম শরীর, এক হাতে রাইফেল–জানালা দিয়ে দেখতে পায়–নদীর ওপারে, দিগন্ত রেখার কাছে এখনো তুমুল গুলি হচ্ছে–গ্রাম জ্বলছে, হাট জ্বলছে, খামারবাড়ি জ্বলে যাচ্ছে। দুজনেই দেখতে পায় লেলিহান শিখা, ধোঁয়ার কুণ্ডলি এবং আর্তচিৎকারময় আকাশের ওপার দিয়ে ভারি বিবর্ণ সূর্যোদয় হচ্ছে।'-[*যাত্রা*/পৃ.২৪০-২৪২]

এ –'ভারি বিবর্ণ সূর্যোদয়' দিয়ে শওকত আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য উদয়ের সম্ভাবনার কথাই বলেছেন। অর্থাৎ অনেক রক্তের আর ধ্বংসস্তুপের দিগন্ত দিয়ে যে- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য দেখা যাবে–এমন আশাবাদেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

যাত্রা উপন্যাসে অধ্যাপক রায়হান, যোসেফ ফার্নান্দেজ, হাসান, লীলা ও বিনু–এ পাঁচটি চরিত্রই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাই বলে সিরাজ, সিকান্দার ও শাকের পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালি জনগোষ্ঠী যে- তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত ছিল– তার মধ্যে প্রতিরোধ যুদ্ধে অগ্রণী মুক্তিযোদ্ধা হাসান, সিরাজ, সিকান্দার প্রমুখ চরিত্র; হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত গৃহচ্যুত নিষ্ক্রিয় সমর্থক রায়হান ও ফার্নান্দেজ প্রমুখ এবং বিরুদ্ধ শক্তির মতো সুবিধাবাদী চরিত্র বেলাল ও শাকেরের কারণে স্বাধীনতার প্রশ্নে জনগণের সামূহিক ও সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের চিত্রটি বিকশিত হয়নি। তবে যুদ্ধের ডামাডোলে গুজব, যুবকদের অস্থিরতা, বাস্তুত্যাগী মানুষের আহাজারী– সব কিছু মিলিয়ে উপন্যাসের পরিবৃত্ত উন্মুখর থেকেছে। তবে 'একটি বিশেষ পরিবেশে, একটি বিশেষ সংকটে নিপতিত নরনারীদের চিত্র অঙ্কন করা হলেও এ উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন ও সমাজের চমৎকার মানসিকতা প্রকটিত হয়েছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তদের গা বাঁচিয়ে চলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়'।[৬] এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ' শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মানস-সংকটের প্রধান প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে অধ্যাপক রায়হান চরিত্রটি। বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় কখনো কখনো মনে হয় ঔপন্যাসিকের আত্মরূপই যেন রায়হান চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে'।[৭] এর কারণ হিসেবে বলা যায়–

> 'মধ্যবিত্তের অবস্থানটা বেশ কৌতূহলের, সে না হয় ঘরের না হয় ঘাটের। সে উপরে উঠতে পারে না বলে আশাব্যঞ্জক যন্ত্রণাকাতর, আর নীচে নেমে যেতে পারে বলে ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। মধ্যবিত্ত এ সমাজের এমন একজন মানুষ– যে উৎপাদন সম্পর্কহীন, সুবিধাবাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী,সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরশ্রীকাতর। সে পরগাছা–ধনীর ও শক্তির সঙ্গে লেগে থাকে, পায় ছিটেফোঁটা, কখনো পায় না। নীচে নামা যায় না, উপরে উঠাও সহজ নয়, এ এক ত্রিশঙ্কু অবস্থা।'[৮]

সাতাশ মার্চ থেকে তিন এপ্রিলের মধ্যবর্তী ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা-নির্মমতা ও নৃশংসতার বাস্তব চিত্রকে অবলম্বন করেই এ উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। যদিও এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হয়েছে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। একইভাবে এ কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির ভবিষ্যৎ। তাই উপন্যাসের কাহিনি চরিত্রের মানসভাবনার মধ্য দিয়ে মাঝে মধ্যে ভবিষ্যতের দিকেও যাত্রা করেছে। চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও ব্যক্তির অন্তর্গত জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া– এ দুই রীতির মধ্য দিয়ে লেখক কাহিনি বয়ান করেছেন।[৯] শওকত আলীর এ *যাত্রা* উপন্যাসের সঙ্গে আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত* এবং শওকত ওসমানের *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের বেশ সাদৃশ্য

পরিলক্ষিত হয়। একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়েই রচিত হয়েছিল এ দুটি উপন্যাস। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এ তিন ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। যদিও শওকত আলী *যাত্রা* উপন্যাসটি বাহাত্তর সনে রচনা করেছেন, তথাপি এ তিন উপন্যাসের গুণ, মান ও বিষয়-বিন্যাসের দিক থেকে মিল পাওয়া যায়। কারণ এ তিনটি উপন্যাসই বর্ণনামূলক, ডায়রিলিখনধর্মী ও লেখকের আত্মজীবনীর ছায়ায় ব্যাপ্ত। অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন যেমন আনোয়ার পাশার প্রতিমূর্তি, প্রৌঢ় শিক্ষক গাজী রহমান যেমন শওকত ওসমানের ছায়ামূর্তি, তেমনি যাত্রা-র অধ্যাপক রায়হানও শওকত আলীর জীবনভাষ্যের প্রতিরূপ। এ চরিত্রগুলো কেউ-ই ইচ্ছা ও সুযোগ থাকার পরেও মুক্তিযুদ্ধে শেষপর্যন্ত অংশগ্রহণ করেনি। আবার এ তিন লেখক যেমন কর্মজীবনে শিক্ষক ছিলেন, তেমনি এ তিন উপন্যাসের প্রধান চরিত্রও শিক্ষক, মধ্যবিত্ত বলয়োদ্ভূত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বপক্ষে উৎসলীন।

তবে আনোয়ার পাশা ও শওকত ওসমানের মতো শওকত আলী তাঁর এ উপন্যাসে পাকিস্তানিদের প্রতি ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত প্রকাশ ঘটাননি। যদিও বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া *রাইফেল রোটি আওরাত* ও *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসে পাকিস্তানি সৈনিকের উপস্থিতির কারণে উর্দু ভাষার ব্যবহার হলেও *যাত্রা* উপন্যাসে পাক বাহিনীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকায় লেখক এ ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছেন। তবে খ্রিষ্টান ফার্নান্দেজ ও হাসানের মাধ্যমে বহু ইংরেজি ভাষার অব্যর্থ প্রয়োগ করেছেন। তবে শওকত ওসমানের *জলাঙ্গী* উপন্যাসের জামিরালি এবং সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসের সলীম যে- সাহস ও বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়েছে, *যাত্রা*-র রায়হান চরিত্রে তা পাওয়া যায় না। আবার শওকত আলীর *পুনর্বার বেয়নেট* গল্পে মুক্তিযোদ্ধা বেলায়েত ও তার সঙ্গীদের মধ্যে যে-প্রতিশোধ স্পৃহা দেখা যায় *যাত্রা*-য় তা পরিলক্ষিত হয় না। অন্যদিকে শওকত ওসমানের *নেকড়ে অরণ্য*-র তানিমা ও সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান*-এর বিলকিস যে-প্রতিবাদ ও দ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা *যাত্রা*-র বিনু ও লীলার মাঝে দেখা যায় না। তারপরেও মৃত্যুকে তুচ্ছ করে হাসানের সঙ্গী হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার মধ্য দিয়ে লীলা চরিত্রকে বিনুর চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও অঙ্গীকারবদ্ধ মনে হয়।

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শওকত আলীর *যাত্রা* এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এখানে গতানুগতিক জীবনবীক্ষণের প্রয়োজন হয়নি। লেখক এখানে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজ-মানসের একটি সত্যময় রূপ বলিষ্ঠভাবে অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের এই ঘটনাক্রমের মধ্যে তৎকালীন যুদ্ধগন্ধী সময়ের জীবনযন্ত্রণা, অত্যাচারিত, নিগৃহীত মানুষের নানা সমস্যার উদ্ভাসন ঘটেছে। একদিকে জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো, অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতার প্রতি দুর্নিবার আকুতি *যাত্রা*-র মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে।[১০] বাঙালির রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রাম অবলম্বনে রচিত উপন্যাস এ *যাত্রা*। একটি রাষ্ট্রের জন্মযন্ত্রণার ইতিহাস এবং একটি জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের ঐতিহাসিক প্রস্তুতির খণ্ডচিত্র এ উপন্যাসে শিল্পিত হয়েছে। পলায়নপর কিছু বাঙালি নরনারীর চলমানতার ফ্রেমে উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসের কাহিনি। খণ্ড ঘটনার অনুষঙ্গে অখণ্ড কাহিনির আভাসও যে-তৈরি হতে পারে– *যাত্রা* উপন্যাস তার-ই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপন্যাসটির প্রমিত আয়তনে লেখক একাত্তরের এক অস্থির আতঙ্কিত সময়ের ঘটনা উপস্থাপন করলেও এর মধ্য দিয়ে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধই যেন বিম্বিত হয়েছে। প্রাণ ভয়ে ভীত মানুষের পলায়নপর মুহূর্তের অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসে বিধৃত হলেও কাহিনির মূল প্রেরণা বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও অবিনাশী প্রতিরোধ-চেতনা। প্রাণের ভয়ে সাময়িকভাবে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেও এক সময় এই মানুষেরা পৌঁছে যায় সুনিশ্চিত এক প্রতিরোধ চেতনায়। অস্থির চলমান খণ্ড-মুহূর্তের কিছু অভিজ্ঞতার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একাত্তরের ঐতিহাসিক অভিযাত্রার দলিল। সমগ্র উপন্যাসে ডক্যুমেন্টারির স্বভাব রয়েছে; চলচ্চিত্রের এই ধরন সমগ্র উপন্যাসে এনেছে এক সাবলীল গতিময়তা। মরণজয়ী যোদ্ধার বিপুল ত্যাগ এবং সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতার অনবদ্য স্মারক *যাত্রা* বিশিষ্টতার দাবিদার।[১১] শওকত আলী তাঁর এ *যাত্রা* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহর ও প্রতিরোধের আকাঁড়া বাস্তবতার চিত্র অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছেন।বাংলাদেশের জন্মযন্ত্রণার প্রসূতি মুহূর্তের জঠরজ্বালা, পীড়িত- পলায়নপর মানুষের আপদকালীন আর্তি-উৎকণ্ঠা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিপ্রতীপে প্রতিরোধের চেতনায় ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচণ্ড প্রত্যয়কে এ উপন্যাসে মূল উপজীব্য করা হয়েছে।

একাত্তরের এ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনার উত্তরাধিকার হিসেবে লেখক কৌশলে পূর্ববর্তী বায়ান্ন, বাষট্টি,ছিষট্টি, আটষট্টি, ঊনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোরও অবতারণা করেছেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন চেগুয়েভারার মতো বিপ্লবী এবং স্টালিনগ্রাড ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো অনুপ্রেরণামূলক বৈশ্বিক অনুষঙ্গ। শওকত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর দুই পাড়ে মানব জীবনের দুটি রূপকে চিত্রায়িত করেছেন। এর একদিকে রয়েছে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা, অপরদিকে নির্মাণ; এদিকে নরমেধযজ্ঞ, অপরদিকে পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি। এ *যাত্রা* উপন্যাসে লেখক ফটোগ্রাফিক নৈপুণ্যে যে- যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন, তা কেবল পাকবাহিনীর মৃত্যুর তাড়া খেয়ে পলায়নপর বাঙালির প্রাণরক্ষার প্রতিচিত্র নয়, বরং একই সঙ্গে উঠে এসেছে বাঙালির প্রতিরোধ চেতনায় ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার, সঙ্ঘচেতনার প্রয়াস, মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শনের সদিচ্ছা এবং ব্যক্তিপ্রেমের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের শাশ্বত শপথের বাণী। তাই শওকত আলীর *যাত্রা* একদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধের প্রথম প্রহরের ইতিহাস; আরেকদিকে মধ্যবিত্তমানসের রক্তাক্ত শিল্পভাষ্য বা দলিল হয়ে উঠেছে।

অপেক্ষা

শওকত আলীর *অপেক্ষা* (১৯৮৫খ্রি.) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত এক অনবদ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসের একদিকে রয়েছে রাজনীতি ও অর্থনীতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একাত্তরের জনযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা; তেমনি আরেক দিকে রয়েছে স্বৈরশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের দোর্দণ্ড প্রতাপ-প্রতিষ্ঠার চিত্র। একাত্তরের অভিঘাত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ধারক-বাহক এদেশের মধ্যবিত্তমানসে যে-স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আত্মত্যাগ-আত্মরতি, বিপ্লব-বিপন্নতা ও আদর্শ-আপসকামী প্রবণতায় রক্তক্ষরণ ও অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়– এসকল বিষয়কে লেখক অত্যন্ত বাস্তবমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন। তাই–'বিপন্ন বর্তমান এবং সম্ভাবনাশূন্য ভবিষ্যতের পদমূলে অপেক্ষমাণ যুবসম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদীর্ণ মানস–রূপ শওকত আলীর *অপেক্ষা* উপন্যাসের মৌল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।...শিক্ষা, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অব্যাহত বিশৃঙ্খলা বাংলাদেশের তরুণমানসকে যে- নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধে নিক্ষেপ করেছিলো, তার দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে পরম অনাসক্তিতে রূপায়িত করেছেন শওকত আলী।'[১২] আলী আকবরের অনুষঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও তদ্‌পরবর্তীকালের সংকট ও বিপর্যয়ের নানা প্রান্তসমূহ এ আখ্যানে গুরুত্ব পেয়েছে।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী আলী আকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। তার বাবা প্রফেসর আলী আফসার সাতচল্লিশের দেশভাগের অভিঘাতে অভিবাসী হিসেবে ছাপ্পান্ন-সাতান্ন সনে দিনাজপুরে এসে বাড়ি করেন। কিন্তু একাত্তরে এসে পুনরায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যূপকাষ্ঠে আকবরের বাবা, মা, ছোট ভাই ও বোন সুমিকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এপ্রিলের শুরুতে দিনাজপুর বর্ডার এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিমান হামলা হলে এবং নিজেদের গোলা বারুদ ফুরিয়ে গেলে যোদ্ধারা ট্রেঞ্চ থেকে সরে পরে। ফলে গোটা শহরের জনমনে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব জাগে। সন্ধ্যা বেলায় সকল মানুষকে শহরের ঘরবাড়ি ফেলে গ্রামের দিকে অথবা বর্ডার পার হয়ে ভারতে যাবার জন্য মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণা শোনার পরপরই–

> 'রাতের প্রথম দিকেই মানুষ হাতের কাছে যার যা সম্বল ছিল তাই নিয়ে পথে নেমে গেল। মেয়ে-পুরুষ, বুড়োবুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা সবাই তখন পথে, পশ্চিমের রাস্তা ধরেছে। কারণ ওদিকে প্রথমে নদী, তারপরই বর্ডার।'-[*অপেক্ষা*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৫ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬/পৃ.৩৪১]

শহরবাসী সবাই প্রাণ রক্ষার্থে রাস্তায় নেমে পড়লেও আকবরের বাবা বউ-বাচ্চা নিয়ে নিজ বাড়িতেই অবস্থান করেন। সহকর্মী আনসারুল হক ও প্রতিবেশী হাসান আব্দুল্লাহ পালাতে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন। কারণ হিসেবে আলী আফসার বলেন–'না, পালাব না। নিজের ভিটেমাটি বাড়িঘর ছেড়ে কেন পালাব? কতবার পালাব? একবার পালিয়ে এসেছি, আর না।' সাম্প্রদায়িক, অমানবিক ও ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দের রাজনীতির এ ঘৃণ্য খেলা দেখে তার মনে প্রচণ্ড জেদ, অভিমান আর ক্ষোভের জন্ম হয়। তাকে এ জেদের মূল্যও দিতে হয় খুব চড়া দামে। রাত কোনো মতে পোহালেও ভোর বেলায় এলাকাতে গাড়ি নিয়ে পাকবাহিনী এসে হত্যা, লুট, ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগের হলি খেলায় মেতে ওঠে। নিজেদের বাড়িতে পাকবাহিনীর আক্রমণের দৃশ্য দেখে চোদ্দ বছরের আকবর দৌড়ে পালায়। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন মানুষের কাছে বাবা-মা ও ভাই-বোনের খবর নিতে গিয়েও আকবর পারে না। আবার বয়স কম হবার কারণে ট্রেনিং নেবার পরেও অপারেশনে তাকে পাঠানো হয় না। এমনকী রেগুলার ফোর্সে রিক্রুটও করা হয় না। এভাবে

বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে দীর্ঘ আট মাস পর বাড়ি ফিরে আকবর ঘর-দরজা সব ঠিকঠাক পেলেও বাবা-মা, ভাই-বোনকে খুঁজে পায় না। বরং দেখতে পায়–

> 'উঠোনময় লম্বা লম্বা ঘাস। ঠিক মাঝখানে একটা কঙ্কাল। আর একটা রান্নাঘরের পাশে... ছোট সাইজের কঙ্কালটা ছিল পাঁচিলের পাশে। বৃষ্টিতে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে কঙ্কালগুলো শাদা হয়ে গিয়েছিল।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৪২]

দুটি কঙ্কালের কাছে পড়ে থাকা কাপড় ও সালোয়ার দেখতে পেয়ে আকবর মা ও বারো বছর বয়সী বোনের ধর্ষণের শিকার হবার বিষয়টি অনুমান করে। আর প্রাচীর ডিঙানোর সময় ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এরপর উঠানের মাঝখানে সবুজ ঘাসের ওপর সমস্ত কঙ্কাল, মুণ্ডু ও হাড়গুলো বিছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে বগুড়া মামার বাড়ি যায় । তারপর রাজশাহী হয়ে যায় যশোরে। কিন্তু বাড়িতে আর ফিরতে পারেনি। কারণ একদিকে তার বড় মামা ধারের টাকার জন্য মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় তাদের বাড়িটি ঢাকাবাসী কামাল উদ্দিনের কাছে বিক্রি করে দেয়। অন্যদিকে বাবা-মা ও ভাই-বোনদের হত্যার বিচার বা প্রতিশোধের অর্পিত দায়ও সে পালন করতে পারে না। নিজের অক্ষমতার বিষয়ে আকবর জানায়–

> 'মা-বাবা, ভাই বোন এদের মারা হয়েছে, তারপর খুনিদের চলে যেতে দেওয়া হয়েছে। আবার মাপও করা হয়েছে, সে কী করবে? কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সন্তান হিসেবে, ভাই হিসেবে তার দায় নেই? সেই দায়ের বোঝা সে কতকাল বয়ে বেড়াবে?' [*অপেক্ষা*/পৃ.৩৪৩]

দেশস্বাধীনের পর আকবর দেখতে পায়; সে শুধু নিকট স্বজনদেরকেই হারায়নি বরং সুবিধাবাদী-সুযোগসন্ধানী দালাল-রাজাকারদের দাপট-দৌরাত্ম্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মানেটাও মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে স্বজন হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে না। আবার মানবিক মর্যাদা নিয়ে লেখাপড়া করাটাও তার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। বগুড়া মামার বাড়ি, রাজশাহীর আশ্রিত জায়গীর বাড়ি ও যশোরে অবস্থানকালেও তাকে নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়। বিধবা ছোট মামীর সঙ্গে স্কুল শিক্ষকের পরকীয়া প্রেমের খবরাখবর সংগ্রহকারীর সন্দেহে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়। শেষ পযর্ন্ত পালিয়ে কোনোরকমে সে প্রাণরক্ষা করে। আবার নাটোরে ইন্টারমেডিয়েটে পড়ার সময় এক সহপাঠিনীর দুই ভাইবোনকে পড়ানোর বিনিময়ে দুবেলা খেতে পেতো আকবর। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেমপত্র আদান-প্রদানের মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাকে অপমান করে বিদায় দেয়া হয়। এতে তার বরাদ্দের দুই বেলার খাবারও বন্ধ হয়ে যায়। তাই ক্ষুধার জ্বালা মেটাতেই–

> 'স্কুলের টিফিনের সময় একখানা আখ খেয়ে সে দিব্যি সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছে। দুমুঠো কাঁচা চাল এবং কয়েক গ্লাস পানি প্রচণ্ড খিদেকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট বলে সে মনে করে। জল হোক, ছোলা হোক, মুড়িচিড়া হোক, মোট কথা খাদ্যবস্তু হলেই হলো।...রাস্তার ধারে ভুট্টা, আখ, টমেটো ইত্যাদির ক্ষেত, ফাঁকা মতো ক্ষেতে নেমে গেলেই হল।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৯০]

এভাবে ক্ষুধার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে আকবর স্কুল-কলেজের পড়া ভালোভাবেই শেষ করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়। স্কলারশিপের টাকা এবং প্রাইভেট পড়ানোর টাকাকে সম্বল করেই ঢাকা শহরের মেসে থেকে পড়াশোনা চালায় । একাশি সনে এম. এ শ্রেণির শেষ পরীক্ষা দিয়ে কলাভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আকবর জীবন পানে ফিরে তাকায়। পাঁচ-ছয় বছর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও ঢাকা শহরে থাকলেও তার তেমন কোনো অবলম্বন বা হিতাকাঙ্ক্ষী নেই। সহপাঠী শামিম আর আহসানের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। আর রাজনীতিতে বড় ভাই হিসেবে পরিচিত কামাল উদ্দিনের পার্টি-পত্রিকা *পদক্ষেপ* অফিসে আড্ডার জায়গা গড়ে ওঠে। আগস্টের মাঝামাঝি শিক্ষাজীবনের শেষ পরীক্ষার দিনেও আকবরকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। কারণ স্বৈরশাসনের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দেশের অপরাপর শিক্ষাঙ্গনের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীরা নকলের মচ্ছবে মেতে ওঠে। সহপাঠী হাসিব, হাসান সায়ীদ, মনোয়ার, রীনা, ডেইজি ও মাস্তান আজহাররা নকলে ভর করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়। অধিকাংশ শিক্ষকেরাও এ দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নকে মেনে নিলেও সায়ীদ সাহেব ও জব্বার সাহেবরা কঠোর হতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে 'বেঁটে বক্কেশ্বর' হিসেবে উপহাসের পাত্রে পরিণত হন। শেষ দিন বিধায় আকবর সহপাঠী মনোয়ার ও কবি জাহিদ আনসারীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করে। এরপর আফরিন ও সাজেদার সঙ্গে দেখা হলেও সে কিছুটা সঙ্কোচ নিয়ে কথা বলে। দুই বছর ধরে শামিমের সঙ্গে প্রেম করা আফরিনের জন্য তার মায়া জাগে। কারণ– 'শামিম আর আহসান...এই দুই বাউণ্ডুলেই পরীক্ষা বাতিল করে বসে আছে। একজন এক পেপার দিয়ে। আর একজন তিন পেপার দিয়ে। একজনের রাজনীতি...আর অন্যজনের স্রেফ আলসেমি।' শামিমের এ পরীক্ষা না দেবার কারণেই আফরিনের বিয়ে ও সংসার বাঁধার স্বপ্ন-পরিকল্পনা

আটকে যাবে–এ কথা ভেবেই আকবর এ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি ব্যথা অনুভব করে। তবে শামিম বড়লোক লঞ্চ-মালিকের ছেলে হওয়ার দরুন সে এরকম দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয়ও দিতে চায় না। 'একদিনও তো গেলেন না।...আপনি কি ঢাকাতেই থাকবেন?'–সাজেদার এমন এক আহ্বান আর জিজ্ঞাসাকে মনে ধারণ করে আকবর একা একা দাঁড়িয়ে থাকে। নিস্তরঙ্গ জীবন আর নির্লক্ষ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কেবলি মনে হয়–

> 'অন্যেরা কেউ বাড়ি যাবে, আপন জনের কাছে চিঠি লিখবে কেউ কেউ, কারো আবার প্রেমিকা আছে, অর্থাৎ কোনো-না-কোনো রকম হিসেব আছে প্রত্যেকেরই। শুধু তারই কোনো হিসেব নেই।...সম্মুখের দিকটা তার একেবারেই ফাঁকা।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৬৫]

আকবরের জীবনের কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা না থাকার পেছনে দায়ী তার একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা আর উন্মূলিত অবস্থা। তার বাড়ি, আপনজন, আত্মীয়-স্বজন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী না থাকার কারণে জীবনের উদ্যম আর আগ্রহ সে হারিয়ে ফেলে। তাই সে সকাল-সন্ধ্যা দুই টিউশনি-নির্ভর রুটিনমাফিক জীবনকেই বেছে নেয়। 'বাইরের মানুষ সে, বাইরে থেকেই বিদায় এবার'–বলে সে মেসে ফিরে। কিন্তু পড়াশোনা না থাকায় দুপুরের দীর্ঘ অলস সময় আকবরের কাটতে চায় না। আড়াইশো আড়াইশো মোট পাঁচশো টাকার দুই প্রাইভেট পড়াতে পড়াতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। আবার মেসের রুমমেট এজি অফিসের চাকুরে দাউদকান্দির মহীউদ্দিন সাহেবের ছকবাঁধা জীবন দেখেও সে হতাশ হয়। অন্যদিকে পার্টির পত্রিকা *পদক্ষেপ*-এর অফিসে গিয়ে বন্ধু শামিম ও আহসানের সঙ্গে দেখা করতেও আগ্রহ জাগে না। আসলে–

> 'কোথাও তার যাবার জায়গা নেই এবং কোনো জায়গা থেকে যে তাকে ফিরতে হবে কোথায়ও– তাও তার মনে হয় না। নিজেকে এমন বিশ্রীরকম আলগা আর বিচ্ছিন্ন আগে কখনো তার মনে হয়নি।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৬৯]

দুটি প্রাইভেট পড়িয়ে আর রাস্তার দেয়ালে লাগানো বিনামূল্যের পেপার পড়ে আকবরের দিন কাটে। কিন্তু প্রাইভেট ছাত্রী পুতুলের ইংরেজি নোটখাতা মেসে নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে ছাত্রীর মায়ের অপমানজনক ব্যবহারে আড়াইশো টাকার মায়া করেও তা শেষপর্যন্ত তাকে ত্যাগ করতে হয়। অথচ নিজের পেটের চিন্তা না করে আকবর পার্টির প্রয়োজনে চাঁদপুর-কুমিল্লা-চাটগাঁও যাওয়া নিরুদ্দেশ বন্ধু শামিমের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। শহীদুল্লাহ হলে গিয়ে শামিমদের গ্রুপের বাবুলের কথায় সে হতাশ হয়। তাই কয়েকদিন পর শামিমকে কাছে পেয়ে আকবর বলে–

> 'তুই কাদের নিয়ে রাজনীতি করিস? এ কেমন রাজনীতি যে একজন কমরেডের বাড়িতে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ জিইয়ে রেখে লোক আনন্দ পায়?...এভাবে জোড়াতালি দিয়ে কতদিন চলবে? যা নিজের শক্তিতে চলে না, তাকে জোর করে চালানো কেন, বাদ দে।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৮৩]

জবাবে শামিম সরাসরি কোনো উত্তর দিতে পারে না। কারণ স্বৈরশাসনের প্রশ্রয়ে দেশের সর্বস্তরের মতো রাজনীতিতেও দুর্বৃত্তায়ন ও পেশীশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। তাই শামিম জানায়–'পার্টি যদি এই মুহূর্তে সত্যি সত্যি ভাগ হয়ে যায়, তাহলে দুই গ্রুপের মধ্যে শুরু হবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ...তাতে আমাকেও একটা পক্ষ নিতে হবে–তাই কি চাস, আমি খুনোখুনির মধ্যে জড়িয়ে পড়ি?' আকবরের বুঝতে বাকি থাকে না যে-শামিম এখন–'বাঘের পিঠে সওয়ার।' তারপরেও দেশের চলমান রাজনীতির হিংস্রতা আর নোংরামি সম্পর্কে সতর্ক করতে সে বলে–

> 'ঘোড়ার ডিম করিস তোরা। তোরা যে কী করিস নিজেরাই তা জানিস না। ছিলি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, মাঝখানে হয়ে গেলি ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাট, তারপর আবার কম্যুনিস্টদের তত্ত্ব এনে হাজির করলি... যে রাজনীতিতে নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, যে রাজনীতিতে মানুষকে অহেতুক মারা পড়তে হয়, সে রাজনীতিতে তুই থাকিস না।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৮৪]

স্বৈরশাসনের পাপ-পঙ্ক শুধু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেই কলুষিত করেনি বরং সেই সঙ্গে সমাজরূপান্তরমূলক মেহনতি মানুষের কল্যাণে গড়া বামরাজনীতিকেও আদর্শচ্যুত করে। বন্ধুর এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আকবর নিজের দিকে খেয়াল না করায় মাসের শুরুতে মেসে থাকা-খাওয়া নিয়ে বেশ জটিল আর বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয় । কারণ মেসের প্রথম সপ্তাহে খাওয়া বাবদ পুরো চারশো টাকা জমা দিতে হয়। কিন্তু আকবর হাতখরচ বাবদ পঞ্চাশ টাকা রেখে দুইশো টাকা জমা দেয়। মেস ম্যানাজার মানিকগঞ্জের কুদরত উল্লাহ তাকে বিশ তারিখ পর্যন্ত সময় দিলেও সে দুইশো টাকা যোগাড় করতে পারে না। বাধ্য হয়ে আকবর ঢাকা শহরের সমস্ত স্কুল চষে বেড়ালেও কোনো চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে না। কারণ প্রভাবশালী মানুষের তদবির ছাড়া তকদির খোলার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই মন না চাইলেও অনেকদিন পর সে পার্টির বড় ভাই কামাল উদ্দিনের *পদক্ষেপ* অফিসে যায় এবং নিজের সমস্যার কথা খুলে বলে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ

কামাল উদ্দিন ঝামেলা ও ব্যস্ততার অজুহাতে তা এড়িয়ে গেলেও আকবর এ অফিসে রোজ যাতায়াত করে। কারণ এখানে বসে সে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত পাঠায় এবং বন্ধু আহসান, হুমায়ূন ও মাসুদের পরামর্শ মোতাবেক 'লেবাননের যুদ্ধ', 'ফিলিস্তিনের যুদ্ধ' ও 'তেলের মূল্যহ্রাস' এ বিষয়ে তিনটি লেখা প্রস্তুত করে। প্রথম দুটি লেখা *পদক্ষেপ* পত্রিকায় ছাপা হলে সে মনে মনে খুশি হয় এবং নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তোলার স্থির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হঠাৎ করে অর্থসংকটে *পদক্ষেপ* পত্রিকার প্রচার-প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে সে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এসময় ছাত্রফ্রন্ট ভেঙে আলাদা আলাদা বিবৃতি দিয়ে রাজনীতির অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। পার্টির পত্রিকা রক্ষা করতে চতুর কামাল উদ্দিন সাহায্যের জন্য প্রথমে ছাত্রনেতা শামিমকে ডাকেন। এরপর অর্থের যোগানদাতা হিসেবে পার্টনার করেন কালোবাজারি ফকিরচান্দ ব্যাপারী ও বিল্বমঙ্গল বাবুর মতো পুঁজিপতিদের। ফলে তিন সপ্তাহের মধ্যে *পদক্ষেপ* পত্রিকাটি পুনরায় চালু হয়। কিন্তু আকবরের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। মাঝে-মধ্যে বন্ধু আহসান তাকে দু-দশটাকা দিয়ে সাহায্য করে। দুপুর বেলা পত্রিকা অফিসের চা-বিস্কুট-সিঙ্গারা খেয়ে খুব কষ্টে দিন পার করে। তবে একসময় আহসানও– 'তুই অন্য সোর্স দ্যাখ, বাড়ি থেকে ক্যাশ আমি আর একটি পয়সাও পাব না' বলে নিজের অপারগতার কথা বলে। আবার টাকা জমা দিতে না পারায়–'আপনি খাবেন না, শুধু থাকবেন, এ কি হয়?' বলে মেস ম্যানাজার তাকে সতর্ক করে । জীবন ক্রমশই জটিল আবর্তে জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আকবর নিজেই নিজেকে বলে–

> 'এবার আলী আকবর, দ্য মোস্ট কনফিডেন্ট ম্যান, কী উপায় হবে তোমার? মানুষের জীবন কোথায় বাঁধা থাকে হে, ভেবে দেখেছো কখনো?... প্রেমে, নাকি বন্ধু-সংসর্গে, নাকি স্রেফ বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায়? কোথায় বাঁধা মানুষের জীবন? নাকি আড়াইশো টাকার টিউশনিতে?'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৮৯]

এর কোনো সদুত্তরও সে দিতে পারে না। এসময় সের তিনেক খবরের কাগজ বিক্রির টাকা দিয়ে সে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করে। দুপুরে বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণে চা-বিস্কুট, সন্ধ্যার সময় প্রাইভেট ছাত্র জামিলদের বাসার চা-নাস্তা এবং রাতের বেলা মেসে ফেরার পথে দুই টাকায় কেনা 'বেশ ফোলানো-গোলগাল' বনরুটি খেয়ে দিন কাটায়। এভাবে কতদিন চলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে আকবর কুলকিনারা খুঁজে পায় না। তবু পেটের ক্ষুধাকে সে ভয় পায় না। কারণ–

> 'পেটকে শায়েস্তা করার নানান উপায় তার জানা। সে জন্যে ভয় তার খিদেকে নয়। ভয় অনিশ্চয়তাকে, ভয় উদ্দেশ্যহীনতাকে, ভয় ঝুলে থাকা অবস্থাকে।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৯০]

জীবনের নির্লক্ষ্য অবস্থায় পড়ে আকবরের ' ঘেন্না ধরে নিজের ওপর।' আবার *পদক্ষেপ* পত্রিকা অফিসে গেলে বন্ধু আহসান ও হিতাকাঙ্ক্ষী মাসুদ-হুমায়ুনদের করুণার দৃষ্টি ও 'কোনো বড়লোক বাড়িতে হাউসটিউটর' হবার পরামর্শকেও তার ভালো লাগে না। তাই কয়েকদিন পত্রিকা অফিসে না গিয়ে বরং গোপীবাগের মোড়ে রাস্তার দেয়ালে লাগানো ইত্তেফাক পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন পড়ে আর 'গৃহশিক্ষক চাই' তার খোঁজখবর নেয়। এ সময় শামিম তার মেসে এলে সে তাকে পড়াশোনা শেষ করে বাবার ব্যবসায়ে মনোযোগ দিতে এবং পরিবারের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে সজাগ হবার তাগিদ দেয়। অযথা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে চেঁচালেই কি আর ইনকিলাব হয়ে যাবে?'– বলে বিদ্রূপ করে। কিন্তু বামপন্থী নেতা শামিম ঠাট্টার সুরে হলেও আকবরকে বলে–'যার যা করণীয় সেটা কি কেউ করে? তোর নিজের কী করণীয় সেটা ভেবে দ্যাখ আগে।' জবাবে আকবর–'আমার কিছু করণীয় নেই। কখনো ছিল না' বলে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিন্তু শামিম তার বাবা-মা, ভাই-বোনের হত্যার প্রতিশোধ নেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে রাগের সুরে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলে–

> 'আমাদের কিছু করার পথে তো তোরাই বাধা। তোদের হাতে অস্ত্র ছিল, ক্ষমতা ছিল, যুদ্ধের পরে তোরা খুনিদের পাহারা দিয়ে রাখলি প্রথমে, তারপর চলে যেতে দিলি– শেষে খুনিদের দোসর যারা ছিল কিংবা ছিল তোদের দিককার খুনি, তারাই সর্বত্র জাঁকিয়ে বসল।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৯৫]

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দালাল-রাজাকার ও সুযোগসন্ধানীদের প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং পঁচাত্তর-পরবর্তী পর্যায়ে স্বৈরশাসনের প্রশ্রয়ে এবং কিছু বিপ্লবী সংগঠনের স্বার্থের কারণে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলো সমাজে পোক্তভাবে পুনর্বাসিত হবার সুযোগ পায়। যার ফলে আকবর তার বাবা-মা, ভাই-বোনের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে না, নিজের বাড়ি দখলে নিতে পারে না, এমনকী সুস্থ-স্বাভাবিক-সংসারী জীবনেও ফিরতে পারে না।

রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন, শিক্ষাঙ্গনের মতো সকল পর্যায়ে অব্যাহত দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কারণে আকবর ও শামিমের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। শামিম প্রেমিকা আফরিনের বিয়ের খবর জানালে আকবর রীতিমতো অবাক হয়। শামীম এম.এ পরীক্ষা জন্য তার হ্যান্ডনোটগুলো চেয়ে নেয় এবং যাবার সময় কতগুলো দশটাকার নোট বের করে– 'তোর দরকার থাকলে এগুলো রাখতে পারিস' বলে এগিয়ে ধরে। কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না। বরং 'শামিম তুই ভেঙে পরিস না–জীবনে বহু রকমের ভাঙচুর হয়, আমাকে তো দেখছিস?'– বলে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় জানায়। আকবর তার নিজের চিন্তা-চেতনা দেখে নিজেই অবাক হয়। কারণ হিসেবে সে নিজেকে বলে–

> 'টাকাটা সে ধার হিসেবেও নিতে পারতো। তাছাড়া মানুষের কাছ থেকে সে কখনো কিছু নেয়নি এমনও তো নয়।...দুরবস্থা মানুষকে বোধ হয় জেদি করে তোলে।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.২৯৭]

এসব দেখে মেসের রুমমেট মহীউদ্দিন সাহেব ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন–'ভায়া হে, তোমার কপালে বহু দুঃখ আছে। তোমার হিসেব কোনোদিনই মিলবে না। মেসের লোকদের সাহায্য নিতে তোমার আপত্তি নেই–কিন্তু যত দোষ করলো এ বড়লোক বন্ধুটি? এ সেন্টিমেন্টের কোনও অর্থ হয় না।' এ মহীউদ্দিন দয়াপরবশ হয়ে নিজের গেস্ট হিসেবে আকবরকে মেসে থাকার ব্যবস্থা না করলে তার রাস্তায় নামা ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। মুখে বকাঝকা করলেও মহীউদ্দিনই তাকে বাঁচার অবলম্বন হিসেবে খিলগাঁও এলাকায় চারশত টাকার এক প্রাইভেটের ব্যবস্থা করে দেন। যা আকবরের কাছে আকাশের চাঁদ পাবার মতো মনে হয়। মহীউদ্দিন মতিঝিলের সরকারি কোয়ার্টারে তার পশ্চিবঙ্গের পূর্বপরিচিত বন্ধু শাহজানের স্ত্রী সাবিহার বাসায় নিয়ে যান। কলকাতায় পড়াবস্থাতে এ শাহজাহান মহীউদ্দিনের বাড়িতে বেড়াতে আসেন এবং সাতচল্লিশ-পরবর্তী ডামাডোলের সুযোগে বন্ধুর প্রেমিকাকে বিয়ে করেন। সরকারি চাকুরে হিসেবে শাহজাহান সাবিহাকে নিয়ে ঢাকা আসেন। কিন্তু স্ট্রোক করে বিছানায় পড়ে যাওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে-মেডিকেলে-কলেজে-স্কুলে পড়ুয়া চার সন্তানকে নিয়ে সাবিহার জীবন-সংগ্রাম শুরু হয়। কুশল বিনিময়ের সময় পাশের ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসায় আকবরের মনে হয়–

> 'একটা লোকের মুখ বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তার গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করা হচ্ছে। নাটোরের কথা মনে পড়ে, রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে এরকম আওয়াজ বেরিয়ে আসতো মধ্যরাতে।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩০০]

তারপরেও আলী আকবরের কাছে এ গোঙানিকে অর্থহীন মনে হয় না। কারণ অস্পষ্টভাষায় চিৎকার করে শাহজাহান সাহেব বলে চলছেন–'সইবে না–এ পাপ সইবে না–বন্ধু হয়ে বন্ধুর এমন সর্বনাশ করলে তুমি– তোমাকে আমি খুন করব।' এসব শুনে তার আশ্চর্য লাগে। সুন্দর ফর্সা সাজগোজ করা মধ্যবয়সী সাবিহাকে নিয়ে হাসিখুশি মহীউদ্দিনের বেড়ানোর কথা বলে বেরিয়ে যাওয়াতে আকবরের মনে সন্দেহ জাগে। ঘরের ভেতরটাকে তার বেশ গুমোট মনে হয়। তখনোও পাশের ঘর থেকে অনবরত গোঙানির শব্দ ও নানা অভিযোগ ভেসে আসে। ইতঃপূর্বে মহীউদ্দিনের রুটিন মাফিক প্রতিদিন বিকেল বেলা সাজগোজ করে খোশ মেজাজে বের হবার ঘটনা মনে পড়ায় তার সন্দেহটা দানা বেঁধে ওঠে। তার মনে হয়–

> 'ঐ বাড়িতে একটি লোক আছে যে খালি গোঙায়। এ বাড়িতে আবার সুন্দরী মেয়েছেলে আছে দুটি। একটি মা অন্যটি মেয়ে। পাবিারিক বন্ধু এলে ঐ বাড়ির মেয়েদের বাইরে বেড়াতে বেরুতে হয়। শুধু কি মেয়েদেরই বেরুতে হয়? মা কে বেরুতে হয় না?'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩০২]

অর্থাৎ সংসারের চাকা সচল রাখতে এবং বড় ছেলের মেডিকেল পড়া শেষ করতেই মূলত সাবিহা পাপের পথে পা বাড়ায়। আর এ সুযোগটি পুরোদমে মহীউদ্দিন সাহেব লুফে নেন। যদিও মহীউদ্দিন পরে কৈফিয়তের সুরে বলেন–'খারাপ ভাবতেই পারো তুমি সাবিহাকে, খারাপ আমিও ভাবি। কিন্তু চিন্তা করে দেখো, কেমন একটা দুঃসময় পার হচ্ছে ওর।...চার বছর পর ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে যাবে–তখন কি আর কেউ পুরনো কথা স্মরণ করবে?'। এসব পাপ-পতনের বিষয়গুলো ঘুরে ফিরে আকবরের মনে আসাতে সে দ্রুত বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামে।

কামাল উদ্দিন নিজ প্রচেষ্টায় ও বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে তার *পদক্ষেপ* পত্রিকাটি পুনরায় জোরেশোরে প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে পত্রিকা অফিসের অবকাঠামো ও আসবাবপত্রে জৌলুস আনা হয়। বিভিন্ন পদে বহু কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হলেও আকবরের চাকরিটা হয় না। যদিও সবাই বলা বলি করে 'আলী আকবরের পদক্ষেপে চাকরি হওয়াটা মাত্রই আনুষ্ঠানিকতার

ব্যাপার'। কারণ কামাল উদ্দিন তার দেশের লোক, ভাইয়ের বন্ধু ও বাবার ছাত্র। তাছাড়া কামাল সাহেব তাকে 'ছোটভাই' বলে সবার কাছে পরিচয়ও করিয়ে দেন। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতেও একসময় সে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। কারণ কামাল উদ্দিনের মতো হিসেবি লোক তাকে 'খুব কাছে আসতে দেন না' আবার দূরেও ঠেলেন না। এমন এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আকবর এক ধরনের বোঝাপড়া করতে কামাল সাহেবের মুখোমুখি হয় আর বলে–

> 'আমাকে পদক্ষেপে চাকরি দিন, চাকরি আমার খুব দরকার।...সাংবাদিকতাই আমি করবো।...আমি সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কিছু করবো না।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩০৭]

কামাল তার স্বভাবসুলভ চাতুর্যের মাধ্যমে বলেন–'সাংবাদিকতা খুব খারাপ জিনিস, সর্বক্ষণ সত্যকে টুইস্ট করা হচ্ছে, খবরের কাগজ শেষে তোমার খারাপ লাগবে। আমি তো তোমার টেম্পারামেন্ট জানি।...কাজ শেখো আগে।...তোমার রেজাল্ট বার হোক, দেখবে তুমি নিজেই অন্যকিছু করার কথা ভাবছো–সাংবাদিকতার মতো নচ্ছার কাজ পৃথিবীতে দুটো নেই। আমি বলি কি, এ লাইনে তুমি এসো না–কী দরকার? তোমাকে আমি চিনি–আমি চাই তুমি শিক্ষকতা করো'। এমন প্রতারণার মাধ্যমে কামাল তাকে পদক্ষেপে চাকরি নিতে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু আকবরও ক্ষোভের সঙ্গেই বলে–

> 'কেন আমাকে নেবেন না; সেটা নিশ্চয়ই বলবেন, আমার কি যোগ্যতা নেই?'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩০৮]

জবাবে কামাল সাহেব বলেন–'আমি ভাই তোমাকে *পদক্ষেপে* চাকরি দিতে পারবো না। আসলে তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা সম্পর্ক আছে, সেটাই সমস্যা।...যদি তুমি পদক্ষেপে'র সঙ্গে যুক্ত হও, তাহলে তুমি স্বভাবতই নানা প্রসঙ্গে কাগজের পলিসির ব্যাপারে মতামত দিতে আরম্ভ করবে, কখনো কখনো অ্যাডমিনস্ট্রেশনে নাক গলাবে আর তাতে দুজনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্টও হয়ে যেতে পারে।...ওদের আমি ইচ্ছে করলে তাড়িয়ে দিতে পারব, কিন্তু তোমার বেলায় কি তা সম্ভব বলো'? আসলে তিনি তার স্বার্থ ও একক প্রভুত্ব বজায় রাখতেই চার-পাঁচ বছর ধরে আশা দিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত আকবরকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্পর্কে তাকে আহসান বলে–

> 'তোর সম্পর্কে তাঁর (কামালের) সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়ে গিয়েছিল জানিস?...যেদিন তুই কাগজের পারমিটের জন্যে দরখাস্ত করলি সেই দিন।...প্রথম প্রথম যখন পরিচয় হয়েছে, তোকে নিয়ে একদিন কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর হেড অফিসে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, মনে নেই? সাফারার ফ্রিডম ফাইটার বলে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিলেন তোর নামে–আর তুই খুব রাগারাগি করছিলি–ভুলে গেছিস?'-[অপেক্ষা/পৃ.৩০৯-৩১০]

অর্থাৎ 'ভয়ানক সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর এবং বিশ্বাসঘাতক'–কামাল উদ্দিন প্রথমে বামরাজনীতি করতেন। কিন্তু পঁচাত্তরের অভিঘাতে দল ভাঙাগড়ার সময় তিনিও দল বদল করেন এবং খুব কৌশলে দলের মুখপত্র হলেও নিজের নামে ডিক্লেয়ারেশন নিয়ে পত্রিকার কাগজ বের করেন। কাগজের পারমিটসহ নানা বিষয়ে সুবিধার জন্য নিজ এলাকার পূর্ব পরিচিত সহজ-সরল-অসহায় আকবরের নামে 'ভুক্তভোগী মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট' বের করে কাজ শুরু করেন। সেদিনের কথা আকবরের পুরোটাই মনে পড়ে। তার নিজের নামে পারমিট আর কামালের নামে লিডারশিপ বের করা হয়। দরখাস্ত করার সময় চতুর কামাল তাকে বলেছিলেন–

> 'আমি তো কাগজ নিয়ে আর ব্যবসা করতে যাচ্ছি না– পত্রিকার জন্য যতটুকু লাগবে, ততটুকুই আমি নেব–তুমি ইচ্ছে করলে কাগজের বাকি অংশটার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে পারো।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩১০]

অথচ কাগজের ব্যবস্থা নেবার মতো সময় ও সুযোগ কোনোটিই আকবরকে তিনি দেননি। বরং তার অজান্তেই প্রথম প্রথম কয়েক মাস সই নিলেও পরে আর নিতেন না। এমনকী পারমিটের চেহারাটাও দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। এভাবে তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পুরোটাই কামাল সাহেবে গলধঃকরণ করেন। ফলে তার মতো চালচুলোহীন অসহায়-সরল মানুষকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করে পরবর্তীকালে খড়কুটোর মতো ছুঁড়ে ফেলতেও তার কোনো সংকোচ হয়নি। বিকেলে প্রাইভেট পড়াতে গেলে ছাত্র জামিলের সিঙ্গাপুর প্রবাসী মামা বেনু তার বিয়ের কার্ড দেখালে আকবর মর্মাহত হয়। কারণ পাত্রী সাদিয়া আফরিন তার সহপাঠিনী এবং বন্ধু শামিমের প্রেমিকা। বেনুর সঙ্গে বিয়ের দিন ধার্য হবার তথ্য জেনে সে সোজা আফরিনদের বাসায় যায়। সে বিয়ের কথা তুললে আফরিন তার প্রেম ও প্রেমিক সম্পর্কে বলে–

> 'একজনের খেয়াল খুশির উপকরণ আমি হতে চাই না, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না–ওই থাকতে দেয়নি, শেষে গোটা ব্যাপরটাই আমি বাদ দিয়েছি...আমার আর উপায় ছিল না; গত তিন বছর ধরে আমাদের জানা শোনা, কিন্তু ব্যাপারটা

> সে ওর বাবা-মায়ের কাছে শেষপর্যন্ত বলতে পারেনি–ওর খালি পলিটিক্স, ওর পলিটিক্স শেষ হবে, তারপর ও পরীক্ষা দিয়ে পাস করবে, তারপর বাবা-মাকে বলবে, তারপরে আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে–আমি কি গাছ পাথর, নাকি জায়গা জমি?-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩১৫-৩১৬]

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আশির দশকের নষ্ট সমাজ ও নষ্ট রাজনীতির বিষবাষ্পে দগ্ধ ছাত্রনেতা শামিমের বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত জীবনেরই স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। কারণ এ নষ্ট রাজনীতি করতে গিয়েই শামিম পরীক্ষা দিতে পারেনি, জীবন গড়তে পারেনি, পরিবারের দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার প্রেমিকাকে দেয়া প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করতে পারেনি। তাই এমন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক শামিমের ওপর আফরিনও আর ভরসা করতে পারেনি। ফলে নিজ হাতে প্রেমকে কণ্ঠরোধ করে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় অন্য পাত্রের সঙ্গে বাবা-মায়ের ঠিক করা বিয়েতে সে রাজি হয়। কারণ সমকালীন সমাজ নারীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলেও একাকী স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের কোনো স্বীকৃতি দেয়নি। তাই সে আঁচলে মুখ ঢেকে বলে–'আপনি আমার দোষটাই দেখছেন শুধু, আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবছেন না। ভবিষ্যৎ তৈরি করতে নিজে পারলাম না, কিন্তু বাবা-মা যে-ব্যবস্থাটা করেছেন, সেটা আমি কোন যুক্তিতে ঠেকাব বলুন?...প্লিজ আমার কোনো ক্ষতি করবেন না।' রাতের ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মর্মাহত আকবরের মনে কেবলি উদয় হয়–

> 'জীবন তাহলে এরকমই।...এরই নাম তাহলে প্রেম। একবার ব্যর্থ হলেও ফের মাথা তুলে দাঁড়ায়।...জীবনের চূড়ান্ত বলে কিছু নেই। অতীতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়াটাই আসল। প্রেমে, পাপে,পতনে–সব ক্ষেত্রেই এক ব্যাপার ঘটছে।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩১৭]

চারপাশে একধরনের গুমোটভাব, রাজনৈতিক উত্তেজনা আর বন্ধু-বান্ধবদের জীবনের ব্যর্থতার পরিসংখ্যান দেখে আকবর হতাশ হয়। তবে সহপাঠিনী অসুস্থ সাজেদাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে দেখতে গিয়ে ধীরে ধীরে এক প্রেমময় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আকবরের চাল চুলোহীন অবস্থা জানার পরেও মৃত মুনসেফ বাবার সুন্দর-স্বাস্থ্যবতী মিষ্টি চেহারার মেয়ে সাজেদা এ প্রেমকে অঙ্কুরিত হয়ে পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হবার সুযোগ দেয়। সাজেদার মায়ের স্নেহের সংস্পর্শ পেয়েও তার মনে নিজের মায়ের স্মৃতি জেগে ওঠে। তার মনের মধ্যেও ছেলেবেলার মতো–'মা কি তাদের বকে? খুব রাগ করে? শীতকালের পিঠে তৈরি করে দেয়?' এরকম নানা প্রশ্ন ও আত্মজিজ্ঞাসা ভর করে। একবার কথা প্রসঙ্গে 'গ্রামে আপনাদের বাড়ি আছে'? সাজেদার এ প্রশ্নের জবাবে সে জানায়–'গ্রামে কেন, কোনো জায়গাতেই আমার বাড়ি নেই।' কিন্তু সাজেদা এর প্রতিবাদ করে। 'আমার বাড়িঘর নেই– তবু বলব আছে?'– আকবরের একথার পরিপ্রেক্ষিতে সাজেদা বলে–

> 'এ জন্যে বলবেন যে, ভবিষ্যতে বাড়িঘর, সংসার সমস্ত কিছু আপনি তৈরি করবেন। বলবেন হ্যাঁ,আমার বাড়ি আছে, পুকুর আছে, আমবাগান আছে, জায়গা জমি আছে–মানুষের যা যা থাকতে হয়, সমস্ত কিছু।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৩৮]

অর্থাৎ সাজেদা আকবরকে জীবনের শূন্যতাজাত নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনাকে ঘুরিয়ে জীবনের পূর্ণতা ও সদর্থক উত্থানকে ইঙ্গিত করে। ফলে সাজেদার সঙ্গে মিশতে মিশতে আকবরও তার নিস্তরঙ্গ জীবনে এক নূতন সুর-ঝংকার ও চেতনা উৎসের সন্ধান পায়। যার জন্য তার মনে হয়–

> 'ভেতরকার সেই বহুকালের চাপা-পড়া ছেলেমানুষি স্বভাবটাকে সাজেদা কেমন অবলীলাক্রমে বের করে আনতে পারে। শুধু সাজেদাকে নয়, সেই সঙ্গে যেন তার নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার।'-[*অপেক্ষা*/ পৃ. ৩৩৬]

এভাবে আকবর তার অন্তঃকরণ সম্পর্কে সজাগ ও সচেষ্ট হয়। নিজের অক্ষমতা-অসহায়ত্ব সম্পর্কে তার ঘৃণা ধরে। তাই বলে–

> 'আমার বাবা-মা ভাই-বোন সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। আমার উচিত ছিল প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়া। কিন্তু আমি পারিনি। উচিত ছিল খুনীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করা– আমি সেটিও পারিনি– বলুন, আমি কাপুরুষ নই? ভিতু নই?'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৪০]

এ জন্যেই তাকে কেবল জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মানুষের কাছে ছোট হতে হয়েছে এবং আনত ভাব-ভঙ্গি পোষণ করতে হয়েছে। কৈশোরে ভেবেছিল বড় হয়ে, পড়াশোনা শেষ করে সে স্বজনদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু যতই বড় হয়েছে ততই তাকে আপস করে নত আর ছোট হয়েই চলতে হয়েছে। তাই আকবর

বলে–'আমি ভেসে রইলাম শুধু, কোথাও যুক্ত হলাম না, শিকড় ছড়ালাম না। নিজেকে আলোর দিকে বাতাসের দিকে বৃহতের দিকে নিয়ে যেতে পারলাম না।' এরকম পরিস্থিতিতেই কামাল উদ্দিনের *পদক্ষেপ* অফিসে শামিম ও আকবরদের ডাক পড়ে। কারণ *পদক্ষেপ* পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ফকির চান্দ ব্যাপারি ও বিল্বমঙ্গল চৌধুরীদের চোরাকারবারির রিপোর্ট ছাপা হওয়াতে কামাল উদ্দিনের সঙ্গে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সরকার দলীয় ছাত্ররা এ পত্রিকা পুড়িয়ে দেয়। ফলে কামাল নিজের প্রভাব-প্রতাপ ঠিক রাখতে *সুপ্রভাত* নামক এক জাতীয় দৈনিক প্রকাশের কথা বলেন। আর স্বভাবসুলভ চাতুর্য দিয়ে চাকরির লোভ, কাজের স্বাধীনতা আর দেশপ্রেম তথা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মতো নীতি-আদর্শের টোপ দিয়ে ছাত্র ও নেতাকর্মীদের সাহায্য চান। এমনকী কাজ শুরু করারও তাগিদ দেন। এতে আহসান ও শামিম প্রথমে খুব উৎসাহ দেখায়। কিন্তু আকবর নীরব থাকায় শামিম খানিক পরে জানায়–

> 'ভদ্রলোক কিন্তু বারবার আমাদের ব্যবহার করে চলছেন। আমাদের ব্যবহার করে পদক্ষেপ বার করলেন, দাঁড় করালেন, এখন ফের আমাদের ব্যবহার করবেন এবং দৈনিক কাগজের মালিক হবেন।...অথচ আমরা জেনে শুনেও নিজেদের ব্যবহার করতে দিচ্ছি; আমরা যদি না দেই, তাহলে অন্যেরা দেবে। মোট কথা তিনি আমাদের ব্যবহার করবেনই– যেমন করে হোক, যেভাবে হোক নিজে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠে যাবেনই। আমাদের কিছু করার নেই।'–[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৩৪-৩৩৫]

শামিমের এ বক্তব্যের মাধ্যমে আশির দশকের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কূটকৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি ও আখের গোছানোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ নেতাদের স্বার্থের হিসেব-নিকেশের কারণেই বহু কোমলমতী সম্ভাবনাময় যুবকদের শ্রম-ঘাম, জীবন-যৌবনের অপচয় ঘটে এবং দলের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এসব কারণেই আহসানরা কামাল উদ্দিনের *সুপ্রভাত*-এ কাজ করতে রাজি হয় না। বরং কামাল উদ্দিন যে-মাত্র পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে নিজ কলেজ শিক্ষকের (আকবরের বাবার) বাড়ি কূটকৌশলে কিনে নিয়েছিলেন সে-বিষয়ে আহসানরা জানতে চায়। 'তুই কি সত্যি সত্যি কোনো দলিলে সই দিয়েছিস?'–আহসানের এমন প্রশ্নে আলী আকবর পূর্বে পদক্ষেপ পত্রিকার কাগজের পারমিট ও ডিলারশিপের জন্য বহু দলিলে তালে-বেতালে সই করার কথা জানায়। প্রথমে এ কথা শুনে হতাশ হলেও পরে সবাই মিলে উকিলের কাছে পরামর্শ করতে চায় এবং আকবরকে তার পৈতৃক বাড়ি উদ্ধারের জন্য জোর তাগিদ দেয়। কিন্তু সে অতটা আগ্রহ না দেখালে আহসান নিজেই তা বন্ধু মহলে প্রচার করে বেড়ায়। এতে বেশ সাড়া পাওয়া যায় এবং *পদক্ষেপ* অফিসের পরিবেশ সরগরম হয়ে ওঠে। এতে চতুর কামাল সাহেব স্বভাবসুলভকণ্ঠে যুবকদের ডেকে বলেন–

> 'কে বলল যে ও বাড়ি আমার? ও তো আলী আকবরেরই–একখানা দলিল অবশ্যি আমার কাছে আছে, কিন্তু ও দলিল যদি না থাকতো তাহলে কি বাড়িটা রাখা যেতো? তোমরাই বলো? আলী আকবর কি যাবে ও বাড়িতে? গেলে যাক, আমি ওকে দলিল ফিরিয়ে দিচ্ছি।'–[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৪৬-৩৪৭]

জ্বলন্ত আগুনে জল ঢালার মতো কামাল উদ্দিন নিজের বাকচাতুর্য দ্বারা ছেলেদের ঠাণ্ডা করে বিদায় দেন। তারা এটাও জেনে যায় যে- 'ও বাড়ির ওপর কেউ হাত দিতে পারবে না, কারণ খুব মোটা টাকায় ও বাড়ি ব্যাংকের কাছে বন্ধক আছে।' ফলে নিজের বেহাত ও বেদখল হওয়া বাস্তভিটা আকবর নিজ দলীয় নেতার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এসময় আকবর শামিম ও মুকুটকে বেশ রাগী আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থায় দেখে। কারণ শামিমের বিরুদ্ধে পার্টির ভেতর থেকে অর্থ-আত্মসাৎ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পার্টির ভেতরে ও বাইরে দারুণ উত্তেজনা চলছে। এ বিষয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মুকুট জানায়–

> 'হোক কাউন্সিল মিটিং–আমরাও তৈরি আছি– কোন্ শালা কত টাকা কার কাছ থেকে খেয়েছে, খেয়ে কোন আন্দোলন বানচাল করে দিয়েছে, সব তথ্য আছে আমাদের কাছে। রাজনীতি করি অথবা না করি, শালাদের ন্যাংটো করে ছেড়ে দেব।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৪৭]

মুকুটের এ কথার মাধ্যমে সমকালীন রাজনীতি ও দলের ভেতরকার ভাঙন, বিনষ্টি, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও অবক্ষয়ের চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে । স্বৈরাচারী শাসকের ভয় ও লোভের ফাঁদে পড়ে বহু নেতারা যে-টাকা খেয়ে নিজ দলের জমে ওঠা আন্দোলন ও কর্মসূচিকে বানচাল করে দিয়েছে– এ তারই ইঙ্গিতবাহী । শামীমদের ভবিষ্যৎ বিপদ আন্দাজ করে আকবর তাদেরকে ইমোশনাল না হয়ে, গোপন কথা প্রকাশ না করে এই মুর্হূতে সংঘর্ষে না জড়ানোর পরামর্শ দেয়। 'আসলে আমরা কি হেরে যাচ্ছি?'–শামীমের এ প্রশ্নের জবাবও আকবর সহসা দিতে পারে না। কারণ সেও দেখে আসছে–

> 'অসৎ, চালবাজ, সুযোগ-সন্ধানী আর ভণ্ড লোকেরাই শেষপর্যন্ত জিতে যাচ্ছে। কামাল ভাইদের মতো লোকদের কি কখনো অসুবিধা হয়? হয় না, বরং তারা কেবলি ওপরের দিকে উঠে যায় এবং এমন অবস্থা হয়তো হবে শিগগিরই, যখন তারা একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাবে।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৪৮]

অর্থাৎ চারদিকে ভণ্ড, সুবিধাবাদী, অসৎ আর নষ্ট লোকদেরই দাপট-দৌরাত্ম্য আর সাফল্যের জয়জয়কার চলে। যাদের অর্থ-বিত্ত, দাপটের কাছে আদর্শবান মানুষেরা টিকতে পারে না। আহসান আকবরকে জানায়–'আয় ফের আমরা ফুল টাইমার হয়ে যাই। রাজনীতি সবাইকে করতে হবে। সৎ মানুষ যদি রাজনীতি করতে আসে, তাহলে রাজনীতি থেকে বাজে লোকেরা বেরিয়ে যেতে বাধ্য হবে।' কিন্তু আকবর কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তবে সেও দুই-তিনজন ছেলেকে সঙ্গে করে ঢাকা-ময়মিনসিংহ ঘুরে আসে। মুকুট উত্তরবঙ্গ থেকে, বরুণ কুমিল্লা-সিলেট থেকে আর শামিমও খুলনা-যশোর থেকে দলীয় ওয়ার্কশপ করে ফিরে আসে। শামিম আগে কাউন্সিল করে সব বিরোধ মিটিয়ে পরে সম্মেলন করার পক্ষে মতামত দেয়। আর লেখালেখির কাজ করে আকবর শুধু সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতে চায়। অথচ পার্টির ভেতরকার গোলমালের বিষয়ে আহসান-মুকুটের কিছুতেই সন্দেহ দূর হয় না। নেতারাও এটা-সেটা বুঝিয়ে আসল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কর্মীদের শান্ত করতে চান। এ তাত্ত্বিক নেতারা সব সময়ই সুবিধাবাদী লাইন ধরে অগ্রসর হন। যা দেখা গেছে সাতান্ন সনে বামদলের বিভাজনের সময়েও। কারণ যে-অংশটি কখনোই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের বিষয়ে একটি কথাও বলেনি, নেতারা তাদের পক্ষেই থেকেছে। এরা একুশ দফা পাশ কাটিয়ে ছয় দফাকে সমর্থন করেও নিজ দলের কর্মীদের মাঝে আবার মার্কসীয় বিপ্লবী তত্ত্বের ছবক দিতেন। আর এদের বুদ্ধিতেই বিপ্লবী ক্যাডার বাহিনী গঠন করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে অন্য বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে খুনোখুনি শুরু করে। ফলে প্রতিক্রিয়াশীলরা আনন্দে বগল বাজায়। দলের পূর্ব ইতিহাস ঘেটে আহসানরা হতাশ হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার মাস্তান কাইয়ুম, মাসুম ও শামসুরা শামীম-মুকুটের সঙ্গে কথা বলতে এলে বাকবিতণ্ডা হয়। যা নিয়ে শামিম বিপদের আশঙ্কা করলেও মুকুট একে পাত্তা দেয় না।

এসময় আকবর সাজেদার সঙ্গে তার মাজু নানার বাড়ি বেড়াতে যায়। এ বাড়িতে পূর্ণ উপযোগী পরিবেশ পেয়েও আকবর সাজেদাকে চুমু খেয়েই নিজেদেরকে সংযত রাখে। 'বিয়ে হওয়াটা আমাদের সত্যিই দরকার।...তোমার নানা ভাই আমাদের বিয়েতে সাক্ষী থাকুন'– আকবর মুখে একথা বললেও তেমন উদ্যোগী হয় না। কারণ সে জানে–

> 'সংসার পাততে হলে শুধু টাকা থাকলেই চলে না। মানসিক প্রস্তুতিও দরকার হয়।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৬৪]

বিয়ে করার মতো মানসিক স্বস্তি ও প্রস্তুতি কোনোটিই আকবরের নেই। আবার মাজু সাহেবের–'ইয়ংম্যান নেভার রাশ আফটার এনেথিং, ঝাঁপ দিও না, অপেক্ষা করো' এমন কথাতেও সে হতাশ হয়। সব মিলিয়েই সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে–

> 'তাকে বিয়ের জন্যও তাহলে অপেক্ষা করতে হবে? প্রেমিকার সঙ্গে মিলনও কি সহজে হতে পারে না?...জীবন কি তাহলে চলছে না, স্বাভাবিকতার গতি কি তাহলে থেমে গেছে? স্রোতের প্রবাহ কি শুধু বিকারের, জীবনের নয়? বিশ্বাসের নয়? ভালোবাসার নয়?'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৬৫]

তারপরেও আকবর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে জীবনকে ও তার গতি-প্রকৃতিকে দেখতে চায়। নরম লোহা ভারি হাতুড়ির আঘাতে যেমন খাটো ও নিচু হয়, তেমনি সেও এ অবস্থা ছেড়ে তার জীবনের প্রসার ও বিস্তৃত হবার ক্ষমতা বা শক্তিকে দেখতে চায়। এসব চিন্তা করেই সে সাজেদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে খিলগাঁও বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াতেই সন্ধ্যার সময় বিধ্বস্ত চেহারার পপিকে দেখে বিস্মিত হয়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পপি জানায়–

> 'মুকুট নেই, মুকুট খুন হয়েছে।...শুধু মুকুট নয়...দুজনে এক রিকশাতে ফিরছিল, বিকেলবেলা–বিরোধী গ্রুপের কয়েকজন এসে হামলা করল– ছোরা দিয়ে–শামিম ভাই ঐখানেই–মুকুট।'-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৬৫-৩৬৬]

এ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনেই আকবর নিজের বুকে দড়াম দড়াম আঘাত অনুভব করে। সে কিছুতেই পা চালাতে পারে না।স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার ও হাহাকারও করতে পারে না। আবার কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও তুলতে পারে না। তার কী করা উচিত তাও নির্ণয় করতে পারে না। তবে শীতের তারা ভরা রাতের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বন্ধু শামিমের ফর্সা-হাস্যোজ্জ্বল মুখটি বার বার তার মনে পড়ে। তবে সে এ মুহূর্তে কিছু বলতে গিয়ে শামিম ও মুকুটের মতো ভুল করতে চায় না, যা শত্রুর কানে চলে যাবে। বরং সে এর জন্য দিন, মাস, বছর এমনকী প্রয়োজনে এক দশকও অপেক্ষা করবে। আর বন্ধুর স্মৃতিকে নিজের বাবা-মা, ভাই-বোনদের জমিয়ে রাখা স্মৃতির সঙ্গেই মিশিয়ে রাখতে চায়। কারণ–

‘ওর (শামিমের) তো আর শরীরী অস্তিত্ব থাকছে না। ও এখন স্মৃতি– স্মৃতিতে থেকেই এখন নিশিদিন ধিকিধিকি জ্বলবে–সপ্তাহ, মাস, বছর; সে জানে না, কতদিন। কিন্তু তীব্র প্রত্যাশা নিয়ে জ্বলবে। যেমন জ্বলে চলছে তার মা-বাবা আর ভাইবোনদের স্মৃতি। আলী আকবর ঐসব স্মৃতির পাশেই রাখলো বন্ধু শামিমকে এবং কখন ঠিক সময়ের মুহূর্তটি আসে, তার অপেক্ষায় রইলো।’-[*অপেক্ষা*/পৃ.৩৬৬]

অর্থাৎ আকবর যে-অপেক্ষা করতে চেয়েছে সে-অপেক্ষা কল্যাণের, সে-অপেক্ষা প্রতিশোধের, সে-অপেক্ষা সমাজ বদলের এবং সে-অপেক্ষা চূড়ান্তভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার। তাছাড়া এ অপেক্ষার মধ্যেও আগামীদিনের সত্য-সুন্দর-কল্যাণময় সমাজগঠনের যে-দৃপ্ত শপথের এক অঙ্গীকার রয়েছে– তা আলী আকবরের মাধ্যমেই লেখক পাঠক সমাজের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ ‘অপেক্ষা’ শব্দের বহুমাত্রিক অভিব্যঞ্জনা ব্যক্তি ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমাজ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক-সংকট উন্মোচনে প্রশংসনীয় সংযুক্তি। যার প্রণিধানযোগ্য ব্যবহার *যাত্রা*, *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, ত্রয়ী *দক্ষিণায়নের দিন* এবং এ *অপেক্ষা* উপন্যাসে দেখা যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়-স্বভাবকে অন্তরঙ্গ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শওকত আলী আজো প্রাসঙ্গিক।

অপেক্ষা উপন্যাসে দুটি বিষয়ের সংযোজন এ আখ্যানকে গতি দান করেছে। তা হলো একাশি সনের রাজনীতি ও সাংবাদিকতা। আলী আকবর এক সময়ে বিশ্ববিদ্যায়ের বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরে তা ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার বন্ধু শামিম, আহসান ও মুকুটরা এ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সমকালীন কংসরূপী সামরিক শাসকের অব্যাহত দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের ফলে সমাজকাঠামোর অপরাপর বিষয়ের মতো রাজনীতিও কলুষিত হয়ে ওঠে। এ নষ্ট রাজনীতির তাপ-চাপে বামদলের ভেতরেও বিভাজন, বিদ্বেষ আর দলাদলি চরমরূপ ধারণ করে। আর এ দলাদলির শিকার হয়ে নিজ দলের মাস্তানকর্মীদের হাতেই শামিম ও মুকুটদের মতো আদর্শবান ছাত্রনেতাদের জীবন দিতে হয়। অপর দিকে পার্টির নামে *পদক্ষেপ* পত্রিকা বের করেও তা ব্যক্তিস্বার্থে এর স্বত্ব-স্বামিত্ব ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ঘৃণ্য কূটকৌশলের চিত্রও সাবেক বাম নেতা কামাল উদ্দিনের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে। দলীয় আদর্শের কথা বললেও সে এ পত্রিকার জন্য অর্থ যোগানদাতা হিসেবে চোরাকারবারি ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মেলাতেও সংকোচবোধ করেনি। সবমিলিয়েই সমকালীন সমাজের এ দুটি বড় সংকটকে শওকত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মোহভাবে চিত্রায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয়-বিনষ্টি এবং শিক্ষাঙ্গনের সামূহিক নৈরাজ্যের বিষয়টিও তিনি এড়িয়ে যাননি।

আলী আকবর সমকালীন নষ্ট সময় ও সমাজের কাছে অনেকটাই পরাজিত ও আত্মসমর্পিত চরিত্র। এ নষ্ট সমাজ ও নষ্ট রাজনীতির দাপট-দৌরাত্ম্যের কারণে সে তার বাবা-মা, ভাই-বোনদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে না। আবার শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার মতো আদর্শ পেশাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে গিয়েও পারে না, বরং বলা যায় প্রতারিত হয়। অন্যদিকে নিকটজনের প্রতারণার শিকার হয়ে বাড়ি ও পত্রিকা ব্যবসায়ের মালিকানা বেহাত-বেদখল হয়ে গেলেও তার কোনো প্রতিকার করতে পারে না। ফলে তাকে দুটি টিউশনির টাকায় ভর করে, বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত এ বেকার, বিপর্যস্ত আলী আকরবকে অনেকটাই সল বেলোর *সিজ দ্য ডে*–র প্রধান চরিত্র টমি উইলহেমের মতো মনে হয়।[১৩] এরা দুজনেই উদ্যমহীন, বিশেষত্বহীন ও দুর্বলচিত্তের। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে অসহায় জেলে কুবের তার শোষণকারী শীতল বাবুর উদ্দেশ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে হলেও ‘হালা ডাকাইত’ বলতে পারলেও আলী আকবর তার বাড়ি ও ব্যবসায়ের মালিকানা দখলকারী পার্টির বড় ভাই ভণ্ড কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদও করতে পারে না। আবার প্রেমিকা সাজেদাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রেও জোরালো উদ্যোগ না নিয়ে বরং তার বদলে অপেক্ষা করাকেই শ্রেয় মনে করে।

অন্যদিকে সাবেক বামদল নেতা এবং পদক্ষেপ পত্রিকার সম্পাদক কামাল উদ্দিনের চরিত্রের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচণ্ড অভিলাষ তাকে শেষ পর্যন্ত নীতিহীন, ভণ্ড, প্রতারক ও দুর্বীনিত করে তোলে। বামদলের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা বের করেও নিজ স্বার্থের জন্য তিনি পুঁজিপতি চোরাকারবারিদের ব্যবসায়িক অংশীদার করেন, নিজ কলেজ শিক্ষকের অসহায়পুত্র আলী আকবরের সরলতাকে ব্যবহার করে তার বাড়ি ও ব্যবসায়ের মালিকানাও দখল করেন

এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে নীতি-আদর্শের কথা বলে কোমলমতী, সৎ ও সম্ভাবনাময় যুবক ছাত্রনেতা ও কর্মীদের ব্যবহার করে শেষে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেন। যা তাকে শেষপর্যন্ত *লালসালু*-র মজিদ পির ও *পদ্মানদীর মাঝি*-র হোসেন মিয়ার মতো কপট ও খলচরিত্রের প্রতিভূ হিসেবে দাঁড় করায়। তিনি আসলে ফাউস্টের মতো ফেরি করে আদর্শের আত্মা বিক্রি করেছেন বা বিকিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া শামিম, মুকুট ও আহসানদের মতো কিছু চরিত্রের সমূহ শক্তি ও সম্ভাবনা থাকলেও নষ্ট সময় ও রাজনীতির তাপ-চাপে তারা পরাভব মেনে নিতে বাধ্য হয়। যদিও এদের মধ্যে কিছুটা কল্পনা-আবেগের অতিরেক রয়েছে। যা হেনরি ডেভিড থরোর ভাষায়– 'Dreams are the touchstones of our characters'. তাই সৎ, সুন্দর, শোষণমুক্ত, আদর্শ ও কল্যাণময় সমাজ গড়ার ব্যাপারে তারা যে-স্বপ্ন কল্পনা নিয়ে অন্যায়-অসুন্দর ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রক্ত ঝরায়– তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ শামিম ও মুকুটের বুকের রক্ত থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের অসংখ্য রক্তবীজ ও সংশপ্তক সেনার মতো নির্ভীক যুবক। যারা কংসরূপী স্বৈরাচারের দৌরাত্ম্য-দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলে তার ধ্বংস ও পতনকে তরান্বিত করবে। এছাড়া অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনা পারম্পর্যহীন নয়। সবকিছু মিলিয়ে শওকত আলীর এ *অপেক্ষা* উপন্যাস পাঠককে হতাশ করে না বরং এক ধরনের শুভবোধ ও সদর্থক চেতনার অঙ্গীকারে উজ্জীবিত করে।

শওকত আলী এ উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর এক যুগের সময়স্বভাবকে অন্তরঙ্গ অবলোকনের উপকরণে পরিণত করেছেন। উত্তর-সম্ভাবনাহীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারুণ্যের আত্মসংকট, আত্মসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের নির্মোহ বিন্যাস শওকত আলীর জীবননির্বাচনের অনন্যতাকেই প্রমাণ করে। সামাজিক অসঙ্গতিই মানুষকে নিরবলম্ব ও নিঃসঙ্গ করে দেয় । কখনো সমাজ তাকে ধ্বংস করে, আবার কখনো স্বনির্মিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই আত্মাহুতি দেয় মানুষ। বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন আত্মকৃত ভূগোলের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিসত্তার আত্মসন্ধান, আত্মদহন ও আত্মহননের স্বরূপ সন্ধানে ঔপন্যাসিকের সাফল্য সন্দেহাতীত।[১৪] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে তরুণ-তরুণীদের প্রেমবোধ, জ্ঞানশক্তি ও রাজনীতি চেতনার ক্ষেত্রে যে-বিনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয় কর্মজীবনে, দাম্পত্যজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে–তারই ব্যর্থ, বিবশ, অসুস্থ ও আদর্শহীন বাধা-বিঘ্নের কালচিত্রই প্রবল হয়ে উঠেছে। আলী আকবরের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার দর্পণে ঔপন্যাসিক সমাজ-সংস্থার মস্তিষ্ক-কোষের এই পচন ও বিনষ্টির ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করেছেন এ উপন্যাসে। আলী আকবরের একাত্তরের তাপ-চাপজাত বিচ্ছিন্নতা, বেকারত্ব ও দলীয় বড়ভাই পত্রিকা সম্পাদকের প্রতারণায় পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উন্মূলিত হয়ে যাওয়া–এ উপন্যাসের মুখ্য ঘটনা নয়। বরং কয়েকজন রাজনীতি সচেতন প্রাণবন্ত তরুণের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সন্ধানের আত্যন্তিক প্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতাই এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়।[১৫] একাশি সনের জুলাই থেকে নভেম্বর অর্থাৎ পাঁচ মাসের সময় ও সমাজের বিক্ষুব্ধ ঘটনাতরঙ্গকে শওকত আলী তাঁর এ *অপেক্ষা* উপন্যাসের মূলচেতনাস্রোত করলেও এখানে সাতচল্লিশের দেশভাগ, ছয় দফা, এগারো দফা, নকশালবাড়ি আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্ষীবাহিনী, বাকশাল, লেবাননের যুদ্ধ ও প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের অনুষঙ্গও নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। তবে এ উপন্যাসে একাত্তর-উত্তরকালীন স্বৈরশাসনের জল্লাদি যুগ ও যন্ত্রণাকে লেখক মূল উপজীব্য করেছেন।

সেনাতন্ত্র ও স্বৈরশাসিত সমাজে রাজনীতির লক্ষ্য মানবকল্যাণ নয়, বরং রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বার্থ-সংরক্ষণ। রাজনীতির এ ঘৃণ্য চরিত্রধর্মের কারণেই মানবমুক্তির মানবিক দলগুলোতেও বিভাজন ও ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এ ভাঙন-বিভাজনকে প্রতিরোধ করতে গিয়েই শামিম ও মুকুটদের মতো আদর্শবানদের আত্মাহুতি দিতে হয়। তারা এ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে উত্তরসূরিদের মাঝে যে-রক্তঋণ (Legacy of blood) রেখে যায়, যার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন। কারণ সকল কলহ-কন্দল মেটাতে, পাপের অবসানে, স্বপ্নের প্রত্যাশা পূরণে, অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণে, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের প্রতিরোধ গড়তে এবং সুস্থ ও কল্যাণময় মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় যে-সময়ের কিংবা প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়–এ উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক সে-যৌক্তিক অপেক্ষার-ই ডাক দিয়ে যান।

উত্তরের খেপ

শওকত আলীর *উত্তরের খেপ* (১৯৯২ খ্রি.) বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এক অনবদ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসের কাহিনিস্রোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগজনিত রক্তক্ষরণের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের উত্তাল মুহূর্ত, যুদ্ধকালীন মৃত্যুর হাহাকার এবং যুদ্ধপরবর্তী ব্যক্তি-মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও অস্তিত্বসংকটের বেদনাই এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। এক হঠকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে-নিমেষেই অগুনতি সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষকে জন্মশেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিভূগোল থেকে নামহীন-গোত্রহীন এক পরিচয় সংকটের দিকে ঠেলে দেয় এবং অভিবাসী হিসেবে জটিলাবর্তে জড়িয়ে উন্মুলিত দশায় নিক্ষেপ করে– তারই আকাঁড়া জীবনবাস্তবতার চিত্র এ উপন্যাসের মৌল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

অমীমাংসিত একগুচ্ছ জীবনের গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে *উত্তরের খেপ* উপন্যাস। এ উপন্যাসের জীবনগুলো কেবল পর্ব পেরিয়ে যায়; লিপ্ত হয় নতুন পর্বের নতুন যুদ্ধে। এই যুদ্ধ যতখানি সমাজঘনিষ্ঠ, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিমুখ্য। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটির চরিত্রগুলোর আসল লড়াই তাদের নিজেদের সঙ্গে, দেশভাগ আর মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতায় মোহাজের জনগোষ্ঠী এবং বাঙালিদের মধ্যে যে-মিথষ্ক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে ক্রমবিবর্তিত রূপ গ্রহণ করেছে; সেই রূপান্তরের অংশ হয়ে চরিত্রগুলো আত্মখনন করে চলে। এই চরিত্রগুলো নিজেদেরকে পর্যবেক্ষণ করে, আপন অতীতের আলোতে নিজসত্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু শেষে নিয়তির মতো এরা নিজেরাই নিজেদের তৈরি করা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। ব্যক্তির নিজের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া অবিবারম এই যুদ্ধের সমীকরণকে শিল্পময় করে এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন শওকত আলী।[১৬] *উত্তরের খেপ* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে ট্রাকচালক হায়দারের বোহেমিয়ান জীবনকে কেন্দ্র করে। জল প্রবাহে ভাসমান শেওলার মতো হায়দারের জীবনও আশ্রয়হীন। হায়দারের ব্যক্তিজীবনের ভাঙাগড়ার অনুষঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে দেশভাগের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। হায়দার আলী যেন সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত ঠিকানাবিহীন নরনারীদের উত্তরসূরি–যারা রাজনীতির অমোঘ হিংস্র থাবায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে ধনে-জনে, মুহূর্তেই যারা স্বদেশে পরবাসী হয়ে গেছে ক্ষমতার উদগ্র খেলায়।[১৭] রাজনীতির ঘনঘটার এফোঁড়-ওফোঁড় হওয়া হায়দারের প্রতীকে ঔপন্যাসিক অসংখ্য মানুষের জীবন-যন্ত্রণার চালচিত্র ভাষারূপ দিয়েছেন।

ট্রাকড্রাইভার সবদর আলী ও নিশাত বানুর একমাত্র ছেলে হায়দার । হায়দারের দাদা আসগর আলী দেশভাগের অভিঘাতে জলপাইগুড়ি ছেড়ে দিনাজপুরে এসে বাড়ি করে। আর মা নিশাতবানুর বাবা মাজহার খান আসানসোলের বাড়িঘর ও কাপড়ের ব্যবসায় ফেলে সৈয়দপুরে এসে বাড়ি করতে বাধ্য হয়। প্রথমে শরণার্থী নিশাত বানুর সঙ্গে রেল কর্মচারী বিহারি মাহবুব এস্ফেন্দিয়ারের বিয়ে হলেও দুর্নীতির মামলার পড়ে সে করাচি পালিয়ে যায়। ফলে অসহায় নিশাত বানুকে তার মামা আফজাল খান বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটিয়েই সবদরের সঙ্গে জোর করে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেন। প্রথম দিকে মানসিক দূরত্ব থাকলেও একপর্যায়ে এসে নিশাত বানু দ্বিতীয় স্বামী গোঁয়ার ও খ্যাঁপাটে স্বভাবের ট্রাকড্রাইভার সবদরকে মেনে নেয় এবং ঘরসংসার শুরু করে। এ দ্বিতীয় সংসারেই হায়দারের জন্ম হয়। কিন্তু আসানসোল থেকে অভিবাসী হয়ে আসলেও প্রথম স্বামী মাহবুবের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে নিশাতের জীবনে 'অবাঙালি বিহারি' তকমা লেগে যায়। এভাবে সৈয়দপুরে আসা বহু বাঙালিকেও এ 'বিহারি' দোষে সংক্রমিত করে। আবার স্বার্থপর মামা আফজাল খান নিশাতের বাবার দোকান আত্মসাৎ করতে তার প্রথম স্বামী মাহবুবকে চিঠি দিয়ে নানাভাবে উস্কানি দেন। মাহবুবের পক্ষে প্রতিবেশী বিহারি আনসার, সুলেমান ও আব্দুলরা নিশাত বানুকে উত্ত্যক্ত করতে আসলে সবদরের মারমুখী প্রতিবাদ ও তৎপরতার কারণে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হয়। যা উনসত্তরের আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে নিশাত বানুর জীবনসংসারও ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

সবদর-নিশাতের ভরাভরান্ত সংসারে যখন– 'শরীরে সুখ, মনে সুখ, স্বপ্নে সুখ ও কল্পনায় সুখ' উপছে পড়ার মতো অবস্থা; ঠিক তখনই আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনের উত্তাপ এসে লাগে সৈয়দপুরের বিহারি অধ্যুষিত এলাকায়। হরতালের পক্ষে-বিপক্ষে বাঙালি আর বিহারিদের মধ্যে প্রকাশ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তার ফলে–

> 'হরতাল হলেই হাঙ্গামা হয়।...চারদিকের অবস্থা বেশ গোলমেলে। বিহারিরা সরকারের পক্ষে তো বাঙালিরা বিপক্ষে। অবশ্য দুপক্ষেই অল্প কিছু মেশামেশি আছে। তবে তা এতই সামান্য যে তাতে মোটা দাগের ভাগটা টানতে অসুবিধা হয় না। একেকেদিন

মারামারিও হয়ে যায় দুপক্ষে। আর একবার যদি ঐরকম মারামারি হয়, তাহলে তার জের চলতে থাকে দিনের পর দিন।'-[*উত্তরের খেপ*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৭ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/পৃ.১০১]

এ রকম পরিস্থিতিতে সবদরের ট্রাক রাস্তায় মিছিলের মাঝখানে পড়ে পূর্ববর্তী শত্রুতার জেরে সুলেমান আর আনসারের উস্কানিতে উত্তেজিত জনতা রড, লাঠি, বাঁশ ও ইট ছুঁড়ে তা ভেঙে ফেলে। 'তোড় দো, জ্বালা দো'– বলে একজন আগুন দেবার আয়োজন করলেও পুলিশ আসায় সবদরের ট্রাকটি রক্ষা পায়। সবদর আর তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে হায়দার বাঙালিদের আন্দোলন সমর্থন করায় তাদের এ চড়া মূল্য দিতে হয়। তিন হাজার টাকার জন্য সবদর ট্রাকটি মেরামত করতে পারে না। ট্রাক-বাসের গোটা ব্যবসায় বিহারিদের কব্জায় থাকায় সবদরকে কোনঠাসা অবস্থায় পড়তে হয়। কেউ কেউ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলে–'সালে তুম লোক কওম কি দুশমন, তুমহারা সাথ হামলোগকা কোই রিশতা নেহি রহে গা।' এমন অবস্থায় ছেলে হায়দার মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে–

'জালিম আইয়ুব আর মোনেম খানের তখত উল্টে গেছে –সামনে আসছে ইলেকশন। মজলুমের সুদিন আসতে আর দেরি নেই। সোনার বাংলা এই এল বলে।'-[উ.খে./পৃ.১০২-১০৩]

সত্তরের নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তেজনা আবার তুঙ্গে ওঠে। 'জয়বাংলা' আর 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর শ্লোগানে চারদিক মুখর হয়ে ওঠে। নির্বাচনের সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতা প্রচার কাজের জন্য সবদরের গাড়ি ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয়াতে সে রাজি হয়। নেতার দেয়া টাকায় ট্রাকটি পুনরায় সারিয়ে বিশাল নৌকা-পোস্টার-ব্যানার লাগিয়ে নৌকার পক্ষে প্রচারণা চালায়। বাপ-ছেলে নির্বাচন নিয়ে মেতে ওঠে। এসময় একদিন নিশাত বানুর কানে আসে–

'খুব জোর নাকি একটা মারামারি হবে, হিন্দুরা দখল করে নেবে বাড়িঘর। মুসলমানরা যদি হুঁশিয়ার না হয়, তাহলে কেউ বাঁচবে না।'-[উ.খে./পৃ.১০৯]

অর্থাৎ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে খুব কৌশলে অবাঙালি বিহারিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়া হয়। নিশাত বানু এ খবরে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় ভয় পায়। কিন্তু স্বামী ও সন্তানকে কিছুতেই ঘরে আটকে রাখতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতেই মার্চ মাসের শুরুতে রেডিওতে শোনা যায়–'ওদের আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব' বলা শেখ মুজিবের ভাষণ। এ ভাষণ উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দেয়। নিশাত বানু ভয়ে সিটিয়ে যায়। কারণ–

'বাঙালিরা তাকে বিহারি বলে এড়িয়ে থাকে, আর বিহারিরা তাকে বাঙালি মনে করে।'-[উ. খে./পৃ.১১০]

এরকম অশ্বস্তির মধ্যে কিছুদিন পর রাতের বেলা দক্ষিণ দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ আসে। সকাল হবার আগেই চারদিকে 'জয় বাংলার' শ্লোগান শোনা যায়। দশমাইল মোড় ও কুঠিবাড়ি এলাকায় ইপিআর জোয়ানদের প্রতিরোধের জোর লড়াইয়ের কথা জানা যায় এবং নিউ টাউন এলাকায়ও প্রচণ্ড গোলাগুলি ও বহু লাশ পড়ে থাকার খবর পাওয়া যায়। স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাছারিতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। সব মিলিয়েই উত্তেজনা কমে না বরং 'সারা শহর যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে।' বিহারিরা তলে তলে দুশমনি করে। তারা ওয়ারলেস দিয়ে সৈয়দপুরে মুক্তিফৌজদের তৎপরতার খবর পাঠায় এবং পাক বাহিনীকে বিমান হামলার জন্য উস্কানি দেয়। এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ইপিআর জোয়ান আর মুক্তিফৌজের সেনারা সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই বর্ডার ছেড়ে বিহারি এলাকায় চলে আসে এবং বিহারি নিধন শুরু করে। বিহারিরা প্রাণ বাঁচাতে মহল্লা ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় গুলি খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকে। ইপিআর সেনাদের যুক্তি–'পেছনে শত্রু রেখে যুদ্ধ করা যায় না-মীরজাফরদের খতম কর।' সকল বেলা সবদর বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় গিয়ে লাশের ছড়াছড়ি দেখে আতঙ্কে-আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিবেশী এতোয়ারি বুড়ো টহলরত ইপিআর সেনাদের ধাওয়া খেয়ে সবদরের বাড়ি ঢুকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। এসময় বর্ডার এলাকায় ভারত সরকার পাহারা তুলে নেয় এবং রাধিকাপুরের ট্রেন আবার সচল হয়। আর দশমাইল মোড়ে ইপিআর সেনাদের সঙ্গে বাংকারে ভারতীয় সেনাদের অবস্থান করতে দেখা যায়। তখন ভারতীয় সেনা গুরুবকস সিং সবদরকে জানায়–

'ওস্তাদ ভাবগতিক ভালো নয়। আমাদের নেতারা গোলাগুলি জোটাতে পারছে না, শেষ রক্ষা হয় কি না কে জানে।'-[উ. খে./পৃ.১১২]

পর দিন থেকেই দিনে দুবার করে বিমান হামলা চলে। চারদিকের অবস্থা দেখে হায়দার বাবা-মাকে হুঁশিয়ার করতে বলে–'চলো গাঁয়ের দিকে পালাই। এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। চল, শিগগির বেরিয়ে পড়ি।' হায়দারের কথা শুনে সবদর ও নিশাত বানু থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে রাজি হয় না। কারণ–

'বড়ো কষ্টে গড়ে তোলা সংসার– হাজারটা খুঁটিনাটি জিনিসের মায়ামমতা হাজার রকমের। কেমন করে সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে যাওয়া যায়? নিশাত থেকে থেকে ঘরের দেয়ালে হাতটা রেখে আস্তে আস্তে বোলোয়।'-[উ. খে./পৃ.১১২]

বহু যত্নে গড়া সংসারের মায়া আর সবদরের জখম পায়ের কথা বিবেচনা করে নিশাত বানু পালাতে রাজি হয় না। কিন্তু পর দিনই সকালে ও দুপুরে–'ভাইসব শহর ছেড়ে চলে যান– শহর নিরাপদ থাকবে না– গ্রামের দিকে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন– দেরি করবেন না, শহর ছেড়ে দিন' মাইকের এমন ঘোষণা শোনার পর শহরের মানুষ পালাতে শুরু করে। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিমে নদীর দিকে ছুটে। সবাই পালালেও সবদর পালাতে রাজি হয় না। বরং তার মনে উদয় হয়–

'কোথায় পালাবি সবদর আলী? এ তোর নিজের ঘরবাড়ি, কেন পালাবি? এই ঘরবাড়ি সংসার কে দেখে রাখবে? যদি তুই ছেড়ে পালাস? ঘরসংসার কি একদিনে হয়?'-[উ. খে./পৃ.১১৩]

এমন আত্মজিজ্ঞাসায় সবদর না পালাতে আরো জেদি হয়ে ওঠে। সার্বিক পরিস্থিতিকে গুরুত্ব না দেবার কারণে তাকে শেষপর্যন্ত চরম মূল্য দিতে হয়। তেরো বা চোদ্দ এপ্রিল সন্ধ্যার আজানের সময় 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনি দিয়ে এবং ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে মাহবুব, আফজাল খান আর আনসাররা অস্ত্রসহ সবদরের বাড়ি ঢুকে। সবদর দরজার বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়াতেই–

'ঠিক ঐ সময়ই গুলির আওয়াজ শোনা যায়। প্রথমে একটা তারপর আবার একটা। নিশাতের গলা দিয়ে শুধু আল্লাহ শব্দটা আর্তনাদ হয়ে বেরুতে পারে–তারপর আর কোনো শব্দ বের হয় না। সে স্থির চোখে দেখে, তার সংসারের সদর দরজায় মরার আগে স্বামীর পা দুখানি দাপাদাপি করে যাচ্ছে।'-[উ. খে./পৃ.১১৩]

বাবার এ নির্মম মৃত্যুর দৃশ্য দেখা মাত্রই হায়দার বারান্দা থেকে দ্রুত লাফ দেয় উঠানে, তারপর মুরগির খোঁয়ারে পা রেখে প্রাচীর ডিঙিয়ে কচুবনের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। তাকে খোঁজার জন্য তার মায়ের আপন মামা আফজাল খান বলেন– 'সালে মর চুকা না? দেখো ঠিকসে। কেয়া হুয়া, মিলা? ঢুঁড়ো সালে গাদ্দার কো।' হায়দার সেখান থেকে সরে আমবাগানে গিয়ে গাছের মাথায় উঠে। আর দেখতে পায় জিনিসপত্র ট্রাকে ওঠানো হচ্ছে এবং শেষে তার মাকে আফজাল খান আর মাহবুব টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে। এসব দেখে হায়দারের সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে এবং গাছ থেকে নেমে আবছা অন্ধকারেই বাগান থেকে ইটের টুকরো একের পর এক ছুঁড়ে। জবাবে বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হলে নিশাত বানু চিৎকার করে বলে–

'মেরে বাচ্চা কো মাত মারো– ও মেরে লাল তু ভাগ যা, তেরা জান বাঁচা।'–[উ. খে./পৃ.১১৬]

বাধ্য হয়ে হায়দার পিছিয়ে আসে এবং রাস্তা ধরে কুঠিবাড়ির বাগান পাড় হয়ে নদীর কাছে চলে যায়। শেষ রাতের দিকে বাড়ি এসে সে তার মা ও ট্রাকটি পায় না। কেবল বাবার ফুলে ওঠা লাশ উঠানে পড়ে থাকতে দেখে। রান্নাঘরের টিনখুলে বাবার লাশের ওপর এনে চাপা দেয়। এরপর ঘরবাড়ি ও এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। জুলকারনাইন ও সুবিনয়দের মতো সহযোদ্ধাদের নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। দেশস্বাধীনের নয় মাস পর বাড়ি ফিরে। কিন্তু বাবার লাশের যে-নিশানা সে রেখে গিয়েছিল তা–

'আর পায়নি। টিনগুলো চুরি হয়ে যায়। আর বাবার হাড়-হাড্ডি পথে পথে পড়ে থাকা অসংখ্য লাশের হাড্ডির সঙ্গে মিশে যায় একাকার হয়ে। হাতের রাইফেল সে তখনো ছাড়েনি।'-[উ. খে./পৃ.১১৭]

হায়দার প্রতিবেশী সুলেমানের মাকে খুঁজে বের করে। কিন্তু সেও কোনো তথ্য দিতে পারে না। হায়দার মাকে খুঁজতে সৈয়দপুর, দিনাজপুর, পার্বতীপুর ও রংপুর ঘুরে-ফিরেও কোনো হদিশ পায় না। ভারতীয় সেনা যাদবের সহায়তায় হায়দার বন্দি ক্যাম্পে গিয়ে আফজাল খানকে পায় । সেও কোনো তথ্য দিতে পারে না।ফলে বাবা-মা হারিয়ে সে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। বিপদগ্রস্ত অসহায় মাকে ফেলে পালিয়ে যাবার কারণে তার মনে এক ধরনের পাপবোধও জাগে। এসময় কাকতালীয়ভাবে তাদের লুট হয়ে যাওয়া ট্রাকটি সে বর্ডার এলাকায় পেয়ে যায়। নানাবিধ বিবেচনায় সে বাবার পেশাকেই বরণ করে। বৈরী সময়ের মুখোমুখি হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হায়দার বাবা-মায়ের হত্যার বিচার করতে পারে না, লালিত স্বপ্ন-অনুযায়ী জীবনকে গড়তেও পারে না। তাই হায়দার শূন্য বাড়িতে থাকে না। রাতে মীর আবেদের গ্যারেজে ট্রাক রেখে ট্রাকের ভেতরেই সে রাত কাটায়। এ মীর সাহেবরাও জলপাইগুড়ি থেকে একান্ন সনে দিনাজপুর এসে বাড়ি করেন এবং পর্যায়ক্রমে মীর ট্রান্সপোর্ট ও মীর ওয়ার্কশপের মালিক হন। হায়দারের ট্রাকে ঘুমানোর বিষয়টি মীর সাহেবের নজরে পড়ে।

তিনি হায়দারের সাহস, সম্ভাবনা ও তেজোদীপ্ত মনোভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হন। তাই হঠকারীভাবে বাপ-মা হারা বড় ছেলের মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়া সুন্দর-সুশ্রী- দেমাগী নাতনি মরিয়মের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার উদ্যোগ নেন। অথচ এসময় মরিয়ম কুড়িগ্রামের দারোগা বাড়ির ছেলে, ফিল্ম কোম্পানির এজেন্ট এবং ফুলবাবু খালাতো ভাই চতুর আজহারের প্রেমে মগ্ন ছিল। কিন্তু দাদা মীর আবেদের সিদ্ধান্ত ও জেদের কাছে অসহায় মরিয়ম চালচুলোহীন হায়দারকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু হায়দারের চরিত্রের সহজাত ঔদাসীন্য, অতিমাত্রায় ঔদার্যবোধ ও ভদ্রতাজ্ঞান বুদ্ধিমতী মরিয়মের চোখে সে পুতুলবৎ বিবেচিত হয়। তার প্রশ্রয় পেয়েই মরিয়ম-আজহারের পূর্বের প্রেম প্রবল হয়ে ওঠে এবং তা অনিবার্যভাবে এক সময় দৈহিক সম্পর্কে গড়ায়। যদিও এর পূর্বেই মরিয়মের গর্ভে মিঠু নামের এক ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। দেহের উত্তাপময় পরকীয়ার পাপ-পঙ্কে জড়িয়ে মরিয়ম স্বামী-সন্তান ও সংসারের গুরুত্ব ভুলে জীবনার্থের পরম বোধ তথা উপলব্ধিকে বিস্মৃত হয়। তাই প্রেমিক আজহারের উস্কে দেয়া কূটচালে অন্ধ হয়ে এক ঝড়ো বৃষ্টির রাতে মরিয়ম হায়দারকে চরম আঘাত করতে বলে–

> ‘ছেলের দিকে তাকাও কেন? ওর জন্মদাতা তো তুমি নও–ওর দিকে তাকিও না।...ও ছেলে তোমার নয়–ইডিয়ট, যদি চোখ থাকতো, তাহলে ঠিকই দেখতে পেতে।’-[দ.মো./পৃ.১২৪]

সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে মরিয়ম মনের আক্রোশে তীব্র কশাঘাত হানে। আর ‘ছেলেকে চাইতে হলে কোর্টের মারফতে চেয়ো’–বলে ফুঁসে ওঠে। পরাজিত ও মারখাওয়া কুকুরের মতো বৃষ্টিতে ভিজেই হায়দার রেলস্টেশনে যায়। আর সোজা ঢাকায় চলে আসে। এভাবে বউ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে হায়দার যাযাবরের মতো ঢাকায় অবস্থান করে। ট্রাক চালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। অথচ ঘর-সংসার টিকিয়ে রাখতে হায়দার তেমন কোনো উদ্যোগও নেয় না। আবার স্ত্রী-পুত্রের উপর তার বৈধ স্বত্ব-স্বামিত্বের দাবিও সে সহজে ছেড়ে দেয়। হায়দার-মরিয়মের বৈধ দাম্পত্যের অবসান আর আজহার-মরিয়মের অবৈধ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা– যা সমকালীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শুভ জীবনপথ থেকে কংসরূপী স্বৈরশাসনের উল্টোরথযাত্রার অশুভসংকেত স্বরূপ। হায়দারের দাম্পত্য জীবনের ভাঙচুরের মতো রাষ্ট্রীয় জীবনেও নানা গোলাযোগ ঘটে। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনে মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও চরমভাবে ব্যাহত হয়।

অন্ধ আবেগ, দেহজ প্রেমের উত্তাপ নিয়ে মরিয়ম দ্বিতীয়বার জীবনের পালাগান শুরু করতে গিয়ে প্রথম দিনই তীব্রভাবে হোঁচট খায়। কারণ আজহার খুব কৌশলে বিছানা থেকে মিঠুকে সরিয়ে দেয়, মীর ট্রান্সপোর্ট ও মীর ওয়ার্কশপের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে চাচা শ্বশুরকে চাপে ফেলে দুটি প্রতিষ্ঠান নিজ হাতে তুলে নেয়। আবার হায়দারের মিশনরোডের বাড়িটিও দখলের পায়তারা চালায় এবং টাকার প্রয়োজনে নিজের মেয়ে মুন্নিকে অপহরণ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করে । উপরন্তু বাড়ির কাজের মেয়ে গুলনাহারের সঙ্গে ব্যভিচারে জড়িয়ে মরিয়মের স্বপ্ন-সুখকে তছনছ করাসহ মীর মঞ্জিলের গোটা খানদানকে নরকে পরিণত করে। এ সময় মরিয়ম প্রাণপণে প্রথম স্বামী হায়দারের প্রত্যাবর্তন কামনা করে এবং অন্তত ছেলে মিঠু ও মিশন রোডের বাড়িটির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার ভীষণ তাগিদ অনুভব করে। এমন পরিস্থিতিতেই হায়দার দীর্ঘ সাত বছর পর (আশি-একাশি সনের দিকে) কিছু মালামাল পৌঁছে দিতে বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর-সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে উত্তরের খেপ নিয়ে যাত্রা করে। এ যাত্রায় সে যেমন নানা সংকট আর শত্রুতার মধ্যে পড়ে, তেমনি ফেলে যাওয়া জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে ও একধরনের বোঝাপড়ায় তাকে অবতীর্ণ হতে হয়। প্রথমেই রায়ের বাজারের লাল্টু মহাজনের মালামাল হিসেবে নারকোটিকস মাদক বহনের সন্দেহে সৈয়দপুর শহরে এসে আবগারি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। পুলিশ ইন্সপেক্টরের জিজ্ঞাসাবাদ ও কথায় কথায় হায়দার নিশ্চিত হয়–

> ‘ একাত্তরে হিলি থানা দখল করার সময় এই লোকই সারেন্ডার করেছিল। লোকটার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ছিল। সুবিনয় খতম করার জন্য বন্দুক তুলতে সেই (হায়দারই) বাধা দেয়।’-[উ. খে./পৃ.৯৩]

অর্থাৎ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দেশস্বাধীনের আট-নয় বছরের মাথায় এসে মুক্তিযোদ্ধা হায়দারকে স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপন্থী পুলিশ অফিসারের হাতে বন্দি হতে হয়। যা একাত্তর-পরবর্তী গোটা রাষ্ট্রকাঠামোতে রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধী অফিসারদের পুনর্বহাল ও প্রতিষ্ঠার বাস্তব চিত্রকে উন্মোচিত করে। এ কলুষিত ও সুযোগসন্ধানী অফিসারদের অব্যাহত কূটচাল আর ষড়যন্ত্রের কারণেই যেমন পঁচাত্তরে এসে দেশ ভয়াবহ সংকটে পড়ে, তেমনি পরবর্তীকালে স্বৈরশাসনের ছত্রছায়ায় এদের দাপট-দৌরাত্ম্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাবিধ হয়রানির শিকার হতে হয়। যা একই সঙ্গে দেশের শুভ শক্তির পতন এবং অশুভ শক্তির পত্তনকে ইঙ্গিত করে। চাচাশ্বশুর মীর জাহান, সাবেক স্ত্রী মরিয়ম

এবং কাইয়ুম উকিলের তৎপরতায় হায়দার থানা থেকে মুক্তি পায়। এ মুক্তির পেছনে সাবেক স্ত্রীর তৎপরতার কথা শুনে হায়দারের মনে তুমুল আলোড়ন চলে। তাই সে বুঝতে পারে–

> 'তার নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ বেঁধে গেছে। ঘৃণার সঙ্গে ভালোবাসার, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রলোভনের।'-[উ. খে./পৃ.১১৪]

সাত বছর আগে যেসব বিষয়কে সে মনের ভেতরে চাপা দিয়ে রেখেছিল, তা সে পুনরায় উন্মোচন করতে চায় না। কিন্তু মনের দগদগে ঘা আর রক্তক্ষরণের যাতনাকে সে এড়াতেও পারে না। স্ত্রী-সন্তান আর সংসার ভাঙা-গড়ার আনন্দ-বেদনার স্মৃতির সঙ্গে যুগপৎভাবে জড়িয়ে আছে তার নিজস্ব শেকড়ের অনিবার্য যোগসূত্র। কারণ–'এই শহরের মাটিতে মিশেছে তার মা আর বাবার রক্তমাংসের হাড়হাড্ডি। এই শহরের রাস্তায়, আম বাগানে, খেলার ময়দানে, তার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের হাজারটা স্মৃতি হাজারভাবে ছড়ানো।' পিতা-মাতার মৃত্যু, মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু মুয়িদের বোনের করুণ মৃত্যু, সহকারী সিধা কালুর মৃত্যুর কথা ভেবে তার মনে উদয় হয়-

> 'মানুষের মরণ কত সহজে হয়ে যায়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, ঝড়, বন্যা এসব থাকলেও; না থাকলেও। মানুষ স্রেফ মরে যায়। কোনো কারণ থাকার দরকার পড়ে না।'-[দ. মো./পৃ.১৭৮]

হায়দারের মানসলোকের এ মৃত্যু-ভাবনার জন্য তার জীবনের শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বই দায়ী। আবার নিজের জীবনভূগোলের এ অনিবার্য পতন ও বিচ্ছিন্নতার জন্য হায়দারের চেতনায় এক ধরনের নিয়তিবাদ ও পাপবোধও তাকে পীড়িত, হতবল এবং উদ্যমহীন করে তোলে। তাছাড়া শত্রুর হাতে মাকে ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাবার ঘটনাকেও হায়দারের মনে পাপবোধ উস্কে দেয়। তাই তার মনে উদয় হয়-

> 'নাকি পাপ ছিল কোথাও? পাপ ছিল বাপ আর মায়ের মিলনে? আফজাল খান যেটা ঘটিয়ে দিয়েছিল। নাকি সেটাও নয়? আরো অনেক দূর থেকে পাপের সূচনা হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতারা যে পাপ করেছিলেন– তারই ফল ভোগ করতে হল সবদর আলীর মতো মানুষকে। তার কি তাহলে পাপ ছিল? হ্যাঁ, পাপী সে, অবশ্যই পাপী। পাপ তার জীবন বাঁচানোর কৌশল?'-[উ. খে./পৃ.১১৫]

অর্থাৎ ভারত বিভক্তির প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতাদের অমানবিক, অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ভয়াবহ পাপের সংক্রমণ হায়দার উত্তরাধিকার সূত্রে বয়ে চলছে। এ পাপের কারণেই সে উন্মূলিত-ভাসমান হয়ে যে-বোহেমিয়ান জীবন যাপন করে চলছে– এটি সেই শাশ্বত সত্যকেই ইঙ্গিত করে। রাজনীতির কুষ্ঠরোগের মতো সংক্রমিত এ বিচ্ছিন্নতার জন্যই হায়দার সংসারবিবাগী হয়ে পড়ে। আর ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সকল দায়-দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ ও অঙ্গীকার পালন থেকে নিজেকে আড়াল-আবডাল করে রাখে। ফলে তার চেতনালোকে ভর করে এক প্রবল নিরাসক্তি। তাই 'তোমার বাড়িটা তুমি বুঝে নাও এবং মিঠুর জানা দরকার যে-ওর নিজেরও একজন বাবা আছে'–মরিয়মের এ কথার জবাবে সে কোনো দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারে না। বরং বলে–'শুধু বল, আমাকে কী করতে হবে, আমাকে হুকুম কর।' নিজের মামলা আর মিশন রোডের বাড়ির বিষয়টি চাচাশ্বশুর মীর জাহানের ওপর ন্যাস্ত করে। তাই কুচক্রী আজহারের হাত থেকে বাড়িটি রক্ষার জন্য মীর জাহান তার নামে পাওয়ার অব এটর্নি করার প্রস্তাব দিলে কোনোকিছু না ভেবেই বলে–'আজই নিন, পারলে এখনই নিন।' এমন কথায় মীর জাহান তার উদ্দেশ্যে বলেন–'তুমি কি কোনোদিন নর্মাল হবে না? তোমার নিজের বলে কি কোনো স্বার্থ নেই? জীবনের কি কোনো অবলম্বনেরই তুমি প্রয়োজন বোধ কর না?' জবাবে হায়দার জানায়–

> 'সবার বেলাতে যা হয়, আমার বেলাতে তা হয় না– কখনো হয়নি–তাই আমি অন্যের মতো কোনো ব্যাপারে চেষ্টা করি না।'-[দ. মো./পৃ.১৫১]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে হায়দারের মানসলোকে এক প্রবল নিরাসক্তি ও নির্লক্ষ্যভাবনার চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে। পাওয়ার অব এটর্নির কথা প্রকাশ পাওয়াতে আজহার তার স্থানীয় মাস্তান বন্ধু সলিমউল্লাহ খানের মাধ্যমে হায়দারের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করে। তাকে সতর্ক করার জন্য কোর্ট চত্বরে এক পা হারানো যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু জুলকারনাইন আসে। সলিমউল্লাহর কথা বলাতে হায়দার হাসতে হাসতে বলে–'সেই ভয়ে আমি পালাব? তুই আমাকে পালাতে বলিস?' জুলকারনাইন তাকে সতর্ক করতে জানায়–

> 'লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে।...আরে এই সলিমউল্লাহ ডিসেম্বর মাসের দিকে এসে জুটেছিল। ছিল রাজাকার, মুক্তি বাহিনীতে ঢুকে গেল কোনো এক পলিটিক্যাল কর্তার সুপারিশে।...অপারেশনে যাবার ভয়ে যে বগলে রশুন চেপে জ্বর বাঁধাত।...সেই সলিমউল্লাহ এখন মাস্তানদের নেতা।'-[দ. মো./পৃ.১৬৬]

অর্থাৎ একাত্তর সনেই সুবিধাবাদী কিছু রাজনীতিবিদদের কারণে মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনীতির ভেতরে যে-বিনষ্টের বীজ রোপিত হয়, তাই পঁচাত্তরের পর প্রবল আকারে ডাল-পালা বিস্তার করে। এ সমিউল্লাহ সেই বিষবৃক্ষেরই ফলস্বরূপ। যারা পরবর্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য রীতিমতো এক বিষফোঁড়া ও ব্যাধি হয়ে ওঠে। 'এখানে মাস্তান আছে?'–হায়দারের এমন প্রশ্নের জবাবে জুলকারনাইন জানায়– 'নেই মানে, গোটা দেশটাই চলে গেছে মাস্তানদের দখলে, এখানে সলিমউল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকারি কোনো কাজ করা যায় না।' এমন বাস্তবচিত্র দেখেই হায়দারের যুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষের দেয়া এনামেলের ডাব্বামগের কথা মনে পড়ে। জুলকারনাইনকে সে মগের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে–'আমারটা ফুটো হয়ে গেছে কিন্তু বউ যত্ন করে রেখে দিয়েছে' বলে উল্লেখ করে। হায়দার মুক্তিযোদ্ধাদের এমন পরিণতিতে দুঃখের হাসি হেসে বলে–

> 'এই তাহলে পরিণতি আমাদের, তাই না? যুদ্ধ করেছিলাম তার প্রমাণ এখন একটা ফুটোমগ।...যুদ্ধ শেষ হলে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাদের হাতে ফুটো মগ ধরিয়ে দেয়া হল। বলা হয়, যাও এবার স্মৃতি হয়ে দেয়ালের ছবির মতো সসম্মানে ঝোলো।...এখন আমরা বোধ হয় দেয়ালেই ঝুলে আছি।'-[দ. মো./পৃ.১৬৬]

একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের বাস্তবতাও ছিল অনুরূপ। রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, সম্ভ্রম দিয়ে, স্বজন হারানো তথা অঙ্গহানির শোক দিয়ে দেশস্বাধীন করে যে-স্বপ্ন গড়ার প্রত্যাশা সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল; তা স্বপ্নই থেকে যায়–বাস্তবে রূপ নিতে পারে না। বরঞ্চ সুযোগসন্ধানী, রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীই স্বাধীনতার সুফল পুরোপুরি ভোগ করে দ্রুত ফুলে ফেঁপে ওঠে। এ সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার আরো অবারিত হয় পঁচাত্তর-পরবর্তী স্বৈরশাসনামলের দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের ফলে। একাত্তরের চেতনাবিরোধী পদক্ষেপের কারণে এ গোষ্ঠীর শুধু কপালই খুলে না বরং সামাজিক সম্মান, দাপট ও দৌরাত্ম্য পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার পালা সম্পন্ন হয়। এদের দাপটে হায়দার ও জুলকারনাইনদের মতো অসহায় মুক্তিযোদ্ধারা খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। পরবর্তীতে আজহারের চক্রান্তে হায়দার গুরুতর দুর্ঘটনার শিকার হয়। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেলেও তাকে দীর্ঘসময় হাসপাতালে থাকতে হয়। জুলকারনাইন তাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে পুনরায় সংসারী হবার তাগিদ দিয়ে বলে– 'তুই কি রাস্তায় থাকবি? ঘরে আসবি না?' জবাবে হায়দার বন্ধুর হাত ধরেই বলে–

> 'সবার ঘর হয় না জুলু। আমার বাবা মা-র শেষপর্যন্ত হয়নি–আমারও হল না।'-[দ. মো./পৃ.১৯৩]

কিন্তু জুলকারনাইন হায়দারের এ নিয়তিবাদী বক্তব্যকে মানতে পারে না। বরং তাকে শক্তি থাকার পরেও লড়াই না করে বিনা প্রতিবাদে সরে দাঁড়ানোর জন্য অভিযুক্ত করে। জবাবে সে বন্ধুকে বলে–'যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকেই আমার মন কেমন যেন এলোমেলা হয়ে যেতে থাকে। প্রথমে তো সব ব্যাপারেই ভয়ানক রাগ হত– ভাবতাম গুলির মুখের সব শালাকে উড়িয়ে দেব। তারপর দেখলাম, কাকে গুলি মারবো? নেতারা এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে-কে শত্রু কে বন্ধু বোঝাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। তারপর যখন অস্ত্র ছেড়ে দিলাম, তখন অসম্ভব ক্লান্ত লাগত নিজেকে।' রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বার্থের হিসাব, সুবিধাবাদী প্রবণতা, আদর্শের সঙ্গে আপস দেখতে দেখতে এবং স্বজন হারানোর বেদনা মিলেমিশে হায়দারের মনে এমন শূন্যতা, উদ্যমহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। এ কারণে সে উপায় থাকার পড়েও নিজের বাড়ি পুনরুদ্ধার করে না বরং ট্রাক নিয়ে সংসার ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় । 'কিন্তু এতে লাভ কী হল'?– বন্ধুর এ প্রশ্নের জবাবে হায়দার বলে–

> 'লাভ- লোকসানের ব্যাপার নয় জুলু, ব্যাপারটা লড়াইয়ের। লড়াই করলে কেউ হারে, কেউ জেতে। কিন্তু আমরা সংসারে এসে লড়াই করলাম না। আর তাতেই দেখছি, আমরা হেরে গেছি–এখন আর কিছু করার নেই। যারা পথে ছিলাম, তারা পথেই রয়ে গেলাম– ঘরে গিয়ে ঢুকবার মতো আর আমাদের সময় নেই।'-[দ. মো./পৃ.১৯৩]

হায়দারের মতো মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সংগ্রামে বিজয়ী হলেও জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে পরাজিত হয়। যা হবার কথা নয়–এমন কূটাভাসই (paradox) তাদের ক্ষেত্রে অমোঘ নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। জুলকারনাইন হায়দারকে কিছু টাকা দিতে গেলেও সে নেয় না। অথচ খোড়া পা নিয়েই সে রেলস্টেশনে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।এসময় মরিয়ম সরাসরি হায়দারকে তার মিশনরোডের বাড়ি আর ছেলে মিঠুর দায়িত্ব নিতে বলে। কিন্তু এতেও সে রাজি হয় না। বরং কৈফিয়তের সুরে জানায়–

'আমাকে ভুল বুঝ না, বলেছি মিঠু তার মায়ের কাছেই থাকবে...মরিয়মের ছেলে মরিয়মেরই থাকবে।...সংসারে থাকাটা খুব মুশকিল, ওর ভেতরে ঢুকতে আমার একদম ইচ্ছে করে না, বোধ হয় পারবও না।...আমাকে হিসেবের মধ্যে ধরো না, আমি বেঁচে নেই।'-[দ. মো./পৃ.২১১-২১৩]

অর্থাৎ *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের কুসুমের মতো প্রেমের প্রতারণায়, পরিস্থিতির তাপ-চাপে হায়দারেরও মানসিক বা আত্মিক মৃত্যু ঘটে। যার জন্য শত অনুরোধ-আহ্বানেও হায়দার সংসার সীমানায় প্রবেশ করে না। ফলে নিজ সন্তানের দায় এড়াতে মন না কাঁদলেও বরং সহকারী গরিব ফোকলা গফুরের জন্য কিছু করতে না পারার দরুন-'শুধু একটাই দায় রয়ে গেলে' বলে অনুতাপ প্রকাশ করে। যা কেবল হায়দারের মতো মানুষেরাই বলতে পারে। তাই হিতাকাঙ্ক্ষী কাইয়ুম উকিল তাকে তার লুণ্ঠিত অধিকার ফিরে পেতে উৎসাহ দিলেও সে সাড়া দেয় না। 'মানুষকে সংসারে ঠাঁই পেতে হয়-সংসারই হল মানুষের সেই আসল ঠাঁই, সংসার না হলে মানুষ হয় না'-এমন কথা বললেও জবাবে হায়দার নিজেকে ফকির, দরবেশ ও ক্রিমিনালদের মতো 'দলছুট মানুষ' হিসেবে উল্লেখ করে। তার রক্ত সন্তান মিঠুর শরীরে যে-প্রবহমান রয়েছে এটাকেই বড় প্রাপ্তি বলে মনে করে। মরিয়ম ছেলে মিঠুকে দিয়েও হায়দারকে ধরে রাখতে পারে না। সংসার না পাতলেও ছেলেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেয়। কিন্তু তাতেও সে রাজি হয় না। কারণ-

'মরিয়ম এখনো তাকে টানে, সে একই জায়গায় থাকবে, দুজনায় দেখা হবে, তখন আবার আবেগ আসবে, ভালোবাসা ফের জেগে ওঠবে, ফের সাধ জাগবে সংসারের। কিন্তু মাঝখানের দেওয়ালটা কি সে ভাঙতে পারবে? ঐ দেওয়ালটা কি এই সময় ভাঙা তার উচিত হবে?'-[দ. মো./পৃ.২৩৭]

হায়দার মনের এ অদৃশ্য বাধার দেয়াল ভাঙতে পারে না কিংবা দূর করতে চায়ও না। তাই বিদায়ের সময় মরিয়মের উদ্দেশ্যে বলে-

'আমি আবার আসব, তুমি ভালো থেকো, মানুষের জীবন এমনই-কখনো নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না।'-[দ. মো./পৃ.২৪০]

বিদায় মুহূর্তে এক ধরনের নিরাসক্তি ও নৈর্ব্যক্তিতা রেখে হায়দার পুনরায় রাস্তায় নামে। হায়দার যে-শেষপর্যন্ত জীবনের কোনো স্থিতি, ঠিকানা ও শক্ত মাটি খুঁজে পেল না, জলে ভাসা শেওলার মতো বোহেমিয়ান জীবনকেই বেছে নিলো-এর কার্যকারণ সূত্র নিহিত রয়েছে তার জীবনসমগ্রতার কেন্দ্রে। ট্রাকচালক হিসেবে হায়দার একজন দলছুট মানুষ। সে যেন তার জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেবল দৌড়ে বেড়াতে চায়। ট্রাকটি তার এ জীবনপথের সঙ্গী। হায়দারের পথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* ও *অপরাজিত* উপন্যাসের অপু চরিত্রের সঙ্গে। অপু যেমন কাজলের মাঝেই নিজের শৈশবকে খুঁজে পায়, আবার কাজল থেকে সে সরে যায় অন্য পৃথিবীর পথে; অনেকটা সেভাবেই হায়দার সন্তান মিঠুর দায়িত্ব তার মায়ের কাছে অর্পণ করে জীবনার্থের খোঁজে পথে বেরিয়ে পড়ে। যদিও অপুর মতো দার্শনিক চেতনা তার মাঝে অনুপস্থিত। হায়দার চরিত্রে আবেগময়তা প্রবল; কিন্তু শেকড় সংলগ্নতা কম। সে যেন প্রত্যেকের জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে অথচ নিজে সবার কাছ থেকে যায় দূরবর্তী হয়ে। সে যে-একাত্তরের একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সমগ্র উপন্যাসে তা কোথাও তেমন আড়ম্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়নি। বরং হায়দারকে দেখা যায় পারিপার্শ্বিক ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে। যে-যুদ্ধ করার মানসিকতা সে তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল তা বহন করে নিয়ে যাবার মতো গভীর জীবনবোধ সে অর্জন করতে পারেনি। তার আত্মসংগ্রামের জটিল মনস্তত্ত্বটি গভীর ও স্বতঃস্ফূর্ততা সেভাবে দানাবেঁধে উঠেনি।

হায়দার এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকলেও তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা লেখকের অভীষ্ট ছিল না। তাই চলমান জীবন প্রবাহে আত্মসংগ্রামমুখর চরিত্র সৃষ্টির ধারায় লেখক জুড়ে দিয়েছেন দুটি পরস্পর সম্পর্কিত কাহিনি। *উত্তরের খেপ* উপবিভাগের সবদর-নিশাত-মাহবুবের কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হায়দার যুক্ত। আবার *দক্ষিণে মোহনা* উপবিভাগের হায়দার-মরিয়ম-আজহারের কাহিনি হলো হায়দারের জীবনোপলব্ধির ভিত্তি।[১৮] *উত্তরের খেপ* উপন্যাসে হায়দারের চেতনাকোণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আন্তরিক প্রতিচ্ছবি। সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত হায়দারের তিন পুরুষের ইতিহাস ধরা পড়েছে এ উপন্যাসে। জীবনবাদী লেখকমাত্রই উপন্যাসের ফরম

নিয়ে বেশি নিরীক্ষাপ্রবণ হন না। শওকতের *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটিও জীবনের অনিবার্য তাপে ব্যঞ্জিত। বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রক্তিম ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে *উত্তরের খেপ* বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য এক সংযোজন।[১৯] শওকতের *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটিতে সাতচল্লিশের দেশভাগের নষ্ট রাজনীতির নখরচিহ্ন ও নীড়হারা মানুষের আর্তি-উৎকণ্ঠা ও উন্মূলিত জীবনসংগ্রামের চিত্র থাকলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়-স্বভাব ও সমাজবাস্তবতার বাণী মুখ্য হয়ে উঠেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য তাপ-চাপজনিত প্রতিরোধের প্রথম প্রহরের প্রস্তুতি, যুদ্ধকালীন ভয়াবহতা এবং যুদ্ধোত্তরকালীন মানুষের বিশেষত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনসংকটের নানা অনুষঙ্গকে লেখক জীবনঘনিষ্ঠ করে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি তথা বাঁকবদল এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মানুষদের জীবনের উত্থান-পতন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে শওকত সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। একাত্তরের স্বপ্ন বাহাত্তর হয়ে পঁচাত্তর পরবর্তীকালের বাস্তবতায় যে-ব্যর্থ, বিবশ, বিবর্ণ হয়ে যায়; মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর যে-দাপট-দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এ সুযোগসন্ধানী শ্রেণির হাতে নিগৃহীত হয়ে এদেরকে অস্তিত্বসংকটে ঘুরপাক খেতে হয়–তারই জ্বলজ্যান্ত চিত্র এখানে বিশ্বস্ততার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পঞ্চাশের দাঙ্গা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, বাঙালি-বিহারি-দ্বন্দ্ব, পঁচাত্তরের পরবর্তী রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তনজনিত স্বৈরশাসনামলের দুর্বৃত্তায়ন ও দুঃসময়ের প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি।

মানুষ সহজাতভাবেই পূর্বের ন্যায় প্রচলিত ধারায় ও পুরনো বিশ্বাসে বাঁধা। অথচ ভেতরে-বাইরে ঘটে চলে অনবরত পরিবর্তন। স্বপ্নদেখার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না বলে তার স্বপ্ন প্রতিনিয়ত ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'- এ ভবিতব্য মানুষের জন্য নির্দিষ্ট বলেই দক্ষিণের মোহনার টানে হায়দারদের মতো মানুষের জীবননৌকাটি ছুটে চলে। সময়শাপিত এ যুগসন্তানেরা অধিকতর অন্তর্দ্বন্দ্বে তাড়িত; তাই সিসিফাসের মতোই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় তাদের সকল উদ্যম, শ্রম, ঘাম আর প্রয়াস। এমন আত্মবিচ্ছিন্ন, আত্মীয়বিচ্ছিন্ন, উন্মূলিত ও বিচ্ছিন্নতার শরবিদ্ধ মানুষের জীবনালেখ্য হয়ে উঠেছে এ উপন্যাস। শওকত আলী *উত্তরের খেপ* উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের সময়স্বভাব, সমাজসংকট ও ব্যক্তিমানুষের উদভ্রান্তিকে বাস্তবমণ্ডিত করে নিষ্ঠা ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে রূপায়ণ করেছেন।

হিসাব নিকাশ

শওকত আলীর *হিসাব নিকাশ* (১৯৯৮খ্রি.) উপন্যাসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সংক্ষুব্ধ সময়ের এক অস্থির ও আশঙ্কার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর গণমানুষের হতাশা এবং গোটা আশির দশক জুড়ে জেঁকে বসা কংসরূপী সেনাশাসনের বিকৃত ও বিকলাঙ্গরূপ এ উপন্যাসে প্রবল হয়ে উঠেছে। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন, সামরিক শাসকের পুনরাভিষেক এবং এ শাকুনিক সরকারের মদদে স্বাধীনতাবিরোধী ও রাজাকারদের পুনর্বাসনের উল্টোরথযাত্রার ইতিকথাই এ আখ্যানের মৌল উপজীব্য। এ স্বৈরযুগের বলয়ঘেরা বিবিক্তির দেয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তমনা মানুষেরা যেমন দমন-পীড়ন হতাশায় ন্যুব্জ হয়ে পড়ে, তেমনি রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনায় ক্ষমতার বিকলাঙ্গরূপকে দীর্ঘস্থায়ীকরণে যুবশক্তিকে মাস্তানবাহিনীরূপে ব্যবহার এবং এতদ্‌জাত বিনষ্টি ও বিপর্যয়ের চিত্রও পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পায়। প্রায় দুই দশকব্যাপী চলমান সময়স্বভাবের দুষ্টক্ষত, চেতনার বিকার-বিকৃতি এবং মূল্যবোধের বিকলাঙ্গ রূপ এ উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে।

শওকত আলীর শিল্পিসত্তার নেপথ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় থাকে তিনটি প্রবণতা বা প্রয়াস। প্রথমত; তিনি তাঁর লিখনিকে মূলত প্রতিবাদের হাতিয়ারস্বরূপ বিবেচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত; একজন জীবনবাদী ও বাস্তববাদী কথাশিল্পী হিসেবে মানব জীবনের অবিকল রূপ অঙ্কনে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তৃতীয়ত; তিনি সমাজের সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন ও সংগ্রামের মধ্য থেকে এক অবিনাশী শক্তির উৎস অন্বেষণ করে একে সমবায়িক ও সম্ভাবনার বিস্ফোরক সূত্রে রূপায়ণ করেছেন।[২০] শওকত আলীর *হিসাব নিকাশ* উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের এক অস্থির সময়-অনুষঙ্গ এবং রূপান্তরিত সময়ের প্রেক্ষাপটে নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রের জটিল সমাজবাস্তবতার রূপ অঙ্কিত হয়েছে। নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রের নানা জটিল হিসেবের মেলবন্ধনে শক্তিমান হয়ে ওঠে স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় বহুজাতিক পুঁজিবাদী

লুটেরাশ্রেণি। জীবনযুদ্ধে এবং জীবিকার লড়াইয়ে হতাশাগ্রস্ত বিপন্ন মুক্তিযোদ্ধা সাজিদের জীবনসংগ্রামের অনুষঙ্গে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন এক দীর্ঘ সময়খণ্ডের বহু বঙ্কিম অভিজ্ঞান।[২১] ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র অনিশ্চয়তা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বস্তুত চিত্রিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়প্রবাহের অন্তর্গত দ্বন্দ্বজটিল বাস্তবতা।

সাজিদ আহসান একজন প্লাটুন কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরের পূর্বে বামপন্থী ছাত্রনেতা সাজিদ সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও দেশস্বাধীনের পর সে কাকতালীয়ভাবে ব্যবসায় জড়ায়। সৎভাবে অর্থ উপার্জন আর সুস্থ রাজনীতির জন্য সেও ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে । বন্ধু আখতার তার সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়ী ইন্দুকান্ত যোশীর পরিচয় করিয়ে দেয়। যোশীর চা, ব্লেড, টিন ও দুধের ব্যবসায়ের জন্য ঢাকা শহরের একজন ক্ষমতাবান লোকের সাহায্য ও আশ্রয়-প্রশ্রয় খুব জরুরি ছিল। এমতবস্থায় আখতারের কথায় সাজিদ রাজি হয় এবং মতিঝিলে পূর্বাশা এন্টারপ্রাইজ নামক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়। যার এম.ডি-র পদ পায় সাজিদ। সাজিদ শুধু অফিসে বসে কাগজপত্র সই করতো, দেশে ঘোরাঘুরি করতো আখতার এবং বিদেশের দিকটা সামলাতো যোশী। আর–'তাতেই টুয়েন্টি পার্সেন্ট এর হিসেবে এক গোছা নোট পেত সে।' এতেই সাজিদ খুশি ছিল। কিন্তু চুয়াত্তরের দিকে আখতার আর যোশী বিদেশ চলে গেলে সাজিদ খুব অসহায় আর অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে। কারণ ব্যবসায়ের কলাকৌশল বলতে সে কিছুই বুঝতো না। এমন বিপদের দিনে তারই অফিসের কর্মচারী কুমুদ বাবু মাহফুজ খানকে জুটিয়ে আনে। এ মাহফুজ সাহেবের– 'খুলনায় গোটা দুই জুটপ্রেস, যশোরে ভালো জায়গায় জমি এবং একখানা বার্জ চলে নারায়ণগঞ্জ-চিটাগাঙ লাইনে।' এসব মাহফুজ করেছিল একাত্তরের পূর্বে আগাখানী এক করাচিবাসী পাঞ্জাবি লোকের টেক্সটাইল মিলের ম্যানাজার হয়ে। উনসত্তর ও সত্তরের রাজনৈতিক গোলযোগ আর দুর্নীতির মাধ্যমে মালিকের ব্যবসায় ধ্বংস করে নিজেই জুটপ্রেস আর কোস্টার বার্জের মালিক হয়। এছাড়া একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার হিসেবে বহু শত্রুসম্পত্তি (হিন্দুদের) গ্রাস করে ফুলে ফেঁপে ওঠে। উপরন্তু বর্ধমান থেকে আসা বড়লোক শাশুড়ির সমস্ত সম্পত্তি সে জোর করে কুক্ষিগত করে। এমনকী আপন ভায়রা রহিম সাহেবের প্রাপ্য অংশও কেড়ে নিতে তার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়। এ মাহফুজকে পার্টনারশিপ করার মাধ্যমেই সাজিদ এক জটিল অবস্থায় পড়ে। কারণ–

> 'সে নিজে, রহিম সাহেব, মাহফুজ সাহেব, তার ভাই মাসুদ সাহেব, মাসুদ সাহেবের স্ত্রী রীনা– সবার ভাগ্য এক সঙ্গে জড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। আর সে পাকানো জট এমনি জটিল যে, সেটা খোলার সাধ্য কারো ছিল না।'–[*হিসাব নিকাশ*; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৯ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৮/পৃ.৫৮]

ব্যবসায়িক সূত্রেই মাহফুজের ভাই মাসুদের চার বছর ঘরসংসার করা ডিভোর্সি বউ এবং এক মেয়ে সন্তানের মা নাসরিন বেগম রীনার সঙ্গে সাজিদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে মাসুদের সঙ্গে যেমন তার সম্পর্ক শত্রুতায় রূপ নেয়, তেমনি মাহফুজ অযাচিতভাবে কোম্পানির শেয়ার দাবি করায় তাকেও সাজিদ চরম অপমান করে বিদায় করে। মাহফুজ সহজে সরতে চায়নি। কিন্তু সাজিদ মারমুখীভাব নিয়ে মাহফুজকে শাসিয়ে বলে–

> 'আমার কাছে গোটা তিনেক পিস্তল রিভলভার আছে আর ওগুলো চালাবার জন্য যে কত মানুষ আছে তার হিসেব নেই।...আমরা রাজাকারদের লিস্ট করেছি, কোনো সরকারি ব্যাপার নয়– একেবারে প্রাইভেট ব্যবস্থা– সমস্ত রাজাকারদের আমরা এলিমিনেট করব।'-[হি.নি./পৃ.৬১-৬২]

এমন হুমকি খাওয়াতে মাহফুজ আর হালে পানি পায়নি। কারণ বাহাত্তর সনে রাজাকার হিসেবে সে ধরা পড়েছিল এবং পাকিস্তান আমলেই পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীর সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার জন্যে মামলাও ছিল তার বিরুদ্ধে। মাহফুজকে তাড়িয়ে দিয়ে সাজিদ শিবশঙ্কর রেড্ডি ও পিয়ারে লাল প্যাটেলকে পার্টনারশিপ করে ব্যবসায়কে কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এসময় একাত্তরের সহযোদ্ধা বন্ধু মান্নানের পাল্লায় পড়ে সাজিদকে প্রায় দেউলিয়া হতে হয়। তার সঙ্গে ইউরোপ প্রবাসী মান্নানের এমন প্রতারণার জন্য একাত্তর-পরবর্তী দেশের কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতিও কিছুটা দায়ী ছিল। কারণ যে-স্বপ্ন, প্রত্যাশা নিয়ে তারা দেশস্বাধীন করেছিল, তা বাহাত্তরে এসেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এ কারণেই ক্ষোভের সুরে সে সাজিদকে চিঠি লিখে জানায়–

> 'আমার ভুল হয়েছিল যে চোরাচালানি করিনি, ভুল হয়েছিল যে ড্রাগস আর সোনাপাচার করিনি। তখন করিনি, কিন্তু এখন করব। এবং আমার পরামর্শ, তুমিও করো।'-[হি.নি./পৃ.৪২]

বড় স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা মান্নান অভিমানবশত দেশত্যাগ করে এবং সুযোগ বুঝে দেশের মানুষের সর্বনাশ করে একধরনের আত্মতৃপ্তি পায়। স্বাধীনতা-উত্তর শাপিত সময়বাস্তবতার দাবদাহে মান্নানও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চুয়াত্তর থেকে আশি সনের মধ্যেই সাজিদ নিজের ব্যবসায় গুছিয়ে নিয়েছিল। মতিঝিলের মতো জায়গায় নিজস্ব অফিস, দুতিনটি টেলিফোন, একটি মাইক্রোবাস, একটি ভেসপা মোটর সাইকেল এবং ব্যাংকের কিছু ব্যালেন্স– সবমিলিয়েই সে নিজেকে প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। কিন্তু বন্ধু মান্নানের প্রতারণায় তার একেবারে পথে বসার উপক্রম হয়। টাকার অভাবে শুধু দারোয়ান রেখে সব কর্মচারী বিদায় করে এবং টেলিফোন লাইনও সচল রাখতে পারে না। ব্যাংকের মাত্র ত্রিশ হাজার টাকার ওপর ভর করে সে ক্যামিকেল কর্পোরেশনের অধীনে ঠিকেদারি করার টেন্ডার জমা দেয়। এ কাজটি বাগিয়ে নিতে দালাল জাহাঙ্গীরকে ধরে। তাই টেন্ডার মিটিংয়ের দিন সকাল বেলা পুরাতন ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের গলি-ঘুপচির জীর্ণ-শীর্ণ জাহাঙ্গীরের বাসায় যেতে বাধ্য হয়। এ দালাল চোরাকারবারি জাহাঙ্গীর নিজের বউ-বাচ্চা জয়দেবপুর রাখলেও ঢাকার বাসায় কাজের মেয়ে যুবতী ফুলবানুকে রক্ষিতার মতো ব্যবহার করে। বিছানায় পড়ে থাকা কনডমের প্যাকেট এবং প্লেবয় পর্ণোপত্রিকা তার বিকৃত যৌনজীবনের ইঙ্গিতবাহী। দালাল জাহাঙ্গীর সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তিকর তথ্য জানার পরেও শুধু নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই সাজিদকে বাধ্য হয়ে ঘিনঘিন পরিবেশে বসতে হয় এবং কপট দালালের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বেলা এগারোটার সময় টেন্ডারের মিটিং হবার কথা থাকলেও জাহাঙ্গীরের তেমন তৎপরতা দেখতে না পেয়ে সাজিদের মনে নানা অকল্যাণের সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ মিটিং বসার পূর্বে ডেল্টা কর্পোরেশনের নুটু চৌধুরী ও তার বোন যূথীকে এবং সেক্রেটারি ও কর্মকর্তা আফতাব সাহেবকে ধরতে না পারলে টেন্ডার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই জাহাঙ্গীরের শরীরের অনাবৃত লজ্জাস্থান ও প্লেবয় পর্ণোপত্রিকার ওপর নজর পড়াতেই সে নিজেকে সংযত করে এবং নানা অশুভ-অকল্যাণের আশঙ্কায় তার মনে উদয় হয় নানা অভিশঙ্কার বীজ। তাই সে–

> 'মনে মনে আস্তাগফেরুল্লাহ পড়ল–আজ তার কপাল নির্ঘাত খারাপ। নইলে সকাল সকাল ওইসব জিনিস তার চোখে পড়বে কেন।...কপালে কী যে দুর্ভোগ আছে আল্লাহ জানে।'-[হি.নি./পৃ.১৬-১৭]

গভীর হতাশা থেকেই সে যেমন নিয়তির কথা ভাবে, তেমনি আবার জাহাঙ্গীরকে অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা না দেবার বোকামিতে আপসস করে। কিন্তু পুনরায় এ দালালের ক্ষমতা নিয়েও তার মনে সন্দেহ জাগে। টেন্ডার নিয়ে বর্তমানে দেশে অন্যায়–অনিয়ম, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন এবং পেশীশক্তির প্রয়োগ হতে দেখে সাজিদের একসময়কার সহকর্মী প্রবীণ সাংবাদিক আবুল কাসেম আনসারীর কথা মনে পড়ে। যিনি চুয়াত্তর সনে রাতের বেলা ডিউটি শেষে বাসায় ফেরার পথে রাজনৈতিক ক্যাডারদের ব্যাংক ডাকাতির সময় এলোপাথারি গুলিতে মারা যান। তিনি বাহাত্তর সনে দেশের দুর্গতি আর দুরবস্থা দেখে সাজিদকে কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন–

> 'তোরা যুদ্ধ করলি ভালো কথা, দেশ স্বাধীন করলি, সেটা আরো ভালো কথা–কিন্তু যুদ্ধ জয় করে দেশটাকে কাদের হাতে তুলে দিলি?...বুঝবি পরে। যারা যুদ্ধ করেনি, তাদের হাতে দেশটা তুলে দিয়েছিস তো, মজাটা টের পাবি।'-[হি.নি./পৃ.২২]

যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীন দেশের সুফল সুবিধাবাদীগোষ্ঠী আর স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের হাতে পুরোটা চলে যাওয়ায় হতাশ হয়ে সাংবাদিক কাসেম সাজিদকে এ কথাগুলো বলেছিলেন। দেশের চলমান বিপর্যয় দেখে ও রাজাকারদের দাপট-দৌরাত্ম্য দেখে তিনি সাজিদকে নিউজ ডেস্কে না বসে সম্পাদকের চেয়ারে বসার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন–

> 'টেবিলে বসে নিউজ তৈরি করার জন্য অনেক লোক পাওয়া যাবে। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার লোক পাওয়া যাবে না–শত্রু খতমের কাজটা শেষ করো আগে।'-হি.নি./পৃ.২২]

কিন্তু নানা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সাজিদরা এ সুবিধাবাদী গোষ্ঠীকে উৎখাত করতে পারেনি। যার দরুন এসব নষ্টদের রাজ্যে, নষ্টদের ভিড়ে তাদের মতো সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের পদে পদে বাধা-বিপত্তি ও হয়রানির মুখে পড়তে হয়। আর অস্তিত্বসংকটও প্রকট হয়ে ওঠে। এরকম নানা আশঙ্কার মধ্যে তার বদলে নেহাল সাপ্লাই ফার্মের টেন্ডার বাগিয়ে নেবার খবর শুনে সাজিদ হতাশায় ভেঙে পড়ে। আর বলে– 'আসলে আমার কপালটাই খারাপ বুঝলেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।' তবে বাস্তবতা ব্যাখ্যা করতে জাহাঙ্গীর সাজিদকে জানায়–

> 'নেহাল সাপ্লাই এর পেছনে ইউনিভার্সিটি এলাকার প্রেসার গ্রুপ আছে– তার পেছনে আবার মন্ত্রী– কী করবেন বলুন?...মন্ত্রীরা পর্যন্ত সুপারিশ করছে –কন্ট্রাক্টা নেহাল সাপ্লাই- ই পাচ্ছে।'-[হি.নি./পৃ.৩৬]

এমন ছোট একটি কাজের তদবিরের জন্য মন্ত্রীদের টাকার বিনিময়ে সুপারিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের চাপ এবং টেন্ডার অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি– সব মিলিয়েই দেশের এ দুর্বৃত্তায়নের অবস্থা দেখে সাজিদের মনে ঘৃণা ধরে। পরিবেশের মোড় ঘোরাতে সান্ত্বনার সুরে জাহাঙ্গীর সাজিদকে বলে–

> 'আপনার ভাই খুব শিগগির বিয়ে করে ফেলা উচিত–এমন মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা–ডিভোর্সি হলে কী হবে, দেখতে কেমন, আর চাকরিটাও দেখতে হবে।...জীবনে খাঁটি ভালোবাসা বার বার আসে না, আপনি জানেন না, ভালোবাসাহীন সংসার একটা নরক।...মহিলাকে ভাই ফিরিয়ে দেবেন না–আমার খুব মায়া লাগে ওকে দেখলে।'-[হি.নি./পৃ.৩৩]

এসব কথা জাহাঙ্গীর তার সহজাত দালালি আর বাকচাতুর্যের ভাবধারায় বললেও সাজিদ একে অস্বীকার করতে পারে না। অথচ জীবনের এমন টানাপোড়েনে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। রীনা চারদিন মতিঝিলের অফিসে এসে অপেক্ষা করেও তার সাক্ষাৎ পায় না। প্রেমাস্পদের এমন দৈন্যদশা দেখে রীনাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সাজিদের সঙ্গে পুনরায় ঘর বাঁধার যে-স্বপ্ন নিয়ে সে অপেক্ষায় ছিল, তাও দিনেদিনে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাজিদের ব্যবসায়িক দুর্দিনে বিয়ের কথা বলার মতো অবকাশও সে পায় না। নিজের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে রীনাকে সাজিদ জানায়–

> 'আমাকে সব ক্লেইম শোধ করে দিতে হলো, এখন ব্যাংক একাউন্ড ফাঁকা–তারপর পঞ্চাশ হাজার টাকার ওডি–অফিস, অফিসের চেয়ার-টেবিল খাতাপত্তর সমস্ত কিছুই ব্যাংকের কাছে বাঁধা–আমি সুদ্ধ।মরতে চাইলেও মরতে পারব না।'–[হি.নি./পৃ.৩৮]

এমন বিপদের দিনে সাজিদ যে-অফিস বিক্রি করে দেবে তাও ব্যাংক লোনের জন্য পারে না। আবার দুর্নীতিবাজ-রাজাকারদের পাল্লায় পড়ে ব্যর্থ হয়ে বসে যাবে–তাও সে মেনে নিতে পারে না। তাই মনের অশান্তি আর অস্বস্তির কারণে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় এবং রীনাকেও এড়িয়ে চলে । সাজিদের এ বাউণ্ডুলে-বোহেমিয়ান জীবন দেখে রীনা আতঙ্ক অনুভব করে। রীনার চোখে ধরা পড়ে–

> 'সাজিদ বদলাচ্ছে। একেবারে ভেতরের দিকে কোথাও অদল বদল ঘটছে ওর মধ্যে। এবং ঐখানেই রীনার ভয়। মানুষটা হাসিখুশি তো ভুলে গেছেই–এখন কেমন নিজের ওপর থেকেই আস্থা হারাতে বসেছে'-[হি.নি./পৃ.৩৮]

সাজিদের এভাবে ডুব দিয়ে থাকা, গুটিয়ে থাকা এবং পরিচিত আপনজন থেকে দূরে দূরে থাকা দেখে রীনা আঘাত পায় এবং এক ধরনের আশঙ্কা অনুভব করে। তার মনে উদয় হয় –'একটা মানুষ জীবনের একটা দিক পুরো ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবে? শরীরের প্রয়োজনও তো বোধ করে একজন পুরুষ মানুষ–তাহলে? তাহলে কি আসলে মানুষটা বদলে ফেলেছে নিজেকে?' এমন আশঙ্কা থেকেই রীনা তার ভবিষ্যৎ জীবনপরিকল্পনা নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আবার সুযোগ-সন্ধানী ডেল্টা কর্পোরেশনের সঙ্গে সাজিদের সম্ভাব্য পার্টনারশিপের কথা জেনেও দুশ্চিন্তায় পড়ে। কারণ- 'নুটু তো নাম্বার ওয়ান লাফেঙ্গা, গুণ্ডামি-মাস্তানি করতো, এখন কিছুটা ভদ্র হয়েছে, ওকে সামনে রেখে ওর বোন যূথীই ব্যবসাটা চালায়। ওই হলো আসল লোক, ওর কর্তা জামান খান, জয়েন্ট সেক্রেটারি– ওরা ওকে গিলে খাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।' আবার সাবেক স্বামী শত্রুসম মাসুদের বিষয়েও রীনা চিন্তিত হয়ে ওঠে। কারণ মাসুদের বিভিন্ন অজুহাতে মেয়েকে ফোন করা, জামা-কাপড় পাঠানোর ছলে-ছুতোয় দেখা করার কথাও রীনার মনে পড়ে । 'এগুলোই মাসুদের কৌশল। এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার দিয়ে সে ঘিরে ধরতে চায়।'– এসব রীনা বুঝতে পারে। তাই রীনার মনে হয়–

> 'জীবনকে শুধু দূর থেকে সে দেখেই গেল। ভেতরে ঢুকতে পারল না; কেবল দূরের ডাক শুনল। সেই দূরে পৌঁছাতে পারল না। এমনকি এই সেদিনও পারেনি। সাজিদ যেদিন বিয়ের প্রস্তাব দিল সেদিন সঙ্গে সঙ্গে কি সে রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যেতে পারত না? খুব পারত কিন্তু মনে মনে তখন তার কত রকমের হিসেব, কত রকমের বিবেচনা। সে পিছিয়ে গিয়েছিল, আর এখন! এখন তাকেই ছুটতে হচ্ছে ঐরকম একটা মুহূর্ত কখন আসবে সেই জন্য।'-[হি.নি./পৃ.৫০]

এভাবে সাজিদের ভাগ্যের মতো রীনার ভাগ্যও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে জড়িয়ে যায়। যেখান থেকে কেউ সহজে বেরুতে পারে না। মনের ক্রমাগত অস্থিরতা, হতাশা আর বেদনা দূর করতেই সাজিদ রাতে মদ পান করে বাড়িতে ফেরায় বাবা-মা, ভাই-বোনসহ সবাই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। মা আয়েশা খাতুন তাকে কল্যাণপুরের জমি বিক্রি করে টাকা ব্যবসায় খাটাতে বললেও সে রাজি হয় না। এমন পরিস্থিতিতে দালাল জাহাঙ্গীর তাকে নতুন করে নুটু চৌধুরীদের ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসায় করতে পরামর্শ দেয়। কিন্তু সাজিদ এতে সায় দেয় না। তাই জাহাঙ্গীর রাগ করে বলে–

> 'আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না, কীভাবে আপনি প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন।...এমন করলে আপনার খুব ক্ষতি হবে–যদি এভাবে নিজেকে গোটাতে আরম্ভ করেন, তাহলে ঠিক মারা পড়বেন।'-[হি.নি./পৃ.৫৪]

কিন্তু সাজিদ 'আমার মারা পড়তে এখনো কিছু বাকি আছে?'–নিজের প্রতি এমন কটাক্ষ ছুঁড়ে শেষপর্যন্ত পার্টনারশিপ চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে প্রেসক্লাবে যায় এবং বহুদিনের পুরাতন বন্ধু অবজার্ভার পত্রিকার নাফিসকে খুঁজে পায়। নাফিস সাজিদকে নিয়ে একটি প্রত্রিকা বের করার প্রস্তাব দেয় এবং অর্থের যোগানদাতা হিসেবে জহিরুল্লাহর কথা বলাতে সে বাধা দিয়ে বলে–

> 'লোকটা এন.এস.এফ করত না? পরে যুদ্ধের সময় করাচি পালিয়ে যায়, বাবা বড় ব্যবসায়ী–মুসলিম লীগ করতো।'-[হি.নি./পৃ.৬৪]

অর্থাৎ আইয়ুব খানের পোষাগুণ্ডা, পাকিস্তানপন্থী জহিরুল্লাহও দেশে ফিরে জাতে উঠতে যেকোনো শর্তে পত্রিকা বের করতে চায়। এতে সাজিদের মতো সাহসী একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পার্টনার হিসেবে পেলে ব্যবসায় করতে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না। সাজিদের মুখে এসব শুনে এবং ব্যবসায় নেমে জাত-পাতের বাছ-বিচার করতে দেখে নাফিস বলে–

> 'দেখ শেষ পর্যন্ত তুই পারবি না– ব্যবসায়ে তুই টিকেছিলি কেমন করে, সেটাই আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতো।
> তোর মতো ছেলে শেষপর্যন্ত ব্যবসায়ী হবে– ভাবা যায়?'-[হি.নি./পৃ.৬৫]

নাফিস দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ, হেলাল ও নুরুদ্দিনের কথা উল্লেখ করে। আশরাফ ব্যবসায় বাদ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে, হেলাল ব্যবসায়ের ঝামেলায় পড়ে জার্মানে না সুইডেনে পালিয়েছে আর নুরুদ্দিন ব্যবসায় বাদ দিয়ে এখন দালালি করছে। তারপরেও সাজিদ বলে–'আমাদের মধ্যে থেকেই তো কাউকে না কাউকে ব্যবসা করতে হবে।' জবাবে নাফিস 'ব্যবসা মানেই চুরি–সবাই কি তা পারে?'– বলে সাব্যস্ত করে। সাজিদ প্রতিউত্তরে বলে–

> 'বাহ কেন পারবে না?...ব্যবসা মানেই প্রফিট আর প্রফিট মানেই চুরি, ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা–প্রফিটের সঙ্গে এসব জড়ানো থাকে।...আর পোস্ট কলোনিয়াল পুঁজি মানেই মুৎসুদ্দি পুঁজি–থার্ডওয়ার্ল্ড এর সব দেশেই এই প্রসেস–এভাবেই ক্যাপিটাল ফর্ম করবে, তার বিকাশ হবে–এবং কাজটা হবে তোর আমার মতো লোকদের দিয়েই।'-[হি.নি./পৃ.৬৫]

সাজিদের মুখে এসব কথা শুনে নাফিস অবাক হয় এবং রাগের ভঙ্গিতে বলে–'তুই একটা নাম্বার ওয়ান শয়তান– সব জেনেশুনে তাই শয়তানি করতে চাস।' কিন্তু এতে সাজিদ তেমন রাগ করে না বরং বলে–'হ্যাঁ চাই, সব জানা শোনাও আমার আছে– কিন্তু দুঃখ এই যে, যথেষ্ট শেয়ানা শয়তান হতে পারিনি। হতে পারলে আমার এমন দুরবস্থা হতো না।' অর্থাৎ নীতি-আদর্শ ও মানবিক সহানুভূতি থাকার কারণেই স্বৈরশাসিত বাংলাদেশে সাজিদের মতো সাহসী ও সম্ভাবনাময় মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের বার বার প্রতারিত হতে হয়। শেষে সাজিদ পার্টনারশিপ চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে। তিনটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ পেলে অনেকেই টেলিফোন করে সাজিদের রানিং ক্যাপিটাল, ব্যাংকের একাউন্ট নাম্বার, এক্সপোর্ট ও ট্রেড লাইসেন্সের খোঁজ নেয়। কিন্তু সাক্ষাৎ করার আগ্রহ দেখায় না। এমতবস্থায় নাফিসের মাধ্যমে শেরাটন হোটেলে কুয়েত-সৌদির বড় ব্যবসায়ী রাজাকার হরমুজ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সব দায়দায়িত্ব এবং টাকা পয়সাও ঢালতে চায়। কিন্তু সাজিদকে তার অফিস বিক্রি করতে অথবা ভাড়া দিয়ে ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করার প্রস্তাব দেন। সাজিদ ভীষণ ক্ষেপে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে। এসময় তার অফিসের একমাত্র পিয়ন বিদায় নিলে সে কষ্ট পায়। বাধ্য হয়ে সাজিদ নিজেই অফিস খুলে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের হিসেব-নিকেশ আরম্ভ করে। কারণ এখন যে-অবস্থায় সে দাঁড়িয়েছে, তাতে তাকে শেষপর্যন্ত হরমুজ খানের চাকর হতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভেজাল মালামাল আমদানি, ড্রাগস ও সোনাপাচারেও সম্মতি দিতে হবে। কারণ বর্তমানে ছোট ছোট ঠিকেদারি ও ব্যবসায় যেমন করা যাচ্ছে না; তেমনি রাজাকার ও সুবিধাবাদীগোষ্ঠীর সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসায়েও মন সায় দেয় না। এমতবস্থায় রীনার হতাশায় সাজিদ তাকে বিয়ে করার কথা বলে কোর্টে যায়। কিন্তু উকিল পাওয়া গেলেও বিয়ের সাক্ষী না পাওয়াতে ম্যাজিস্ট্রেট বিয়ে পড়ায় না। কোনো পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় দ্বিতীয়বারের মতো তারা ব্যর্থ হয়। তবু খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করার কথা জানিয়ে তারা ফিরে আসে। এসময়ে মাসুদ রীনাকে কাবু করতে ও নিজের কব্জায় নিতে মেয়ে সোমাকে স্কুল থেকে তার বাসায় নিয়ে যায়। এমনিতে ভীতু ও লম্পট মাসুদকে রীনা পাত্তা না দিলেও একটা অজানা ভয় ও সন্দেহ তার মনে উদয় হয়। কারণ–

> 'এমন হ্যাংলামিপনা মাসুদ দেখায় বটে, আসলে তো সে ভয়ানক ধূর্ত আর হিসেবি।...আর সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার নিজেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারে মানুষের নজর থেকে। ৭১-এ শান্তি বাহিনীতে কাজ করতো– এখনো তার ওসব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ, কিন্তু বাইরে থেকে সেটা কেউ জানতে পারে না।'-[হি.নি./পৃ.৮০]

এমতবস্থায় সাজিদ কোর্টে গিয়ে বিয়ে করার সমস্ত আয়োজনের কথা জানালেও রীনা মেয়ের এ ঘটনার জন্য রাজি হতে পারে না। বাধ্য হয়ে বিয়ের দিন পিছিয়ে দেয়া হয় এবং তৃতীয়বারের মতো এ উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। দালাল জাহাঙ্গীরের পীড়াপীড়ির কারণে সাজিদ পার্টনারশিপের বিষয়ে আলোচনা করতে নুটু চৌধুরীদের ডেল্টা কর্পোরেশনের অফিসে যায়। নুটু ও তার বোন যূথীকে সবকিছু শৃঙ্খলার সঙ্গে গুছিয়ে দূরদর্শিতা ও দাপটের সঙ্গে চালাতে দেখে সাজিদ বিস্মিত হয়। কারণ এ নুটু চৌধুরীকে সাজিদ– 'পুরনো ঢাকার মাস্তানদের সঙ্গে বসে মদ খেতে, নিউ ইয়ার্স ডের মধ্যরাতে টলমল পায়ে নাচতে দেখেছে। এখন সেই লোক শান্ত, স্থির, গম্ভীর ও বিনয়ী।' আবার তার বোন সুন্দরী ও বাকচতুর যূথীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি দাঁড় করার উদ্যোগ এবং সচিবালয়ের সকল সাপোর্ট পাবার কথা শুনেও সাজিদের ঘোর লাগে। আরো অবাক হয় যখন যূথী তার দুহাত চেপে ধরে বলে–

> 'পোস্ট লিবারেশন পিরিয়ডে এই আর একটা ফাইট–এটা মুক্তিযোদ্ধার মতো অন্যরা তেমন ভালো পারবে না। লজিক্যালি তাদের সেই কমিটমেন্ট থাকার কথা নয়।'- [হি.নি./পৃ.৯০]

যূথীর কথায় সাজিদের 'লুম্পেন ক্যাপিটালিজম ও চুরি-চামারি করে পয়সা কড়ি করার' যেন তেন উপায়ে বড়লোক হবার কথা মনে পড়ে। আর ইন্দুকান্ত যোশী, বন্ধু আখতার ও মুক্তিযোদ্ধা প্রতারক মান্নানের কথাও স্মরণে আসে। এরা সবাই পুঁজি করতে তাকে ব্যবহার করেছিল। সাজিদ নানাবিধ চিন্তায় স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কিন্তু পরদিন দেখা যায় পনেরো হাজার টাকার বিল পরিশোধ না করার দায়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সাজিদের টেলিফোনগুলো সব সচল হয়ে গেছে। সাজিদের কাছে সবকিছু ভেলকিবাজির মতো লাগে। যা নুটু চৌধুরীর দুলাভাই জয়েন্ট সেক্রেটারি জামান খান ব্যবসায়িক যোগাযোগের স্বার্থে টিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ধরে এটি করেছেন। আমলাদের এ প্রভুসুলভ প্রভাব-দাপট, দুর্নীতি ও সুযোগসন্ধানী প্রবণতা দেখেও সাজিদ বিস্মিত হয়। নুটু চৌধুরীর লোকজন এসে সাজিদের পূর্বাশা অফিসে ডেকোরেশনের কাজ করতে থাকলেও সে বাধা দিতে পারে না। আবার হরমুজ খান এসময় সহজ শর্তে পার্টনারশিপে ব্যবসায় করতে রাজি হয়ে ফোন দেয়। আর হিন্দুয়ানি 'পূর্বাশা' নাম পাল্টে ইসলামি নাম 'আল মাশরিক' নামকরণের প্রস্তাব করে। সেই সঙ্গে নিজের দুঃখ-অনুতাপের কথা বলতে গিয়ে জানায়–

> 'সবচেয়ে বড় কথা আপনার মতো...একজন ফ্রিডম ফাইটার আমার দরকার– না হলে ঝামেলা হয়। পাকিস্তানি আমলের কথা তুলে আমাকে রাজাকার বলে গাল দেয়।...একাত্তর সালে দেশে ছিলাম সাত মাস, সেই জন্যে শত্রুতামি করে।'-হি.নি./পৃ.৯৪-৯৫]

ব্যবসায়িক স্বার্থে সবাই যে-তার 'ফ্রিডম ফাইটার' তকমাটা ব্যবহারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে–তা বুঝতে পেরে সাজিদ নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। কারণ তাকে–'ব্যুরোক্র্যাট কাম ক্যাপিটালিস্ট এর যেমন দরকার, তেমনি দরকার একজন রাজাকার কাম বিসনেসম্যানেরও।' এমন নানাবিধ চিন্তায় সাজিদ হরমুজ খানকেও সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। আবার–'বিয়ে না ব্যবসা, কোনটা সে হাত বাড়িয়ে নেবে' তারও কোনো লক্ষ্য স্থির করতে পারে না। ফলে সে রীতিমতো ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পড়ে। এসময় নুরুদ্দিনের কথায় আশি হাজার টাকার এক ছোট ঠিকেদারি কাজের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট এলাকায় গিয়ে মাসুদের লেলিয়ে দেয়া যুবশক্তি সংগঠনের মাস্তান সাইমন, বোম্বা ও বোঙ্গা বাহিনীর কবলে পড়ে। তারা তাকে হুমকি দিয়ে বলে –

> 'আপনে তো উইড়া বেড়াইতাছেন–খুব মাস্তান চার্লি হইছেন, তাই না?...মোটর বাইকের পেছনে অন্যের বউকে চাপিয়ে নিয়ে হাওয়া খান...যা করছেন, করছেন– তার বেশি এগোবেন না–বিয়ে টিয়ে করার চেষ্টা করবেন না মহিলাকে। যদি সে চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার বাইকের মতো আপনারও দশা হবে বুঝেছেন?'-[হি.নি./পৃ.১০৫]

ভেসপার কথা শুনে সাজিদ দৌড়ে গিয়ে দেখে তা ভেঙ্গে চুরমার করে দুটি চাকাই ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। একজন পেট্রোল ঢেলে পোড়াতে গেলেও অপর সঙ্গীর নিষেধে তা না করেই সবাই চলে যায়। অথচ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাহসী সাজিদ এর প্রতিবাদও করতে পারে না। তার চৈতন্য জুড়ে একাত্তরের যুদ্ধকালীন ছয় নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জামান ও সুবেদার হাশেম উল্লাহর– 'দুশমনের সামনে মাথা উঠাবেন না–নড়বেন না–লাই নো নেভার বেইজ ইয়োর হেড–স্টেপ ব্যাক–হেড ডাউন–স্টেপ ব্যাক সাইলেন্টলি-র কথা' মনে পড়ে। এসময় সাজিদের ছোট ভাই টোটন ছুটে আসলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর বিধ্বস্ত গাড়ির চেহারা দেখে সে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ সে কী রাজাকার-

চোরাকারবারিদের লাভের সিঁড়ি হবে, নাকী তার প্রেম ব্যর্থ হবে, নাকী সে পরিবারের হাল ধরতে পারবে না–এমন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে সে ভেঙ্গে পড়ে।

সাজিদ চতুর্থবারের মতো বিয়ের দিন ধার্য করলেও এ ঝামেলার কারণে তা ভেস্তে যায়। বন্ধু নুরুদ্দিন তাকে অনেকটা জোর করেই মোহাম্মদপুরে স্বৈরাচার এরশাদের ঢাকা মহানগর শাখার দলীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি কালাম শিকদারের বাসায় নিয়ে যায়। কালাম শিকদার সাজিদকে দেখে দেশস্বাধীনের পর মানিকগঞ্জ দিয়ে ধামরাই হয়ে ঢাকায় ঢোকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং চিনতে পারেন। তিনি খুব কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের গুণ-কীর্তন করেন এবং সরকারদলীয় সাইমন-বোঙ্গা-বোম্বার মতো যুবশক্তির ক্যাডারদের মুখে–'কুত্তার বাচ্চা, খানকির পোলা, জাউরার পয়দা' বলে গালিগালাজ করলেও তেমন কোনো পদক্ষেপ নেন না। তাই আক্ষেপ করে সাজিদ নুরুদ্দিনকে বলে–

> 'ওই মাস্তানদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। মাস্তানরা ভাড়া খাটলে কী হবে–ক্ষমতায় যারা থাকে–ওরা তাদেরই অংশ। পাকিস্তান আমল থেকেই ওরা আছে। এন.এস.এফ এর কথা মনে নেই? সংখ্যায় তখনো কম ছিল। কিন্তু বেশ দাপটের সঙ্গেই ছিল। তখনও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করা যায়নি। স্বাধীনতার পর ফের নতুন করে এদের গড়ে তোলা হয়েছে–এখনো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করা যাবে না।'–[হি.নি./পৃ.১১৫]

সাজিদের বক্তব্যের মাধ্যমে মূলত পাকিস্তান আমল থেকে চলে আসা স্বৈরাচারী শাসকদের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য প্রশাসনের মদদে ভারাটে খুনি, মাস্তান ও ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলা, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃত চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে। যা দেশের পরিচয় বদলে গেলেও, সময় পাল্টে গেলেও সে-প্রতিকারহীন দুর্বৃত্তায়নের ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এদের সম্পর্কে সাজিদের ভাই টোটন জানায়–'ওদের মধ্যে দুজন খুবই ডেঞ্জারাস–কালো মতো লম্বা যেটাকে ঢাকাইয়া কথা বলতে দেখেছ, ওর নাম বোম্বা। আর ফর্সা মতো যেটা, পেছনে মেয়েদের মতো চুল বাঁধা, ওর নাম বোঙ্গা–একটা পপ গ্রুপে বঙ্গো বাজাতো। কিন্তু এখন হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। একজন মানুষকে ও আপেল কেটে খেতে খেতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করেছে ঐ একই ছুরি দিয়ে। ওদের গ্যাং লিডার হচ্ছে সাইমন।' এসব কথা শুনে সাজিদ তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বোন মিনু, ভাই জাহিদ ও টোটন এবং প্রেমিকা রীনার জীবনে বিপদের আশঙ্কা করে। আবার রীনার চিন্তা, জীবিকার চিন্তা এবং পয়সা থাকলে যে- এ মাস্তানদের উল্টো মাসুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যেত–এমন এলোমেলো ভাবনা এসে সাজিদের মাথায় ভিড় করে। ফলে কোনো চিন্তাই সাজিদের–

> 'মনের ভেতরে খুঁটি গাড়তে পারে না–কেমন আলগা আলগা থেকে যায়। কে যেন বুকের ভেতর থেকে বলে ওঠে–উইল্যু সারেন্ডার? উইল্যু কম্প্রোমাইজ?'-[হি.নি./পৃ.১১৭]

অর্থাৎ সাজিদকে জীবনের প্রয়োজনে সময় ও সমাজবাস্তবতায় অব্যাহতভাবে আদর্শের সঙ্গে আপস, আত্মসমর্পণ ও আনত হতে হচ্ছে–এই বেদনা আর অনুতাপই তাকে বেশি দগ্ধ করে। বিপ্লবী চেগুয়েভারা, ফিদেল ক্রাস্টো ও মেজর হায়দারের বিস্ফোরক বাণী মনে আসায় তার আরো খারাপ লাগে। কয়েকদিন পরেই নুটু চৌধুরী ও যূথীর আহ্বানে সাজিদ জাহাঙ্গীরকে নিয়ে ডেল্টা কর্পোরেশনে যায় এবং সিঙ্গাপুর থেকে আসা আগরওয়ালা, হংকংয়ের শীন চিয়াও এবং রাজাকার মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে জানানো হয় আগরওয়ালা ও মাহফুজের টাকায় এবং শীন চিয়াওয়ের মেশিনারিজ ও লেবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং পূর্বশা ও ডেল্টার তত্ত্বাবধানে টঙ্গী-গাজীপুরে ম্যাল্টিন্যাশনাল বেসিস জয়েন্ট ভেনচার রেডিমেট গার্মেন্টস চালু করার পরিকল্পনা। দেশের প্রশাসনিক সব ঝক্কি ঝামেলা সামলানোর বিষয়টি জয়েন্ট সেক্রেটারি যূথীর স্বামী জামান খান নিজে নেবার ঘোষণা দেন। দ্রুত এ ব্যবসায় শুরু করার কথা বলে সবাই বিদায় নিলেও সাজিদ হতাশার ভঙ্গিতে বলে–'ভাবছি, কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে এখন আমাকে ব্যবসা করতে হবে' । রাজাকার ও পূর্বের তাড়িয়ে দেয়া মাহফুজ সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করায় দালাল জাহাঙ্গীর রাগ করে বলে–

> 'এতো খুবই সিম্পল ব্যাপার–হিসেবে মিলল না তাই বাদ গেছেন–ব্যবসা মানেই তো তাই–খামোখা সেন্টিমেন্ট কেন আসবে এর মধ্যে। তখন স্বার্থে বনেনি, তাই বাদ গেছেন–এখন স্বার্থে বনছে, তাই ফের একসঙ্গে যাচ্ছেন, এই তো ব্যাপার।'-[হি.নি./পৃ.১২৩]

অর্থাৎ ব্যবসায় ও পুঁজির জন্য শেষপর্যন্ত সাজিদকে যে-রাজাকার আর চোরাকারবারিদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। এছাড়া মাহফুজ ব্যবসায় যুক্ত হলে তার ভাই মাসুদের সঙ্গে যে-শত্রুতা ও তিক্ততার সম্পর্ক রয়েছে;

তারও যে-সহজে সুরাহা হয়ে যাবে–একথা জাহাঙ্গীরের মুখে শুনে সাজিদ আরো চিন্তিত হয়। কেননা এতে করে শত্রুকে, অপছন্দের মানুষকে ঘৃণা করার নৈতিক বল ও সুযোগও থাকবে না। এসময় সাজিদ বোন মিনুর প্রেমিক আবিদের কাছে জানতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের সিট দখল, টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, ছাত্রভর্তি নিয়ে মারামারিতে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হবার কথা। 'কেন ছাত্ররা বাধা দিতে পারে না?...ছাত্ররা না পারলে টিচাররা?'–সাজিদের এমন কথায় আবিদ হেসে বলে–

> 'ছাত্ররা কেন বাধা দেবে বলুন? বঙ্গভবন থেকে যারা যা খুশি করতে পারার হুকুম নিয়ে আসে, তাদের কে বাধা দিতে যাবে?...টিচাররাই বা কেন বাধা দেবেন বলুন? রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফরে সঙ্গী হবার চান্স নষ্ট করবেন, তারা কি এতই বোকা।'-[হি.নি./পৃ.১২৯]

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় যে-বঙ্গভবন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র অঙ্গনকেও কলুষিত করে ফেলেছে–এ তারই ইঙ্গিত দেয়। এ পাপ-পচন ও অবক্ষয়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় যেমন স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি, তেমনি একে প্রশ্রয় দেয় কিছু জ্ঞানপাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা। গোটা দেশের সমাজকাঠামোর এ বিপর্যয় দেখে সাজিদ রীতিমতো হতাশ হয় এবং মনের ভেতরে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাতে–

> 'অস্পষ্ট মুখ দেখতে পায় কতগুলো– হ্যাঁ অস্পষ্ট, আলাদা আলাদাভাবে চেনা যায় না, তবে ঠিক ধরা যায়–ওগুলো অন্য কারো নয়, সারি সারি খুনীদেরই মুখ। সেই মুখগুলোর পেছনে লাশের পর লাশ–ওপরে তামাটে আকাশে শকুন উড়ছে–নিচে লাশখেকো শেয়ালদের ছোটাছুটি–অস্পষ্ট হলেও সে দিব্যি দেখতে পায়।'-[হি.নি./পৃ.১৩০]

অর্থাৎ গোটা দেশটাই স্বৈরশাসকের প্রতিপালিত খুনী-মাস্তান-দুর্বৃত্ত আর চাঁদাবাজদের দখলে চলে গেছে এবং এদের তাণ্ডব দৌরাত্ম্যে সমগ্র দেশ আজ লাশের ভাগারে রূপ নিয়েছে। আর শকুন-শেয়ালরূপী লুটেরা-মাস্তানরা জিহ্বা মেলে সর্বত্র ঘুরে ফিরছে। এসময় সাজিদ রীনাদের বাসায় গেলে উভয়ে ভালোবাসার সমুদ্রে অবগাহন করে। রীনার এ প্রেমের পরশে সাজিদ বুকের ভেতরে জেগে ওঠা একধরনের সাহস দিব্যি টের পায়। সেখানে কেউ যেন বার বার উচ্চারণ করে বলে–'না, কখনো না–নো সারেন্ডার–নো কম্প্রোমাইজ।' এমন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সাজিদ বিদায় নেয়। সহযোদ্ধা নুরুদ্দিন সাজিদকে রাজাকার মাহফুজ ও মাসুদের সঙ্গে ব্যবসায় পার্টনারশিপে যাবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে সরাসরি কোনো উত্তর দিতে পারে না। শুধু 'আদর্শের কম্প্রোমাইজ' করার কথা বলায় নুরুদ্দিন ক্ষুব্ধ সুরে বলে–

> 'হ্যাঁ করতাম–লিবারেশনের পর থেকেই তো কম্প্রোমাইজ করে চলছি–বল চলছি কিনা–যুদ্ধ করলাম আমরা। কিন্তু যুদ্ধ শেষ করে বসে রইলাম কখন পলিটিক্যাল নেতারা এসে ক্ষমতায় বসে? আমাদের কি উচিত ছিল না প্রথমেই ক্ষমতা হাতে নিয়েই তারপর ইলেকশন দেওয়া এবং তারপর পলিটিক্যাল নেতাদের ক্ষমতায় বসতে হলো, অস্ত্র জমা দিয়ে দাও–চোর-গুণ্ডা-বদমাশ স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দিলাম।...তারপর দেশে যারা শত্রুপক্ষের দালাল ছিল, তাদেরকে আমাদের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো–তাও মেনে নিলাম– এসব কি কম্প্রোমাইজ নয়?-[হি.নি./পৃ.১৩২]

নুরুদ্দিনের এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-উত্তর বাংলাদেশে দালাল-রাজাকারদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পুনর্বাসিত হওয়া এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমশই রাজনীতি ও জীবনের মঞ্চ থেকে ছিটকে পড়ার বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে। ক্ষমতা আর অর্থবিত্তের দাপটে রাজাকারগোষ্ঠী প্রবল হয়ে ওঠায় তাদের কাছে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের বাধ্য হয়ে আপস করতে হয়। কারণ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পাশাপাশি আদর্শহীনতার নিষ্ঠুর বাস্তবতা একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশে তৈরি করে এক অসম প্রতিযোগিতা। উঠতি বিত্তবান শ্রেণির কাছে স্বাধীনতা মানেই অবারিত পুঁজির মালিক হবার উপায়। কেননা পুঁজির কোনো শ্রেণিচরিত্র নেই, গোত্রধর্ম নেই বরং পুঁজি সার্বভৌম। ফলে লুটেরা, সুবিধাবাদী, দুর্বৃত্ত, স্বদেশি কিংবা প্রবাসী রাজাকার কিংবা মুক্তিযোদ্ধা সবাই পুঁজিপতি হবার দৌড়ে শামিল হয়। বাহাত্তর-তেহাত্তর সনে শুরু হওয়া এ প্রক্রিয়াটি সাতাশি-আটাশি সনে এসে আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আর বামপন্থী নেতাদের বাস্তবতা বাদ দিয়ে তত্ত্ব নিয়ে অতিমাত্রায় মাতামাতি এবং নির্বাচনকে পরিহার করায় দিনে দিনে বহু নেতা-কর্মী হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে অনেকে বিদেশে চলে যায়। আবার অনেকে রাজাকার-সুবিধাবাদীগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপস করে। তাই দেখা যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সাজিদ-নুরুদ্দিনদের গ্রুপের 'তিনজন মারা গেছে, পাঁচজন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, বিরাশিতে দুজনের ফাঁসি হয়েছে, দুজন আর্মিতে আর বাকিরা কে কোথায় আছে কেউ জানে না'। এমতবস্থায় নুরুদ্দিন সাজিদকে বলে–

> 'তুমি যদি নুটুদের সঙ্গে পার্টনারশিপে যাও, তাহলে মাহফুজ সাহেবদের তোমাকে মেনে নিতে হবে–আর সেই অবস্থাটা তৈরি করার জন্য মাস্তানদের সঙ্গেই বল, আর রাজাকারদের সঙ্গেই বল, তোমাকে আপোশ করতেই হবে।'-[হি.নি./পৃ.১৩৫]

কিন্তু এসব শুনে সাজিদ ভেতর থেকে হুংকার দিয়ে বলে ওঠে–'নো, নেভার!' সেই সঙ্গে সাজিদের মনে হয় এ শব্দটি পাক বাহিনীর টর্চারসেলে বন্দি নির্যাতিত সহযোদ্ধা হাফিজ বা আনিসের। ফলে এ আপসের ব্যাপারে সাজিদ একধরনের জোর প্রতিবাদ ভেতর থেকে সাড়া পায়। মাস্তানদের বিষয়ে বিহিত করতে সাজিদ আর নুরুদ্দিন বিডিআর পিলখানায় যায় সহযোদ্ধা বন্ধু কর্নেল ইফতিখারের সঙ্গে দেখা করতে। সব শুনে ইফতিখারও কোনো সাহায্য করতে পারে না। এতে ইফতিখার নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করেও বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলে–'পুলিশের কাছে গেলেও তাতে কাজ হবে না। ঐসব মাস্তানদের যারা পোষে, তারা সরকারি দলের যেমন, তেমনি সরকারের উঁচু মহলের লোক–ওরা সোজাসুজি সেক্রেটারিয়াটের ভেতরে যেমন চলে যেতে পারে, তেমনি ওরা বঙ্গভবনের ভেতরেও চলে যেতে পারে।' এসব শুনে সাজিদ হতাশ হয়ে বিদায় নেয়। বিবেকের দংশন আর অব্যক্ত ক্রোধে তার–

> 'সর্বাঙ্গে চামড়ার ওপর দিয়ে পিঁপড়ে হেঁটে যায়; চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে। কিন্তু তবু কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। কারণ বুকের ভেতরে ওস্তাদের ধমকটা ঠিকই শুনতে পায় সে; একদম চুপ লড়বেন না, মাটির লগে, গাছের লগে, ঘাসের লগে মিশ্যা যান, দুশমন যেন টের না পায়, বুঝবেন আপনের মাটি, আপনের গাছ বিরিক্ষি, আপনের নদী– এই গিলি আপনের দোস্ত, এ্যারা আপনেরে লুকাইয়্যা থুইবো।'-[হি.নি./পৃ.১৩৭]

অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন গেরিলা হিসেবে সে যেভাবে মনের তেজ, ক্রোধ ও রাগকে দমন করে শত্রুর হাত থেকে নিজেকে আড়াল-আবডাল করতো; তেমনি এমন এক অবরুদ্ধ সময়ের মুখোমুখি হয়ে সাজিদকে যেন তাই করতে হচ্ছে। তারপরেও অল্প কয়েকজন তরুণের জোর গলার–'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। সন্ত্রাসীদের খতম কর, খতম কর।'–শ্লোগান শুনে থমকে দাঁড়ায়। মনের ভেতরে একধরনের সদর্থক চেতনা, ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা উঁকিঝুঁকি দেয়। তার মনে প্রশ্ন জাগে 'সময় কি এভাবেই ঘুরে ঘুরে আসে? আবার কি আন্দোলন আর বিদ্রোহ আসছে?'–এমন এক প্রত্যাশা নিয়ে বাসায় ফিরে। সাজিদ তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই জাহিদের কাছেও এ বিষয়ে বিস্তারিত শুনে। সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি গাড়তে তৎপর হওয়ায় বামদলের উদ্যোগে সাধারণ ছাত্ররা এর প্রতিবাদে মিছিল করেছে। আর জাতীয় দৈনিক এসব আন্দোলনকে গুরুত্বের সঙ্গে পত্রিকায় ছাপিয়েছে। তাই সাজিদের স্মরণ হয়–

> '৬৮/৬৯-এর এন.এস.এফ-র কাণ্ডকীর্তির কথা। তাহলে কি এরশাদ-র শাসনের শেষঘণ্টা বেজে ওঠেছে? তার মগজে নতুন চিন্তা ঘা দেয়। এইভাবেই ইউনিভার্সিটি এলাকায় শুরু হয়েছিল ছাত্রদের প্রতিরোধ–খবরের কাগজ তো হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের সাথী।'-[হি.নি./পৃ.১৪০]

এ খবরকে স্বৈরাচার এরশাদ সরকার খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। মহানগরের সরকার দলীয় নেতা কালাম শিকদার দ্রুত একটি আপস রফা করতে নুরুদ্দিন ও মাসুদকে ডেকে নেন। নুরুদ্দিনের মুখে মাসুদের সকল কীর্তিকলাপ শুনে এবং 'আমরা তো ফ্রিডম ফাইটার, আমাদের নিয়ে বড় প্রব্লেম কী জানেন? আমরা নিজেদের কথা সবাইকে বোঝাতে পারি না। আগে যখন আমাদের হাতে অস্ত্র ছিল, তখন সবাই আমাদের কথা সহজেই বুঝে নিত'–এমন প্রতিক্রিয়া দেখে কালাম শিকদার মাসুদকে অপমান করে এবং ধমকিয়ে বের করে দেন। পরে নুরুদ্দিনকে বিনয়ের সঙ্গে সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এদিকে ব্যবসায়ের কাজ শুরু করতে যূথী সাজিদের কাছ থেকে পূর্বাশা অফিসের চাবি চেয়ে নেয়। সেই সঙ্গে চুক্তিপত্রের দলিলে সই করার কথা জানায়। আর নুটুর ডেল্টা, মাহফুজের ক্রিসেন্ট, আগরওয়ালার সেভেন স্টারস, শীন চিয়াওয়ের গোল্ডেন সান এবং তার (সাজিদের) পূর্বাশা মিলিয়ে 'ইস্ট এশিয়ান অ্যাপারেলস' নামক বহুজাতিক কোম্পানির অগ্রযাত্রার ইঙ্গিত দিতেও ভুলে না। এসব শুনে সাজিদ মহাভাবনায় পড়ে। মনের সঙ্গে নিরন্তর বোঝাপড়া করে সে নিজের সম্পর্কে বলে–

> 'যুদ্ধ শেষ হলে সে নিজের বলে কিছু দাবি করেনি, রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়নি অথচ এখন নুটু চৌধুরীদের গিলবার বস্তু হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।'-হি.নি./পৃ.১৪২]

এসব চিন্তা করতে করতে সাজিদ তার চিরচেনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোকে এবং কার্জন হল, শহিদ মিনার দিয়ে হেঁটে জগন্নাথ হলের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। জগন্নাথ হলের মাঠ দেখে তার পঁচিশ মার্চের গণহত্যার কথা মনে পড়ে। এসময় ছোট ভাই জাহিদের সঙ্গে দেখা হলে সে ব্যবসায়িক পার্টনারশিপের কথা জানতে চায়। সাজিদ রাজাকার, চোরাকারবারি ও পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে পাবার কথা বলাতে সে অবাক হয়। আর চুক্তিপত্র হবার কথা জেনেও সে চুপ হয়ে যায়।

এভাবে জাহিদকে চুপ থাকতে দেখে এবং 'ব্যবসার আমি কি বুঝি'–জবাব শুনে সাজিদ ভাইয়ের প্রতি রেগে ওঠে। কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে বলে–

> 'কেন বুঝিস না?...কেন তোরা কিছু বলিস না। আমি তোর ভাই...আমার ভালো হলো কি মন্দ হলো, সেটা তুই বুঝবি না?'- [হি.নি./পৃ.১৪৯-১৫০]

এভাবেই সাজিদ একলা আমি-র বৃত্ত থেকে বহু আমি-র প্রাঙ্গণে নিজেকে শামিল করে। কারণ তারা দেশস্বাধীন করে, অস্ত্র ত্যাগ করে ও নিজেদের গুটিয়ে নেয়াতে সবাই একলা হয়ে পড়েছিল। তাই তারা দেশজয়ের যুদ্ধে সফল হলেও জীবনযুদ্ধে সবাই ব্যর্থ হয়। সাজিদ এবার প্রেমিকা, বন্ধু ও ভাইদের মতো নিকট স্বজন-শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে এক প্রতিবাদী চেতনার সমবায়িক বন্ধন গড়ে তুলতে চায়। কারণ সামনে স্বৈরাচার পতনের ডাক আসছে। কোনো যুদ্ধ যে-একা একা করা সম্ভব নয়– এটাই সাজিদ তার ভাইকে বোঝাতে চায়। তাই সাজিদ ভাইকে নিয়ে নিজের অফিসে যায় এবং একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কথা বলে। এর আগে সে দুটি টেলিফোন করে। প্রথম টেলিফোনে নুটু চৌধুরীকে 'আমি দুঃখিত...আপনার এখানে আসার দরকার নেই–আমি দলিলে সই করতে পারব না।'- বলে নিজের সিদ্ধান্তের কথা সরসরি জানিয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় টেলিফোনে শান্ত গলায় প্রেমিকা রীনাকে বলে–

> 'রীনা শুনছ, আমি পার্টনারশিপে যাচ্ছি না, তুমি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, নিজেই যা পারি করব। আমার কি অমন লোকদের সঙ্গে পার্টনারশিপে যাওয়া উচিত, বল তুমি?'-[হি.নি./পৃ.১৫০]

এভাবেই সাজিদ তার মনের সকল হতাশা ঝেড়ে, সকল ব্যর্থতা-বিষণ্ণতা মুছে, সকল ভয়-ভীতি অতিক্রম করে হারানো শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে, লুপ্ত-প্রায় পৌরুষের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এবং আত্মবলে বলীয়ান হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। যেখানে সাজিদ আর আগের মতো একাকী, নিঃসঙ্গ, নিরবলম্ব ও নির্লক্ষ্য নয় বরং প্রেমিকা ও প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে আগামীর পথ চলায় অনেক বেশি লক্ষ্যময়, আস্থাবান, সহানুভূতিশীল ও অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ রীনার ভালোবাসার অন্তরঙ্গ শুশ্রূষায় সাজিদ এই বোধে উপনীত হয় যে– জীবন মানে কোনো হতাশার চোরাবালিতে নিমজ্জন নয় এবং মুক্তিযুদ্ধ মানে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা নয়। এ পরিণামী সিদ্ধান্তে সাজিদ প্রত্যাখান করে সকল প্রলোভনের প্রস্তাব ও হাতছানি।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ক্রমশ বিপর্যয় এবং সুবিধাবাদী-দালালগোষ্ঠীর পুনরুত্থান ও পুনর্বাসনের ক্রমজটিল সময়-স্বভাব ও হতাশার প্রেক্ষাপট উন্মোচনে ঔপন্যাসিক মুক্তিযোদ্ধা সাজিদ ও নুরুদ্দিন, রাজাকার মাহফুজ-মাসুদ-হরমুজ খান, দালাল জাহাঙ্গীর, চোরাকারবারি নুটু ও যূথী চৌধুরী, আমলা জামান খান, রাজনীতিবিদ কালাম শিকদার ও রীনার মতো চরিত্র নির্মাণ করেছেন। বামপন্থী ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা সাজিদ আদর্শের সঙ্গে আপস না করায় স্বৈরশাসনামলে ব্যক্তিজীবন ও ব্যবসায়ে বার বার ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে সে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তবে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়সী সাজিদকে অবিবাহিত অবস্থায় রেখে ডিভোর্সি রীনার সঙ্গে বিবাহপূর্ব প্রেমময় যৌথ জীবনের মাধ্যমে লেখক যে-প্রথাভাঙার ইঙ্গিত দিয়েছেন– সে উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফল হলেও, সাজিদের জীবনবিকাশ তেমন স্বতঃস্ফূর্ততা পায়নি। সাজিদের মধ্যে যথেষ্ট তেজ ও সাহস থাকার পরেও চরিত্রটি বলিষ্ঠভাব নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার সঙ্গে *অপেক্ষা*-র আলী আকবর এবং *উত্তরের খেপ*-এর হায়দার আলী চরিত্রের বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আবার রীনা ব্যক্তিত্বের যে-তেজ নিয়ে লম্পট-মর্ষকামী ও রাজাকার স্বামী মাসুদকে ডিভোর্স দিয়ে এবং চাকরি করে সাবলম্বী হবার পরিচয় দেয়–তাও শেষপর্যন্ত অটুট-অবিচল থাকেনি। কারণ নিজের বিয়ে ও ভবিষ্যত নির্মাণ করতে গিয়ে সে অনেকটাই সাজিদের নিকট সমর্পিত হয়ে পড়ে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা ব্যবসায়ী নুরুদ্দিন এবং দালাল জাহাঙ্গীর চরিত্রে সদগুণ ও জীবনবেগ থাকা সত্ত্বেও দালালিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে ব্যক্তিত্বের খামতি দেখা যায়। আর রাজনৈতিক নেতা কালাম শিকদার যেমন স্বৈরশাসকের যোগ্য প্রতিনিধি, তেমনি সাইমন-বোঙ্গা-বোম্বারা সমকালীন সরকারের প্রতিপালিত দুর্বৃত্ত, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। শওকত আলী তাঁর *হিসাব নিকাশ* উপন্যাসের মাধ্যমে একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের (১৯৭২-১৯৮৮/৮৯ খ্রি.) চলমান বিপর্যয়, বিপন্নতা, উদ্বেগ-অস্থিরতা এবং স্বৈরশাসনের পাপ-পঙ্কের চিত্র অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠরূপে উপস্থাপন করেছেন। তবে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে নিকট-অতীত, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এন.এস.এফ-র দৌরাত্ম্য, শ্রেণিশত্রু খতম আন্দোলন, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নভঙ্গ, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের সুযোগে দালাল রাজাকারদের

সমাজ ও প্রশাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিংবা দাপুটে উত্থান, স্বৈরাচারী এরশাদের দুঃশাসন ও সন্ত্রাসবাদ কায়েমের চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দূর-অতীতের দেশভাগ, অভিবাসন ও শত্রুসম্পত্তির বিষয়গুলোও নজর এড়িয়ে যায় না।

এ উন্যাসে শেষপর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এক অদম্য অকুতোভয় মানুষের অনমনীয় উজ্জীবনের কথা। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আতঙ্ক, যূথীর মায়াবী প্রলোভন, অঢেল অর্থের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতাবান পুঁজিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ–এসব কিছুকে তুচ্ছ করে, উপেক্ষা করে সাজিদ নামক এক সাহসী মুক্তিযোদ্ধার আত্মমর্যাদায় উপনীত হবার ইতিবৃত্ত *হিসাব নিকাশ* উপন্যাসের উজ্জ্বলপ্রান্ত। চেতনার অন্তর্স্রোতে-ঘাত-প্রতিঘাতে বিরুদ্ধ বাস্তবতা তৈরিতে ঔপন্যাসিক শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ উপন্যাসে। এই প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যেও একজন মুক্তিযোদ্ধার অমিত অহং উজ্জীবিত করে এই প্রজন্মকে, বিনাশী অন্ধকারের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয় এক রাশ প্রাণবন্ত আলোর কণিকা। আলোর এ আবাহন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের অমোচনীয় চেতনার শৈল্পিক প্রকাশে শওকত আলীর *হিসাব নিকাশ* উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।[২২] তবে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে স্বৈরশাসনের শরবিদ্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রেণিচরিত্রের জীবনবেদ ও জীবনসংগ্রামের হিসাবকে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। যেমন মুক্তিযোদ্ধা সাজিদের ব্যবসায় ও জীবন প্রতিষ্ঠার হিসাব, রীনার নতুন সংসার শুরুর হিসাব, দালাল জাহাঙ্গীর ও নুরুদ্দিনের ব্যক্তি-স্বার্থের হিসাব, নুটু ও যূথীদের মতো লুম্পেন বুর্জোয়াদের ব্যবসায়িক হিসাব, কালাম শিকদারদের রাজনীতি ও ক্ষমতার মঞ্চে রাজত্ব টিকিয়ে রাখার হিসাব, খল-কপট মাসুদের ডিভোর্সি বউকে ফিরিয়ে আনার হিসাব এবং মাহফুজ ও হরমুজ খানদের মতো রাজাকারদের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ভর করে বদনাম ঘুচিয়ে জাতে ওঠা কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের হিসাব– এসব ক্রমজটিল বিষয়-আশয়কে পারঙ্গমতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন।

শওকত আলী সময়-সমাজ ও মানুষের গতর-গহ্বরের গলদ, বিনাশ ও বিপন্নতার স্বরূপকে অবিকলরূপে ধরার ও তাকে শিল্পোত্তীর্ণরূপে অঙ্কন করার এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর লক্ষ্যই ছিল মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশ ও বিকাশ-প্রতিবন্ধক স্বৈরবলয়ের মুক্তি তথা অবসান। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতা-উত্তর মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশা, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন, ধর্মাশ্রিত পাকিস্তানিভাবাপন্ন দুঃশাসনের পুনঃপ্রবর্তনের মচ্ছব সর্বোপরি নীতি-নৈতিকতার সামূহিক ভাঙনের বাস্তবতাকে নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন। তারপরেও তিনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়প্রবাহের ক্রমজটিল প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র অনিশ্চয়তা ও সংগ্রামের মধ্যেও সদর্থক উত্তরণ-উজ্জীবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিরুদ্ধ সময়-স্বভাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের *হিসাব নিকাশ* তথা আত্ম-আবিষ্কারই এ উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

ঘরবাড়ি

ঘরবাড়ি (২০০১খ্রি.) শওকত আলীর মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে লেখা এক অনবদ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসে একটি জাতির জন্মযন্ত্রণার মৌল চারিত্র্য এবং তদ্‌পরবর্তী ক্রমজটিল জীবনযাত্রার ইতিহাস বিম্বিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের আগ্নেয় উত্তাপে ছেঁকে তৈরি করেছেন জীবনের কঠিন হাড়কাঠামোর ছাঁচ। এখানে ভারত-বিভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের ওপর চেপে বসা পশ্চিম পাকিস্তানি শাকুনিক হিংস্র নখরের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি জাতির আত্মজাগরণ ভাষারূপ পেয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পাকিস্তানি প্রেতাত্মারূপী স্বৈরশাসনের দানবীয় শক্তিতে ভর করে সুবিধাবাদী-দালালগোষ্ঠীর সমাজ ও রাষ্ট্রে দাপুটে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জ্বলজ্যান্ত ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। শওকত আলী একজন জীবনবাদী কথাশিল্পী হিসেবে চলমান সমাজসংকট ও সংক্রমণের বিনাশী ঘটনাসমূহকে তুলে এনেছেন জহুরির দক্ষতায়। সমাজদেহের বাইরের অসঙ্গতির সমান্তরালে মানুষের নিরালোক মনের টানাপোড়েন ও ভাঙচুরের অনুষঙ্গও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এছাড়া সমাজের শোষণ-পীড়ন-বিনষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পট-পরিবর্তনের ধারায় সংঘটিত দুর্বৃত্তায়নের মচ্ছব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, শুভ শক্তির পরাভবের বেদনা এবং অশুভ শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপ-প্রতিষ্ঠার চালচিত্রও তিনি বাস্তবমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন। সময় ও সমাজের প্রতি; বিশেষত শোষিত-বঞ্চিত-

অধিকারহারা অসহায় মানুষের কল্যাণে এমন সৎসাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল ও দায়বদ্ধ। তিনি সাহিত্যে জীবনবিলাসকে নয় বরং জীবনসংগ্রামকে মৌল অভীপ্সায় পরিণত করেছেন।

ঘরবাড়ি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা এক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস হলেও যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ সংঘটন, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের চিত্র এখানে নেই। লেখকের অভিপ্রায়ও তা নয়। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি গড়ে তোলার পরিবর্তে একশ্রেণির দুর্নীতিবাজ, কালোবাজারি ও সুযোগসন্ধানী দালাল মানুষেরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এ সুযোগে সদ্য-স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে সমাজের মূলস্রোতে মিশে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে সমাজ ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেয়। পক্ষান্তরে যারা যুদ্ধ করে, পরিবার-পরিজন হারিয়ে,নিঃস্ব হয়ে দেশকে স্বাধীন করে; তারা সমাজের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের নানা অন্যায়-অপবাদ দিয়ে কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবচিত্রই *ঘরবাড়ি* উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের অন্তর্গত দায়বোধের জায়গা থেকে তিনি এর অবিকল বাস্তবতার ছবি বিশ্বাসযোগ্য করে অঙ্কন করেছেন *ঘরবাড়ি* উপন্যাসে।[২৩] সময় ও সমাজবাস্তবতার নিরিখে এ উপন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

আফজাল হোসেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। আফজালের বাবা দেশভাগের হাঙ্গামায় হুগলির বসতভিটা ফেলে শরণার্থী হিসেবে এদেশে এসে গাজীপুরের জয়দেবপুরে বাড়ি করেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে আফজালের বাবা-মা,বড় ভাই ও বোন মিনুকে হানাদার বাহিনী ও স্থানীয় রাজাকাররা মিলে নির্মমভাবে হত্যা করে বাড়ির উঠানে গণকবর দেয়। আফজাল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং দেশস্বাধীন করে শূন্য বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পতন-পচন ও বিনষ্টি দেখে সে খুব হতাশ হয়। তার লালিত সকল স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। রাজাকার-দালাল-সুবিধাবাদীগোষ্ঠীকে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং অর্থে-বিত্তে-প্রাচুর্যে সমাজের নেতৃত্বের আসনে চলে যেতে দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। স্থানীয় এক স্মাগলারকে শাসন করতে গিয়ে এদেরই ষড়যন্ত্রে আফজালকে জেলে যেতে হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তার চোদ্দ বছরের জেল হয়। দেশ স্বাধীনের দুই বছর পর (চুয়াত্তর সনে) সে জেলে যায় এবং চোদ্দ বছর পর (আটাশি সনের) স্বাধীনতা দিবসে পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সী আফজাল মুক্তি পায়।

অন্য সবার মতো আফজালেরও স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে সেও সুখের সংসার গড়ে পারিবারিক শোককে ভুলবে। আর সবার জন্য শোষণহীন-বৈষম্যমুক্ত এক কল্যাণময় দেশ গড়ে তুলবে। কিন্তু দেশস্বাধীনের পর অন্যায়-অবিচারের প্রথম কোপ এসে পড়ে তার ঘাড়ে। জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তার জীবনভূগোলের গতিপ্রকৃতি বদলে যায়। একটি সুখী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ধ্বংস হবার শোক আর অন্যায়ভাবে জেলজুলুম বরণের গ্লানি–সব মিলিয়েই আফজালের মানসভুবনে বয়ে আনে এক অনিবার্য পরিবর্তন। তাই বর্তমানে সে কাউকে বিশ্বাস করে না, কারো আদর্শ ও ভালো কথা তার সহ্য হয় না। এমনকী কেউ তার বাবা-মা, ভাই-বোনদের কথা জিজ্ঞাসা করলে ও সহানুভূতি প্রকাশ করলে তার গায়ে জ্বালা ধরে। সব কিছুকেই তার মেকি-কৃত্রিম আর ফালতু মনে হয়। এমন অবস্থা শুধু আফজালের একার হয়নি বরং সহযোদ্ধা চাপাইনবাবগঞ্জের এস্কেন্দিয়ার, কুমিল্লার মুকুল সাহা, ছয় নং সেক্টরের জুলকারনাইনদেরও হয়েছিল। তারাও প্রায় একই ধরনের অন্যায়-অবিচার আর প্রতারণার শিকার হয়ে জেলবন্দি হয়। জুলকারনাইনের কাছে খবর আসে–

> ‘বাইরের অবস্থা কী রকম উল্টাপাল্টা আর গোলমেলে। শত্রুরাই হয়ে গেছে বন্ধু আর বন্ধুরাই শত্রু। রাজনৈতিক দলগুলো একে পর এক ভেঙে যাচ্ছে–কারো পায়ের তলায় মাটি থাকছে না।’-[ঘরবাড়ি; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ১০ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/পৃ.১৩২]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশগঠন বাদ দিয়ে সুযোগসন্ধানী, দালাল-রাজাকারদের সঙ্গে এক শ্রেণির রাজনীতিবিদ, আমলা, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীরাও রাতারাতি আখের গোছাতে দুর্নীতি, কালোবাজারি, অন্যায়-অনিয়মের মচ্ছবে মেতে ওঠেন। তাই দেখা যায়–‘বিপ্লবী নেতা বলে যাকে চিনত, সেই লোক নাকি দিনের বেলা নিজের চ্যালাদের সামনে বিপ্লব বিপ্লব বলে

চিৎকার করে, আর রাতের বেলা সরকারি কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাত করতে যায়। আর ইউনিভার্সিটির মাস্টাররা নাকি ম্যানপাওয়ারের ব্যবসা করে আর ডাক্তাররা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর কাছ থেকে ঘুষ খায়। আর বিদেশি দূতাবাসের মদ পেটে না পড়লে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে ভাবের নাকি দুয়ার খোলে না–এইরকম সব কাণ্ড।' বলা যায় গোটাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিনাশ-বিনষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। এসব শুনে জেলবন্দি চার জন মুক্তিযোদ্ধাই হতাশ হয়। তবে জুলকারনাইন প্রতিবাদ করে জানায়–

> 'এত রক্ত দিয়ে যে দেশটাকে স্বাধীন করলাম সে কি শুধু জোচ্চোর, ঘুষখোর আর মাতালদের রাজত্ব করার জন্য? আমাদের রক্তের দাম নেই?'-[*ঘরবাড়ি*/*পৃ*.১৩৩]

জবাবে এস্কেন্দিয়ার বলে– 'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু ঐ স্বাধীনতা পর্যন্ত–তার বেশি নয়। যুদ্ধ করে দেশকে মুক্ত করেছ ব্যস ঐখানেই তোমার কাজ শেষ– দেশের লোক এখন বুঝে নেবে কীভাবে তারা দেশ চালাবে– সব কাজ আমরাই করে দেব– এ ধারণা কেন থাকবে আমাদের? আমাদের এখন আর কোনো দায় নেই।' একথাগুলো এস্কেন্দিয়ার গভীর হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ আর অক্ষমতার ক্রোধ থেকেই উচ্চারণ করে। কারণ দেশস্বাধীনের মতো দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি এদের দিয়ে করিয়ে সুবিধাবাদীরা এদেরকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে। ফলে তাদের দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। তাই তারা দেশের সংঘটিত দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা, মঙ্গা, ঝড়-তুফানের খবর পেয়ে এবং অকাতরে মানুষের মৃত্যুর কথা শোনার পরেও কেউ চিন্তা করে মাথা গরম করে না। বরং তারা সিদ্ধান্ত নেয়–'তাদের দায় নেই কারোর কাছে–মানুষ যা ইচ্ছে বলুক। আর তারা মানুষের কথায় কান দেবে না।' ফলে মুকুল ও এস্কেন্দিয়ার জেল থেকে বের হয়ে সকল সহায়-সম্বল বিক্রি করে আমোদ-ফূর্তির মাধ্যমে জীবন কাটিয়ে দেবার মনোবাসনা ব্যক্ত করে। সামাজিক সকল দায় এড়িয়ে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার এ প্রবণতা-প্রত্যাশার পেছনেও একধরনের ক্ষোভ, হতাশা , বিচ্ছিন্নতা ও গ্লানি কার্যকর রয়েছে। বন্ধুরা তাদের জীবন-পরিকল্পনার কথা বললেও আফজাল তা ভাবতে পারে না। কারণ–

> 'তাঁর বাবা জায়গাজমি করেননি, কিংবা ব্যাংকেও টাকা রেখে যাননি। ঘুরে ফিরে বাড়িটার কথা মনে পড়ত। মনে হতো, ভয়ানক নিঃসঙ্গতার মধ্যে বাড়িটা অহেতুক ক্ষয়ে যাচ্ছে। বাড়ি বিক্রির চিন্তাটা ঐ সময়ই তার মগজে গজায়। অর্থাৎ জেল থেকে বেরুবার পর ইচ্ছেমতো দিন যাপন। আর কোনো কর্তব্য নেই।... কোনো কিছু গড়ে তোলার সঙ্গে নিজেকে সে আর জড়াবে না। অনেক হয়েছে, এখন সে ক্লান্ত–ভালোবাসাও নেই, রাগারাগিও নেই।'-[*ঘরবাড়ি*/*পৃ*.১৩৪]

এভাবে দায়-দায়িত্বহীন, কর্তব্যহীন, প্রেমহীন, মানবিক সম্পর্কহীন এবং সংসারহীন আফজাল জীবনের কোনো বন্ধন বা শেকড় খুঁজে পায় না। ফলে নিজেকে গুটিয়ে নেবার প্রস্তুতি নেয়। তার সিদ্ধান্ত–' যা করেছি, করেছি–সময়ের দাবি ছিল, জাতীয় দাবি ছিল, মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আর না–এখনকার দাবি মেটানোর দায় আমাদের নয়–এ দায় এখন অন্যেরা নিক।' মানসলোকের এমন ভাঙচুর আর বিধ্বস্ত অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ চোদ্দ বছরের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে আফজাল সন্ধ্যাবেলা নিজের জয়দেবপুরের বাড়ি এসে অবাক হয়। জীর্ণশীর্ণ মলিন বাড়ি দেখে সে প্রথমে চিনতে পারে না। কারণ–

> বেজায় কাহিল অবস্থা বাড়িটার। গেটের একটা পিলার পাল্লাসুদ্ধ শুয়ে পড়েছে পথের একপাশে। অন্য পিলারটা পাল্লা দিয়ে অর্ধেক পথ আটকে ঠ্যাংভাঙা দুর্বল চৌকিদারের মতো অবশ্য এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তারও অবস্থা পড় পড়। ভেতরের লনে ভাটির জঙ্গল, দালানের ছাতে বটচারার সদর্প ডালপালা ছড়ানো, খাবলা খাবলা পলস্তারাহীন দেয়াল, জানালার পাল্লা উধাও, যে দু'চারখানা আছে, সেগুলোর ফোঁকরে কাচের বদলে পিচবোর্ড আটকানো।'-[*ঘরবাড়ি*/*পৃ*.১২৩]

প্রায় অচেনা ভাঙাচোরা জীর্ণ-শীর্ণ নিজের এ বাড়িটিকে আফজালের কাছে তার দেশের মতোই মনে হয়। এ বাড়িতে যে-একসময় একটি সুখী পরিবার বসবাস করতো, তার আদুরে বোন মিনুর হাতের লাগানো গন্ধরাজ, কামিনী, শিউলী, ম্যাগ্নোলিয়ার ও গোলাপ ফুলের গাছ ছিল– তা আর বোঝার উপায় নেই। আফজাল প্রথমে ডাকাডাকি করে কারো সাড়া-শব্দ পায় না। পরে আশ্রিত হামিদের ছেলে টুলুর দেখা পেলেও বাড়িতে ঢুকতে বাধা পায়। এতে একদিকে আফজালের যেমন নিজেকে আগন্তুক-অনাহুত ভেবে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি অন্যদিকে নিজের ঘরে ঢোকার প্রচণ্ড জেদ চেপে বসে। তাই জোর করে ঘরে ঢুকতে গেলে এক যুবতী মেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় আর বলে–'মগের মুলুক পেয়েছেন? জোর করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যাবেন?'– এমন কথায় আফজালের রাগ-ক্ষোভ আর অনুতাপ আরো বেড়ে যায়। কারণ মুক্তিযোদ্ধার তকমার কারণে তার যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থান নেই, তেমনি নিজের বাড়িতে সে আজ নির্বিঘ্নে ঢুকতেও পারে

না। তাই 'আমি এ বাড়ির মালিক– আমার নাম আফজাল'–এমন পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয়। এভাবে অপমানের একশেষ হয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকে এবং চোদ্দ বছর ধরে অব্যবহৃত ঘরের ধুলো-বালি-ময়লার রাজ্য দেখে হতাশ হয়। উঠানের দিকে তাকাতেই তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ষোলো বছর পূর্বের এক নির্মম দৃশ্য। পাশের বাড়ির আখুনজিদদের দোতলার জানালা দিয়ে সে দেখেছিল–

> 'উঠোনের ঠিক কোথায় দাঁড় করানো হয়েছিল বাবা আর বড় ভাইকে, সেই জায়গাটা সে মনে মনে আন্দাজ করে।...মিনুকে বারান্দার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল।...সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একটা খাকি লোক পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল। আরেকটা সাদা পোশাকের লোক খানিক দূরে দাঁড়িয়েছিল। প্রখর রোদ ছিল চৈত্রমাসে–সাদার ওপর লাল ডোরাকাটা জামাটা ভয়ানক জ্বলজ্বল করছিল রোদ লেগে।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১২৭]

একে একে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে যুদ্ধে যাবার ঘটনা, ক্যাম্পের ঘটনা, বাড়ি ফেরার ঘটনা এবং জেলে যাবার ঘটনা। মাত্র ষোলো বছরেই বহু ঘটনা ফিকে ও বিবর্ণ হতে দেখে আফজাল মনে মনে বিস্মিত হয়। স্বাধীনতা দিবসের উপহারস্বরূপ তাকে জামিন দেবার কথা শুনে বাড়ির আশ্রিত হাকিম আলী মাস্টারের ছেলে সাব-কন্ট্রাক্টর আব্দুল হামিদ ব্যঙ্গ করে বলে–

> 'হুঁ কে কাকে উপহার দেয়, চৌদ্দটা বছর আটকে রাখার পর উপহার।...এদেশে বোধ হয় এরকমই নিয়ম।...সবই কপাল ভাই–না হলে মুক্তিযোদ্ধার নকল সার্টিফিকেট বাগিয়ে নিয়ে কত জন লালে লাল হয়ে গেল–আর আপনি যুদ্ধ করলেন, মা-বাবা, ভাইবোন হারালেন–আর আপনাকেই ওরা এতগুলো বছর জেলখানায় পুরে রেখে দিল।...আপনার বাবার কথা, অমন ফেরেশতার মতো মানুষ তাঁকেই কিনা ঐভাবে মারল। তার বিচার হলো না–হলো আপনার বিচার, অদ্ভুত কাণ্ড।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৩০]

পুরনো দিনের কথা, দেশের নৈরাজ্যের কথা হামিদ বলাতে আফজালের কাছে তা 'পুরনো কাসুন্দির' মতো লাগে এবং মনটাও রাগে ক্ষোভে বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়। তবে ঢাকা শহরের কাছাকাছি এ পৈতৃক বাড়িতেই তাকে বসবাসের জন্য হামিদ অনুরোধ করে। ঘর-সংসারের কথা শুনেই আফজালের বন্ধু হায়দার, শামিম ও বেলালের কথা মনে পড়ে । জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সে দুজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এদের বিত্ত-বৈভব-আভিজাত্য এবং সুন্দর বউ-বাচ্চা ও সুখী পরিবার দেখে তার রীতিমতো হিংসে হয়। তাই নিজের দিকটা চিন্তা করতেই তার মনে হয়–

> 'অমন বউ তার কস্মিনকালেও হবে না। ৩৫/৩৬ বছর বয়সে সংসার পাততে চাইলেই হয় না–এমন বউ জোটে না, আর অমন ছেলে মেয়ের বাবাও হওয়া যায় না। এক উপায় হচ্ছে প্রেম করা। কিন্তু তার মতো একজন দাগি খুনের আসামীর সঙ্গে কোন মেয়ে প্রেম করতে আসবে? সে বোঝে, ওসব আর হবে না।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৩৫]

জীবনের এ ব্যর্থতা, শূন্যতা ও রিক্ততা থেকে আফজাল ক্রমশই হতাশ হয় । সহযোদ্ধা হায়দারের হাতের দশ আঙুলে দামি পাথর বসানো আংটি, আভিজাত্য আর দামি মদের বোতল দেখে আফজালের মনে কেবল প্রশ্ন জাগে–'এ কাকে দেখছে সে? একি হায়দার? নাকি অন্য কেউ?' হায়দারের এ পুঁজির পাহাড় আর আদর্শের অবক্ষয় দেখে সে হতাশ হয়। আরেক সাংবাদিক বন্ধু তাকে দেখে এক ক্যামেরাম্যান ডেকে ছবি তুলে একটি স্টোরি তৈরি করে তার অন্যায় জেল- জুলুমের প্রতিবাদ জানাতে চাইলে সে বিরক্ত হয়। তাকে ধমক দেয় আর বলে–

> 'তোর এই দেশপ্রেম চৌদ্দ বছর আগে কোথায় ছিল?...এতদিন বসে বসে কী করেছিস? খেয়ে দেয়ে মোটা তো কম হসনি? যে দেশে বারো মাস দুর্ভিক্ষ থাকে, সে দেশে একজন কনশাস লোক এত মোটা কেমন করে হয়? তুই বরং অন্য কথা বল, খবরদার দেশের কথা বলবি না।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৩৬]

বন্ধুদের কাছ থেকে এমন কৃত্রিম ব্যবহার পেয়ে এবং তাদের নৈতিক অধপতন দেখে আফজাল আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। কথায় কথায় হামিদ এলাকার রাজাকার হোসেন মৃধার মোটরগাড়ির ওয়ার্কশপ বানানোর জন্য এ বাড়ি দখলের নানা অপচেষ্টার কথা জানায়। আবার চাকরির বাজারে ঘুষ-দুর্নীতি ও তদবিরের ঝামেলা থাকায় আফজালকে ছোটখাটো ব্যবসায় শুরু করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আফজাল টাকার কথা বলাতে হামিদ বাড়ি দেখিয়ে লোন নেবার পথ বাতলে দেয়। তবে আফজাল বাড়ি মেরামতের জন্য যে-দশ হাজার টাকা হামিদকে দিয়েছিল, সে-টাকার কথা উল্লেখ করায় হামিদ লজ্জায়-আড়ষ্টতায় মিইয়ে যায়। কৈফিয়তের সুরে সে তার বাবা হাকিম আলী মাস্টারের বেকারির ব্যবসায় করতে গিয়ে শত্রুদের কূটকৌশলে মামলায় জড়ানোর কথা জানায়। লজ্জায়-অপমানে তিনি ছয় মাস পর মারা যান। বাহাত্তর সনের শুরুতে

আফজালরা যখন সরকারি নির্দেশে অস্ত্র জমা দিতে রাস্তায় গিয়ে জড়ো হয়েছিল, তখন এ হাকিম মাস্টারই সবার পথ আগলে চিৎকার করে বলেছিলেন−

> 'কেন অস্ত্র জমা দেবে তোমরা? খবরদার দিও না−ইয়ার্কি নাকি এ্যাঁ? চোর গুণ্ডাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার মুরোদ নেই−ভালো লোকদের ওপর যত হম্বিতম্বি-হাতের অস্ত্র জমা দিয়ে ভালো লোকেরা ঠুটো জগন্নাথের মতো বসে থাকবে আর চোরডাকাতদের হবে পোয়াবারো! আমাদের মা-বাবা, ভাইবোনদের যারা খুন করেছে, তাদের বিচার হোক আগে, তারপর অন্য কথা।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৪১]

সমকাল বিবেচনায় হাকিম মাস্টারের প্রস্তাব ও পরামর্শই যে-ঠিক ছিল, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আফজালের মন পুরোপুরি সায় দেয়। 'আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই, ও টাকা একদিন না একদিন আপনি ফেরত পাবেনই'− বলায় আফজাল তার ওপর মনে মনে চটে যায়। হামিদ যে-কৌশলে পিতৃঋণ এড়াতে চায়, তা সে বুঝতে পারে। হামিদ তার সাব-কন্ট্রাক্টারি করতে গিয়ে ঘুষ ও দুর্নীতি-বাণিজ্যের কথা বলাতে আফজালের বন্ধু ইস্ফেন্দিয়ারের কথা মনে পড়ে। সে খালি হাতে বিপদে পড়া বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পুলিশের দাবি অনুযায়ী দিতে না পারায় পুলিশ তাকে সশস্ত্র অবস্থায় পাবার কথা উল্লেখ করে চার্জশিট দেয়ায় তার জেল হয়। এসব শুনে হামিদ জয়দেবপুরের দুধ বিক্রেতা আদম আলীর ছেলে আইয়ুব আলীর ধনী হবার কাহিনি বলে। একাত্তরের বিজয় দিবসে আইয়ুব পথে কুড়িয়ে পাওয়া খাকি পোশাক, বুট ও লাঠি ব্যবহার করে ইমদাদ খানের রড-সিমেন্টের দোকান দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে সে দ্রুত ডজনখানেক দোকানের মালিক বনে যায় এবং লোহা ঢালাইয়ের কারখানা বসায়। এ আইয়ুব আলীর অপকর্ম সম্পর্কে হামিদ জানায়−

> 'সে এখন রীতিমতো কারখানা বসিয়ে সিমেন্টে মাটি মেশায়−প্রতি বস্তায় সিকিভাগ মাটি। ওর দোকান থেকে সিমেন্ট নিয়ে একটা কালভার্ট বানিয়েছিলাম গত বছর। গত বছরেই বর্ষায় সিমেন্ট ধুয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যায়...কালভার্ট ভেঙে বাস নিচে পড়ে চারজন লোক মারা যায়।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৪৫]

আইয়ুব আলীর মতো সুযোগসন্ধানী, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদার ও লুটেরাদের হাতেই গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এতে সাধারণ মানুষের মানমর্যাদা ও জান-মালের নিরাপত্তা চরমভাবে হুমকির মধ্যে পড়ে। আফজাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও হামিদের উদ্দেশ্যে বলে −'ভাবছি বাড়িটা বিক্রি করে দেব। এ বাড়ি আমার কোনো কাজে আসবে না। এটা না থাকলেই বরং ভালো, খামোখা একটা ঝঞ্ঝাট মাথায় চাপিয়ে রাখা। আমি বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্যই এসেছি− আপনি খদ্দের দেখুন।'− একথা বলতে পারায় সে এক ধরনের স্বস্তিবোধ করে। কিন্তু হামিদ রীতিমতো আঁতকে ওঠে এবং অস্তিত্বসংকটে পতিত হয়। পরদিন থেকেই গোটাবাড়ির মানুষের চলাফেরা, কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। হামিদের ছোট মেয়ে বুলবুলির কাছে বাসা ভাড়ার জন্য সস্ত্রীক হামিদের বাইরে যাবার কথা শুনে আফজাল অনেকটা নির্ভার হয়। তার অনুপস্থিতিতে রাজাকার উলফতউল্লাহ বাড়িটি দেখে গেলে এবং 'টাকা পেলেই আমার হলো' − এমন কথা আফজালের মুখে শুনে বিনু বিস্মিত হয় এবং ক্ষোভের সঙ্গে বলে−

> লোকটার নাম উলফতউল্লাহ, টঙ্গীতে থাকতো, শান্তি কমিটির মেম্বার ছিল− এখন এখানে থাকে, মিউনিসপ্যালিটির মেম্বার হয়েছে।...ভাবাই যায় না− আপনি চলে যাবেন, আমরা চলে যাবো, আর একটা রাজাকার এসে এ বাড়িতে বসবাস করবে। চিন্তা করুন তো কেমন লাগে?'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৪৯]

বিনুর এমন বিদ্রূপপূর্ণ কথায় তার মনে আঘাত ও আলোড়ন তুললেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিন্তু এরপর স্থানীয় ব্যবসায়ী হোসেন মৃধা আফজালের বাড়িটি কেনার জন্য দালাল পাঠান । এ মৃধা সাহেবের নাম শুনেই আফজাল সচকিত হয়। কারণ যুদ্ধের সময়−

> 'এই মৃধাই বাড়িটি দখল করতে চেয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর সে প্রথম এই লোকটাকেই ধরতে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়া, বাড়িঘর দখল করা, পাক আর্মি অফিসারের কাছে মেয়ে সাপ্লাই করা−বহু কীর্তি লোকটার। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও তাকে ধরা যায়নি ঐসময়।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫০]

ফলে এমন নেতৃস্থানীয় রাজাকার হোসেন মৃধার কাছে আফজাল বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয় না। আবার মতি কন্ট্রাক্টার বাড়ি কেনার জন্য দালাল মারফত আফজালকে তার অফিসে ডেকে পাঠায়। এসব শুনে আফজালের গা জ্বলে ওঠে। আর তাই–

> 'দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে লোকটার চেহারা স্মরণ করে। ভুলে যাবে সে? এতই সোজা? বেলালের বোনকে জিপগাড়িতে তুলে নিয়ে যায়নি সে?...যাকে ধরার জন্য কালিয়াকৈর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল তারা।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫৩]

এভাবে একের পর এক রাজাকাররা খদ্দের হিসেবে আসায় আফজাল রাগে গনগন করে। আর হামিদের উদ্দেশ্যে বলে–'একটা স্বাভাবিক ভদ্রলোক পান না? যত সব বদমাশদের ধরে ধরে আনছেন।' জবাবে হামিদ জানায়–'স্বাভাবিক ভদ্রলোকদের কাছে কি তিন-চার লাখ টাকা থাকে? অমন টাকাওয়ালা লোক কি সৎ পথে টাকা পয়সা রোজগার করেছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন? নতুন ধনীরা সবাই তো লুটেরা চোর আর ডাকাত।' হামিদ আফজালকে এমন বাস্তবতা মেনে নিয়ে বেশি বাছবিছার না করে সবাইকে স্রেফ খদ্দের হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়। তা না হলে যে-বাড়ি বিক্রি সম্ভব নয়–একথাও জানিয়ে দেয়। কিন্তু আফজাল তা মানতে পারে না। তাই 'এমন এক দেশে সে বাস করছে, যে দেশে সৎ লোকদের হাতে টাকা পয়সা থাকে না।'– বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে। আর বাড়ি বিক্রির জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলে। বিজ্ঞাপন বের হলে ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকা থেকে কয়েক খদ্দের এসে বাড়িটি দেখে যায় কিন্তু পরে আর অগ্রসর হয় না। কারণ–

> 'তারা বাড়িঘর দেখে টেখে আর পরিচিত লোকদের কাছে খোঁজখবর নেয়। আর সেই সুবাদে মতি ঠিকাদার নয়ত হোসেন মৃধা কিংবা উলফতউল্লাহ–এদের কারোর না কারোর সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে যায়।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫৫]

এদের বিরোধিতার কারণেই বাইরের ধনী খদ্দেররা এসে অযথা স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে বিবাদে জড়াতে চায় না। ফলে আফজাল আরো হতাশ হয় এবং রাগে-ক্ষোভে ফুসে ওঠে। তারপরেও সে বাড়ির জঙ্গল-আগাছা পরিষ্কার করতে কয়েকজন দিনমজুরকে কাজে লাগায়– যাতে গ্রাহকদের আগ্রহ বাড়ে। কিন্তু শেকড়সুদ্ধ পদ্মভাট তুলতে গিয়ে এরা কিছু মুণ্ডু ও হাড়হাড্ডি দেখতে পায়। এতে মজুরেরা ভয় পেয়ে কাজ বন্ধ করে চলে যায় এবং গোরকাটা মানুষ আনার পরামর্শ দেয়। এদের কথা শুনে আর গর্তের মধ্যে নরমুণ্ডু দেখে আফজালও রীতিমতো অবাক হয়। সে নিজেই কোদাল ধরে আর তাতেই–

> 'প্রথমে পাঁজরের হাড় তোলে কয়েকটা। আঙুলসুদ্ধ হাতের পাঞ্জাও আবিষ্কার করে সে। মুণ্ডুটা তোলে। ভাটগাছের শিকড়েরর গন্ধ এবং সদ্য খোঁড়া মাটির গন্ধ এসে লাগে তার ঘ্রাণে। একটার পর একটা মুণ্ডু পেতে থাকে সে।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫২]

এসব নরকঙ্কাল তুলতে গিয়ে তার শরীরে মাটি মাখামাখি হয়। হাড়হাড্ডির দিকে তাকিয়ে সে বাবা-মা, ভাই-বোনকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। গর্তের ভেতরে আফজাল তন্ময় হয়ে নীরবে অনেকক্ষণ বসে থাকে। টুলু ও বিনুরা এসে ডাকাডাকি করায় তার সম্বিৎ ফিরে। দিনমজুররা তাকে জিনে ধরার সন্দেহে মৌলবি ডেকে দোয়া-দরুদ ও তাবিজ-কবচের দাওয়াই দিতে বলে। 'এতগুলো মানুষকে এখানে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল অথচ খবরটা কেউ জানত না?'–আফজাল এমন কথা জিজ্ঞাসা করায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এসময় আফজাল–

> 'একটা একটা করে মুণ্ডু হাতে তোলে আর পরখ করে দেখে। নিজের অতীতকে দেখতে পায় সে ঐ মুণ্ডুগুলোর মধ্যে। বাবা আছে ভাই আছে বন্ধু আছে মানুষের সংসার আছে ভালোবাসা আছে–সব ঐ হাড়হাড্ডি আর মুণ্ডুগুলোর ওপর সাঁটা। তার মনে হয়, নিজের অস্তিত্বের অর্ধেকটাই মাটির ভেতরে পোঁতা।... মাটির তলাটা কেমন যেন তাকে টানতে থাকে।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫২-১৫৩]

অর্থাৎ তার পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর জীবনের প্রায় অর্ধেকটা জীবন মিশে রয়েছে এসব হাড়হাড্ডির সঙ্গে। নিজের জীবনশেকড়, প্রেম-ভালোবাসা, আদর-সোহাগের সকল স্মৃতিই–এ গর্তের ভেতরে মাটিচাপা পড়ে রয়েছে। এসব দেখে আফজাল সেই পুরনো জীবনের খোলসে পুনরায় ঢুকতে চায় না বরং দ্রুত বাড়িটি বিক্রির ব্যবস্থা করতে হামিদকে তাগিদ দেয়। হামিদের স্ত্রী তাদের ভাড়া বাসায় চলে যাবার কথা বলতে এসে আবেগে কেঁদে ফেলে আর জানায়–

> 'ভাইজান আমরা বোধ হয় কালপরশু চলে যাচ্ছি।...একটা অনুরোধ রাখবেন?...আপনি কষ্ট করে আমাদের বাসা থেকে দু'বেলা খেয়ে আসবেন।...আপনাদের কাছে আমাদের অনেক ঋণ। বিয়ের পর এই বাড়িতে আমি সংসার পাতি, সবসময় নিজের বাড়ি ভেবে এসেছি।...এতবছর পর এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি বলে সম্পর্কটা কেন নষ্ট হবে বলুন? আমার অনুরোধ আপনার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা আমাদের করতে দিন।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫০-১৫১]

হামিদের বউয়ের এমন আন্তরিক কথায় আর অকৃত্রিম ব্যবহারে আফজালও বেদনা অনুভব করে। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে বাড়ি ত্যাগ করতে নিষেধও করে না। কারণ-'এ বাড়িতে থাকতে হলে যে-জীবনযাপন করতে হবে, সে- জীবন তো সে চায় না। তার সময় তো চলে গেছে। জীবনের যেটুকু বাকি, সেটুকু দিয়ে নতুন করে কিছু গড়ে তোলা আর সম্ভব নয়–ওরকম কোনো ইচ্ছা তার জাগে না।' আসলে হতাশা, লালিত স্বপ্নের ব্যর্থতা ও ভাঙচুরের কারণে আফজাল আর নতুন করে সংসার বন্ধনে নিজেকে জড়াতে চায় না। তাই বাড়িটি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত সে হামিদের বউকে তার বাড়িতে থাকার অনুরোধ জানায় এবং এক সঙ্গেই সবাই চলে যাবার কথা বলে। অগত্যা তাদের ভাড়া বাসায় যাবার প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিন যাত্রা বিরতি করতে হয়। এসময় আফজালের জীবনযাপনও কিছুটা কষ্টকর হয়ে ওঠে। কারণ তার–

> 'টাকা পয়সা হাতে যা ছিল, সবই ফুরিয়ে এসেছে। দৈনন্দিন খরচ জোটানোই মুশকিল। লন্ড্রি থেকে কাপড় আনানো যায় না, দাঁতের মাজনের অভাবে কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতে হয়, সাবান ছাড়াই গোসল করতে হয়। হামিদের কাছে হাত পাততে তার লজ্জা করে।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫৫]

এমন সংকটে পড়ে আফজাল দু'একদিনের কথা বলে ঢাকা যায় এবং সহযোদ্ধা বন্ধু বেলাল, শামিম, হায়দার ও মিন্টুর সঙ্গে দেখা করে। বাড়ি বিক্রির অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বলায় সবাই এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। 'যুদ্ধের সময় যারা লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিল তারা এরকম'– স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্পর্কে আফজালের এ কথার প্রতিবাদ করে বেলাল বলে–

> 'ভুল ধারণা তোর–এরা কোনো সময় ল্যাজ গুটিয়ে পালায়নি, এরা তোর আমার সঙ্গেই মিশে ছিল– যে সব লোকের নিকেশ হয়ে যাবার কথা ছিল তাদের বাঁচাল কে? বল কে? কে খুনিদের চলে যেতে দিল? বল তুই? রোমে তো বরাবরই রোমানরা ছিল–এখন সেই রোমে এসে তুমি অন্য আইন চালু করতে চাইলেই কি হবে?'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫৫]

অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যই কিছু সুবিধাবাদী নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এসব প্রভাবশালী দালাল-রাজাকারদের রক্ষা করেছে। আর সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়ে দেশটাকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই আফজাল তার এক বিঘার বেশি জমি, বাগান আর পুকুর সমেত বাড়িটি বিক্রির জন্য কোনো ভালো লোক খুঁজে পায় না। হতাশ হয়ে-' আমার বাড়িটা কি বিক্রি হবে না?' এমন প্রশ্ন করলে বেলাল জবাবে বলে–

> 'তুই ঠগ বাছতে চাস কেন? বাড়ি বিক্রি করতে চাস; যে খদ্দের বেশি দাম বলবে, তাকে দিয়ে দিবি, ব্যস চুকে গেল।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫৬]

বেলালের মুখে এমন কথায় আফজাল প্রতিবাদ করে। কারণ নিজের স্বজনদের হত্যাকারী রাজাকারদের কাছে সে কিছুতেই বাড়ি বিক্রি করতে পারবে না। অথচ বেলাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে–'ওসব যখন ছিল তখন ছিল। গাড়ি স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে, তুই আমি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পালে কোনো কাজ হবে না।' এমন হতাশার কথা জানিয়ে বেলাল আফজালকে বর্তমান বাস্তবতা মেনে নেবার পরামর্শ দেয়। কারণ সেও তার নিজের বোনের সর্বনাশকারী মতি রাজাকারেরও কিছু করতে পারেনি। তাই সে আফজালকে বাড়ি বিক্রির জন্য আরেক বন্ধু হায়দারের কাছে পাঠায়। হায়দার তাকে এসব মোকাবিলা করার জন্য একমাত্র পথ হিসেবে রাজনীতি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু দেশের রাজনীতিতেও এসব রাজাকার-দালালদের পুনর্বাসিত করায় আফজাল তাতেও রাজি হয় না। বরং 'এই ঘণ্টার দেশে থাকবই না আমি'– বলে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং তার বাড়ি বিক্রি করে দিতে জোর তাগিদ দেয়। এজন্য দেড় দিন সে হায়দারের বাসায় অতিথি হয় । তার মনের বেদনা দূর করতে হায়দার তাকে দামি হোটেলে নিয়ে নাচ-গান, মদ ও নারীর ব্যবস্থা করে । কিন্তু কোনো কিছুই সে গ্রহণ করে না। অথচ জেল থেকে পণ করে এসেছিল আমোদ–ফূর্তি করে বাকি জীবন পার করার। কিন্তু নিজের মানসিকতা দেখে আফজালের নিজেরই অবাক লাগে। দুদিনেই হায়দার সুরভি এন্টারপ্রাইজের বেলায়েত চৌধুরী এবং পূর্বাশা লিমিটেডের আবিদুল হাসানকে বলে দরদাম ঠিক করে। এ বাড়িতে সুরভি কোম্পানি করতে চায় ফলের জুস তৈরির কারখানা এবং পূর্বাশা করতে চায় সিল্কের উপর গবেষণা কেন্দ্র । বাড়ি ফেরার পথে সে মনে মনে বলে–

> 'এবার সে সত্যি সত্যি কেটে পড়বে–জীবনের আর কোনো পিছু টান থাকবে না। স্মৃতি না, দায় না, কর্তব্য না–জীবন তুমি এখন কার?'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৫৮]

অর্থাৎ সব বন্ধন পাশ কাটিয়ে, সব দায়িত্ব-কর্তব্য এড়িয়ে আফজাল বেরিয়ে পড়তে চায়। রাজাকাররা নয় বরং একটি কোম্পানি বাড়িটিকে কাজে লাগাবে ভেবে সেও স্বস্তি পায়। হামিদ জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়িটিকে সুন্দর করে তোলায় সে খুশিই হয়। এতে খদ্দেররা আকৃষ্ট হবে। 'আপনার বাবার তৈরি জিনিস–কত কিছু ভেবেছিলেন তিনি'–হামিদের এমন

আবেগী কথাকেও আফজাল যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে পাশ কাটায় এবং বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এদিন বিকেল বেলা খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি হয়। আম কুড়াবার জন্য বিনু, টুলু আর বুলবুলি বৃষ্টিতে ভিজে হাসাহাসি, দৌড়াদৌড়ি আর হৈহুল্লর করে। হামিদের বউয়ের বারান্দা থেকে নিজের বিবাহযোগ্য বোন বিনুর উদ্দেশ্যে– 'আয় ধিঙ্গি মেয়ে, তোর ঠ্যাং যদি আজ ভেঙে না দিয়েছি তো আমার নাম তোরা বদলে রাখিস' বলে ভর্ৎসনা করা দেখে আফজালের শৈশবস্মৃতি ও নস্টালজিয়া এসে ভর করে। আবার 'বিনুর ভেজা শরীরের দৃশ্যটা আফজালের মনের মধ্যে কেটে কেটে বসে যায়।' নিজের শরীরের ভেতরকার ক্ষুধার অস্তিত্ব টের পেয়ে সে মনে মনে হাসে। সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে–

> 'বাবাও বোধ হয় এই রকম একটা সুখের কথা ভেবেছিলেন। নিজে পাবেন না জানতেন, তবু ভেবেছিলেন। সন্তানসন্ততিরা পাবে, এই আশায় সংসারের পোক্ত একটা ভিত গেড়েছিলেন। বাড়ি হলো সেই ভিত। শুধু বাড়ি নয়, দেশও–নিজের মনের দিকটা দেখে নেয় আফজাল। যুদ্ধ করার সময়ও তার পরেও তো সে নিজের চারদিকে সুখেরই ছবি দেখতে চাইতো। ঐ জায়গাতে আঘাত আসছে বলেই তো মাথা গরম হয়ে উঠত–অস্ত্র হাতে বেরিয়ে যাবার কারণ তো ওটাই।'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৬০]

সবার সুখের জন্য যুদ্ধ করে দেশস্বাধীন করলেও আফজালরা সবাইকে সুখী করতে পারেনি। ভিন্ন বাস্তবতার কারণেই সে নিজের শূন্যতা ভোলার জন্যই বাড়ি বিক্রি করতে চায়। ঢাকার দুই পার্টির জন্য অপেক্ষারত আফজালের কাছে এসে জ্বর-আক্রান্ত বিনু পার্টির খবরা-খবর নেয়। আর– 'লোকে আপনাকে লাখপতি বলবে' এবং 'আপনার ভাগ্য দেখলে হিংসে হয়'– বলে কটাক্ষ করে। এতে আফজালের মনে একধরনের খটকা লাগে। কারণ বিনুর অব্যক্ত কথাগুলো অনুমান করতে গিয়ে তার মনে মায়া ও বন্ধনে জড়ানোর সন্দেহ জাগে। দুপুর বেলা পূর্বাশার ম্যানাজার বাড়ি দেখতে আসেন এবং সবকিছু দেখে তাদের পছন্দও হয়। কিন্তু পার্টনার হিসেবে স্থানীয় রাজাকার মতি ঠিকেদারকে সঙ্গে নিয়ে আসায় আফজালের ভারি বিরক্তি লাগে। তাছাড়া ভদ্রবেশী মতি ঠিকেদারের 'এ বাড়ি দেখার কিছু নেই, আমি চিনি এঁদের–প্রফেসর সাব খুব ভালো লোক ছিলেন–আহা আর্মির লোকেরা মেরে ফেলল–খুব স্যাড ব্যাপার।'– এমন কথা শুনে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। আফজালের মনে পড়ে তার বন্ধু বেলাল বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনটি বুলেট আলাদা করে নিয়ে তাকে হত্যার জন্য খুঁজে বেরিয়েছে, কিন্তু পায়নি। তাই আফজাল এদের কাছে বাড়ি বিক্রি না করার কথা কড়াকড়িভাবে বলে বিদায় দেয়।

বিকেল বেলা সুরভি এন্টারপ্রাইজের বেলায়েত সাহেব বাড়ি দেখতে আসেন এবং পছন্দ করেন।'আপনাদের কোনো পার্টনার নেই তো?'– আফজালের এমন জিজ্ঞাসায় বেলায়েত জানান–'আমাদের পার্টনার দরকার পড়ে না। বিদেশি ইনভেস্টাররা সোজাসুজি আমাদের টাকা দেয়। বিদেশি বলতে ধরুন–ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, অ্যারাব কান্ট্রিজ।' 'পাকিস্তান'– দেশের নাম শুনে আফজাল কোনো কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে চলে এসে আমগাছ তলায় বসে। মালিককে না পেয়ে সবাই ফিরে যায়। হামিদ তার সামনে এসে দাঁড়ালে আফজাল বাড়ি বিক্রির প্রসঙ্গে না বলে গতকালের ঝড়ে তিনটি আমগাছে কত আম পড়েছে এবং পাকলে কত আম হতো তার হিসেব করে। তারপর হামিদকে অবাক করে আফজাল ঘোষণা দেয়–

> 'ঠিক করেছি, এ বাড়ি আমি বিক্রি করব না। ভেবে দেখলাম, আমের হিসেব করাই ভালো। এ ফাঁকা জমিতে কী পরিমাণ সবজি হবে সেই হিসেব করব–তারপর হাঁসমুরগির হিসেব করব।...বাগানের হাড়হাড্ডি আর মুণ্ডুগুলোর কথা একবার ভেবে দেখুন। কতগুলো ডেডবডি–তাদের রক্তমাংস এই বাড়ির মাটিতে মিশেছে–মাটি তাতে উর্বর হয়ে আছে, সেই উর্বর মাটি আমি খুনিদের হাতে তুলে দেব? এত সোজা?'-[*ঘরবাড়ি*/পৃ.১৬২]

শেষপর্যন্ত আফজাল তার মনের সকল হতাশা, অস্থিরতা, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের অবরুদ্ধ দেয়াল ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই সঙ্গে ফেলে আসা একাত্তরের অবিনাশী অগ্নিমন্ত্রে পুনরায় নিজেকে অভিষিক্ত করে। তাই নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে বরং একাত্তরের বহু শহিদের মূল্যবান জীবনের রক্ত-মাংসে মেশা স্মৃতিবিজড়িত নিজের বাড়িটিকে কোনোক্রমেই রাজাকার-দালালগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে পারে না। কারণ গোটা বাংলাদেশই যেন একটি বধ্যভূমি। তারই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আফজালের বাড়িটিকে উপন্যাসের মূল পাদপ্রদীপের আলোয় স্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। তাই আফজালের এ পৈতৃকবাড়ি আর স্বাধীন বাংলাদেশ যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। গোটা দেশের মাটিতে যেমন লাখো শহিদের রক্তের দাগ লেগে আছে, তেমনি এ বাড়ির মাটিতেও আফজালের স্বজনদের মিশে যাওয়া রক্ত ও স্মৃতি শুকিয়ে যায়নি ও মলিন হয়ে পড়েনি। এ বাড়িটি যেন প্রতীকী অর্থে মুক্তিযুদ্ধের রক্তেভেজা বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে।[২৪] মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে অতিদ্রুত সমাজে এবং রাষ্ট্রে নেতিবাচক পরিবর্তনের ফলে বিপ্লবী চেতনায় বিশ্বাসী যুবকদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন

বাংলাদেশকে তারা যেমনটি দেখতে চেয়েছিল, তার উল্টোরথযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সাহসী ও নির্লোভ একশ্রেণির যুবক এসব মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারা দেশের বিদ্যমান আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে গণ্য হয় এবং স্বাধীনতার সূর্যশক্তিকে কারারুদ্ধ করা হয়। এর পাশাপাশি চলে স্বাধীনতাবিরোধী দালাল-রাজাকার ও পাকিস্তানি দোসরদের পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন। এ প্রক্রিয়াকে পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন আরো এক ধাপ এগিয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রারম্ভিককালে এ ধরনের চিত্র খুব বিরল ছিল না। ফলে কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যার জন্য একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয় কিন্তু মানুষের মুক্তির সংগ্রাম অধরা রয়ে যায়।[২৫] যার পরিণতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অঙ্কুরিত হয় অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের বীজ। সময় স্বভাবের এ বিরুদ্ধ শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আফজালকে তাই হতাশার গ্লানিতে জর্জর, অস্তিত্বসংকটে বিপর্যস্ত,বিচ্ছিন্নতার শরবিদ্ধ আরেক মানুষে পরিণত হতে হয়।

মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠার গতরসর্বস্ব এ উপন্যাসের কাহিনিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের (১৯৭১-১৯৮৮খ্রি.) বিচিত্র উত্থান-পতনের ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধকালীন স্বপ্ন-প্রত্যাশার অচরিতার্থতা যুবমানসকে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এ ব্যথা,বেদনা ও বঞ্চনাই তরুণসম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত এবং আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি-জনিত আবেগ ও ঔদার্যের ফলে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি এ পর্যায়ে অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় এবং নেতিবাচক সংক্রমণ দ্রুততর হয়। এতে শুধু হোসেন মৃধা, মতি ঠিকেদার, উলফতউল্লাহ ও আইয়ুব আলীরাই লাভবান হয় না, বরং শুভবোধ ও আদর্শের চেতনাকে আলগা ময়লা বা কীটপতঙ্গের মতো শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলা মুক্তিযোদ্ধা শামিম, হায়দার, বেলাল, চন্দনরাও আপসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অসহায় ও সহায়-সম্বলহীন আফজাল এ আদর্শের আপস মেনে নিতে পারেনি। তাই ষোলো বছর পর স্বজনদের হত্যাকারী দালাল-রাজাকারদের মুখোমুখি হয়ে তার ফিকে-মরচে-ভোতা অনুভূতিও শতধারায় শানিত হয়ে ওঠে। যা তাকে খুনি-রাজাকারদের হাতে বাড়িঘর সমর্পণে প্রতিবাদী করে। এমন শুভবোধ ও পরিণামী সিদ্ধান্তই আফজালকে পৌঁছে দেয় অনমনীয়-অবিনাশী চেতনার সৌধলোকে। সকল তাপ-চাপ-প্রলোভন উপেক্ষা করে সাহসী মুক্তিযোদ্ধার আদর্শে ও আত্মমর্যাদায় অবিচল থাকার ইতিবৃত্তই আফজাল চরিত্রের উজ্জ্বল প্রান্ত। আফজালের এমন বোধের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত এ উপন্যাসে প্রবল হয়ে উঠেছে এক অদম্য-অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধার উজ্জীবনের কথা। প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিরুদ্ধ বাস্তবতার বিবিক্তির দেয়ালে অবরুদ্ধ হয়েও একজন মুক্তিযোদ্ধার অমিত অহং অনুপ্রাণিত করে উত্তরকালের প্রজন্মকে; বিনাশী বিবরের অন্ধকারের মধ্যে থেকেও তা ছড়িয়ে দেয় প্রণোদনার দীপশিখা। যা স্বপ্নহীনতা নয়, আদর্শের আপস নয়, বিরুদ্ধ শক্তির কাছে মাথা নত নয়, মূল্যবোধ বিকিয়ে দেয়া নয়, অর্থের কাছে দাসত্ব নয় সর্বোপরি গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের অনির্বাণ চেতনাকে বিস্মৃত হওয়া নয়–এমন বোধের জাগরণ ও উত্তরণই *ঘরবাড়ি* উপন্যাসের সারকথা। সময় ও সমাজসচেতন শওকত আলীর শিল্প দক্ষতায় *ঘরবাড়ি* উপন্যাসটি বাংলাদেশের জন্ম-পরবর্তীকালের অবক্ষয়িত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটের বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *যাত্রা* ১৯৭৬ সনে চট্টগ্রামের বইঘর বিপণী বিতান থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি শওকত আলীর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩) প্রকাশের একযুগ পর তিনি দ্বিতীয় উপন্যাস হিসেবে *যাত্রা* রচনা করেন। এটি পরবর্তীকালে এশিয়া পাবলিকেশন্স (২০০১), বিশ্বসাহিত্য ভবন (২০১৪) ও ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ (২০১৯) থেকে প্রকাশিত হয়।– [উৎস– সরকার আশরাফ (সম্পা.) : *নিসর্গ ;* শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, ১৯৯২, পৃ. ৭৮ এবং ড. মোহাম্মদ হাননান (সম্পা.) *শওকত আলী রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড , বিশ্বসাহিত্য ভবন , ঢাকা, ২০১৪ পৃ. ৫৯৩]

২. অনিরুদ্ধ কাহালি : *শওকত আলীর যাত্রা: মুক্তিযুদ্ধ ও মধ্যবিত্ত-মানস (চন্দন আনোয়ার সম্পা.গল্পকথা); শওকত আলী সংখ্যা, বর্ষ-৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী, ২০১৬, পৃ. ১১৪-১১৫*

৩. নাহিদ হক : *যাত্রা: ঐতিহাসিক বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. উলুখাগড়া); সংখ্যা-১৬, সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫৮*

৪. সরকার আশরাফ সম্পা. : কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর মুখোমুখি দুই সন্ধ্যায় (*নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৭, সংখ্যা- ১, বগুড়া, ১৯৯২, পৃ. ২১

৫. অনিরুদ্ধ কাহালি : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৬-১১৭

৬. অনীক মাহমুদ : *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও শওকত আলীর যাত্রা (নিসর্গ); পূর্বোক্ত*,পৃ. ২৫

৭. অনিরুদ্ধ কাহালি : পূর্বোক্ত; পৃ. ১২২

৮. আবুল হাসনাত : *সাহিত্যের মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের সাহিত্য; সুন্দরম*, ঢাকা, শীত সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃ. ৭১

৯. অনিরুদ্ধ কাহালি : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৫

১০. অনীক মাহমুদ : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩-৩০

১১. চঞ্চল কুমার বোস : *শওকত আলীর কথাসাহিত্য: জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ*; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০৭-১১০

১২. রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৭৪-২৭৫

১৩. মাসুদ রহমান : *অপেক্ষা: একটি প্রতিবেশ প্রধান উপন্যাস (চন্দন আনোয়ার সম্পা.গল্পকথা);* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

১৪. রফিকউল্লাহ খান :পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭৫-২৭৬

১৫. রফিকউল্লাহ খান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭৫

১৬. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান : *উত্তরের খেপ: নিজের সঙ্গে যুদ্ধ নিরন্তর* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া); পূর্বোক্ত*; পৃ. ২১৫

১৭. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১০

১৮. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১৬

১৯. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১১৬

২০. শামস্ আল্‌দীন : *শওকত আলীর 'হিসাব নিকাশ' শশব্যস্ত সময়ের কথন (*চন্দন আনোয়ার সম্পা.*গল্পকথা);* পূর্বোক্ত,পৃ. ২৮৭

২১. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪০

২২. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৬

২৩. শংকর কুমার মল্লিক : শওকত আলীর ঘরবাড়ি: প্রসঙ্গ আলোচনা (চন্দন আনোয়ার সম্পা. গল্পকথা); পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

২৪. শংকর কুমার মল্লিক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৮

২৫. শংকর কুমার মল্লিক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৫

নাগরিক চেতনার উপন্যাস

আধুনিক নগরজীবন ও নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিচিত্র সংকট, নৈঃসঙ্গ্য ও সম্ভাবনার চালচিত্র শওকত আলী তাঁর বহু উপন্যাসে গুরুত্বের সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। ঔপন্যাসিক এখানে উদয়াস্ত শ্রমে-ঘামে অবসিত সিসিফাসরূপী নাগরিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধ, বিচিত্র টানাপোড়েন ও নিরালোক মনের দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথের ভাষারূপ দিয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এ নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্য, মেকি ও মুখোশধারী প্রতিবেশকে। পুঁজিসর্বস্ব এ নাগরিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবন অনেক বেশি যান্ত্রিক, আবেগহীন, স্বার্থঘেরা ও লাভ-ক্ষতির হিসেব দ্বারা সংক্রমিত। যার স্থায়িত্ব রঙিন ফানুস ও বেলোয়ারী কাচের মতো ক্ষণস্থায়ী। পুঁজির পাপ, বিত্তের বিকার ও বিবিক্তি নিয়ে গড়ে ওঠা ঝলমলে বিলাসী নগরে বসবাসরত মানুষের ভণ্ডামি, প্রতারণা, প্রেম, পাশবপ্রবৃত্তি, পলায়নপ্রবণতা, নৈঃসঙ্গ্যের বিনাশী রূপ ও ভোগ-লালসার দানবীয় চালচিত্রের সন্ধান মেলে শওকতের বিভিন্ন উপন্যাসে। এ ধারার প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসগুলো হচ্ছে–*পিঙ্গল আকাশ*, *গন্তব্যে অতঃপর*, *ভালোবাসা কারে কয়*, *যেতে চাই*, *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা*, *প্রেমকাহিনী*, *পতন*, *জননী ও জাতিকা*, *তনয়ার স্বীকারোক্তি*, *জোড় বিজোড়*, *শেষ বিকেলের রোদ*, *এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা*, *ছবির উপরে ছাপ*, *পাকা দেখা*, *স্থায়ী ঠিকানা*, *দোলাচল*, *কাহিনী ও কথোপকথন*, *অস্তাচলের আলো* এবং *ঘরে যেতে চাই*। তবে বিষয়বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের গভীরতা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ববহন না করায় *প্রেম কাহিনী*, *তনয়ার স্বীকারোক্তি*, *শেষ বিকেলের রোদ*, *এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা*, *ছবির উপরে ছাপ*, *দোলাচল*, *কাহিনী ও কথোপকথন*, *অস্তাচলের আলো ও ঘরে যেতে চাই* উপন্যাসসমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এধারার উপন্যাসে শওকত সর্বদ্রষ্টার মতো নাগরিক নর-নারীর নিরালোক মনের 'ভেতরকার মানুষ' বা 'আরেক মানুষ'–এর যন্ত্রণাসহ উপলব্ধিকে পারঙ্গমতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এসব মানুষ বিচ্ছিন্ন, উন্মুলিত ও হতাশায় জর্জর হয়েও অনেক সময় আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্যোগী হয়। ফলে কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতায় নিমজ্জিত হবার পরেও এদেরকে সদর্থক চেতনায়, সামাজিক দায়বদ্ধতায় ও সপ্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হতে দেখা যায়। এ অধ্যায়ে *পিঙ্গল আকাশ*, *গন্তব্যে অতঃপর*, *ভালোবাসা কারে কয়*, *যেতে চাই*, *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা*, *পতন*, *জননী ও জাতিকা*, *জোড় বিজোড়*, *পাকা দেখা* এবং *স্থায়ী ঠিকানা* উপন্যাসগুলো আলোচিত হয়েছে।

নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকট ও জীবনজিজ্ঞাসার নির্মিতি

পিঙ্গল আকাশ

পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩ খ্রি.) শওকত আলীর লিখিত প্রথম উপন্যাস এবং প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।[১] এটি শওকত আলীর যুবা বয়সের রচনা হলেও এর বিষয়-ভাব-ভাষা-ভাবনা ও বর্ণনায় এক ব্যতিক্রমী মাত্রা প্রযুক্ত হওয়ায় দুই বাংলার সাহিত্য

মহলেই তা আগ্রহ ও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে ডায়রির ঢঙে। এর সূচনাটিও হয়েছে প্রকৃতির এক বৈরী পরিবেশের তীব্র ঝড়-বঞ্ঝা, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে। যখন নীলফামারীর মফস্বল শহরের সাহিত্যিক চন্দন সফোক্লিসের *ইদিপাস* নাটকের রাজা ইদিপাসের মৃত্যু পথযাত্রার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অনুবাদের কথা ভাবছিলেন, তখনই প্রতিবেশী চৌধুরী বাড়ির সপ্তদশী মেয়ে মঞ্জু তার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। আবার চন্দনের অজান্তে মঞ্জু নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিন্তু রেখে যায় তার ব্যক্তিগত একটি কালো রঙের ডায়রি। যেখানে–'বিধৃত হয়েছে তিলে তিলে একটি নিঃশেষ হওয়া যন্ত্রণাময় জীবনের ইতিবৃত্ত। মঞ্জুর পরাশ্রয়ী জীবনে চাওয়া-পাওয়ার কোনোও স্থান ছিল না। তাই সে নিজের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাসকে বিবৃত করেছে ডায়রির পাতায়। সেখানে রয়েছে তার নিত্য–নৈমিত্তিক যন্ত্রণালিপ্ত আত্মকথা, উপলব্ধি, তার চারপাশের অমানবিক পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের করুণ বর্ণনা।...ঘরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশে লঘু চিত্ত বিনোদনে উন্মত্ত তার মায়ের কালিমালিপ্ত জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত।'[২] এ উপন্যাসের কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে মঞ্জু নামের এক অসহায়, রিক্ত, নিঃস্ব ও পরাশ্রিত সপ্তদশী কিশোরী। মঞ্জুর মাধ্যমেই বিশ শতকের ষাটের দশকের সূচনাপর্বের নীলফামারীর মতো প্রান্তিক মহকুমা শহরের এক ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরী বাড়ির পতনোন্মুখ পরিস্থিতি ধরা পড়লেও ঔপন্যাসিক এখানে সমকালীন নাগরিক জীবনসংকটের এক বিনাশী দিক নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। নাগরিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক, বিশেষত তার বৈবাহিক জীবন, বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয় এবং প্রণয়হীন পাশবিক সম্পর্কসূত্রের সুস্থ-অসুস্থ ও সুন্দর-অসুন্দরের পরিবেশ ও অনিবার্য পরিণামের গন্তব্য-পথটি উন্মোচিত হয়েছে।

মঞ্জু মোহনপুরের খানবাড়ির মেয়ে এবং হাফিজ খানের নাতিন। শৈশবে বাবার মৃত্যু হলে তার মা সালেহা বেগম প্রথমাবস্থায় পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করে। কিন্তু এক পর্যায়ে ঢাকায় পড়ুয়া কলেজ ছাত্র দেবর কবিরের সঙ্গে সালেহার দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় এবং তা ননদ রাহেলার চোখে ধরা পড়ায় হাফিজ খান তাকে এক রকম বিতাড়িত করেন। কয়েক বছর পর সালেহার বিয়ে হয় নীলফামারীর ক্ষয়িষ্ণু বনেদি চৌধুরী বাড়ির বিপত্নীক, প্রৌঢ় ও তিনসন্তানের জনক আনিসের বাবার সঙ্গে। এ চৌধুরী বাড়ি এক সময় বিত্তবৈভবে পরিপূর্ণ থাকলেও বর্তমানে আর্থিক সংকটে জর্জরিত। পূর্ব-পুরুষের প্রচলিত জমির আবাদ ও কৃষিকর্মের পাঠ গুটিয়ে চৌধুরী সাহেব ব্যবসায়ে নেমেও তেমন সুবিধা করতে পারেননি। উপরন্তু এক সংসারে তিনপক্ষের ছয়টি সন্তান নিয়ে চৌধুরীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হয়। চৌধুরী ও সালেহার এটি দ্বিতীয় বিয়ে আর দ্বিতীয় সংসার। চৌধুরীর প্রথম পক্ষের সন্তান আনিস, ফরিদা আর রাহুল। সালেহার প্রথম পক্ষের সন্তান মঞ্জু। চৌধুরী ও সালেহার বর্তমান সংসারের সন্তান পুতুল ও মম। ছোট সন্তান মম-র জন্ম উপলক্ষে চার বছর পূর্বে অনেকটা দাসী-বাঁদির ভূমিকায় মঞ্জুর এ বাড়িতে আগমন ঘটে। চৌধুরীর এ দ্বিতীয় বিয়েতে পরিণত বয়সের তিন সন্তানই পিতার প্রতি যেমন ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত, তেমনি নিজেদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন গঠনে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যচ্যুত। আনিস-ফরিদা আর রাহুল কেউ মন থেকে নতুন মা সালেহাকে মেনে নিতে পারেনি। আর সালেহাও এ সন্তানদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা আদায় বা আকর্ষণে কার্যকর কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। আবার আপন বাবা হয়ে চৌধুরী সাহেবকেও মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে ও দায়িত্ব পালন করতেও দেখা যায় না। বরঞ্চ পিতা ও বিমাতার একান্ত ভোগপ্রবণ দাম্পত্য জীবনাচার দেখে তারা সংসারবৃত্তের বাইরের বাসিন্দা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পিতৃহারা মঞ্জুও মায়ের দ্রুত দ্বিতীয় বিয়ে আর প্রবল কামকাতর মানসিকতা দেখেও আহত হয় এবং তার মনে জন্ম নেয় এক যন্ত্রণার অঙ্কুশ। সব মিলিয়ে চৌধুরী বাড়িটি হয়ে ওঠে নরকসদৃশ। তাই জীবনের না বলা এবং না বলতে পারা কথাগুলোই মঞ্জু ডায়রিতে লিখে রাখে।

চার বছর পূর্বে চৌধুরী বাড়িতে আসা মঞ্জু দুবছর ধরে গেঁয়ো পোশাক ছেড়ে শাড়ি ধরে। কিছু দিন স্কুলে গিয়েও নানা সংকোচে তা বন্ধ করতে হয়। পুতুল, মম-এর দেখভাল করা এবং সংসারের কাজকর্ম করেই মঞ্জুর রুটিনমাফিক জীবন চলে। তবে টানা দুই বছর অভিমান করে বাড়িতে না আসা ও ঢাকায় পড়তে যাওয়া বৈমাত্রেয় আনিস বাড়িতে আসায় সপ্তদশী সুশ্রী মঞ্জুর মানসভুবন পাল্টে যায়। দুই বছর পূর্বে ঢাকা যাবার সময় সে মঞ্জুকে সস্নেহে বলেছিল–'তুই চলে যাস না, থাকিস এ বাড়িতে, পড়ালেখা করিস মনোযোগ দিয়ে।' একথা থেকেই মঞ্জু দুপুরে ও রাতের অবসরে আনিসের সংগৃহীত বাংলা ও ইংরেজি বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। আর ছোট আপা ফরিদা যখন রাহুলকে পড়াতো, তখন দূর থেকেই মঞ্জু শুনতো এবং তা মনে মনে আওড়াতো। মঞ্জুর এ তৎপরতা বেগম রোকেয়া ও রাসসুন্দরী দেবীর মতো স্বশিক্ষিত হবার সংবিদ ও সদিচ্ছাকেই জানান দেয়। এসব বইয়ের সংস্পর্শে মঞ্জুর মানসলোকের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে

এবং সৎ-সুন্দরভাবে জীবনগড়ার বাসনাটি শতদলের ন্যায় বিকশিত হয়। জীবনবোধের এমন সত্তার সন্ধান পাওয়াতেই মোহনপুরের দাদু বাড়ির পর্দাপ্রথার বিধিনিষেধের বন্দি জীবনের চেয়ে চৌধুরী বাড়ির প্রায় দাসীবৃত্তির মুক্ত জীবনকে তার শ্রেয় মনে হয়েছে। তাই অফিস কেরানি পাত্রের সঙ্গে দাদুর বিয়ে দেবার উদ্যোগের কথা মনে পড়ায় সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নিজের মানসিকতার পরিচয় দিতে মঞ্জু বলে–

> 'আমি যদি দাদুর বাড়ি থাকতাম, হয়ত ঘর বন্ধ করে রাখত, কাপড় আর জামার পুটলি হয়ে চলাফেরা করতে হত। হয়ত একের পর এক বরপক্ষ থেকে দেখতে আসত, জিজ্ঞেস করত নাম কী? হাঁটিয়ে পরখ করত খোঁড়া কিনা, চুল মাপতো কেউ, কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! খোদা তুমি রহমানুর রহিম। আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ।'- [পি.আ. শওকত আলী রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৪/পৃ.২৯]

এমন জীবনবোধ, সত্তাসন্ধান আর স্বপ্নসাধনা নিয়েই মঞ্জুর দিন কাটে। নিজের ছোট খালা অর্থাৎ মীনার মা বেড়াতে আসায় এবং তার সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে মঞ্জু জীবনবাস্তবতার আরেক নগ্ন দিকের মুখোমুখি হয়। অভিনেত্রী হবার বাসনায় বিভোর-বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত মীনার প্রসঙ্গে– 'ভাল গান গাইতে পারলে আজকাল সিনেমায় নাম করা যায়' বলা মাত্রই ছোট খালা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে আর তার মায়ের সামনেই বলে–

> 'নিজের বাপের মাথা তো খেয়েছিস, পরের বাড়িতে এসে তোর আবার এত তেজ হলো কোত্থেকে! দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে তো দাঁড়াবার জায়গা পাবি না।'-[পি.আ./পৃ.২৯]

এমন অপবাদ আর অপমানে মঞ্জুর অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। অথচ সে কাঁদতেও পারে না। উপরন্তু মাকে কোনো প্রতিবাদ না করতে দেখেও সে অবাক হয়। বিচিত্র প্রশ্ন ও আত্মজিজ্ঞাসায় তার মন তোলপাড় করে। তাই মনে মনে হিসেব করে আর বলে– 'তাহলে কি মাকেও আমি হারিয়েছি?...আমার মা কেন অন্যের মা হয়ে গেল!...কেন মা চলে এল দাদুর বাড়ি থেকে! কেন নানার কাছে থাকল না। কেন মা আবার বিয়েতে রাজি হলো।...ঘর-সংসারেরই যদি সাধ ছিল মা'র, নানার কাছে থাকলেও তো পারত! তাহলে মায়ের ওপর আমার অধিকার থাকত। মা'র বুকে মাথা রেখে আমি প্রাণভরে কেঁদে শান্ত হতে পারতাম।' এমন মানসিক অবস্থায় মঞ্জুর কাঁধে আনিস হাত রেখে বলে–

> 'খুব কষ্ট হয় তোর এখানে না?...আমি বুঝি। তোর সব কথা বলবি আমাকে। একটু পড়াশোনা কর। কাঁদিস না, কথা দে, আর কাঁদবি না।'-[পি.আ./পৃ.৩১]

এমন আন্তরিক কথা আর সম্ভাষণে আনিসকে মঞ্জুর খুব আপন মনে হয়। 'এই, আমার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিবি?'– এমন কাজ পেয়ে মঞ্জুর মনের যন্ত্রণার গুমোট ভাব কেটে যায় এবং দেখতে দেখতে সারা মন 'স্বচ্ছ আর সুন্দর' হয়ে ওঠে। সেদিন বিকেলেই আনিসের হাত থেকে একটি বই আনতে গেলে আনিস তার হাত ধরে। অদ্ভুত 'ঠাণ্ডা আর নরম' হাতের সংস্পর্শে মঞ্জু আনিসের চোখের ভেতরে 'একটা থমথমে কান্না' আবিষ্কার করে। ফলে মুহূর্তেই সে আনিসের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। 'তুমি আমার কথা খুব ভাবো, তাই না?'– আনিসের এ 'তুই' থেকে 'তুমি' সম্বোধন শুনে মঞ্জুর অন্তরাত্মা সমূলে কেঁপে ওঠে। কারণ তার মনও এতে সায় দেয়। তবে ভাই-বোনের সম্পর্কের এক দেয়াল থাকায় সে স্বস্তি পায়, মনকে ধমক দেয় এবং জটিল আবর্ত থেকে টেনে তুলে। তার প্রতি আনিসের এ ভালোবাসাকে সে ছোট আপা ও রাহুলের মতো আন্তরিক সম্পর্কের বিবেচনায় নেয়। 'পৃথিবীতে অন্তত একজনও আমার কথা ভাবে'–এমন কথা ভাবতেই মঞ্জুর মনে হয়–

> 'আমি যেন একটা পাখি, আজ বিকেলে অগাধ নীল আকাশে মুক্তি পেয়েছি। অনেক রাত এখন, আমার এখনো ঘুম পাচ্ছে না। আনিস ভাইয়ের হাত দুটো কী স্নিগ্ধ আর নরম। এই গভীর রাতে ওরই দু'হাতে আমার মুখ ঢাকতে ইচ্ছে করছে।'-[পি.আ./পৃ.৩২]

তবে মঞ্জুর মানসিক সুন্দর আর শুভ্রতার আবেশ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। একদিন আনিস তার কক্ষে মঞ্জুকে আবেগে জড়িয়ে ধরলে এবং কাঁধের কাছে আনিসের 'এক টুকরো নরম আগুন'-এর নিশ্বাস পড়ায় মঞ্জু নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় আর 'ছি' বলে বেরিয়ে আসে। মনে কান্না গুমরে গুমরে ওঠে আর জেঁকে বসা সংস্কার বা ট্যাবুর প্রচণ্ড আঘাতে বলে ওঠে– 'অন্যায়, এটা ভয়ানক অন্যায় তোমাদের। একী করছ তোমরা! এমন কিছু করবার অধিকার তো তোমারও নেই, আমারও নেই।' মঞ্জুর এ বিরক্তি ও ঘৃণা মেশানো 'ছি' সম্ভাষণে এক ধরনের পাপ ও অপরাধবোধে পীড়িত হয়ে আনিস উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিরুদ্দেশ হয়। এতে মঞ্জু নিজের সুন্দর ও লোভনীয় শরীরের প্রতি ধিক্কার দেয় আর– 'আমি কেন জন্মের পরই মরে গেলাম না!' বলে মৃত্যু কামনা করে। কারণ কামকাতর আনিসের হাত স্পর্শকে তার কাছে যন্ত্রণার আগুনের পরশ বলেই মনে হয়। যেমনটা মনে হয় খালাতো ভাই বেনুর লোভ ও রিরংসাপূর্ণ দৃষ্টিকে। তাই মঞ্জুর–

> 'আনিস ভাইয়ের ওপরও ঘৃণা হতে লাগলো। বেনুদা আর ওর মধ্যে পার্থক্য কোথায়! সবাই তো আমার এই রক্তমাংসের শরীরটার দিকে হাত বাড়িয়েছে। আমার এই আঠারো বছরের বয়সটাকে অভিশপ্ত করে তুলতে চেয়েছে। কাকে আমি শ্রদ্ধা করব, কাকে আমার ভালো লাগবে!'-[পি.আ./পৃ.৩৫]

এসব অভিযোগ উত্থাপনের পরেও আনিসের জন্য মঞ্জুর মায়া জাগে। নিজের অপরাধবোধে দগ্ধ হওয়া আনিসের দূরে সরে থাকাটাকেও তাকে কুড়ে কুড়ে আঘাত করে। তবে হাস্না খালার ছেলে ও ছোটখাটো ঠিকেদার প্রেমপ্রত্যাশী বেনুদার ব্যাপারে মঞ্জুর পূর্ববৎ জন্মানো ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বহাল থাকে। এ সম্পর্কে মঞ্জু বলেছে– 'বেনুদা কোনো দিন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে আমাকে। আমি জানি, বুঝতে পারি, ওকে চোখে না দেখতে পেলেও। সব মেয়েই নাকি পারে। ওর চোখের ভেতরে যেন একটা সাপ আছে। যে কেবলই আমার শরীরের চারপাশ ঘিরে ঠাণ্ডা দেহ দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।' তাই এ সুযোগসন্ধানী ও রিরংসাগ্রস্ত বেনুদা তার মায়ের প্রশ্রয়ে নিয়মিত দুপুর বা বিকেলে তাদের বাড়িতে আসে। আর পানি, চা ও পান খাওয়ার বাহানায় কাছে ঘেঁষতে চাইলেও মঞ্জু নিজেকে সজাগ আর সতর্ক রাখে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় ও কৌশলী কর্মতৎপরতা দিয়ে বেনুকে মোকাবিলা করে। তারপরেও তার মা সালেহার প্রশ্রয় পেয়ে বেনু মঞ্জুর হাত ও বুক ধরতে গেলে সে প্রতিবাদস্বরূপ ধমক ও চেঁচামেচি করে। 'কি হলো তাতে আর! ও-সব কিছু না, মনে করো না কিছু'– বলে বেনু নির্লজ্জের মতো হাসলে মঞ্জুর মনে হয়–

> 'ক্রোধে, ঘৃণায় আর প্রতিহিংসায় আমি একাকার হয়ে গিয়েছি। প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা কামড়ে ধরি। নিজেকে আমার অশুচি মনে হতে লাগল। আমাকে স্নান করতে হলো। সারা গায়ে সাবান মাখলাম। তবু ওর আঙুলের ঘৃণ্য স্পর্শ কিলবিল করতে লাগল আমার সব অনুভূতির মাঝখানে।'-[পি.আ./পৃ.৩৫]

এরপরেও বেনুকে তার মা প্রশ্রয় দেয় এবং 'যা তুই সিনেমা দেখে আয়' আর 'এটুকু হাসিঠাট্টা না করতে পারলে ভাইবোন সম্পর্ক কেন?'–বলে বেনুকে উস্কে দিলেও মঞ্জু তাকে এড়িয়ে চলে। যা সালেহা বেগমের সহ্য হয় না। তাই স্বামী চৌধুরীকে বলে মঞ্জুকে হয় দাদার বাড়ি পাঠাতে আর না হয় বিয়ে দিতে জোর তাগিদ দেয়। কিন্তু 'ফরিদার বিয়ে না হলে– ওর বিয়ে কেমন করে দেওয়া যায়?'–বলে চৌধুরী যুক্তি ও বাস্তবতা তুলে ধরায় সালেহা আক্রোশে ফেটে পড়ে। ' মেয়ের বয়স বসে নেই। ও বয়সের অনেক আগে আমি মা হয়েছিলাম'– বলে স্বামীর ওপর ঝাঁজ ঢালে আর সতীনের ছেলেমেয়েদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানতেও বাদ রাখে না। আবার 'যাও না কোন চুলোয় যেতে পারো দেখি। আমাকে মারবার জন্য এনেছ তুমি এখানে'– বলে স্বামীর প্রতিও চরম বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করে। যদিও দ্বিতীয় বিয়ের পর এখানে এসে সালেহার চোখে-মুখে এক তৃপ্তির ভাব ছিল। তবে বর্তমানে প্রৌঢ় স্বামীর সঙ্গে তার যে-তিক্ততা দিনদিন বেড়ে চলছে–তা মেয়ে মঞ্জুর দৃষ্টিও এড়ায় না। এসব দেখে মঞ্জুর মনে হয়–

> 'দুজনের মাঝখানে যেন একটা অদৃশ্য দেওয়াল উঠে দাঁড়াচ্ছে।...সবাই একাকী। বাবা আর ছোট আপা, ছোটো আপা আর আনিস ভাই, রাহুল আর আমি এ বাড়ির সঙ্গে কারো যোগ নেই।...এদের সব সম্পর্কের মূলে কেউ যেন একের থেকে অন্যকে কেটে কেটে বাদ দিয়ে রাখছে।...এ এক আশ্চর্য বাড়ি। যেন শহরের হোটেল।'-[পি.আ./পৃ.৩৭]

এ বিচ্ছিন্নতাই সবাইকে দূরে সরিয়ে দেয় সকল প্রেম-প্রীতির বন্ধন থেকে, মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে, জীবনবেগ ও কর্মস্পৃহা থেকে। তাই দেখা যায় এ বাড়ির আনিস শিক্ষা শেষ করে বাড়ি ছাড়া, ফরিদা আই.এ. পাশ করে হতাশ, রাহুল ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, চৌধুরী সাহেব ব্যবসায়ে গিয়ে ঋণগ্রস্ত, সালেহার সব থেকেও শরীর-মনের অতৃপ্তি আর বাবা-মায়ের স্নেহবঞ্চিত মঞ্জু পরাধীন আর পরাশ্রিত জীবনের যন্ত্রণায় জর্জর। মঞ্জুর এ বাঁদির মতো জীবনের গ্লানি, অপবাদ ও অপমান দেখে রাহুল তাকে বাড়ি ছাড়তে বকা-ঝকা করে। তবে একই বয়সী দুজনের জীবনের নির্লক্ষ্য দশা উভয়কেই ভাইবোনের সম্পর্ক ছাড়াও পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত করে। তাই মঞ্জুকে অপমানকারী বেনুর উদ্দেশ্যে রাহুল বলে– 'এ বাড়িতে পা রাখবি না, মেরে ফেলব তাহলে।' অথচ এ শাসন করা নিয়েও মঞ্জুকে বিরাগভাজন হতে হয় এবং তার নিজের মা সালেহাও রাহুলের প্রতি রুচিহীন সন্দেহ করে। তারপরেও মঞ্জু অনুতাপ করে তার এ বাড়িতে ন্যূনতম অধিকার না থাকার জন্য। এ অধিকার থাকলে সে সবাইকে হাত ধরে ফিরিয়ে এনে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে দীক্ষিত করতো। তাই নিজের দোষ স্বীকার করে সে– 'আনিস ভাই, ফিরে এসো' বলে প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করে। রাহুলের সঙ্গে কথা বলা নিয়ে মায়ের কাছ থেকে অপমানের এক শেষ হয়ে মঞ্জু এ বাড়ি ছাড়তে দাদুর উদ্দেশ্যে চিঠি লেখে। এসময় ফরিদা তার মৃতমায়ের একটি ছবি বাঁধানোর বায়না ধরায় আর অর্থাভাবে চৌধুরী তা নাকচ করায় উভয়ে ঝগড়ায় জড়ায়। আক্রোশে ফরিদা বাবার উদ্দেশ্যে বলে–

> 'তুমি স্বার্থপর, নিজের এতটুকু কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নেই তোমার। নিজের সুখের জন্য নিজের বিয়ে পর্যন্ত করতে পারো।...অন্ধ হয়ে গিয়েছ একেবারে।'-[পি.আ./পৃ.৪৩]

মেয়ের মুখের এমন আপত্তিকর কথা শুনে চৌধুরীও বলেন–'তবু তো এই স্বার্থপর অন্ধ লোকটাকেই বাবা বলে ডাকতে হবে। যদি বাবা বলে ডাকতে অসুবিধা হয়, ডোকো না। এ বাড়িতে থেকো না। রাস্তা খোলাই আছে।' বাবার এমন ব্যবহারে অপমানে-অভিমানে ফরিদা ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অথচ তাকে কেউ আটকায় না, এমনকী ফিরিয়েও আনে না। যা দেখে মঞ্জু রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। আর এটাও বুঝতে পারে যে, ফরিদার গায়ের রঙ ফর্সা না হওয়াতে বরপক্ষের কাঙ্ক্ষিত যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় তার বিয়ে হয় না। সকল বান্ধবীর বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ফরিদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। তাই পড়াশোনায় ঝোঁক কম থাকা ফরিদা আই.এ পাশ করার পরেও আগ্রহের ঘর-সংসার না করতে পারায় বাবার ওপরই তার সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়ে। এ জন্য ফরিদা মঞ্জুকে প্রায়ই বলতো– 'ছেলেরা সবাই শয়তান, ওদের কখনো বিশ্বাস করবি না। বাবা, ভাই, কাউকে না।' এ চাপা ক্ষোভ ও ঘৃণা ফরিদাকে ঠেলে দেয় অনিশ্চিত-অনিরাপদ এক ভবিষ্যতের পথে। এসময় মঞ্জু ব্যবসায়ী চাচার দায়সাড়াগোছের পাঠানো চিঠি পড়ে নিজেকে মোহনপুরের পৈতৃক বাড়ির একজন অধিকারহীন, অসহায় ও অস্তিত্বহীন মানুষ বলে চিহ্নিত করে। এদিকে নিজের কিছু প্রয়োজনীয়ও জিনিসের কথা সৎবাবা চৌধুরীর কাছে চাইলেও তিনি তা বউয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। এতে মঞ্জুকে তার মা অযথা বকাঝকা করেন। ফলে মঞ্জুর চোখ ফেটে পানি আসে আর মনে হয়–

> 'মানুষের বোধ হয় ভিখিরি হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। নিজেকে কেমন যেন ছোটো মনে হয়।...এ শরীরটাই যে হয়েছে আমার কাল। এর জন্য কাপড় জামা দরকার। আর এর অসুখ করলে বেঁচে ওঠার জন্যে আবার ওষুধেরও যে প্রয়োজন।'-[পি.আ./পৃ.৪৫]

এ সুশ্রী ও যৌবনবতী শরীর নিয়েই মঞ্জুর অস্বস্তি আর অশান্তির শেষ নেই। একদিন দুপুর বেলা গোসল সেরে বারান্দায় আসতেই স্বভাববশত বেনু তার প্রতি মনের কাতরতা প্রকাশ করে। জবাবে মঞ্জু জানায়– 'আপনি যদি এমন পাগলামি করেন, তাহলে আমি বাবা আর রাহুলকে জানাব। জুতো দিয়ে পিটিয়ে এসব ভূত ঝেড়ে দেবে।' কিন্তু মঞ্জুর মা সালেহা বেনুকে প্রশ্রয় দেয় এবং সুযোগ করে দিতে নিজে গোসলে ঢুকে। ফলে দুপুরের নির্জন বাড়িতে বেনু মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরতে গেলে সে এক দুঃসাহসিক কাজ করে। এ সম্পর্কে মঞ্জু জানায়–

> 'আমার সারা শরীরে কিছু ঝংকার দিয়ে উঠল। বিদ্যুতের মতো আমার ডান হাত ওর কানের কাছে আছড়ে পড়ল। তারপরই আমি সে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম।'-[পি.আ./পৃ.৪৯]

এমন বিব্রতকর ঘটনা ছাপিয়ে চৌধুরী বাড়িতে আরেক দুঃসংবাদ ধেয়ে আসে। সুদের দশ হাজার টাকা পরিশোধ না করার দায়ে চৌধুরীর নামে ফৌজদারি মামলা হয় এবং বিরাট সংসারের একমাত্র উপার্জনের উৎস দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে রাশভারী চৌধুরীকে অর্থ-সংগ্রহের দুশ্চিন্তা আর অপমানের জ্বালায় জর্জর হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এ ঘর-ওঘর পায়চারি করতে দেখে মঞ্জুর মনে মায়া ও অজানা আশঙ্কা জেঁকে বসে। তার বার বার মনে হয়–

> 'বাবা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছেন...এ সংসার আর থাকবে না। চোরাস্রোতের উপরকার বালির ওপর যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। এই স্রোতের জন্ম অনেক পেছনে।...বাবাই বোধ হয় এই চোরাস্রোতের কথা জানতেন।...শত্রু রয়েছে অগোচরে, আমারও তারাও। এ বাড়িকে যে ধ্বংস করছে, সে রয়েছে সব রকম স্পষ্টতার ওপারে। দূর থেকে নানান ছলে সে এগিয়ে এসে একে একে ভিত্তির ইট খসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ কেউ টের পাচ্ছে না।'-[পি.আ./পৃ.৫০]

চৌধুরীর বাবা জমিদার ছিলেন। কিন্তু ভোগ-বিলাসিতায় জমিদারির জৌলুস ছিল না। তারপরেও যে-জমি ছিল, তা বিক্রি করে চৌধুরী ব্যবসায়ে ঢুকে দেউলিয়া হওয়ায় আর দাঁড়াবার জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। দোকান ক্রোক হবার ঠিক দুদিন পূর্বে চৌধুরীর ধনাঢ্য বন্ধু বরকত এলাহী বেড়াতে আসলে তাকে আপ্যায়ন করতে মা সালেহা মঞ্জুকে কৌশলে পাঠিয়ে দেয়। বরকত এলাহীর চাপা পরামর্শে চৌধুরীর গর্জন করা এবং এলাহীর চোখে-মুখে কামাগ্নির মত্ততা দেখে মঞ্জুও ভয়ংকর কিছু আন্দাজ করে। যা রাতের বেলা বাবা-মায়ের কথোপকথনে পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ মঞ্জুকে বিয়ে করার শর্তে বরকত এলাহী মামলা প্রত্যাহার করে নেবে আর দেনা সুযোগ মতো পরিশোধ করতে হবে। 'বরকত এলাহীর কী আর এমন বয়স হয়েছে।'–বলে সালেহা নিজে সম্মতি দিলেও চৌধুরী সাহেব তা নাকচ করেন। বরং প্রতিবাদ করে বলেন– 'না!...ওসব কথা তুমি এনো না। যায় যাবে আমার ব্যবসা, কিন্তু একটা জীবন নষ্ট করতে পারব না আমি।' তারপরেও সালেহা বেগম সংসার আর সন্তানদের কথা ভেবে চৌধুরীকে এ প্রস্তাবে রাজি হতে প্ররোচিত করে। কিন্তু চৌধুরী পরিষ্কারভাবে বলেন– 'তুমি নিজের মেয়ের এমন সর্বনাশ করতে চাও কেমন করে?... একটা ষোলো বছরের বাচ্চা মেয়েকে ওর হাতে তুলে দিতে পারব না।' এতে বিরক্ত হয়ে সালেহা মেয়ের বয়স সংশোধন করে স্বামীকে বলে– 'ষোলো নয়, সতেরো।' সে নিজেও যে-

বুড় বয়সী চৌধুরীকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে– সে-কথা বলতেও ভুল করে না। চৌধুরী তাতেও বিভ্রান্ত হন না, বরং ধীর-স্থির কণ্ঠে বলেন– 'মঞ্জু আমার মেয়ে হয়তো নয়, কিন্তু ওকে আমি স্নেহ করি। ওকে সুখী করার দায়িত্ব আমারও।' এসব কথা শুনে সৎবাবার প্রতি মঞ্জুর যেমন ভক্তি-ভালোবাসায় মন ব্যাকুল হয়, তেমনি আপন মায়ের লোভ-লালসা আর পাশবিক মানসিকতা দেখে মন বিষিয়ে ওঠে। আর জগৎ ও জীবনে টাকা-পয়সার সূক্ষ্ম হিসেব ও প্রভাবের খেলা দেখে সে অবাক হয়। কারণ একদিকে স্বজনদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আরেকদিকে বাবার বয়সী স্বামীর ঘরে গিয়ে তার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার গড়ে তুলতে হবে। তাই মঞ্জুর ঘৃণা আর বিদ্বেষ বরকত এলাহী ছাপিয়ে গিয়ে পড়ে আপন মায়ের ওপর। তাই মনে মনে বলে–

> 'আমারই মায়ের মন এমন কেন? আমার জীবন তার কাছে কি কিছুই না! পুতুল আর মম-এর কথা মা ভাবছে, কিন্তু আমার কথা মা ভাবছে না কেন? মা'র জীবনে সুখ বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছে! আমার কেউ নেই। কার জন্যে তবে আমি বাঁচব। কার জন্যে?...আমার মা কেন আমার থাকল না।'-[পি.আ./পৃ.৫৩-৫৪]

এভাবে আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মঞ্জুর রাতে ঘুম আসে না। জীবনের শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতার মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া বারান্দায় বসা মঞ্জুর মাথায় এসে চৌধুরী হাত রাখেন আর সস্নেহে 'মঞ্জু মা' বলে ডেকে পাশে বসেন। আর বলেন– 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ তোর সব দায়িত্ব আমার। তোর যা ভালো লাগবে না, তা আমি কক্ষনো হতে দেব না।' ফলে সৎবাবা চৌধুরীর প্রতি তার পূর্বের সকল ধারণা পাল্টে যায়। এমন স্নেহের ও নির্ভরতার আশ্রয় পেয়ে মন ভরে ওঠে।

দেনার দায় মেটাতে শেষপর্যন্ত চৌধুরী গ্রামের অবশিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। এর সূত্রেই বাড়িতে সাবেক জাহাজের চাকুরে, মামলায় জড়িয়ে চাকরিচ্যুত, চল্লিশ বছর বয়সী চৌধুরীর মামাতো ভাই আকরামের আগমন ঘটে। সে প্রথমে চৌধুরী সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসায়ের কথা বললেও পরে তার কাছে দোকান বিক্রির প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হন না। বরং জমি বিক্রির জন্য রাতদিন দৌড়াদৌড়ি করেন। অথচ স্বামীর খাওয়া-দাওয়া ও যত্ন-আত্তির দিকে নজর না দিয়ে সালেহা দেবর আকরামকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠে। চৌধুরীর পুরো দেখভালের দায়িত্ব মঞ্জু নীরবে-নিশ্চুপে পালন করে। সম্পত্তির ওয়ারিশান বেরিয়ে পড়ায় চৌধুরী জমিও বিক্রি করতে ব্যর্থ হন। তাই শেষ ভরসা ইনসিওরেন্সের টাকা ধারের চেষ্টা করতে চৌধুরী ব্যস্ত হন। এসময় খালাতো বোন মীনার অভিনেত্রী হবার পাগলামিতে ব্যর্থ হয়ে বখাটে প্রতিবেশী আফজালের সঙ্গে ভেগে যাওয়ার কথা, বান্ধবী রঞ্জুর আহসানকে এবং নাসিমার জামিলকে নিয়ে শরীরী প্রেমের কথা, অহংকারী রানি দিদিমনির শেষপর্যন্ত বি.এ. ফেল আশরাফের ঘর করার কথা এবং উচ্চশিক্ষিত রাজিয়া খানের কলেজের মেয়েদের সঙ্গে সমকামী সম্পর্কের কথা শুনে মঞ্জুর অবাক লাগে। এসবের মূলে যে- নারীর শরীর নামক এক শত্রুর উপস্থিতি রয়েছে– তাও মঞ্জু বুঝতে পারে। তাই মঞ্জু বলে–

> 'যত যন্ত্রণা, সব তো এই শরীরটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।...কেন আমাকে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। আমার শরীরটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লোভ আর লোভ। আমার চারপাশে শুধু ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল, রোমশ লোভ থিকথিক করছে। সেই লোভ-লালসার ওপারে আমি একেক সময় কোনো মানুষের মুখই দেখতে পাই না।'-[পি.আ./পৃ.৬৩]

অর্থাৎ 'অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী'-র মতো মঞ্জুকেও তার নারী জীবনে সমাজে ঘাপটি মেরে বসে থাকা লম্পট-মর্ষকামীদের বিরুদ্ধে যেমন সজাগ-সতর্ক থাকতে হয়; তেমনি নিজের মনের লেলিহান সাধ এবং রক্তমাংসের শরীরের অদৃশ্য গোপন কামনা-বাসনার সঙ্গেও রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। এমন বিরূপ ও বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মঞ্জু তেমন কাউকেই সহায়ক হিসেবে পাশে পায় না। চৌধুরী ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাওয়াতে শেষপর্যন্ত বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। তিনি পুনরায় ব্যবসায় দাঁড় করতে দোকান নিয়ে ব্যস্ত হন। কিন্তু আকরাম ও বেনুর অন্দরমহলে যাতায়াত অব্যাহতই থাকে। যা মঞ্জুর মনে নানা আশঙ্কার জন্ম দেয়। 'চৌধুরী বাড়ির ভেতর ভেঙে গিয়েছে, তা আর জোড়া লাগবে না'–এমন সামূহিক ধস ও সম্ভাব্য পতনের অনিবার্য আশঙ্কায় মঞ্জুর মন বিষাদ-বেদনায় ভরে ওঠে। মঞ্জুর উদ্দেশ্যে পাঠানো ফরিদার চিঠি পড়ে তার আরেক ভয় ও যন্ত্রণা শুরু হয়। ফরিদা চিঠিতে লিখেছে–

> 'মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই মঞ্জু। বাড়িতে ফিরতে পারব কিনা জানি না। ফিরলেও কোন মুখে ফিরব!...যদি এ মাসের মধ্যে ফিরতে না পারি তাহলে বুঝবি, তোর ছোটো আপা মরে গেছে।'-[পি.আ./পৃ.৬৫]

এমন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের শুরুতে ক্ষয়িষ্ণু উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এক শিক্ষিত স্বাধীনচেতা নারীর ক্রমশই পতন, পরাভব ও লক্ষ্যচ্যুত জীবনের করুণ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ফরিদা বাবার সঙ্গে অভিমান করে যে-প্রেমিকের ওপর

বল-ভরসা করে বাড়ি ত্যাগ করেছিল, প্রথমে সে সেই প্রেমিক পুরুষ দ্বারা প্রতারিত হয়। এরপর সে নার্সিং-এ চাকরি নেয়। এ চাকরি ছেড়ে সোস্যাল ওয়েলফেয়ারে যোগদান করে বিভিন্ন মফস্বলে একাকী ঘুরে বেড়ায়। এমতবস্থায় বেনুর উদ্যোগে পারিবারিক পিকনিকে গিয়ে মঞ্জু সারাক্ষণ নিস্পৃহভাবে বসে থাকায় মা সালেহার ভর্ৎসনার শিকার হয়। তাই মঞ্জুকে ধমক দিয়ে বলে– 'ছেলে মানুষের মতো থাকবে। ছেলে মানুষের বুড়োমি দেখলে আমার গা জ্বালা করে।' আসলে এ কথার দ্বারা সে যে-মেয়েকে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে উস্কে দিতে চায়– তাও মঞ্জু বুঝতে পারে। মঞ্জু তার এ জীবনসংকট আর যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে জানায়–

> 'যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা। মানুষের মনে যে কী করে এত যন্ত্রণার জন্ম হতে পারে! আমি যেন নিজেরই শত্রু হয়ে পড়েছি। নিজেকেই হত্যা করে চলছি তিল তিল করে।'-[পি.আ./পৃ.৬৭]

এসময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা নিয়ে আনিস বাড়িতে আসলে মঞ্জু ছাড়া কারো মনে কোনো রেখাপাত করে না। কুশলাদি জিজ্ঞাসা আর প্রয়োজনের কথা জানতে নানা সঙ্কোচ হবার পরেও আনিসের কাছে গেলে সে বালিশ ছেড়ে মঞ্জুর কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজে। আর তাতে মনের অজান্তেই মঞ্জু তার একটি হাত আনিসের মাথার চুলে গুজে দেয়। এতে বহুদিন ধরে অপরাধ বয়ে বেড়ানোর যন্ত্রণা থেকে আনিস মুক্তি পেলেও মঞ্জুর মনে কান্না গুমরে গুমরে ওঠে। কুলোতে না পেরে মঞ্জু আনিসের ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে। আর–

> 'এই এক আশ্চর্য বোধ। আমি যেন আর একাকী নই। আমার যন্ত্রণা হলো দ্বিগুনতর।...একদিকে শুধুই নিজেকে বলছি, এবার তোর মরা ভালো। আর অন্যদিকে মনের ভেতরে আমার সব সুখ সব সাধ ফুলের মতো ফুটে উঠছে, বাঁচার সাধে বার বার হাত বাড়াচ্ছি সম্মুখের দিকে।...মনে হলো কে যেন আমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ, আর কেবলি ওকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। জানি না, এরই নাম ভালোবাসা কিনা। মনের ভেতরে কেউ যেন বারবার ধমকে উঠছে। বারবার ক্রুদ্ধস্বরে বলছে, এটা অন্যায়, পাপ হচ্ছে তোমার।'-[পি.আ./পৃ.৬৮]

তারপরেও এ অন্যায়-অস্বীকৃত প্রণয়ের পাপ-প্রতিক্রিয়ায় পরিস্রুত হয়ে মঞ্জু সুন্দর-শুভ্র-সার্থকভাবে বেঁচে থাকতে এ অপ্রাপনীয় প্রেমের ওপরই আস্থা রাখে। তাই অভাবনীয়রূপে আনিসকে –'আর অমনভাবে চলে যেও না তুমি' বলে সম্বোধন করে বাধার পাথার-পাহাড় অতিক্রম করে। নিঃসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারার মধ্য দিয়ে মঞ্জু ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের জাল বুনে। কিন্তু লোকলজ্জার ভয় আর মায়ের বিরোধিতার ভয়ে নিমেষেই মঞ্জু মিইয়ে যায়। তাছাড়া এ কথা প্রকাশ পেলে মৃত্যু ছাড়া যে-লুকানোর আর কোনো জায়গা থাকবে না– সে-বিষয়ে মঞ্জু নিশ্চিত হয়। তাই দাদুর বাড়ি চলে যাওয়াকেই সে শ্রেয় মনে করে। যুক্তি হিসেবে মঞ্জু জানায়–

> 'দুজনে কোনোদিন সুখী হতে পারব না। কোনো দিন না। তার চেয়ে এই ভালো। নাহলে আনিস ভাইকে মা ছেড়ে কথা বলবে না। পাড়া-প্রতিবেশীর কানে উঠবে কথাটা, মা-ই হয়ত তুলবে। হায়রে! আমার নিজের মা-ই যে সব চাইতে বড়ো শত্রু।'-[পি.আ./পৃ.৬৯]

নিজের মায়ের এ ঘরভেদী বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে মঞ্জু ব্যথা-বেদনায় ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। আবার লোকলজ্জার ভয়ে, কুৎসা-কলঙ্কের ভয়ে আর স্বজনদের স্নেহ বঞ্চিত হবার ভয়ে মঞ্জু দাদুর বাড়ি চলে যেতেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। এসময় পতনোন্মুখ চৌধুরী বাড়িটি কিছু দিনের জন্য আবার পূর্বেকার ছন্দে ফিরে আসে। ঠিক যেন ধপ করে প্রদীপ নেভার পূর্বে তীব্র শিখায় জ্বলে ওঠার মতো। চৌধুরীর দোকানে উন্নতির হাওয়া লাগে আর গত বছরের কেনা সরিষাতে লাভও আসে আশাতীত। ফলে সালেহার নতুন শাড়ি-কাপড়, সন্তানদের জামা, বিনোদনের জন্য সিনেমা দেখতে যাওয়া আর ভালো বাজার– সব মিলিয়েই এক চাঁদের হাট বসার মতো অবস্থা হয়। তবে এর ভেতরে ভেতরে পাপ-পচন আর পতনের প্রস্রবণটিও বেগবান হয়ে ওঠে। যা মঞ্জুর দৃষ্টিও এড়ায় না। প্রায় প্রতিদিনই দুপুরের পর ভাইপো বেনুর সামনেই সালেহা দেবর আকরামের সঙ্গে যে-রসালাপ আর অঙ্গভঙ্গি করে, তা শুনে ও দেখে মঞ্জুর চোখ-মুখ লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে ওঠে। আবার ব্যবসায় নিয়ে ব্যস্ত সরল স্বভাবের চৌধুরীর অন্ধ স্নেহের প্রশ্রয়ে ছত্রিশ বছর বয়সী সালেহার নতুন নতুন শাড়ি, জামা, অন্তর্বাস, স্নো-পাউডার, সাজসজ্জা আর মনের দুরন্ত পাখা মেলার বাসনা দেখেও মঞ্জু স্বাভাবিক থাকতে পারে না। কারণ একদিন দুপুর বেলা বারান্দা দিয়ে যাবার সময় মঞ্জু সালেহা বেগমের ঘর থেকে চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পায়–'আঃ ছাড়ো! মঞ্জু আসছে।' মায়ের এমন ব্যভিচারী কর্মকাণ্ডে মঞ্জু অপমানে-আক্রোশে ফেটে পড়ে। কারণ হিসেবে মঞ্জু জানায়–

> 'আমার কানে তখন জ্বালা ধরেছে। কেউ যেন অপমান করল সেই মুহূর্তে। যেন কোনো বিষাক্ত সাপ ছোবল মারল আমার শরীরে! আমি ইচ্ছে করে পায়ের শব্দ তুলে সরে এলাম বারান্দা থাকে।'-[পি.আ./পৃ.৭৯]

যুবতী মেয়ের অদৃশ্য উপস্থিতি টের পেয়েও সালেহা বেগমের উদগ্র ভোগ-বাসনায় অবিচল থাকা– তার সর্বনাশা ব্যভিচারী রূপটি উন্মোচিত করে। এটি আন্দাজ করেই রাহুল ও আনিস সালেহা বেগমকে এড়িয়ে চলে। আর চৌধুরীর উদাসীন ভাব দেখে মঞ্জু রাগে-ক্ষোভে ছটফট করে। নিজের মনের অবস্থা বলতে গিয়ে মঞ্জু জানায়–

> 'মাঝে মাঝে আমার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে। কেন বাবা ধমকে উঠছেন না মাকে! কেন ওই সাজপোষাক আর স্নো, পাউডারগুলো পাঁচিলের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন না। ভয়ংকর রকমের সর্বনাশা স্রোতের মুখে বসতে যাচ্ছে মা।'-[পি.আ./পৃ.৭০]

নিজ মায়ের এমন বেহায়াপনা আর ব্যভিচারে মঞ্জু সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারে না। তবে মায়ের সঙ্গে অভিমান ও ঘৃণা ছুঁড়ে সে রঙিন জামা-শাড়ি ছেড়ে সাদা কাপড় ধরে। আর প্রসাধনী ত্যাগ করে নিরাভরণ-বিধবার সাজে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে। মঞ্জু মায়ের অসংযমে নিজের সংযমতা দিয়ে এক নীরব প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করে। আর বিস্ময়ের সঙ্গে মঞ্জু কেবলি ভাবে–'কেন করছে মা এসব।' এ চিন্তাসূত্রেই মঞ্জুর মনে পড়ে পিতার মৃত্যুর পরপরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকার পরেও কবির চাচার সঙ্গে মায়ের ব্যভিচারী জীবনের কথা। যা তার ও রাহেলা ফুপুর চোখেও ধরা পড়েছিল। সেই দুর্বার উদগ্র লালসার লীলাখেলায় তার মা পুনরায় মেতে ওঠে। অথচ এ সর্বনাশা পতন-পচনময় চোরাস্রোতের ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবেই মঞ্জু ভয় পায়। তার কেবলি মনে হয়–

> 'চৌধুরী বাড়ির ভিতে লোনা লেগেছে। এবার ভাঙবে, ভেঙে পড়বে বিরাট বাড়িটা। আর সেই ধ্বংসস্তূপে কে যে চাপা পড়বে কিছু বলা যায় না।'-[পি.আ./পৃ.৭১]

এ নরকসদৃশ চৌধুরী বাড়িতে মঞ্জু কেবল আনিসের অবস্থান আর উপস্থিতির কারণে বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন পায়। অথচ তার কুটিল ও ঘৃণ্য স্বভাবের মা নিজের অপকর্মের সাক্ষী মেয়ে মঞ্জুকে ঘায়েল করতে তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে। তাই মঞ্জু গোসল ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তীক্ষ্ণ চোখে তার ঠোঁট, মুখ, গাল, ঘাড়, গলা, বুক ও হাত– এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর নজর বোলায়। এতে অজানা আশঙ্কায় তার শরীর মন শিউরে ওঠে। এসময় মঞ্জুর ছোট খালার ভাসুরের মেয়ে তাজিনা বেড়াতে আসে। রূপসী হবার পরেও সাজগোজ না করে সাদা কাপড়ে বিধবার মতো থাকাতে সে মঞ্জুকে কটাক্ষ করে। আর 'খবরদার বাইরে বেরোবে না। যে তোমাকে দেখবে, তারই মাথা খারাপ হবে'–বলে ভয়-ভীতি ধরিয়ে দেয়। তাজিনার বলা–'আমি সুন্দর' কথাটিই তার কানে সারাক্ষণ বাঁজে। ফলে আনিসের উদ্দেশ্যে মঞ্জু মনে মনে বলে–

> 'আমি সুন্দর। আর সুন্দর হয়েছি যে তোমারই জন্যে। তোমারই জন্যে আমি শুভ্র হব, পবিত্র হব।'-[পি.আ./পৃ.৭৩]

এ বাসনাতেই মঞ্জু ভোর বেলা আনিসের ঘরে যায়। সদ্য ঘুম থেকে জাগা আনিস নিজের অপরাধ স্বীকার করে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে এবং চুমো খায়। এতে মঞ্জু পূর্বের মতো বাধা দেয় না বরং মনের সকল কামনা, সুখ-স্বপ্ন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'পারলাম না আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে।...এত সুন্দর হলে কেন তুমি?'– আনিসের এমন কথায় মঞ্জুর মনের জমানো দুঃখ-বেদনা নিমেষে উবে যায়। তাই মঞ্জুর মনে হয়–

> 'এরই নাম কি ভালোবাসা! এমনি ভরে থাকা, এমনি নিজের মনের ভেতরে বিভোর হয়ে যাওয়া। এমনি একাকী সুখী হওয়া। এই কি চায় না মানুষ সমস্ত জীবন ধরে।'-[পি.আ./পৃ.৭৬]

এমন মানসিক অবস্থার কারণেই মঞ্জু কয়েকদিন পূর্বে যে-চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে যেতে চেয়েছিল, বর্তমানে প্রেমের জন্য এ বাড়ি ছাড়ার কথা মনে হতেই তার ভেতরে কান্না বেজে ওঠে। তাই জন্ম অবধি কান্না করে যাওয়া মঞ্জু সামনের সারাজীবন সুখী হতে, সুন্দর হতে ও পবিত্র হতে পণ করে। এসময় দুদিনের জন্য আনিস রংপুর চলে গেলে সালেহা বেগম দেবর আকরামকে নিয়ে ব্যভিচারে মত্ত হয়। মধ্যরাতে চৌধুরীর কাছে তা ধরা পড়লে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে হাঁক-ডাক দিয়ে বাড়িসুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলেন। 'যা তো বন্দুকটা নিয়ে আয়'– বলে তিনি লাথি দিয়ে দরজা ভাঙেন। আর সালেহার পেছনে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকা আকরামকে দেখতে পান । এমন আপত্তিকর দৃশ্য দেখে মঞ্জু ফুঁসে ওঠে বাবাকে বলে–

> 'মারুন ওটাকে। মেরে ফেলুন।'-[পি.আ./পৃ.৮১]

স্বামী ও মেয়ের এমন মারমুখী মূর্তি দেখে সালেহা ঘাবড়ে যায়। তাই আতঙ্কগ্রস্ত আকরামকে বাঁচাতে স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে–'যদি মারতে হয়, আমাকে মারো আগে, তারপর ওর গায়ে হাত দিও।' এমন কথায় চৌধুরী মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে

থাকেন। এ সুযোগে আকরাম পালিয়ে গেলে রাগে-ঘৃণায় সালেহার উদ্দেশ্যে চৌধুরী বলেন–'তুমি পশুরও অধম সালেহা, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তোমার মুখ দেখিও না আমার কাছে।' চৌধুরী সাহেব সেই রাতে বাড়ি ত্যাগ করেন এবং দোকানে অবস্থান নেন। এ ঘটনায় মঞ্জুর দেহ ঘিনঘিন করে ওঠে এবং ঘৃণায় বমির উপক্রম হয়। সে এ ঘটনা কাউকে বলতেও পারে না। অথচ সালেহা বেগম স্বাভাবিক নিয়মে চলা ফেরা করে। যা মঞ্জুর কাছে অস্বাভাবিক লাগে। মা যে-তার ওপর চটে আছে– মঞ্জু তা টের পায়। অথচ কয়েকদিন ধরে স্বামী চৌধুরী যে-বাড়ি আসেন না– সে বিষয়ে সালেহার কোনো খেয়াল নেই। তাই মঞ্জু নিজে রান্না করে দোকান কর্মচারী আবুলের মাধ্যমে খাবার পাঠায় আর তাকে বলে– 'বলবি মঞ্জু পাঠিয়েছে। বলবি, মঞ্জুই রান্না করেছে।' এমন পরিস্থিতিতে মঞ্জু দাদুর কাছে– 'এখানে থাকতে পারছি না, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও' বলে চিঠি পাঠায়। কারণ 'যে-বাড়িতে ছোট আপা নেই, আনিস নেই, বাবা নেই, আর মা থেকেও নেই'–সে- বাড়িতে মঞ্জু হাঁপিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ব্যভিচারী মায়ের শরীরের বিচিত্র ও ভয়ংকর উল্লাসের কথা মনে পড়ায় যন্ত্রণা বহুগুণে বেড়ে যায়। আবার অন্যায়কে বাধা দেবার, নিজের সুখকে অনুভব করার ও স্বপ্নকে সফল করার যে-শক্তি ও শক্তপোক্ত মাটির প্রয়োজন তা মঞ্জুর নেই। এ জীবনের স্বরূপ বর্ণনা করতে মঞ্জু বলে–

> দাঁড়াব কোথায়? আমার পায়ের নিচের জমিই যে টলোমলো। আমি কার আশ্রয়ে থাকব এখানে? বাবা নেই, আনিস নেই, মা নিজেই থাকবার অধিকার হারিয়েছে। এখন কোন আশ্রয়ের নিচে আমি মাথা গুঁজব?'-[পি.আ./পৃ.৮৫]

এভাবে মঞ্জু তার জীবনের অনিকেত, অসহায়, অভিভাবকহীন আর অস্তিত্বসংকটের চরম অবস্থানটি অনুধাবনে সক্ষম হয়। এসময় আসা দাদুর মৃত্যুসংবাদটি তাকে আরো গভীর শূন্যতায় নিক্ষেপ করে। স্মৃতিসূত্রে মনে পড়ে বাড়ির বড় নাতিন হিসেবে সবার আদর, দাদুর সঙ্গে পাবনা-ঢাকা-কলকাতা বেড়ানো, চুড়ি কেনার টাকা এবং 'তোর জন্য ভালো বর জুটিয়েছি'– বলে ঠাট্টা-রসিকতার বিষয়-আশয়। চৌধুরী সাহেব বাড়ি এসে মঞ্জুকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেন। অথচ আপন মা সালেহাকে মঞ্জু কাছে পায় না। কিছুদিন পরেই মঞ্জুর জোতদার ও ব্যবসায়ী চাচা চিঠি পাঠান এবং মঞ্জু যে-খানবাড়ির কেউ নয় আর তার কোনো দায়িত্বও তিনি নেবেন না– এমন কথা জানিয়ে দেন। ফলে মঞ্জুর নামে তার দাদু যে-জমি লিখে দিয়েছিল, তাও হাত ছাড়া হবার উপক্রম হয়। কারণ এ সম্পদ উদ্ধার ও দখলে নিতে যে-মামলা ও পয়সার দরকার তাও মঞ্জুর নেই। ফলে দাদু মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে মোহনপুরের খানবাড়ির সঙ্গে মঞ্জুর সকল সম্পর্কের স্থায়ীভাবে অবসান ঘটে। এ অবস্থায় মঞ্জু নিজের সম্পর্কে বলে–

> 'এখন আমি শূন্য। মা আমার নয়। বাবার দিক থেকে কোনো সম্পর্ক থাকল না। আমার এখন দাঁড়াবার জায়গা নেই। অথচ সব তো ছিল আমার।'-[পি.আ./পৃ.৯০]

এপর্যায়ে মঞ্জু বেনুকে আর ভয় পায় না। তারপরেও বেনু এবং আকরামের কথা স্মরণে হলেই তার অস্বস্তি লাগে। এ দুজনকে চৌধুরী বাড়ির পতনোন্মুখ আবর্তের তলার 'দুটো মৃত প্রেতাত্মা'–বলে মনে হয়। লোভের ক্রীতদাস এ বেনু ও আকরামের হাত ধরেই মঞ্জুর মা সালেহার পতন-পচন শুরু হয়। নিজের মায়ের সম্পর্কে মঞ্জু বলে–

> 'মা-র লোভ ছিল রক্তে-মাংসে। লোভের পৃথিবীতে বিকট উল্লাস রয়েছে। মা জীবনে পেতে চেয়েছিল সেই উল্লাস। আর আজীবন সেই উল্লাসের ক্রীতদাসী হয়েছে মা। নিজের জীবন দিয়ে কিনেছে এমনি একটি শিকল। এখন উল্লাসের সেই অভ্যাস তাকে টেনে নামিয়েছে ঘৃণা আর লোভের তরঙ্গিত সমুদ্রে। যেখান থেকে মা আর কোনোদিন উঠতে পারবে না।'-[পি.আ./পৃ.৯২]

মঞ্জু বেড়াতে আসা বান্ধবী রঞ্জু ও তাজিনার মুখে জানতে পারে, কালের প্রভাবে এ ব্যভিচারের পাপ-পঙ্কে তার মা সালেহা বেগমই শুধু একা নিমজ্জিত নয় বরং আশে-পাশের আরো অনেকেই পতিত হয়েছে। এ তালিকায় কেরানির মেয়ে জোহরা, হাস্না এবং জাহানারা যেমন পড়ে; তেমনি ধনী ঘরের তাজিনা ও রঞ্জুরাও পড়ে। এ শুধু বয়সের দোষ বা কৌতূহল নয়, বরং যুগধর্মের সংক্রমিত বিকার-বিকৃতিও বটে। অথচ এসব পাপের পরশ থেকে মঞ্জু নিজেকে আশ্চর্যভাবে পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়। দুই সপ্তাহ যাবত চৌধুরীর ঘর-বাড়ি ছেড়ে দোকানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তার বন্ধু-বান্ধবদের নজরে পড়ে। যা নিয়ে মঞ্জুর অস্বস্তি লাগে। আকরাম আর বেনু বাড়িতে আসলেও আগের মতো আর হৈহুল্লর করে না। অথচ তাদের চোখের দৃষ্টিতে আরণ্যক বুনো হিংস্রতা আর উল্লাস ঠিকই মঞ্জু দেখতে পায়। মঞ্জুর মনের এমন অসংলগ্ন ও এলোমেলো অবস্থায় এক সন্ধ্যাবেলা আনিস ফিরে আসে। তখন বেদনায় পাণ্ডুর আনিসের বুকে মঞ্জু নিজেকে সঁপে দেয়। তার একান্ত ইচ্ছা আনিস সংসারের দায়িত্বপালনে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াক, বাবা বাড়িতে ফিরে আসুক, রাহুল ম্যাট্রিক পরীক্ষার

প্রস্তুতি নিক আর তার মা সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হোক। কারণ দুঃখ-যন্ত্রণা-ঘৃণার মাঝেও জীবন তাকে শান্তি আর স্নিগ্ধতা দেখিয়েছে। ফলে মঞ্জু নিজের কর্তব্য প্রসঙ্গে বলে-

> 'মনকে সাজাতে বসলাম আমার সব কাজ আর বিশ্রামের প্রহরে। যে অপরিসীম শূন্যতা আমার বুকের ভেতরটা ছেয়ে রয়েছে, সেই শূন্যতা আমি ভরে তুলতে চাইলাম। বারবার বললাম, আমি সুন্দর হব, শুভ্র হব। আমাকে বাঁচতে হবে।... বাঁচব আনিসের জন্যে, আমার জীবনের জন্যে।'-[পি.আ./পৃ.১০১-১০২]

কিন্তু মঞ্জুর এ শুভবোধ ও সদিচ্ছা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। দুই সপ্তাহ পর চৌধুরী বাড়ি এলে মঞ্জুই লেবুর শরবত করে খাওয়ায়। চৌধুরী ইচ্ছে করেই স্ত্রীকে কটাক্ষ করতে বলেন– 'তোর মা কেমন আছে মঞ্জু?' বাবার এমন সম্ভাষণ ও স্ত্রীর প্রতি অবিচল ঘৃণার ভাব দেখে মঞ্জুর মন আর্তনাদ করে ওঠে। সে মনে প্রাণে চাইছিল বাবা ও মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর একটি বিহিত করতে আর ভেতরের কষ্ট-যন্ত্রণার কথা খুলে বলতে। কারণ –'এভাবে কেউ বাঁচতে পারে না।' কিন্তু মঞ্জু মনের সংকোচের কারণে তা বলতে পারে না। চৌধুরী তা ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যান। নিরুপায় সালেহা মেয়ের উদ্দেশ্য বলে– 'তোর বাবা লোকটা ভীষণ জেদি মঞ্জু, সত্যি সত্যি বোধ হয় এ বাড়িতে আর আসবে না।' মায়ের মুখের এমন কথা শুনে মঞ্জুর ভুল ভাঙে। আর মা সম্পর্কে বলে–

> 'বাবা যেন মা'র কেউ না, বাইরের লোক।...মা সব করতে পারে। আর সে কথা মনে হতেই ঘেন্নায় আমার গা রি রি করে উঠল।'-[পি.আ./পৃ.১০৩]

অথচ স্বামীর প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন না করে এবং স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগীদার না হয়ে শুধু টাকা আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মায়ের নীচ প্রবৃত্তি দেখে মঞ্জু ভেঙে পড়ে। তাই মায়ের সঙ্গে কথা না বলে নিজের কক্ষে ঢুকে। নিজের জীবনপরিসর সম্পর্কে মঞ্জু বলে–

> 'এই তো আমার জগৎ, চারপাশে সীমানা দিয়ে ঘেরা। বাইরে বেরোলেই চারটে প্রাচীর আর ঘরে ঢুকলেই চারটে দেওয়াল। বাইরে কিছুই দেখতে পাই না।'-[পি./আ./পৃ.১০৪]

এভাবে ক্রমশই মঞ্জুর স্বপ্নের ফুল শুকিয়ে ওঠে, স্বাভাবিক জীবনজগৎ সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে আবার তীব্র আঘাত আসে চৌধুরী সাহেবের ব্রেইন স্ট্রোকের ঘটনা। দাদুর মৃত্যুর চেয়েও বাবার এ দশা মঞ্জুকে ভীষণ আঘাত করে। ডাক্তার জ্ঞান ফেরার পূর্বের আটচল্লিশ ঘণ্টা খুব সাবধানে সবাইকে থাকতে বলেন। আর রোগী যাতে কোনো অবস্থাতেই উত্তেজিত না হন– এসব খেয়াল করতে বলেন। অথচ সালেহা ভবিষ্যৎ চিন্তায়–'আমি এখন কী করব, কী হবে আমার' বলে মরাকান্না শুরু করে। মঞ্জু ধমক দিলেও সে প্রতিবাদ করে বলে– 'কেন এ ঘরে থাকবার অধিকার কি নেই আমার? তুই কি সব নাকি?' তার এমন জেদের কারণেই ভোরের দিকে জ্ঞান ফেরা চৌধুরী মুখোমুখি সালেহাকে দেখতে পেয়েই উত্তেজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ডাক্তার সব শুনে শুধু মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করেন– 'তোমার মা'র সঙ্গে কি তোমার বাবার সম্পর্ক ভালো ছিল না?' মন না চাইলেও এ মুহূর্তে মঞ্জু তীব্র রাগে-ক্ষোভে সত্য প্রকাশ করতেই বলে–

> 'বাবা মরেনি, বাবাকে হত্যা করা হয়েছে।...বাবা মাকে ঘৃণা করতেন।'-[পি.আ./পৃ.১০৮]

রংপুর সরকারি কলেজে চাকরিরত আনিসকে টেলিগ্রাম করে আনা হয়। বাড়িতে ঢুকেই সৎমা সালেহা বেগমের মরা কান্নার আর্তনাদ দেখে সে ধমক দিয়ে ওঠে। বাবাকে কবরস্থ করেই পরের দিন আনিস কর্মস্থলে ফিরে যায়। আনিসের এ দায়িত্বজ্ঞানহীন মানসিকতা দেখে মঞ্জু পীড়িত হয়। কারণ চৌধুরীর অবর্তমানে বাড়ির লোকদের বেঁচে থাকাটাই সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া মায়ের পুনরায় গর্ভবতী হবার কথা শুনেও মঞ্জুর দুঃখের মাঝে হাসি পায়। তার মনে হয় সংসারে মানুষের– 'কী নিষ্ঠুর মৃত্যু। আর কী কুৎসিত জন্ম!' মঞ্জু আরো অবাক হয় মায়ের আকারাম আর বেনুর মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে দোকানের চাবি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর পোস্ট অফিসের বই কব্জায় আনার তৎপরতা দেখে। এসব দেখে মঞ্জুর কেবলি মনে উদয় হয়–

> 'এবার হুড়মুড় করে মস্ত দালানটা ভেঙে পড়বে। যেকোনো মুহূর্তেই পড়ে যাবে। কোনো প্রেতাত্মা যেন একটার পর একটা পাথর চাপা দিচ্ছে বাড়িটার ওপর।'-[পি.আ./পৃ.১১০]

এমন অবস্থায় মঞ্জুর সুন্দর ও শুভ্রভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমশ ভাটা পড়ে। 'মঞ্জু, এখন? এখন কী করবি তুই?'– মনের এ প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দিতে পারে না। ব্যাংকের ও ইনসিওরেন্সের টাকা পেয়ে বাড়িতে যেমন নতুন করে কাজের ঝি ও ছেলে রাখা হয়, তেমনি আকরাম আর বেনু দোকান খুলে লুটপাটে তৎপর হয়। মা সালেহাকে মঞ্জুর কাছে আরো

প্রাণোচ্ছল মনে হয়। কারণ–‘আকরাম কোনো কোনো দিন রাতে দোকান থেকে এ বাড়িতে আসে। সকালে চলে যায়।’ এ ঘটনাটি সালেহা বেগমের তীব্র ব্যভিচারী জীবনের ইঙ্গিতবাহী। বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে পরিবর্তন আসে, অথচ নিজের মায়ের কোনো পরিবর্তন-পরিশোধন না দেখে মঞ্জু অবাক হয়। এসময় আনিসে পাঠানো একটি চিঠি মঞ্জুর জীবনবেদ আর ভাবনাকে বদলে দেয়। কারণ দুঃখ-গ্লানি-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আনিসের প্রত্যাশাসমেত লিপিমালা মঞ্জুকে আলোড়িত করে। ‘কী ভাবছ জানতে দিও’– আনিসের এমন মন্তব্যও মঞ্জুর মনে রেখাপাত করে। এসময় লেবানন থেকে ছোট আপা ফরিদার পাঠানো চিঠি পেয়ে মঞ্জু নারী জীবনের আরেক নগ্ন বাস্তবতার স্বরূপ জানতে পারে। কারণ উচ্চাভিলাষী ফরিদাকে জীবনের স্বপ্নপূরণে চড়া মূল্য দিতে হয়। যাতে করে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিত্ব, সতীত্ব ও জীবনার্থের সব মূল্যই ধুলিসাৎ হয়ে যায়। জীবনের এ চরম বিপর্যয়ের বর্ণনা দিতে মঞ্জুকে ফরিদা লিখেছে–

> ‘বিদেশে আসার জন্যে স্বাস্থ্য আর যৌবন থাকলে মেয়েদের যা যা করতে হয়– আমাকেও তা করতে হয়েছে।...এও নিজেকে হত্যা করা।...যে আমাকে নিয়ে পুতুল পুতুল খেলেছে– সেই আমাকে এখন ঘরের স্বপ্ন দেখায়। মঞ্জুরে, সেইখানে যে আমার সবচাইতে বড় অপমান। আমার মতো ভুল তুই করিস না। জীবনকে সুন্দর করে তুলিস, যে-কোনো মূল্যেই হোক।’-[পি.আ./পৃ.১১৭-১১৮]

ফরিদার নারী জীবনের এমন অপমান আর অধপতন জেনে মঞ্জু তার চারপাশের বৈরী পরিসর সম্পর্কে আরো সতর্ক হয়। ইট ব্যবসায়ের নামে আকরাম সালেহার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করে। যা নিয়ে সালেহার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অন্যদিকে দোকান চালাতে গিয়ে বেনুর সঙ্গেও আকরামের দ্বন্দ্ব বাড়ে। এমনি গোলযোগের এক নির্জন দুপুরে আকরাম ঘুমন্ত মঞ্জুকে বলাৎকার করার চেষ্টা করে। মঞ্জুর প্রাণপণ বাধা আর চিৎকারে বেনু কয়লা ভাঙার লোহা দিয়ে আকরামের মাথায় আঘাত করায় মঞ্জু রক্ষা পায়। এমন পাশবিক ঘটনার মাধ্যমে আকরাম চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে যায়। এপর্যায়ে এসে সালেহারও সর্বগ্রাসী ক্ষুধা শান্ত হয় এবং লম্পট আকরামকে চিনতে পারে। কিন্তু ততদিনে চৌধুরী বাড়ির সর্বনাশ যা করার তা সে ঠিকই করে যায়। বাড়ির পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে মঞ্জু বলে–

> ‘কতগুলো টাকা আর দোকানটা শেষ করে ও (আকরাম) চলে গেল।...মা আজকাল কেবল কাঁদে। টাকা-পয়সার বড়ো অভাব। বেনু কোনোদিন টাকা দিয়ে যায়– কোনোদিন দেয় না। একেক দিন উনুনে হাঁড়ি চড়ে না।’-[পি.আ./পৃ.১২১]

চরম আর্থিক সংকট, অনিশ্চয়তা ও অভাবে জড়িয়ে সালেহার হুঁশ হলেও করার কিছুই থাকে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পুতুল ও মম কান্নাকাটি করলে গহনা বিক্রি করে কিছুদিন চলে। তারপর আবার শুরু হয় কান্না। তাছাড়া গর্ভবতী সালেহাও অযত্ন ও অপুষ্টির শিকার হয়ে শুকিয়ে বিশ্রী চেহারার হয়ে ওঠে। অথচ তার টাকাতেই আকরামের চেহারার জৌলুস আর পোশাকের ঔজ্জ্বল্য পাল্লা দিয়ে বাড়ে। সব দেখে মঞ্জুর মনে হয়– ‘জটিল, বড়ো জটিল এই জীবন আর মানুষের মনের এই ভেতরটা।’ তাই এক সময়কার জীবনের উল্লাসে পরিপূর্ণ সালেহাকে এখন প্রতিরাতেই মঞ্জু আর্তনাদ করতে শুনে। এসময় আনিস রাহুলের হাত দিয়ে কিছু টাকা পাঠালেও তা সালেহা বেগমের ওষুধ-পত্র কিনতেই শেষ হয়ে যায়। তাই মম ও পুতুলের দুধ আর কেনা হয় না। এর জন্য বেনুকে বললেও সে মঞ্জুর ওপর প্রতিহিংসাবশত আনিসকে জড়িয়ে বলে– ‘তোমার ছেলে রয়েছে তো! যার সঙ্গে তোমার মেয়ে পিরিতি জমিয়েছে।’ এসব কথা শুনে মা ও মেয়েকে মুখ বুঝে সব সহ্য করতে হয়। এসময় মঞ্জুর ছোটখালার ভাসুর ও তাজিনার বাবা আহমদ সাহেব তেলের পাম্প বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে চৌধুরী বাড়ি আসেন। তার সঙ্গে তেল কোম্পানির চাকুরে লম্পট কাসেম খানের আগমন ঘটে। মঞ্জুকে দেখে তিনিও লালসায় মত্ত হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গে যোগ দেয় বেনু, তাজিনা, দুলু ভাবী আর তার স্বামী মতিন। পারিবারিক পিকনিকের নাটক সাজিয়ে এরা মঞ্জুকে সঙ্গে নেয় আর কৌশলে কাসেম খানের সঙ্গে বসায়। আর উচ্ছৃঙ্খল প্রোষিতভর্তৃকা তাজিনা বসে বেনুর সঙ্গে এবং মতিন গাড়ি ড্রাইভ করে। মতিন পূর্ব পরিকল্পনা মতো গ্রামের পথে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালালে এর ঝাঁকুনিতে বুনো উল্লাসে কাসেম খান মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে, বুকে চাপ দেয় আর চুমো খায়। অপমানে, লজ্জায় আর আক্রোশে মঞ্জু নিজেকে ছাড়াতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। অবশেষে কাসেম খানের ডান হাত কামড়ে দেয় এবং চিৎকার করে বলে–

> ‘গাড়ি থামাও, নইলে লাফিয়ে পড়ব গাড়ি থেকে।...আপনি আমার বাপের বয়সী, যদি জানতাম আপনি এরকম লোক, তাহলে আমি কখনো আসতাম না।’-[পি.আ./পৃ.১৩৮]

জবাবে নারীখেকো বাঘ কাসেম খান নির্লজ্জের মতো বলেন–‘আরে বাপু তোমার বয়সী হলে এত পয়সা খরচ করতাম নাকি? বাপের বয়সী বলেই তো এত পয়সা খরচ করেছি।’ কাসেম খানের এ কথাতেই মঞ্জু তাজিনা, দুলুভাবী আর বেনুর ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পারে। তাই গাড়িতে আর উচ্চবাচ্য না করে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য সতর্ক হয়। নির্জন নদীর তীরবর্তী

বনের ডাকবাংলোর কাছে গাড়ি থামা মাত্রই তাজিনা-বেনু ও দুলুভাবী-মতিনরা পূর্বপরিকল্পনা মতো দূরে সরে যায়। কাসেম খান মঞ্জুকে জোর করে ডাকবাংলাতে নিতে গেলেও মঞ্জু-না', না, আমি যাবো না' বলে প্রতিবাদ করে। কিন্তু চতুর কাসেম খানের–'আনিসকে জানিয়ে দিতে কতক্ষণ? আর একবার আনিস জানতে পারলে তোমার এই অহংকারটা কোথায় থাকবে?' এমন মানসিক আঘাতে মঞ্জু ভেঙে পড়ে। এ সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে লম্পট-দুরাত্মা কাসেম খান নিষ্পাপ-নিরপরাধ-অসহায় মঞ্জুকে বলাৎকার করে মত্ততার আগুন নেভায় এবং তার কুমারীত্ব হরণ করে। এ পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে মঞ্জু জানায়–

> 'চোখের সম্মুখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ হলদে অন্ধকার দেখেছি।...ঘর্মাক্ত পাশব আর হিংস্র নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ এবং তীব্র যন্ত্রণার ছুঁড়ি দিয়ে কেউ যেন আমার অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে আমাকে আলাদা করে ফেলছে। আমি শেষবারের মতো চিৎকার করে মরে গেলাম।...বেঁচে থাকল শুধু শরীরটা।'-[পি.আ./পৃ.১৪৪]

এমন পাশবিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মঞ্জুর আত্মিক মৃত্যু ঘটে। কেবল বেঁচে থাকে তার শরীর নামক কঙ্কাল। সে এ ঘটনার কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না; কাউকে বলতে পারে না, বাড়ি থেকে বের হতে পারে না, কারো সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না, ভোরের হাওয়া বুক ভরে নিতে পারে না এবং মন ভরে হাসতেও পারে না। এমন অস্বস্তি ও যন্ত্রণাময় জীবনে উপনীত হয়ে মঞ্জু একেকদিন খালি ঘরে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। তাই দুঃখভরে মঞ্জু বলে–'হারালাম আমি। আমার সবকিছু হারালাম। আমার সাহস, আমার সাধ, আমার অধিকার–সবকিছু নিঃশেষে হারালাম।' জীবনের এমন বিপর্যয়, ব্যথা ও বেদনায় জর্জর হয়ে নিজের নির্লক্ষ্য ও নরকময় হয়ে ওঠা জীবন সম্পর্কে মঞ্জু জানায়–

> 'আমি যে কোনোমতে ভুলতে পারি না, আমি শুভ্র ছিলাম, পবিত্র ছিলাম। জীবনকে ভালোবেসে আমি সুন্দর, শুভ্র আর পবিত্র করতে চেয়েছিলাম। আমি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিলাম সেই পবিত্র শুভ্রতার মধ্যে। জন্মজন্ম ধরে এমনিভাবে বাঁচবার বড়ো সাধ ছিল আমার। জীবনের কাছে আমি কিছুই চাইনি, শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কেউ আমায় বাঁচতে দিল না।'-[পি.আ./পৃ.১৪৬]

মঞ্জুর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পাশবিকতা, রক্তচক্ষু আর সর্বগ্রাসী মানসিকতার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে; তেমনি আরেকদিকে সুন্দর-শুভ্রভাবে বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষাও উন্মোচিত হয়েছে। অথচ উঠতি নাগরিক জীবনের পাপ-পঙ্ক, কীটরূপী নরপশুদের নখরাঘাত, নিকট-আত্মীয়দের আসঙ্গলিপ্সা,আপন মায়ের বিরুদ্ধাচরণ ও বৈরী সমাজের বিষবাষ্পীয় পরিমণ্ডলে মঞ্জুর জীবনস্বপ্ন ধীরে ধীরে পিঙ্গল-পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। যার অনিবার্য পরিণামে মঞ্জুকে নিরুদ্দেশ হতে হয়। একেও এক ধরনের মৃত্যুর শামিল-ই বলা যায়। যে-জীবন ছিল মঞ্জুর সবচেয়ে ঈপ্সিত, সে-জীবনপরিসর থেকে তাকে শেষপর্যন্ত পালাতে হয়।

মঞ্জুর জীবনদীপ্ত বাসনার মধ্যেই কিংবা তার সুস্থ-সুন্দর জীবনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিপুল সংগ্রামশীলতার মধ্যেই লেখক এ উপন্যাসের মানবিক বোধের স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। মঞ্জুর প্রথম সংগ্রাম নিজের উন্মূল নিঃস্ব জীবনের সঙ্গে। যেখানে তার আপন মা ও খালাতো ভাই বেনু তার শত্রুসম । মঞ্জুর দ্বিতীয় সংগ্রাম তার দেহমনের সুরুচি ও পবিত্রতা রক্ষায়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও বাবা-মায়ের বৈবাহিক সূত্র থাকায় সমাজশাসন ও সংস্কারকে ডিঙিয়ে বৈমাত্রেয় আনিসের সঙ্গে মঞ্জুর পবিত্র প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা– যা তার উদার ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়। মঞ্জুর তৃতীয় সংগ্রাম পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেও প্রেমের সম্মোহনী শুভশক্তির বলে লম্পট আকরামের বলাৎকারের মুখোমুখি হয়েও হার না মেনে প্রতিবাদ করা। মঞ্জুর চতুর্থ সংগ্রাম পিতার অবর্তমানে সংসারের হাল ধরা এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাসেমের দ্বারা ধর্ষিতা হলেও অব্যাহত সুন্দর-শুভ্র জীবনাকাঙ্ক্ষা নিয়েই নিরুদ্দেশ গমন– যা তার অন্তর্গত অপরাহত শক্তিরই পরিচয়।[৩] শেষপর্যন্ত নরকময় সংসার-বন্ধন থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেও মঞ্জুর জীবনের সংগ্রামশীলতাই উন্মোচিত হয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের *স্ত্রীর পত্র*-এর মৃণাল, *পয়লা নম্বর*-এর অচলা আর *বোষ্টমী*-র আনন্দীর মধ্যেও এমন প্রবণতা দেখা যায়।

এ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের দিক হলো, লেখক এখানে নারীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে নারীর চিন্তার ভুলগুলো, তার অভিজ্ঞতার অপরিপক্ব প্রান্তগুলো, তার অনভিজ্ঞ অপ্রামাণ্য বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলো উন্মোচন করেছেন। নারীর জীবন-দুর্ভোগের পেছনে শুধু পুরুষের পাশবিকতাই যে-দায়ী নয়, নারীর অসংযত লোভ-লালসাও এক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে কার্যকর। যা মঞ্জুর মা, দুলুভাবী সমবয়সী ও সহপাঠী রঞ্জু, নাসিমা, তাজিনা, মীনা, জোহরা, হাস্না, শেলী ও জাহানারা-র মতো

নারীচরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'জীবনোপভোগের দার্শনিক মনোভঙ্গি যে-মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তাও লেখক এ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত করেছেন। সমগ্র উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে লেখক মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে প্রবাহিত শুভ-অশুভ, সুন্দর-অসুন্দর, মানবিকতা-পাশবিকতার দ্বন্দ্বকেই চিত্রিত করেছেন। মঞ্জু-আনিসের প্রণয়সম্পর্কের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুটিত হয়েছে সুন্দর ও সুরুচির মানবীয় আখ্যান। মঞ্জুর জীবনব্যাপী সত্য ও সুন্দরের সাধনাই বৃদ্ধি করেছে এ উপন্যাসের ঔজ্জ্বল্য।[৪] প্রথম উপন্যাসে যুবা বয়সের শওকত বয়সপ্রভাবী রোম্যান্টিক ভাববিলাসের পরিবর্তে উপস্থাপন করেছেন এক পাপ-পঙ্কময়, যন্ত্রণাজর্জর লাঞ্ছিত জীবনের চিত্র; যে জীবন-পঙ্কের মধ্যেই ফুটে থাকে এক মানবীর জীবনপদ্ম। শত লাঞ্ছনায়ও যার সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে না– এমন আখ্যান সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত থাকে শওকত আলীর প্রাতিস্বিক প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় ।

ভ্লাদিমির নবোকভের *ললিতা* উপন্যাসের নায়ক হামবার্ট যেমন তার সৎমেয়ের কুমারীত্ব হরণের অভিসন্ধি ও ক্রমাগত কিশোরীদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের উন্মাদনা এবং পরিণামে সহসা এক ধ্বংসাত্মক প্রতিশোধ–আকাঙ্ক্ষায় নিমজ্জিত হয়েছে, তেমনি *পিঙ্গল আকাশ*-এ মঞ্জুও প্রতিনিয়ত অনভিপ্রেত যৌনপীড়নের আতঙ্কে এবং পরিশেষে আত্মবিনাশী কামাসক্তির শিকার হয়। তবে এক্ষেত্রে সে সৎবাবা বা ভাইদের দ্বারা নয় বরং খালাতো ভাই বেনু ও চাচা আকরামের নখরাতে বিদ্ধ হলেও পিতৃবয়সী কাসেম খানের লালসার শিকার হয়। এক্ষেত্রে মঞ্জু সৎবাবার কাছ থেকে স্নেহ-ভালোবাসা পেলেও আপন মায়ের কাছ থেকেই সে প্রতারিত হয়েছে। এ মা-ই তার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। যা এক নির্মম কূটাভাসও (paradox) বটে।

পিঙ্গল আকাশ উপন্যাসের এই আপাত সরল কাহিনিপুঞ্জে ব্যক্তি-মানুষের জীবন ও সমাজবাস্তবতার অন্তর্তলবর্তী স্রোতে সদ্য ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তি ও তৎপরবর্তী সাম্প্রদায়িক চৈতন্যের উত্থান-পতনের অষ্টাচক্র ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত এবং পরিণামে দীর্ঘ সামরিক শাসন-শোষণে পিষ্ট সমাজ ও মানুষের বিনষ্ট মূল্যবোধের রূপালেখ্য উপলব্ধি করা যায়। যা উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক সফোক্লিসের নাটক *ইদিপাস*-এর রাজা ইদিপাসের চরিত্রের মাধ্যমেই কৌশলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিয়তির অনিবার্য অভিশাপ ও কৃতকর্মের পাপে থিবির রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রিক্ত-নিঃস্ব রাজা ইদিপাসের সিথারেয়ন পর্বত নামক মৃত্যুপুরীর দিকে যাত্রার মতোই এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরাও কালের ব্যবধানে নির্মম এক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক বাস্তবতার ঘূর্ণিতে যন্ত্রণাময় পথের অভিযাত্রী ও মৃত্যুশীল। এখানে চৌধুরী সাহেব, সালেহা, বেনু, আকরাম, তাজিনা, কাসেম খান, রাহুল, ফরিদা, মঞ্জু ও আনিস– এরা সকলেই সেই ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নিষ্ঠুর নিয়তি বহন করে চলেছে রক্তের মধ্যে।[৫] বিরুদ্ধ সময়ের বিনষ্টি, ব্যক্তি মানুষের ক্রমাগত পতন-পচন ও বিপন্ন মানবসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বয়ং শওকতের ভাষ্য–

> '৪৭ সালের পর গত ৪টি দশক জুড়ে আমাদের অস্থির এবং খুব টানটান সময়ের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। জীবনের বাইরের দিকে যেমন, তেমনি ভিতরের দিকেও এত ভাঙচুর ও দ্রুত ভালোমন্দ পরিবর্তন ঘটেছে যে...আমাদের লেখকদের ওপর জীবনবাস্তবতার চাপ খুব বেশি।...বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জীবন বেশি, বানানো গল্প কম।'[৬]

সমকাল প্রভাবে মঞ্জু চরিত্রের ওপর নারীবাদী সংবেদনার কিঞ্চিৎ ছাপ পড়েছে। তার মাঝেও আধুনিক শিক্ষা বিশেষত লুকিয়ে লুকিয়ে ইংরেজি বই পড়ার আগ্রহ ও স্বশিক্ষিত হবার প্রবণতা দেয়া যায়। আবার রক্তের সম্পর্ক না হলেও ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে প্রণয়কে প্রশ্রয় দেয়ার মধ্যেও প্রথাভাঙার সাহস লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে মঞ্জুর বাড়ি ছেড়ে পলায়ন তার কুমারীত্ব হারিয়ে কলঙ্ক বা গর্ভধারণের অপকর্ম আড়াল করা নয় বরং তা ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই এ সম্পর্কে সে নিজেই বলেছে– 'না, মানুষের দেহ কুলষিত হতে পারে– এমন গোঁড়ামি আমার নেই।' তারপরেও জীবনবোধ ও দুঃসাহসের দিক থেকে মঞ্জুর চেয়ে ত্রয়ী *দক্ষিণায়নের দিন*-উপন্যাসের রাখী অনেক বেশি প্রাগ্রসর। কারণ সে বিবাহবহির্ভূত প্রেমিক সেজানের সন্তান পেটে ধারণ করে এবং প্রেমিকের নামেই নামকরণ করে জন্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকে। আর আনিসও সেজানের মতো সংসারবিবাগী উদ্‌ভ্রান্ত হলেও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সেজানের মতো সাহসী আর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। চাকরি রক্ষা করে এবং সমাজশাসনকে পক্ষে রেখেও সে মঞ্জুকে নিজের কাছে রেখেও তাকে সুরক্ষা দিতে পারতো। তার চরিত্রে কাঙ্ক্ষিত শক্তি, তেজ ও সাহস প্রদর্শনে শৈথিল্য লক্ষ্যণীয়। ফলে নারী-পুরুষের যৌথ সংস্কৃতি ও মানবিক

সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশ অথবা সমাজ নির্মাণের যে-অঙ্গীকারটি পল্লবিত হতে পারতো, *পিঙ্গল আকাশ*-এ তা অনেকটাই দুর্বল ও ক্লিশে।

পিঙ্গল আকাশ বস্তুত নষ্টনীড়ের কথা, মানবীয় অবয়বের ভিতর লুকিয়ে থাকা হিংস্র ও আদিম লিবিডো-দানবের কথা। আপস, প্রীতি ও আবেগের শূন্যময়তা বিকটভাবে উঠে এসেছে এর আখ্যানে। বিরূপ রুক্ষতার মধ্যেও যে-জীবন বেড়ে ওঠে তার আশ্রয় কোথাও নেই। ফলে *পিঙ্গল আকাশ*-এর চরিত্রগুলো পরিণামে নিরাশ্রয়-গৃহী।[৭] শাহুরিক মধ্যবিত্তের নগ্নতা, স্থূলতা, নৈতিকতাবিবর্জিত বিত্তসর্বস্বতা, রুচিবিকার ও হিংস্র কামনার চাপে বিনষ্ট এক মেয়ের দীর্ঘশ্বাস, রক্তক্ষরণ ও হাহাকারের শিল্পরূপ শওকত আলীর *পিঙ্গল আকাশ*। মুৎসুদ্দি পুঁজির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য মানুষের সনাতনী নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রেমধারণাকেও সংশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। মূলত ষাটের দশকের সমরাস্ত্র ও বিত্তের চাপে বিপন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের এই বেদনাকরুণ অন্তরালেখ্যই *পিঙ্গল আকাশ*-এর অন্বিষ্ট। সমগ্র উপন্যাসের পুরাণ-সংকেতসূত্র (key-note) নিহিত রয়েছে। আসলে মানুষ তার নিয়তি নির্ধারিত বিশ্ববিধানের কাছে অত্যন্ত অসহায়। সফোক্লিসের কালে সেই নিয়তির ব্যাখ্যা ছিল এক রূপ। ষাটের দশকের বাংলাদেশেও সেই সমাজ-বিধানের নির্মম বাস্তবতা আরেকটি ট্র্যাজেডির সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এ ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত রয়েছে কলোনিশাসিত শ্রেণিশোষণ, ধর্মশোষণ ও জাতিশোষণ পীড়িত সমাজের সার্বিক অব্যবস্থার মধ্যে। তাই এ উপন্যাসে বিধৃত ট্র্যাজেডি কেবল মঞ্জুর একার নয়, বাংলাদেশের অসংখ্য অস্তিত্বকামী শুভ্রতা ও সুন্দরের প্রত্যাশী নারীরও। এ অবস্থায় বেঁচে থাকার অর্থ পালিয়ে বেড়ানো, নিজের প্রতি নিজের ঘৃণায় অন্ধকারের মধ্যে বসবাস।[৮] বিষয়ের অভিনবত্বে, ভাষার গাম্ভীর্যে ও বক্তব্যের ঋজুতায় শওকত আলী *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসটিতে এক স্বতন্ত্র সুর সৃজনে সক্ষম হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় ল্যাটিন আমেরিকা-আফ্রিকা-ক্যারেবিয়ান লেখক আলেহো কার্পেন্তিয়ার, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, হুয়ান রুলফো, হোর্হে বোর্হেস, সোয়াইঙ্কা, চিনোয়া আচেবে-র মতো শওকত আলীও ঔপনিবেশিক প্রভুদের রেখে যাওয়া আধিপত্যবাদ, অপরতাবোধ, আত্মক্ষয় ও আত্মগ্লানির বিরুদ্ধে নিজস্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের পথ নির্দেশ করেছেন। কারণ নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড় ও শক্তির অনুসন্ধান না করে মানুষের যে-প্রকৃত মুক্তি নেই– লেখক সে-কথাই এ উপন্যাসের মৌল উপজীব্য করেছেন। অবিশ্বাস ও হৃদয়হীনতার নির্দয় পরিবেশে জীবনযাপনরত কিছু মানুষের সর্বাত্মক ক্ষয় ও নিশ্চিহ্ন হবার তীব্র যন্ত্রণা ভাষারূপ পেলেও শেষ পর্যন্ত এক সুন্দর- শুভ্র- সদর্থক সংবিদই শানিত হয়ে উঠেছে। প্রথম উপন্যাসের মাধ্যমেই শওকত আলী জীবনের পিঙ্গল, পাণ্ডুর আর প্রাণহীন পরিসর নয় বরং প্রচণ্ড জীবনতৃষ্ণা উজ্জীবন আর উত্তরণের সংকেত দিয়েছেন।

গন্তব্যে অতঃপর

গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭ খ্রি.) শওকত আলীর এক ব্যতিক্রমী ও বৈভবমণ্ডিত উপন্যাস। যেখানে সময়-সমাজ ও প্রতিবেশের বিদ্যমান বিপর্যয়-বিনষ্টি গুরুত্ব পেলেও ব্যক্তিমানুষের মানবিক সম্পর্কের ভাঙন, আরণ্যক অন্তরভুবন, মনোবিকার ও বিচ্ছিন্নতার সুরই প্রবল হয়ে উঠেছে। চার রাত তিন দিনের ঘটনারতঙ্গের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কেবল ব্যক্তি আলী আকবর বীরুর আত্মকেন্দ্রিক, পলায়নপর, ভোগবাদী ও নীতিবিবর্জিত জীবনের রূপায়ণ করেননি, বরং একই সঙ্গে বিশ শতকের চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর গলদ, গ্লানি, পাপ ও পঙ্কের বিনাশী রূপকেও বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে যুগ-যন্ত্রণা, যুগ-মানস ও যুগ-জিজ্ঞাসার সমান্তরালে ব্যক্তির কাম,পাপ ও পতনের প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রান্তির পথ নির্দেশিত হয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্ব সর্বদাই নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা দ্বারা সংক্রমিত। সমাজে পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য গতিতে উত্থান এবং এর সর্বগ্রাসী প্রভাবের কারণে মধ্যবিত্তের এ সংকট ক্রমশই ভয়ংকর,বিনাশী ও দানবীয় রূপ ধারণ করে। তবে এ বিচ্ছিন্নতা কেবল সমাজের সৃষ্টি নয়, বরং মানবসৃষ্ট-বিচ্ছিন্নতাও সমাজকে প্রভাবিত করে। এ সমাজবিচ্ছিন্ন চরিত্র সর্বযুগের সাহিত্যেই দেখা যায়। গ্রিক সাহিত্যের প্রথম এলিয়েনেটিভ সত্তা হচ্ছে প্রমিথিউস। এছাড়াও টেলেমাকুস, ইলেক্ট্রা, ইদিপাস, এন্টিগনে ও কাসান্ড্রা প্রমুখ চরিত্র গভীরভাবে বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সাহিত্যে জীবন-

সংগ্রাম থেকে সরে এসে একক ধ্যানমগ্নতায় আত্মস্থ হবার ধারাটাই সত্য ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনের চেয়ে অরণ্যে প্রত্যাবর্তনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টধর্মে বিচ্ছিন্নতার আদি উৎসও আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতি। যিশু নিজেও তার যুগের এক সমাজবিচ্ছিন্ন সত্তা ও একক ব্যক্তিত্ব। এমনকি তার আত্মদানও সমাজবিচ্ছিন্নতা উত্তরণের প্রয়াস। আবার হযরত মুহম্মদ, গৌতম বুদ্ধ, কবির, নানক ও শ্রী চৈতন্যদেব– প্রমুখও ছিলেন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। এরা স্রষ্টার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের অভিপ্রায়ে জীবনের দীর্ঘসময় সমাজ ও লোকালয় ছেড়ে জনশূন্য-নির্জনপ্রান্তরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ যোগ-সাজশের চেষ্টা এবং মোল্লা-পুরোহিত-পাদ্রিদের মধ্যস্থতাই মানুষের মাঝে জন্ম দিয়েছে বিচ্ছিন্নতার বীজ।[৯] সেবাশ্রম, মিশন, জনকল্যাণমূলক আশ্রম, এনজিও সংস্থাসমূহ ও তাবলীগী কর্মকাণ্ড– এসবই বিচ্ছিন্নতার ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মধ্যযুগের বিচ্ছিন্ন সত্তা আশ্রয় পেত ধর্মশালায়, গির্জায়, মন্দিরে ও মাজারে। কেউ কেউ সংসার-মায়াশূন্য বেদে, যাযাবর কিংবা জিপসীর ছদ্মবেশ ধারণ করতো। বিচ্ছিন্নতার ফলেই আজকের সামাজিক সম্প্রীতি ও পারিবারিক বাঁধন দ্রুত আলগা হয়ে যাচ্ছে। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধপ্রবণতা, সুরাসক্তি, মাদকাসক্তি, মাস্তানী ও যৌনবিকার। সেই সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে মূল্যবোধ, বিবেক, উপলব্ধি ও বিশ্বাসের জগৎ।

কার্ল মার্কসের মতে, শ্রমিক বিচ্ছিন্ন তার জীবনে আর অ-শ্রমিক বুর্জোয়া বিচ্ছিন্ন তার চিন্তায়। আবার বিশেষ যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পরিবেশও অনেক সময় বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতা, বেকারত্ব, ছাত্র-আন্দোলন, মুদ্রাস্ফীতি, শূন্যতাবোধ, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় বিচ্ছিন্নতা। আমাদের সমাজে বিচ্ছিন্নতার রূপ প্রধানত চার প্রকার। যথা- ১. কর্ম বা কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্নতা ২. উৎপাদনসামগ্রী থেকে বিচ্ছিন্নতা ৩. আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ৪. মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা।[১০] কার্ল মার্কসের মতে, এসব বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে শ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্নতা। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষ শ্রম দেয় অন্যের কারণে, নিজের জন্য নয়। এই অধিকারহীন শ্রম মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় দ্বৈতসত্তার। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের সৃষ্টিই তার শত্রুতে পরিণত হয়। ক্রমশই মানুষ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। আর তখনই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় যন্ত্রণাসহ উপলব্ধি।

আলী আকবর বীরু ঠাকুরগাঁও জেলার পঁচাগড়ের চৌধুরী বাড়ির মেজো ছেলে। সে মেডিকেলে পড়তে চাইলেও বাবা বাবর আলী চৌধুরীর জেদের কারণে বুয়েটে ভর্তি হয়। কিন্তু দুই বছর ফলাফল খারাপ হওয়াতে নিজ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়। আর সাংবাদিকতার চাকরিতে যশ-খ্যাতি অর্জনেও সক্ষম হয়। অথচ তার রাশভারী স্বভাবের বাবা প্রথমে লেখাপড়ার খরচ পাঠানো বন্ধ করে দিলে সে টিউশনি ও জায়গির থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে চৌধুরী মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠালেও পিতা-পুত্রের দূরত্ব আর কমেনি। যার ফলশ্রুতিতে আকবর পিতার প্রতি ঘৃণায়-অভিমানে দশ বছর বাড়ি যায়নি। কিন্তু পিতার স্ট্রোক হবার ঘটনায় ভাই-বোনদেন পাঠানো চিঠি ও টেলিগ্রাম আসায় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুবিনয়ের তাগিদ ও ব্যবস্থাপনায় আকবর ধনুকভাঙা পণ থেকে সরে আসে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায় তিনশো মাইলব্যাপী জনদুর্ভোগ ও বিশ্রী ট্রেন-বাস যাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে মৃত্যু পথযাত্রী বাবার প্রতি অন্তরের টানের চেয়ে তার কাছে যাত্রাপথের কষ্ট ও ক্লান্তিই বড় মনে হয়। এ অবস্থা প্রকাশ করতেই আকবর মনে মনে বলে–

> ‘একেবারেই কোনো মানে হয় না। একজন লোক মরে যাচ্ছে বলে তোমাকে আসতে হবে। যে অবস্থাতে থাকো, যেমন থাকো, আসা চাই তোমার।...লোকটার বয়স হয়েছে, জীবনে দেখেছে অনেক, ভোগ করবার যা কিছু সবই করেছে সাধ্য মতো–এখন তো স্বাভাবিকভাবেই তার মরে যাবার কথা। এর মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হবার কী আছে।’-[*গন্তব্যে অতঃপর;* শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৫ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬/পৃ.১৫৫]

এমন মনোভাবনাই পিতার প্রতি আকবরের মানসিক দূরত্ব, সম্পর্কের শীতলতা ও অভিমানের বিষয়টি উন্মোচনে যথেষ্ট। অথচ এ বাবা সম্পর্কে বন্ধু সুবিনয়ের ‘দারুণ সেন্টিমেন্টাল’ হওয়াকেও তার ভাল লাগে না। কারণ পিতা ও সন্তানের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ও আনুগত্যের মধ্যেও সে একধরনের স্বার্থের হিসেব–নিকেশ দেখতে পায়। তাই সে অকপটে বলে–

> বাবারা ছেলে-মেয়েদের আদর করে নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্তির জন্যে– ওটা জৈবিক ব্যাপার– ওর মধ্যে মহত্ত্ব-ফহত্ত্ব নেই।...সংসারে নিজের আধিপত্য ঠিক থাকল কি না, সে বিষয়ে ভয়ানক টনটনে জ্ঞান তাঁদের।...স্নেহ-মমতা এসব তো জৈবিক

ব্যাপার, জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও আছে–মানুষের মধ্যে থাকবে, এতে আশ্চর্যের বা কী আর মহত্ত্বই বা কোথায়?'-[গ.অ./পৃ.১৫৬১৫৭]

ফলে আকবরের কাছে এমন কষ্টকর যাত্রাকে অযথা-অহেতুক মনে হয়। ভাই-বোনদের চিঠিতে তাকে দ্রুত পৌঁছানোর তাগিদের পেছনে সে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সংক্রান্ত স্বার্থের গন্ধও পায়। আবার বাবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তার চোখে জল আসবে কী না–এসব ভাবনা দ্বারা পীড়িত হয়েও সে অশ্বস্তিতে পড়ে। বাড়ি ফেবার ব্যাপারে তার অনাগ্রহ-অনিচ্ছা থাকলেও আকবর ঠিকই টের পায়– 'আসলে অতি গোপনে, বলা যায়– রক্তের ভেতরে, একটা টান ধরেছে কোথাও, আর সেই টানই তাকে টেনে নিয়ে চলছে।' তাই মানবীয় সম্পর্কের এ চিরন্তন যোগসূত্রকে আকবর কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। এমন মানসিক অবস্থায় বাসের সহযাত্রীদের নানা আলাপচারিতার মধ্যে আকবর ড্রাইভারের মুখে জানতে পারে তার মরণাপন্ন বাবার জন্য ঢাকা থেকে ওষুধ নেবার কথা। আরো জানতে পারে পিতার শিক্ষাবিস্তারে স্থানীয় ভজনপুর স্কুল প্রতিষ্ঠা, গরিব ট্রাকড্রাইভারকে আর্মি অফিসারের প্রহার থেকে উদ্ধার এবং বিপদাপন্ন রহিমার স্বাভাবিক জীবনপথ বাতলে দেবার কথা। অথচ এসব শুনে আকবরের মনে খটকা লাগে । কারণ–'তার বাবা যে এত দানশীল, বিদ্যোৎসাহী এবং দরিদ্রজনের বন্ধু ছিলেন– এমন খবর আদৌ জানা ছিল না।' কেননা শৈশব থেকেই সে বাবাকে একজন রাশভারী, দাপুটে, উগ্রমেজাজী আর প্রচণ্ড জেদি মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছে। তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সহজ সম্পর্ক ছিল না। বরং বরাবরই এক ধরনের সমীহের ভাব ও দূরত্ব বজায় ছিল। তাই বাবা সম্পর্কে আকবরের স্থির সিদ্ধান্ত–

'ছেলেবেলা থেকেই সে জানে, বাবা খুব ভয়ের বস্তু। ছেলেমেয়েদের যে খুব মারধর করতেন, এমন নয়–কিন্তু তবু বাবাকে কেউ ভয় না করে পারেনি। বাবা কিছুটা দূরের–বরাবর যেমন, তেমন এখনও।...ঐ হলেন বাবা–দূরের এবং ভয়ের। এছাড়া অন্য চেহারা তাঁর ছিল না।'-[গ.অ./পৃ.১৬৫-৬৬]

পিতা-পুত্রের সম্পর্কের এ যোজন যোজন দূরত্বের পেছনে শুধু বনেদি পরিবারের আভিজাত্য- অহং, দাপুটে স্বভাব, রাশভারী ব্যক্তিত্ব ও কঠোর অনুশাসনই দায়ী ছিল না বরং এর জন্য পাঁচটি সুস্পষ্ট কারণও ওতপ্রোতভাবে কার্যকর ছিল। প্রথমত; তার মায়ের অনাদর-অবহেলায় মৃত্যুবরণের ঘটনা। মায়ের এ মৃত্যুর জন্য তার বাবাকেই দায়ী মনে হয়েছে। দ্বিতীয়ত; ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আকবরকে সংবর্ধনা দেবার উদ্যোগ নিলেও নীতি-আদর্শের অজুহাতে বাবর চৌধুরী তাতে বাধা দেন। এতে তার মনে পিতার বিরুদ্ধে সৃষ্টি করে প্রবল ক্ষোভ ও অভিমান। কেননা পরিশ্রম ও মেধার সমন্বয়ে পাপ্য স্বীকৃতি অর্জনের পথে পিতার এমন হঠকারী আচরণ তার একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তৃতীয়ত; আকবরের কলেজে পড়াবস্থায় ঠাকুরগাঁও গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আফরোজা খানমের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর বয়সী পিতার পরকীয়ার ঘটনা। যা তার মনে পিতা সম্পর্কে জন্ম দেয় সীমাহীন ঘৃণা। চতুর্থত; ইন্টারমেডিয়েট পাশ করার পর পিতার জেদের কারণে ডাক্তার হবার স্বপ্ন ও সাধকে মাটিচাপা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হবার ঘটনা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়তে গিয়ে পরপর দুই বছর অকৃতকার্য হওয়ায় পিতার প্রতি তার মায়া-মমতা সম্পূর্ণ উবে যায়। পঞ্চমত; পিতার ঘরের বুকসেলফে রাখা বইগুলোর মধ্যে আফরোজা খানমের নাম ও ছবি থাকলেও নিজের মায়ের কোনো স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে না পাবার ঘটনা।

পিতা বাবর চৌধুরীর এমন স্বেচ্ছাচারী, পাশবিক ও জেদি কর্মকাণ্ড শৈশব থেকেই আকবরকে দারুণভাবে পীড়িত করে। পরকীয়ার কারণে বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবনের প্রেম-প্রীতিহীন অবস্থা এবং মায়ের প্রতি পিতার সীমাহীন অবজ্ঞা-অবহেলা ও দাপুটে অবস্থান– তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে আকবরের মনে নারী সম্পর্কে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ভাবমূর্তি গড়ে ওঠেনি বরং পুরুষ হিসেবে ভোগী, মর্ষকামী ও সর্বগ্রাসী মনোভঙ্গি তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাই নারীর প্রশ্নে, প্রেম-ভালোবাসার প্রশ্নে তার মনে একধরনের বিকার ও বিদ্বেষ জেঁকে বসে। বাসের মধ্যেই কাকতালীয়ভাবে পরিচয় ঘটে পিতৃবন্ধু ও পারিবারিক হিতাকাঙ্ক্ষী আবদুল গফুর সাহেব ও তার মেয়ে নীহারের সঙ্গে। এ গফুর সাহেব ছিলেন বাবর চৌধুরীর কলকাতা বেকার হোস্টেলের সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিয়ের ঘটক। আর নীহার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান থেকে সদ্য এম.এ. পাশ করা ছাত্রী। আকবরকে কাছে পেয়ে এবং পরিচিত হয়ে বয়স্ক গফুর সাহেব যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে যান। তিনি অনর্গল আকবরের প্রশংসা, সংবাদপত্রের কলাম ও দুর্নীতিবিরোধী রিপোর্টের কথা, নিজের মেয়ে নীহারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে চৌধুরীর পরামর্শ, উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তার

জেলা কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করা এবং স্ট্রোক হয়ে চৌধুরীর শরীরের বাম পাশটা অবশ হবার কথা বলেন। এসব আকবরের কাছে বিরক্তিকর মনে হয় । তারপরেও গফুর সাহেব তাকে বলেন–

> ‘সেই যে লুকিং অ্যাট দ্যা গ্লাস! ভারি সুন্দর হাত বাবা তোমার। ঐ কলামটা তোমার আব্বা রেগুলার পড়েন। তোমার জন্য খুব গর্ব তাঁর।...তোমার বাবা যে কী রকম ভালোবাসেন তোমাকে, সেদিন দেখলাম। বললেন, তুমিই তাঁর বংশের নাম রাখবে।...তা হবেই বা না কেন, গুণী ছেলে তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না।’-[গ.অ./পৃ.১৭৪-১৭৫]

আলাপসূত্রেই তিনি চৌধুরী সম্পর্কে বলেন– ‘চৌধুরী খুব মডার্ন মাইন্ডের লোক–চিন্তাভাবনায়ও বরাবর আধুনিক। কোনো ভণ্ডামি নেই ওর মধ্যে।’ এ কথায় নীহার সায় দিলেও আকবর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। কারণ তার বড় ভাই হুমায়ুন নিজের পছন্দে কেরানির মেয়ে জয়নবকে বিয়ে করায় চৌধুরী সাহেব এ ছেলে ও ছেলের বউকে প্রথমে দেখতেই পারতেন না। কেননা তিনি এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে প্রায় ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু ছেলের অবাধ্যতার কারণে এ সম্বন্ধ ভেস্তে গেলে তিনি এদের প্রতি নাখোশ হন। যার ফলে হুমায়ূন পড়াশোনা ছেড়ে ঠিকেদারি, চাকরি ও পরে ব্যবসায়ে জড়ায়। আর তার জীবনস্বপ্ন ভেঙে চুরমার করার পেছনে বাবার ভূমিকার কথা তো আকবরের জানাই ছিল। তাই বাবা সম্পর্কে তার অভিমত–

> ‘বাবা আর যা-ই হোন, উদার বা আধুনিক নন। কখনো ছিলেন না। বাবা যদি উদার হবেন, তবে স্বার্থপর কে?’-[গ.অ./পৃ.১৬৯]

বাবা সম্পর্কে এমন প্রচণ্ড আক্রোশ, অভিমান আর নেতিবাচক ধারণা নিয়েই আকবর বাড়ির দিকে যাত্রা করে। কিন্তু রাত নয় টার সময় মাঝপথে এসে বাস বিকল হয়ে পড়ায় যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। রাতের বেলা দুর্গম রাস্তায় এমন বিপদে পড়ায় অন্যান্য যাত্রীদের মতো আকবরেরও মন-মেজাজ খারাপ হয়। কারণ পাঁচ মাইল দূরবর্তী শহর থেকে ব্যাটারি এনে গাড়ি সচল করতে নির্ঘাত তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। আকবর এ সময়টা ঘুমিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলেও গফুর সাহেবের ডাকে সাড়া দিতে হয়। মেয়েকে সঙ্গে করে তিনি আকবরের কাছে আসেন এবং রাতটুকু তার বাড়িতে কাটানোর জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আকবর বাবার অসুখের অজুহাত দিয়ে এ প্রস্তাব এড়িয়ে গেলে নীহারকে বাসে রেখে গফুর সাহেব নেমে পড়েন। তখন মুখরা নীহার তার উদ্দেশ্যে বলে–

> ‘একজন মুরুব্বি লোকের মনে কষ্ট দিতে যে আপনার বাধে না, তা-ই দেখলাম। দেখলাম মুরুব্বি লোককে অ্যাভয়েড করার জন্যে কেমন বানানো কথা পর্যন্ত অবলীলাক্রমে বলে যেতে পারেন।’-[গ.অ./পৃ.১৮২]

আকবর এমন অভিযোগ খণ্ডাতে বিভিন্ন যুক্তি দিলেও নীহার তা মেনে নেয় না। বরং বলে–‘আপনার মতো লোক, যে গত দশটা বছর বাবার কথা ভুলে থাকতে পারল, তার হবে বাবার জন্য দুশ্চিন্তা? আপনি বললেই মানুষ বিশ্বাস করবে?...আপনার খুব নাম শুনেছিলাম। কিন্তু দেখছি, আপনি আসলে ভালো লোক নন। মনের ভেতরে আপনার নানান প্যাঁচ।...বাবর চাচার ছেলে বলেই এত কথা উঠছে, নইলে আমার বয়ে গিয়েছিল আপনার সঙ্গে কথা বলতে। আর একটা কথা শুনে রাখুন, আমি একটু বেয়াড়া ধরনের মেয়ে, রাফ ব্যবহার করে লাভ হবে না কিছু।’ এসব কথায় নীহারের প্রতি আকবরের বাড়তি কৌতূহল জাগে এবং সে যে-তেজি, মুখরা ও প্রগলভা স্বভাবের নারী তাতে তার সন্দেহ থাকে না। নীহারের উপস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে আকবরের মনে পড়ে প্রেমিকা ও যৌথ-জীবন গড়ে তোলা সঙ্গিনী সাকিনা, নীলা আর রিফাতের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে এম.এ পাশ করা সংবাদপত্রের চাকুরে সাকিনার সঙ্গে যৌথ জীবন যাপন করায় তার গর্ভপাত ঘটাতে হয়। সাকিনা বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠলেও সে রাজি না হওয়াতে এ সম্পর্কের ইতি ঘটে। অন্যদিকে পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবন পার করা এবং এক সন্তান হবার পরেও স্বামী-সংসার ত্যাগ করে আসা নীলাও আকবরের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঝামেলা শুরু করে। তাই নারী সম্পর্কে তার ধারণা–

> ‘কী যে হয় না মেয়েদের মগজের ভেতরে, কিচ্ছু বোঝা যায় না।...তারও (নীলার) ঐ এক বায়না–বিয়ে হোক। ডিভোর্স হওয়ার পরই সব গড়বড় আরম্ভ হয়ে গেল। আসলে মেয়েরা বোধ হয় সবাই একই রকম।’-[গ.অ./পৃ.১৮৫]

আসলে আকবর প্রেমের নামে বহুভোগী জীবনের অপ-উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করতে চেয়েছে। প্রেমিকার কোনো দায়-দায়িত্ব, জীবনের স্থিতি, সম্মান ও সংসারের ঝামেলা কাঁধে নিতে চায়নি। যা তাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের হেরম্ব ও *চতুষ্কোণ* উপন্যাসের রাজকুমারের সমান্তরালে এনে দাঁড় করায়। উপযুক্ত পরিবেশ ও নীহারের নীরব প্রশ্রয় পেয়ে আকবর ‘নীহারের দিকে সরে এল এবং হাত বাড়িয়ে নীহারের ঘাড়ের ওপর হাত রাখল। তারপর বাহুধরে নীহারকে নিজের কাছে টানল।’ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে নীহার যেমন অবাক হয়, তেমনি ‘এ কী, এ কী করছেন’ বলে

দ্রুত ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে বসে। আর মুখে বলে–'আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না দেখছি।' এতে আকবর নিজেকে সংযত করে এবং 'সরি, কিছু মনে করবেন না' বলে মুখে দুঃখপ্রকাশ করলেও মনের দিক দিয়ে সজাগ থাকে। কারণ সম্পর্কের শুরুতে সব মেয়েরাই যে-এমন করে– তা সাকিনা ও নীলার ক্ষেত্রেও এ প্রমাণ সে পেয়েছে। রমণবিহারী পাকা জহুরি আকবর তার এ অভিজ্ঞতার আলোকেই মনে মনে বলে–

> 'তার উচিত আবার নীহারের ঘাড়ে হাত রাখা! এবং নীহারের বাধা সত্ত্বেও তাকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটের ওপর চুমু খাওয়া।...এসব ব্যাপারে পরপর কতগুলো কাজ করে যেতে হয়–কতগুলো কথা বলে যেতে হয়।...এসব ব্যাপার আরম্ভ হয় খুব হাল্কা ভাবে। কিন্তু একবার আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না। মন শরীরের দখলে চলে যায়। তারপর ঐ ব্যাপার চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।'-[গ.অ./পৃ.১৮৮]

বহুগামী, বহুভোগী ও লম্পট প্রকৃতির আকবর এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সাকিনা আর নীলার সঙ্গে ব্যভিচারে জড়িয়ে। তাই স্বামী-সন্তান-সংসার ছেড়ে আসা নীলার মুখে–'তোমাকে কাছে না পেলে আমার কিছু ভালো লাগে না' এসব যুক্তি শুনেও সে মনে মনে বলতো–'মাগী, ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি, পাঁচ পাঁচটা বছর একটা পুরুষ মানুষের ঘর করে, তার ছেলে পেটে ধরে, বিইয়ে, এখন আমি কাছে না থাকলে তুমি মরে যাও?' নারীর প্রতি এমন মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আকবর সুকৌশলে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ভোগবাসনা চরিতার্থ হলে এদেরকে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে। এরপরও নীহার পুনরায় আকবরের কাছে আসে এবং তার সঙ্গে কিছুক্ষণ পূর্বে করা আচরণের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবর কৈফিয়তের সুরে বলে–'আমি ভালো লোক নই'। একেও নীহারের কাছে একধরনের চাতুর্য ও পাশ কাটানো বলে মনে হয়। তাই সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে–

> 'বাবর চাচা আপনাকে কিছু লিখে যাননি? আব্বা কেন আমাদের দুজনকে একসঙ্গে হতে দিয়েছেন, সেটাও বুঝতে পারেন না?'-[গ.অ./পৃ.১৯০]

বাবর চৌধুরী অনেক আগেই নীহারের সঙ্গে আকবরের বিয়ে পারিবারিকভাবে ঠিক করে রেখেছিলেন। এ জন্যই নীহার আকবরের প্রথম সাক্ষাতের এমন আপত্তিকর আচরণকেও কিছুটা প্রশ্রয় দেয় এবং ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গীকে বোঝার চেষ্টা করে। নীহারের এ কথায় আকবরের বাবার পাঠানো এক চিঠির কথা মনে পড়ে। যেখানে বাবর চৌধুরী লিখেছিলেন–'আই ওয়ান্ট য়ু টু সেটল, ইফ য়ু ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস, মেবি উয়ি ক্যান হেল্প য়ু।' ব্যাপারটি যে-ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে– এ কথা ভেবে আকবর একে আর প্রশ্রয় দিতে চায় না। তাই বাস সচল হয়ে গেলে গফুর সাহেব ও নীহারের অনুরোধেও তাদের বাড়ি না গিয়ে মধ্যরাতেই বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। বাড়ির নিকটবর্তী হতেই অতীতস্মৃতিমুগ্ধতা বা নস্টালজিয়াসূত্রেই তার মনে পড়ে হাজারীলাল আগরওয়ালার পাটের গুদাম ঘর, বটবৃক্ষের নিচে ছগনলাল মুচির বসত ও মেয়ে বিন্দিয়া আর দারোয়ান রাম ভরোসার ছেলে বাঁকে বিহারীর পালিয়ে জলপাইগুড়ি গমন, জামগাছ থেকে পড়ে জমশেদ চাচার ছেলে মানিকের পা ভাঙা, চুয়ান্ন সনে পুলিশের হয়রানিতে রাজনীতি করা গোপালের বাবার বাড়ি বিক্রি করে ভারত গমন, বাড়ির বাইরে বাঁধানো চাতাল, উঁচু ধানের পাঁজা, আকালু শেখের জাল-খালুই নিয়ে মাছ মারতে যাওয়া, আথালে গরু-বাছুর, মস্ত উঠানে দু'তিনজন বালিকার সঙ্গে বোন জাহানারার বেনী দুলিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলা এবং বারান্দার জানালার কাছে আকাশী-নীল শাড়ি পরা ফর্সা মায়ের ফ্যাকাশে মুখ তার চেতনায় জায়গা করে নেয়। এভাবে স্মৃতি হাতড়ে দীর্ঘ দশ বছর পর আকবর বাড়িতে পা রাখতেই গোটা চৌধুরী বাড়ি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বড় ভাই হুমায়ুন, ছোট ভাই শাজাহান, বোন জাহানারা ও বড় ভাবী জয়নব কুশলাদি বিনিময়, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খেয়ে-দেয়ে সে অসুস্থ পিতা বাবর চৌধুরীকে দেখতে গিয়ে প্রথমে চিনতে পারে না। কারণ–

> 'দাড়ি-গোঁফে সারা মুখ ঢেকে গিয়েছে। মাথার চুল একেবারে শাদা।...মুখটা ঠোঁটের কাছে বাঁদিকে বাঁকানো। লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের পাশ দিয়ে–বালিশের একটা জায়গা গোল হয়ে ভিজে উঠেছে। শরীরের বাকি অংশ চাদরে ঢাকা। তবু মনে হয়, চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা কঙ্কাল। সে কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। খুঁজে খুঁজে দেখতে চাইল বাবাকে। জীবনে কখনো এত কাছাকাছি যায়নি। আজ প্রথম গেল। বাবাকে খুঁজতে গেল সে বাবারই কাছে।'-[গ.অ./পৃ.১৯৫]

জীবনে এই প্রথম আকবর বাবার এত কাছে আর ঘনিষ্ঠ হয়েও স্বস্তি ও শান্তির বদলে একধরনের অস্বস্তিবোধ করে। এক সময়কার বাঘের মতো সাহসী আর দীর্ঘদেহী বলশালী বাবার কঙ্কালের মতো জীর্ণশীর্ণ দেহের মধ্যে কেবল কপালের অর্ধবৃত্তাকার চাঁদের মতো কাটা দাগটাই তার নজরে আসে। জাহানারা ও হুমায়ুন চৌধুরীকে ডেকে আকবরের আগমনের

কথা জানালেও তিনি চোখ খুলেন না। সবার পরামর্শ মোতাবেক চৌধুরীর ঠাণ্ডা হাত নিজের হাতে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আকবর বলে–

> 'বাবা, চিনতে পারছেন?...আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি, ঢাকায় নিয়ে যাব আপনাকে।'-[গ.অ./পৃ.১৯৬-১৯৭]

এতে চৌধুরী চোখ খুলে তাকান, অস্থির হয়ে ওঠেন এবং শব্দ করে ডানে-বামে মাথা হেলান। সম্পূর্ণ নগ্ন, শ্লথ চামড়া আর শিথিল পেশি ঢলঢল করা চৌধুরীকে শাজাহানের পাঁজাকোলায় দেখে আকবরের মনে হয় এ যেন–

> 'অচেনা কোনো জানোয়ার। অন্তত মানুষের মতো মনে হল না। মাথাটা হেলে পড়েছে পেছনে, বুক এবং হাঁটু দুটি প্রায় এক জায়গায় হওয়ার কারণে পেটের চামড়া এক দিকে ফুলে ওঠেছে। তার নিচে, কোমড়ে কষির কালো দাগ, আরো নিচে উরুসন্ধির গোল হাড় এবং শেষে জননযন্ত্রটির বেজায় অসহায় অবস্থা।'-[গ.অ./পৃ.১৯৭]

এরকম অশ্বস্তিকর পরিবেশে আকবর বেশিক্ষণ পিতার সামনে থাকে না। ঘরে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করেও পারে না। কারণ জাহানারা চুপিসারে তার কাছে আসে আর চাপা গলায় বলে–'পরে হয়তো সময় পাবো না–সই-টই সব হয়েছে। শুধু রেজিস্ট্রিটুকু বাকি ছিল। কিন্তু বড় ভাই ঐ উইল মানতে চায় না। বলছে প্রপার্টি এখন ভাগাভাগি হবে না, যা থাকবার একসঙ্গে থাকবে। এটা কি ঠিক, তুই-ই বল? বাবার ইচ্ছেটাকে এভাবে অগ্রাহ্য করা কী বড় ভাইয়ের ঠিক হচ্ছে?' বোনের এ স্বার্থের হিসেব-নিকেশ দেখে সে মনে মনে বিরক্ত হলেও তখনকার মতো জাহানারাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করে। এর কিছুক্ষণ পরেই ছোটভাই শাজাহান এসে তাকে দরজা বন্ধ করে ঘুমানোর পরামর্শ দেয়। কারণ এ পৈতৃক সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে একের পর এক সবাই এসে তাকে বিরক্ত করবে। পিতার করে যাওয়া উইলের বাস্তবতা তুলে ধরতেই শাজাহান বলে–

> 'উইল মানলে বুবুর লাভ, না মানলে বড় ভাইয়ের। তোমার আমার ওতে করবার কিছু নেই। তুমি ওদের কথায় কান দিও না।'-[গ.অ./পৃ.১৯৮]

পিতার মৃত্যুদশায় ভাই-বোনদের বিষয়-সম্পদ নিয়ে এমন ব্যস্ত হতে দেখে আকবরের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে। পরের দিন ডাক্তার জগদীশ বাবু এসে আরো দুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। এরপর ঢাকা বা জেলা সদরে নেবার পরামর্শ দেন। পিতার হাত-পা নাড়াবার অক্ষম চেষ্টা আর মুখের গোঙানির শব্দে আকবরের মনে হয়–

> 'মরণ তাহলে এমন জিনিস। প্রাণের চূড়ান্ত বিদায়ের আগে শরীর, বুদ্ধি, চেতনা–এসব জিনিস কিছুটা রেখে, কিছুটা তুলে নিয়ে বেশ খানিক মজার খেলা খেলে যায়।'-[গ.অ./পৃ.২০২]

পিতার আসন্ন মৃত্যু এবং ভাই-বোনদের সম্পত্তির বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন বেলা এগারোটার দিকে গফুর সাহেব নীহারকে নিয়ে চলে আসেন। ফলে আকবর আরেক ঝামেলার মধ্যে জড়ায়। বাড়ির সবাই নীহারকে 'মেজো বউ' হিসেবে একরকম মেনেই নেয়। আবার জাহানারার 'ভাই, নীহারকে তোর পছন্দ হয়? যদি রাজি থাকিস তো বল, আমরা এখনই ব্যবস্থা করে ফেলি, শুভ কাজটা হয়ে যাক।...ধার একটু বেশি। কিন্তু জিনিস তো খারাপ না।'- বলা এমন ঠাট্টা-রসিকতাপূর্ণ কথা শুনেও সে বিরক্ত হয়। অথচ নীহার বাড়ির সবার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ আর স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়। কিন্তু আকবরের আড়ষ্ট আর গুটিয়ে থাকা ভাব কাটতে চায় না। ঘরের মধ্যে সে মায়ের তেমন কোনো স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পায় না। অথচ বুক সেলফে আফরোজা খানমের লেখা নাম ও ছবি দুই-ই সে আবিষ্কার করে। পরে সিলিং-এর ওপর এক ভাঙা বাক্স থেকে অল্প বয়সে তোলা মায়ের একটি ছবি পায়। এ ছবি দেখে গফুর সাহেব তাকে তার মায়ের বিয়ের হবার পুরো ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। ডোমারের চৌধুরী বাড়ির ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা আকবরের মাকে দেখতে গিয়ে হাত-পা-চুল-মুখমণ্ডল নেড়েচেড়ে দেখার পর বাংলা ও ইংরেজিতে ঠিকানা লিখতে বলায় তিনি সবার সামনে বলেছিলেন–

> 'আমি দুটোই লিখব। কিন্তু ঐ লেখার মানে আপনাদের করে দিতে হবে।'-[গ.অ./পৃ.২০৯]

অথচ এমন ব্যক্তিত্বময়ী, সুশিক্ষিতা, রুচিশীল ও সুমার্জিত আকবরের মায়ের দাম্পত্য জীবনও সুখের ছিল না। পিতার পাশবিক ব্যবহারে দূরে অবস্থান করা এবং পারিবারিক আভিজাত্য-অহং-এর জাঁতাকলে পিষ্ট তার হয়ে এক রকম অনাদর-অবহেলায় মৃত্যু হয়। এমনকী শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও অনীহা-দায়সাড়া ভাব দেখা যায়। 'আমার জীবন এমন হল কেন? আমি তো এমন জীবন চাইনি'– মায়ের লেখা এমন চিঠি পড়ে তার জীবনের অশান্তি আর অতৃপ্তি সম্পর্কে আকবর নিশ্চিত হয়। তাই মায়ের এ দাম্পত্য জীবন মূল্যায়ন করতে আকবর বলে–

> 'মা বলে যে কেউ সংসারে ছিলেন টেরই পাওয়া যেত না। এমনভাবে মিশে থাকতেন যে, তার আলাদা অস্তিত্ব কারো চোখে পড়ত না। বেঁচে ছিলেন যেমনভাবে, মরলেনও ঐভাবেই।...এমন নিঃশব্দ, এমন গুটিয়ে নেয়া, অমন পবিত্র এবং শান্ত থেকে মায়ের

কোনো লাভ হয়নি। না বেঁচে থাকার সময়, না মরার পর। দূরের মানুষ দূরেরই থেকে গিয়েছেন। জ্বলে ওঠেননি, তীব্র হননি, তীক্ষ্ণ হননি। ঐ জীবন, কি আসলেই কোনো জীবন'?-[গ.অ./পৃ.২১০-২১৩]

মায়ের এ অপমান-বঞ্চনাময় জীবনের গ্লানি সর্বদাই তাকে রক্তাক্ত করেছে। আকবর পুনরায় মায়ের ব্যবহৃত পুরোনো ট্রাঙ্ক খুলে বেনারসী শাড়ি ও সিল্ক নেড়েচেড়ে দেখে। বিকেলে চৌধুরীর ঘর থেকে জাহানারা চিৎকার করে বলে—

'তোমরা খালি মিটিং করো, মরণাপন্ন বাপের চিকিৎসা নিয়ে—তাহলেই বাপ সুস্থ হয়ে ওঠে বসবেন। কেন, তোমরা শহর থেকে বড় কোনো ডাক্তার নিয়ে আসতে পারো না?'-[গ.অ./পৃ.২১৫]

জাহানারার আর্তচিৎকার আর অভিযোগে সবাই বিচলিত হয়। ডাক্তার জগদীশ বাবু এসে চৌধুরীর দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হবার কথা জানান এবং রোগীর ঘরে কোনো শব্দ ও মানুষের ভিড় না করার নির্দেশ দিয়ে চলে যান। সেই সঙ্গে জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। অর্থাৎ তৃতীয় এবং শেষ আঘাতটার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার জন্য আগাম সতর্ক থাকতে বলেন। ফলে রাতের বেলা আকবর আর নীহারের পালা করে মুমূর্ষু বাবার পাশে থাকার দায়িত্ব পড়ে। 'কেন ভাই, আমি শুধু একাই শ্বশুরের সেবা করব আর ও কিছুই করবে না?'— জয়নব ভাবীর এমন কথাতে নীহারও রাজি হয়। গভীর রাতে পাশাপাশি চেয়ারে বসা নীহারের মুখ-ঘাড়-বাহুমূলের 'ভারী-করুণ এবং কোমল আলোর আভা' দেখে আকবরের সাকিনা আর নীলার কথা মনে পড়ে। আর আজেবাজে চিন্তায় মন ঘুরপাক খায়। একদিকে মায়ের দুঃখের স্মৃতি এবং নীহারের আকর্ষণ; আরেকদিকে বালজাকের উপন্যাস পড়ে তার 'মগজের মধ্যে মেয়ে মানুষের চিন্তা ঢুকে গেল'। রাত প্রায় দুইটার দিকে নীহার আকবরকে ঘুমানোর তাগিদ দেয় কিন্তু আকবর ভবিষ্যৎ স্ত্রীর এমন মায়া-মমতা পূর্ণ ব্যবহার ও সজাগ দৃষ্টি দেখে মনে কুটিল হাসি হাসে। আর আবছা আলোতে নীহারের শরীরটা দেখে তার রীতিমতো লালসা জেগে ওঠে। তাই ঠাট্টার ছলে নীহারকে বলে—

'না, অসুবিধা কেন হবে? বরং রাতজাগা ব্যাপারটা বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে—এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে রাত জাগছি, একি সোজা কথা? বিশেষ করে রোগী যখন দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না।'-[গ.অ./পৃ.২১৮]

'ছি! ওভাবে কেন বলছেন!'— নীহারের মৃদু ভর্ৎসনায় আকবর কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও স্বভাবসুলভভাবে কথা চালিয়ে যায়। আবার—'আমার সঙ্গে রাত জাগতে আপনার ভয় করছে না?...যদি এই রাতের সুযোগে খারাপ কিছু' এমন কথায় নীহার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। আর আকবরের উদ্দেশ্যে বলে—

'কাল আপনি ভয় দেখাচ্ছিলেন, আজ বাজে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আসলে কি ভেবেছেন, আমি আপনার কথায় ভয় পেয়ে যাব?...আমি কি খুব সহজে ভয় পাবার মতো মেয়ে?'-[গ.অ./পৃ.২১৯]

আকবর তার রমণীরমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই বুঝতে পারে যে, নীহার তার প্রতি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যৎ-স্বামীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতেও তৎপর হয়ে উঠেছে। সে এবার নীহারের শরীরের দিকে ভালো করে নজর দেয় আর মনে মনে হিসেব করে বলে—'নীহারের শরীর যথেষ্ট ভালো। বিছানায় আনন্দ দেয়ার মতো মাল-মশলা ঐ শরীরে প্রচুর। ঐ মুহূর্তে তার লম্পট স্বভাব মাথা তুলতে চাইল। বুঝলো নীহারের কপালে দুঃখ আছে।...দারুণ নেশার মতো জিনিস মেয়ে মানুষের শরীর।' এসব চিন্তা নিয়ে সে ঘুমানোর চেষ্টা করেও পারে না। বাবার ঘরে ঢুকে নীহারের ঘাড়ে হাত রেখে বলে—'এবার ঘুমোতে যান।' নীহার পাশের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। একাকী মুমূর্ষু বাবার কাছে বসে আকবরের মনে হয়—

'মেয়ে মানুষ আসলেই বিচিত্র জীব। নীহার যতই নিস্পৃহতা দেখাক, আসলে সে তারই দিকে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। মেয়েদের বেলাতে এই-ই হয়। বিয়ের প্রসঙ্গ এলে মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক থাকা প্রায় অসম্ভব। বিয়ে এমনই জিনিস মেয়েদের কাছে। ঐ প্রসঙ্গ এলেই মেয়েদের সবকিছু উল্টেপাল্টে যায়।'-[গ.অ./পৃ.২২০]

শুধু নীহারের ক্ষেত্রে নয় বরং সাকিনা, নীলা ও রিফাতের বেলাতেও এ অবস্থা আকবর গভীরভাবে লক্ষ করেছে। বিয়ের একটুখানি মেহেদি ও হলুদ মেয়েদের দারুণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। 'গায়ে-হলুদের হলুদ আনম্যারেড ছেলেমেয়েদের মাখতে হয়। তাতে খুব শিগ্‌গির বিয়ের ফুল ফোটে।'—ইংরেজিতে এম.এ পাস সাকিনার এমন মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে বেশ তাৎপর্যবাহী। আবার সহপাঠী রিফাতের সঙ্গে পবিত্র প্রেম যখন অন্যত্র বিয়ের মাধ্যমে ব্যর্থতায় রূপ নেয় তখন বন্ধু কামাল বলেছিল—'শুয়েছিলি দু-একবার? ওরে আহাম্মক, মেয়েদের সঙ্গে না শুলে ওদের কব্জা করা যায় না।' কামালের এমন কথাতে তার মনেও স্থির সিদ্ধান্ত জন্মায়—'রিফাতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেঁচে যাবার কারণ আর কিছুই নয়—শুধু বিছানার

কর্মটি না করা।' তবে এসব ক্ষেত্রে বিয়ের প্রসঙ্গটা আগাগোড়া উজ্জ্বল থাকলে আর কোনো বাধাই থাকে না। ফলে নীহারের প্রসঙ্গটি আকবরের দেহ মনে দারুণভাবে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আবার গফুর সাহেব ও নীহারের এ যেচে আন্তরিকতা দেখানোকেও একেকসময় তার কাছে একধরনের 'গ্রাম্যচালাকি' বলে মনে হয়। এর উপযুক্ত জবাব দিতেও সে একেকবার মনস্থির করে। তাই সে একবার ভাবে নীহারের ঘরের দরজায় কড়াঘাত করে ঢুকে পড়ে। আবার টেবিলের ওপরে নীহারের রেখে যাওয়া *এ ড্রাই উইন্টার* নামক ইংরেজি উপন্যাস ও চিঠিকেও তার কাছে এক ধরনের চালাকি বলে মনে হয়। যাতে করে এর ছুতোয় সে তার ঘরে যেতে পারে। কিন্তু তারপরেও সে নীহারের কাছে যায় না।

তবে রাতের শেষ প্রহরের দিকে নীহার চৌধুরীর অবস্থা জানতে পুনরায় আকবরের কাছে আসে আর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জ্ঞান ফেরার কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন সে ওঠে দাঁড়ায় এবং নীহারের হাত শক্ত করে ধরে। 'আপনার সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক পাতানোর কথা হয়েছে জানেন?'–এমন কথা নীহারের মুখ থেকে শুনে আকবর তার সঙ্গে তিনজন নারীর সম্পর্ক, বদ স্বভাব ও সর্বনাশ করে ভেগে পড়ার কথা জানায়। কিন্তু নীহার তা হেসে উড়িয়ে দিলে এবং 'আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন?'–এমন ভরসা পেয়ে আকবর নীহারকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খায়। নীহার মৃদু প্রতিবাদ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। 'এই হল মোক্ষম সময়–এই মুহূর্তটি তার জন্যে ভবিষ্যৎ অনেকখানি জায়গা করে দেবে'– এমন সূক্ষ্ম হিসেব করে পাকা জহুরির মতো সে পুনরায় নীহারের লজ্জা-সঙ্কোচ ভাঙতে তার শরীরে হাত রাখে। এবারও নীহার চাপা ক্রোধ প্রকাশ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং নিজের কক্ষে চলে যায়। পর দিন আকবর ঢাকা থেকে পাঠানো বন্ধু সুবিনয়ের চিঠি পায়। যাতে প্রেমিকা নীলার পঁচাগড়ের বাড়িতে চলে আসার আশঙ্কার কথা জানানো হয়। নীলা যে-এখানে এসে একটা সিনক্রিয়েট করে বসবে–এ বিষয়ে আকবর প্রায় নিশ্চিত হয়। এসব অনুমান করেও সে অনেকটা নির্ভার থাকে। তবে নীলা ও নীহারের সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার বিষয়ে সে একটি মীমাংসায় পৌঁছায়। যেমন–

> 'পুরনো বিদায় নেয় এবং নতুন জায়গা অধিকার করে। মেয়ে মানুষ বড় বিচিত্র জীব–স্বামীই হোক আর প্রেমিকই হোক, প্রতিযোগিতার প্রশ্নে কেউ পিছু হটতে চায় না।'-[গ.অ./পৃ.২২৮]

এ ভাবনার মধ্যেও আকবরের বহুভোগী জীবনের ক্রমশই নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নীলার আগমনের আশঙ্কার সঙ্গে যুক্ত হয় ভগ্নীপতি আশরাফের (জাহানারার স্বামী) শ্বশুরের সম্পত্তির উইল নিয়ে নানাবিধ তৎপরতা। আশরাফ এ উইলের বিষয় নিয়ে তার কাছে আসলে সে কোনো সমাধান দিতে পারে না। বরং 'প্রপার্টি যদি টাকা পয়সা হয়, তাহলে আমি নেব। দেবেন আমাকে ক্যাশ, আজই?'– বলা এমন মন্তব্য আকবরের উদ্‌ভ্রান্ত-অস্থির-বোহেমিয়ান জীবনের পরিচয়বাহী। দুপুর বেলা নীহার আকবরের কাছে আসে আর বলে–'শরীর খারাপ লাগছে তাই না? গোসল করে নাও, ভালো লাগবে।' তার কাছে নীহারের এমন কথাকে বহুকাল ধরে ঘর করা বউরের মতো লাগে। অথচ তার ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে আকবরের কিছুটা করুণাও জাগে। আবার বিকেল বেলা স্থানীয় গির্জার পাদ্রি ম্যানুয়েল চৌধুরীকে দেখতে এসে ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে প্রায় দেবতার স্তরে নিয়ে যাওয়াকেও আকবরের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। বরং বুড়ো পাদ্রি হিপ্নোটিজম জানে বলে সন্দেহ করে। রোগীর কাছে থাকার জন্য রাতের প্রথম প্রহরে আকবরের এবং শেষ প্রহরে নীহারের পালা পড়ে । 'এই শোন, তুমি বরং ঘুমোও গিয়ে'–নীহারের এমন প্রীতিপূর্ণ কথায় আকবর মনে ধাক্কা খায়। তারপরেও 'আপনি' সম্ভাষণই যে ভালো এবং এতে একটা দূরত্ব বজায় থাকে–তা উল্লেখ করায় নীহার তার উদ্দেশ্যে বলে–

> 'তোমাকে আর চেনার দরকার নেই। আমার কপালে যা আছে, তাই তো হবে।'-[গ.অ./পৃ.২৩৫]

এভাবে নীহার তার অজান্তেই নিজের জীবনভার হবু স্বামী আকবরের হাতে সঁপে দেয়। তার প্রতি আকবরেরও তীব্র আকর্ষণ জাগে। আর ক্রমশই সে বেপথু ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মুমূর্ষু পিতার উপস্থিতিতেই নির্জন রাতের বেলায় আকবর তাই–

> 'উঠে দাঁড়িয়ে নীহারকে কাছে টানে। দুহাতে খুব ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁটের ওপর মুখ ভরে চুমু খায়।...আলী আকবর নিপুণ লম্পটের মতোই নীহারের চোখে, মুখে, কপালে, গলার কাছে, ঘাড়ে–একটা একটা করে, খুব ধীরে ধীরে, খুব ঠাণ্ডা মাথায় চুমু খায়। ঐ সময় সে একবার শায়িত মরণদশায় পাওয়া নিজের বাবাকেও দেখে নেয়।...তারপর নীহারের বুকে হাত রাখে।...নীহারের ঘোর কেটে যায়। সে বাধা দেয়। বলে, না।...আলী আকবর সামনের দিকে তাকাল এবং দেখল মরণদশায় পাওয়া মানুষটা চোখ মেলে রয়েছে। সে থমকালো মুহূর্তের জন্যে। বোধ হয় আরেকটা বাধা সে পার হয়ে এল। তারপরই সে সহজ

হয়ে উঠল। নীহারের বুকে হাত দিল এবং ব্লাউজের বোতাম খুলল–নীহার তখন শুধু মুখে বলছে; না–প্লিজ না, দোহাই তোমার, দুটি পায়ে পড়ি, এখানে না...নীহারের চুলের খোঁপা ভেঙে পড়েছে, চোখে পানি ভরে এসেছে–আঁচল মেঝেতে লুটোচ্ছে।...সে টান মেরে ব্রা'র একটা ফিতে ছিঁড়েছে সবে, ঠিক এ সময়ে গোঁ গোঁ আওয়াজটা শুনতে পেল।'-[গ.অ./পৃ.২৩৭-২৩৮]

চোখের সামনে ছেলের এমন লাম্পট্য-ব্যভিচারী কর্মে উদ্যোগী হতে দেখে সবেমাত্র জ্ঞান ফিরে পাওয়া বাবর চৌধুরী তার ভাষায় ক্রমান্বয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে আর হাত-পা ঝাঁকুনির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিছানা থেকে পড়ে যান। 'এ কী হল!'– বলে আতঙ্কে নীহার তার বিস্রস্ত-এলোমেলো বেশবাস নিয়েই তীব্রতম চিৎকার দিয়ে বাড়ির মানুষ জড়ো করে। এতে এক চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারণ বিছানা থেকেই পড়েই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু হয় এবং এ মৃত্যুর দায়ভার পড়ে আকবরের ঘাড়ে। ফলে বাড়ির সবাই তাকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করে আর গালমন্দ করে। হবু শ্বশুরের এমন মৃত্যুর জন্য নীহারও নিজেকে দোষী ভাবে এবং অপরাধবোধ দ্বারা দগ্ধ হয়। তাই আকবরের উদ্দেশ্যে বলে–'তুমি কী, ঠিক করে বলো, তুমি মানুষ না শয়তান, বলো তুমি কে?' তার দেখাদেখি ছোটবোন জাহানারাও বলে–'দেখো তোমরা খোঁজ করে, ও এ বাড়ির কেউ নয়– নিশ্চয় নাম ভাঙিয়ে এসেছে, পুলিশে দাও ওকে।' ছোটভাই শাজাহান কাছে এসে বলে– 'এ জন্যে কি দশ বছর পর বাড়ি এসেছিলে তুমি?' নিকট আত্মীয়-স্বজনদের এমন অপমান আর অপবাদও আকবরকে তেমন পীড়িত করে না। মৃত পিতার শববহন ও কবরস্থ করার সময় কেউ তাকে না ডাকলেও সে পাশে উপস্থিত থাকে। সন্ধ্যার দিকে শুয়ে টানা ছয়-সাত ঘণ্টা ঘুমাতেও তার অস্বাভাবিক মনে হয় না। আবার পরকীয়ার লীলাসঙ্গী নীলার আগমন ও নীহারের সঙ্গে তার আলাপচারিতায় গোপন অযাচারি জীবনের তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে তেমন দুশ্চিন্তাকাতর হতে দেখা যায় না। উপরন্তু এমন বিব্রতকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সে নীহারকে ও তার কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকেই দায়ী করে। আর যুক্তি হিসেবে বলে–

'হঠাৎ মেয়েটা ঐভাবে খেপে উঠল কেন? যদি ঐ মুহূর্তে, কাপড় চোপড়ের ঐ রকম বেসামাল অবস্থায় চিৎকার করে লোক জড়ো না করত, তাহলে গোটা ব্যাপারটাই অন্য রকম হয়ে যেত।...ভাবী বধূর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া কি দোষের? চেতনাবিহীন লোকের (যে ঘটনাক্রমে তার বাবা) মৃত্যুশয্যার পাশে ঘটনাটা ঘটেছে বলে?...যে বাড়িতে দীর্ঘ রোগভোগের পরে মানুষ অনিবার্যভাবে মারা যায়, সে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীরা কি মিলিত হয় না? বাবা যদি ঐ রকম মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতেন আরো ছ'মাস, তাহলে ঐ ছ'মাস কি জাহানারা আর হুমায়ুন নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কাজটা বন্ধ রাখত? তাহলে তার দোষটা কোথায় ছিল? আড়াল ছিল না বলে? মাঝখানে যদি একটা দেয়াল থাকত, তাহলেই আর দোষ হত না। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থার চাইতে বড় দেয়াল কি আর কিছু হতে পারে?'-[গ.অ./পৃ.২৪৫]

এজন্যই আকবর এমন গর্হিত অপকর্মেও তেমন কোনো অনুশোচনা অনুভব করে না। শুধু বাড়ির লোকজনদের বিরূপ আচরণকেই সে পীড়ন মনে করে। আর নীহারের বোকামির জন্য তার কিছুটা খারাপ লাগে। কারণ প্রথমত ভাবী শ্বশুরের মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে এবং দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ স্বামীর পরকীয়ার সঙ্গী নীলার উপস্থিতি–এ দুই আঘাতে নিহার উন্মাদদশায় পৌঁছায়। এমতবস্থায় আকবর মধ্যরাতে বারান্দা থেকে নেমে উঠানে দাঁড়ায়। রাতের জ্যোৎস্না আর শিউলি ফুলের ঘ্রাণে সে শৈশবস্মৃতিতে ফিরে যায়। গেটের কাছে যেতেই গফুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় এবং তিনি তার ঢাকা গমনের কথা এবং কুলখানিতে থাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তবে তার নিস্পৃহভাব দেখে এবং রাস্তায় নেমে অদূরের করতোয়া নদীর ব্রিজের দিকে হাঁটতে দেখে গফুর সাহেবও তার পিছু নেন। তিনি আকবরের আত্মহত্যার সন্দেহে তাকে বাড়ি ফিরতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আকবর নির্বিকারচিত্তে বলে–

'আমার মনের কথা আমি খুব ভালো বলতে পারি, কেননা আমার মনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আমি পাপ করিনি। আমি কোনো-রকম যন্ত্রণা ভোগ করি না।'-[গ.অ./পৃ.২৪২]

কিন্তু গফুর সাহেব তার কথায় সম্মতি দেন না। বরং তিনি বলেন–'মানুষ ওকথা বলতে পারে না। মানুষের জন্মই তো পাপ থেকে। সূচনাতেই তো কারনাল সীন আর ফ্রাট্রিসাইড–সেইখান থেকেই তো জীবন আরম্ভ, বলো? নিস্পাপ হয়েছি, এমন কথা বলা কি সাজে মানুষের?' গফুর সাহেবের কুরআন কিংবা বাইবেলের এ কথাকেও সে আমলে নেয় না। তাই পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলে–

'অঙ্গীকার না থাকলে পাপ কিসের? মানুষের অঙ্গীকার শুধু নিজেরই কাছে। মানুষ স্বার্থপর জানোয়ার মাত্র–ম্যান ইজ এ সেলফিশ এনিমেল–স্বার্থের জন্যে তার এত কিছু উন্নতি আর বিকাশ। আমার কারো কাছে কোনো অঙ্গীকার নেই, আমার কোনো পাপবোধও নেই, আর তাই যন্ত্রণাবোধও করি না আমি।'-[গ.অ./পৃ.২৪২]

আকবরের এমন নির্মম কথায় গফুর সাহেব মানসিকভাবে আহত হন। তাই কান্নাভেজা কণ্ঠে তার উদ্দেশ্যে বলেন–'পাপবোধই তো মানুষকে পবিত্র করে, শুদ্ধ করে– যন্ত্রণাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে দেয়–অঙ্গীকারেই তো মানুষ মানুষ

হয়ে ওঠে। তুমি ভুল ভাবছ আলী আকবর।' তারপরেও সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তাই জুলাই মাসের খরস্রোতা করতোয়া নদীর ওপরের ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকবর গফুর সাহেবকে বলে–

> 'আত্মহত্যা করার কোনো কারণ নেই আমার। আমি হতাশ নই, ব্যর্থও মনে করি না নিজেকে–আর পাপবোধ তো নেই-ই।'-[গ.অ./পৃ.২৪২]

আকবরের এমন অনমনীয় মনোভাব দেখে শেষে গফুর সাহেব মিনতির সুরে নীহারকে বাঁচাতে সান্ত্বনা এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশের কথা বলেন। কিন্তু আকবর কোনো অনুশোচনা প্রকাশ তো করেই না, বরং তার কাছে একে 'বাবা-মেয়ের নাটক করা শেষে মেয়ের জন্য বাবার উকালতি'– বলে মনে হয়। তাই গফুর সাহেবের কথায় মনোযোগ না দিয়ে পরের দিনই ভোরবেলার বাস ধরে ঢাকা ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। আর বাড়িতে ফিরে নীহারের নিখোঁজ হবার কথা শোনে। এতে গফুর সাহেব ডকুরে কেঁদে ওঠেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা নীলাকে নীহারের নিখোঁজ হবার জন্য বাড়ির সবাই দোষারোপ করে। ভোরবেলা স্যুটকেস গুছিয়ে আকবর বের হবার সময় নীলকে দেখতে পায় এবং 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে' বলাতে ভর্ৎসনার মুখোমুখি হয়। নীলা ক্ষোভের সঙ্গে জানায়–

> 'তোমার কি কর্তব্যবোধ বলতে কিছু নেই? আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তুমি কী বল তো?...তোমার সঙ্গে অন্তত যাচ্ছি না।...তোমার আসল পরিচয় জানা ছিল না বলেই সম্পর্কটা হয়েছিল।...এখন আর নেই–আমি একাকী এসেছি, একাকী ফিরে যেতে পারব।'-[গ.অ./পৃ.২৪৭]

নীলার এমন কথাতেও তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। বরং ভাই-বোনদের কাছ থেকে আকবর স্বাভাবিকভাবে বিদায় নেয়। বাসস্ট্যান্ডে এসে ম্যানুয়েল পাদ্রির সঙ্গে দেখা হয়। তিন দিনের দিন বাবার মিলাদ মাহফিল রেখে ঢাকা যাওয়ার উদ্যোগ দেখে তিনি আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে পিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনাকে গুরুত্ব দিতে বলেন। তাই আকবরের উদ্দেশ্যে বলেন–

> 'প্রার্থনাই হল আসল, মানব জীবনটাই হল একটি প্রার্থনা– তুমি প্রার্থনা করো, শান্তি পাবে। প্রার্থনা করলে দেখবে, দুঃখে-শোকেও শান্তি আছে।'-[গ.অ./পৃ.২৪৮]

কিন্তু আকবর ম্যানুয়েলের সামনে এসে দাঁড়ায় আর নিঃসঙ্কোচে বলে–'যদি শোক না জাগে মনে?' এ কথায় তিনি চমকে উঠেন এবং তার মুখ যে-পাপীর নয় বরং সংশয়বাদীর মুখ– তিনি তা সহজেই বুঝতে পারেন। তাই পুনরায় বলেন–

> 'তর্ক কোরো না বাবা, তর্কে কেবলই সংশয় তৈরি হয়। আর শোক কেন জাগবে না বলো? দুঃখ-শোক-পাপ-লাঞ্ছনা সবই তো মানুষের মনের ভেতরকার জিনিস। মানবজন্ম আছে বলেই তো ওসব আছে। এসবের ওপরে মানুষকে কিছু অর্জন করতে হয়। ঐ অর্জনটুকুই শান্তি।...মুক্তিলাভের ঐটিই পথ। শোক-দুঃখই মানুষের মুক্তির পথটাকে খুলে ধরে এবং মানুষের হাত ধরে তাকে প্রার্থনায় পৌঁছে দেয়।...মানুষের শোক না জেগে পারে না।'-[গ.অ./পৃ.২৪৮-২৪৯]

এসব কথাতেও আকবরের মনে তেমন প্রভাব পড়ে না। বাসে উঠেও সে সহযাত্রীদের মুখে তার মৃত বাবার প্রশংসা শুনতে পায় এবং মাঠের আউশের শূন্য জমিতে কোথাও রোপা আমন লাগানো কিংবা সবুজ ছোট চারার সমারোহ দেখে। প্রায় ঘণ্টাখানেক গাড়ি চলার পর পথের কালভার্টের বেদিতে হাল্কা নীল রঙের শাড়ি পরা এক নারীকে দেখে আকবর চিৎকার করে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে এবং নেমে বিপর্যস্ত চেহারার নীহারকে দেখতে পায়। আর নীহারও আকবরকে চিনতে পেরে স্বামীজ্ঞান করে মাথায় আঁচল টেনে ঘোমটা দেয়।আকবর তাকে তুলে এনে নিজের কাছে বসায় এবং বাবার বাড়ি ঠাকুরগাঁও নামবে কীনা–জিজ্ঞাসা করায় নীহারের দুচোখ জলে ভরে ওঠে। যা দেখে আকবরেরও অনুতাপ শুরু হয়। তাই সে কৈফিয়তের সুরে বলে–

> 'আমি খুব খারাপ লোক।...দুর্ঘটনা কি ঘটে না মানুষের জীবনে বলো? জন্তু-জানোয়ার কি আঁচড়ে খামচে দেয় না? মনে করো,সেই রকম একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে তোমার জীবনে।...তুমি গোটা ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিও না– তাহলেই দেখবে সব কিছু সহজ হয়ে গেছে।'-[গ.অ./পৃ.২৫০]

আকবরের এ দোষ স্বীকার, কতৃকর্মের অনুতাপ দেখে নীহারও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 'আমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা এখন তোমার পক্ষে সহজ হবে'–এমন অভিমত ব্যক্ত করায় আকবরের প্রতি নীহারের বিশ্বাস বাড়ে। তাই ঠাকুরগাঁও বাবার বাড়ির কাছে এসেও নীহার নামে না। আকবর নামার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও সুস্থ-স্বাভাবিক-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিবাহিতা নারীর মতই নীহার বলে–

‘কই কাউকে যে দেখছি না–আব্বা না আসুন, অন্য কাউকে তো পাঠাতে পারতেন।...বিয়ের পর প্রথমবার বাপের বাড়ি যাচ্ছি, আমার মান-সম্মান নেই!’-[গ.অ./পৃ.২৫১]

নীহারের শারীরিক-মানসিক এমন বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আকবরের মন প্রকৃত অর্থেই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। ‘একটি মেয়ে মনে আঘাত পেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল’–বলে নিজেকে দোষী ভাবে। সামনের সিটে বসা ফাদার ম্যানুয়েলকে দেখে তার কথা আকবরের স্মরণে আসে। তিনি বলেছিলেন–

‘পাপ এই সংসারে আছে–এবং তার দায়ও আছে–সবচাইতে সৎ এবং পবিত্র লোকদেরই সে দায় বহন করতে হয়–ঈশ্বর তাদের সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন।’-[গ.অ./পৃ.২৫২]

এ কথাসূত্রেই আকবরের মনে নানা ভাঙচুর ও বোঝাপড়া শুরু হয়। বুকের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হয়। এমন কষ্ট অতীতে কখনো সে অনুভব করেনি। মনে পড়ে কৈশোরে হারানো মায়ের কথা। তাই সে নীহারকে নিয়ে বাস থেকে নামতে গিয়েও পারে না। কারণ তার মনের ভেতর থেকে কে যেন দংশন করতে করতে বলে–

‘এই আহত, অপমানিত, রুগ্ন মেয়েটি কার দায়?...কে দায়ী মেয়েটির ঐ অবস্থার জন্যে?...নীহার কি এখন তাহলে অন্যের পাপের দায় বহন করবে?’–[গ.অ./পৃ.২৫২]

এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আকবর কোনো জবাব দিতে পারে না কিংবা কোনো যুক্তিও দাঁড় করাতে পারে না। তাই নীহারকে নিয়ে সে ঢাকায় যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে দুজনে পুনরায় নিজেদের আসনে গিয়ে বসে। আর নীহারও অনুগত নববধূর মতো মাথার ঘোমটা টেনে নিঃসঙ্কোচে আকবরের জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়।

এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের গ্রন্থিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে আলী আকবরের চেতনাপ্রবাহধর্মী স্মৃতিরাশি, যার কেন্দ্রীয় অভিমুখ তার বাবা। এই একটি মানুষের ভূমিকা তার মনোলোকে যে-ভয়াবহ অভিঘাত সৃষ্টি করে, তার পরিণতিতে আলী আকবরের জীবনপ্রবাহ নেতি ও নাস্তির পথে চালিত হয়। এতে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে তার আঘাতপ্রাপ্ত মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা দুটি কেন্দ্রীয় ভাবাবর্ত। প্রথমত; সারাজীবন বাবার দ্বারা বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হবার ফলে তার প্রতি জমে ওঠা বিরূপতার প্রতিকার। দ্বিতীয়ত; নারীসংসর্গের প্রতি দুর্বার আসক্তি। যা পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন, ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও প্রচলিত নৈতিকতাকে তাচ্ছিল্য করে নিজের কামাসক্তিকে যেকোনোভাবে চরিতার্থ করার তৎপরতা। এক্ষেত্রে তার পিতা কর্তৃক মায়ের নিগৃহীত যাপিত জীবনের প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাবও ক্রিয়াশীল রয়েছে। কাজেই বাবর চৌধুরীর রক্ষণশীলতা ও দাপুটে ব্যক্তিত্বের অনুশাসনে জর্জরিত কিশোর আলী আকবরের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক বিকাশ প্রতিরুদ্ধ হবার অনুকূল প্রতিবেশ তাকে পরিণত বয়সে যে-হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও কামতাড়িত পশুর পর্যায়ে অবনমিত করে এবং তার সান্নিধ্যে অচিরেই নীহারের মনোবিকলন ঘটে; তা শুধু এ দুই নর-নারীর ব্যক্তিজীবনের সংকট নয়। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোভুক্ত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল; এর অন্তর্গত বাসিন্দাদের চেতনালোকে সন্নিহিত বিকারগ্রস্ততা, তাৎপর্যহীন সংকীর্ণ জীবনদৃষ্টি ও ভোগাকাঙ্ক্ষী মূল্যবোধে অবাধ আসক্তির যথেচ্ছ সমাবেশ।[১১] যার সংক্রমণ থেকে ব্যক্তি আলী আকবরও মুক্ত ছিল না।

শওকত আলী তাঁর এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন, আমাদের নৈতিকবোধ ও সামাজিকবোধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নৈতিক সততা ব্যক্তির নিজস্বতার ওপর নির্ভরশীল আর সামাজিক মান-মর্যাদা তার বাইরের খোলস মাত্র। এ দু'য়ের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নেই। আমাদের সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি, সদাসৎ, শুভাশুভ, স্থিত চিত্ততা ও অব্যবহিত চিত্ততা সম্পর্কিত ধারণা শওকত আলীর উপন্যাসে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। যাতে আমাদের ধরাবাঁধা সূত্রগুলো বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাঁর চরিত্র–চিত্রণে এমন এক সার্বজনীনতা আছে, যা আমাদের কাছে টানে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সমস্যাকে আমাদের নিজস্ব সমস্যা বলে মনে হয়। আমরা প্রত্যেকেই তখন আলী আকবর হয়ে যাই। নিজ নিজ অপরাধের দ্বারা আমরা তাড়িত, পীড়িত ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শুদ্ধতার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কারণ শুদ্ধতাতেই ঘটে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।[১২] ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম-আবিষ্কার ও যন্ত্রণাসহ আত্মোপলব্ধির যে- সূচনা *Crime and Punishment* উপন্যাসে দস্তয়ভস্কি শুরু করেছিলেন, আধুনিক কথাসাহিত্যে তার বিস্তার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এ ধারার অন্যতম একজন হচ্ছেন গ্রাহাম গ্রিন। তাঁর *The Heart of the Matter* উপন্যাসে আত্মোপলব্ধির প্রয়াস সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ তিনি নিজে রোমান ক্যাথলিক মতবাদ দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। এ উপন্যাসের নায়ক সাম্রাজ্য-স্বার্থ

রক্ষায় চালিত হয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে। এরপর একসময় বিবেকতাড়িত হয়ে নিজে আত্মহত্যা করে। অথচ শওকত আলীর এ উপন্যাসের নায়ক আলী আকবর তা করেনি। বরং নিজ কৃতকর্মের দায়ভার নিষ্পাপ নীহারকে চরমভাবে বহন করতে দেখে বিবেক দংশনের শিকার হয়ে অশুদ্ধ সত্তা (in-authentic being) থেকে শুদ্ধ সত্তায় (authentic being) উপনীত হয় এবং শুভবোধের জাগরণ ঘটে। যা আমাদের জগদীশ গুপ্তের *অসাধু সিদ্ধার্থ* এবং সৈয়দ শামসুল হকের *অনুপম দিন* ও *খেলারাম খেলে যা* উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন পাপ-অপরাধবোধ এবং এ থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন ফ্রাসোয়াঁ মোরিয়াক। পাপীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি বিদ্যমান থাকলেও তিনি পাপীকে স্পষ্ট করে তুলেন। দেহের আকর্ষণের সঙ্গে পাপবোধ সম্পৃক্ত থাকায় আত্মা ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

শওকত আলীর নায়ক আলী আকবরের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু তা নৈতিকতাবোধ থেকে উদ্ভূত নয়। বরং এ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে সমাজকর্মের মধ্যে থেকে। সমাজকর্মের মধ্যে পরিক্রমণশীল মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব এটি এবং তা বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত। এই দ্বন্দ্ব এসেছে কখনো প্রজন্মগত বিচ্ছিন্নতা থেকে, কখনো স্বদেশত্যাগের বিচ্ছিন্নতা কিংবা শৈশবের স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা। এরূপ বিচ্ছিন্নতার সমাবেশ দেখা যায় শওকত আলীর *ওয়ারিশ*, *বসত*, *জননী* ও *জাতিকা* এবং *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* উপন্যাসেও। এ ধারাবাহিক প্রজন্মগত বিচ্ছিন্নতার তীব্র কষাঘাত করেই লেখক বাবর, হুমায়ুন, আকবর, শাজাহান ও জাহানারা চরিত্রের নামকরণ করেছেন। এসব চরিত্রের ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা ঐতিহাসিকভাবেও স্বীকৃত।

শওকত আলী একজন অস্তিত্ববাদী এবং জীবনঘনিষ্ঠ লেখক। কারণ অস্তিত্বহীনতা সত্য হলে জীবন মূল্যহীন হয়ে যায় এবং মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। এমন সঙ্গহীনতার নামই বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়। জীবন-জগৎ ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতার নামই নাস্তি। যা অসঙ্গতি বা absurdity-এর সমগোত্রীয়। এর সফল প্রয়োগ দেখা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য* ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *শ্যাওলা* উপন্যাসে। কিন্তু শওকত জীবনের এ ক্রমজটিল হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, স্থবিরতা, নিঃসঙ্গতা ও বিষাদময়তার মধ্যেও সামগ্রিক মানব (total man) ও তার প্রতিশ্রুতির (commitment) পথরেখা আবিষ্কার করেন। বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিবেশে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের ভিতরের ক্রোধ ও অসহায়তাকে উদ্ভূত বাস্তবতার সঙ্গে ধরতে চেয়েছেন শওকত আলী। মতি নন্দী, দেবেশ রায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনিও নতুন করে জীবনের মানে খুঁজেছেন। 'আত্মপ্রীতিই যে-মানুষের সকল কাজের মূল'– এমন চরম সত্যই ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। তিনি নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মুখোশটা নির্মমভাবে উন্মোচিত করেছেন। পাপবোধ ও শাস্তি– চরিত্রের যন্ত্রণাসহ উলব্ধির বিশ্লেষণই এ যুগের মানুষের আত্ম-আবিষ্কার। এটিই সাম্প্রতিক উপন্যাসের আধুনিকতা। এ আধুনিকতার আলোকে শওকত আলীর *গন্তব্যে অতঃপর* উপন্যাসটি উজ্জ্বল।[১৩] মাত্র চার রাত তিন দিনের মূল ঘটনাস্রোতে শওকত আলী প্রায় চল্লিশ বছরের সময়প্রবাহকে পশ্চাৎঝলকের মাধ্যমে জুড়ে দিয়েছেন। যেখানে দাঙ্গা, দেশভাগ, সামন্তবাদের ভাঙন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের উত্থান, ক্রমবিকাশমান মধ্যবিত্তের প্রথা-প্রগতির দ্বন্দ্ব, নগরায়ণের সম্প্রসারণ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর দুরবস্থা, সামরিক দুঃশাসন,দুর্নীতির দৌরাত্ম্য, নগরজীবনের পাপ-পঙ্ক ও পলায়নপর জীবনজিজ্ঞাসাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায়, শওকত আলী স্বাধীনতা-পরবর্তী বিরুদ্ধ সময়ের বিনষ্টি, মূল্যবোধের অবসান, সুস্থ জীবনবোধের ধস, রাজনীতির অবক্ষয়, সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে চোখ মেলে তাকিয়েছেন এবং দেখেছেন বিপন্ন স্বদেশভূমিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের উপন্যাস-শিল্প জটিলতর হয়ে ওঠে। ভাষা ও সংলাপের গুরুত্ব বেড়ে যায়। চেতনলোক থেকে অবচেনলোকে চরিত্রের যাত্রার ইঙ্গিত বহনকারী হিসেবে ভাষা ও সংলাপ হয়েছে উজ্জ্বল, প্রসাধিত ও জটিল। কনফেশ্যন ও ডিটেকশ্যন– অপরাধের স্বীকারোক্তি ও জীবনের সত্যান্বেষণ সাম্প্রতিক উপন্যাসের লক্ষণ। ফলে উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতাবোধ ও বিষাদময়তা প্রভাববিস্তারী হয়ে উঠেছে। যার সুস্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে শওকত আলীর *গন্তব্যে অতঃপর* উপন্যাসে। *গন্তব্যে অতঃপর* মনোবাস্তবতা রূপায়ণের ধারায় এক স্বতন্ত্র সংযোজন।

ভালোবাসা কারে কয়

ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮খ্রি.) শওকত আলী রচিত বিকাশমান নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাপিত জীবন ও ক্রমজটিল মনস্তত্ত্বনির্ভর এক উপন্যাস। এতে নাগরিক প্রেমের সংরাগ প্রবল হলেও দেশভাগের অভিঘাতটিও উপেক্ষিত হয়নি। কারণ দেশভাগ বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক অস্থিরতা,

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বৈষম্য প্রভৃতি মিলে এ বাংলা অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনকে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিমাত্রই সমাজের বিদ্যমান এ ব্যাধি ও ভেদরেখার বিষফল তাঁদের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। শওকত আলীর *ভালোবাসা কারে কয়* উপন্যাসটিও এমন বাস্তবতানির্ভর এক সংযোজন। জটিল নাগরিক বাস্তবতায় যাপিত যে-জীবন তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ক্ষয়-ধস ও অবসাদের বিশ্বস্ত দলিল শওকত আলীর *ভালোবাসা কারে কয়*। 'উপন্যাসটি সেই বিশেষ মনোবাস্তবতার রেখাচিত্র; যেখানে ব্যক্তির বিপন্নতা ও অতৃপ্তির চোরাফাটল গোপনে তৈরি করে বিমর্ষতা, নৈঃসঙ্গ্য ও সীমাহীন ব্যর্থতা। উপন্যাসটির আয়তন পরিমিত হলেও এতে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তির অন্তহীন যন্ত্রণার কথা, তাদের মনোদৈহিক প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়া এবং একের সঙ্গে অন্যের ক্রমাগত সংঘাত-মিলন ও বৈপরীত্যের কথা'।[১৪] এখানে একটি বিশেষ সময় , সমাজ ও রাজনীতির ভাঙাগড়া কিংবা ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বিবিক্তি ও বিচ্ছিন্নতাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

লীলা পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট এলাকার মহী মাস্টারের মেয়ে। দেশভাগের সময় লীলা ছিল কিশোরী। বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহী মাস্টারের মধ্যে জেঁকে বসা প্রথা ও প্রগতির দ্বন্দ্ব এবং এর প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়ে কিশোরী লীলার ওপর। তাই লীলকে স্কুলে পড়ার সমান্তরালে বাড়িতে বসে প্রতিবেশী জমিলা নানির কাছে আমপারা- কুরআন শিখতে হয়। তবে শৈশব থেকেই তার গানের গলা চমৎকার থাকায় এবং যেকোনো গান শুনেই গলায় তুলতে পারার আশ্চর্য প্রতিভা থাকার পরেও শুধু পারিবারিক অনুশাসনেই সে-পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া সাইকেল চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেও তাকে অনুরূপ বিধি-নিষেধ ও ধমকের মুখোমুখি হতে হয়। নিজের ওপর আরোপিত পারিবারিক অনুশাসনের বিষয়ে লীলা জানায়–

> 'সাইকেল চড়া শিখতে চেয়েছিল, কী ধমক বাপের। মাস্টারের কাছে গান শেখার বায়না ধরেছিল বলে কি মারটাই না খেতে হয়েছিল মায়ের হাতে। বোরখা কিনতে পয়সা লাগে বলেই সম্ভবতঃ মেয়েকে বোরখা ধরাননি আব্বা। নইলে তাকে বোরখায় শরীর মাথামুখ ঢেকে ইস্কুলে যেতে হত।'-[ভা.কা.ক; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬/পৃ.২৭০]

গান গাওয়া নিয়ে লীলা একাধিকবার বাধার মুখে পড়ে। প্রতিবেশী টুলুভাবীদের বাড়িতে আসা হরিপদ মাস্টারের কাছে গান শেখার আবদার করায় তার মা বিরক্ত হয়ে 'চ্যালাকাঠের ঘা ঝেড়ে দিলেন বেশ কয়েকটা। একেবারে পিঠের ওপর।' তারপরেও লীলার গান শেখার ইচ্ছায় ভাটা পড়েনি। ফলে স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সে তিনটি গান গায়। তবে এর ফলও সুখকর হয়নি। এ নিয়ে এলাকায় নানা কথার জন্ম নেয়ায় তার বাবা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। বাবার দেয়া বিধিনিষেধও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বারো বছরের লীলার পড়ালেখার স্পৃহাকে দমাতে পারেনি। বাবার সহকর্মী এবং ছোট খালার ভাসুরঝির দেবর সমিরউদ্দিনের উৎসাহ ও সহযোগিতায় লীলা *সঞ্চিতা*, *সঞ্চয়িতা*, *গীতবিতান*, *মেজদিদি*, *রামের সুমতি*, *পরিণীতা* ও *দত্তা* প্রভৃতি বই পড়ে। পারিবারিক এ বিরূপ প্রতিবেশের সঙ্গে লীলার জীবনে এসে যুক্ত হয় দেশভাগের অভিঘাত। দেশভাগের এ টালমাটাল অবস্থা সম্পর্কে লীলা বলে–

> 'ঐ সময় দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল। তাদের ছোট শহরে দুদিন চাঁদ তারা মার্কা সবুজ সাদা ফ্ল্যাগ উড়ল। সে দুদিন হিন্দুদের মুখ চুপ। সবাই মেয়ে বউদের নিয়ে স্টেশন মুখো। গাড়িতে তখন ভয়ানক ভিড়।...কিন্তু মাত্র দু-তিনটে দিন। হঠাৎ একদিন পোঁ পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল বিকেল তিনটের দিকে। জয় হিন্দ জয় হিন্দ বলে তিনরঙা চরকা মার্কা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল; বন্দে মাতরম–বন্দে মাতরম।'-[ভা.কা.ক./পৃ.২৮০]

দেশভাগের কারণেই সমিরউদ্দিন যেমন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তেমনি এলাকার তপনরাও সপরিবারে কাটিহার গিয়ে বসতি গড়ে। দেশভাগ বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজে সীমাহীন ব্যথা–বেদনা ও আর্থিক দৈন্যদশা বয়ে আনে। সবাই নিজ জন্মভিটা, জমিজমা বিক্রি-বন্দোবস্ত করতে নানা রকম ঝুট-ঝামেলা ও প্রতারণা-হয়রানির শিকার হয়। তাই বালুরঘাটের স্থানীয় হাজারী লাল আগরওয়ালা লীলার বাবার বসতবাড়ি ও বাগানের দাম দিতে চায় মাত্র ছয় হাজার টাকা। আবার তার ভাই মামুনকেও স্থানীয় হিন্দু বখাটেরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। একেকদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে ইটের টুকরো এসে পড়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক এমন চরম অস্থিরতা চলাকালে লীলার মানসভুবন ও জীবনভূগোল আরেক অশ্বস্তির সংস্পর্শে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এসময় সে কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করে। তাই দেখা যায়–' যে ফিনফিনে হাল্কা মেয়ে তীরের মতো ছুটত, তরতর করে পেয়ারা গাছে উঠে পড়তো, সেই মেয়ে হঠাৎ একদিন বড় হয়ে গেল।' তাই ডাংগুলি খেলতে গিয়ে প্রতিবেশী হারান দত্তের ছেলে ট্যারা বিনয় তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের ওপর চুমু দিয়ে প্রেম নিবেদন

করে। ‘থুঃথুঃ- তুই কী রে!’– বলে লীলা নালিশ করে বিনয়কে শায়েস্তা করার ভয় দেখায়। প্রেম সম্পর্কে তখনো লীলার সম্যক ধারণা গড়ে না ওঠায় এ ঘটনা তার মনে তেমন রেখাপাত করেনি। তবে এ ঘটনা ফাঁস হওয়াতে লীলাকে তার ভাই মামুনের কয়েকটি থাপড় হজম করতে হয়। আবার এ সময় তার বান্ধবী সখিনা উত্ত্যক্ত করার জন্য তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কিন্তু লীলা আমল না দেয়াতে সখিনা তার মুখের ওপর বলে –‘বুঝবি একদিন, বুকে হাত দিলে কী হয়?’ সখিনার এ মন্তব্যের মর্মার্থ লীলা এর কিছুদিন পরেই বুঝতে পাড়ে। বেড়াতে আসা সন্তানসম্ভবা মুনিরা বুবুর স্বামীর তাকে আম পারার জন্য গাছে ওঠায় এবং নামার সময় সাহায্য করার ছলে–

> ‘একেবারে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল জোরে। পেছন থেকে জাপটে বুকের দুদিকে প্রায় খামছে ধরল আর কচলাতে কচলাতে বলতে লাগল, আয়রে শালী তোকে একটু সেয়ানা করে দেই, দেখ সেয়ানা হতে কেমন লাগে।’-[ভা.কা.ক./পৃ.২৭৪]

এমন পাশবিক ও কদর্য ব্যবহারের মুখোমুখি হয়ে লীলা নারী-পুরুষ সম্পর্কের ধরন ও তার নারীসত্তার উপস্থিতি টের পায়। আর ‘ঐ দিনই সে বুঝেছিল সে একা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কেউ আছে, সে অন্যকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়।’ এসময় ভাই মামুনের বন্ধু এবং বান্ধবী উমার ভাই তপনের সঙ্গে লীলার প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বন্ধুর সঙ্গে বই দেওয়া-নেওয়ার সূত্র ধরেই লীলা-তপনের হার্দিক সম্পর্ক গাঢ় হয়। *বিজয়া*, *রমা* ও *পথের দাবী* তপনের দেয়া বইগুলো পড়ে লীলার মানসলোকের স্বপ্ন ও বাসনা পাখা মেলতে শুরু করে। ‘আমার অসুখ, বইটা দিও’–জীবনের প্রথম প্রেমপত্রের এ সম্মোহনী আকর্ষণে লীলা সকল বাধা, অনুশাসন, লাজলজ্জা ও সংকোচ মাড়িয়ে তপনদের বাড়ি যায়। যার ফলও লীলার জন্য সুখকর হয় না। এ ঘটনা জানাজানি হলে লীলাকে তার বাবা-মা কড়াশাসন করে আর তপনকেও তাদের বাড়িতে আসতে বারণ করে। কারণ হিসেবে লীলা জানায়–

> ‘এ হল সেই সময়ের ঘটনা যখন পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের যুগ। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের যুগ।...একদিন আব্বা খুব শাসন করেছিলেন– খবরদার বাইরে যাবে না। মা চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিলেন–গালাগাল দিয়ে বললেন, হারামজাদী বংশের মুখে চুনকালি দিতে চাস। ফের যদি বাইরে পা রাখবি তো ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব একেবারে।’-[ভা.কা.ক./পৃ.২৭৯]

একদিন তাদের বাড়িতে তপনকে দেখতে পেয়ে লীলার মা কায়দা করে বলেন–‘তুমি বাপু এভাবে এসো না। আমাদের ঘরের মেয়েদের বাইরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা বারণ, সেটা তো জানো।’ এসময় দেশভাগের উত্তেজনায় স্থানীয় হিন্দু -মুসলমানদের সম্পর্কও ক্রমশই তিক্ত হয়ে ওঠে। কিছুদিন পর তপনরা সপরিবারে কাটিহার চলে যাওয়াতে লীলার এ প্রেমও আর অগ্রসর হয় না। এখানেই এর সমাপ্তি ঘটে। এসময় বাড়িতে লীলার ফুপা হাজি সাহেব এসে তার বিয়ের ব্যাপারে মহী মাস্টারকে তাগিদ দেন। ঋতুবতী হবার পরেও লীলাকে বিয়ে না দেয়ায় শরিয়তের বরখেলাফের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন। আর বলেন–‘মহী মিয়া! জানো, তুমি কী রকম গুনাহগার হচ্ছ? প্রত্যেক মাসে তোমার গুনাহার বোঝা বাড়ছে, সে খেয়াল রাখো? বালেগ মেয়েকে কোনো মুসলমান বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখে কখনো?...ওরকম মেয়ে যে-বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির দানা পর্যন্ত আমার জন্য হারাম, জানো তুমি?’ ভগ্নীপতি হাজি সাহেবের এমন কথায় মহী মাস্টার লীলার বিয়ের উদ্যোগ নেন। এসময় কমলাপুরের চৌধুরীদের বাড়ি এবং চন্দনবাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। কিন্তু ‘মেয়ের নাকি স্বভাব খারাপ, মেয়ে গান গায়’–এমন অপবাদ আর অজুহাত দেখিয়ে দুটি সম্বন্ধই নাকচ হয়ে গেলে তার মা রাগে-ক্ষোভে লীলাকে বলেন–

> ‘মরে যা পোড়ামুখী, মরে গেলে তোর গোরে আমি বাঁশ চাপ দেব। তুই মরলে আমার হাড় জুড়োয়। বল কবে মরবি রাক্ষুসি–আজরাইল তোকে চোখে দেখে না।’-[ভা.কা.ক./পৃ.২৮২]

লীলাকে বিয়ে দিতে না পেরে এবং বসতবাড়ি ও জমিজমার বন্দোবস্ত না করার কারণে মহী মাস্টার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়েন। ‘শালারা এখনও এদেশে আছে? সাফ করে দেয় না কেউ।’– ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা থেকে আগত শরণার্থী হিন্দুদের এমন কথায় মহী মাস্টার ভয় পেয়ে যান। ফলে লীলাকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন। মামার বাড়িতে এসেও লীলার জীবন নতুন জটিলতার আবর্তে জড়ায়। কারণ এ সময় কলকাতা কলেজের ছাত্র লীলার মামাতো ভাই হায়দারের বিয়ে উপলক্ষ্যে তার কলেজ বন্ধু আনিসের এ বাড়িতে আগমন ঘটে। জ্যোৎস্না রাতে ঘরের ছাদে বসে লীলার গাওয়া– ‘পরম লগন করো না হেলা; তোমরা ডাকো; শুকনো পাতার নূপুর পায়ে’ গান শুনে ও সুশ্রী চেহারা দেখে হায়দার তার প্রেমে পড়ে। ঘুমন্ত অবস্থায় লীলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় আর রাহেলার পরিবর্তে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আর বলে–‘বল, আমার বউ হবি তুই?...তোকে না পেলে আমি বিষ খেয়ে মরব’।

হায়দারের এ পাগলামির কথা জানাজানি হলে এর দায় ও দোষ গিয়ে পড়ে লীলার ওপর। চারপাশের ভয়ংকর লোভ, ভয় আর বৈরিতার মধ্যে দিনযাপন করাকেই লীলা নিজের নিয়তি বলে বুঝতে শেখে। এ খবর লীলাদের বাড়ি চলে যাওয়াতে তার ভাই এসে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু এখানে থাকার সূত্রে হায়দারের বন্ধু জঙ্গীপুরের আনিসের সঙ্গে লীলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লীলাদের বাড়িতে তিনদিনের অতিথি হয়ে আনিস লীলার মনের ওপর সওয়ার হয়। এতে লীলার মায়েরও এক ধরনের প্রশ্রয় দেখা যায়। কারণ দেশের উত্তপ্ত পরিবেশে তিনি মেয়েকে অবিবাহিত রেখে মানসিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাই যাবার আগের দিন সন্ধ্যার পর ঘরের পেছনে আনিস লীলাকে জড়িয়ে ধরে আর প্রেম নিবেদন করে বলে–'বলো, তুমি আমার হবে? বলো, কারও হবে না; বলো, তুমি আমার বউ।' এভাবে আনিস চলে গেলে লীলার মানসলোকে তা গভীর আলোড়ন তুলে। ফলে সে বাবা-মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সালোয়ার-কামিজ বাদ দিয়ে শাড়ি পড়ে আর ভাবে –

'হ্যাঁ, প্রথম পুরুষ, ঐ আনিসই। প্রথম প্রেম নয়, প্রথম আকর্ষণ নয় শুধু– সে হল তার জীবনের প্রথম পুরুষ।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩০১]

কিন্তু লীলার এ প্রেমও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ একদিকে প্রেমিক আনিসের ভীরু মানসিকতা এবং আরেক দিকে আনিসের বাবা মীর্জা গোলাম আলী খাঁর নগদ দশ হাজার টাকা ও গহনার যৌতুক দাবি– লীলার প্রেম ও পরিণয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ল পাশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা এবং অন্তত পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করার নির্দেশ সংবলিত আনিসের চিঠি পেয়ে লীলা হতাশ হয় এবং প্রেমিকের পূর্বপ্রতিশ্রুতির বিষয়ে সন্দেহ জাগে। মহী মাস্টারও আটচল্লিশ সনের দিকে দেশভাগ- পরবর্তী হুজুগের শিকার হয়ে তার জায়গাজমি ন্যায্য দামে বিক্রি করতে ব্যর্থ হন। আবার লীলার মা দুই ভাইয়ের কাছে তার ওয়ারিশ বাবদ কিছু টাকা চাইলেও স্বার্থঘেরা ও সুযোগসন্ধানী ভাইয়েরা প্রসঙ্গটি কৌশলে এড়িয়ে যায়। উপরন্তু লীলার নকুমামা ভাগ্নীর বদলে নিজের মেয়ে রীনাকে আনিসের সঙ্গে মোটা যৌতুকসহ বিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। আবার পূর্ব আক্রোশবশত ট্যারা বিনয় একদিন লীলার ভাই মামুনের মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং মহী মাস্টারের সঙ্গে হিন্দু সহকর্মীরা অপমানজনক ব্যবহার আরম্ভ করে। এভাবে সব দিক থেকেই মহী মাস্টার ক্রমশই জটিল অবস্থায় পড়েন। ফলে মহী মাস্টারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লীলার জীবনে আনিসের পরিবর্তে সমির উদ্দিনের আগমন ঘটে।

উনিশ শতকে বাংলায় জাগ্রত রেনেসাঁর আলো হিন্দু সমাজকে আলোকিত-বিকশিত করলেও মুসলিম সমাজকে সেই অর্থে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি। কারণ ইসলাম-প্রীতি, আলীগড়ী ঘরানা, ব্রিটিশ-বিদ্বেষ, শরিয়তি সংস্কার, আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে দ্বিধা, সাবেক সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা তখনো মুসলিম সমাজ ছিল আক্রান্ত। তাই এ প্রথা ও প্রগতির অনিবার্য দ্বন্দ্বের ফলে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মেয়েরা মুক্তি পায়নি। বরং সমাজশাসন, বিধি নিষেধ ও পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষু নারীর মনোদৈহিক বৃত্তির ওপর নানা অবরোধ আরোপ করে। যা থেকে লীলাও মুক্তি পায় না। তাই দেখা যায় নিজের পিতার বয়সী সাবেক স্কুলশিক্ষক, পূর্বপাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী ব্যবসায়ী সমিরউদ্দিনের সঙ্গে লীলার বিয়ের কথা চলে। 'তুমি দমে যেও না–ঐ ইস্কুলে না গেলেও তোমার চলবে–পড়াশোনা ঘরে বসেও হতে পারে'–বলে যে সমিরউদ্দিন পূর্বে তাকে উৎসাহ দিত, সে লোকই কৌশলে প্রথমে নিজের অশিক্ষিত ভাতিজা ওদুদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং পরে নিজেই বর সেজে বসে। এ বিয়েতে মামুন ও লীলার মায়ের সম্মতি ছিল না। তাই তিনি স্বামী মহী মাস্টারকে প্রতিবাদ করে বলেন–'না, ও হয় না। মেয়েকে বরং আমি বিষ খাইয়ে মারব। ঐটুকু মেয়ে আমার, ওর সঙ্গে বিয়ে হবে ঐ বুড়ো হাবড়ার!' লীলাও আনিসের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাবার পর নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে। এভাবে স্বপ্ন আর স্বপ্নহীনতার টানাপোড়নে বৈশাখের ঝড়োবাতাসে লীলা দেখতে পায়–'আমবাগানের আম ভর্তি ডালপালা আরো নুয়ে পড়ছে, আকাশ ভরানো রোদ গাঢ় হয়ে উঠেছে আর তার ওপরে তার স্বপ্ন একবার ফুটছে, একবার মিলিয়ে যাচ্ছে।' তারপরেও লীলা লজ্জা-শরম ভুলে প্রেমিক আনিসের উদ্দেশ্যে কলকাতায় শেষ চিঠি পাঠায় আর বলে–

'তুমি যখন আমাকে বউ বলে ডেকেছিলে, কই তখন তো আমার কাছে টাকা ছিল না। গয়না ছিল না। তবে এখন কেন ওসব চাইছ। তোমার বউকে এসে অন্যে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তুমি কিছু একটা করো।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩০৪]

অথচ প্রেমিক আনিস লীলার এ অসহায়ত্বের সময়ও তেমন বল-ভরসার বাণী শোনায়নি এবং সাহসী কোনো পদক্ষেপও নেয়নি। উপরন্তু 'তোমার আব্বা যদি হাতটা একটু খোলেন তাহলেই তো সবকিছু সহজ হয়ে যায়। আমার আব্বার চাহিদা আমি একটু কমিয়ে আনতে পারবো'–এমন দায়সাড়া ও কাণ্ডজ্ঞানহীন জবাব পেয়ে লীলা একেবারে নীরব-নির্বাক হয়ে যায়।

যার ফলে খুব চুপচাপে ও মানুষের অগোচরেই সমিরুদ্দিনের সঙ্গে ষোলো বছরের লীলার বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং বিধিনিষেধের ঘেরা দেয়ালে সে বন্দি হয়ে পড়ে। লীলার বিয়ের ব্যাপারে লেখক জানান-

'না, লীলা কাঁদেনি। ষোল বছর বয়স বলেই সম্ভবতঃ ঠিক পুরো বোঝেনি তার কী হয়ে গেল। ক্ষোভ ছিল, অভিমান ছিল, কিছুটা রাগও ছিল। কিন্তু সে-সবই যেন শখের কোনো জিনিস না পেলে যেমন হয়-তেমন।'-[ভা.কা.ক/পৃ.৩০৪]

তবে এ বিয়ে লীলার জীবনে সুখ-স্বপ্ন বয়ে আনেনি বরং বাসর রাতই তার কাছে বৈধব্যের রাত হয়ে ওঠে। বাসর রাতেই স্বামী সমিরউদ্দিনের ভণ্ডামি, কুরুচি ও পাশবিকতার স্বরূপ জানতে পেরে তার অবশিষ্ট স্বপ্নসৌধগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কারণ–

'সেই প্রথম রাতেই বিয়ের সব অভিজ্ঞতা হয়ে গেল লীলার। স্বামী নামক পুরুষ মানুষটি তার শরীরটা ইচ্ছেমতো চাপল, পিষল, চুষল, বিদ্ধ করল এবং এক সময় ক্লান্ত হয়ে পাশে শুয়ে নাক ডাকতে আরম্ভ করল। আর ষোল বছরের লীলা অন্ধকারের মধ্যে দু'চোখ মেলে জেগে রইল, যদিও ঘরের মধ্যে শরৎ রাতের জ্যোৎস্না এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।...শেষ রাতের দিকে দ্বিতীয়বার লীলাকে ভোগ করতে উঠলে লীলা কেঁদে উঠেছিল। ফলে সে আর জোর করল না , কিন্তু সম্পর্কও রাখল না।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩০৫]

এমন পাশবিক আর কদর্য ব্যবহারে প্রথম রাতেই স্বামী নামক নারীখেকো বাঘ সম্পর্কে লীলার এক বিরূপ ধারণা মনে জেঁকে বসে। 'তোমার মতো বড়সড় গড়নের আমার একটা বউ দরকার ছিল। ছোটখাটো মেয়েদের আমার ভালো লাগে না। বেশ স্ট্রং, তেজী, সাহসী–এরকম না হলে ব্যক্তিত্ব ফোটে না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে আমার এই একটা লাভ হল। আমি একটা সুন্দর বউ পেয়ে গেলাম।'–সমিরউদ্দিনের এমন লালসাপূর্ণ মানসিকতা, প্রতারণায় লীলার প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক হয়। তার প্রথম বিয়ের তথ্য প্রকাশ পাওয়ায় লীলা স্বামী থেকে নিজেকে যোজন যোজন দূরের বাসিন্দায় পরিণত করে। তাই ষোলো বছরের রক্তাক্ত, অপমানিত, অবদমিত ও অতৃপ্ত লীলা স্বামীর উদ্দেশ্য ক্ষোভের সঙ্গে বলে–

'এ বাড়িতে আরো একজন বউ ছিল, সে কোথায়?'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩০৭]

নববধূর এমন অভাবনীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সমিরউদ্দিন কৈফিয়তের সুরে শুধু জানায়–'সে অনেক কথা–পরে শুনো'। সমিরউদ্দিনের এমন প্রতারণা ও ভণ্ডামির পরিচয় জানতে পেরে স্বামী ও সংসার বিষয়ে লীলার মন বিষিয়ে ওঠে। তাই নিজের জীবন সম্পর্কে লীলার সিদ্ধান্ত–

'জীবন এরকমই–এসবই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু মনের যে আরেকটি দিক, যেদিকটায় তার গান ছিল, খুশি ছিল, স্বপ্ন ছিল–সেদিকটায় সহজ হবার উপায় ছিল না। খুব চাপা হয়ে, খুব ছোটো হয়ে, একেবারে দমবন্ধ অবস্থায় এসে পৌঁছালেও তার মনের সেই দিকটা সম্ভবতঃ টিকে থাকল এবং ঐ প্রথম থেকেই ঘাড় বাঁকা করে মাথা তুলে রাখতে চাইল।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩০৬]

লীলা বাবার বাড়ি বালুরঘাট গ্রাম থেকে শ্বশুর বাড়ি মহিমপুরে এসে দুই বছর কাটায়। এ দুই বছরে সে ম্যাট্রিক পাশ করে। এখানেই একদিন সমিরউদ্দিনের ভাতিজা ওদুদ (যার সঙ্গে লীলার বিয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল) সুযোগ বুঝে কাকিমা লীলাকে জড়িয়ে ধরে এবং চুমো খেয়ে পালিয়ে যায়। সামাজিক বিধি-বিধান অনুযায়ী লীলার প্রথম বিচ্যুতি বা স্খলন শুরু হয় বিয়ের পর। দিনে দিনে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বামী সমিরুদ্দিনের মধ্যে অর্থের অহংকার ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বামীকে ভালোবাসার মতো কোনো অবলম্বন সে খুঁজে পায় না। যদিও সমিরউদ্দিন ধানমণ্ডিতে বাড়ি করে লীলাকে আই.এ. পাশ করায়, গাড়ি চালানোর সুযোগ করে দেয় এবং গান গাওয়াসহ সংস্কৃতি চর্চার অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়। কিন্তু স্ত্রী লীলার মনের চাওয়া-পাওয়ার প্রতি তেমন গুরুত্বই সে দেয় না। কারণ সমকালীন নব্য পুঁজিবাদী সমাজে সোসাইটি চষা সুন্দরী-সুশিক্ষিতা-সুমার্জিত স্ত্রীরা ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি না পেলেও তারা স্বার্থসিদ্ধির সোপান হিসেবে বিবেচিত হতো। ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্যই মূলত এ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বিনিয়োগ করা হতো। জীবনের মূল্যমান ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিত্তবানদের ধর্তব্যের মধ্যে পড়তো না। ফলে স্বামীর প্রতি লীলার নিদারুণ ঘৃণা জন্মায়। কারণ সমিরউদ্দিন তার প্রথম বউকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেও একেবারে ত্যাগ করেনি। এসব ঘটনা সে জেনে ফেলায় সমির উদ্দিনের সকল রাগ ও আক্রোশ গিয়ে পড়ে জেদি স্বভাবের লীলার ওপর। আর তাই–

'কোথায় সে স্ত্রীর মন পাওয়ার চেষ্টা করবে, তা না করে সে প্রতিরাতে স্ত্রীকে রেপ করতে লাগল। শারীরিক অসুস্থতাতেও কোনো রেহাই নেই। ঐ হল তৃতীয় ঘটনা। সে ঘটনা ফুরিয়ে গেল না; কেবল বাড়তেই থাকল। ঝড়ের আরম্ভ ঐ ঘটনা থেকেই।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩১৮]

এরকম অবস্থাতেই লীলার মেয়ে সুমির জন্ম হয়। সব মিলিয়ে লীলা স্বামী-সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার প্রস্তুতি নিলেও তাদের দাম্পত্য জীবনের ফাটল বা চোরাগলি দিয়ে সমিরউদ্দিনের ইন্ডেটিং ব্যবসায়িক পার্টনার অবিবাহিত হামিদ

ঢুকে পড়ে। আই.এ. পরীক্ষার সময় লীলাকে পরীক্ষাকেন্দ্রে আনা-নেয়া, স্বামীর প্রশ্রয় এবং হামিদের উদগ্র রূপতৃষ্ণার কারণে উভয়ের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক গাঢ় হয়। এছাড়া হামিদের নানা অজুহাতে লীলাকে স্পর্শ করার বিষয়টিও উভয়কে ক্রমশই বেপথু করে । অথচ লীলা হামিদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও তাকে বাধা দেয় না। কারণ যা সে স্বামীর কাছ থেকে পায়নি, তা হামিদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে শুরু করে। ঢাকার সববাস, কলেজ জীবনের প্রভাব ও রেডিওতে গান গাওয়া–এসবই লীলার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আকাঙ্ক্ষাকে আরো প্রবল করে। তাই হামিদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সে আঁচ করতে পারলেও আতঙ্কিত হয় না। কারণ –

> ‘কেবলি মনে হচ্ছিল একটা প্রচণ্ড ওলট পালট কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে। কিন্তু মজা, সেজন্যে তার ভয় হচ্ছিল না–তার মন বলছিল আসুক ঝড়টা, ভেঙে চুরে দিক সব কিছু– সে দেখবে।’-[ভা.কা.ক/পৃ.৩২১]

জীবনের অতৃপ্তি, স্বপ্নভঙ্গ ও দাম্পত্যসংকটই লীলাকে ক্রমশই প্রতিশোধপ্রবণ করে তোলে। তার সকল ঘৃণা, আক্রমণ আর আক্রোশ গিয়ে পড়ে স্বামীর ওপর। তাই তার আই.এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া উপলক্ষ্যে সেলিব্রেট করার দিনেই হামিদ অনেকটা জোর করেই লীলার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। যাতে লীলার প্রশ্রয়ও লক্ষ করা যায়। কারণ–

> ‘লীলার আত্মস্থ হওয়ার ঐ হল আরেকটা ধাপ। নিজেকে চেনার আরেকটা পর্যায়।...লীলার কাছে এতটুকু স্পষ্ট হল, শরীর নামক একটা জিনিস আছে, যার ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষের অনেক কিছুই যা বদলে দিতে পারে। সেই থেকে স্বামীসঙ্গের পর নিজেকে তার দারুণ অশুচি মনে হত। ঐ একদিনই নয়, তারপর আরেকদিন, এইভাবে দিনের সংখ্যা বেড়েই চলল।’-[ভা.কা.ক./পৃ.৩২৩]

এভাবে স্বামীর সঙ্গে লীলার শুধু দৈহিক দূরত্বই বাড়ে না বরং মানসিক বৈপরীত্যও জেগে ওঠে। তবে লীলা-হামিদের গোপন বিহার ও চিঠি চালাচালি সমিরউদ্দিন ঠিকই ধরে ফেলে। টেলিফোন কক্ষে তালা দিয়েও সমিরউদ্দিন লীলাকে আটকাতে পারে না। তাই সমিরউদ্দিন লীলাকে হামিদের সঙ্গে বৈধভাবে জীবন শুরু করার সম্মতি দিলেও মেয়ে-সুমিকে নিজের কাছে রেখে দেবার দাবি জানালে সে কিছুটা ধীরস্থির হয়। ‘আমাকে সময় দাও, আর একটু অপেক্ষা করো’–এমন পরামর্শ দিয়ে হামিদকে লীলা চিঠি পাঠায়। কিন্তু এ সময় সমিরউদ্দিন জোর করে মেয়ে সুমিকে নিজের বোনের কাছে রেখে আসে। এতদিন লীলা কিছু না বললেও এবার ক্রোধে, অপমানে, গ্লানিতে ও প্রতিহিংসায় ওঠে দাঁড়ায় এবং স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ও হাতাহাতি পর্যন্ত করে। ঢাকা শহরের পথঘাট ভালো করে না চিনলেও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তার জেদের কারণে সমিরউদ্দিনের মুষ্টি যখন শিথিল হচ্ছিল, তখনই সুমি ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বার বার খবর পাওয়া সত্ত্বেও লীলা অভিমানবশত গুরুতর অসুস্ত মেয়েকে দেখতে যায় না। ফলে সুমির করুণ মৃত্যু হলে–

> ‘লীলা আছাড় খেয়ে পড়ল শক্ত মেঝেতে। জন্মজন্মান্তরের কান্না বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে চিৎকার হয়ে বেরুল এবং বার বার জ্ঞান হারাল সে। তার অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ঐ কান্নার সঙ্গেই ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তবুও শেষ সমাধান যাকে বলে; সেই সমাধানটা আর হল না।’-[ভা.কা.ক./পৃ.৩২৪]

এসময় রহস্যজনকভাবে হামিদ লন্ডন চলে যাওয়াতে লীলা সংসার নামক এ নরক থেকে মুক্তি পায় না। সুমির অসুস্থতা তাকে টলাতে না পারলেও সুমীর মৃত্যুই লীলাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। বিবাহবহির্ভূত নর-নারীর-সম্পর্ক বাঙালি সমাজবিরুদ্ধ কাজ। উচ্চতর কোনো সামাজিক দণ্ড দ্বারাও এ অপরাধ মার্জনীয় নয়। এরপরও লীলার জীবনে একে একে বহু পুরুষের আগমন ঘটে। যার পেছনে বহুবিধ কারণও সক্রিয় ছিল। কখনো তার নিষ্ক্রিয়তা, কখনো স্বামীর নির্লিপ্ততা তাকে বহুগামী করে। বাঙালি নারীর সতীত্বের ধারণার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সে প্রেমের বাতাবরণে শরীরকে সমর্পণ করে । যার সূচনা হয়েছিল কৈশোরে মুনিরা বুবুর স্বামীর হাত ধরে। তবে মামাতো বোন বীণার স্বামী কাশেমকে সে ভিন্নতরভাবে গ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কের চিহ্ন বা ফসল হিসেবে বড় ছেলে সুনন্দের জন্ম হয়। সময়ের আবর্তে লীলা-কাশেম সম্পর্কের ইতি ঘটলেও তার দোলাচলবৃত্তি শেষ হয় না। লীলা আশা করে সুনন্দকে নিয়ে কাশেম আগ্রহ-উৎসাহ দেখাক। কারণ–

> ‘লীলার একবার মনে হয়েছিল সুনন্দর কথা মনে করিয়ে দেয়। বলে, সুনন্দ ছুটিতে এসেছে, যদি চান তো চাটগাঁয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কথাটা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু বলেনি।...লীলা সেদিন কিছুই বলেনি। তবে এখন একেক সময় কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, সুনন্দকে তুমি কিছু দিয়ে যাবে না? তোমার তো অনেক আছে, অনেক তো দান ধ্যান করে যাচ্ছ, সুনন্দর ব্যাপারে তোমার কিছু ভাবা উচিত।’-[ভা.কা.ক./পৃ.২৭১]

এভাবে লীলার কোল জুড়ে আসে ছোট ছেলে আনন্দ। একই সঙ্গে তার প্রেমও থেমে থাকেনি। প্রেমিক হিসেবে তার জীবনে আগমন ঘটে জাহিদ আর হুমায়নের। তবে এ প্রেমও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ জাহিদ ছিল ‘খুব দুর্বল আর ভয়ানক লোভী।’ এছাড়া নিজের বউয়ের নামে অপবাদ দিত এবং কুৎসা রটনা করতো। আর হুমায়ন ছিল বাকচতুর ও ঠোঁটকাটা

বেহায়া স্বভাবের। কোনো কথা তার মুখে আটকাতো না। তাই সে খোলাখুলিভাবেই লীলাকে বলতো– 'তোমাকে না হলে আমার চলবে না। বউকেও দরকার, তোমাকেও দরকার। বউ হল সংসারের জন্য, আর তুমি হলে আমার ভালোবাসার জন্য।' আসলে হুমায়নের মূল লক্ষ্য ছিল বড় লোকের সুন্দরী বউ নিয়ে বিছানায় শোয়া। আবার সে লীলার কাছ থেকে কেঁদেটেদে টাকা চেয়ে নিয়ে বউকে শাড়ি-গয়না কিনে দিত। তার এ ছোটলোকি ও হীনমন্যতার কারণে এ প্রেমও আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। লীলার জীবনে শেষ পুরুষ হিসেবে আসে আহসান। সঙ্গীত নিকেতনের এক গানের আসরে তাদের পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আহসানের চেয়ে লীলার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাই ছিল বেশি। তাই দেখা যায় ঢাকার এক চ্যারিটি শোতে বিদ্যুৎবিভ্রাট ও টিকিট কাটার হট্টগোলের সুযোগে–

> 'লীলা তখন আহসানের হাত নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরল। আহসানের সম্ভবতঃ সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে হাতটা টেনে নিতে চাইল। তাকে লীলা আরো জোরে চেপে ধরল বুকের মধ্যে। কিছুতেই ছাড়বে না সে। ঐ মুহূর্তে মনের ভেতরে কোথায় যেন কাঁদছিল সে। অনেকদিনের পুরনো আর জমিয়ে রাখা যেন তার ঐ কান্নাটা। সে একবার আহসানের দু'হাত মুখের ওপর, আবার একবার তার বুকের ওপর চেপে ধরে রাখতে চাইছিল।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩১১]

এভাবেই বয়োকনিষ্ঠ আহসানের সঙ্গে লীলার গোপনবিহার চলে। ছুটির দিনে লীলা ধানমণ্ডির বাসা থেকে সকালে আহসানের মিরপুরের বাসায় যায় এবং সারাদিন ব্যয় করে বিকেলে ফিরে আসে। তবে আহসান লীলার এ দেহজ প্রেমকে স্বীকার করতে চায় না। ফলে অতৃপ্ত লীলা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তাই আহসানকে বলে–'দেখ, তোকে আমি গেঁথে তুলব বলে মনে মনে আগে থেকেই তাক করে রেখেছিলাম। বাচ্চা পুরুষকে জাগিয়ে তোলার জন্যে মেয়ে হাঁসদের কত রকম কায়দা কৌশল। যেদিন পছন্দ হবে না সেদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিস। কুত্তী বলে গালি দিস। তুই আমাকে দেখতে পাস না? অন্ধ না কী? আমার এত বড় শরীরটা তোর চোখে পড়ে না। বিয়ে করবি না, বউ বলবি না, ঘরে তুলবি না। তো আমি কি শুধু তোর কানের কাছে অনন্তকাল ধরে ভ্যাজর ভ্যাজর করে যাব'? এমন শরীরী আকর্ষণের চেয়ে প্রকৃত প্রেমের, সুখী সংসারের এবং যোগ্য সম্মানের বা স্বীকৃতির জন্যই লীলাকে বুভুক্ষু হতে দেখা যায়। তাই আহসানকে লীলা বলে–

> 'আহসান, আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দিও–আমার ভয়ানক লোভ– দেবার কিছু নেই আমার–শুধু তোমার কাছ থেকে নিতে চাই। ...ধরে নিও আমি খারাপ মেয়ে। ধরে নিও আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি। ধরে নিও আমি ভয়ানক স্বার্থপর। কিন্তু কোনোদিন, কখনো আমার অতীতকে জানতে চেয়ো না।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩২৭-৩২৮]

এভাবে লীলা প্রেমিকের কাছে নিজেকে পাপী-অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করলেও নিজের অব্যক্ত ব্যথা-বেদনার কথা ব্যক্ত করে না। বরং পাথর চাপা দেবার মতো তা মনের অতল গহ্বরেই রেখে দেয়। আবার আহসানের চরিত্রের যান্ত্রিকতা ও অতিমাত্রায় বাস্তবনিষ্ঠ স্বভাবও লীলাকে আঘাত করে। কাঙ্ক্ষিত প্রেমের সুধাও আহসানের মধ্যে পর্যাপ্ত পায় না। কারণ আহসান জার্মান মোটর অটোমোবাইল গাড়ি কোম্পানির সাবেক ইঞ্জিনিয়ার। তার প্রথম স্ত্রী রানু। রানুর বাবা ডেপুটি সেক্রেটারি। প্রেম করে পরিবারের অমতে রানু দরিদ্র ঘরের আহসানকে বিয়ে করে। পাবনার এলাহী করিমের ফার্মে চাকরি করতে গিয়ে রানু আহসানের অতীত জীবন জানতে পেরে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ইসলামাবাদ চলে যায়। কারণ আসহানের বাবা এলাহী করিমদের পৈতৃক ট্রান্সপোর্টের গাড়ি চালক থাকাকালে এক চুরির মামলায় জেল খাটেন। 'চোরের ছেলের বউ'– এমন অপবাদকে রানু কিছুতেই মেনে নিতে না পেরে রাগে-অভিমানে শুধু চাকরিই ছাড়ে না এবং সেই সঙ্গে আহসানকেও ত্যাগ করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী টুটুর সঙ্গেও আহসানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এসব প্রেমময় সম্পর্কের চেয়ে আহসানের কাছে নিজের একটি ওয়ার্কশপ গড়ে তোলাই বড় হয়ে ওঠে। তাই লীলার সঙ্গে যৌথ মালিকানায় ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করে আর নতুন দাম্পত্য জীবন শুরুর লক্ষ্য নিয়ে আহসান দিনরাত পরিশ্রম করে। প্রথম প্রথম লীলার কাছেও তা আগ্রহের বস্তু হয়ে দেখা দিলেও তাতে দ্রুত ভাটার ভাব চলে আসে। কারণ লোহালক্কড়ের সংস্পর্শে থাকা জীবন ও জীবিকার পথ তার কাছে একঘেয়ে আর প্রাণহীন মনে হয়। তারপরেও 'লায়লা আহসান' নামে লীলা আহসানের সঙ্গে যৌথ ব্যবসায়ের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে এবং দুই ছেলের জন্য দুটি চিঠি লিখে স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আর নির্ভারকণ্ঠে ঘোষণা দেয়–

> 'আমাকে এবার অব্যাহতি দাও–আমি ডিভোর্স চাই।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩৩৮]

লীলা শুধু মুখেই বলে না বরং এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাজও জোরের সঙ্গে একে একে করে। নিজের মনোভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে লীলা জানায়–'না, আর পেছনে ফেরা নয়–নতুন করে বাঁচা এখন থেকে। যত ইতস্তত করবে, ততই দেরি হবে অহেতুক। সারাটা জীবন সে এই সুযোগ পায়নি। খালি ভুল মানুষ এসে গেছে তার কাছে। আর নিজেও সে ভুল করে

এসেছে–শুধুই আঘাত করে এসেছে, শুধুই প্রতিহিংসায় আক্রমণ করেছে। এবার আর সে-রকম কিছু সে করতে যাবে না।' তাই সমিরউদ্দিনকে ত্যাগ করে আহসানের সঙ্গে ঘর বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়েই লীলা নিয়মিত ওয়ার্কশপে যায় এবং অফিসে বসে কাগজপত্রের হিসেব দেখে। তবে কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ আহসানকে ডুবে থাকতে দেখে তার মনে নানা জিজ্ঞাসা ও দোলাচল মাথা চাড়া দেয়। নিজের জীবন মূল্যায়ন করতে লীলার কেবলি মনে হয়–

> 'কী দীর্ঘ এই প্রতীক্ষা–দিনের পর দিন এভাবেই প্রতীক্ষা করতে হবে তাকে। ওয়ার্কশপের মেশিনের বিচিত্র ধরনের শব্দ, ঘাম, কুলিদের চিৎকার এই হবে এখানকার জীবন। এই জীবনের মধ্যে সে আহসানকে কোনোভাবেই অনুভব করে না।...আহসান যেন যোজন যোজন দূরের মানুষ। ভয়ানক অচেনা লাগে ঐ মুহূর্তে।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩৪৯-৩৪০]

'ভালোবাসার সঙ্গে কি কাজের বিরোধ আছে? ভালোবাসা কি জীবন থেকে সরিয়ে আনে মানুষকে না যুক্ত করে?'–আহসানের এ যৌক্তিক জবাবও লীলার ভালো লাগে না। তাই আহসানকে লীলা জানায়–'আমি তো তোমার কাছে কাজ চাই না, শুধু তোমাকে চাই আমার। এখানে তোমাকে একদম খুঁজে পাই না–এ জায়গায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে–এখানে থাকলে আমি মরে যাব–তুমি এসব বন্ধ করে দাও।' লীলার এ কথাগুলো আহসানের মর্মমূলে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়। সে কিছু না বলে কারখানার অসুস্থ সবদর মিস্ত্রিকে দেখতে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা অবধি আর ফিরে আসে না। ভয়ানক ক্লান্ত লাগলেও লীলা অপেক্ষা করে। কারণ–

> 'শেষ পর্যন্ত আহসানকে চাই তার। নিজের কাছেই অনেক বড় বাজী ধরেছে সে। এ বাজীর শেষ না দেখে সে কেমন করে ওঠে?'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩৪০]

এরপরেও আহসান না ফিরলে লীলার কাছে প্রকাণ্ড টিনশেডের ওয়ার্কশপকে ভয় লাগে আর ভেতরের বিকল মোটর গাড়িগুলোকে একেকটা ছিন্নভিন্ন লাশ বলে মনে হয়। তাই অপমানিত, লাঞ্ছিত লীলাকে একাকী বাসায় ফিরতে হয়। চরম হতাশায় আক্রান্ত লীলা একাকী বলে–'এ অপমান আর কাউকে নয়–তার ভালোবাসাকে, এ লাঞ্ছনা তার বিশ্বাসকে, আর এই নিঃসঙ্গতার অভিশাপ তার সমস্ত জীবনকালের।...আহসান তোমার একটু দয়া হল না? আমার যে আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা রইল না–ফিরবার নৌকা তো আমি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি।' লীলা এভাবে আত্মবিশ্লেষণে নিজের স্বরূপ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়। এ পর্যায়ে তার মনের মধ্যে দেখা দেয় এক নিরাসক্ত জীবন-জিজ্ঞাসা। তাই লীলার অন্তিম সিদ্ধান্ত–

> 'বারবার মনে হয়েছিল, এই বুঝি তার জীবনে প্রেম এল। এই বুঝি সে বাঁচবার মতো পথ পেয়ে গেল। কিন্তু না, আসেনি সেই প্রেম। সেই নিশ্চিন্তে নির্ভর করার মানুষ, সেই জীবন ভরে দেবার মানুষ তার জীবনে আসেনি। কেবলি তার জীবনে ভুল জিনিস ঘটে। ভুল স্বামী, ভুল প্রেমিক। শক্ত হাতে ধরবার মতো তার কিছুই জুটল না।'-[ভা.কা.ক./পৃ.৩১৭]

কাঙ্ক্ষিত প্রেম, প্রেমিক, স্বামী, সংসার, সুখ ও স্বপ্নের পেছনে লীলা শুধু মরীচিকার মতো ছুটে হয়রান হয়। কিন্তু বিরুদ্ধ সময়- সমাজের বিষবাষ্প, পুরুষতন্ত্রের দাপট-দৌরাত্ম্যে এবং কিছুটা প্রতিহিংসাজাত অসংযম বা ইচ্ছাপূরণের জেদই লীলাকে নির্লক্ষ্য ও নিঃসঙ্গতার অতল তলে নিক্ষেপ করে। তাই আয়নার সামনে নিভাঁজ শরীর, গোল ঘাড়, সুন্দর বুক, লীলায়িত কোমরের বাঁকসমেত শরীরে সাপিনীর মোহনীয়তা দেখতে পেলেও ত্বকের ভেতর থেকে ফুটে ওঠা আভা বা লাবণ্য বেরুতে না দেখে হতাশ হয়। একে একে মনে পড়ে জীবনে আসা সকল প্রেমিকের কথা। 'কী জীবন লোকটার।'–বলে স্বামী সমিরউদ্দিনের প্রতি তার করুণা হয়। এরপর মনে পড়ে জাহাঙ্গীরের একজিবিশনের কথা, খুকুর ক্লাবের প্যাট্রন হবার কথা। এরপর সে পর্ণো পত্রিকার ছবিগুলো দেখে এবং সিজোফ্রেনিয়ার ওপর লেখা প্রবন্ধের বই নাড়াচাড়া করে। আবার স্বভাব-সুলভ কণ্ঠে সে পরিচিত পারিবারিক ডাক্তারকে টেলিফোন করে প্রেসার ও মাথা ব্যথার কথা বলে প্ররোচিত করে। তারপর লীলা ড্রয়ার থেকে ঘুমের ওষুধের কৌটা হাতে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে এবং অতীতের দুঃসহ স্মৃতিচারণ করতে করতে বড়িগুলো খায়। আত্মহননের এ পন্থার মাধ্যমে লীলা তার মুক্তির পথ বেছে নেয়। কারণ তার কাছে–

> 'ভালোবাসা তো রাক্ষুসিই।...তার ভালোবাসা সমস্তটাই চায়।...আর গান, ছবি-সেমিনার এসবের নামে ভণ্ডামি আর প্রেমের নামে এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায়, সেখান থেকে আবার বিছানায়–এই রকম, উহ্ কত যে বিছানায় উঠতে হবে আর নামতে হবে তার সীমা সংখ্যা নেই।...ঢাকা শহরের সমাজ-সেবা–ওতেও কি বিছানা নেই? ওখানেও তো বিছানার ব্যাপার থেকে যাচ্ছে–চুরি জোচ্চুরি প্লাস বিছানা প্লাস তোষামুদি, প্লাস ইতরামি প্লাস আরো কত কি!'–[ভা.কা.ক./পৃ.৩৪৩-৩৪৪]

এভাবে অবক্ষয়িত সময়-সমাজের বলির শিকার হয়ে, পুরুষতন্ত্রের নখরাঘাতের দগদগে দাগা খেয়ে এবং প্রেমিক পুরুষের মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে চরম হতাশাগ্রস্ত লীলা পনেরো-ষোলোটি ঘুমের বড়ি খেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

স্বামী সমিরউদ্দিন লীলাকে এ অবস্থায় দেখে প্রথমে আর্ত-চিৎকার করে ভড়কে গেলেও দ্রুত টাল সামলে ওঠে। তাই অতি হিসেবি ও সাবধানী সমিরউদ্দিন হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ফোন করে চেনাজানা ডাক্তার ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়। আর ভবিষ্যত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেয়। যদিও তখনো তার চৈতন্যে জাগতে থাকে লীলাকে প্রথম দেখার অনুভূতি ও স্কুলে গাওয়া –'আমি কার নূপুরের ছন্দ' গানের সুর ঝঙ্কার।

লীলা মধ্যবিত্ত পরিবারে সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে থেকেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কৈশোর থেকে সে বহু ও বিচিত্র পুরুষের সান্নিধ্য পায়। তার সঙ্গে বিনয়, তপন, হায়দার, মুনিরা বুবুর স্বামী, আনিস, হুমায়ন, কাশেম,ওদুদ, হামিদ ও আহসানের নানামাত্রিক সম্পর্ক তৈরি হয়। স্বামী হিসেবে এসেছে অসমবয়সী সমিরউদ্দিন। অন্যদের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত প্রেম বা প্রেমবহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়। ভালবেসেছে দুজনকে। বিবাহিত জীবনের পূর্বে আনিসকে এবং পরে আহসানকে। কিন্তু তাদের কেউই তাকে ভালোবাসেনি। অর্থের প্রতিই তারা বেশি আসক্ত। লীলার জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনার কার্যকারণ সূত্র হিসেবে 'ভালোবাসা' শব্দটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ লীলা সমগ্র জীবনে এ ভালোবাসা দ্বারাই বারবার প্রতারিত হয়েছে। কারণ মানুষের জীবনবাস্তবতা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট দ্বারা বেষ্টিত। এখানে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই। যন্ত্রসভ্যতার কুফল অনেকের জীবনে মহামারি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ষাটের দশকে এ প্রবণতা ভয়াবহরূপে সংক্রমিত হয়। শওকত আলী এ ধারার অন্যতম স্রষ্টা[১৫]। আলোচন্য উপন্যাসের লীলা যার প্রধানতম সাক্ষী তবে সমার্থক নয়।

চরিত্র বিকাশের সঙ্গে উপন্যাসটির পটভূমির পরিবর্তন ঘটেছে। যা পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর (বালুরঘাট-মহিমপুর) থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের মহানগরী ঢাকা পর্যন্ত এর পরিধি-বিস্তৃত। শওকত মাত্র আশি পৃষ্ঠার ও এগারো পরিচ্ছেদের এ উপন্যাসে প্রায় চল্লিশ বছরের (১৯৪৬-১৯৮৫ খ্রি.) বাংলা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ,আটচল্লিশের উদ্বাস্তুসংকট, মধ্যবিত্ত মুসলমানদের জাগরণ, পাশ্চাত্যমোহ, নারীশিক্ষার প্রসার, গ্রামীণ সংস্কার, নাগরিক জীবনের বিকাশ ও বিকার, ঘুষ-দুর্নীতি, বেকারত্ব, পণপ্রথা, পুঁজিবাদের পাপ-পঙ্ক, দাম্পত্যসংকট, যৌথজীবনের সূত্রপাত ও সংক্রমণ এবং প্রথা ও প্রগতির দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে। নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা-জটিলতা এখানে প্রাধান্য পেলেও গ্রামীণ পটভূমিও উপেক্ষিত হয়নি। জটিল নাগরিক বাস্তবতায় যাপিত যে-জীবন; তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ক্ষয়-ধস ও অবসাদের বিশ্বস্ত দলিল শওকতের *ভালোবাসা কারে কয়* উপন্যাস। এটি সেই বিশেষ মনোবাস্তবতার রেখাচিত্র; যেখানে ব্যক্তির বিপন্নতা ও অতৃপ্তির চোরাফাটল গোপনে তৈরি করে নির্মমতা, নৈঃসঙ্গ্য, বিমর্ষতা ও সীমাহীন ব্যর্থতা। উপন্যাসের আয়তনটি পরিমিত হলেও এতে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তির অন্তহীন যন্ত্রণার কথা, তাদের মনোদৈহিক প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়া এবং ক্রমাগত সংঘাত-মিলন ও বৈপরীত্যের কথা। নামকরণে ভালোবাসার অনুষঙ্গ থাকলেও এর কেন্দ্রীয় চরিত্র লীলার জীবনে প্রেম কিংবা ভালোবাসা অধরাই থেকে যায়। দেশভাগের অভিঘাতে নীরবে-নিভৃতে ভেঙে যায় লীলার মতো মেয়েদের বর্তমান ও ভবিতব্য। *ভালোবাসা কারে কয়* তাই এক অর্থে স্বপ্নহীনতার আখ্যান। নৈতিক-অনৈতিক সবধরনের চাওয়া-পাওয়াই শেষপর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়েছে ভয়ংকর শূন্যতায়, বেদনাময়তায় ও বিবর্ণতায়।[১৬] লীলা এ সময় ও সমাজবাস্তবতার এক শাপিত প্রতিনিধি।

লীলা চরিত্রের সঙ্গে গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের *মাদাম বোভারী*- এর এমা, লিও টলস্টয়ের *আন্না কারেনিনা*-এর আন্না এবং মাহবুব-উল আলমের *মফিজন* উপন্যাসের মফিজন চরিত্রের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। এমা মূলত জীবনের কাঙ্ক্ষিত সুখ ও স্বপ্ন চরিতার্থ করতে চেয়েছে। কিন্তু সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাওয়া ফ্রান্সে তার এ স্বপ্নসাধ পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না । কারণ এ বিপ্লবে প্রকৃত অর্থে সাম্য-মৈত্রী আসেনি, এসেছিল স্বাধীনতা। কিন্তু তাও ছিল ধনী-বুর্জোয়াদের কব্জায়। এতে এমার মতো কনভেন্ট শিক্ষার্থী কৃষক কন্যার, স্বামী চার্লস বোভারীর মতো পাশ করা মফস্বল ডাক্তারের , প্রেমিক রদলফের মতো খামারির এবং লেও–এর মতো উকিলের মুহুরির জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাই পিতৃবয়সী , বিপত্নীক ও পশুর মতো ভারবাহী ডাক্তার চার্লস এর সঙ্গে এমার অসামঞ্জস্য বিয়ে হয়। সঙ্গতকারণেই এমার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য সন্ধানী এমা এক কন্যার জননী হয়েও প্রতারক রদলফ ও ভীরু প্রকৃতির লেও-এর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ায়। অথচ দেশের বিদ্যমান বুর্জোয়া–পেটি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও পুরুষতন্ত্রের খাঁচা থেকে এমা মুক্তি পায় না। স্বামী-সন্তান-সংসার

রেখে এমা প্রেমিকদের হাত ধরে পালাতে চাইলেও সে উভয়ের প্রতারণার শিকার হয়। তাই নির্মম পুরুষতন্ত্রের পাশবিকতায় পাণ্ডুর হওয়া এমাকে আর্সেনিক বিষ খেয়ে জীবন থেকে পালাতে হয়। প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জালে বন্দি, আত্মসচেতন, স্বাধীনচেতা ও প্রজাপতি সদৃশ স্বপ্নাতুর এমা অবাধ সংসর্গের মাধ্যমে মূলত সুখ খুঁজেছে, প্রতিশোধ নিয়েছে ভারবাহী স্বামীর উপর, ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে ব্যর্থ বিবাহের। সমাজসৃষ্ট পাপবোধ ও নৈতিকতায় এমা তেমন দগ্ধ হয়নি, বরং রক্তাক্ত হয়েছে সমাজশোষণ ও পুরুষের পাশবিকতায়। আন্নাও বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ার পতন-উন্মুখ সামন্তবাদের ফাঁপা, নির্মমতা ও জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ক্রমশই বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর ভাঙন, গলদ, পাপ-তাপ ও পতন-পচনের অনিবার্য অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, ব্যক্তিত্বময়ী, স্বাধীনচেতা ও অভিজাত আন্নার জীবন। জার-সম্রাটের প্রভাবশালী আমলা বয়স্ক স্বামী কারেনিন ও ক্ষমতাধর সেনা অফিসার প্রেমিক ভ্রনস্কির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানো সমূহ সম্ভাবনাময় আন্নার জীবনও শেষপর্যন্ত বিচ্ছিন্ন-বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। জার-শাসিত দেশের বিদ্যমান দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল আইন অমান্য করে, স্বামী-সন্তান-সংসার রেখে আন্না জীবনকে রাঙাতে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েও মুক্তি পায় না। সমাজশাসন উপেক্ষা করায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আন্নাকে দেয় না তার একই সঙ্গে বহু প্রতিক্ষিত প্রেমিকা-স্ত্রী-মা হবার অধিকার। কারণ এ সমাজ প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস-সমর্থন করে পাশবিকতায়। তাই শেষপর্যন্ত আন্নাকে আত্মহত্যা করতে হয় ট্রেনের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে। এ চাকা মূলত সামাজিক বিশৃঙ্খলার, নিষ্ঠুরতার ও বিবেকের। বিবেকের চাকা ও সমাজের চাকা পুরুষতন্ত্রের চাকায় রূপান্তরিত হয়ে পিষ্ট করে আন্নাকে। অন্যদিকে বঙ্গ ললনা প্রাণোচ্ছল মফিজনও প্রথমে বাঞ্ছিত প্রেমিক মামুদকে না পেয়ে, প্রথম স্বামী প্রবাসী বকশুর অকাল মৃত্যুতে, দ্বিতীয় প্রেমিক পুত্রপ্রতিম ছাত্র ভাগ্নে শাহনওয়াজের অপ্রাপনীয়তায় এবং দ্বিতীয় স্বামী পিতৃ বয়সী পির সৈয়দ বুরহানুদ্দীনের মর্ষকামিতায় পাণ্ডুর ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের অচলায়তন বাংলাদেশের বিদ্যমান পুরুষতন্ত্রের দাপট, জবরদস্তি ও পর্দাপ্রথার বেড়জালে বন্দি মফিজনের স্বপ্নবাসনার অপমৃত্যু ঘটে। সকল দেশের সকল সমাজ ও পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিতে এদের প্রণয়-পাপ- প্রতিবাদী স্পৃহাই বড় হয়ে উঠেছে; কিন্তু এদের অন্তরের আর্তি ও দুঃখ-বেদনা কারো নজরে পড়েনি। প্রেমের ব্যর্থতা , স্বপ্নের অপমৃত্যু , বেদনার বিশালতা,আকাঙ্ক্ষার অবদমন, পাশবিক পুরুষতন্ত্র ও বিরুদ্ধ সমাজ প্রেক্ষাপট সবাইকে একই সমান্তরালে দাঁড় করায়। *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* রচয়িতা ডি.এইচ. লরেন্সের মতো শওকতও বিশ্বাস করতেন- We can go wrong in our minds, but what the blood , and believes , and says is always true. অর্থাৎ মানুষের মনের বোধ-ভাবনা ও বিশ্বাসে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তার রক্ত-মাংসের শরীর যা অনুভব-উপলব্ধি ও প্রকাশ করে তাতে কোনো ভুল নেই।

পরিশেষে বলা যায়, *ভালোবাসা কারে কয়* উপন্যাসটি এক ভিন্ন জাতের রচনা। নামকরণে জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে লেখক ভালোবাসার নানা মাত্রিকতা ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রেম এখানে কখনো শরীরী, কখনো চেতনাগত আর কখনো স্মৃতিরাভাসে উজ্জীবিত। তারপরেও লীলা ভালোবাসার নতুনতর সংজ্ঞায়ন করতে ব্যর্থ হয়ে জীবনাবসানের সিদ্ধান্ত নেয়; যা তার সমগ্রজীবন প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় অমূলক নয়। আর শওকতও ছিলেন আধুনিক লেখকদের মতোই জীবনমূলস্পর্শী, শিল্পসৃষ্টির প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রবণ ও সমকালশাসিত। লীলা গতানুগতিক বাঙালি নারী নয়। তার জীবনবোধ স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। অর্থাৎ নারী-পুরুষের সম্পর্কের গন্তব্য নির্ধারণ করতে শওকত বাঙালিয়ানাকে আদর্শ ধরে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারণ সৃষ্টিশীল ব্যক্তি বা শিল্পীমাত্রই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। জীবনকে নির্মোহভাবে গ্রহণ করাই প্রকৃত জীবনশিল্পীদের কাজ–এ শৈল্পিক গুরুদায়িত্ব শওকত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেছেন। এখানে তিনি সমাজের প্রচলিত ও চেনাজানা জীবনের ছবিটিকে প্রত্যাখ্যান করে নির্মাণ করেছেন এক বিরূপ বিশ্ব। জীবনকে সুখ-স্বস্তি, প্রাণ-প্রাচুর্যের বাইরে থেকেও নেতি-নাস্তির তির্যক–তীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে শওকত আলীর *ভালোবাসা কারে কয়* এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

যেতে চাই

শওকত আলীর *যেতে চাই* (১৯৮৮খ্রি.) নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-বিচ্ছিন্নতা, পারিবারিক বিপর্যয় ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব-আশ্রয়ী এক উপন্যাস। এ মধ্যবিত্তশ্রেণি তাঁর উপন্যাসে বহুভাবে-বহুরূপে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। নাগরিক জীবনের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা ক্ষয়-ধস, অবসাদ, অবদমন, শূন্যতা, বেদনা, বিবর্ণতা, কৃত্রিমতা, পলায়নবৃত্তি ও

আত্মহনন প্রবণতা এ উপন্যাসে প্রবল আর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তের এ স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, প্রেম-অপ্রেম, সহানুভূতি-স্বার্থমগ্নতা সর্বোপরি মানবতা ও মর্ষকামিতা সমাজমনস্ক শওকত আলীকে সর্বদাই তাড়িত-পীড়িত করেছে। এ তাড়নাই তাঁকে মধ্যবিত্তের জটিলাবর্ত, সামূহিক ভাঙন ও সম্ভাবনা রূপায়ণে প্রণোদনা যুগিয়েছে। তিনি অত্যন্ত নির্মমভাবে নাগরিক নর-নারীর নিরালোক প্রান্ত ও নির্মমতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের এ বিশ্বাস, ব্যাধি ও বিভ্রমগুলোকে তিনি বায়োস্কোপের পর্দার এক একটি প্রোজেকশন করে তুলেছেন। *যেতে চাই* উপন্যাসে এমন সংকট ও বিচ্ছিন্নতাই ভাষারূপ পেয়েছে।

ভাঙনের সুর, ক্ষরণের দাগ, সুখ-দুঃখের মেদুরতা–এসব ছোট ছোট মনোবিকলন আর অবদমনের ইতিকথা নিয়েই গড়ে উঠেছে শওকত আলীর *যেতে চাই* উপন্যাসটি। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নগরজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া সাধারণ মানুষের চলচ্ছবি নির্মাণে শওকত আলী সর্বজনগ্রাহ্য ও সমাদৃত এক জীবনমুখী শিল্পী। তৃতীয় বিশ্বের এক উন্নয়মুখী দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের নগরযাপনের ভেতরে যা যা বাস্তবসম্মতভাবে ঘটা সম্ভব এবং যা আজও ক্রিয়াশীল; সেই মধ্যবিত্ত সংসারের মনোবিকলন ধরা পড়েছে শওকত আলীর *যেতে চাই* উপন্যাসে।[১৭] এখানে ব্যক্তির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব কিংবা জীবনবেগ ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্বই প্রবল হয়ে উঠেছে।

ডা.আবু জাফর তালুকদার ও নিশাতের আশ্রয়ে সমকালীন নাগরিক দাম্পত্যসংকট , জীবনযন্ত্রণা, বিত্তের বিকার ও ভয়াবহ নৈঃসঙ্গ্যের ইতিকথা এ আখ্যানে গুরুত্ব পেয়েছে। নিশাত সেক্রেটারিয়েটের কেরানি (পরে সেকশন অফিসার) নেহালুদ্দিনের চতুর্থ সন্তান ও ছোট মেয়ে । দেখতে সুশ্রী আর গানের গলা ভালো হওয়াতে মেয়েকে তিনি বড় স্বপ্ন নিয়ে হলিক্রস স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু বাবার স্বপ্ন নিশাত রেজাল্ট দিয়ে পূরণ করতে পারেনি। বরং কেতা কায়দা শেখা, নিত্যনতুন ছাঁটকাটের পোশাক ও দামি প্রসাধনী মেখে নিশাতের স্কুল-কলেজের সিঁড়ি টপকানোতেই তিনি খুশি ছিলেন। পরে নিশাত হোম ইকনমিক্স কলেজে ভর্তি হলে তার বিয়ে নিয়ে নেহালুদ্দিন নানা হিসেব-নিকেশ করেন। কারণ–

> ‘প্রথম দিকে সাধ ছিল ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন আমলার সঙ্গে। কিন্তু এখন তাঁর ধারণা পাল্টে গেছে। দিনকালের অবস্থা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, ব্যবসায়ীরাই আসলে সমস্ত কিছুর মূলে। টাকার কাছে রাখব বোয়াল আমলরাও কাত হয়ে পড়ে। সুতরাং যদি ব্যবসায়ী ছেলে পাওয়া যায়, তাহলে তার হাতেই মেয়েকে তুলে দেবেন।’-[যেতে চাই; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৫ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫/পৃ.৩৯৩]

নেহালুদ্দিনের এ মানসিকতার মধ্য দিয়ে সেনাশাসিত গোটা আশির দশকের বিকাশমান নাগরিক মনস্তত্ত্বের বাস্তব চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে। এসময় পুঁজিই ধীরে ধীরে সামাজিক প্রভাব-প্রতাপ, যশ-খ্যাতির মাপকাঠি হয়ে ওঠে। ফলে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের কাছে ডাকসাইটে আমলা ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা পর্যন্ত আনত হয়ে পড়ে। তাই নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যেনতেনভাবে অর্থ-উপার্জনের বাতিক ও বিকার চেপে বসে। এর জন্য শুরু হয় প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা। এ নেশার চোরাবালিতে আটকে পড়ে অনেকেই ব্যর্থ-বিবশ ও বিভ্রান্ত হয়। রাজধানী ঢাকা নগরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা নিশাতের আধুনিক রুচি, সংস্কৃতি চর্চা, মুখরা স্বভাব আর সুশ্রী চেহারা–সব মিলেই সে মানসিকভাবে উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে। প্রথম জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র শাফাক আহসান ও নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী কামরান ইলাহীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ দুজনেই ছিল ব্যবসায়ীর ছেলে। কামরান ইলাহী ছিল আবার বিবাহিত। স্মার্ট-চৌকস শাফাকের মোটর বাইকে চেপে নিশাত চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও রমনা পার্কে ঘুরে বেড়ালেও থার্ড ইয়ারে ওঠার পর প্রেমিকের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে । নিশাত কিছু বুঝে ওঠার আগেই শাফাক আমেরিকা চলে যায়। এসময় নির্জনপ্রিয় কামরান ইলাহীর দামি গাড়িতে চেপে নিশাত সিনেমা দেখেছে, সাভার-মিরপুরে ঘুরেছে, চীনে রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিয়েছে এবং পাঁচতারকা হোটেলের নির্জন কামরায় শুয়ে-বসে গল্প গুজব করেছে। নিশাত নিজেকে নিবেদনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলেও কামরান ইলাহীর নিরাসক্ত মানসিকতার কারণেও এ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই অভিমানে, অপমানে ও আত্মগ্লানিতে জর্জর নিশাত প্রেমিক কামরান ইলাহীকে বলে–

> ‘আমাকে তুমি পুতুল মনে করো, না? শুধু খেলা করতে চাও আমাকে নিয়ে আর কিছু ভাবো না–তাই না?’-[যে.চা./পৃ.৩৯৫]

পরবর্তীকালে কলেজ বান্ধবী নীলার মামাতো ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, সিরাজগঞ্জের পিতৃহীন আবু জাফর তালুকদারের সঙ্গে নিশাতের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ‘বেশবাসে চেহারায় অপ্রতিভ ভাব, মাথায় সর্ষের তেল মাখে,

ফিতে বাঁধা জুতো প'রে, আর কথায় কথায় নিঃশব্দে হাসে'–এমন বিপ্রতীপ রুচি-মানসিকতাসম্পন্ন জাফরের সঙ্গে নিশাতের প্রেম হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না। তারপরেও জাফর-নিশাতের এ সম্পর্কটা গড়ে ওঠে। কারণ–

> 'ছেলেটি গেঁয়ো টাইপের হলেও তার বুদ্ধিখানা ভয়ানক ধারালো। বরাবর স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। এবং কথাবার্তায় খুব চোস্ত। দূর থেকে মন্দ লাগত না নিশাতের।'-[যে.চা./পৃ.৩৯০]

তাই জাফর দেখতে সুদর্শন, বেশভূষা ও ব্যবহারে মার্জিত না হলেও শুধু প্রতিভার গুণে এবং উজ্জ্বল-অভিজাত জীবনের প্রত্যাশায় নিশাত জাফরকে প্রশ্রয় দেয়। এ প্রেমের কারণেই নিশাত ম্যাজিস্ট্রেট পাত্র সাহেব আলীকে কৌশলে নাস্তানাবুদ করে এড়িয়ে যায়। এমন আমলা পাত্রকে পছন্দ না করায় বাবা-মাও নিশাতের ওপর চটে। অথচ জাফরের নিস্পৃহ ভাব নিশাতকে ভাবিয়ে তুলে। তাই বিভিন্ন অজুহাতে জাফরের হাত নিজের বুকে রাখে আর 'জানো, ছত্রিশ সাইজের ব্রা'তে হয় না আজকাল'– এমন উত্তেজক কথা বলে প্রেমিককে উস্কে দেয়। কিন্তু জাফরের অনাগ্রহ আর উদাসীন ভাব দেখে নিশাত মনে মনে বলে–

> 'একজন পুরুষ মানুষ কেমন করে একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে।...সামনে শরীর ধরে রাখলেও জাফর গ্রহণ করতে চায় না।...এমন এক লোককে সে বেছে নিল, যে হাত বাড়িয়ে কখনোই কিছু নেবে না। কোনো উদ্যম নেই, কোনো উদ্যোগ নেই।...জাফরের কাছ থেকেও কি তাকে শূন্যহাতে ফিরতে হবে?'-[যে.চা./পৃ.৪০১]

এসব নিয়ে নিশাতের একেকদিন দুশ্চিন্তা হয়। তাই নিজের বিয়ের বিষয়ে বানানো মিথ্যে কথা বলার পরেও জাফরকে নিরুত্তেজ ও নিরুদ্বিগ্ন দেখে নিশাত ক্ষোভের সুরে বলে–'তুমি জোর করতে পার না কেন?...আমাকে তুমি ছিনিয়ে নিতে পারো না?' জবাবে মৃদু হেসে জাফর জানায়–

> 'আমি খুব মিডিওকার লোক নিশাত, কারো মনের ওপর আমি জোর খাটাতে চাই না। তুমি মিছিমিছি আশা করে আছ, অমন শিভালরি আমাকে দিয়ে কখনোই হবে না।'-[যে.চা./পৃ.৪০৩]

জাফরের এ নিরুত্তেজ, নিস্পৃহ, পৌরুষহীন মানসিকতা পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। এমতবস্থায় নিশাতের আগ্রহেই তাদের অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। নিশাত এক দুপুরে জাফরের বাসায় যায় এবং অনেকটা যেচে নিজেকে নিবেদন করে দৈহিক সম্পর্ক ঘটায়। এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে জাফর বাসায় কাজি ডেকে এনে বিয়ের রেজিস্ট্রি করে। পরে পারিবারিকভাবে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। তবে পাঁচ-ছয় দিন পর মামাশ্বশুর, খালুশ্বশুর ও চাচাশ্বশুরের বাসায় দাওয়াত খাওয়া এবং সাফারি-স্যুট-টাই পরে থাকা নিয়ে জাফরের সঙ্গে নিশাতের মন কষাকষি শুরু হয়। আবার শ্বশুর নেহালউদ্দিনের কাছে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব শুনে জাফর সোজা মানা করায় তিনিও নাখোশ হন। আবার শাশুড়ি এ বিষয়ে বলতে এলে জাফর এমনভাবে চোখ তুলে তাকায় যে-ভদ্রমহিলা একেবারে লজ্জায় মিইয়ে যান। নিশাত তার বনানীর বড়লোক বান্ধবী রায়হানার বাড়িতে বেড়াতে যাবার দিনক্ষণ ঠিক করলে তা সে এড়াতে পারে না। তবে বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে জাফরকে বেশি কথা বলতে নিষেধ করে এবং যুক্তি দিয়ে বলে–

> 'ওরা বেজায় বড়লোক, ওদের কাছে আমি তোমাকে গরিব মানুষের ছেলে বলে প্রেজেন্ট করতে পারব না।...রায়হানাদের ফ্যামিলি খুব বড়–ওপরের দিকে ওদের নানা কানেকশন। ওদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে কার সঙ্গে করব বলো?'-[যে.চা./পৃ.৪০৯]

এ জন্যই নিশাত বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়ে নিজের শ্বশুরকে সাবেক জমিদার, ননদজামাইকে লন্ডনপ্রবাসী, কলকাতার বিখ্যাত এম.বি. সরকারের দোকানের নব্বই ভরি স্বর্ণের গহনা ডাকাতি,জাফরের তিনটি রিসার্চ প্রজেক্ট চালানো এবং শ্বশুরের সাভার-নয়ারহাটে বাগান বাড়ি থাকার কথা বলে তাক লাগিয়ে দেয়। নাগরিক জীবনের এমন মিথ্যা, মেকি, প্রতারণা ও ভণ্ডামির মুখোমুখি হয়ে জাফর বিস্মিত হয়। জাফরের এ মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরেই নিশাত বলে–

> 'ওদের বড়লোকি কবে থেকে তা আমি জানি না ভাবছ? সব তো ৭২ সালের পরে। আগে পাটকলে লেবার অফিসার ছিলেন ভদ্রলোক (রায়হানার স্বামী)। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর হয়েছিলেন পাটের ফড়ে ব্যবসায়ী। ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে এখানে-ওখানে কিনে জড়ো করতেন। তারপর সেগুলো অর্ধেক যেত মিল-কারখানায়, বাকি অর্ধেক যেত বর্ডারের ওপারে। ওদের নাড়ি-নক্ষত্র জানি আমি।'-[যে.চা./পৃ.৪১০]

স্বাধীনতাযুদ্ধের সংকট ও যুদ্ধপরবর্তী নাজুক পরিস্থিতির সুযোগে রায়হানার স্বামী আমজাদের মতো অনেকেই কালোবাজারি ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে। বিত্ত বানানোর নেশা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যে-বেপরোয়া-বেপথু করে তুলেছিল–আমজাদ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নাগরিক জীবনের এ তাপ-চাপ, মেকি ভদ্রতা, বিত্তের বিকার আর আভিজাত্যের অন্ধ-অহং নিয়ে নিশাত-জাফরের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। তাদের কোল জুড়ে আসে মুন্নি আর মিঠু। কিন্তু জাফরের হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চেম্বার নিয়ে পেশাসুলভ ব্যস্ততা আর নিশাতের এনজিওর চাকরিসূত্রে সংসারের বাইরে অবস্থান–সব মিলিয়েই ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের প্রয়োজনীয় সঙ্গ-সংস্পর্শ, স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে মুন্নি-মিঠুর মাঝে দেখা দেয় একধরনের হতাশা ও বিপর্যয়। তাই রাতের বেলা মিঠু ঘুমোতে গেলে ভূতের আতঙ্কে যেমন চিৎকার করে ওঠে, তেমনি ভালো ছাত্রী মুন্নিও পড়াশোনায় ক্রমশই নিরুৎসাহিত হয় । যার প্রভাব পড়ে তার ক্লাশ টেনের পরীক্ষাতেও। স্কুল কর্তৃপক্ষ জাফরকে ডেকে মুন্নির প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখায় এবং অবস্থার উন্নতি না হলে স্কুল থেকে বাদ দেবার কথা জানিয়ে দেয়। মেয়ের পড়াশোনার এ দুরবস্থার চিত্র দেখে জাফর রীতিমতো হবাক হয়। এ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে সে পরীক্ষার সময় প্রাইভেট টিউটরের অনুপস্থিতি, তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্বটা স্ত্রীর পরিবর্তে কাজের মহিলা মরিয়মের মায়ের হাতে তুলে দেয়া ও নিজের দায়িত্বহীনতাকেও সমভাবে চিহ্নিত করে। জাফর মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গেলে মুন্নি ফুঁপিয়ে বলে –

> 'আমাকে দিয়ে কিছু হবে না আব্বা। আমি পারব না। যা করব, সব ভুল হয়ে যাবে।'-[যে.চা./পৃ.৪১৩]

সন্তান ও পরিবারে সময় না দেয়া ও দায়িত্ব না নেয়ার ভয়াবহ পরিণতি দেখে জাফরের মন বিষিয়ে ওঠে। আবার বাসার কাজের ছেলে আব্দুলের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মরার দশা হলেও সে-তথ্য না জানতে পেরেও তার খারাপ লাগে। ফলে সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে স্ত্রী নিশাতের ওপর। তাই নিশাত কুমিল্লায় কনফারেন্সে যেতে জাফরের কাছে গাড়ি, ড্রাইভার ও পাঁচশত টাকা চাইলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। তাই বিদ্রূপের সঙ্গে বলে – 'তোমার নানান জায়গায় যাওয়া মানে তো আড্ডা দিয়ে বেড়ানো।' কিন্তু নিশাত প্রতিবাদ করে বলে–

> 'নিচ্ছি তোমার মতো আকাট একটা গেঁয়োলোকের পাল্লায় পড়েছি বলে, কালচার্ড ভদ্রলোক হলে তুমিই আমাকে দিয়ে আসতে।'-[যে.চা./পৃ.৩৭১]

স্ত্রীর এমন আক্রমণ আর আক্রোশের মুখোমুখি হয়ে জাফর আর কথা বাড়ায় না। বরং সে পরের দিনের ক্লাশ নেবার প্রয়োজনীয় নোটগুলো দেখে, হাসপাতালে নিজের কয়েকজন রোগীর আশানুরূপ উন্নতি না হবার চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খায়। সেই সঙ্গে থাকে ছেলে-মেয়েকে স্কুলে আনা-নেয়া ও সংসার সামলানোর ঝামেলাও। এসব কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত জাফর আত্মজিজ্ঞাসায় ব্রতী হয় এবং মনের মধ্যে উদয় হয়–'দুর! কোনো ভালো কাজই তাকে দিয়ে আর হল না। এভাবে নিজেকে চারদিকে ছড়িয়ে না দিয়ে যদি এক জায়গায় গুটিয়ে আনতে পারত, তাহলে কাজের মতো কাজ হত। কিন্তু পারা যায় না। নানান কাজে না গিয়ে উপায় আছে? এত খরচ যে-সামাল দেয়া যায় না।'নাগরিক জীবনের জৌলুসের জের আর ব্যয়ভার মেটাতে গিয়েও জাফর অনেকটা হাঁপিয়ে ওঠে। তাই তাকেও দুটি ঘুমের বড়ি খেয়ে রাত দেড়টার সময় ঘুমাতে হয়।

চারদিন পর নিশাত দেহে ক্লান্তি আর মনে বিশাল স্বপ্ন নিয়ে ঢাকার বাসায় ফিরে টানা ঘুম দেয়। কারণ এনজিও কর্মকর্তা আমেরিকার ডেভিড ক্লার্ককে খুশি করতেই নিশাত কক্সবাজার সি-বিচ ঘুরে বেড়িয়েছে এবং হোটেলে রাত কাটিয়েছে। ফলে নিশাতের সাউথ কোরিয়া কিংবা থাইল্যান্ড নয় বরং আমেরিকা যাবার সম্ভাবনাও প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। এর সঙ্গে জুটেছে সহকর্মী মুশফেক সাহেবের অনুরাগও। উচ্চাশার স্বপ্নে-বিভোর নিশাত তাই টেলিফোনে স্বামীর কাছে সাংসারিক বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে সম্ভাব্য আমেরিকা যাবার কথা রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে। রেজাল্ট খারাপ করা মেয়ে মুন্নির কথা তার মাথায় ঢোকে না। স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে নিশাত ভাবে–

> 'স্টেট্‌স থেকে ফিরে আসার পর নিশ্চয়ই সে ডিরেক্টর হচ্ছে। তারপর আর ক' বছর? তারপর সে অনায়াসে ডিজি হয়ে যেতে পারবে।...তারপর বছর পাঁচেক চাকরি, বেশি নয়। কিছুদিনের সোশ্যাল ওয়ার্ক, তারপরই এমপি, মিনিস্টার, অ্যাম্বাসাডর, কতপথ সামনে খোলা পড়ে রয়েছে। নিজের ভবিষ্যৎটা সে আজকাল আলাদাভাবে দেখছে।'-[যে.চা./পৃ.৪১৫]

এমন উচ্চাশার মোহে বিভোর নিশাতের কাছে ছেলে মিঠু এসে ডাকাডাকি করলে সে বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। এতে মিঠু ও মুন্নি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিশোরী মেয়ে মুন্নি 'মায়ের পিঠ এবং কোমরের দিকে তাকিয়ে' কিছু আপত্তিকর চিহ্ন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। যা তার কিশোরী মনকে আরো বিপন্ন করে তোলে। আবার জাফর তার রোগী নীলম ও চিত্রশিল্পী সালেহ উদ্দিনের অবস্থা ক্রমশ সংকটাপন্ন হয়ে ওঠায় হতাশ মনে বাসায় ফেরে। মুন্নিই জাফরকে কমলার স্কোয়াশ ও পানি খাওয়ায়। এতে জাফর ভারি তৃপ্তিবোধ করে এবং মেয়ের স্কুলের পড়াশোনার খোঁজ-খবর নেয়। বহুদিন পর জাফর ছেলে-মেয়ে নিয়ে পার্কে ঘুরতে যায়। মুন্নি ও মিঠুর প্রাণ খুলে হাসা, দৌড়াদৌড়ি ও ডাকাডাকি জাফরকেও ফুরফুরে করে। আমেরিকা যাবার স্কলারশিপ বাগে পেতে নিশাতের বাসায় সহকর্মী মুশফেক আসে এবং বিভিন্ন আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। 'রাত জাগেন না আপনি?'–মুশফেক এমন অশ্লীল ইঙ্গিত করার পরেও নিশাত স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বলে–'আজ তিন চার বছর হচ্ছে আমার রাত জাগার দরকার পড়ে না'। এমন মন্তব্য নিশাত ও জাফরের দাম্পত্য জীবনের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিতবাহী। তিন চার বছর ধরে উভয়ে আলাদা বিছানাতেই ঘুমায়। এভাবে ক্রমশই দুজনের দূরত্ব বাড়ে এবং উভয়েই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দায় পরিণত হয়। কক্সবাজার ট্যুরে গিয়ে বস ডেভিড ক্লার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা নিয়েও প্রথমে মুশফিক সন্দেহ করতো। তাই নিশাত মুশফিককে বলে–

> 'সবাই আমাকে ভুল বুঝে; কিন্তু আমি কি অন্যায় কিছু করি বলুন? যদি কোনো পুরুষ মানুষ নিজের ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য তদ্বির করে, সেটা কারো চোখে পড়ে না, যেহেতু আমি একজন মহিলা, তদ্বির করতে গেলাম, অমনি সেটা দোষ হয়ে গেল।'-[যে.চা./পৃ.৪২৭]

নিশাতের এ প্রতিবাদ শুধু মুশফিককে উদ্দেশ্য করে নয়, বরং সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। উপরন্তু একজন নামকরা ডাক্তারের স্ত্রী, দেখতে রূপসী, স্মার্ট ও চটপটে নারী হবার পরেও তার পদে পদে হয়রানি ও নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্যও নিশাতের অবাক লাগে। 'ওরা তো আর নাম ধরে স্কলারশিপ দেবে না, নামটা তো ঢোকাতে হবে মিনিস্ট্রি নইলে ডিপার্টমেন্ট থেকে।'–মুশফেকের এমন বাস্তবসম্মত কথায় নিশাত আরো ধাক্কা খায়। তাছাড়া এ ফাইলটা যে ডিএস সমীরউদ্দিন দেখভাল করছে এবং তা একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি বা অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি দিয়ে ম্যানেজ করে লিস্টের প্রথম দিকে নাম লেখাতে হবে। সহকর্মী মুশফেকের এমন সতর্কসংকেত নিশাতকে ভাবিয়ে তোলে। আলাপের এক ফাঁকে মুশফেক নিশাতের কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু নিশাত ত্বরিত কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না, বরং কিছুক্ষণ পর হাতখানা সে নামিয়ে দেয়। কৈফিয়তের সুরে মুশফেক বলে –'কিছু মনে করলেন? বলি কাল আবার তো দেখা হচ্ছে।' জবাবে নিশাত জানায়– 'না,...শুধু কাল কেন, রোজই দেখা হবে আমাদের।' তাই দেখা যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *গৃহদাহ* উপন্যাসের অচলার প্রশ্রয় পেয়ে যেমন সুরেশ বেপরোয়া-বেপথু হয়ে ওঠে, তেমনি মুশফেকও নিশাতের নীরব ইঙ্গিত পেয়ে উদগ্র হয়ে ওঠে। মুশফেককে তার স্বার্থের হিসেবে ব্যতিব্যস্ত দেখে নিশাত কপট হাসি হাসে। অথচ তার ছেলে মিঠু মুখের ঘায়ের জন্য কাজের ঝি শরিফার মায়ের হাতে ভাত খেতে কান্নাকাটি করলেও সে তাকিয়ে দেখে না। অথচ মায়ের ধমক খেয়ে ছেলে ও মেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। মুন্নির মুখে জাফর এ কথা জেনে আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত হয়। 'সে ডাক্তার অথচ তারই ছেলের মুখে ভিটামিনের অভাবে ঘা হয়ে গেছে' এ কেমন কথা?'– এমন ভাবনা থেকেই জাফর ভালোভাবে না খেয়ে ওঠে যায়। ঘুমাতে গিয়ে নিশাতকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে সে স্ত্রীকে ডেকে তুলে একবার ঝগড়া করতে চায়। কিন্তু মনে রাগ চেপে সেও ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টির পেছনে কিছু কারণও কার্যকর ছিল। একবার জাফরের ঢাকা থেকে ফেনীতে বদলির অর্ডার হয় এবং তা সে মেনে নিয়ে যাবার প্রস্তুতিও নেয়। কিন্তু নিশাত বেঁকে বসে এবং একরকম ঘোষণা দিয়ে বলে– 'অসম্ভব! আমি গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারব না।...অন্যকিছু জানি না; আমার শেষ কথা, ঢাকা ছেড়ে তুমি যেতে পারবে না।' জাফর স্ত্রীকে কোনোভাবেই বুঝিয়ে রাজি করাতে পারে না। উপরন্তু জাফরকে বদলি ঠেকাতে কোনো তৎপর না দেখে নিশাত স্বামীর সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করে। পরে বাবা নেহালুদ্দিনকে সেক্রেটারিয়েটে পাঠিয়ে জানতে পারে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শ্যালকের চাকরি হবার কারণে জাফরকে বদলি হতে হয়েছে। ফলে অন্য কাউকে সরিয়ে জাফরের ঢাকার পোস্টিং ধরে রাখা জরুরি হয়ে পড়ে। এ জন্য নিশাত ফুপাতো বোন রুহী খাতুনের স্বামী ও সরকারি দলের নেতা সালামতউল্লাহকে গিয়ে ধরে। তিনি জাফরকে নিয়ে ডিজির কাছে গিয়ে বিষয়টি বলাতে মিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার দিলরুবা আসাদকে

ফেনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু জাফর একে অমানবিক বিবেচনা করে সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনেই ফেনী চলে যায়। কিন্তু নিশাত হাল ছাড়ে না। এভাবে তদবির করতে গিয়ে নিশাতের বিরাট অভিজ্ঞতা হয় এবং সে বুঝতে পারে–

> 'দেশের কাজকর্মের সব কলকাঠি নাড়া হচ্ছে দুটি জায়গা থেকে। এক হচ্ছে পার্টি আর দুই হচ্ছে সেক্রেটারিয়েট। দুই দেবতাকে তুষ্ট করা না গেলে কোনো কাজ হওয়া অসম্ভব।'-[যে.চা./পৃ.৪৩৩]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে আশির দশকের স্বৈরশাসনামলে দেশের বিদ্যমান স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, ঘুষ-দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ভয়াবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। আর নিশাতও তার রাজনীতিবিদ দুলাভাই সালামতউল্লাহ এবং যুব সংগঠনের নেতা মহব্বত আলীকে সম্বল করে সেকশন অফিসার, ডিএস, জয়েন্ট সেক্রেটারি ও অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ করে বসে থাকে আর তদবির চালিয়ে যায়। এভাবেই নিশাতের সঙ্গে জয়েন্ট সেক্রেটারি খলিলুল্লাহ আখন্দের চেনাজানা এবং পরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত নারীখেকো বাঘ খলিলুল্লাহকে নিজের রূপ-যৌবনের ভেট দিয়ে সে ছয় মাসের মাথাতেই ঢাকায় স্বামীর বদলির অর্ডার করায় এবং নিজের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর চাকরিরও বাগায়। এ পথটা বাতলে দিতে নিশাতের বাবাই তাকে সাহায্য করেন। কারণ–'কোন ফুলে কোন দেবতা তুষ্ট হতে পারে, সে খবরটাও তিনি মেয়েকে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন।' ফলে নিশাতের নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেরি হয় না। নারীত্ব-সতীত্ব-ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের বিষয়টি প্রথম দিকে তাকে কিছুটা পীড়িত করলেও তা মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ–

> 'তার প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ হলেও শেষের দিকে ঐভাবটা আর থাকেনি। সে নিজেই রাখতে চায়নি। কী দরকার ওসব কথা রেখে? সে তার পথে চলে যাবে, আমার পথে আমি চলে যাব–দুটো একটা ঘটনার হ্যাংওভার জিইয়ে রাখা কেন'?-[যে.চা./পৃ.৪৩৪]

জীবনের উচ্চাশার সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেতে মোহগ্রস্ত নিশাত নীতি-নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ব খোয়ানোকেও তেমন গুরুত্ব দেয় না। বরং এসবের মাধ্যমে স্বার্থ ও সুযোগ হাতিয়ে নেয়াকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। এ ক্ষেত্রে স্বামী জাফরকে তার তেমন প্রতিবন্ধকও মনে হয়নি। কারণ–'সে বুঝতো, জাফর এসব পছন্দ করবে না এবং এজন্য সে জাফরকে দোষও দেয়নি কখনো। গেঁয়ো টাইপের মানুষ, শহরের উঁচু সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ কম, তাছাড়া এমনিতেই অমিশুক স্বভাব–তার চোখে নিশাতের চলাফেরা ভালো লাগবার কথা নয়। তবে মুখ ফুটে সে কখনো কিছু বলেনি। তার তখন এমনিতেই মেলা ঝামেলা–বউয়ের চাল চলন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো সময়ও বোধ হয় তখন তার ছিল না।' এভাবে মানসিক বৈপরীত্য আর পেশাজাত ব্যস্ততা–এসব কারণেই জাফরের সঙ্গে নিশাতের দাম্পত্য দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ে। আধুনিক সোসাইটি চষা বহির্মুখী নিশাতের সঙ্গে চাপা স্বভাবের জাফরের বিচ্ছিন্নতা-বিভেদ দিনে দিনে প্রকট হয়ে ওঠে।

নিশাত প্রথম দিকে মেয়ে মুন্নিকে তার মায়ের কাছে রেখে চাকরি, রেডিও-টিভিতে গান গাওয়া ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলায় জাফরের সঙ্গে তার ঝগড়া ও খিটিমিটি লেগেই থাকতো। তাই একেক সময় জাফর বলতো–'চাকরি করার কী দরকার, চাকরি ছেড়ে দাও।' কিন্তু নিশাত এর প্রতিবাদ করলে জাফর পাল্টা তেমন কিছু বলতে পারতো না। কারণ পূর্বে সে বহুবার বলেছে–

> 'মেয়েরা রান্নার আর সন্তান ধারণের যন্ত্র নয়–মেয়েদের মুক্তি দিতে হলে রান্নাঘর আর বিছানাগুলো ভেঙে ফেলা দরকার।'-[যে.চা./পৃ.৪৩৬]

ফলে জাফর স্ত্রীর উদগ্র চলাফেরা ও চাকরি বাদ দেয়ার ব্যাপারে জোরালো কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু দাম্পত্য দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব ঠিকই দৃশ্যমান হয়। তাই আরেকবার সিলেটে জাফরের পোস্টিং হলে নিশাত এবার আর কোনো তদবির করতে যায় না। ফলে জাফর সিলেটে যায়। আর কোনো যোগাযোগ না করেই মাস পার করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে প্রতিমাসে নিশাত নিজেই সিলেটে যেত। কিন্তু ট্রেনজার্নির ধকল, নিজের পড়াশোনা ও কর্মব্যস্ততার অজুহাতে জাফর নিশাতকে এড়িয়ে যেতে চাইতো। জাফরের এমন পাশকাটানো স্বভাব, ঠাণ্ডা-নিস্পৃহ প্রবণতা দেখে নিশাতের– 'একেকদিন সত্যি কান্না পেয়ে যেত। ফিরত রাত দশটা-এগারোটায়। ফিরেও সে স্ত্রীর কাছাকাছি আসত না। স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে জাফর মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে তাকে বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিত। স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে নিশাতের অন্তরাত্মা জ্বলে ওঠতো। তাই সে স্বামীর উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে বলতো–

> 'আমি কি এত দূর পর্যন্ত আসি শুধু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য? কোনো মেয়ে আসে এভাবে? আমার দোষ থাকলে বলো, আমি সংশোধন করি। আমি চাকরি করছি, এটা কি এমনই অপরাধ যে ক্ষমা করা যায় না? ম্যারেড মেয়েরা চাকরি করছে না?'-[যে.চা./পৃ.৪৩৭]

এভাবে প্রায় দুই বছর নিশাতের জীবন চলে। তার প্রতি জাফরের অনাগ্রহ ও অবহেলা ক্রমশই তাকে দূরের বাসিন্দায় পরিণত করে। তারপরেও স্বামীর প্রতি দুর্বলতা থেকে জাফরের জন্য তার চিন্তা হত। স্বামীকে পুরোপুরি চিনতে না পারার কারণে মনে কিছুটা ভয়ও বিরাজ করতো। কিন্তু বর্তমানে বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে পদার্পণ করে সে ভাব আর নেই।

বরং সে জীবনের কথা মনে পড়লে নিশাতের এখন রীতিমতো হাসি পায়। অথচ মেয়ে মুন্নির পড়াশোনার বিপর্যয়ে তার নজর পড়ে না । লেখাপড়ায় ক্রমশই খারাপ হবার কারণে অনেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেটে ফেলেছে আবার কেউ কেউ মুখ টিপে হাসে। ফলে দারুণ হতাশায় মুন্নি আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে মিঠুও বাবা-মায়ের স্নেহ-আদর-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে একা একা বারান্দায় লাটিম ঘোরায় এবং একাকী কথা বলে বেড়ায়। যা মুন্নির কাছে অস্বাভাবিক লাগে। আবার সুযোগসন্ধানী ও লম্পট প্রকৃতির মুশফেকের আগমন ও তৎপরতাকে মিঠুর কাছে ছুঁচো আর ধেড়ে ইঁদুরের মতো মনে হয়। তাই সে বোন মুন্নিকে বলে–

> 'লোকটার ব্যবহার ছুঁচোর মতো। ছুঁচো যেমন ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রথমে লম্বা নাকশুদ্ধ মাথাটা ঢুকিয়ে দেয়, তারপর বাতাস শুঁকে জায়গাটা সুবিধাজনক কিনা আন্দাজ করে। এই ভদ্রলোকও সে রকম।...লোকটাকে একদম পছন্দ হয় না। অথচ ঐ লোকটাই আম্মার বন্ধু। গলায় গলায় ভাব একেবারে। আম্মার ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলে।...দূর! আম্মাটা যেন কী! আবার আব্বাটাও এমন, আম্মাকে কখনোই কিছু বলে না।'-[যে.চা./পৃ.৪৩৯]

বাবা-মায়ের সম্পর্কের দাবদাহ আর সংসারের বিরূপ পরিস্থিতি নিষ্পাপ মুন্নি ও মিঠুর অন্তঃকরণকেও প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। এতে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও বেড়ে ওঠা চরমভাবে ব্যাহত হয়। মনের সুকুমারবৃত্তি ও বাসনাগুলো দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। স্কলারশিপ বাগিয়ে আমেরিকা যাবার বিষয়টিও নিশাতের জন্য খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ জুনিয়র সহকর্মী হওয়া সত্ত্বেও সেক্রেটারির ভাগ্নি ও মন্ত্রীর ভাই প্রার্থী থাকায় নিশাত ও মুশফেকের সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া মাত্র দু'বছর আগে তারা দুজনই বিদেশ ঘুরে আসাতে তদবির করতেও তেমন জোর পায় না। রাজনৈতিক লাইনে দুলাভাই সালামতউল্লাহ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় নিশাত হিতাকাঙ্ক্ষী আর্মি অফিসারের কথা চিন্তা করে। কিন্তু পরিচিত সে আর্মি অফিসার বগুড়ায় বদলি হওয়াতে আরো হতাশা বাড়ে। আবার পনেরো বছরের পূর্বের জয়েন্ট সেক্রেটারি খলিলুল্লাহ আখন্দের মতো হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ ও দেহের মোহনীয় আকর্ষণ ক্ষমতা না থাকায় নিশাত দুর্ভাগ্যকে দোষারোপ করে। তারপরেও লাজ-লজ্জার দিকে না তাকিয়ে সেক্রেটারির কাছে অনুনয়-বিনয় করে নিশাত বলে–

> 'স্যার, এই শেষবার, আমেরিকায় সোশ্যাল ওয়ার্কটা কীভাবে হয়–সেটা স্টাডি করতে চাই–চাকরি যা হবার হল–একটা থিসিস করার সুযোগ দিন।...স্যার, আপনি একটু বিবেচনা করুন–অন্তত মহিলা হিসেবে একটা স্পেশাল কনসিডারেশন আমি চাইছি।'-[যে.চা./পৃ.৪৪১-৪৪২]

এমন করুণাভিক্ষা করেও নিশাতকে হতাশ হতে হয়। কারণ সেক্রেটারি কড়াভাবে তার মুখের ওপর বলেন –'দু-দুবার আপনি বিদেশে গিয়েছিলেন, ফের কেন যাবেন? অন্যদের যেতে দিন। মহিলা হিসেবে আর কত স্পেশাল কনসিডারেশন চান, অনেক তো পেয়েছেন।' এভাবে অপমানের এক শেষ হয়ে নিশাত বাসায় ফিরেও রক্ষা পায় না। মুন্নির স্কুলের হেডমিস্ট্রেস তাকে ডেকে নিয়ে মেয়ের লেখাপড়ার অবনতির কথা বলে চরম সংকেত দিলে নিশাতের মন আরো বিষিয়ে ওঠে। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে –'পেয়েছে কী সবাই? তাকে কি এখন চারদিক থেকে আঘাত করা হবে? এখন শুধুই মার খাওয়া আর পিছু হটা?' এমন পরিস্থিতিতে নিশাত স্বামী জাফরের মুখোমুখি হয় আর মেয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ঝগড়া বাঁধায়। কারণ জাফর অযথা প্রাইভেট টিউটর বাদ দেয়া, সন্তানদের দেখভাল না করা এবং চাকরির নামে বিদেশ বেড়ানোকে দায়ী করলে নিশাতও প্রতিবাদ করে । বাবা হিসেবে তারও দায়-দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং বলে–

> 'আমার যোগ্যতা আছে, বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শিখেছি, প্রতিযোগিতা করার সাহস আছে, আমি কেন বিদেশে যাব না? যাদের ওসব নেই, তারা ঘরে বসে থাকতে পারে–আমাকে ঘরে বসে সংসার আগলাতে বলার কোনো অধিকার তোমার নেই।'-[যে.চা./পৃ.৪৪৩]

নিশাতের মুখ থেকে এসব শুনেও জাফর অবাক হয় না বরং সেও উত্তেজিতভাবে বলে– 'বাইরে যাও, জাহান্নামে যাও, বেহেশতে যাও, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে, ছেলেমেয়েদের ওপর নজর রাখবে, এইটুকুই অনুরোধ।...তুমি যদি সেটুকুও অস্বীকার করো, তাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা দেখব। তোমার কাছ থেকে আমি স্পষ্ট উত্তর চাই।' জাফরের এমন ভাবমূর্তি ও ডিভোর্সের ইঙ্গিত পেয়ে নিশাতের মনে খানিকটা ভয়ের ভাব জাগে। তবে সে ঘাবড়ায় না। এসব শুনে ও দেখে মুন্নি আর মিঠু আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রাইভেট টিউটর না আসায় অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন মুন্নি মায়ের সাহায্য নিতে গিয়ে দেখে মুশফেক নিশাতের দুবাহু ধরে অনুচ্চকণ্ঠে বলছে–'না নিশাত না– ছেলেমানুষি করবেন না।' এসময় পড়া দেখিয়ে দিতে মুন্নি মাকে ডাকায় সে সমস্ত রাগ-ক্ষোভ ঢালে মুন্নির ওপর। অকথ্য ভাষায় চিৎকার করে নিশাত মেয়েকে বলে–

> 'শয়তানের বাচ্চা, কেন তোর রেজাল্ট খারাপ হয়? এ্যাঁ? মাস্টারের সঙ্গে তো খুব ইয়ার্কি মারতে চাও। মাস্টার কি তোমার লাভার, যে তাকে যা-ইচ্ছা তাই বলতে পারবে? মাস্টারের নাম দেয়া হয়েছে গাবলু, যেন আমি কিচ্ছু টের পাই না?'-[যে.চা./পৃ.৪৪৫]

মায়ের কাছ থেকে এভাবে অপমানিত হয়ে মুন্নি বইখাতা হাতে নিয়েই সোজা লনে গিয়ে দাঁড়ায় আর নির্বিকারভাবে বৃষ্টিতে ভেজে। রাতের বেলা বাসায় ফিরে জাফর মুন্নিকে নেশার বারবিচুরেটস টেবলেট সেবন করা অবস্থায় পায়। জাফর নিজেই মুন্নিকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। নিজে এবং সহকর্মী আহসান, মুনীর, সাদউদ্দিন ও নার্সরা মুন্নিকে বাঁচাতে আপ্রাণচেষ্টা চালায় । মৃত্যুপথযাত্রী মেয়ের করুণ দশা দেখে নিশাতের–

> 'মনের ভেতরে কান্না গুমরে ওঠে। মনে মনে সে আল্লাহকে ডাকে। তার কপালে শেষে এই ছিল; ফুলের মতো মেয়ে তার। সেই মেয়ের মনের ভেতরে এমন কালকূট বাসা বেঁধেছিল অথচ সে মা হয়ে তার কিছুই জানত না! সে মনে মনে ডাকে, আল্লাহ এ তোমার কেমন বিচার? মুন্নি তো কোনো দোষ করেনি।'-[যে.চা./পৃ.৪৫০]

এসময় নিশাতও উচ্চাশার মোহ ভেদ করে, নাগরিক কৃত্রিমতার খোলস ভেঙে বাৎসল্যে বিসর্জিত বাঙালি মায়ের শাশ্বতরূপে আবির্ভূত হয় । মুমূর্ষু সন্তানের প্রাণ ভিক্ষায় সেও বিধাতার দরবারে করজোড়ে মিনতি করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুন্নিকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। সন্তানকে কবরস্থ করে জাফর বাসায় ফিরলে নিশাত তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেও দুজনের মধ্যে কোনো বাক্যবিনিময় হয় না। অচেনা দুই মানব-মানবীর মতো উভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ–

> 'দুজনের মিলনে সন্তান। একদিকে জনক, অন্যদিকে জননী, মাঝখানে সন্তান। সন্তান চলে গেলে কি শূন্য জায়গায় মিলন ফিরে আসবে?...মাঝখানের শূন্য জায়গাটা জমাট হয়ে অদৃশ্য পাথরের মতো অনড় হয়ে গেছে। এ শূন্যতার পাথর জন্ম জন্ম কাল ধরে যেন ঐ একই জায়গায় থেকে যাবে।'-[যে.চা./পৃ.৪৫২]

তাই দেখা যায় জাফর-নিশাত দম্পতির মাঝে সন্তান বিয়োগের ঘটনায় পূর্বের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় না বরং তা ক্রমশই বেড়ে চলে। জাফর পুনরায় হাসপাতালে আর ক্লিনিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের তত্ত্বাবধানে নীলমের মতো দুরারোগ্য রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও মেয়ে মুন্নিকে বাঁচাতে না পারার বেদনা তাকে দংশন করে। আবার টেলিফোনে মুশফেক নিশাতের আমেরিকা যাবার খবর জানালেও জাফরের মন বিষিয়ে ওঠে। এর জেরে জাফর মেডিকেলের ভাইভা বোর্ডের পরীক্ষায় বহু শিক্ষার্থীকে নাজেহাল করে। মনের অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও বিশ্রামের অভাবে জাফরের শারীরিক অবস্থাও খারাপ হয়ে ওঠে। পয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে জাফরের মানসিকতায় দুটি পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমত রোগীর প্রতি আন্তরিকতার পরিবর্তে দায়সাড়াগোছের ব্যবহার। দ্বিতীয়ত সংসারে বা বাসায় ফেরার প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব। তারপরেও ছেলে মিঠুকে নিয়ে সে রাতে ঘুমায়। এমন পরিস্থিতিতে এক রাতে নিশাত জাফরকে ডেকে তুলে এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে–

> 'তুমি কেন বুঝতে চাও না আমি মা, মুন্নিকে আমি পেটে ধরেছিলাম।...ওর দিকে নজর দিইনি বলে আমার বুকের ভেতরে দিনরাত আগুন জ্বলছে, তার ওপর তুমি আমাকেই দোষী ভাবছ। তুমি কী চাও, আমাকে তুমি কী করতে বলো?-[যে.চা./পৃ.৪৫৬]

জাফর এ কথার জবাব না দিয়ে তাকে ঘুমাতে বলে এবং 'ও কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হবে, আমার কেন, কারুরই কিছু করার নেই। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো।'–বলে নিজের দায়িত্বভার এড়িয়ে যায়। স্বামীর এমন ব্যবহার ও মানসিকতা দেখে নিশাতও জেদি হয়ে ওঠে। তাই স্বামীর উদ্দেশ্যে চরমবার্তা উচ্চারণ করে বলে–

> 'আমার অসহ্য লাগছে, এভাবে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।...আমার এত কষ্ট তবু তুমি কিছু করবে না ?...আমার আর এত কষ্ট সহ্য হয় না–আমাকে তুমি মুক্তি দাও।'-[যে.চা./পৃ.৪৫৭]

এভাবে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ছেলে মিঠুকে নিশাত তার মায়ের (অর্থাৎ নানির) কাছে রাখার প্রস্তাব করলেও মিঠু বাবার কাছে থাকার জেদ ধরায় তাও ব্যর্থ হয়। এক সন্ধ্যায় নিশাত স্বামী-সন্তান ও সংসার ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। অথচ জাফর সেদিন খুব ভোরবেলা বাসা থেকে বের হয়। হাসপাতালের দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যাবেলা ক্লিনিকে আসে। এখানে এসে বই পড়ে এবং রোগীর প্রতি নিস্পৃহ ভাব দেখায়। তার এ স্বভাববিরোধী অসংলগ্নভাব দেখে সহকর্মী সাদউদ্দিনও অবাক হয়। মুনীর ও সাদউদ্দিন জাফরের বিদেশে যাবার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাতে সে তা নাকচ করে । কারণ তার রোজগার, যশ-খ্যাতি কম নয় বরং দিন দিন তা বেড়ে চলছে। কিন্তু একটি বিষয়ে জাফরের অদ্ভুত লাগে। যখন সে ক্লাসের ছাত্র ও হাসপাতালের রোগীর ব্যাপারে মনোযোগী ও মানবিক ছিল, তখন তার নাম যশ তেমন বাড়েনি। কিন্তু বর্তমানে এসব ব্যাপারে কর্কশমেজাজি ও নির্মম হওয়াতে তার সুনাম-সুখ্যাতি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এসময় জাফরের বাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মামাতো ভাই আতিক জায়গির থাকায় মিঠুর যথার্থ সঙ্গীও জোটে। আর মিঠুও দেখতে দেখতে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। যা জাফরের জন্য স্বস্তির কারণ হয়। তাই জাফরের মনে হয়–

> 'এই-ই ভালো–এই জীবনই যাপন করতে হবে তাকে। এমন জীবন যাপন করাটাই সহজ। দায়হীন-ভারহীন এবং একাকী থাকতে পরাটাই ভালো।'-[যে.চা./পৃ.৪৫৯]

এভাবে সংসারে থেকেও সংসারের প্রতি জাফর ক্রমশই নিরাসক্ত হয়ে ওঠে। একবার রংপুর মেডিকেলের পরীক্ষা নিতে গিয়ে কাকতালীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. খালেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যে খালেদ তেহাত্তর-চুয়াত্তর সনের দিকে কমিউনিস্ট

পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডের রাজনীতি করতে গিয়ে পাবনায় আত্মগোপনে থাকে। এখানে রাজনৈতিক এক সহকর্মীর এম.এ পাশ করা শিক্ষিকা বোন রঞ্জনা বসুকে বিয়ে করে সংসার পাতে। রঞ্জনা তৃতীয় মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে। এসময় রক্ষীবাহিনীর তৎপরতার কারণে সে স্ত্রীর কাছে থাকতে পারেনি। পরে খালেদ নীলফামারীর মিলগঞ্জ এলাকায় কৃষক-শ্রমিকদের জন্য পাবলিকের চাঁদায় একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও জীবনের মোহকে গুরুত্ব না দিয়ে দীনহীন অবস্থাকে বেছে নেয়। যা যশ-খ্যাতি, অর্থ-বিত্তে মোড়ানো জাফরকে রীতিমতো বিস্মিত করে। আরো অবাক হয় খালেদকে তার গরিব রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারদের সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখে। অথচ এ খালেদের বলা–'একজন ডাক্তার কী একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মতো বড়লোক হতে পারে?'– এমন কথাও জাফরকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। গরিব মেহনতি মানুষের প্রতি খালেদের মমতা ও অঙ্গীকার দেখে জাফর মুগ্ধ হয়। ফলে জাফর খালেদের রোগীর প্রতি তৎপর হয়। জাফরের এ মহানুভবতায় রোগীর চাষা ভূষা স্বজনদের বিনয়ের সঙ্গে বলা–'ডাক্তারের ব্যাটা, তমরা ফেরেশতা বাহে' সম্বোধন পেয়ে সে অভিভূত হয়। অথচ রোগী ইস্কান্দার ও সালেহউদ্দিনকে জাফর বাঁচাতে পারে না। ফলে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের কোথায়ও জাফর দাঁড়ানোর মতো শক্ত মাটি খুঁজে পায় না। বাসায় ফিরেও জলশূন্য অ্যাকোরিয়াম, শুকনো ফুলের টব, ধূলি-ধূসর সোফা এবং বিশ্রী ঘর-দরজা দেখে জাফরের মন হাহাকার করে ওঠে। আবার কাজের মহিলা শরীফার মায়ের কাছে রাতের ভাত চেয়েও সে বিফল হয়। 'শরীফার মাও তাকে হিসেবের বাইরে ধরে রেখেছে'– সংসারে নিজের এমন অবস্থান দেখে জাফর ঘাবড়ে ওঠে। কারণ–

> আসলেই সে বড় কম জানে সমস্ত কিছু। স্ত্রীকে জানত না, সন্তানকে জানত না, সংসারকে জানত না। আগাগোড়াই সে বাইরে রয়ে গেছে। সংসারে সে একেবারেই আলগা মানুষ।'-[যে.চা./পৃ.৪৭৩]

তারপরেও জাফর মিঠুর লেখাপড়ায় প্রগ্রেস রিপোর্টের উন্নতি দেখে আশাবাদী হয়। তাই মুন্নির ঘরে মিঠু মনিয়া, টিয়া আর ময়না পাখি রাখতে চাইলে জাফর প্রথমে বারণ করলেও পরে তা মেনে নেয়। আবার তার রোগী চারুশিল্পী সালেহউদ্দিনের আঁকা তার নিজের স্কেচ দেখে জাফর শেকড়হীন উন্মুল ভাসমান একটা অস্তিত্বের মধ্যেও দাঁড়াবার মতো শক্তপোক্ত মাটির সন্ধান পায়। সালেহউদ্দিনের স্কেচটা সে হাসপাতালের ওয়ার্ডে টাঙিয়ে দেয়। তাই স্ত্রী নিশাতের পাঠানো চিঠিতে মিঠুসহ তার আমেরিকা যাবার আহ্বানও জাফরের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগায় না। আবার সহকর্মী আহসান বিদেশে চলে যাবার কথা জানালে সে তাকে স্বাগত জানায়। তবে নিজের দায়িত্ব ও কতর্ব্যবোধ বিস্মৃত হয় না। তাই রাতের বেলা ওয়ার্ড ভিজিট শেষে হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে একাকী হাঁটতে হাঁটতে জাফরের মনে হয়–

> 'বহুকাল ধরে সে যেন হাঁটছে। আরো অনেকদিন সে এইভাবেই রোগী দেখার কাজ শেষ করে এই বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের চেম্বারে ফিরবে। পৃথিবীর বয়স বাড়ছে, মিঠু বড় হয়ে ওঠবে, দেয়ালে সালেহউদ্দিনের ছবির রঙ ধুলোয় ধূসর হয়ে যাবে–তারপরেও এই বারান্দা দিয়ে তাঁকে হাঁটতে হবে।'-[যে.চা./পৃ.৪৭৬]

এ উপন্যাসের জাফর ও নিশাত মধ্যবিত্তের ঘানিটানা সংসারে ঘরে-বাইরের দোলাচলে দোদুল্যমান। এরা সকলেই স্বচ্ছন্দ জীবনের খোঁজে ছুটে চলা যেন এক ফিনিক্স পাখি।[১৮] স্মৃতি ও স্বপ্নের নাগপাশে আক্রান্ত জাফর মধ্যবিত্তের বাঁধাধরা জীবনের বাইরে হাঁটতে পারে না। আবার শিক্ষিত চৌকস হবার পরেও এবং রাজধানী ঢাকায় বসবাস করেও ডা. জাফরের মানসলোকের মধ্যবিত্তের সংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরোমাত্রায় পরিশোধন ঘটে না। তাই মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, দৃষ্টি ও রীতিনীতি মেনে নিয়েই বদ্ধ জলাশয়ে ফুটে থাকা কচুরিপানার মতো ভেসে থাকতে হয়। ফলে শেষপর্যন্ত তাকেও মধ্যবিত্তের অনুশাসন মেনে নিয়েই সকল আবেগ, উত্তাপ, ঔদার্যকে সংযত করতে হয় এবং এগিয়ে যেতে হয় এক নিরেট বাস্তবসম্মত জীবনসমগ্রতার কেন্দ্রে। ছেলে মিঠুর কারণে শূন্যতার মাঝে ফেরারি হয়েও জাফর ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে নিশাত বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রচলিত সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে উচ্চাভিলাষ ও স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে সুখের সংসারকে নষ্টনীড়ে পরিণত করে। যে-সুখ ও সাফল্যকে নিশাত প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল তা তার অনায়ত্তই থেকে যায়। বিবেকবিরুদ্ধ ও ব্যক্তিত্ববিসর্জন দিয়ে যেনতেন পথে স্বার্থের হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে স্বাবলম্বী হবার বিরাট সম্ভাবনাকে সে নষ্ট করে। উচ্চাভিলাষী মানসিকতা, আভিজাত্যমোহ, পাশ্চাত্যপ্রীতি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈরী প্রতিবেশ ও নাগরিক জীবনের বিকার–সব মিলিয়েই সে স্বামী-সন্তান-সংসারের বলয় থেকে ছিটকে পড়ে। চরম নিঃসঙ্গতার মাঝে একাকী জীবনের পথ অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ হয়েও নিশাত শেষপর্যন্ত পায় না তার কাঙ্ক্ষিত ঘরমনজানালা। নাগরিক মধ্যবিত্তের এমন দাম্পত্যসংকটকে আশ্রয় করে রাজিয়া খানের *বটতলার উপন্যাস* ও *হে মহাজীবন* এবং রশীদ করিমের *প্রেম একটি লালগোলাপ* উপন্যাস রচিত হয়েছে। নাগরিক দাম্পত্যসংকট ও তাদের মানসগঠনই এ সকল

উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। কেউ পুনর্বার ঘর বেঁধেছে, কেউ বা আবার ফিরতে গিয়েও পারেনি। শওকত আলীর *যেতে চাই* উপন্যাসের জাফর ও নিশাত তাদেরই যোগ্য প্রতিনিধি।

যেতে চাই উপন্যাসের মাত্র নয় পরিচ্ছেদে আঠারো বছরের (১৯৬৭-১৯৮৫) দীর্ঘ সময়প্রবাহকে অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক শওকত আলী অত্যন্ত বাস্তবমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে ষাটের দশকের আন্ডারগ্রাউন্ড-রাজনীতি, একাত্তরের সংকট, বাহাত্তর-পরবর্তী দুরবস্থা, রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডব, ঘুষ-দুর্নীতি, কালোবাজারি, বদলি-বাণিজ্য, তদবির, স্বজনপ্রীতি, সেনাশাসনের বৈরী পরিস্থিতি, নাগরিক মধ্যবিত্তের বিকাশ ও বিকার, দাম্পত্যসংকট, উচ্চাভিলাষ, আভিজাত্যের অন্ধ অহং এবং পাশ্চাত্যমোহের অনুষঙ্গগুলো বলিষ্ঠভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজধানী ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে দ্রুত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠে। কিন্তু সমকালীন আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অরাজকতা আর সাংস্কৃতিক বিনষ্টি–এ শ্রেণির স্বপ্নকে দুমরে মুচড়ে ফেলে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ক্লাব-পার্টি, ভোগবিলাস, উগ্র আধুনিকতা, মেকি আভিজাত্য ও বিত্তের বিকার– এসব মধ্যবিত্তের জীবনব্যবস্থাকে করে ক্ষতবিক্ষত। নাগরিক মধ্যবিত্তের এ আশাভঙ্গের কাহিনি, আর্থিক টানাপোড়েন, মূল্যবোধের বিপর্যয় ও ব্যক্তি তথা পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা–অর্থাৎ সমাজ সৃষ্ট নতুন এ সংকটকে শওকত আলী সহানুভূতির সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন। সময়ের সংকট, সমাজের ভাঙাগড়া ও জীবনের অনিবার্যতায় মধ্যবিত্তশ্রেণিকে তিনি আদর্শ ও বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। সেই সঙ্গে এদের অতলান্ত মানসলোককে নির্মমভাবে উন্মোচিত করেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকটসন্ধানী এ জীবনঘনিষ্ঠ প্রবণতাই শওকত আলীর *যেতে চাই* উপন্যাসকে বিশিষ্ট মাত্রায় উন্নীত করেছে।

বাসর ও মধুচন্দ্রিমা

বাসর ও মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০খ্রি.) শওকত আলীর নাগরিক জীবন প্রেক্ষাপটে রচিত ক্ষুদ্র কায়াকলেবরের উপন্যাস। অতীত ও বর্তমান সময় হাত ধরাধরি করে এ উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনি ও ভাষা সরল-সোজা মনে হলেও ঔপন্যাসিক এখানে বিষয়-বৈচিত্র্য ও জীবনার্থের নতুন উৎস আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। সাহিত্য সাধনায় শওকত আলী নিভৃতচারী ও নিমগ্ন থাকলেও সমকালের সমাজসংকট ও সংক্রমণে তাঁর অবস্থান সর্বদাই ছিল সরব ও স্বতঃস্ফূর্ত। মূলত তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথাকার। এ মধ্যবিত্ত তাঁর সৃজনের উৎসমূলে সর্বদা দেদীপ্যমান থাকলেও তিনি নাগরিক উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তশ্রেণির জীবন ও জিজীবিষাকে এড়িয়ে যাননি। তিনি প্রকৃত লেখকের পূর্ণদৃষ্টি দিয়েই জীবনের বহুমাত্রিক প্রবণতা ধারণ-নিরীক্ষণ-রূপায়ণে সচেষ্ট থেকেছেন। রাজধানী ঢাকা শহরে বসবাসসূত্রে তিনি অবলোকন করেছেন নাগরিক সমাজের বিত্তের বিকার, আভিজাত্য-অহং, মেকি-অন্তঃসারশূন্যতা, স্বার্থের টানাপোড়েন, ভোগবাদী মানসিকতা, দাম্পত্যসংকট ও ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতার শরবিদ্ধ নর-নারীর জীবন-যন্ত্রণা। ঔপন্যাসিক সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়েই এ নাগরিক জীবনের মেকি-ফাঁকি ও উন্মুলিত দশার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে সুস্থ-সুন্দর ও কল্যাণময় জীবনার্থের পথনির্দেশ করেছেন। কারণ–'শওকত আলী জীবন-অন্বিষ্ট, ইতিহাস-সচেতন, নীরব অথচ দৃঢ়বাদী একজন লেখক। তিনি প্রতিটি পরম্পরাতেই স্বচ্ছন্দ। কখনো মনোজগতের চোরা গলিপথে, কখনো একজন সমাজবীক্ষক হিসেবে, কখনো স্রেফ ইতিহাসের নির্জলা সাক্ষী হিসেবে তিনি তাঁর কথা বলে যান। ব্যক্তি শওকতের জীবনও নানা রৈখিক। বহুধা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে তাঁকে থিতু হতে হয়েছে। ইতিহাসের অনচ্ছ গ্লানিময় অতীত তাঁর লেখক সত্তাকে পুষ্টি দিয়েছে। আত্মসংগ্রাম, টিকে থাকার নিরন্তর লড়াই, গৃহহীন দশা, উদ্বাস্তু জীবনের টানাপোড়েন তাঁকে বানিয়েছে তৃষিত লেখক। জীবন তৃষ্ণার সুপেয় পানির সন্ধানে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসাধারণ শিল্পকর্ম।'[১৯] আলোচ্য উপন্যাসটিও এমনি এক জীবন তৃষ্ণারই ফসল। নাগরিক জীবনের রস-রুচি, মিথ্যা-মেকি-যান্ত্রিকতা, নিরাবেগ-নিরস্তিত্ব মানসিকতা এবং নিয়মের ফ্রেমে বন্দিদশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই এ কথাবস্তুর প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের শুরুই হয়েছে রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানের এক কমিউনিটি সেন্টারের বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। আনিস-মীনা দম্পতির প্রথম পক্ষের মেয়ে রেহনুমা নিমার সঙ্গে বিগ্রেডিয়ার আফজালুদ্দৌলার ছেলে আফসানের প্রেমের বিয়েটিকে পারিবারিক বিয়েতে রূপ দিতে জৌলুস আর আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগানো হয়। এর সঙ্গে থাকে বিসমিল্লাহ খানের ক্লাসিক সঙ্গীত, ফুল-অর্কিডের কারুকাজ, চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা আর বিত্তবান শ্রেণির আনাগোনা। আসলে এ বিয়ে ও বৌ-ভাত নামক মহাযজ্ঞের আরেক নাম নাগরিক কর্পোরেট পুঁজিপতিদের ছোট এক মিলন মেলা। এখানে আগমন ও আপ্যায়নের নেপথ্যে থাকে বিত্তবানদের পার্থিব স্বার্থ, অর্থমোহ ও সম্পর্ক গড়ার তোড়জোড়। ভদ্রতা ও আন্তরিকতা এখানে প্রদর্শনী মাত্র। তাই মনের অস্বস্তি থাকার পরেও নিমার মা মীনাকে তার দ্বিতীয়

স্বামী আমজাদ বেয়াই ব্রিগেডিয়ার আফজালুদ্দৌলা ও মিসেস দৌলার সঙ্গে যেচে আলাপ জমাতে বলে। অথচ নিমা ও তৌহিদ জন্মের পর এ সন্তানদের রেখে মীনা আনিসের সঙ্গে সাত-আট বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টানে। আর স্বামীর বন্ধু আমজাদকে পুনরায় বিয়ে করে। এ বিয়েকে কেন্দ্র করে আনিস ও আমজাদের মধ্যেকার মিত্রতা মাঝে মধ্যে শত্রুতায় রূপও নিয়েছে। পরবর্তীকালে আনিস শাহিদাকে বিয়ে করে সংসারী হয় এবং নিমা ও তৌহিদকে অপত্যস্নেহেই প্রতিপালন করে। অথচ নিজের দ্বিতীয় বিয়ে ও সন্তান ত্যাগের বিষয়ের গ্লানি আর অপরাধবোধের দংশন থেকে চোদ্দ-পনেরো বছর পরেও মীনা তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। লজ্জা আর সংকোচে সে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে চাইলে আমজাদ বলে–

> ‘নিমার শ্বশুর সিভিল অ্যাসাইনমেন্টে এখনো বহুদিন থাকবে বলে মনে হয়–আর্মি রুলের দেশে একজন ব্রিগেডিয়ার আত্মীয় হিসেবে পাওয়া কি সোজা কথা? বঁড়শিতে আনিস বড়ো মাছই গেঁথেছে, দেখে নিও, ঠিক ও মাছটাকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলবে। মিসেস দৌলা...খুবই রিসোর্সফুল মহিলা– প্রচুর কানেকশান, সেক্রেটারিয়েট, ক্যান্টনমেন্ট, পলিটিক্যাল সার্কেল, সব জায়গাতেই তার আত্মীয় স্বজন, তুমি বরং একটু ক্লোজ হলে পারতে।...তুমিই তো ওর আসল বেয়ান।’-[বা.ও ম. শওকত আলী রচনাসমগ্র; ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৭/পৃ.২৭৬]

আমজাদের এমন বক্তব্যের মাধ্যমে সমকালীন সামরিক শাসক এরশাদের দুঃশাসন, ব্যাংক-বিমা-ইনসিওরেন্স,গার্মেন্টস-ইন্ডাস্ট্রির ছত্রছায়ায় কালোটাকার ছড়াছড়ি এবং রাতারাতি কিছু মানুষের বিত্তবান বনে যাবার বিষয় উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রশাসনিক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সেনা অফিসারদের দাপট-দৌরাত্ম্য এবং নষ্টরাজনীতির প্রভাব-প্রতাপও বাদ যায়নি। আপস ও দালালির মাধ্যমে দ্রুত বিকাশমান এ উচ্চ মধ্যবিত্তের বাহ্যিক রূপজ জৌলুসের খোলসটি জীবন্ত হয়ে ওঠে ব্রিগেডিয়ার আফজালুদ্দৌলার বক্তব্য ও রঙ্গ-রসের মাধ্যমে। তিনি আনিস, আমজাদ ও মীনার উদ্দেশ্যে বলেন–

> ‘আসলে ঘটনা কি জানেন, আপনাদের মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছে ওনলি বিকজ অফ হার লুক–শী ইজ এ বিউটিফুল লেডি। আমি চাই আমার পরের জেনারেশনটা আরো সুন্দর হোক। আমার বাবাও তাই করেছিলেন।...আমার ছেলের জন্য মেয়ে খুঁজে বার করা আমারই উচিত ছিল। কিন্তু ছেলে আমাকে সে সুযোগ দেয়নি–আজকালকার ছেলে তো, একটু বেশি অ্যাডভান্সড। নাউ উয়ি মাস্ট অ্যাডমিট, কাজটা সে সাকসেসফুলি করেছে–কি বলেন, করেনি?’-[বা. ও ম./পৃ.২৭৮]

মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত ব্রিগেডিয়ার সাহেবের বক্তব্য ও ভাবনায় নিমার শারীরিক সৌন্দর্যই প্রাধান্য পেয়েছে, তার বোধ-বিশ্বাস-ব্যক্তিত্ব এখানে স্থান পায়নি। বিয়ে অনুষ্ঠানের এমন প্রাণহীন মেকি ছদ্মবেশ, বিত্তবান অভ্যাগতদের বাক্যবিলাস, প্রচার-প্রকাশের মহড়া এবং নিয়ম-নিগড়ের প্রাবল্যে নবদম্পতি আফসান ও নিমা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠে। রাত এগারোটা অবধি তাদের এসব যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। বাড়ি গিয়ে আফসান মুক্তি পেলেও নিমার জন্য তখনো শাশুড়ির বধূবরণের আনুষ্ঠানিকতা ও ননদদের অশ্লীল ইঙ্গিতময় কটাক্ষ হজম করতে হয়। সারা দিনের ক্লান্তি আর ঘুমের প্রভাবে আফসান বিরক্ত হয়ে ঘরের দরজা আটকাতে গিয়েও নিমার নিষেধে পারে না। উপরন্তু আফসানের বিয়ের পোশাক খুলে ফেলার জন্য নিমাকে তার শাশুড়ি ভর্ৎসনার সুরে বলেন–

> ‘ও বউ-মা, কিছু কিছু নিয়ম মানা ভালো, বুঝলে? বাসর রাতে বিয়ের সাজ খুলতে নেই, গয়না-টয়না কিছু খুলবে না। আর ওকে কেন কাপড় পাল্টাতে দিলে? তোমাকে এসব কথা কেউ বলে দেয়নি বাছা?’-[বা. ও. ম./পৃ.২৮১]

এমন ভর্ৎসনার মুখোমুখি হয়ে, অমঙ্গলের আশঙ্কা এবং বিষণ্ন মন নিয়ে নিমা বাসর ঘরে যায়। বাইরে চাঁদের আলো, দূরাগত বাঁশির সুর, আর মনের ক্লান্তি নিয়ে সে ফুলসজ্জার ওপর বসে এবং বালিশে হাত রেখে মনে মনে বলে–

> ‘এই হলো তাহলে তার পার্মানেন্ট বিছানা–আইনসম্মত, পবিত্র আর নারীজন্ম সার্থক করার পূজাবেদি। এই বিছানায় দুজনকে শোয়াবার জন্য কতো রকমের না কাণ্ড করে মানুষ।’-[বা. ও ম./পৃ.২৮১]

আসলে বিয়ে নামক অনুষ্ঠানের নিয়ম-নীতির বাড়াবাড়ি, বিশ্বাস-সংস্কারের প্রশ্নে সমর্পিত মানসিকতা এবং বাসর যাপনের অনিবার্য শরীরী সম্পর্কের অনুষঙ্গ নিমাকে ভেতরে ভেতরে হতাশ আর হতবল করে তোলে। আবার আফসানের ঘুমোতে যাবার ব্যগ্রতা, পরদিন বৌভাতের আনুষ্ঠান আয়োজনিত দুশ্চিন্তা এবং স্বামীর মুখে একসময়কার প্রেমপ্রার্থী আকরামের নিমন্ত্রণে আসার কথা শুনে নিমা বহুস্মৃতি ও আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়। ছেলে বন্ধু আর প্রেমসূত্রেই নিমার মনে পড়ে আকরাম, সাজ্জাদ, জহিরুদ্দিন, সাব্বির ও মোহনলালের কথা। এসব বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে নিমা বান্ধবীসহ বিভিন্ন পার্টিতে, উৎসবে, চীনা রেস্তোরাঁয়, বাগান বাড়ির ক্যাম্পিং-এ এবং টিন-এজার্সদের ক্লাবে গিয়ে মিশেছে। এসব ব্যাপারে তার বিমাতা শাহেদার প্রশ্রয়ও ছিল লক্ষ করার মতো। তিনি এসব বড়লোক ছেলেদের বাসায় আসতে আহ্বান করতেন। নিজেই নিমাকে টিন-এজার্সদের ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। ধনীর দুলাল মোহনলালের সঙ্গে একবার ক্লাবে গিয়ে তার প্ররোচনায় নেশায় আসক্ত হয়ে প্রায় সর্বনাশের সীমানায় গিয়ে পুলিশের রেইড-এর জন্য রক্ষা পায়। কলেজে পড়ার সময়

থেকেই নিমা জানতে পারে বড়লোকদের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তাই মদ্যপ সাব্বির একবার তাকে জড়িয়ে ধরলে নিমা তাকে চড় লাগায়। এতে তার মা তাকে ভর্ৎসনা করেন। মায়ের মুখ থেকে এ ম্যানার শেখা সূত্রেই নিমার মনে পড়ে–

> 'পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে গায়ে হাত দেবে, ঘাড়ে চুমু খাবে, তবু নাকি কিছু বলা যাবে না। ছেলেদের নাকি ওটা স্বভাব, অমনই ওরা করে–ওতে কিছু মনে করতে নেই–খুব ট্যাকটফুলি ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হবে।'–[বা.ও ম./পৃ.২৮৩]

বিত্তবানদের সমাজে প্রচলিত এসব প্রথা-ঐতিহ্য ও নিয়মের সম্মুখীন হয়ে নিমাও নিজের শরীর সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার হয়। 'শরীর খুব পবিত্র একটা জিনিস'–এমন ধারণায় প্রথম ঝাঁকুনি খায় কলেজ বান্ধবীদের বলা পূর্ণদাস বাউলের 'জলেতে নামিব, সিনান করিব, চুল ভেজাবো না'–গানের কথায় এবং 'সুইমিং পুলে মাথায় ক্যাপ পরার' ইঙ্গিতে। যা নাগরিক সমাজ-সভ্যতায় ধনী ঘরের ছেলে-মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনচর্চা, উদগ্র কামনা-বাসনা ও যৌনতার নিরাপদ-নিষ্কণ্টক পদক্ষেপেরই ইঙ্গিত । কলেজে পড়াবস্থাতেই নিমার টেবিলের ড্রয়ারে জন্মনিরোধক পিলের পুরো একটি স্ট্রিপ তার মা শাহিদা কৌশলে রেখেছিরেন আর সতর্ক করতে বলেছিলেন–

> 'ওটা আমিই রেখেছি–তোমার দরকার হতে পারে, বলা তো যায় না–ইমোশন কি সবসময় চেক দেয়া যায়, একটা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা থাকা ভালো।'-[বা. ও ম./পৃ.২৮৪]

এভাবে মায়ের প্রশ্রয় ও প্রস্তুতিতে নিমার যেমন মিলি, মৌলি, সুনন্দা, সুনীতার মতো মেয়ে বান্ধবী জোটে, তেমনি আকরাম, আফসান, সাজ্জাদ, সাব্বির, জহির ও মোহনলালের মতো ছেলে বন্ধুও জোটে। এদের সঙ্গে মিশেই নিমা মদ ও মাদকের সঙ্গে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে আকরামদের আম বাগানের পার্টিতে গিয়ে আফসানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং পরে তা প্রেম ও পরিণয়ে রূপ নেয়। তবে নিমার এ প্রেম ও পরিণয়ের ব্যাপারে তার নিজের সাধনা, সদিচ্ছা, স্বপ্ন ও সংগ্রামের অনুষঙ্গ সক্রিয় ছিল না। বরং এখানে বড়লোকের সন্তান হিসেবে একধরনের খেয়াল-খুশি ও অভিভাবকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। তাই আফসানের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হবার পরেও প্রেমপ্রার্থী বন্ধু আকরাম, জহির ও সাজ্জাদরা বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে নিমা কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি। উপরন্তু আফসানকে নিমা বলেছিল–

> 'আব্বা-আম্মা যা করবেন, তা-ই হবে।...যাই হোক আমাদের মধ্যে ফাইনাল কথা বলবেন কিন্তু আব্বা আর আম্মা, কথাটা ভুলে যেও না।'-[বা. ও ম./পৃ.২৮৮]

ফলে হৃদয়বৃত্তির চর্চা, প্রতিশ্রুতি কিংবা সম্পর্ক প্রগাঢ় হবার চেয়ে উভয়ে মনোযোগী হয়েছে অভিভাবকদের সম্মতি আদায়ে। এক্ষেত্রে বংশ, বিত্ত আর আভিজাত্যই প্রেমের পরিণামী মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পরস্পরকে অনুধাবন করা, দায়িত্বভার গ্রহণ করা, জীবন বিকাশে উদ্যোগী হওয়া এবং প্রেমরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া–এসব চেতনাস্রোতে এরা কেউ ঋদ্ধ হতে পারেনি। ফলে সামরিক শাসনামলে সেনা কর্মকর্তা বিগ্রেডিয়ার আফজালুদ্দৌলার প্রস্তাবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই নিমার বাবা-মা খুব সহজেই এ বিয়েতে রাজি হন। তাই ক্যাডেট কলেজ পড়ুয়া, আর্মি কমিশনের চাকরি এড়াতে বাড়ি পালানো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে বাবার ব্যবসায় দেখভাল করা খেয়ালি আফসানের সঙ্গে নিমার বিয়ে হয়। লেখক এখানে খুব সচেতন আর নির্ভার ভঙ্গিতে আল্ট্রামডার্ন সোসাইটির বিদ্যমান নষ্টামি, ভণ্ডামি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও মূল্যবোধের সামূহিক বিপর্যয়কে চিহ্নিত করেছেন। এসব উপস্থাপনায় লেখকের তেমন কোনো সংস্কার বা সংকোচ নেই। সমাজের গলি-ঘুপচিতে জন্মানো এমন দুষ্টক্ষত, বিষফোঁড়া ও খেয়ালি মনস্তত্ত্বকে খুব দক্ষতার সঙ্গে বিম্বিত করেছেন। বাসর রাতে আফসান ঘুমালেও নিমা জেগে থাকে। পরে আফসানের ঘুম ভাঙলে নিজের ঘুমানোতে সে অস্বস্তিতে ভোগে। তাই চোখ কচলাতে কচলাতে নিমাকে জড়িয়ে কাছে টানে আর বলে–

> 'সরি, আমার বোধ হয় ঘুমানোটা উচিত হয়নি। বলতে বলতে সে বউয়ের গালে গাল ঘষে, ঠোঁটে চুমু খায়।...সে নিমার অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং নিজের ঘোর লাগা শিথিল দেহে কাণ্ডটা ঘটায়। নিমার বিরক্তি, ক্লান্তি কিংবা আনন্দ কোনো বোধই হয় না।'-[বা.ও ম./পৃ.২৯১]

এভাবে উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই, মনের স্ফূর্তি ব্যতিরিকে আফসান-নিমার শারীরিক সম্পর্ক হয়। যা দাম্পত্য জীবনের আবেগহীন অভ্যাসেরই এক পালাগান সূচনার ইঙ্গিত। যান্ত্রিক নগরজীবনে অনিবার্য এ শরীরী সম্পর্ককে নিমার কাছে প্রাণহীন, প্রেমহীন ও রোজকার বলে মনে হয়। আবার আফসানের প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকার বিষয়টি নিয়েও নিমার এক খেয়াল চাপে। এ নাকডাকা রেকর্ড করতে নিজের টুইন-ওয়ানটি পাঠাতে ছোট ভাইকে টেলিফোন করায় বাবা-মা উভয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। নিমার এমন খেয়াল ও পাগলামি ছাত্রজীবন থেকেই শুরু হয়। একবার স্কুল থেকে বাড়ি না ফিরে কয়েকদিনের পরিচিত বান্ধবী বিনুদের বাসায় গিয়ে রাত কাটাবার ঘটনায় সারা বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে যায়। নিমার এ হঠকারী কাজে বিমাতা শাহিদা নিজের লাভ ও বহু সম্ভাবনাময় ইউরোপিয়ান মিসেস স্মীথের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত নকশি

কাঁথার ব্যবসায়িক প্রোগ্রাম বাতিল করেন। আর মেয়েকে টেলিফোনে বোঝান এবং সবকিছু মানিয়ে নেবার পরামর্শ দেন। উপরন্তু বউভাত অনুষ্ঠানে আসারও প্রতিশ্রুতি দেন। আবার নিমার মা মীনাও মেয়ের এমন পাগলামির কথা জানতে পেরে টেলিফোনেই মেয়েকে নারী জীবনের বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেন–

> 'মুশকিল কি জানিস–জীবন যতোবারই আরম্ভ করা যাক না কেন, অনিশ্চয়তা সব সময়ই থাকে। এখন যেটা অসহ্য লাগছে, পরে হয়ত তার চাইতেও বেশি অসহ্য জিনিস সহ্য করতে হবে।...নিমু,মা লক্ষ্মীটি, জেদি হোস না, মানিয়ে চল, সংসারকে না মানলে সংসার শোধ নেয়, সে বড় কঠিন শাস্তি।'-[বা. ও ম./পৃ.৩০৭]

মীনা তার নিজের জীবন থেকে নেয়া নির্মম বাস্তবতার আলোকেই মেয়ে নিমাকে এ কথাগুলো বলে। স্বামী, সন্তান ও সংসার–এসব ক্ষেত্রে একজন নারীর স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, পাওয়া-না পাওয়া, দায়িত্ব ও দায়ভার বড় হয়ে দেখা দেয়। বাঙালি সমাজবাস্তবতায় এসব এড়াবারও তেমন সুযোগ নারীর থাকে না।তাই আফসানদের বাড়ির পরিবেশ নিমার কাছে ধীরে ধীরে অসহ্য লাগলেও তাকে মেনে নিতে হয়। আবার বউভাতের জন্য নির্ধারিত সিনথেটিকের শাড়ি পরা, পারিবারিক গহনা পরার নিয়ম-নীতি ও খাবার-দাবাড়ে বাধ্যবাধকতা–এসব মিলে নিমার মন বিষিয়ে ওঠে। তাই স্বামী আফসানকে বলে–

> 'এত নিয়ম কেন চারদিকে বল তো? আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ও বাড়িতে যখন ছিলাম তখনও নিয়ম, এ বাড়িতে এসেছি,এখানেও নিয়ম।'-[বা.ও ম./পৃ.৩০৫]

কিন্তু আফসানও নিমাকে এ নিয়ম-নিগড়ের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। কারণ তাকেও মায়ের হুকুমে পূর্বের বরাদ্দকৃত দুটি ডিমের পরিবর্তে চারটি ডিম খেতে হয়। আর বাবার কথামতো নির্ধারিত পোশাকে সেজে ছয় জন মন্ত্রী, দুই জন মেজর জেনারেল, তিনজন বিগ্রেডিয়ার ও পাঁচজন সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। যা একই সঙ্গে বাসর ও বৌভাতের অন্তরালে যৌনতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের ইঙ্গিতবাহী। তাই অসহায়ের মতো আফসান নিমাকে বলে–'আমাদের বাড়িতে কোনো নিয়ম নেই, আম্মার হুকুম আর আব্বার হুকুম, ব্যস ঐ দুই হুকুম মেনে চললেই নিয়ম মানা হলো।' এসব শুনে নিমার বিশ্রী রকমের গ্লানিবোধ হয় এবং বুকের ভেতর কান্না গুমরে গুমরে ওঠে। আবার শ্বশুরের মুখে পরদিন দুই সপ্তাহের জন্য হানিমুনের প্রোগ্রাম শুনেও নিমার ভীষণ বিরক্ত লাগে। কারণ শ্বশুরের আয়োজ করা এ মধুচন্দ্রিমাতেও থাকে নিয়ম-কানুন মানার বাধ্যবাধকতা ও হুঁশিয়ারি। তাই বিষণ্ন মনে নিমা আফসানকে জানায়-

> 'তুমি ছেলে বেলায় পুতুল খেলেছ?...দুই পুতুলের বিয়ে দেওয়া হয়, তারপর তাদের বাসর হয়, তাদের সংসার করানো হয়। আমার মনে হচ্ছে, আমরাও যেন ঐ রকমই পুতুল।'-[বা.ও ম./পৃ.৩০৮]

ব্যক্তিস্বাধীনতা, সদিচ্ছার মূল্য ও মূল্যায়ন না পেয়ে নিমার কাছে নিজেদের জড়বৎ প্রাণহীন পুতুলের মতো মনে হয়। কারণ তাদেরকে নিয়ে উভয়ের বাবা-মা ও সমাজ এক পুতুল খেলার আয়োজনে মেতে উঠেছে। যেখানে তাদের প্রাণ-প্রণয়-আকাঙ্ক্ষার কোনো স্থান হয় না। এর পরিবর্তে বিত্তবানশ্রেণির আত্ম-অংহ, আভিজাত্য ও স্বার্থের হিসেব-নিকেশই বড় হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে আত্মবিশ্লেষণের জায়গায় এসে নিমা নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়। তার ভেতরেও তৈরি হয় আত্মদ্বন্দ্ব। তাই সে কৃত্রিম সামাজিকতা থেকে মুক্তি পেতে স্বামী আফসানকে বলে–'পালিয়ে যাওয়া যায় না?' আফসান রাজি হলেও পর মুহূর্তেই নিমার মাঝে দ্রোহের ভাবনা ফিকে হয়ে আসে। কারণ পালানোর দায়ে ভবিষ্যতে শ্বশুরের ভর্ৎসনা, 'অপয়া বউ' বলে শাশুড়ির গঞ্জনা এবং মা মীনার স্বামী-সংসারকে মানিয়ে নেবার সতর্ক বাণীর কথা মনে পড়ে। কারণ নিমা নিজের মায়ের জীবন দেখেই বুঝে নিয়েছে যান্ত্রিক নগরজীবনে বিত্তবানদের সংসার ভাঙতে সময় লাগে না। অবিশ্বাস, স্বার্থের হিসেব-নিকেশ আর নানা টানাপোড়েনে নর-নারীর দাম্পত্য জীবন বেলোয়ারি কাচের মতো নিমেষেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। স্বার্থঘেরা নাগরিক সমাজে টিকে থাকার জন্য দরকার হয় বিত্ত, বুদ্ধি আর সুসম্পর্ক। আর এসব স্বার্থ হাসিলের সুযোগ এনে দেয় বিয়ের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই এখানে আপ্যায়ন আর আন্তরিকতা থাকে স্বার্থের বৃত্তে বন্দি। এ উদ্দেশ্যেই বউভাত অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ অতিথিদের সঙ্গে আফসানের যোগাযোগের ঘাটতি দেখে এবং একই সঙ্গে চাকরি, ইনডেন্টিং ও কনসালটেন্সি চালানো আফজালুদ্দৌলা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন–

> 'আফসান মাই বয়...য়ু আর জাস্ট হোপলেস, তার বেশিও নও কমও নও। তোমাকে কি আমি কখনো বোঝাতে পারব যে সামাজিকতা, মানে পাবলিক রিলেশনস ইজ মোস্ট ভাইটাল ফর বিজনিস। বল, কখন তোমাকে বোঝাতে পারব?'-[বা.ও ম./পৃ.৩১৮]

আসলে নগরজীবনে এ বৌভাত নামক মহাযজ্ঞের আরেক নাম বিত্তবানদের এক মিলন মেলা। সামাজিকতার চাদরে ঢাকা থাকে ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির হিসেব। এ লাভ ও লোভের মনস্তত্ত্ব থেকে সংসারের সাধারণ গিন্নীও মুক্ত থাকে না। তাই নিমার বাবা-মায়ের মতো তার শাশুড়িও নিজেদের লাভের হিসেব মেলাতে জিজ্ঞাসা করেন–

> 'তোমার নানা তো খুব বড়লোক ছিলেন, তাই না?...তোমার মায়ের অনেক প্রপার্টি শুনেছি, ঢাকা শহরে বাড়িই নাকি খান পাঁচেক, তোমাকে কিছু দেননি?...তোমার নামে নাকি মগবাজারে একটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং আছে।...আর তোমার আব্বা? উনি কিছু দেননি? ওরও তো বহু প্রপার্টি...অবশ্যি ও ব্যাপারে চিন্তার কিছু নেই, দ্বিতীয় সংসারে তো ছেলেপুলে কিছু হলো না, যা করে যাচ্ছেন, সব তোমরা দু'ভাই-বোন পাবে।'-[বা.ও ম./পৃ.৩১২-৩১৩]

এমন স্বার্থঘেরা, লোভ ও লাভের হিসেবে মগ্ন, কৃত্রিম, মেকি নগরজীবন থেকে নিমা পালাতে চায়। এতে আফসানেরও পূর্ণ সম্মতি থাকে। আর সুযোগও এরা পেয়ে যায়। বাসর শেষে মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন উপলক্ষে আফজালুদ্দৌলার ব্যবস্থাপনাতেই দুই সপ্তাহের জন্য তারা কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এ মধুচন্দ্রিমার ভেতরেও থাকে নাগরিক অভিজাতশ্রেণির ঐতিহ্য ও আত্ম-অহংকারের প্রসঙ্গ। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্যও বিদ্যমান থাকে। প্রথমত; বিয়ের পর ছেলেকে হানিমুন করতে না দিলে সামাজিক আভিজাত্য থাকে না। দ্বিতীয়ত; ছেলেকে আরামের নেশায় বুঁদ করে রাখার এটা একটা ভালো উপায়। নিজস্ব গাড়িতে আফসান-নিমা দম্পতি মধুচন্দ্রিমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার মধ্য দিয়ে এক অর্থে তাদের প্রতিক্ষিত পালানোর উদ্দেশ্যটাও পূরণ হয়। নগরজীবনের যান্ত্রিকতা, মেকি ও কৃত্রিম জগৎ ত্যাগ করতে পেরে তাদের আনন্দ-উল্লাসের সীমা থাকে না। কারণ–

> 'শহরের সীমানা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। তারপরই মুক্ত দিগন্ত তাদের ডেকে নেয়। খোলা আকাশ, দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ ধানক্ষেত, আর দূরে দূরে গ্রাম দেখা যায়। যেতে যেতে আফসান নিমাকে শিমুল গাছ চেনায়, মাদারগাছ চেনায়, হিজল গাছ চেনায়। বেনে বউ পাখি দেখে নিমার খুশিতে হাততালি দিতে শুধু বাকি থাকে।'-[বা. ও ম./পৃ.৩২৪]

খাঁচা থেকে পালানো পাখির মতো মুক্তির এমন আনন্দ ও স্ফূর্তি নিয়ে তারা মেঘনা নদী পার হয়। খুনসুটি, ঠাট্টা আর রসিকতা করতে করতে দুজনে কুমিল্লা গিয়ে রাস্তার ধারে বটবৃক্ষ দেখে গাড়ি থামায়। গন্তব্যস্থল কক্সবাজার না গিয়ে এবং ড্রাইভারকে অবাক করে দিয়ে–

> 'দু'জন স্যুটকেস-ব্যাগ হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। তারপর হাসাহাসি করতে করতে দু'জনে আলপথ ধরে।...ঐভাবে তারা গ্রামের দিকে এগোচ্ছে।'-[বা.ও ম./পৃ.৩২৫]

আফসান-নিমা নবদম্পতির এমন সিদ্ধান্ত ও কর্মতৎপরতাকে আপাত দৃষ্টিতে একধরনের খেয়ালিপনা মনে হলেও এর মূলে ভিন্নতর উদ্দেশ্য বিদ্যমান। তারা নিয়মের ফ্রেমে বন্দি, যান্ত্রিক নাগরিক জীবনের অবসাদ ও গ্লানি ভুলতে যে-মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হয়েছিল, সেটিও কৃত্রিমতা, ক্লান্তি আর ভোগ-বাসনা দ্বারা আক্রান্ত। এ ব্যবস্থাপনাটিও বিত্তবানশ্রেণির হাত ধরেই গড়ে উঠেছে। তাই নিমা ও আফসান নাগরিক সমাজের এ উত্তাপ ও উন্মূলিত জীবন এড়াতে সুস্থ-সুন্দর ও শান্তিময় গ্রামীণ প্রতিবেশকে বেছে নেয়। কারণ খেটে খাওয়া কৃষক-কৃষাণীর সহজ-সরল-অকৃত্রিম জীবনচর্চা এবং ভেজা-নরম মাটির সংস্পর্শই মানুষকে দিতে পারে প্রকৃত মুক্তি ও প্রশান্তি।

বাসর ও মধুচন্দ্রিমা-র 'বাসর' শব্দটির মাঝে বাঙালি কিংবা বাংলাভাষীর কাছে একটি অনিবার্য বাসনা লুকিয়ে আছে। আবার সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধুচন্দ্রিমার মতো স্পর্শকাতর শরীরনির্ভর একটি শব্দবন্ধ। এখানে প্রাণ আর কাম একসঙ্গে একাকার। আনন্দের নির্মলতার সঙ্গে এখানে মিশে আছে কামার্ত আলিঙ্গনের গোপন বেলা। শওকত এখানে তাঁর স্বভাবজাত লেখক সত্তাকে যেন কিছুটা আড়াল করতে চান। আর কাহিনিকেও কিছুটা পরম্পরাহীন বলে মনে হয়। তবে হতে পারে এটিও তাঁর একধরনের এক্সপেরিমেন্ট। তবুও শেষপর্যন্ত শওকত আলী আত্মপ্রতীতির আহ্বানে থাকেন সজাগ ও সতর্ক।[২০] এ সমাজমনস্কতা থেকেই তিনি নাগরিক বিত্তবানশ্রেণির আভিজাত্য-অহং, অর্থপিপাসা, ভদ্রতার ছদ্মবেশ, যান্ত্রিক জীবনের বিবর্ণতা-বিবিক্তি, তাপ-চাপ-গ্লানি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পারঙ্গমতার সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। নাগরিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে জড়িত কিছু বিষয়কে সহজ-সরল করে বিম্বিত করে তিনি যেভাবে অনিবার্য করে তুলেছেন–তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আধুনিক শিক্ষা, শিল্প-প্রযুক্তি ও উৎপাদনের কেন্দ্র যে-নগর; সে-অতি-নাগরিক সভ্যতা মানুষকে ক্রমশই কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও বিলাসী করে তোলে। কিন্তু এক সময় যান্ত্রিকতার জাঁতাকলে পিষ্ট ও বন্দি হয়ে নাগরিক মানুষকে

মানসিক শান্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নিসর্গময় গ্রামের শরণ নিতে হয়। এমন সতর্ক-সংকেতকেই লেখক *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* উপন্যাসের প্রতিপাদ্য করেছেন।

পতন

শওকত আলীর *পতন* (১৯৯২খ্রি.) নগরজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এক অনবদ্য সৃষ্টিসম্ভার। *পতন* ও *বিদায় নিরঞ্জন* নামে দুটি পৃথক কাহিনি নিয়ে এ কথাবস্তু নির্মিত হয়েছে। নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, প্রেম-অপ্রেম, পুণ্য-পাপ, প্রত্যয়-প্রতারণা, বিকাশ ও বিনাশের প্রান্তগুলোকে ঔপন্যাসিক ভাষারূপ দিয়েছেন। দুটি আখ্যানে নগরজীবনের বিকার-বিবিক্তি, মেকি-কৃত্রিমতা, অনিকেত ও নৈঃসঙ্গ্যের বিষয়-আশয় প্রধান হয়ে উঠলেও লেখক সচেতনভাবেই নাগরিক মধ্যবিত্তের ঐতিহ্য ও জন্মশেকড়ের অন্বেষাকেই মৌল প্রতিপাদ্য করেছেন। পুঁজির পাপ, রূপের নেশা ও প্রযুক্তির তাপ-চাপ নগরবাসীকে করে প্রাণহীন, মমতাশূন্য, উন্মূলিত ও হতাশাগ্রস্ত। আধুনিক সভ্যতার এ অনিবার্য পতন-পচন উত্তরণে প্রয়োজন গ্রামীণ নিসর্গে প্রত্যাবর্তন ও প্রেমময় মানবিক সম্পর্কের সংস্পর্শ–এমন অভীপ্সাই এ কথাবস্তুর প্রাণশক্তি। শওকত আলীর *পতন* উপন্যাসটি জটিল নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র। আবদুল্লাহ ও বিলকিসের অনৈতিক রোমাঞ্চের অনুষঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে কাহিনির প্রচ্ছদপট। নারীসঙ্গ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার কুশলী প্রয়াসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনিবৃত্ত।[২১] এতে নাগরিক মধ্যবিত্তের মুখোশ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নিষ্ঠার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে।

হাসান আবদুল্লাহ পেশায় সাংবাদিক। তিনি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় চাকরি করলেও নাগরিক ক্ষমতাবানশ্রেণিরই পর্যায়ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষে তিনি প্রথমে মফস্বলের এক কলেজে অধ্যাপনার পেশায় যুক্ত হন। কিন্তু দুই পুরুষ আগে গ্রামত্যাগ করা উচ্চাভিলাষী আবদুল্লাহ জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আদর্শের পেশা বাদ দিয়ে রাজধানী ঢাকায় ফেরেন এবং এক জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকায় চাকরি নেন। এ সাংবাদিকতা সূত্রেই রাজনীতিক, আমলা ও কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সঙ্গে আবদুল্লাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রে যাবার সিঁড়ি পেয়ে যান এবং দ্রুত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানদের মহলে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। এ জন্য আবদুল্লাহকে–

> 'বহু ঠেকে, বহু ধাক্কা খেয়ে এ পথে আসতে হয়েছে। আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্কটি দিব্যি তার বজায় আছে, সেক্রেটারিয়াটের আমলাদের সঙ্গে পুরনো পরিচয়ের জের ধরে এখন জমজমাট হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছে সে। রাজনৈতিক দাবাখেলায় মাঝেমধ্যে দামি ভূমিকা নিতে পারে সে। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য তার ভাবনা নেই। টাকা-পয়সা যা আছে যথেষ্ট, প্রভাব-প্রতিপত্তির সহজ রাস্তাটা হয় মন্ত্রিত্ব নইলে রাষ্ট্রদূতের আসনে তাকে পৌঁছে দেবে।'-[পতন; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৭ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/পৃ.৩২৪-৩২৫]

দীর্ঘ পনেরো বছরের পরিশ্রম আর সাধনায় আবদুল্লাহ নিজের এ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন। তবে সমৃদ্ধির এ সিঁড়ি বেয়ে উপড়ে উঠতে তাকে অনবরত অন্যায় ও অনৈতিকতার সঙ্গে আপস করতে হয়েছে। কারণ সাংবাদিকতার যশ-খ্যাতিকে পুঁজি করেই তিনি ম্যানপাওয়ার এজেন্সি ও শেয়ারে হ্যান্ডিক্রাফটের এক্সপোর্টের লাইন পান। আর তেহাত্তরের প্রেক্ষাপটে আসলাম ফারুকীদের মতো দালাল-রাজাকারদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে প্রেস, বাড়ি-গাড়ি ও বিত্তবৈভবের মালিক হন। এ অর্থবিত্ত অর্জনে আবদুল্লাহ শুধু সাংবাদিকতার আদর্শকেই জলাঞ্জলি দেননি বরং নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ থেকেও বিচ্যুত হন। হ্যান্ডিক্রাফটের ব্যবসায় গিয়ে তিনি একে একে ব্যবসায়িক পার্টনার নাহিদা আজিজ, নূরজাহান ছবি, কারিমা ইউসুফ ও বিলকিস মাহমুদের সঙ্গে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়েন। পুঁজির এ অনিবার্য পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হবার কারণে আবদুল্লাহ স্ত্রী রোকেয়া, সন্তান মিঠু ও তিশমার কাছে থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যে রোকেয়া তাকে ভালোবেসে বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করেছিল, সে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে আবদুল্লাহ প্রতারিত করেন। আবদুল্লাহর এমন ব্যবহার ও বিশ্বাসভঙ্গের কারণে রোকেয়ার জীবনভূগোলও দ্রুত পাল্টে যায়। ধানমন্ডির অফিসে গিয়ে রোকেয়া নিজ হাতে ব্যবসায়িক পার্টনার নাহিদা আজিজের সঙ্গে স্বামীর ব্যভিচার দেখে নিজেকে গোটাতে শুরু করে। তাই সে–

> 'প্রথম প্রথম আবদুল্লাহর সান্নিধ্য ঠেকিয়ে রাখত–কিন্তু কতদিন? আর তাই নাকি পারা যায়। পারা যায়নি। আর প্রতিবারই তার নিজেকে কলুষিত মনে হত। ঘেন্নার অনুভূতিটা মন থেকে শরীরে ছড়ায় এবং এক সময় বোধবুদ্ধির শাসন অস্বীকার করে শরীরের প্রতিটি অনুকণা পাগল হয়ে যায়। সুতরাং বারবিচুরেট আর বারবিচুরেট। ঘুম আর ঘুম।'-[পতন/পৃ.৩৩১]

স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা থেকেই রোকেয়া গভীর রাত অবধি চাপা আর্তনাদে কাঁদতো, দেয়ালে মাথা ঠুকতো এবং মেঝেতে গড়াগড়ি করে হাত পা আছড়াতো । স্বামীর সুমতি ও শুভবোধের উদয় না দেখে সে ক্রমশই নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং শরীর মন 'পাথরের মতো স্থির এবং অচঞ্চল' হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে ঘুমের নেশার আশ্রয় নেয় এবং মনের দুঃখে নিরাভরণ দেহে সাদা কাপড় বেছে নেয়। যা প্রতারক ও লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে রোকেয়ার শরীরী সান্নিধ্যের প্রতিবন্ধক এবং লাগামহীন ভোগের বিপরীতে আত্মসংযমেরএক প্রতীকী প্রতিবাদ। নিজেকে ঘুমের ঘোরে নিমজ্জিত রেখেই মন-প্রাণের দিক থেকে মরে যাওয়া রোকেয়ার দিন কাটে। ডাক্তার ছেলে মিঠুর পাপ-তাপের ঢাকা নগর ছেড়ে পীরগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের কর্মক্ষেত্রে বসবাসের সিদ্ধান্ত ও আগ্রহ দেখে সে স্বস্তি পায়। এজন্য রাজধানী ঢাকার নগরজীবনের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে মেয়ে তিশমাকে বলে–

> 'আরো কিছুদিন যাক, বিয়ে হোক, তখন বুঝবি ঢাকা কেমন জায়গা। ঢাকায় প্রতারণা আছে, ভণ্ডামি আছে, মিথ্যে আছে, অহংকার আছে–এখানে আমি ওকে থাকতে বলব কেন, বল?'-[পতন/পৃ.৩২৯]

রোকেয়া কখনোই চায়নি শুভবোধসম্পন্ন মিঠু ঢাকায় অবস্থান করে নগরজীবনের পাপ-পঙ্কে কলুষিত হোক। তাই সে ছেলের ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। আবার স্বামীর চরম বিপদকালেও রোকেয়াকে দেখা যায় নির্ভার ও নির্বিকার। এসময়ও তাকে সাদা শাড়ি পরা অবস্থায় বিদ্রূপের হাসি হাসতে দেখা যায়। যা আবদুল্লাহর কাছে প্রতিভাত হয়–

> 'বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে রোকেয়া।...অন্যান্য দিনের মতোই ঐ সাদা শাড়ি যেন প্রচণ্ড একটা বিদ্রূপ। হ্যাঁ, আবদুল্লাহর পৌরুষকে এবং স্বামিত্বকে বহুকাল ধরে বিদ্রূপ করে আসছে রোকেয়া। মুখে কিছু বলেনি।...রোকেয়া মনে করে তার স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেছে।'-[পতন/পৃ.৩৬১]

স্বামী আবদুল্লাহর বেপরোয়া ভোগ আর অন্যাসক্তির প্রতিবাদে রোকেয়া আশ্রয় নেয় আত্মবিবরে। নীরবতাই তার প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। রোকেয়ার কাছে এক অর্থে স্বামী আবদুল্লাহ মৃত এবং সেই বিতৃষ্ণা থেকেই সে কখনো রঙিন শাড়ি পড়ে না। আবদুল্লাহর যথেচ্ছচারী আচরণের বিপরীতে স্ত্রী রোকেয়া নিজের অবস্থান ধরে রাখে তার প্রখর দৃঢ়তা, তেজ এবং ক্ষোভের মধ্য দিয়ে।[২২] রোকেয়ার শ্বেতবস্ত্র পরিধান, নিরাভরণ বেশবাশ এবং ছন্দহীন যাপিত জীবন স্বামী আবদুল্লাহর প্রতি এক তীব্র প্রতীকী প্রতিবাদ। এমতবস্থায় আব্দুল্লাহর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে–

> 'রোকেয়ার কাছে তার মুখ নেই–ছেলেমেয়েদের কিছু বলতে পারে না সে।...সে এমন একটা রাস্তায় চলেছে যে রাস্তার চলাটাই আলাদা ধরনের। ক্লাবে যেতেই হবে, পার্টিতে শরিক না হলে চলবে না এবং মদ্যপান করে মাতাল না হয়ে উপায় নেই।'-[পতন/পৃ.৩৩২]

এজন্যই আবদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী মাহমুদের স্ত্রী ও রুমনির মা বিলকিসের সঙ্গে গড়ে ওঠা দশ বছরের পরকীয়ার সম্পর্ক ছাড়তে পারে না। স্বার্থের হিসেব এবং লাভ-ক্ষতির টানাপোড়েনে চারবার সম্পর্ক শিথিল হলেও কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি। আবার বিলকিসের নারীত্বের ও ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়ের মূলে শুধু উচ্চাশা ও অর্থবিত্তের বিকার দায়ী নয়, বরং কার্যকর রয়েছে স্বামী মাহমুদের ভোগপ্রবণতা, সুরাসক্তি, লাম্পট্য স্বভাব ও দায়িত্বহীনতা। স্বামী সম্পর্কে তাই সে বলে–'মাহমুদ আমাকে কি দিয়েছে বলো? দু-বার প্রেগনেন্সি ব্যস! কখনো আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখেনি। লম্পট, মাতাল আর অথর্ব লোক একটা।–ছি! এ কি জীবন আমার।' বিলকিসের জন্য একবার আবদুল্লাহ স্ত্রী রোকেয়াকে তালাক দেবার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। কিন্তু বিলকিসের দুই সন্তানের ঝামেলা আর অতিমাত্রায় স্বার্থচিন্তার কারণে নিজের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাননি। তারপরেও রমণবিহারী আব্দুল্লাহ নিজের ভোগবাসনাকে নিষ্কণ্টক করতেই ঢাকার অভিজাত এলাকায় বিলাসী বাড়ি বানায়। প্রমোদলীলার এমন নিরিবিলি-নির্ঝঞ্ঝাট আয়োজন দেখে বিলকিস বিদ্রূপ করে বলে–

> 'প্রমোদলীলার একটা ভালো জায়গা হয়েছে।...এমন নিরিবিলি আরামের জায়গা। মেয়েবন্ধুকে নিয়ে সময় কাটাবার এমন সুন্দর জায়গা আর কার আছে বলো?...তুমি আসলে মিনমিনে শয়তান।'-[পতন/পৃ.৩২০]

আবদুল্লাহর বহুগামী স্বভাবের কথা বিলকিসের কাছেও অজানা নয়। তাই চতুর ও বহুরূপী আবদুল্লাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই বিলকিস কৌশলে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরির আগ্রহ দেখিয়ে বলে– 'তোমার ছেলের বউ করে নাও না ওকে (রুমিনকে), তাহলে তো বেশ হয়।' আবদুল্লাহও এতে সম্মতি জানায়। আসলে এ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এরা লাগামহীন ভোগবাসনায় এক সামাজিক আবরণ দিতে চেয়েছে। সদ্য ডাক্তারি পাশ করা মিঠু বাবা আবদুল্লাহর পরামর্শ আমলে না নিয়ে পীরগঞ্জের কর্মস্থলে যোগদান করে। নগরজীবনের দাবদাহ, কৃত্রিমতা, প্রতারণা ও যান্ত্রিকতায় জর্জর বিষবাষ্প

এড়াতে সে পীরগঞ্জকেই বেছে নেয়। থাকা-খাওয়ায় কষ্ট হলেও স্থানীয় টাঙন নদীর প্রকৃতি, পাহাড়ি এলাকার অপূর্ব শোভা, গরু চড়াতে আসা রাখালদের বাঁশির সুর, আইয়ুব আলী ও মথুরা মাঝির সংস্পর্শ পেয়ে মিঠুর জীবনবোধের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। নিজের বাবা-মায়ের নরকসদৃশ যাপিত দাম্পত্যজীবনের বিপ্রতীপে এ গ্রামীণ নিসর্গময় জীবনচর্চাই যে-খাঁটি, প্রীতিময় ও স্বাস্থ্যপূর্ণ–তা সে উপলব্ধিতে নিতে সক্ষম হয়। তাই বোন তিশমার শহরে থাকার অনুরোধের জবাবে সে বলে–

> ‘আমি ধার করেছি দেশের মানুষের কাছে। দেশের মানুষ, মানে একেবারেই সাধারণ মানুষ, যারা গ্রামে থাকে, কখনোই শহরে আসে না–মানে আসার সুযোগ পায় না। তাদের টাকা দিয়েই তৈরি হয়েছে ভদ্দরলোক বানানোর জন্য কলেজ, ইউনিভার্সিটি এইসব প্রতিষ্ঠান–আমি এই মেডিক্যাল কলেজে পড়ে তাদের কাছে আসলে ধার করেছি।’-[পতন/পৃ.৩২৮]

আসলে দেশের বর্তমান নগরসভ্যতা সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের শ্রমে-ঘামে-রক্ত জলকরা অর্থের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে। অথচ নাগরিক সুবিধার পুরোটাই ভোগ করে আবদুল্লাহর মতো বিত্তবান-স্বার্থান্বেষী মানুষেরা। জীবনে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা যারা পায় না, সেসব গ্রামীণ সরল-অসহায় মানুষের সেবা করাকেই মিঠু ডাক্তার জীবনের পরম ব্রত বলে মনে করে। তাই প্রেমিকা রিফাত ‘গ্রামে যাব আমি’– বলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও মিঠু তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। মিঠু প্রেমের অধিকার থেকেই হবু স্ত্রী রিফাতকে গ্রামে থাকতে বলে। তাই রিফাতের বাবা বিত্তবান রশিদ মল্লিকের দেখানো অর্থের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে সে বলে–‘বিয়ে করব আপনার মেয়েকে আপনাদের দেওয়া সাহায্যকে নয়।’ এমন ব্যক্তিত্বের কারণেই মিঠু বাবার লেলিয়ে দেয়া বিলকিসের মেয়ে রুমনির মায়াবী হাতছানিও প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ মিঠুর সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে এসে রুমনিও নগরজীবনের মেকি ও মিথ্যার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং জীবনার্থের সন্ধান পায়। তাই সে রুমনিকে বলে–

> ‘আমরা কি ওদের হাতের সোনার পুতুল? বল? ওদের টাকা আছে বলে যা ইচ্ছে ওরা তাই করবে। আমাদের রুচি, আমাদের ইচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু নিয়ে ওদের শুধু খেলা। আমরা ওদের ছেলেমেয়ে হতে পারি, কিন্তু পুতুল তো নই।’-[পতন/পৃ.৩৫৬]

নগর জীবনের পঙ্কিল প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা দিকভ্রান্ত রুমনি মিঠুর সংস্পর্শে জীবনের শুদ্ধ সত্তার উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই রুমনিকে মিঠু বলে–‘আমরা যা হতে চাই না আমাদের তাই বানাতে চায় আমাদের বাবা-মা রা। এটা হচ্ছে গিয়ে জীবনের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র– এরকম খারাপ কাজ আর হতে পারে না।’ মিঠু ও রুমনির এমন জাগরণ দেখে, আত্ম-আবিষ্কারের এমন সম্মোহনী শক্তি দেখে বিত্তের বিকারগ্রস্ত আবদুল্লাহ ও বিলকিস দুশ্চিন্তায় পড়ে। মিঠু মা ও বোনের সমর্থনে বাবার সকল কূটকৌশলের ফাঁদ অতিক্রম করে কর্মস্থল পীরগঞ্জে অবস্থান করেই দরিদ্র-অসহায় মানুষের সেবা-শুশ্রূষা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তাই হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র সংগ্রহ করতে পরিচিত বন্ধুদের কাছে হাত পাতে। আবার স্বাস্থ্য বিভাগে ওষুধের আবেদন করতে গিয়ে মিঠুর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। সে বুঝতে পারে রাষ্ট্রযন্ত্র আর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের অবাধ চুরি, ঘুষ, দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের কারণেই গ্রামের হাসপাতালগুলোর দৈন্যদশা ও ওষুধের ঘাটতি। আর এ অর্থ লালসা ও ক্যারিয়ারের চিন্তা থেকেই ডাক্তাররা গ্রাম-মফস্বলে যেতে চায় না। আবদুল্লাহ একইভাবে অর্থ যোগানদাতা লীলাভাবীর মেয়ে সোনিয়াকেও মিঠুর কাছে পাঠিয়েও বিফল হন। এসব কূটকৌশলে ব্যর্থ হয়ে আবদুল্লাহ ছেলে মিঠুকে পীরগঞ্জের কর্মস্থলে যেতে নিষেধ করেন। আর রাজধানী ঢাকায় থাকার নানা সুযোগ-সুবিধা ও জীবনে দ্রুত প্রতিষ্ঠা পাবার প্রলোভন দেখান এবং বদলির ব্যাপারে তদবির ও তদারকির আশ্বাসও দেন। কিন্তু মিঠু তার ফাঁদে পা না দিয়ে বরং পীরগঞ্জের দরিদ্র মানুষের সাহায্যে কিছু ওষুধ কিনে দেবার আবদার জানালেও আবদুল্লাহ কর্পোরেট পুঁজিপতির স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন–

> ‘বড়োলোকেরা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যও যা করে তার মধ্যেও একটা হিসেব থাকে। নিজের এলাকায় দানখয়রাত করলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে এবং সেটা শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা শেয়ার করার সুযোগ করে দেয়।আর দ্বিতীয় হিসেবটা হলো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করলে এমন একটা এস্টাবলিশমেন্টকে দান করা হয় যা বড়োলোকদের কোনো সময় লেট-ডাউন করে না।’-[পতন/পৃ.৩৪৫]

আসলে আবদুল্লাহর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিত্তবান শ্রেণির আয়কর ফাঁকির দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। আবার দান-দক্ষিণার পেছনেও যে-বিচিত্র স্বার্থের হিসেব থাকে– এমন বাস্তবতারও ইঙ্গিত মেলে। সববিষয়ে এমন হিসেব আর সতর্ক থাকার পরেও আবদুল্লাহর একসময় পতন শুরু হয়। পত্রিকার মালিকানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার পদেরও অবনমন ঘটে। পরিচিত অর্থযোগান দাতা লীলা ভাবীও বিরূপ হয়ে ওঠেন। বিলকিস তাকে প্রত্যাখ্যান করে আর নাহিদাকে পাওয়া যায়

রূপহীন ও ঐশ্বর্যহীন অবস্থায়। চাকরি-ব্যবসায়ে বিপর্যয়, স্ত্রীর প্রবল ঘৃণা আর সন্তানদের সহানুভূতি বঞ্চিত আবদুল্লাহ শেষপর্যন্ত অনিবার্য পতনে নিমজ্জিত হন। তাই–

> ‘ভয়ে তার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে।...সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে, কাছাকাছি কোনো মানুষ নেই। শুধু তারই দিকে তাকিয়ে ভয়ানক নিঃশব্দ হেসে যাচ্ছে রোকেয়া।...অসম্ভব পবিত্র লাগে ঐ মুহূর্তে রোকেয়াকে–পবিত্র ও সুদূর। শুধু রোকেয়া নয়, বাড়িঘর, সংসার, ছেলেমেয়ে সবই যেন দ্রুত বহু দূরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয় তার। এবং তারপরই হঠাৎ মনে হয় তার পা জোড়া ওপরে উঠে গেছে এবং মাথাটা নেমে এসেছে নিচুতে।’-[পতন/পৃ.৩৬১-৩৬২]

এভাবে সকল মানবীয় সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রেম-প্রীতির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থপিশাচ ও বহুভোগী আবদুল্লাহর যে-ভয়াবহ পতন সূচিত হয়, তা রোধ করার ক্ষমতা তার থাকে না। পুঁজির পাপ ও বিত্তের বিকারে সে যে-অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয়–এটিই হয়ে ওঠে তার নিয়তি। এর জন্য সে নিজেই দায়ী। মিঠুর আদর্শ ও স্বাধীনচেতা মনোভাব আঘাত করে পিতা আবদুল্লাহকে। পিতার জীবনবোধের বিপ্রতীপ মেরুতে অবস্থান পুত্র মিঠুর। মিঠুর সুবিধাভোগী উচ্চবিত্তের প্রতি এক ধরনের ক্ষোভ স্পষ্টত লক্ষ করা যায়। যা উদ্ভূত হয়েছে তার পরিবার থেকেই। পিতার নৈতিকতাহীন জীবনের বিপরীতে পুত্র মিঠুর নৈষ্ঠিক-আদর্শবাদী জীবন এ উপন্যাসে তৈরি করেছে একধরনের ভারসাম্য।[২৩] তাই পীরগঞ্জের দুঃখ-কষ্টের জীবনকেই সে সাময়িক প্রায়শ্চিত্ত বলে মেনে নেয়। পিতার এলিটিয় মনোভাবের পাশে মিঠু যেন প্রাকৃত নরনারীর আপনজন। মিঠু শওকত আলীর সযত্ন সৃষ্টি। তার মাধ্যমে লেখক আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বহু সমস্যা ও অবস্থা চিহ্নিত করেছেন এবং সমাধানেরও পথ নির্দেশ করেছেন।

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে আবদুল্লাহর সিঁড়ি দিয়ে পতনটি ব্যঞ্জনাদীপ্ত। ক্ষমতা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, উচ্চবিত্তশ্রেণির সাহচর্য এবং এলিট সম্প্রদায়ের আকাশচুম্বী অবস্থান থেকে আবদুল্লাহ পতিত হন বাড়ির সিঁড়ি থেকে। যা আবদুল্লাহর চাকরি-ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক বিপর্যয়েরও ইঙ্গিতবাহী। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উচ্চবিত্তশ্রেণিতে উন্নীত হবার উত্থানপর্বটি আবদুল্লাহর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। আবদুল্লাহর পতন ও পরিণামের মধ্যেও লেখক রোকেয়া ও মিঠুর শুভ্র-সদর্থক জাগরণ ঘটিয়েছেন। এটিই *পতন* পর্বের উজ্জ্বল প্রান্ত।

বিদায় নিরঞ্জন পর্বে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি নিরঞ্জন ডিরোজিওর মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে আশির দশকের প্রারম্ভকালীন (১৯৮১-১৯৮৩) সময়-স্বভাবকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভাষারূপ দিয়েছেন। এ পর্বটি কেবল ব্যক্তি নিরঞ্জনের প্রেম-অপ্রেম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, পূর্ণতা ও শূন্যতার আলেখ্য হয়ে ওঠেনি বরং বৈরী সময়পর্বে নাগরিক মানুষের ভণ্ডামি, প্রতারণা, ক্লেদ ও গ্লানিজর্জর যাপিত জীবনের সত্যভাষণ হয়ে উঠেছে। কারণ *বিদায় নিরঞ্জন* পর্বটি অন্তর্মুখী এক মানুষের উজ্জ্বল জীবনকথা। নিরঞ্জনের নিভৃত জীবন আকস্মিক মৃত্যুতে সমাপ্তি লাভ করে। কিন্তু তার বেঁচে থাকার সময়ে এবং মৃত্যুর পরে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে জীবিতাবস্থায় তার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার কথা। স্বজন ও বন্ধুদের মুখে মুখে কীর্তিত হয়েছে নিরঞ্জনের মানবিক স্বাতন্ত্র্যের গৌরবের দিক।[২৪] স্কুল শিক্ষক বন্ধু চন্দনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে নিরঞ্জনের সর্বত্যাগী জীবনাদর্শের কথা। সমগ্র কাহিনিটি ফ্লাশব্যাক করে অনেকটা চলচ্চিত্র রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। চলমান ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়েছে নিরঞ্জনের সংগ্রামী জীবনের টুকরো টুকরো ছবি।

মুক্তিযোদ্ধা নিরঞ্জন ডিরোজিও ধর্মে খ্রিষ্টান এবং পেশায় হিসাব রক্ষক। ঢাকার পার্শ্ববর্তী দোহার-নবাবগঞ্জের কলাকোপা-বান্দুরা এলাকায় তার জন্ম। শৈশবে তার মা মৃত্যুর মুখে পতিত হবার পূর্বে এক জ্ঞাতি বোনের কাছে তাকে দিয়ে যান। স্থানীয় খ্রিষ্টান মিশনেই নিরঞ্জন প্রতিপালিত হয়। এখানেই শিক্ষাগ্রহণ করে সে বেড়ে ওঠে। এ পাতানো পিসিই হয়ে ওঠে নিরঞ্জনের পৃথিবীর একমাত্র স্বজন ও হিতাকাঙ্ক্ষী। অসহায়-এতিম নিরঞ্জনের শৈশবকালীন শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে বৃদ্ধা পিসিমা বলেন–

> ‘কেমুন সুন্দর পোলা–কপালটা চওড়া–রেশমের মতন চুল–এক্কেরে মাথাভর্তি–চক্ষু দুইখান দেখলে পরানটা জুড়াইয়া যায়।...এই পোলা বড়ো মানুষ হইবো।’-[বি.নি./পৃ.৪০২]

শারীরিকভাবে নিরঞ্জন সুশ্রী ও সুলক্ষণ চেহারার অধিকারী হলেও সংক্ষুব্ধ সময় বাস্তবতায় তার জীবন-প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তিতে অপূর্ণতাই থেকে যায়। কারণ সে শৈশব থেকেই অনাদর-অবহেলায় সংগ্রাম করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে এবং হিসাব রক্ষক

পদে চাকরিও পায়। পুরাতন ঢাকায় বসবাস সূত্রে সে স্কুলশিক্ষক চন্দন, কোম্পানির চাকুরে খোন্দকার ফরহাদ, উকিল আশরাফ, গিয়াসউদ্দিন ও মহিবুল্লাহর মতো বন্ধু পায়। কিন্তু উদার মন, দয়ালু স্বভাব আর পরোপকারী মানসিকতার কারণে সে জ্ঞাতি পিসির ভরণ-পোষণ, প্রেমিকা মিনতি ডি কোস্টার লেখাপড়ার খরচ বহন এবং বন্ধুদের বায়না মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অথচ হঠাৎ জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের অনাদর-অবহেলায়-নির্বান্ধব পরিবেশে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু চন্দনের মানসলোকে প্রচণ্ড বেদনার উদ্রেক করে এবং নাড়া দেয় তার সংবেদনশীলতাকে। এ সম্পর্কে চন্দন বলে–

> 'এভাবে লোকটা হঠাৎ করে মারা যাবে, কল্পনাও করা যায়নি।...নিরঞ্জন মারা যাবার সময় কেউ ছিল না কাছে, হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সও না।'-[বি.নি./পৃ.৩৬৩-৩৬৩]

অথচ নিরঞ্জন ধর্মনিষ্ঠ খ্রিষ্টান মেয়ে মিনতিকে ভালোবেসেছে এবং এ দায়ভার থেকেই তার পড়ালেখার সমস্ত খরচ বহন করেছে। কিন্তু কলেজের লেখাপড়ার পাট চুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিনতি এক অখ্রিষ্টান ছেলের সঙ্গে ভেগে যায়। মিনতির দ্বারা এমন প্রতারিত হয়েও নিরঞ্জন তার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করেনি ও কটূকথাও বলেনি। উপরন্তু তার সমস্ত ইনসিওরেন্স ও বেনেভোলেন্ট ফান্ডের নমিনি সে মিনতিকে করায় আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়। মিনতি চলে গেলেও তার প্রতি নিরঞ্জনের বিশ্বাস ও আস্থা পূর্ববৎ অবিচল থাকে। এ প্রসঙ্গে চন্দন জানায়–

> 'তখনো নিরঞ্জনের বিশ্বাস মিনতি তার কাছেই আসবে। তার চিঠিগুলো সে বালিশের তলায় রাখত সব সময়। কত রকমের যে মানুষ থাকে দুনিয়ায়।'-[বি.নি./পৃ.৩৬৭]

অথচ নিরঞ্জনই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ মিনতি, বন্ধু ফরহাদ, বন্ধুপত্নী কুলসুম ও কিশোরী মেয়ে টুটুকে চরম বিপদের মুহূর্তে জীবন বাজি রেখে রক্ষা করেছিল। সে রমনা পার্কের ডুবে যাওয়া এক তরুণীকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আবার বন্ধুদের বিপদে নিরঞ্জন সর্বদাই সবার অগোচরে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। মহৎ মনের অধিকারী অথচ চাপা স্বভাবের নিরঞ্জনের এমন মৃত্যু কোনোভাবেই চন্দন মেনে নিতে পারেনি। তাই ক্ষোভের সুরে বলে–

> 'শালা নিরঞ্জন এমন বেঘোরে মরে গেলি তুই। নীলিম কি জানে তোর মরণের কথা? না, জানে না–কেন জানবে; তোর কোনো খবর কেউ জানুক, তার ব্যবস্থা তুই রেখেছিস? জ্যান্ত অবস্থায়, না মরণ অবস্থায়? তুই বড়ো চুপচাপ ছিলি। নিজের কথা জানতে দিতে বড়ো লজ্জা ছিল তোর, এমনকি মিনতিকে পর্যন্ত জানতে দিতে চাসনি; তোর নিজের ইচ্ছের কথাটা।'-[বি.নি./পৃ.৩৮৯]

এভাবেই নিরঞ্জন নিজেকে গুটিয়ে রেখে, আড়াল-আবডাল করে এবং মনের কথা প্রকাশ না করেই নিঃস্বার্থভাবে মিনতিকে ভালোবেসে যায়। নিকট বন্ধু ও পরের উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এ প্রেম, দায়িত্ব-কর্তব্য ও সহানুভূতিতে শতভাগ সৎ ও অবিচল থাকতে গিয়েই সে এমন পরিণতির শিকার হয়। পরকে আপন করতে গিয়ে তাকে সারা জীবন পথে পথেই থাকতে হয়। সে সংসার বৃত্তের ভেতরে কখনো প্রবেশ করতে পারেনি। তার এ নিঃস্বার্থ ও নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে চন্দন বলে–

> 'তুই বাবা অ্যাকাউন্টসের কাজ করতিস, মোটামুটি রোজগার ছিল–একা মানুষ, বেশ তো ছিলি। কিন্তু না, ঐরকম থাকা তোর পছন্দ ছিল না। গাঁয়ের পিসির সংসার টানতে গেলি, ওদিকে আবার মিনতিদের সংসার–গরিব ছেলেরা আসতো তোর কাছে, বন্ধুরা বায়না ধরতো। এক চাকরি থেকে দুই চাকরি–কাজে পারতিস, এড়িয়ে যেতে পারতিস। কিন্তু না, পাললি না, এড়িয়ে গেলি না–বেকুবের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলি।'-[বি.নি./পৃ.৩৮৫]

এভাবে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পরোপকার করতে গিয়ে নিরঞ্জনকে এক রকম রিক্ত-নিঃস্ব-নির্বান্ধবরূপে বিদায় নিতে হয়। সবাই তাকে ভুলে গেলেও রক্তসম্পর্কহীন গ্রামের জ্ঞাতি পিসিমা বাৎসল্যের টানে ঠিকই নিরঞ্জনকে দেখতে ঢাকায় আসেন। মায়ের আর্তি-উৎকণ্ঠার সুরে বৃদ্ধা পিসি নার্স কুলসুমের উদ্দেশ্যে বলেন– 'আইতে পারি না, বুড়া মানুষ, একলা ক্যামনে আহি–আইজ ভোরে আইছি–আমার মনডা কেমুন জানি করতাছে মা, নীরুরে আমি কই পামু কইয়া দাও।' অথচ এ পিসিমার চোখের জল ঝরিয়ে নিরঞ্জনকে সমাধিস্থ করা হয়। এসময় অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে চন্দনও উপস্থিত থাকে। নিরঞ্জনের জীবনাদর্শের স্বরূপ উপলব্ধি করে চন্দন এক তাৎপর্যপূর্ণ বোধের সীমানায় উপনীত হয়। কারণ পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকাটা জরুরি; কিন্তু তা অবশ্যই হতে হবে উদ্দেশ্য নিয়ে, মূল্য নিয়ে ও আদর্শ নিয়ে। আমৃত্যু এমন আপসহীনভাবে, আদর্শ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটা সত্যই দুরূহ কাজ। যা নিরঞ্জন তার যাপিত জীবন ও কর্ম দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যাকে সমকালীন চাকরির মোহ, ব্যবসায়ের বিকার, রাজনীতির নোংরামি, অশ্লীল ভাঁড়ামো এবং নগরজীবনের পাপ-পচন-হতাশা স্পর্শ করতে পারেনি।

নিরঞ্জনের নিঃস্বার্থবোধ ও পরার্থচেতনার বিপরীতে খোন্দকারের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে টুটু ও আহসানের প্রেমের বাতাবরণে কাম-প্রতারণার অনিশ্চিত সম্পর্ক, হাসপাতালে সুন্দরী রোগীর প্রতি ডাক্তার কাদিরের বিকারগ্রস্ত মানসিকতা এবং খোন্দকার ফরহাদের প্রচার পাওয়া নপুংসক অবস্থা নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের করা অশ্লীল রসালাপ রূপায়ণে শওকত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের বৈচিত্র্য ও বিকার, সৌন্দর্য ও কদর্যতাকে নির্মোহভাবে দেখার এক সহজাত শক্তি রয়েছে লেখকের। ডাক্তার কাদির ও আহসানের কুশ্রী জীবনদৃষ্টির পাশে নিরঞ্জনের নির্মল-নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন উপন্যাসে এনেছে ভিন্ন স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্য। মনুষ্যত্বহীন সমাজের জটিল বাস্তবতায় নিরঞ্জন চরিত্রটিকে আগন্তুক বলে মনে হয়। নিরঞ্জন যেন অচিন আলোর ইশারা। সাংসারিক ও জাগতিক ক্লিন্নতার মধ্যে নিরঞ্জন নিয়ে আসে অনির্বচনীয় অনুভব ও মনুষ্যত্বের উদার আহ্বান। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জীবনের জয়গান গেয়ে যায়। শওকত আলীর উপন্যাসে মানুষের যে- সহজাত আন্তরিক রূপের পরিচয় সচরাচর পাওয়া যায়, নিরঞ্জন সেই মানুষদের মধ্যে উজ্জ্বলতম।[২৫] কাহিনিতে সক্রেটিসের বিষপানে আত্মহত্যার প্রসঙ্গটিকে ঔপন্যাসিক নিরঞ্জনের জীবনের সমান্তরালে প্রতীকী অনুষঙ্গে দেখার প্রয়াস চালিয়েছেন। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সক্রেটিস যেমন সত্যপ্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণে অনায়াসে মুখে বিষ তুলে নিয়েছিলেন, নিরঞ্জনও তেমনি তার চারপাশের বৈরিতা ও প্রতারণাকে উপলব্ধি করেও পরোপকারে পিছপা হয়নি। তাই *বিদায় নিরঞ্জন* নামকরণের মধ্যে এক গভীর বেদনা এবং এক তীব্র বিরোধাভাস লক্ষ্যণীয়।[২৬] যা সমকালীন নাগরিক মানুষের অন্তর্হিত-অবলুপ্ত মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটের বিপরীতে জীবনের মহৎ, মানবতা ও পরার্থপরতার কথা জানান দিয়ে যায়।

শওকত আলী জীবনবাস্তবতার রূপদক্ষ শিল্পী। জীবনকে আন্তরিকতার ঋজুটানে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত। সময়-স্বভাব ও মানুষের জীবন রূপায়ণে তিনি যে-বয়নরীতি গ্রহণ করেন তাতে নিরীক্ষার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। তিনি মনে করতেন অতিমাত্রায় নিরীক্ষা প্রকৃত জীবনকে আড়াল করে। তিনি জীবনকে প্রাকৃত ও নিরাভরণ দৃষ্টিতে দেখতেই সাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। অর্থাৎ জীবন বাস্তবে যেমন, তাকে ঠিক তেমনভাবে উপস্থাপনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। *বিদায় নিরঞ্জন* পর্বে এ ধারার জীবন রূপায়ণের প্রযত্ন-প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়।

জননী ও জাতিকা

শওকত আলীর *জননী ও জাতিকা* (২০০১খ্রি.) উপন্যাসটি নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির যাপিত জীবন ও মনস্তত্ত্বের এক শিল্পিত দর্পণ। জননী আবিদা ও জাতিকা রীনার জীবনপরিসর, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি আর চেতনাস্রোতের অনুষঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্তের স্তর থেকে নাগরিক মধ্যবিত্তে রূপান্তর এবং এতদ্‌জাত তাপ-চাপ, বিকার-বিনাশ, উদ্যম ও উন্নাসিকতার বাস্তব চালচিত্র এ কথাবস্তুর মূল সুর হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত-জীবনচেতনে নারীর অবস্থান কোথায়–এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জননী আবিদাকে জীবনযুদ্ধে নামিয়ে দেন; যেখানে জাতিকা রীনা তার প্রতিপক্ষ। সে মায়ের অমতে বিয়ে করতে চায়, মায়ের অপছন্দের কাজগুলো বেছে বেছে করে। এ দুটি নারী চরিত্রের অবস্থান পৃথক দুই মেরুতে। পৃথক দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই চরিত্র দুটি উপন্যাসের গল্প এগিয়ে নেয়। লেখক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এক ধরনের সামাজিক দায় থেকেই এ উপন্যাস রচনা করেছেন। আবিদা-রীনার লড়াইকে ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষের মাধ্যমে রূপায়ণের মূল লক্ষ্যই হল–মধ্যবিত্তের সংকট প্রকাশ করা।[২৭] লেখক সচেতনভাবেই এমন বার্তা দিয়েছেন এ উপন্যাসের পরতে পরতে। আসলে মধ্যবিত্তের লোভ-লালসা ও বিকারের পেছনে বিভিন্ন কারণ সক্রিয় থাকে। এ শ্রেণি একদিকে যেমন উচ্চবিত্তের জীবনমানকে ধারণ করতে প্রচণ্ড আগ্রহ অনুভব করে, তেমনি অন্যদিকে পেছনের সারিতে নিজেকে দেখতেও থাকে প্রবল অনিচ্ছা। তাই যে-কেনোভাবেই হোক এদেরকে ওপরে ওঠার বিকারে পেয়ে বসে। মধ্যবিত্তশ্রেণির নর-নারী উভয়েই এ ঘোড়দৌড়ে শামিল। ফলে মধ্যবিত্তের ভোগবিলাস, বিকার, বিচ্ছিন্নতা, কামসর্বস্বতা কিংবা দাম্পত্যসংকট এ উপন্যাসের ভবিতব্য হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের জটিল সমীকরণটি লেখক সরল আখ্যানে উপস্থাপন করলেও সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাঁর অঙ্গীকারের জায়গাটি বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে।

আবিদা গাইবান্ধার হাইস্কুল শিক্ষক হেলাল মাস্টারের মেয়ে। বর্তমানে সে আন্তর্জাতিক নারী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, সরকারি আমলা মাহমুদুল জাফরের স্ত্রী এবং রীনা ও আফরিনের মা। জন্মসূত্রে আবিদা এমন নাগরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল না এবং সামাজিক আভিজাত্যের অধিকারীও ছিল না। গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্তর থেকে রাজধানী ঢাকার

শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণিতে নিজেকে অভিষিক্ত করতে আবিদাকে বহু আপস, নারীত্বের অপমান, ব্যক্তিত্বের বিসর্জন, পরিশ্রম আর সাধনা করতে হয়েছে। আবিদাকে প্রথম যুদ্ধ করতে হয়েছে কলেজে আগত মফস্বলের মধ্যবিত্ত সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিরুদ্ধে এবং নিজেকে যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে। কারণ স্কুলমাস্টার বাবা তাকে কলেজে পড়াশোনার সুযোগ করে দিলেও কলেজ-উপযোগী পোশাক-প্রসাধনী সরবরাহ করতে পারেননি। ফলে আবিদা যখন প্রথম কলেজে যায়–

> ‘তখন তার পরনে ছিল তাঁতের শাড়ি আর ছিটের ব্লাউজ, মুখে প্রসাধনী ছিল না। মাথায় আঁচল রাখত সর্বক্ষণ। ভাবত, জীবন এই রকমই হয় মেয়েদের। আড়ষ্ট, অনুজ্জ্বল এবং প্রায় নির্বাক। শুধু শুনতে হবে, কিছু বলা যাবে না। বললেই লোকে দোষ ধরবে। ওদিকে তারই সহপাঠী মেয়েরা স্পোর্টসে দৌড়াচ্ছে। ডিবেটে চিৎকার করে বক্তৃতা করছে, বেশবাসে–প্রসাধনীতে রঙিন এবং ঝলমলে। তারা তাকে কাছে ভিড়তে দেয় না। যদি কোনোক্রমে সে কাছাকাছি যায়, তো দেখে চোখ ঠারাঠারি শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ হাসে। একদিন তো সে নিজের কানে শুনল, তাকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে এর নাম নিশ্চই পুতুল...পুঁটলি...গাঁটরি।’-[জ.ও জা./শওকত আলী রচনাসমগ্র; ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৭/পৃ.৩৯১]

নিজের সহপাঠীদের দ্বারা এমন অপমান, অবহেলা আর বিদ্রূপের শিকার হয়ে আবিদার অন্তঃকরণে কেবল রক্তক্ষরণই ঘটে না বরং নিজের অবস্থানকে সে শনাক্ত করতেও সক্ষম হয়। এ ব্যথা-বেদনাই আবিদাকে নিজস্ব অবস্থান ও শ্রেণিচরিত্রের বদনাম ঘোচাতে বিদ্রোহী করে। তাই প্রথম কয়েকদিন কাঁদলেও সে ভেঙে পড়ে না। মাঝারি মানের ছাত্রী হলেও শক্ত-সবল-সুশ্রী চেহারার আবিদা প্রথমে শাড়ি-ব্লাউজ ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ ধরে। ফলে সে সহজেই সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয়। এরপর কলেজের স্পোর্টসে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে না পারলেও নিজের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে এনে দাঁড় করায়। তবে অন্তর্বাস না পরার কারণে চতুর্থ বর্ষের নূরী আপা তাকে ভর্ৎসনা করে–‘এই অসভ্য মেয়ে ব্রেসিয়ার পরতে পার না?’ বলায় সে আরো আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। তাই মায়ের কাছে অন্তর্বাস কেনার আবদার করলে মা একে ‘অসভ্যপানা’ বলে সাব্যস্ত করায় সে কিছুটা দোলাচলে ভোগে। কারণ–‘একটা অন্তর্বাস না পরলে একজনের কাছে সেটা অসভ্যপনা, আবার সেটা পরলে অন্যজনের কাছে অসভ্যপানা।’ তারপরেও আবিদা এটি কিনতে মনস্থির করে এবং এর জন্য বাবার পকেট ও মায়ের বাক্স থেকে পয়সা সরিয়ে নিজেই অন্তর্বাস কিনে আনে। কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটকের অভিনয় করে এবার আবিদা সকলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। এভাবে পোশাক পরিবর্তন করে এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে যখন সে নিজেকে জীবনদৌড়ে প্রায় উপযুক্ত করে তোলে, ঠিক তখনই আচমকা বাবার সহকর্মী স্কুল শিক্ষক কবিরের সঙ্গে আবিদার বিয়ে হয়। ফলে–

> ‘আবিদার সাধের জগৎ নাগালের ভেতর এসে গিয়েছিল প্রায়, সেটা ফের নাগালের বাইরে চলে যায়।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৯২]

অর্থাৎ তীরে এসে তরী ডোবার মতো আবিদার স্বপ্নের ডানা মেলার আগেই তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। তবুও আবিদা হাল ছাড়ে না। তাই দৃঢ়চেতা আবিদা আই.এ পাশের পর বি.এ পাশ করে এবং শিক্ষকতার চাকরি বাগাতেও সক্ষম হয়। এতে সিরাজগঞ্জের মানুষ ও গণিতের শিক্ষক স্বামী কবির সাহেব মনে মনে খুশিই হন। কিন্তু আবিদা নিজের রোজগারের পয়সায় আসবাবপত্র, পোশাক, গহনা ও প্রসাধনী দিয়ে সংসার সাজিয়ে তুললেও জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতায় দগ্ধ হয়। ফলে বাড়তি উপার্জনের জন্য সে স্বামীকে টিউশনি করতে যেমন চাপ দেয়, তেমনি নিজে বড় হবার পথ অন্বেষণ করে। এ পথও সে সহজেই পেয়ে যায়। স্বামীর দূর সম্পর্কের ভাগ্নে নীলফামারীর ইপিসিএস মাহমুদুল জাফর সিরাজগঞ্জে চাকরি করতে এসে মাঝেমধ্যে অতিথি হয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে আসতো। ফলে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে মামী-ভাগ্নের সম্পর্কটি উভয়ে অতিক্রম করে নিষিদ্ধ চোরাবালিতে ক্রমশই আটকে যায়। ‘একেকদিন মনে হয়, আমি মরে গিয়েছি। যে-সংসার করছে, সে আমি নই, আমার প্রেতাত্মা’–এমন কথায় ও শরীরী টানে আবিদা জাফরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ফলে একদিন ছেলে বাবুকে প্রতিবেশীর কাছে রেখে আবিদা জাফরের বাসায় গিয়ে বলে–

> ‘আমাকে তুমি বিষ এনে দাও, এ জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। দেহ, মন দিয়েছি তোমাকে, আর ঘর করছি অন্য লোকের। এমন জীবন থাকার চাইতে না থাকাই ভালো। আমার পেটে সন্তান এসেছে সে তোমার–বল, এখন আমি কী করি? যদি বিষ এনে না দাও, তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৯৩-৩৯৪]

এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে আবিদা জাফরকে বিয়ে করতে বাধ্য করে। স্বামী কবির ও ছেলে বাবুকে ত্যাগ করে আবিদা উচ্চাশার আশায় জাফরকে সমৃদ্ধির সিঁড়ি হিসেবে গ্রহণ করে। এ সংসারে এসে ছেলে সাবুর জন্ম হয়। কিন্তু নিয়তির নির্মম আঘাতে বড় ছেলে নিওমোনিয়ায় এবং ছোট ছেলে ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণ করায় আবিদা বড় আঘাত পায়। তবে এ শোকের পরেও তার জন্য নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের পালাটি বাকি ছিল। কারণ দ্রুত বড়লোক হবার আকাঙ্ক্ষায় স্বামী জাফরকে জেলা শহর থেকে বদলি করে রাজধানী ঢাকায় আনতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। যার মূল্যস্বরূপ আবিদাকে কুষ্টিয়ার ডিসি

একরামুল্লাহ ও রাজশাহীর কমিশনার মাজহার খানকে যৌবনের ভেট দিয়ে তুষ্ট করতে হয়। আর এতে কাজও হয়। প্রথম প্রথম আবিদার নিজেকে ঘেন্না লাগত কিন্তু পরে তা গা সওয়া হয়ে যায়। কারণ ততদিনে সে বুঝতে সক্ষম হয়–

> ‘এ হল যার যার জীবন ও জগতের দাবি।...সে দাবি না মেটালে চলে না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কিংবা দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। মোটের উপর সে শেষপর্যন্ত হারেনি। প্রতিযোগিতার সিঁড়িগুলো ঠিকমতোই ভেঙে ভেঙে উপরে উঠে এসেছে।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৯৫]

এভাবেই আবিদা রাজধানী ঢাকার নাগরিক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আন্তর্জাতিক নারী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়। এ পেশাসূত্রেই সে সেক্রেটারিয়েট, অ্যাম্বাসিতে যাতায়াত এবং বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সেমিনারে অংশ নিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে শামিল হয়। তার বহু হিসেবি ও সাবধানী পদক্ষেপই তাকে এ পর্যায়ে এনে পৌঁছে দেয়। বাকি থাকে শুধু এম.পি-মন্ত্রী হওয়া বা রাষ্ট্রদূতের পদ অলংকৃত করা। যার জন্য আবিদা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বড় মেয়ে রীনার বিয়েকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তাই মেয়ের বিয়ের পাত্র বাছাইয়ে আবিদা সাবেকি ঐতিহ্যের পাবলিক সার্ভিসের আমলা, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার বাদ দিয়ে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীকে পছন্দের শীর্ষে রাখে। কারণ যুগ বিবেচনায় টাকাই যে-সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে–এমন বাস্তবতা অনুধাবন করতে আবিদার ভুল হয় না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যয়নরত মেয়ে রীনাকে সে শুরু থেকেই অভিজাত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করার ব্যাপারে সতর্ক থেকেছে। ফলে রংপুরের বনেদি পরিবারের সেনা অফিসার মুশফেকের ব্যাপারে আবিদা শুরু থেকেই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু মুশফেক প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে রীনাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়াতে সে চিৎকার করে ওঠে। এ ঘটনাতেও আবিদা মেয়েকে নাগরিক সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার পরামর্শ দেয় এবং মৃদু ভর্ৎসনা করে বলে–

> ‘কেন চিৎকার করবি? ন্যাস্টি কিছু তো করেনি–কাজিন হয় তোর, একটা চুমোই মাত্র খেয়েছে–ছেলেদের সঙ্গে মিশার সময় একটু ট্যাক্টফুল হতে হয়। তুই চিৎকার না করে বুঝিয়ে বলতে পারতিস যে বিয়ের আগে ওসব তুই পছন্দ করিস না, ব্যস তাতেই ও সব বুঝে যেত।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৪৯]

মায়ের মুখের এমন বক্তব্য রীনা মেনে নিতে পারেনি। কারণ তার মা নারী-অধিকার ও সম্মান রক্ষার্থে কাজ করে বেড়ায় অথচ জীবনের সমৃদ্ধির সিঁড়ি ব্যবহারে পুরুষতন্ত্রের এসব অন্যায়-অপরাধকে নীরবে প্রশ্রয় দেয়। যা রীনার কাছে এক ধরনের কূটাভাস হয়ে দাঁড়ায়। এ ঘটনা থেকেই মা ও মেয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব বাড়ে। তারপরেও আবিদা রীনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী মধ্যবিত্ত ঘরের কায়সার, মামুন ও আতিকের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকে এবং প্রয়োজনে অপমান করতেও দ্বিধা করে না। অথচ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের জন্য এদের কাছ থেকে হ্যান্ডনোট সংগ্রহের বিষয়ে সে নীরবে প্রশ্রয় দেয়। মায়ের এমন স্বার্থঘেরা ও হিসেবি মানসিকতাকে রীনার সহ্য হয় না। রীনা ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে অনার্স পাশ করলে আবিদা দ্রুত বগুড়ার নবাব বাড়ির ইউরোপ-প্রবাসী ছেলে সৈয়দ মাহবুবের সঙ্গে বিয়ের উদ্যোগ নেয়। তার এ উদ্যোগের পেছনেও আলাদা একটি হিসেব থাকে। কারণ হবু বেয়াই সৈয়দ গোলাম হোসেনের মতো বিত্তবান ও ডাকসাইটে মানুষ থাকলে নারী সংগঠনের সভাপতির পদটি বাগাতে আবিদার সহজ হবে এবং ভবিষ্যতে এম.পি-মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত হবার পথটাও সুগম হবে। এ জন্য আবিদা হবু বেয়াইয়ের সঙ্গে পানাহার ও হাত ধরাধরি পর্যন্ত করে। কিন্তু রীনা বান্ধবী নীলুর মামাতো ভাই ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার ইব্রাহীমকে স্বল্প পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে গোপনে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিলে আবিদা রাগে- ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই উত্তরবঙ্গের এডিসি শাহাবুদ্দিন, ঢাকার ডিআইজি সালাম সাহেব এবং পরিচিত কাজিদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বিয়ে বন্ধের ব্যবস্থা করে। কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাত ও বৈরী পরিবেশের কারণে রীনা বান্ধবী নীলুর বাসায় পূর্ব-নির্ধারিত বিয়েটা খেয়ালের বশে না করে বাড়ি আসায় আবিদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আর মেয়ের উদ্দেশ্যে বলে–

> ‘তুই পেয়েছিসটা কী? বিয়ে কি ছেলেখেলা? বাবা-মা হয়ে আমরা কিছুই জানব না কেন?...বিয়েটা তোর হলেও তার সঙ্গে এ সংসারের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আমাদের একটা সোসাইটির মধ্যে বসবাস করতে হয়, ঐ রকম বিয়ে আমরা হতে দেব না।...বিয়ে মানে সারাজীবনের ব্যাপার–ঐ জায়গাতে ভুল হলে শোধরাবার উপায় থাকে না।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৪০-৩৪২]

আবিদা তার জীবন থেকে নেয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মেয়েকে বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। রীনার অস্পষ্ট ও হেঁয়ালিপূর্ণ কথাতে আবিদা অস্বস্তিতে ভোগে। কারণ–‘নিজের পেটের মেয়ে হলেও তার মনের নাগাল সে কখনোই পায় না। মায়ের কাজকর্ম সে পছন্দ করে না। সমস্ত কিছুতেই তার বিরক্তি আর ঠাট্টা। মা ভালো কথা বললেও সে উল্টো অর্থ বার করে।’ তারপরেও আবিদা হাল ছাড়ে না। উপরন্তু মেয়েকে ইউরোপীয় জীবন যাপনে উৎসাহ দিতে শার্ট-প্যান্ট কিনে আনে। যা রীনাকে রীতিমতো বিস্মিত করে। তার কৌশলে বগুড়ার নবাব বাড়ির লোকজন রীনাকে ঘটা করে দেখতে আসে। কাপড়-চোপড় আর প্রসাধনী মেখে প্রতিমার মতো বসে থাকার পুরো ব্যাপারটা নিয়েই রীনার মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে। সমস্ত

ব্যাপারটাই তার কাছে ‘প্রকাণ্ড একটা ফাজলামো’ মনে হয়। যা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রীনা বান্ধবী নীলুকে বলে–‘জীবনটা যে আমাকেই যাপন করতে হবে–সারাটা জীবন অন্যের পছন্দ মতো কাটানো যায়? ধর তোকে একটা বাক্সের মধ্যে ঠেলে-ঠুলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো সারাজীবনের জন্য। যেমন আগে পাগলদের রাখা হত।’ আসলে রীনার কাছে জোর করে বিয়ে দানের গোটা ব্যাপারটিকে একটি পাগলা গারদের মতো জবরদস্তিমূলক বন্দিশালা বলেই মনে হয়েছে। তাই মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদস্বরূপ বলে–

> ‘মা তুমি কী আমাকে সিঁড়ি চেনাচ্ছ? যে সিঁড়ি বেয়ে আমি উপড়ে উঠব?...মা বিয়েটা আমার, তুমি এত খুশি হচ্ছ কেন?...আমার ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও না কেন?’-[জ.ও জা./পৃ.৩৮১-৩৮২]

আসলে রীনা বিয়ের ব্যাপারে তার মায়ের মতো বিত্তবান ছেলে আর বনেদি পরিবারকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং মানবিক, সহানুভূতিসম্পন্ন, কর্মঠ, দায়িত্বশীল, সৎ, সুমার্জিত ও সুশিক্ষিত ছেলেকেই বেছে নিতে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্যই ইব্রাহীমের মতো স্বাধীনচেতা, পরিশ্রমী ও প্রাণবন্ত ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু আবিদা তা মেনে নেয় না। সে উল্টো ইব্রাহীমকে টেলিফোনে প্রচণ্ড বকাঝকা করে এবং শাস্তি দেবার ভয় দেখায়। স্বামী জাফর তাকে এসব না করার পরামর্শ দিলেও সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে–‘একটা থার্ডক্লাস স্কাউন্ডেল, একটা হীনিয়াস ইমবেসাইল, সে আমার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে? একটা মিস্তিরি শেষপর্যন্ত। উফ্ ঢাকা শহরে কীভাবে মুখ দেখাবো আমি?’ তারপরেও আবিদা সহজে ভেঙে পড়ে না। কারণ–

> ‘জীবন তাকে কম শেখায়নি। সে জানে, জীবনও একটা প্রতিযোগিতা, যে ভালো কৌশল জানে, যার শক্তি আছে, সেই প্রতিযোগিতায় জেতে। যার শক্তি নেই, কৌশল নেই, সে চিরকাল হারে–সে কিছুতেই হারতে রাজি নয়।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৯১]

তাই আবিদা মেয়ে রীনার সঙ্গে জেদ ও একগুয়েমিতে কুলোতে না পেরে কৌশলীপন্থা হিসেবে ইব্রাহীমের প্রশংসা করে। কিন্তু রীনা মায়ের পাতা ফাঁদে পা দেয় না। কারণ আবিদা ইব্রাহীমকে বিতর্কিত করতে তার ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লেক্স গড়তে দশ হাজার টাকা যেচে দিতে চায়। মায়ের এমন কূটকৌশলের কথা শুনে রীনা প্রতিবাদে চিৎকার করে বলে–

> ‘মা, তুমি একটা লায়ার, তোমার সব কথা বানানো। জঘন্য রকম মিথ্যা কথা বলতে পার তুমি।...তোমার মতো মহিলার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলে পাপ হবে, তাই চলে যাচ্ছি। এক মুহূর্তও এ বাড়িতে থাকা যায় না।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৯৯]

যাপিত জীবন, জীবনদর্শন, জীবনের লক্ষ্য, রুচিজ্ঞান, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যই মা ও মেয়েকে দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দায় পরিণত করে। তাই–‘এভাবে চলে যাস না, তাহলে এ বাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে’ বলে আবিদা সতর্ক করে। কিন্তু রীনা তা আমলে না নিয়ে রোকেয়া হলে বান্ধবী সুতপা বড়ুয়ার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারণ মায়ের চাপিয়ে দেয়া জীবন-বন্দোবস্তকে সে কখনোই মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া তার প্রত্যাশার সঙ্গে মায়ের প্রত্যাশাও খাপ খায় না। যদিও তার জীবনের বড় কোনো অ্যাম্বিশন নেই, তথাপি–

> ‘মায়ের মতো সে হতে চায় না।...না, অমন সে হতে চায়নি কখনো, এখনো হতে চায় না। মা, বাবা, তাদের জানাশোনা লোকেরা–সবাইকে একই রকম লাগে তার। মনে হয় প্রকাণ্ড একটা ভার সবাই ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং সেটা একেবারেই অহেতুক।’-[জ.ও জা./পৃ.৩৮৭-৩৮৮]

আসলে রীনা নাগরিক মধ্যবিত্তের লোকদেখানো ভদ্রতা, বিত্ত উপার্জনে ব্যগ্রতা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনে সর্বস্বান্ত এবং শেকড়হারানো বিভ্রান্ত জীবন বেছে নিতে চায়নি। তাই মায়ের অন্ধ-অহং, প্রলোভনের হাতছানি, আভিজাত্যের ফানুস ও মেকি জীবন অবলীলায় মাড়িয়ে প্রেম ও প্রতীজ্ঞায় এক সংগ্রামী, স্বাবলম্বী ও সংবেদনশীল জীবনকে বরণ করে নেয়। যেখানে অবক্ষয়, আপস, আভিজাত্য, অর্থ ও উচ্চাশার চেয়ে প্রেম, প্রাণ-প্রাচুর্য ও জীবন প্রতিষ্ঠাই বড় হয়ে উঠেছে।

আবিদা গাঁয়ের মেয়ে হয়েও সে শহরের কণ্টকিত পথ-যাত্রার একজন হয়ে ওঠে। তার জীবনযুদ্ধ আমাদেরকে জানায় যে, উর্ধ্বে উঠবার যুদ্ধে অনেক কিছু হারাতে হয়। দেহ ও কাম-লালসা এখানে অবলম্বন হতে পারে। থাকতে পারে বিকৃত প্রেমের বিকার। ঔপন্যাসিক কাহিনি সৃজনে নিম্নমধ্যবিত্ত স্কুলমাস্টারের মেয়ে আবিদাকে যখন নির্বাচন করেন, তখন তার প্রতিপক্ষ সমগ্র পরিবেশ। দারিদ্র্যের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা তাকে ঘিরে রাখে। তাকে প্রত্যহ এক ঘৃণিত জীবনকে বয়ে বেড়াতে হয়। তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ সংকুচিত। তার বিকাশপথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় উঠতি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা। ছোটখাটো বিষয়ও তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। উপরন্তু এদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অবজ্ঞা ও ধিক্কার তার মধ্যে এক বিদ্রোহের জন্ম দেয়।[২৮] ভেতরের যুদ্ধে এবং বাইরের যুদ্ধে আবিদা ক্ষতবিক্ষত হলেও সে ভেঙে পড়ে না, বরং ক্রমান্বয়ে

নিজেকে যোগ্য করে তোলে এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি গন্তব্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে যায়। সকল দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে কলেজ-জীবনের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ রীনাকে জীবনদৌড়ের প্রণোদনা যোগায়। এক্ষেত্রে তার শ্রমনিষ্ঠা ও জীবনযুদ্ধকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তবে জীবনের সমৃদ্ধির পথে হাঁটতে গিয়ে তার নারীত্ব-ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের বিষয়টি তাকে মানসিকভাবে পীড়িত ও পরাজিত করে। আর এ পরাজয় শুরু হয় তার নিজ গৃহের মধ্যে এবং প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তারই আপন মেয়ে। এটিই আবিদার অনিবার্য নিয়তি হয়ে ওঠে।

রীনা মায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। আভিজাত্যের মধ্যে বড় হলেও সে হয়ে ওঠেনি উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতাপিয়াসী। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো থাকতে চেয়েছে সে। সে পছন্দ করেনি মায়ের লোভী মানসিকতাকে। সে নিজে কারো উপরে ওঠার উপায় বা অবলম্বন হতে চায়নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বলেই রীনা মায়ের এই মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে মায়ের দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মা-মেয়ের এই দ্বন্দ্বই উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।[২৯] প্রেমিক ইব্রাহীমের আচরণ এবং বিয়ের প্রথম উদ্যোগে রীনার মধ্যে একধরনের দ্বিধা ও দোলাচল দেখা দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হয় তার প্রেম। মা আবিদার গর্ভে জন্মে নিয়ে, তার রক্তপ্রবাহ শরীরে ধারণ করে এবং সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেও জীবনবোধ ও চেতনাস্রোতে রীনা যে-বিপ্রতীপ দৃষ্টিভঙ্গি ও শুভচেতনায় নিজেকে ঋদ্ধ করে তোলে; এখানেই তার বিজয় বিঘোষিত হয়েছে।

জননী ও জাতিকা উপন্যাসে এক মধ্যবিত্ত নারীকে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শওকত আলী একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছেন। তা হল সমাজসংকট চিহ্নিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস। সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে স্বভাবতই অবৈধ ও অসৎ পথ মাড়িয়ে উঠতে হয়। এ আপস ও অসুদোপায় ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই জীবনে প্রতিষ্ঠা আসে না–তা মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে লেখক রূপায়ণ করেছেন। অনেক সময় এ শ্রেণির নারীর আত্ম-অধিকারের লড়াই হয়ে ওঠে শোষণ, তোষণ ও ক্লেদের উপকরণ। যার প্রতিমূর্তি এ কথাবস্তুর আবিদা। এখানে কেবল মধ্যবিত্ত নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার চিত্রই নয় বরং সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণির উচ্চাভিলাষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার চালচিত্রই ভাষারূপ পেয়েছে। *জননী ও জাতিকা* নির্মাণের মধ্য দিয়ে শওকত আলী নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনসত্য ও সমাজসত্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষ ও সরলভাষ্যে রূপায়ণ করেছেন।

জোড় বিজোড়

শওকত আলীর *জোড় বিজোড়* (২০০১খ্রি.) নাগরিক অভিজাত শ্রেণির মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকারের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ উপন্যাস। এখানে একাত্তর-পরবর্তী পুঁজিনির্ভর বিত্তবান শ্রেণির আভিজাত্য-অহং ও নৈঃসঙ্গ্যচেতনার বিষয়টি প্রাধান্য পেলেও আখ্যানের মর্মমূলে রয়েছে সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণা ও দেশভাগের অনুষঙ্গ। এ উদ্বাস্তু-প্রজন্মের লেখক হিসেবেই তাঁর উপন্যাসে নানা আঙ্গিকে এসেছে অভিবাসনমনস্ক চরিত্র, যারা নানা অর্থেই জীবনে থিতু হতে চেয়েছে। এ থিতু হওয়া যেমন আক্ষরিক অর্থেই অভিবাসী মানুষ হিসেবে, তেমনি মানসিক অভিবাসন প্রক্রিয়াতেও। *জোড় বিজোড়* উপন্যাসে শওকত তাঁর নির্মিত চরিত্র কামরুল হায়দারের প্রতীকে একজন থিতু হতে না পারা মানুষকেই উপস্থাপন করেছেন।[৩০] তবে এ অভিবাসী মনস্তত্ত্বের উন্মূলিত ও শেকড়বিচ্ছিন্ন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে নাগরিক উচ্চ-মধ্যবিত্তের সীমাহীন ভোগ-বিকার ও খেয়ালি জীবনের চালচিত্র। জীবনের পড়ন্তবেলায় উপনীত প্রৌঢ় কামরুল হায়দারের মানসলোকের নিঃসঙ্গতা নির্মাণসূত্রে বিম্বিত হয়েছে কর্পোরেট পুঁজিপতিশ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল, অসংলগ্ন, হতাশাগ্রস্ত এবং মানবীয় সম্পর্কশূন্য জীবনালেখ্য। লাগামহীন ভোগ-বাসনায় জীবনে শান্তি ও স্থিতি আসে না, বরং দায়িত্বভার, সহানুভূতিশীল মন ও মানবিক সংস্পর্শই মানুষকে দেয় প্রকৃত সুখ ও মুক্তি– এমন বার্তাই এ উপন্যাসের প্রাণবীজ হয়ে উঠেছে।

কামরুল হায়দার খান নীলফামারী সৈয়দপুর এলাকার মোহনপুর জমিদার বাড়ির তৃতীয় উত্তর-পুরুষ। তার দাদা দেওয়ান বদরুল হায়দার খান কলকাতার খিদিরপুরের জমিদারি এস্টেটের মালিক হলেও সাতচল্লিশের দেশভাগের হুজুগে সম্পত্তি

বিনিময় (exchange) করে মোহনপুরে চলে আসেন। কালের আবর্তে এ বনেদি পরিবার ভূমিনির্ভর সামন্তবাদী কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসেন। গোটা পাকিস্তানি শাসনামল ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তারা পর্যায়ক্রমে জুট-টেক্সটাইল, গার্মেন্টসের রমরমা ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে ওঠেন। সবশেষে বিনিয়োগ করেছেন হাউজিং ব্যবসায়। এ কর্পোরেট পুঁজিপতি কামরুল হায়দার পড়াশোনা করেছেন ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনে গীতিকা চক্রবর্তী ও খায়রুন্নাহার মৌমিতার (যাকে তিনি 'দীপিকা' বলে ডাকতেন) সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়ালেও ধর্ম ও সামন্তবাদী আভিজাত্যের কারণে এদেরকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। গীতিকারা কলকাতা যাওয়াতে এবং মৌমিতারা দরিদ্র হওয়াতে কামরুল সাহেবকে বংশীয় খানদান মেনে কিশোরগঞ্জের জমিদার বাড়ির সৈয়দজাদী শামসুন্নেসা খাতুনকে বিয়ে করতে হয়। পরিণত বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হলে দুই ছেলেকে ব্যবসায়ের দায়িত্বভার দিয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা মোহনপুরের জমিদার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বহুদিন পর প্রাসাদোপম পৈতৃক বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তিনি শুধু নিজের শৈশব, কৈশোর আর প্রথম যৌবনের দিনগুলোকেই আবিষ্কার করেন না, সেই সঙ্গে 'আভিজাত্য-বৈভব আর ক্ষমতার প্রতীক' খানবাড়ির দালানকোঠা, প্রকাণ্ড গেট, গাড়ি বারান্দা, আমবাগান ও শখের হর্টিকালচার গার্ডেন দেখে এক ধরনের আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। যা তার শূন্য ও নিঃসঙ্গ মনের বেদনা প্রশমনে কিছুটা হলেও শান্তি ও স্বস্তির বারিবর্ষণে সহায়ক হয়। তাই আমবাগান, পুকুরপাড়, নদীরধার, মন্দির-মসজিদ-চার্চ ও মাজার এলাকা দিয়ে প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক হাঁটার ফলে তার দেহ-মনে ফুরফুরে অবস্থা ফিরে আসে। এ প্রসঙ্গে কামরুল সাহেবের উপলব্ধি–

> 'এখানে আসার পর থেকেই ব্যথাটা (হাঁটুর ব্যথা) আর তীব্র বোধ হয় না। আর ব্লাডসুগারও দেখছেন। নর্মাল-এর প্রায় কাছাকাছি থাকছে।'-[জো.বি./শওকত আলী রচনাসমগ্র; ১০ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮/পৃ. ৭১]

ফলে নিজেকে কামরুল সাহেবের আর আগের মতো নিঃসঙ্গ, একাকী, ভারগ্রস্ত, বিপন্ন আর অসহায় মনে হয় না। উপরন্তু মনে এক ধরনের উদ্যম আর উৎফুল্ল ভাব অনুভব করেন। এজন্যই বহু দেরিতে হলেও শেষ বয়সের শান্তি আর স্বস্তির ঠিকানা খুঁজে পাওয়াতে মনের আক্ষেপ-আফসস দূর হয়। তাই জীবনের শেষ দিনগুলো পার করার ব্যাপারে তার উপলব্ধি–

> 'যাক শেষ পর্যন্ত নিজের জায়গাটা খুঁজে পেয়েছেন এবং সেখানে পৌঁছে গেছেন। এখন আর বাইরের দিকে নজর দেবার দরকার নেই তাঁর। শেষ নিঃশ্বাস যদি ফেলতেই হয়, তাহলে মোহনপুরে পূর্বপুরুষের ভিটাই হচ্ছে তাঁর জন্য যথার্থ জায়গা-শুকুরআলহামদুলিল্লাহ।'-[জো.বি./পৃ. ৭৬]

অথচ কিছুদিন পূর্বেও কামরুল সাহেবের মনের অবস্থা এমন ছিল না। মনের মতো একজন জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পেতে তিনি তার সাধ্যের সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন। যাতে করে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো এ মনের মানুষ নিয়ে 'কোনো পাহাড়ি এলাকা অথবা সমুদ্র উপকূলে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে' কাটাতে পারেন। এ লক্ষ্যেই তিনি নিজ কর্মস্থল ঢাকা-চট্টগ্রামের বাইরেও কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই, কলম্বো, আরব, ইরান, তুরস্ক, গোটা ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্যাপার মতো হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরেছেন। আর সিলেটের লন্ডন প্রবাসী ডিভোর্সি নাজমা মজুমদার, ঢাকার স্কুল শিক্ষিকা বিধবা নাফিসা খানম, লন্ডনের এলিস হাওয়ার্ড, কলকাতার কনক গুপ্ত, চেন্নাইয়ের সুভদ্রা অনুপিল্লাই আর লক্ষ্ণৌয়ের শবনম দুররানীর মতো নারীর সান্নিধ্য-সংস্পর্শ পেয়েছেন। এমতবস্থায় তার–

> 'একেক বার মনে হয়েছে, বোধ হয় পেয়ে গেছেন মনের সঙ্গিনীটিকে। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, না ওই মহিলা তাঁর মনের মানুষের জায়গাটা নিতে পারবেন না। অন্য কিছু তো না, শুধু পরিপূর্ণ সঙ্গ লাভ করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু দেখেছেন এবং টেরও পেয়েছেন যে, তিনি চাইলে কী হবে, তার সঙ্গিনীটির মন অন্যকিছু বা অন্য কাউকে খুঁজছে।'–[জো.বি./পৃ. ৭৭]

অর্থাৎ প্রৌঢ় কামরুল সাহেব মন-প্রাণ সমর্পিত জীবনসঙ্গিনী প্রত্যাশা করলেও তিনি একে একে ভুল নারীর শরণ নিয়েছেন। কারণ তার সংস্পর্শে আসা সব নারীই কামরুলের মনের দিকে না তাকিয়ে, তার বিত্তবিলাস ও টাকা-পয়সাকেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত থেকেছে। তাই শবনম দুররানী ও সুভদ্রা অনুপিল্লাইকে তার খুব কাছের মনে হলেও তাদেরও নজর কেবল টাকা এবং আভিজাত্যপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। সেখানে তার জীবন, সুখ-শান্তির বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। যৌথ জীবনে অভ্যস্ত এসব বসন্তের কোকিলের মতো মানসিকতাসম্পন্ন নারীদের মাঝে তিনি স্ত্রীর বিকল্প সন্ধান করতে গিয়ে শুধু শুধু অর্থের অপচয় করে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ফলে মনের অশান্তি দূর করতে তিনি–

'একা একাও ঘুরেছেন কিছুদিন। ট্যুরিস্ট হয়ে প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, মাজার, নানান ধরনের পুরাকীর্তি দেখেছেন। কিন্তু তারও তো শেষ আছে। এক সময়ে ক্লান্তি লাগতে আরম্ভ করে। তখন মনে হয়েছে খামোখাই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন– তার এই একা একা ঘোরাঘুরিটা একেবারেই অর্থহীন।'–[জো. বি./পৃ. ৭৭-৭৮]

অবশেষে তিনি এ মিছে মরীচিকার পেছনে না ঘুরে এবং নাগরিক মেকি জীবনের চোরাবালিতে আটকে না থেকে দুদণ্ড শান্তি ও স্বস্তির অন্বেষণে মোহনপুরের পৈতৃক বাড়িতে আসেন। তবে সার্বিক বিবেচনায় কামরুল হায়দারের এ আগমন ব্যর্থ হয় না। কারণ দাদার তৈরি শখের হর্টিকালচার গার্ডেন পুনঃসংস্কার এবং প্রাচীর মেরামত করতে গিয়ে জ্ঞাতি ভাই জাভেদ সাহেবের বিধবা স্ত্রী মুশতারি বানুর সঙ্গে পরিচয় ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ার সোপান তৈরি হয়। তার দাদা বদরুল হায়দার খান কলকাতার খিদিরপুরে থাকাবস্থায় প্রতিবেশী হায়দ্রাবাদী পরিবারের বন্ধুর বিধবা বোন মেহের বানুকে বিয়ে করেছিলেন। আর এ বউয়ের জন্য তিনি আলাদা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে কামরুল হায়দারের আপন দাদি আর সৎদাদির দুটো পরিবার পাশাপাশি থাকলেও প্রাচীর টেনে বিচ্ছিন্ন করা ছিল। এ বাগান ও প্রাচীরের বিষয়ে পরামর্শ করতে গিয়ে রমণীমোহন কামরুল সাহেব সহজেই নিঃসঙ্গতাড়িত বিধবা ভাবী মুশতারি বানুর মনের ওপর সওয়ার হন। অপূর্ব দেহলাবণ্য আর সুরুচির সমন্বয়ে মুশতারি বানু তাকে শুধু আচ্ছন্নই করেন না, বরং প্রতিবেলার খাবারে মুরগি মুসল্লাম, কাবাব, টিকিয়া, আলু গোবি এবং আচারের মতো উপহার দ্রব্য পাঠিয়ে সহানুভূতি অর্জন করেন। আবার শের ও সায়েরি ভক্ত মুশতারি বানু পছন্দের লেখক মীর তকি, গালিব, ইকবালের উর্দু বই নিতে আসলে দুই প্রৌঢ় নর-নারী আরো নিকটতর হবার সুযোগ পান। মুশতারি বানুর দাওয়াত মাফিক কামরুল সাহেব জ্ঞাতি ভাইয়ের বাড়ি যান। প্রাসাদের ভেতরকার আভিজাত্যের কারুকাজ, জৌলুস আর সুরুচির পরিচয় পেয়ে অভিভূত হন। আর মুশতারি বানুও পর্দা এড়িয়ে দেবর কামরুল সাহেবকে বসার ঘরে ডেকে পাঠান। খাট-পালং, ফরাস-তাকিয়ার জৌলুস এবং ঝোলানো কাচের ঝাড়বাতির টুংটাং আওয়াজের চেয়ে সাবেক পূর্ণিয়ার আসাদনগরের স্টেটের জমিদার কন্যা 'জান্নাতকা নূর'–খ্যাত মুশতারির গোলাপি রঙের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। মুশতারি বানু বিপত্নীক দেবরের কাছে নিজের অকাল বৈধব্যবরণ, অপ্রাপ্তি ও স্বপ্নভঙ্গের কথা বলে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। তার কান্নাভেজা মুখ, দীর্ঘশ্বাস ও মনের আকুলি-বিকুলি–

'ষাট বছরের কামরুল হায়দার নামক প্রৌঢ়ের দেহ-মনকে ঝাঁকাতে শুরু করে। মুশতারি বেগম ঘাড়ে হাত রাখলে তিনি খুবই অভ্যস্ত হাতে নিঃসঙ্গতার পীড়নে কাতর প্রৌঢ়া বিধবাটিকে দু'হাতে চেপে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন। কতক্ষণ কাটে ঐভাবে কারোরই খেয়াল থাকে না। হঠাৎ মুশতারি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য চিৎকার করে ওঠেন। বলেন, ছি, আপ ছোড়িয়ে মুঝে ছোড় দিজিয়ে– ছাড়েন আপনি। না হলে আমি চিখ পাড়বো।'-[জো. বি./পৃ. ১০৯]

এমতবস্থায় মুশতারির মেয়েলি হাতের কিল, ধমক ও শাসন একসঙ্গে চলতে থাকলে কামরুল হায়দারের বুকের ব্যথা অনুভব হয়। মুশতারি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধাক্কা দিলে তিনি মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়েন এবং নিশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হয়। তাকে স্থানীয় জেলাসদরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় তাকে আন্তরিকভাবে সেবা করতে দেখা যায় বাড়ির কেয়ারটেকার সমিরুদ্দিন মণ্ডলের বিধবা বোন তাহেরাকে। তাহেরা শুধু এ আপদকালেই তার সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়নি বরং কামরুল সাহেবের আগমনের শুরু থেকেই তার সেবা-যত্নের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিন কামরুল সাহেবকে শুধু রঙ চা ও মচমচে মুড়ি দিয়ে আপ্যায়নই করেনি, বরং সাপের উৎপাতে আম বাগানের ভেতর দিয়ে তাকে আলো হাতে এগিয়ে দিয়েছিল। আবার মুশতারি বানুর নির্ধারিত উপঢৌকনস্বরূপ খাবার না আসায় এ তাহেরাই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছিল–

'ঐ বাড়ির কুন তরকারিখানা ভালো সোয়াদের ছিল? আমাকে বলেন, আমি রান্ধে দিব।'-[জো. বি./পৃ. ১০২]

কামরুল হায়দারের প্রতি তাহেরার এ সজাগ দৃষ্টি, সেবাপ্রবণ মানসিকতা ও দায়িত্বভার গ্রহণের আন্তরিকতা দেখে তিনি অভিভূত হন। তাই মনমতো জীবনসঙ্গিনী খুঁজে বেড়ানো কামরুল সাহেবের উপলব্ধি হয়–

'ধনী অভিজাত মেয়ে পুরুষের এই একই চরিত্র। বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, প্রেম–সবই বাইরের জিনিস; বাইরে থেকে আসে আর বাইরে থেকে চলে যায়।'-[জো.বি./পৃ. ১১১]

ধনী-অভিজাত নাগরিক নারীদের স্বার্থমুখর মন, লোভী মানসিকতা ও মেকি প্রেম-ভালোবাসার কাছে তাহেরার নিঃস্বার্থ সেবা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিক সহানুভূতিশীল স্বভাবকে কামরুল সাহেবের কাছে ব্যতিক্রম মনে হয়। তাই মনিব কামরুল সাহেবকে এ অসুস্থ সময়ে ছেলে ও ছেলের বউ দেখতে না আসায় তাহেরা কিছুটা অবাক হয়। 'আমাকে তো ছোটো ছেলে ঢাকায় নিয়ে যাবে'– এমন কথা শুনে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো সে জিজ্ঞাসা করে–

‘কিন্তু বড় ছেলে তো আসল না– একজন বৌমাকেও তো দেখলাম না।...আপনার কাছে কে থাকবে তখন?’-[জো. বি./পৃ.১১২]

কাজের ব্যস্ততার অজুহাতে বাবাকে ছেলেদের দেখতে না আসা এবং নার্স রেখে সেবা-যত্ন করানোর কথা কামরুল সাহেবের মুখে শুনে তাহেরা বিস্মিত হয়। সংসার-স্বজন-সন্তান থাকার পরেও কামরুল সাহেবের এমন নিঃসঙ্গ-নির্বান্ধব পরিস্থিতি দেখে তাহেরা যেমন ব্যথা পায়, তেমনি মনিবের প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত হয়ে ওঠে। মনিবের এ সাংসারিক জীবনের চালচিত্র অনুভবসূত্রে তাহেরার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে জমিদখলের বিবাদে জড়ানো রক্তাক্ত স্বামীর লাশ, জলে ডুবে মরে যাওয়া ছেলের লাশ এবং সন্তানপ্রসব করতে গিয়ে সেয়ানা মেয়ের করুণ মৃত্যুর দৃশ্য। সাধের সংসার, স্বামী ও সন্তান হারিয়ে অসহায় তাহেরাকেও দরিদ্র ও প্যারালাইজডপীড়িত ভাই সমিরুদ্দিনের সংসারে এসে আশ্রয় নিতে হয়। কামরুল ও তাহেরার সংসার জীবনের এ শূন্যতা ও অতৃপ্তিই দুজনকে নিকটতর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যদিও উভয়ের মাঝে মনিব-বাঁদির সম্পর্ক বিদ্যমান। তারপরেও তাহেরা কামরুল সাহেবের ছোট ছেলে শাহনেওয়াজের আগমন, দায়সাড়াগোছের তৎপরতা দেখে এবং বড় ছেলে ও বউমার ‘সবার যাওয়ার কী দরকার?...ট্রেইনড নার্স কাউকে রাখা হবে, খরচ এমন কিছু বেশি নয়’– এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা শুনে ঘাবড়ে যায়। ভাইপো হোসেন আলি বাড়িতে যাবার তাড়া দিলেও সে উৎকণ্ঠার সুরে বলে– ‘হ্যাঁ এখুনে যামু, খালি শুনে যাঁও, ডাকতর সাহেব কী কহে।’ কামরুল সাহেবের হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় এবং বাল্ব নষ্ট হওয়ায় কয়েক মাস ঢাকায় রেখে পরে বিদেশে নেবার সিদ্ধান্ত হয়। দুই ছেলের মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় সম্পত্তির ভাগ-বণ্টন অবশ্যম্ভাবী জেনেও কামরুল সাহেব তার এ পৈতৃক বাড়িটি ভাগ না করার অসিয়ত করেন। কারণ তিন পুরুষের এ বাড়িটিই তার কাছে ইতোমধ্যে শান্তি ও স্বস্তির ঠিকানা হয়ে উঠেছে। তাই এ বাড়ির বুক চিরে কোনো প্রাচীর বা বিভেদের রেখা টানতে নিষেধ করেন। কারণ প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় পবিত্র জায়গায় নাগরিক জীবনের যন্ত্র ও প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটলে অবশিষ্ট জন্মশেকড়েও টান পড়বে। এতে করে নাগরিক সভ্যতার তাপ-চাপে বিপন্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা পাবার আর কোনো জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না।

ঢাকা যাবার আগের রাতে কামরুল সাহেবের খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ-খবর নিতে শাহনেওয়াজ ও হোসেন আলি হাসপাতালের কক্ষে ঢুকে অবাক হয়। তারা দুজনেই দেখে–

‘তাহেরা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বড় সাহেবের কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে, আর ওদিকে বড়ো সাহেব গভীর ঘুমের তলায় তলানো।’-[জো. বি./পৃ. ১১৯]

এভাবে তাহেরা তার সেবা-শুশ্রূষা ও যত্ন-আত্তি দ্বারা কামরুল সাহেবের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং মনের অজান্তেই তার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হয়। তাই ঢাকায় রওনা হবার পূর্বমুহূর্তে তিনি ছেলেকে ডেকে বলেন– ‘শোন বাবা, তাহেরাও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, আমার দেখা শোনার জন্য এমনিতেই একজন মানুষ দরকার। ও আমার দেখাশোনা করেছে এখানে, ওখানেও তাই করবে, বুঝেছ?’ ছেলের সম্মতি পেয়ে কামরুল সাহেব তাহেরাকে দ্রুত গাড়িতে ওঠার তাড়া দিলে দেখা যায়–

‘হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে মাথায় যথারীতি ঘোমটা টেনে তাহেরা ঘরের দরজা পার হয়ে বেরুল। পরনে একখানা আটপৌরে শাড়ি, তাও দো-ফেরতা করে পরা, পায়ে রাবারের স্যান্ডেল।’-[জো. বি./পৃ. ১২০]

দীর্ঘ সময় থাকার এমন প্রস্তুতি নিয়েই তাহেরা কামরুল সাহেবের ঢাকা যাত্রার সঙ্গী হয়। ‘তুমি এমন কাপড় কেন পরেছ?’– বলে কামরুল সাহেব কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করলেও তাহেরা তা আমলে নেয় না। উপরন্তু ‘কেন দোষ কী? আমি এমন কাপড়ই পরি।’– বলে নিঃসঙ্কোচে মনিবের সঙ্গে ঢাকাগামী গাড়িতে ওঠে বসে।

মানব জীবনে প্রেম অনিবার্য। শুধু তরুণ-তরুণীরাই নয়, প্রৌঢ়-বৃদ্ধরাও প্রেমে পড়তে পারে। তবে এ দুই সময়ের প্রেমে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। জীবনের শুরুতে তা সুন্দর একটি ভবিষ্যতের আশ্রয় হলেও পড়ন্ত সময়ে হতে পারে একাকীত্ব, অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচার উপায়। সেই সত্যই শওকত আলী তুলে ধরেছেন *জোড় বিজোড়* উপন্যাসে।[৩১] ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়ির সন্তান পুঁজিপতি কামরুল হায়দারকে নাগরিক জীবনের শূন্যতা ও একাকীত্ব ভুলতে শেষ পর্যন্ত গ্রামের বাড়ি আসতে হয় এবং গ্রামের পল্লীপ্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা সরল-সোজা তাহেরাকে আপন করে নিতে হয়। কারণ তাহেরার মাঝে চাওয়া-পাওয়ার কোনো বাতিক নেই। তাহেরার হাতের স্পর্শই তাকে এনে দেয় পরম শান্তির ঘুম। নিঃস্বার্থপরায়ণতা ও স্নেহময়তা তাহেরা চরিত্রের ভূষণ। এ সহজ-সরল তাহেরাকেই তিনি শেষ জীবনের অনিবার্য এক সত্তা

হিসেবে দেখেছেন। তাই মনের প্রশান্তির প্রশ্নে তাহেরাকে গ্রহণে তার অতীত-আভিজাত্য ও বর্তমান শ্রেণিচেতনা এক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে উঠেনি।

তবে একজন গ্রামীণ নারীর পক্ষে কোনো সামাজিক বন্ধন ও স্বীকৃতি ছাড়া এভাবে চলে যাওয়াটা দেশীয় প্রেক্ষাপটে কিছুটা বেমানান। আবার ক্ষুদ্র আয়তনের এ উপন্যাসে কামরুল হায়দার চরিত্রটি যেভাবে বিকশিত হয়েছে, সেভাবে মুশতারি বানু ও তাহেরা বিকশিত হয়নি। এদের মনোজগৎ পরিস্ফুটনে কোথাও আখ্যান বর্ণনায় ঔপন্যাসিক অংশ না নিলেও শেষে এসে যখন বলেন– 'পাঠক, সেদিন সেই যে তাহেরা গেছে, এখনো ফেরেনি, শোনা যায়, বড় সাহেবের সেবা-যত্ন করে সে ভালোই আছে। তবে শেষ পর্যন্ত কেমন থাকবে আমরা জানি না। বড় লোকদের খেয়াল, কখন কী করে, আগাম কি কিছু বলা যায়?' তখন এক ধরনের সংশয়ের জন্ম দেয়। তা কেবল বেমানন নয় বরং পাঠকের ভাববার ও ব্যাখ্যার স্বাধীনতাও এতে বিঘ্নিত হয়।

এসব ছোটখাটো সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, *জোড় বিজোড়* উপন্যাসে নারীর সেবাপরায়ণ দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। 'মেয়েরা দুই জাতের। এক জাত প্রধানত মা, আর-একজাত প্রিয়া।' নারীর এ প্রিয়ামূর্তিতে কখনো কখনো প্রবঞ্চনা ও বিনাশের চোরাবালি থাকলেও জননী মূর্তিতে সর্বদাই থাকে পরমআস্থা ও প্রশান্তি। এমন আস্থা ও প্রশান্তিই কামরুল হায়দার তাহেরার মাঝে খুঁজে পেয়েছেন। সেবাব্রতী ও সহানুভূতিশীল মনের জোরেই সে বড়লোক কামরুল হায়দারের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। তাই বড় সাহেবকে তাহেরা আর ভয় করে না, সমীহ করে না বরং ভালোবাসে। বড় সাহেবের খেয়ালে তাহেরার প্রতারিত হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু তার যে-সেবা করার অকৃত্রিম মন রয়েছে– তা পুঁজিনির্ভর নাগরিক সমাজে পাবার সুযোগ নেই। এমন শাশ্বত সত্যকেই শওকত আলী এ উপন্যাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

পাকা দেখা

শওকত আলীর *পাকা দেখা* (২০০৩খ্রি.) নাগরিক জীবনজিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণাসহ আত্ম-আবিষ্কার প্রয়াসী এক উপন্যাস। আকার-আয়তনের দিক থেকে এটি ক্ষুদ্রাকৃতির এক উপন্যাস।[৩২] নীপার মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সংকটই এ উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। তবে লেখক এ কথাবস্তুতে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও বেড়ে ওঠার বিপ্রতীপে সমাজ অস্বীকৃত মানবীয় জীবনপদ্ধতির যে-ভাষারূপ দিয়েছেন– তা নিঃসন্দেহে ভিন্ন স্বাদ, স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতার চিহ্নবাহী। এছাড়াও শওকত আশি থেকে নব্বই দশকের দীর্ঘ সময় প্রেক্ষাপটে বামপন্থীদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি, রাজনীতির চরমপন্থা, সামরিক দুঃশাসনের বিষফল, রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতাপ, ঘুষ-দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, ছাত্রসংগঠনের দ্বন্দ্ব ও দুর্বৃত্তায়ন, প্রচণ্ড বেকার সমস্যা এবং নাগরিক জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চালচিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্মোহভাবে রূপায়ণ করেছেন।

নীপা হাসান টুনির আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম-আবিষ্কার, আত্মযন্ত্রণা ও জীবনসংকটকে ঘিরেই এ উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে। নীপার মা দিলারা বেগম দীপা এবং বাবা জোবায়দুল হাসান। তবে নীপার জন্ম সমাজের আর দশটি মেয়ের মতো হয়নি। তার বাবা-মায়ের বিবাহের পূর্বেই সে মাতৃগর্ভে স্থান করে নেয়। বিবাহবহির্ভূত যৌন সংসর্গের এ নীপা সমাজের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত হলেও সে ছিল মূলত তার বাবা-মায়ের প্রেমের ফসল। নীলফামারীর তারাগঞ্জের জোবায়দুল রংপুর কারমাইকেল কলেজে অনার্সে পড়ার সময় বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে জড়ায়। এ কলেজে পড়াসূত্রে রংপুর শহরতলির দিলারার সঙ্গে জোবায়দুলের প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে রাজনীতির মাঠ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বিপ্লব ও প্রেমের টানাপোড়েনে জোবায়দুল বেসামাল হয়ে পড়ে। ফলে তাকে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। জোবায়দুল দীপাকে বিয়ের অঙ্গীকার করায় সে প্রেমিককে সর্বশক্তি দিয়ে রাজনীতিবিমুখ করে সংসারবৃত্তে ঢোকাতে মরিয়া হয়। দীপার এমন প্রয়াসের এক দুর্বল মুহূর্তে উভয়ের দৈহিক সম্পর্কে ঘটে। এ সংসর্গের ঘটনায় জোবায়দুলের চেয়ে দীপার ভূমিকাই সক্রিয় ছিল। কারণ–

> 'ওই রাতে দিলারা বেগমের মনে জেদ ছিল, ভালোবাসা ছিল, আশ্লেষ ছিল, চিন্তা আর বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল রাজনৈতিক অস্থিরতায় দুশ্চিন্তাকাতর টালমাটাল জোবায়দুল হাসানকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ জোবায়দুল হাসানকে সে- রাতে নির্জন বাড়ির মেঝেতে ফেলে নিজের সমস্ত দেহমন দিয়ে বন্দী করতে চেয়েছিল এবং পেরেও ছিল। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর তাকে কিছু বলতে হয়নি। হাসানই বলেছিল, আমি বিয়ের ব্যবস্থা করছি চিন্তা করো না।'-[পা.দে; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯/ পৃ.৯১-৯২]

কিন্তু ভাগ্য দীপার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়নি। জোবায়দুল তখনো টিউশনি করে চলছিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় বদরগঞ্জ হাইস্কুলে চাকরি পায়। স্কুলে যোগদানের পর বিয়ের করার পরিকল্পনা থাকলেও যাত্রাপথে সে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গ্রুপের প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয়। তার গলাকাটা লাশ রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। ফলে কান্না করা ছাড়া দীপার আর কিছুই করার থাকে না। তারপরেও দীপার বাবা মেয়েকে জোবায়দুলের পরিবারে গ্রহণ ও স্বীকৃতির দাবি জানালেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। দীপাকে গর্ভপাতের জন্য তার মা চাপ দিলেও সে কোনোমতেই রাজি হয় না। ফলে অনিচ্ছার সন্তান হিসেবে নীপার জন্ম হয়। প্রেমের সন্তান হলেও নীপার এ জন্মকে সমাজের কেউ স্বাগত জানায়নি কিংবা সহানুভূতি প্রকাশ করেনি। তবে দীপা সহজে ভেঙে পড়ার মতো মেয়ে ছিল না। তাই স্বাবলম্বী হাবার আকাঙ্ক্ষায় নীপাকে সে তার মায়ের কাছে রেখে ঢাকায় বড় খালার বাসায় এসে ওঠে। বি.এ পাশ করে ব্যাংকে চাকরি নেয়। এ কর্মসূত্রেই জোবায়দুলের পরিচিত ও বামমতাদর্শী সহকর্মী ব্যাংকার কামাল আহমদকে বিয়ে করে। ফলে নীপাকে শৈশবকাল নানা-নানির তত্ত্বাবধানে রংপুরের শহরতলিতেই কাটাতে হয়। তবে তার পিতৃপরিচয়হীন অবস্থা তাকে পদে পদে বিড়ম্বনার মুখোমুখি করে। কারণ 'অপয়া মেয়ে' তকমার জন্য সে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না। এ নানা বাড়িতেই নীপার পড়ালেখার হাতেখড়ি ও শৈশব কাটে। তার মা দু-এক মাস পর পর ছুটিতে কাছে আসলেও নীপার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে থাকে তার নানা-নানির মুখ। এ স্মৃতিসূত্রেই নীপার মনে পড়ে–

> 'গাছপালায় ঢাকা রংপুরের শহরতলির বাড়িটা। কুয়োতলা, শজনে গাছ, টিনের চাল বেয়ে বর্ষার পানি পড়া, পানি ছপ-ছপ উঠোন। তারপর আবার ঢেঁকিঘর, ধানভানার আওয়াজ হচ্ছে একটানা ছন্দের মতো– এই ছন্দময় আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। ঘুম ভাঙত ভোর সকালে নানার ডাকাডাকিতে।'-[পা.দে./পৃ.২৩-২৪]

নীপার এ সোনাঝরা শৈশবকালকে তার পরিচয়সংকট ক্রমশই কুৎসিত-কদাকার করে তোলে। শৈশবে সে 'টুনি' নামে পরিচিতি পায়। নানির মুখে সে জানতে পারে বাবা হিসেবে 'জোবেদালি' নামক এক সাধারণ মানুষের কথা এবং বাস চাপায় তার মৃত্যুবরণের কাহিনি। এ নানির কাছ থেকেই নীপা তার অস্বাভাবিক জন্মের ইতিবৃত্ত শোনে। ফলে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে। তার মতো আরো অনেক বাপহারা-মাহারা মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে নিজেদের কথা ব্যক্ত করতে পারলেও নীপা পারে না। ভেতর থেকে বাধা ও সংকোচের কারণে সে মিইয়ে যেত। জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকেই তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে–

> 'তার জীবন আর সবার মতো নয়। তার বাবা নেই, মা থাকলেও অন্য সবার মায়ের মতো নয়।...সব বাচ্চারই বাবা আছে, শুধু তার নেই। সবাই বাপের কোলে-পিঠে চেপে আদর নিচ্ছে, শুধু তারই আদর নেওয়ার উপায় নেই। কারণ তার বাপ নেই। সে অন্য বাচ্চাদের বাপের কোলে চেপে আদর নেওয়ার দৃশ্য দেখত আর একা একা কাঁদত।'-[পা.দে./পৃ. ২০ ও ৬১]

এভাবেই নীপা অন্য সবার চেয়ে তার ব্যতিক্রম, অভিশপ্ত, অবাঞ্ছিত জীবনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। তার জীবন যে-অন্যদের মতো মসৃণ ও মাধুর্যময় হবে না– এমন বাস্তবতাও নীপা শৈশব থেকেই বুঝতে শেখে। নানা-নানি মারা গেলে বাধ্য হয়ে নীপাকে ঢাকা শহরে মায়ের নতুন সংসারে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু আপন মা দীপা, সৎবাবা কামাল আহমদ এবং সৎভাই আফসানকে মন চাইলেও সে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। হাইস্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে নীপা বাবার প্রকৃত নাম ও পরিচয় পায়। এ নতুন পরিচয়সূত্রে তার মনে জেঁকে বসা বাবার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন ঘটে। 'বিপ্লবী রাজনীতি করার জন্য যে বাবা প্রাণ দিতে পারে, সেই বাবার জন্য সন্তানের গর্ব না হয়ে পারে?'– মনে মনে নীপা এমন ধারণা করলেও তা সে প্রকাশ করতে পারতো না। বরং বার বার মন থেকে বাধা আসতো আর জেগে ওঠতো–

> 'বিয়ে করার লোভ দেখিয়েই ওই মানুষটাই তার মায়ের সঙ্গে সেক্স করেছে। তখন রাগে আর ঘেন্নায় তার সমস্ত শরীর রি রি করে উঠতো।'-[পা.দে./পৃ.৬৪]

নিপার এ মনোভাবকে উস্কে দেবার পেছনে দায়ী ছিল তার দাদা কলিমুদ্দিন হেকিম এবং চাচা ওবায়দুল হোসেনের অমানবিক আচরণ ও দায়িত্বহীনতা। তার দাদা যেমন তাকে নাতনি হিসেবে স্বীকৃতিটুকু দেননি, তেমনি তার উচ্চশিক্ষিত চাচাও মিরপুরের রূপপুরে বসবাস করার পরেও তাকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। সৎবাবা কামাল সাহেবই নীপার চাচাকে খুঁজে বের করেছিলেন। অথচ তার পক্ষ থেকে তেমন আগ্রহ দেখতে না পেয়ে নিজেই নীপাকে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিলে দীপা বাধা দিয়ে বলে–

> 'নীপা কেন যাবে ওঁদের কাছে ? নিজেদের বংশের একটা বাপ-মরা অসহায় মেয়ের খরব পাওয়ার পরেও যখন ওঁদের মনে কোনো রকম হিউম্যান রিঅ্যাকশন হয় না, তখন অমন মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'– [পা. দে./পৃ.৬৬]

মায়ের এমন বাধার মুখে নীপার চাচাকে দেখার ও পিতৃবংশের মানুষজনদের সঙ্গে মেশার আগ্রহ পূরণ হয় না। উপরন্তু তার মায়ের কথায় নীপা আরো জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ায়। যুক্তি হিসেবে দীপা বলে– 'তোর বাবাকে ওরা অপমান করতে চায়। তার বিশ্বাসকে, ভালোবাসাকে, তার অস্তিত্বের অংশকে অস্বীকার করতে চায়। তার বিশ্বাস ও ভালোবাসা তো মিথ্যা ছিল না। তুই তো সেই বিশ্বাস আর ভলোবাসারই প্রমাণ। তুই তো তারই অংশ'। নিজের এমন জন্মবৃত্তান্ত শুনে নীপা কয়েক মুহূর্ত হতাশ হয় বটে, কিন্তু ভেঙে পড়ে না। তাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বলে-

> 'অন্য মেয়েদের জীবনে যেমন প্রেম-ভালোবাসা আসে, তার জীবনে তেমন কিছু আসবে না। কারণ তার জীবনের সব কথা জানার পর কোনো সংসারেই তার ঠাঁই মিলবে না। তাকে বাঁচতে হবে শুধুই নিজের ওপর নির্ভর করে। তাকে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে; ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ভালো চাকরি করতে হবে এবং তাকে রোজগারও করতে হবে।'-[পা.দে./পৃ. ২১

একারণেই নীপা কলেজ জীবন থেকেই প্রাইভেট পড়িয়ে হাত খরচের টাকা যোগাড় করে। সৎবাবা কামাল সাহেব তার প্রতি আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল হবার পরেও তার কাছে কোনো কিছু চায় না ও তার কোনো উপহারও গ্রহণ করে না। আপন মা দীপা ঈদের সময় যে-জামা দেয়, তা শুধু সেদিন পরেই আর গায়ে তুলে না। এভাবে একই সংসারে বসবাস করেও নীপা নিজের আলাদা জীবনপরিসর গড়ে তুলে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় নিজের যোগ্যতার পরিচয় রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অনার্স পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম হয়। অথচ বাবা-মায়ের প্রেমজীবনের তিক্ত পরিণাম নীপার অন্তঃকরণে এক বিরূপ প্রভাব ফেলায় সে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কামরুল ও হাবিবদের মতো বহু প্রেমপ্রার্থী ছেলেদের পাত্তা দেয় না। এ প্রেম নিয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নীলা, রিনা, মাহমুদা, আফরিন ও মুন্নি ঠাট্টা-রসিকতা করলেও নীপার মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। তাই পূর্ববৎ ধারণা থেকেই –

> 'ছেলেতে-মেয়েতে মেলামেশা আরম্ভ করেছে জানতে পারলেই তার মনে হয়, ঠিক তারা ওই কম্মো করে দিয়েছে।... ভেতরে ভেতরে তার মনে ঘেন্না বিজবিজ করত।...মনের ভেতরকার সেই বাধা তার কাটেনি। কেউ একজন মনের ভেতর থেকে ঠিকই বলে উঠেছে, তুই কেন করিস এসব? তুই তো ওদের মতো নোস?'-[পা.দে./পৃ.৩৯]

তাই কোনো ছেলে তার কাছাকাছি হলেই সে নানা আতঙ্কে এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো। আর এদের মনোভঙ্গি ও ভাবসাব সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। নিজের অজান্তেই সে তার মনের চারদিকে একটা বেড়া ও বাধার দেয়াল অনুভব করতো। যার ফলে তার মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলতো– 'এই নীপা, যাস না। ওদিকে যাস না। গেলেই মরবি।' আবার এ প্রেমের মতো দাম্পত্যসম্পর্ক বা বিয়ের বিষয়টাকেও তার কাছে প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে যৌনতাকেই প্রধান বলে মনে হতো। ছোট বেলা থেকেই এ বিয়ের ব্যাপারটি নীপার কাছে আগ্রহের চেয়ে বিরক্তিকর হয়ে ধরা দিয়েছে। কারণ–

> 'বিবাহের প্রথম ব্যাপারটাই তো শারীরিক।...গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে মনে হয় ভোগ আর সম্ভোগ– কোমরের নিচে যা আছে আর ওপরে যা আছে, সেটাই আসলে চারণক্ষেত্র। মিলন টিলন নয়, সবই বিদ্ধ করা, ছিন্ন করা এবং নাশ করা।...তার মন ঐ ভালোবাসার কথা মেনে নিতে চায় না।...বরং মনে হয় জন্মের মূলে তো শুধুই লালসা আর সম্ভোগ।'-[পা.দে./পৃ.৬৯-৬০]

তাই নীপার কাছে বিয়ে উপলক্ষে বলা 'আত্মার মিলন, সৃষ্টির সূচনা ও দার্শনিক তত্ত্বের' চেয়ে লালসা আর সম্ভোগকেই আসল বলে মনে হয়েছে। নীপার চেতনাস্রোতে এ বিরূপ প্রভাবের ক্ষেত্রে তার বাবা-মায়ের বিবাহবহির্ভূত যৌনসংসর্গই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমন বিরূপ স্মৃতিসূত্র, গুটিয়ে নেয়া জীবনপরিসর ও আত্মদহনে জর্জর হয়ে নীপা একলা চলার পথে সংগ্রাম করে নিজেকে এগিয়ে নেয়। এম.এ পরীক্ষা দিয়েই সে খিলগাঁও কে.জি স্কুলে চাকরির আবেদন করে। পঞ্চমবারের এ ইন্টারভিউ দিতে এসে সে কিছুটা হতাশও হয়। কারণ রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির ও কমপক্ষে ছয় বছর চাকরি চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার বা বন্ডসইয়ের মুখোমুখি হয়ে নীপা চাকরির আশা প্রায় ছেড়েই দেয়। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে তার চাকরিটা হয় এবং বহু ঝামেলা মোকাবেলা করে সে দুই-আড়াই হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ পায়। কিন্তু এ চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসে নীপার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কারণ তার চেয়েও এক বছরের ছোট সাবেক বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, চটপটে এবং অকপট স্বভাবের আরেক চাকরিপ্রার্থী সোকরাতুজ্জামান ওরফে রাতুলের পরিচয় ও সংস্পর্শ নীপাকে ভিন্ন এক দিগন্তের সন্ধান দেয়। বীরভূম থেকে আগত অভিবাসী রাতুলের নয় বছর বয়সে ক্যান্সারে মা মারা গেলে স্কুল শিক্ষক বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। রাতুল জগন্নাথ কলেজ থেকে দর্শনে এম.এ পাশ করে কোথাও চাকরি না পেয়ে অবশেষে দৈনিক *দেশের খবর* পত্রিকায় যোগদান করে। প্রথম পরিচয়ে নিজ বংশধরদের বিষয়ে রাতুলের প্রাণখুলে সব বলা, তার মাতৃহীন অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গিতে সংযম ও সহানুভূতির ভাব দেখে নীপা তাকে ব্যক্তিক্রম পুরুষ হিসেবে শনাক্ত করে। নীপা ও রাতুলের পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থা ও পোড়খাওয়া জীবনসংগ্রাম খুব দ্রুত উভয়কে ঘনিষ্ঠ করে। চারবার রিক্সায়

একত্রে গমন এবং আটবার সাক্ষাৎ ও গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে প্রেমময় সম্পর্কের পত্র-পল্লব মেলে। উপরন্তু রাতুলের সান্নিধ্য-সংস্পর্শ নীপার মনের ভারকে অনেকটা হালকা ও ফুরফুরে করে। তাই সে মনে মনে ঠিক করে–

> 'পরের দিন দেখা হলেই সে রাতুলকে তার নিজের সমস্যার কথা বলবে। নিজের কথা বলার মতো কোনো লোকই সে খুঁজে পায়নি। আজই প্রথম মনে হচ্ছে, রাতুলকে বোধ হয় সে নিজের কথা বলতে পারবে। আর বললে মনে হয়, সে বুঝবেও।'-[পা.দে./পৃ. ৮৬]

ফলে নীপা দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ বয়ে বেড়ানো অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা, নিজের অস্বাভাবিক গ্লানিময় জন্মের কথা বলে হালকা হবার ও সান্ত্বনা পাবার হিতাকাঙ্ক্ষী খুঁজে পায়। আবার তার মনে পূর্বেকার পুরুষ-সান্নিধ্য, ভালোবাসা ও বিয়ে সম্পর্কে যে-প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উদয় হতো; বর্তমানে সেই মনোভাব যে-আর নেই– তাও নীপা সুস্পষ্টভাবে টের পায়। কারণ রাতুল সঙ্গে থাকলে নীপার– 'শরীরে মনে আকর্ষণ যেমন জাগে না, তেমনি আবেগও জাগে না। শুধু কেমন যেন ভালো লাগে, সুখ-দুঃখের কথা বলতে ইচ্ছে করে, হাসিঠাট্টা করতে মন চায়। মনে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করতে পারবে, ও যদি পাশে থাকে।' এ রাতুলকে ঘিরে নীপা যখন তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার সুখ-স্বপ্ন দেখছিল, তখন বুয়েটপাশ ইঞ্জিনিয়ার ও আমেরিকাপ্রবাসী কবির মাহমুদ পাণিপ্রার্থী হয়ে আসায় সে কিছুটা সংকটের মুখে পড়ে। এ প্রস্তাবকে নীপার মা অতি আগ্রহে বরণ করে নেয়। দীপার আগ্রহের মূলে শুধু কবিরের বংশ-অর্থ-বিত্ত-শিক্ষাই বড় হয়ে ওঠেনি বরং প্রবাসে জীবযাপন করায় তার অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কীয় সম্ভাব্য ঝামেলা এড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। কিন্তু প্রবাসী ছেলে, বেশি বয়স, তথ্য ঘাটতি, রুচিবোধ-মানসিকতার বৈপরীত্যের কথা তুলে নীপা এ প্রস্তাব এড়াতে চাইলেও মায়ের আপত্তির কারণে পারে না। উপরন্তু দীপা কবিরকে ভালোভাবে জানার ও বোঝার জন্যে বেড়াতে যাবার পরামর্শ দিলে নীপা ক্ষেপে বলে –

> 'ওইভাবেই তো মেয়েদের ভোলায় ওরা। তারপর কী করে তুমি জানো না? দেখোনি?...তোমার জীবনেই তো অমন ঘটনা ঘটেছে। তোমার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন করেনি জোবায়দুল হাসান?'-[পা. দে./পৃ.৯১]

মাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন চরম আঘাত করে নীপা মর্মযাতনায় বিবশ হয়ে পড়ে। তারপরেও তাকে বিয়ে দিতে মায়ের পরামর্শ, উপদেশ, উদ্যোগ ও তোড়জোড় দেখে নীপা তার উন্মুলিত জীবনের স্বরূপকে অনুধাবন করে। তার মনে হয় 'তার পায়ের তলায় মাটি নেই, কখনোই ছিল না। তার জন্ম, জন্মদাতা, জন্মকাল– সবই বানানো। সত্যিকার অর্থে কোনো সমাজে বা সংসারে সে বিলং করে না। অন্তত মানসিকভাবে সে করতে পারে না।' ফলে মাকে কষ্ট না দিতে মনের বিরুদ্ধে সে সাজসজ্জা করে পাত্র পক্ষের সামনে যায়। আর সুযোগ বুঝে পাত্র কবিরকে অনাগ্রহী করতে বলে–

> 'আমি তো মনের দিক থেকে বিয়ের জন্য তৈরি নই...আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তবু বিয়ে করেননি কেন?..আমার বিশ্বাস, অল্প দু-চারজন বাদে সব পুরুষ মানুষই খারাপ। তারা লোভী, মিথ্যাবাদী আর লম্পট। প্রেমের ভান করে মেয়েদের সঙ্গে সেক্স করতে চায়।'-[পা. দে./পৃ. ৯৬-৯৭]

এসব আক্রমণাত্মক কথার মাধ্যমে নীপা কবিরকে তার অপছন্দের কথা কৌশলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু কবিরের নাছোড়বান্দা জেদ আর তার মায়ের প্রশ্রয়ে নীপা স্বস্তি পায় না। তবে হোটেল শেরাটনে আড্ডা দিতে গিয়ে নীপা কবিরের বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে দেখার বিষয় জানতে পারে। যা তার কাছে বিয়ের নামে ঘুরে ঘুরে পণ্য কেনা বা হাট থেকে কুরবানির গরু-ছাগল কেনার মতো মনে হয়। তার মতের তোয়াক্কা না করে বিয়ের পাকা কথা চলাকালে নীপার সৎবাবা কামাল সাহেব কবিরের পাত্রী হিসেবে আকরামের বোন, গুলশানের শাহেদ সাহেবের মেয়ে, উত্তরার মহসীন সাহেবের মেয়েকে দেখা, বিয়ের কার্ড ছাপানোর কথা এবং আমেরিকায় বিয়ের কথা জানতে পারেন। একে গুজব বলে সাব্যস্ত করে এবং এর পক্ষে যুক্তি তুলে দীপা তারপরও নীপাকে কবিরের সঙ্গেই বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু নীপা দেশত্যাগ করে বিদেশে যাবার বিষয়ে আপত্তি তোলে বলে–

> 'আমার পূর্বপুরুষ এ দেশের আকাশ-বাতাস, মাটি, নদী, গাছপালা, পশুপাখি– বলা যায় সমস্ত কিছু ভালোবেসেছে এবং সে-সবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেঁচে থেকেছে, এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি কীভাবে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারি? আর কেনই-বা যাব? আমি এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না, গেলে আমার নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে বলে আমি মনে করি।'-[পা. দে./পৃ. ১০০]

এমন দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলে নীপা এ জবরদস্তির বিয়েকে অস্বীকার করে। কারণ যে-দেশের ঘাস-মাটি-ধুলো-লতাপাতার সঙ্গে জোবায়দুল হাসানের মতো বিপ্লবীর রক্ত মিশে আছে, যিনি দেশকে ভালোবাসতেন– এমন স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি ছেড়ে নীপা বিদেশ যেতে কিছুতেই রাজি হয় না। এ দেশ ও দেশপ্রেমসূত্রেই তার বাবার কথা মনে পড়ে। যে বাবাকে সে কোনোদিন দেখেনি, যাকে নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই। আর দেখেনি বলে তার আগ্রহ বরং কিছুটা বেশি। সমাজ-অস্বীকৃত পন্থায় তাকে জন্ম দেয়ায় যে বাবাকে নীপা কখনো কখনো অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। সেই বাবার জন্য মাঝে মাঝে তার মন আবেগে আপ্লুত হয়। তাই–

> 'পায়ের তলায় ঘাস, মাটি, বালু আর কাঁকরের স্পর্শ তাকে যেন সজাগ করে তোলে। বাবাকে সে দেখেনি। কিন্তু বাবার শরীর এই মাটিতেই মিশে আছে। মাটিতে, ঘাসে, গাছে, লতায়-পাতায় শরীর ছুঁলেই মনে হয় বাবাকে ছুঁতে পারছে, যে বাবা মানুষকে ভালোবাসতেন, জীবনসঙ্গনীকে ভালোবাসতেন, দেশকে ভালোবাসতেন।'-[পা. দে./পৃ. ১০৪]

এমন বাবার আদর্শে বলীয়ান হয়ে নীপা সকল লোভের হাতছানিকে পরাস্ত করে দেশপ্রেমে অবিচল থাকে। তারপরেও তার মা কবিরকে বিয়ের জন্য অব্যাহত চাপ দিলে নীপা রাতুলকে বিয়ে করার ঘোষণা দেয় এবং তার সঙ্গে গড়ে ওঠা প্রেমের বিষয়টিও প্রকাশ করে। 'যদি আমাদের অমতে বিয়ে করো তাহলে এ বাসা ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে, সেটা জানো?'– মা ও সৎবাবার এমন ভয়-ভীতিকে সে আমলে নেয় না। বরং 'তোমরা কি অনুমতি নিয়ে বিয়ে করেছ?'– বলে পাল্টা প্রতিবাদ করে। তাই রাতুলের সাংবাদিকতা পেশার স্বল্প উপার্জন এবং অতীতের বামরাজনীতি সংস্পর্শের কথা ভেবে তার মন সামান্য ঝাঁকুনি খেলেও সে ভেঙে পড়ে না। তার মানসলোকে উদয় হয়– 'জোবায়দুল (তার বাবা) তো বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ত্যাগ করে আসেনি । কিন্তু রাতুল ছেড়ে এসেছে– ভুল রাজনীতির দায় সে কেন বইবে? না এমন কিছু হবে না, তাহলে তুই কেন আছিস ওর সঙ্গে? তুই অমন কিছু হতে দিবি না। কিছুতেই না।' মায়ের করা ভুল নীপা কিছুতেই করবে না– এ প্রেমই তাকে সে-বোধ, বিশ্বাস, শপথ ও প্রেরণায় উজ্জীবিত করে।

নীপা এক বছরের বয়োকনিষ্ঠ প্রেমিক রাতুলকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। নীপার এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রথাবিরোধী মনোভাবনার পরিচয় মেলে। এ মনোবলের মধ্য দিয়েই নীপা অতিক্রম করে যায় তার পরিচয়সংকট ও জীবনসংকটের নির্মম বাস্তবতা। জন্ম-নিয়তি,সমাজ ও পরিবার কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধকে সে কর্মনিষ্ঠা ও সুন্দর জীবনবোধ দ্বারা পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। এ হার না মানা মানসিকতাই তাকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী মহিমা। এ উপন্যাসে লেখক যে-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের চিত্র এঁকেছেন তা অবক্ষয় তাড়িত। জোবায়দুলের খুন হওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা, গলাকাটা রাজনীতি, সামান্য কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নিয়োগ নিয়েও প্রভাব খাটানো ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্য– এসব চিত্র সমাজের সুস্থতার নির্দেশক নয়।[৩৩] এছাড়া স্বৈরাচার এরশাদের দুঃশাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট, ছাত্রদল-ছাত্রলীগ-ছাত্রসমাজ ও চরমপন্থী বামদলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ভীতিকর পরিবেশ, কালো টাকার দাপট, চাঁদাবাজি, জনমনের অসন্তোষ এবং পাশ্চাত্য মোহের চালচিত্র অত্যন্ত নিপুণ ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ উপন্যাসে নীপার পিতৃপরিচয়ের সংকট যতটা ঘনীভূত হতে পারতো, ঠিক ততটা হয়নি। আবার তার অন্তর্দ্বন্দ্বও যথেষ্ট মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠেনি। আর দীপা চরিত্র যেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, তার তুলনায় রাতুল ও কামাল অনেকটাই নিষ্প্রভ। এমন সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও *পাকা দেখা* উপন্যাসে শওকত নীপার পিতৃপরিচয়ের সংকটের সমান্তরালে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার যে-ভাষারূপ দিয়েছেন তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। আশির দশকের শুরুতে নীপার পিতৃহীন অবস্থা এবং আত্মপরিচয়সংকট মূলত মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট, অচলাবস্থা ও অভিভাবকশূন্য দশাকেই ইঙ্গিত করে। নীপার এ ব্যক্তিসংকট সামাজিক-সংকটে রূপ লাভ করেছে। ব্যক্তির জীবনযন্ত্রণা ও আত্মসংকট জাতীয় জীবনের গভীর ক্ষত ও বিনাশেরও যে-ইঙ্গিত দেয়– *পাকা দেখা* শওকত আলীর সে-অভিপ্রায়ের এক সতর্কসংকেত।

স্থায়ী ঠিকানা

শওকত আলীর *স্থায়ী ঠিকানা* (২০০৫খ্রি.) উপন্যাসে নাগরিক জীবনে প্রযুক্তির আগ্রাসন এবং এর পরিণাম ও প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনিকেত-উন্মূলিত হবার চিত্রই বিম্বিত হয়েছে। আধুনিকতার নামে, নগরায়ণের নামে, নাগরিক সুবিধার নামে যন্ত্রনির্ভর একচ্ছত্র পুঁজিবাদ কীভাবে মানুষকে নাড়িমাটি থেকে বিচ্ছিন্ন-গৃহহীন-ঠিকানাহীন করে এক পরিচয়-সংকটের দিকে ঠেলে দেয়– এমন আত্মযন্ত্রণার ভয়াল ও বিনাশী রূপটিই এ কথাবস্তুর প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। জীবন বিস্ময়কর ও বহুমাত্রিক। জীবনের রীতিই হচ্ছে পরিবর্তিত হওয়া, বদলে যাওয়া ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এ ক্রমচলিষ্ণুতাই জীবনের ধর্ম। মানুষের জীবনের বিকাশ ও পরিণতির সূত্র এখানেই নিহিত। চলিষ্ণু জীবনের সঙ্গে মানুষের আবাস-আবাসনের ঠিকানাও বদলে যায়। ফলে মানুষের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলাও সম্ভব হয় না। কারণ জীবনের অস্তিত্ব আছে কিন্তু স্থায়িত্ব নেই। 'মৃত্যু' নামক এক অমৃত বৃক্ষের ফল খেয়ে মানুষ জীবনের ভুবনে প্রবেশ করে। তবুও মানুষ এ নশ্বরজীবনে প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি তৈরি করে একে অবিনশ্বর রূপ দিতে চায় এবং গড়তে চায় স্থায়ী ঠিকানা। তাই জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গেও মানুষকে স্থায়ী ঠিকানা জুড়ে দিতে হয়। কেননা এসবই জীবনের পরিচয় বহন করে। জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে মানুষ ঠিকানা গড়ে, আবার নতুন ঠিকানার দিকে যায়; নতুন-পুরাতনের এই দ্বন্দ্বই শওকত আলীর *স্থায়ী ঠিকানা*-র মৌল উপজীব্য।[৩৪] সময় ও সমাজসচেতন লেখক হিসেবে শওকত আলীর এ উপন্যাসে শুধু নগরজীবনের উদ্ভূত অনিকেত অবস্থাই গুরুত্ব পায়নি, বরং সেই সঙ্গে সাতচল্লিশের দেশভাগ, দেশত্যাগ, দাঙ্গা, পয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, দুর্নীতি, পুঁজিপতিশ্রেণির অপ্রতিরোধ্য উত্থান, সামরিক দুঃশাসন, দেশের নৈরাজ্য, উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম এবং দেশীয় তথা বৈশ্বিক নানা সংকটের চালচিত্রও নিষ্ঠার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে।

নব্যপুঁজির প্রশ্রয়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু শহর ও নগরায়ণের চাপে মুহিব হাসানের মূল্যবোধ ও মনোজগতের অনিবার্য দ্বন্দ্ব এবং তদ্‌জাত রূপান্তরকে কেন্দ্র করে এ কথাবস্তু গড়ে উঠেছে। মুহিব হাসান নবাবপুর সরকারি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার; সাবিনা ওরফে বিনুর স্বামী এবং পিন্টু, মিন্টু ও শিউলির বাবা। মুহিব সাহেব দেশভাগের শিকার হয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে ঢাকায় আসেন এবং উয়ারী এলাকার হেয়ার রোডে একটি দোতলা বাড়ি করতে সক্ষম হন। এ বাড়িটিই তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে। দশ বছরের অবসর জীবনে তিনি সম্প্রতি আমেরিকায় বড় ছেলে পিন্টু ও শ্যালক জাহিদের লন্ডনের বাসায় ছয় মাস কাটিয়ে সকাল বেলা বাড়ি ফিরেন। দীর্ঘ প্রবাসজীবন কাটিয়ে আসলেও তিনি তার আটপৌরে জীবনের ধরনটি অটুট রাখেন। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো নাস্তার টেবিলে পত্রিকা দেখতে দেখতে খাবার সময় প্রচণ্ড শব্দের ঝাঁকুনিতে তিনি ভয় পান। মুহিব সাহেবের এমন বেসামাল অবস্থা দেখে মেয়ে শিউলি বাবাকে বিস্তারিত জানায়। প্রতিবেশী আমজাদ আলীরা তিনভাই বাড়ি বিক্রি করে গ্রিনরোডের অ্যাপার্টমেন্টে চলে যান। আর এ জায়গাটি নব্যপুঁজিপতি জহিরুল্লাহ হাউজিং কোম্পানি কিনে নিয়ে বহুতল ভবন গড়ে তুলছে। এজন্য তারা পূর্বেকার তিনতলা বনেদি বাড়িটি ভেঙে ফেলেছে, অসংখ্য ফলফলাদি ভেষজ গাছে সমৃদ্ধ বাগানটিও কেটে পরিষ্কার করেছে এবং ভবনের ভিত গড়তে গভীরভাবে মাটি খনন করছে। অপ্রতিরোধ্য পুঁজির আগ্রাসন ও যন্ত্রদানবের নখরাঘাতে মুহিব সাহেবের চিরচেনা জীবনের ছকটি যেন ধীরে ধীরে ধসে পড়ে। তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে দৃষ্টি দেয়া মাত্রই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সবই তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কারণ–

> 'সামনের জায়গাটা একেবারে ফাঁকা।...অথচ বিদেশে যাওয়ার সময়েও দেখে গেছেন পাশাপাশি তিনটে দালান বাড়ি।... সেই দালান তিনটার এখন কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গোটা এলাকাটা ছিলো গাছগাছালিতে ভর্তি। ফলফলাদির গাছ ছিলো, ফুলের গাছ ছিলো, ফলের গাছ ছিলো, কবিরাজী হেকিমী ওষুধের গাছ লতাপাতা ছিলো– এখন ওসবের কিছুই নেই– চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না– খালি লালচে আর গেরুয়া রঙের খাবলানো খাবলানো মাটি।'-[স্থা.ঠি; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫/ পৃ. ১৩]

এ যন্ত্রের আঘাত ও লোহার ব্লকের ঘা কেবল পুরনো দালানেই পড়ে না বরং তা মুহিব হাসানেরও স্মৃতিমুগ্ধতাকেও ক্ষতবিক্ষত করে। এ বাড়ি করা সূত্রেই তার একে একে মনে পড়ে নিজের উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় আসা, কলেজ পড়ুয়া সাবিনার ইচ্ছায় বিয়ে হওয়াতে শ্বশুরের বিরাগভাজন হওয়া এবং বহুকষ্টে উয়ারীর বনেদি জমিদার জীতেন্দ্রমোহন ঘোষের কাছ থেকে বাড়িটি কেনার বিষয়। বাষট্টি শতাংশের এ বিরাট বাড়িটি ঘোষ বাবুরা অন্যান্য হিন্দুদের মতো পয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ডামাডোলে বিক্রি করে ভারত চলে যান। বাড়ির বায়ান্ন শতাংশ কেনেন পূর্ণিয়া থেকে আগত উদ্বাস্তু সিকান্দার আজিজ খান আর বাকি দশ শতাংশের আড়াই শতাংশ করে সাড়ে সাত হাজার টাকায় কেনেন তিনিসহ তার তিন সহকর্মী সলিমুল্লাহ, মাজহার ও নূর হোসেন। টাকা সংগ্রহ করতে গিয়েও তাকে বহু হিমশিম খেতে হয়। স্ত্রী সাবিনা নিজের

গহনা বিক্রি করে টাকা দিতে চাইলেও তিনি নেননি। তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রাইভেটের জমানো টাকা, গ্রামার বই লেখার সম্মানি এবং ধারদেনা করে শেষপর্যন্ত জায়গাটি কিনতে সক্ষম হন। আর দোতলা বাড়ি করার সময়েও ইট ব্যবসায়ী ছাত্র মনিরুলের কৃপায় সহজ শর্তে ইট পাওয়াতে এবং স্ত্রীর স্কুল সহকর্মী সাহানার প্রকৌশলী স্বামীর বদান্যতায় হাউজিং লোন পাওয়াতে তিনি বাড়িটি শেষ করতে পারেন। বাড়িটি মুহিবের স্ত্রী সাবিনাই মনমতো গড়ে ও গুছিয়ে তোলেন। তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ধাক্কায় সিকান্দার আজিজ পুনরায় পূর্ণিয়ায় চলে গেলে বাড়িটির মালিকানা চলে যায় মুহিবেরই নবাবপুর স্কুলের ছাত্র, সাবেক ছাত্রনেতা, রাজাকার ও কালোবাজারি আমজাদ আলীর হাতে। সম্প্রতি এ আমজাদ বাড়িটি যে-জহিরুল্লাহ হাউজিং কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছে, সে জহিরুল্লাহও মুহিবের সাবেক ছাত্র। সৎ, মানবিক ও সংবেদনশীল স্বভাবের ব্যবসায়ী মনিরুলের সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যু হয়। অথচ এর বিপ্রতীপে রাজাকার-কালোবাজারি-লুটেরা ও দুর্বৃত্ত স্বভাবের আমজাদ ও জহিরুল্লাহদের অপ্রতিরোধ্য উত্থান ঘটে। যা দেশের সংক্ষুব্ধ সময়ের উল্টোরথযাত্রারই ইঙ্গিতবাহী।

মাত্র সত্তর-আশি বছরে এ বাড়িটি যোগেন্দ্রমোহন, জীতেন্দ্রমোহন, সিকান্দার আজিজ খান ও আমজাদ আলীর হাত ঘুরে জহিরুল্লাহ হাউজিং-এর মালিকানায় চলে আসে। এরপর আর একক মালিকানা থাকে না। কারণ বারো তলা বিশিষ্ট এ বহুতল ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডে গাড়ির পার্ক, নিচের তিন তলায় শপিং মল আর উপরের নয় তলায় হবে আবাসন। এমন সময়-বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মুহিব হাসান মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকান। খাদ্য সংগ্রহের যুগে মানুষের স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু ছিল না। স্থায়ী ঠিকানার সূচনা ঘটে খাদ্য উৎপাদনের সময় অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক সামন্ত সমাজে। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজবাস্তবতায় এসে মানুষের সেই স্থায়ী ঠিকানা বাড়িরও স্থায়ীত্ব থাকছে না। কারণ মানুষ যেখানে চাকরি ও কর্মস্থলে যোগদান করছে সেখানেই ঠিকানা গড়ে তুলছে। আবার অভিবাসী হয়ে ইউরোপ চলে যাওয়াতে স্বদেশ-স্বজন বলতে আর কিছুই থাকছে না। বর্তমান কর্পোরেট পুঁজির অপ্রতিরোধ্য উত্থানে মানুষ মাত্রই আজ শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে। ফলে নিজস্ব শেকড় ও ঐতিহ্য ভুলে বর্তমান প্রজন্ম বিভ্রান্ত ও আত্মপরিচয়হীন হয়ে পড়ছে। তাই এ প্রজন্মের কাছে পূর্বপুরুষ, পৈতৃকভিটা তেমন আগ্রহের বস্তু ও আবেগের বিষয়ে পরিণত হয় না। এসব মনে করে মুহিব হাসান লম্বা দীর্ঘশ্বাস নেন এবং সামনে তাকাতেই তার নজরে পড়ে–

> ‘শুধুই খাঁ খাঁ রুক্ষতা। আর সেই রুক্ষতার ওপর উঠবে ইট, লোহা, সিমেন্ট আর পাথর দিয়ে তৈরি বিশাল বিশাল কাঠামো। আর সেই কাঠামোর খোপে খোপে থাকবে বসত। গাছের সবুজ থাকবে না, পাখির ডাক কানে আসবে না। গাছের পাতায় পড়া বৃষ্টির শব্দ শোনা যাবে না, প্রজাপতি উড়তে দেখা যাবে না। আর এটাই হলো বাস্তবতা; বর্তমান আর আধুনিকতা।’-[স্থা.ঠি./পৃ.২৬]

আধুনিকতার নামে, নগরায়ণের নামে উত্তর-প্রজন্ম যে-স্থায়ী ঠিকানাহীন, শেকড়হীন, প্রাণহীন-আবেগহীন জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে তা মুহিব হাসান ভালো করেই বুঝতে পারেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে পূর্বপূরুষের স্মৃতিচারণ মানেই ‘ইউজলেস লস অব ব্রেইন এনার্জি।’ বর্তমান প্রজন্মের এ উন্মুল, ভাসমান ও আত্মপরিচয়হীন অবস্থা দেখে মুহিব হাসান বেসামাল হয়ে পড়েন। কারণ তিনি নিজের, সিকান্দার আজিজ খানের ও জীতেন্দ্রমোহন বাবুর জীবনের ঠিকানাহীন অবস্থার পেছনে নষ্ট রাজনীতির কালো থাবা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। কিন্তু বড় ছেলে পিন্টু ও ঘরজামাই নাঈমের শেকড়বিচ্ছিন্ন জীবনও তাকে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ভেতর ঠেলে দেয়। একদিকে মনের অশান্তি, আরেকদিকে আবাসন প্রকল্পের প্রচণ্ড শব্দ– এ দুই মিলে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। ফলে দীর্ঘদিনের অভ্যাস দুপুরের ঘুমও তিনি ঘুমোতে পারেন না। আবার বিদেশ থেকে আনা প্রিয় লেখকদের *সাচ এ লং জার্নি, বর্ডার লাইনার্স ও স্ট্রেঞ্জ পিলগ্রিম*-এর মতো বই পাঠেও মনোযোগ দিতে পারেন না। এমতবস্থায় মেয়ে শিউলির ব্যবস্থামতো কানে তুলো গুঁজে খাটে মরার মতো পড়ে থাকতে বাধ্য হন। বিকেল বেলা নিচ তলার ভাড়াটে মুকুন্দরাম বিশ্বাস শব্দের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দুই মাসের নাতিনের জীবন সুরক্ষায় বাসা ছাড়ার কথা জানান। এতে মুহিব হাসানের করার কিছুই থাকে না। এসময় প্রতিবেশী ও সাবেক সহকর্মী সলিমুল্লাহ সাহেব দেখা করতে এসে জহিরুল্লা হাউজিং-এর অমানবিক কর্মকাণ্ডের কথা জানান। প্রথম দিকে রাত-দিন সমানে আবাসনের কাজ করায় আশেপাশের কেউ ঘুমোতে পারতো না। শিশুদের অবস্থাও চরম আকার ধারণ করে। সবাই মিলে থানায় গেলেও কোনো কাজ হয় না। বরং কোম্পানির টাকা খেয়ে পুলিশ উল্টো সবাইকে অপমান করে। শেষে স্থানীয় কমিশনারকে ডাকায় এবং তার মধ্যস্থতায় রাতের বেলার কাজ বন্ধ করা হয়। কথায় কথায় প্রকাশ পায় ছাত্র জহিরুল্লাহর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নকল করার সময় ধরাপড়া এবং মুহিব সাহেবের দয়া-করুণায় বহিষ্কারের হাত থেকে রক্ষা পাবার ঘটনা। গোটা দেশের চলমান এ নৈরাজ্য সম্পর্কে সলিমুল্লাহ সাহেব তার উদ্দেশ্যে বলেন–

> ‘আজকাল খবরের কাগজে খালি মানুষ খুন, রেপ আর বোমাবাজি সন্ত্রাসের খবর দিয়ে পৃষ্ঠাগুলো ঠাসা থাকে– এমন অবস্থা হয়েছে যে গোটা দেশটাই মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে– বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি ভালো করেছেন। ওর যদি

সিটিজেনশিপ হয়ে যায়, তাহলে আপনি ওখানে গিয়ে পারমানেন্টলি থাকতে পারবেন...আমাদের আর অমন সৌভাগ্য হবে না।'-[স্থা.ঠি./পৃ. ৪০-৪১]

সলিমুল্লাহর এমন হতাশায় মুহিব হাসান কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন না। উপরন্তু এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তিনি ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হন। প্রতিবেশীর হতাশায়, অসহায়ত্বে তিনি কোনো বল ভরসা দিতে পারেন না। বহু কষ্টে গড়া মাথা গোজার শেষ ঠাঁইটুকু যে-প্রযুক্তির আগ্রাসনে ও পুঁজির দাপটে হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়ে পড়েছে; তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন। তাছাড়া জহিরুল্লাহ হাউজিং-এর বাড়ি কেনা বাবদ বহু টাকার প্রস্তাব শুনে অজানা আশঙ্কার মধ্যে পতিত হন। এর সঙ্গে টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচার পাওয়া দেশের মতো বিদেশেও ছোট দেশগুলোর উপর বড় দেশগুলোর চালানো আক্রমণ-আগ্রাসনের খবরও তাকে বিপন্ন করে তোলে। ফলে মুহিব হাসানের মন–

'থই বিহীন অনিশ্চিত দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ে যায়। তাঁর মনের ভেতরকার শক্তপোক্ত ধারণা আর গভীর বিশ্বাসকে প্রশ্নটা ঘুণ পোকার মতো কুরে কুরে কাটতে থাকে। মন থেকে প্রশ্নটা কিছুতেই ঠেলে সরাতে পারেন না। যদি তাঁর ঘরবাড়ি কিনে নিতে চায় কেউ, তাহলে তিনি কী করবেন?'-[স্থা.ঠি./পৃ. ৪৩]

এমন আত্মজিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর মুহিব হাসান দিতে পারেন না। আবার মনের জোর ও আত্মবিশ্বাসের জায়গাটাও তিনি আগের মতো দেখতে পান না। এভাবে নানা আশঙ্কা আর অস্বস্তির মধ্যে প্রথম রাত কাটলেও পর দিন আরেক নতুন সমস্যার মুখোমুখি হন। প্রতিবেশী ও সাবেক সহকর্মী নূর হোসেন সাহেব সাক্ষাত করার ছলে জহিরুল্লাহ হাউজিং কর্তৃক তাদের চারজনের বাড়িসুদ্ধ জায়গা ত্রিশ লক্ষ টাকায় কেনার প্রস্তাব এবং চাইলে তাদের গাজীপুর হাউজিং প্রজেক্টে দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট পনেরো লক্ষ টাকায় সরবরাহের কথা জানান। আর এমন প্রস্তাবে তারা তিনজন যে রাজি– তা মুহিব হাসান বুঝতে পারেন। তাই বাড়ি বিক্রির বিষয়ে আলোচনায় বসতে এবং মতামত জানতে তাগিদ দেয়াতে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং ক্ষোভের সুরে বলেন–

'নো, নেভার!...আমি ঘরবাড়ি বিক্রি কখনোই করবো না, ঘরবাড়ি কি শুধু প্রপার্টি? যে দরদাম করে কেনাবেচা যায়? আপনার কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি, ইটস এ পারমানেন্ট বেস অব লাইফ, হোয়ার হিউম্যান বিয়িংস বিলংটু– যেখানে মানুষ জন্মলাভ করে, যেখানে স্নেহ, ভালোবাসা, চিন্তা, বোধবুদ্ধি বিকাশ লাভ করে, যেখানে জীবন লালিত পালিত হয়, বিকশিত হয়। ঘরবাড়ি দরদাম করে লাভ করার আশায় কেউ বিক্রি করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'-[স্থা.ঠি..পৃ.৪৫]

মুহিব হাসানের কাছে বাড়ি কেবল থাকার জায়গা নয় এবং লাভ-লোকসানের সম্পত্তি মাত্রও নয় বরং এটি মানুষের জীবন বিকাশের এক চারণভূমি। যাকে টাকার মূল্যে বিচার করা যায় না। তাই এ বাড়ি বিক্রির বিষয় নিয়ে নূর হোসেনের সঙ্গে তার বাক-বিতণ্ডা হয়। পাশের কক্ষ থেকে মেয়ে শিউলি এসব শুনে তাকে সান্ত্বনা দিতে 'এখন তো ঢাকার মিডল ক্লাসের সবাই বড় বড় মাল্টি স্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে বাস করতে চায়– এটাই এখন ক্রেজ, ওল্ড ভ্যালুজের কথা কি কেউ চিন্তা করে?...যা মানুষের লাইফকে এনরিচ করে... সেটাই আমার কাছে ভ্যালুজ মনে হয়'– এসব কথা বলাতে তিনি আরো রেগে ওঠেন। তাই মেয়েকে বলেন–

'পুরনোকে বাদ দিয়ে কি তা সম্ভব?...তোর মায়ের প্ল্যান মতো বাড়িটা করা; গেটের দুপাশে ফুলের গাছ দুটো, গেটের ওপর মাধবী ঝাড়টা, পাঁচিলের গায়ে লতানো জুঁইগাছ দুটো– ওগুলো কেউ যদি কেটে ফেলতে চায়, তো কি করবি? কেটে ফেলতে দিবি?...সুবিধা-অসুবিধা বড়, মায়ের স্মৃতিটা কিছু না।'-[স্থা.ঠি./পৃ. ৪৮]

এ কথাসূত্রেই মুহিব হাসানের মনে পড়ে স্ত্রী সাবিনার তিল তিল করে গড়া বাড়ি ও সংসারের কথা। বাবা-মায়ের পরিত্যাজ্য হয়ে সাবিনা কঠোর সংগ্রাম করে সাধের এ সংসার গুছিয়ে তোলেন। মেয়ে শিউলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শেষ করার পরপরই বুয়েট ছাত্র রংপুরের নাঈমকে কোর্ট ম্যারেজ করে বিয়ে করলে পরিস্থিতি বুঝে সাবিনাই মেয়ে ও জামাতাকে নিজবাড়িতে আশ্রয় দেন। কারণ নাঈম এ প্রেমের বিয়ে করায় সৎমায়ের কোপানলে পড়ে পৈতৃক সম্পত্তির দাবি-দাওয়া ছেড়ে চলে আসে। আবার বড় ছেলে পিন্টু আমেরিকায় গিয়ে ভারতীয় হিন্দু মেয়ে ইলোরা আচারিয়াকে বিয়ে করলে সাবিনা প্রচণ্ড আঘাত পান। তারপরেও তিনি নিজ উদ্যোগে পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলে তাকে বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতিতে আগ্রহী করে তোলেন। আবার শেষ দিকে তিনি মুহিব হাসানকে সকালবেলা হাঁটাতে ভোরবেলাতেই পোশাক ও জুতা-মোজা তৈরি করে রাখতেন এবং একত্রে বের হতেন। যা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ভারতের চেন্নাই হাসপাতালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত চলমান ছিল। মুহিব তার কবরে পছন্দের হাসনাহেনা, নীলপাপড়ির ঝুমকো লতা আর জুঁই ফুলের চারা লাগিয়ে

দেন। আগে প্রতি মাসে নিয়মিত স্ত্রীর কবর জিয়ারত করলেও ছয় মাসের বিদেশ ভ্রমণে এর ব্যত্যয় ঘটে। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি শান্তি ও স্বস্তির ঠিকানা এ বাড়িতে ফিরতে উতলা হয়ে উঠেছিলেন। অথচ সাধের বাড়িতে এসে প্রযুক্তির নখরাঘাতে তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই সকাল সকাল তিনি স্ত্রীর কবর দেখার জন্য তৈরি হন। কিন্তু এসময় তিন প্রতিবেশী ও সহকর্মী সলিমুল্লাহ, মাজহার ও নূর হোসেন আসেন এবং বাড়ি জহিরুল্লাহ হাউজিং-এর কাছে বিক্রি না করলে ভাড়াটে মাস্তানদের আক্রমণ ও মামলার ঝামেলায় জড়িয়ে পরার কথা জানান। কারণ আমজাদ আলীসহ তাদের জমির প্রকৃত মালিক জীতেন্দ্রমোহন বাবু ছিলেন না। ছিলেন তার ছোট ভাই হিতেন্দ্রমোহন। তিনি পূর্বেই ভারত চলে যাওয়াতে জীতেন্দ্র বাবুর লিখে দেওয়া দলিল যথার্থ হয়নি। ফলে জহিরুল্লাহ কোম্পানি ভারত গিয়ে মূল দলিল করে এনেছে এবং বাকি জমিতে আরেকটি আবাসন প্রকল্প গড়ার লক্ষ্যে তাদের উচ্ছেদের মামলা দিয়ে বিতাড়িত করবে। পুলিশ-প্রশাসন ও মাস্তানরা নব্যপুঁজিপতি জহিরুল্লাহর কব্জায় থাকায় তারা সবাই যে-বড় ধরনের ঝামেলায় পড়ে যাবেন– তা মুহিব হাসানকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তারপরেও তিনি স্বভাবসুলভ কণ্ঠে সবাইকে বলেন–

> ‘আপনার বাস্তুভিটা দখল করে নিতে চায় একজন লুটেরা– আপনি নিজের ভিটা রক্ষা না করে তার হাতেই তুলে দেওয়ার জন্য ফন্দি ফিকিরের কথা ভাবছেন।...আমাকে বাস্তুভিটা ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। বহু কষ্টে এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু গড়ে তুলেছি– এটাই আমার বাস্তুভিটা–শুধু আমার বাস্তুভিটা– শুধু আমার নয়, আমার পরবর্তী জেনারেশনেরও।...ওরা পুরনো আর ট্রাডিশনাল হ্যাবিটেশনের ওপর হাইরাইজ কেন তুলছেন ? ফাঁকা জায়গাতে গেলেই তো পারেন।...টেকনোলজি তো অবশ্যই ভালো, কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে তার গ্রহণযোগ্যতা কীরকম, তা ভেবে দেখতে হবে না?’–[স্থা.ঠি./পৃ. ৫৯-৬১]

আর যুক্তি হিসেবে তিনি আমেরিকা ও লন্ডনের চার-পাঁচ তলাবিশিষ্ট সবুজ গাছপালায় ঘেরা ঐতিহ্য রক্ষা করে আবাসিক এলাকার কথা বলেন। আবার বাংলাদেশে সার-কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে ধানের উৎপাদন বাড়লেও পূর্বে ধানক্ষেতে পাওয়া জিওলসহ দেশীয় অন্যান্য মাছের বিলুপ্ত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মুহিব হাসানের মাঝে যে-উদার মানবতা, সার্বিক কল্যাণভাবনা, শ্রেয়বাদীদর্শন ও নিসর্গচেতনা দেখা যায়; তার মূলে রয়েছে এক অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ঐতিহ্য-অন্বেষার মানসিকতা। তাই তিনি যেমন চৌষট্টির দাঙ্গায় ঢাকার খ্রিষ্টানদের গোরস্থান এলাকার এক খ্রিষ্টান ছেলেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন, তেমনি ঐতিহ্যের কথা তুলে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করতে চাননি। নগদপ্রাপ্তি ও বস্তুমুখ্য চেতনার কারণে তার সঙ্গে যেমন পুরনো ছাত্রদের মতের মিল হয় না, তেমনি হয় না প্রতিবেশীদের সঙ্গে। তার এসব কথায় প্রতিবেশীরা মনঃক্ষুণ্ন হন। কোনোভাবেই তারা তাকে বাড়ি বিক্রিতে সম্মত করাতে পারেন না। ফলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এমন বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা এবং ‘বাড়ি হাতছাড়া হবার আশঙ্কায়’ তাড়িত হয়ে তিনি স্ত্রীর কবর দেখতে যান। এখানে এসেও তিনি মর্মাহত হন। কারণ স্ত্রীর পাশের জায়গা তিনি নিজের কবরটির জন্য বরাদ্দ নেবার আগেই তা অন্যত্র বিক্রি হবার কথা জানতে পারেন। আর কবরের ঝুমকো ও মাধবী ফুলের গাছকে মলিন অবস্থায় দেখতে পান। শেষে স্ত্রীর কবরেই নিজে সমাহিত হবার বিষয়টি ইমাম সাহেবের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেন এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে করতে বলেন–

> ‘তুমি চিন্তা করো না বিনু, সব ঠিক আছে, ছেলেমেয়েরা ভালো, সবাই ভালো, আমার জন্য ভেবো না। আমি শিগগিরই চলে আসবো তোমার কাছে।’-[স্থা.ঠি./পৃ. ৬৪]

মোনাজাত শেষে তিনি জুমার নামাজ পড়েন এবং নামাজ শেষে স্ত্রী সাবিনার কথা বার বার মনে উদয় হওয়ায় তিনি বসে থাকেন। কারণ– ‘মনের আকাশে একটা অজানা আশঙ্কা কালো মেঘের মতো ছেয়ে যাচ্ছিলো।’ এমন আশঙ্কা নিয়ে তিনি বিকেলে বাড়ি ফিরে আরেক সমস্যার মুখে পড়েন। জামাতা মেয়ের ওপর রাগ করে সে তার নতুন ভাড়া বাসা গুলশানে গিয়ে উঠেছে। কারণ নাঈম নতুন গাড়ি কেনায় তা এ উয়ারীর গলি-ঘুপচি দিয়ে ঢোকে না। গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা না থাকা, মেয়ে নিমাকে ভিকারুন্নেসা স্কুলে ভর্তি করা এবং ঘরজামাই অপবাদ থেকে রেহাই পেতে সে ভাড়া বাসায় চলে যায়। কিন্তু অসহায় ও একাকী অবস্থায় বাবা মুহিব হাসানকে রেখে শিউলি কোনোমতেই ভাড়া বাসায় যেতে রাজি হয় না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে ঝগড়া, পরে না খাওয়ার পালা চলে। অবশেষে নাঈমের বাড়ি ছাড়ার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যসংকট চরমে পৌঁছায়। নাঈমের কাছে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও সুবিধাটুকু গুরুত্ব পেলেও শিউলির কাছে পিতার একাকিত্ব ও অসহায়ত্বও ছিল মুখ্য। ফলে নাঈম-শিউলির মধ্যে ঘনিয়ে ওঠা দ্বন্দ্বের মধ্যে মুহিব হাসান হয়ে পড়েন আগন্তুক ও প্রান্তিক। ধনী ও বিত্তবানশ্রেণির মতো মধ্যবিত্তশ্রেণির আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্তি দেখে

মুহিব হাসান যেমন বিরক্ত হন, তেমনি মেয়ে ও জামাতার সংকটে নিজের অক্ষমতার গ্লানিতে জর্জর হন। বড় ছেলে পিন্টুর আমেরিকায় স্থায়ী হওয়া, মেয়ে শিউলির স্বামীর ভাড়া বাসায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা, ছোট ছেলে মিন্টুর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা আর শেষ ঠিকানা বাড়িটার হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় তিনি নিজেকে কোথাও মেলাতে পারেন না। এসময় মিন্টু বাড়িতে আসায় শিউলিও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে আর তিনিও কিছুটা ফুরফুরে ভাব ফিরে পান। কিন্তু প্রতিবেশীরা তাকে বাদ দিয়ে মিন্টুকে নিয়ে জহিরুল্লাহ হাউজিং কোম্পানির সঙ্গে বাড়ি বিক্রির কথা বলেন– যা মুহিব হাসান মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। এমতবস্থায় মেয়ে শিউলি স্বামীকে ডিভোর্স দেবার সিদ্ধান্ত নিলে মুহিব হাসান চরম সংকটের মুখে পড়েন। কারণ তার জন্য মেয়ের সংসার ভাঙার উপক্রম হয়। ফলে তিনি সংসারে নিজেকে এক বাড়তি ঝামেলা ও উপদ্রব হিসেবে বিবেচনা করেন। আবার সংসারের অচলাবস্থা দেখে মিন্টুর মাস্টার্স না করে চাকরি খোঁজার বিষয়টিও তাকে প্রচণ্ড পীড়া দেয়। তারপরেও তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী নিশাতকে মিন্টুর প্রতি অনুরক্ত দেখে মনের অজান্তেই বলেন– ‘ছেলে আর মেয়েটির মন যখন ফুলের মতো ফুটে উঠতে চাইছে, তো উঠুক না।’ তাই প্রথমে মিন্টুকে পাঠান এবং পরে নিজে যেচে নাঈমের বাসা দেখে আসেন। দোতলার ব্যালকনি, সবুজ ঘাসের লন এবং গাছপালাসমেত পরিষ্কার ছিমছাম গুলশানের ভাড়া বাসাটা তার খুব পছন্দ হয় এবং মেয়ের সঙ্গে সেখানে বসবাস করার বাসনাও তিনি ব্যক্ত করেন। এতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছোট ছেলে মিন্টুর– ‘আমরা কেন নাঈম ভাইদের বাসায় গিয়ে বসবাস করবো?’ এমন কথায় তিনি রাগ করেন না বরং ঠাট্টার ছলে বলেন–

> ‘নাঈম যদি আমাদের বাড়িতে পাঁচ-ছয় বছর থাকতে পারে, তো আমরা কেন ওর বাসায় দু’বছর থাকতে পারবো না, ও যদি ঘরজামাই থাকতে পারে তো আমিও ঘরশ্বশুর হয়ে থাকবো।...আপাতত আমরা নাঈমের বাসায় উঠবো, তারপর বাড়ি বিক্রির টাকা হাতে এলে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’-[স্থা.ঠি./পৃ.৮৫]

মুখে হাসি থাকলেও এসব কথা বলতে মুহিব হাসানের বুক ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়। তিনি বড় ছেলে পিন্টুর পরামর্শ মতো বাড়ি বিক্রি করে শিউলির ভাড়া বাসায় গিয়ে ওঠাকেই সার্বিকভাবে শ্রেয় বিবেচনা করেন। কারণ এতে করে মেয়ের দাম্পত্য সংকটেরও যেমন নিরসন হবে, তেমনি জহিরুল্লাহ কোম্পানির মামলা ও মাস্তানদের ঝামেলা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। প্রতিবেশীরা একে একে জহিরুল্লাহ কোম্পানির নতুন ফ্লাটে চলে গেলেও তার কাছে স্থায়ী ঠিকানার প্রশ্নটিই বড় হয়ে ওঠে। তাই জামাতা নাঈমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন– ‘ওদের তো স্থায়ী ঠিকানা আছে। মানে পূর্বপুরুষদের ভিটাবাড়ি আছে কিন্তু আমার তো নেই। বিনু এই বাড়িটাকেই স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গড়ে তুলেছিলো। সেই একমাত্র ঠিকানাটা অন্যের হাতে তুলে দিতে কার মন চাইবে বলো?’ তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি সাবেক ছাত্র জহিরুল্লাহর আহ্বানে তার অফিসে যান। বিনয় আর যথাযথ আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে কয়েক মুহূর্তেই স্বপ্নের বাড়িটি বিক্রি করে দেন। আর প্রতিবেশীরা গাজীপুরের আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাট নিলেও তার ইচ্ছানুযায়ী জহিরুল্লাহ তাকে নির্মাণাধীন এ উয়ারীর ফ্ল্যাট দেবার চুক্তি করে এবং বছরখানেক বাসা ভাড়া বাবদ বাড়তি তিন লক্ষ টাকাও দেয়। এত টাকা পেয়েও মুহিব হাসান মনের অশান্তি, অব্যক্ত বেদনা ও আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পান না। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ির সামনে পৌঁছান। প্রতিদিনের মতো গেটের সামনে স্ত্রীর লাগানো সাদা ও হলুদ করবী গাছ থেকে মৌটুসি পাখির মধু খাওয়া শেষে ঝরে পড়া ফুল দেখতে পান। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণায়নের শুরুতে মাগরিবের আজানের শব্দে তিনি যেন মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পান। পা দুটোকে তার অসম্ভব ভার মনে হয়। সিঁড়িতে ওঠার সময় মিন্টু এগিয়ে আসাতে তিনি টাল সামলে ওঠেন। উপরে ওঠে তিনি খুব কষ্টে বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেন–

> ‘কার ঘরে যাবো? এ্যাঁ? কার ঘর?...সহ্য হচ্ছে না; কষ্ট হচ্ছে বুকের ভেতরে– আমার একটা বাড়ি ছিলো, একটা স্থায়ী ঠিকানা ছিলো, আমার বিনু ছিলো, তার স্মৃতি ছিলো, তার ভালোবাসা ছিলো। ছেলেমেয়ে ছিলো, এখন তো মনে হচ্ছে কিছুই নেই। আমার সব কিছু হারিয়ে গেছে।’-[স্থা.ঠি./পৃ.৯৫]

কর্পোরেট পুঁজির অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসন এবং প্রভাবে মানবীয় আবেগের শেষ আশ্রয়টুকুও নষ্ট হয়ে যায়। যান্ত্রিক নগরায়ণের থাবায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষের নাড়িছেঁড়া অনুভূতি, অতীত-স্মৃতিমুগ্ধতা ও সুখ-স্বপ্ন। মুহিব হাসানের কাছে তার এ বাড়ি কেবল একটি লেনদেনের সম্পত্তি নয় বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার স্ত্রীর মায়া-মমতা, নিবিড় যত্ন ও ব্যথিত মনের দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু এমন স্মৃতিঘেরা বাড়িটা রক্ষা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত অব্যক্ত বেদনা, অভিমান ও অসহায়ত্বতাড়িত মুহিব হাসান আক্রোশে ফেটে পড়েন। উপন্যাসের অন্ত্যপর্বে এ মানবিক ব্যঞ্জনাটি তীক্ষ্ণ-তির্যক হয়ে উঠেছে। কারণ

শেকড়চ্যুত মুহিব হাসানকে ভোর বেলায় রান্না ঘরের ভোঁতা দা দিয়ে স্ত্রীর শখের করবী গাছদুটোকে জেদের বশে কাটতে দেখা যায়। মেয়ে শিউলি বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন–

> 'তোমার মায়ের আদর করে লাগানো গাছ, ওরই যত্নে বড় হয়ে উঠেছে, ফুলও ফোটায়। এই গাছ অন্য কেউ কেন কাটবে? তাই আমিই কেটে ফেলছি। ওপরে দেখ মাধবীর ঝাড়টাও কেটে ফেলেছি।...স্থায়ী ঠিকানা বলে, নিজের বাড়ি বলে কিছু থাকবে না– তা কী করা যাবে বলো? অস্থায়ী ঠিকানাই কপালে বেঁধে টিকে থাকতে হবে।'-[স্থা.ঠি./পৃ-৯৬]

মুহিব হাসানের এ বৃক্ষ-হন্তারকে রূপান্তরের পেছনে তার জমাটবাঁধা বেদনার যে-আভাস ফুটে ওঠে তা আমাদের মানবিক সংবেদনশীলতাকে নাড়া দেয়। পুঁজিশাসিত ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমসম্প্রসারণ এবং নির্মায়িক নাগরিকতার দাপটে অসহায় এক স্কুল শিক্ষকের মানবীয় অনুভবের পরাভব-যন্ত্রণা সমস্ত উপন্যাসে নিয়ে এসেছে এক অমোচনীয় বিষাদ ও কারুণ্য।[৩৫] ভাগ্য ও ভবিতব্যকে অনিবার্য মেনে নিয়ে মুহিব হাসানের অন্যত্র চলে যাওয়াটা তার উন্মুলিত হবার ও শেকড়হীনতার বাস্তবতাকে অমোঘ করে তোলে। জীবন সর্বতোভাবেই দ্বন্দ্বময়। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার যেমন বিরোধ বাঁধে, তেমনি সনাতনের বিপ্রতীপে সমকালীনতার দ্বন্দ্বও স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিকতার নামে ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হওয়া কিংবা প্রাচীনতার মধ্যে সবকিছুতেই নেতিবাচকতা খুঁজে পাওয়াটাও একধরনের বিকার। আধুনিক নাগরিক জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে সনাতন অনেক ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্যেও মানবীয় স্মৃতি ও আবেগের একটি নিজস্ব মূল্য রয়েছে। সেই আবেগের কাছে অনেক সময় গৌণ হয়ে যায় আধুনিকতার বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা। *স্থায়ী ঠিকানা* এই চিরায়ত দ্বন্দ্বের অনবদ্যরূপ।[৩৬] মেট্রোপলিটন নগরীর বহুবিচিত্র অভিঘাতে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠে ব্যক্তির মানবিক বিশ্ব, বিপন্ন হয়ে ওঠে তার স্মৃতি ও আবেগের জগৎ। নাড়িমাটির সঙ্গে আবহমানের সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে সেখানে তৈরি হয় কৃত্রিম কংক্রিটের অরণ্য। আর সেই অরণ্যে নীরবে-নিভৃতে অশ্রুপাত করে অনুভূতিকাতর ও সংবেদনশীল ব্যক্তিচৈতন্য। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই অগ্রগতির চাপে হারিয়ে যাওয়া মানুষের অনিবার্য যন্ত্রণা ও পরাভবের রূপ উন্মোচনে এ এক শৈল্পিক সাক্ষ্য।

শওকত আলী এ উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে যতটা মনোযোগ দিয়েছেন, চরিত্রসৃজনে তাঁর পরিচর্যা ততটা চোখে পড়ে না। নির্মোহ ভঙ্গিতে তিনি কাহিনি বর্ণনা করায় এটি অনেকাংশে নীরস ও নিরানন্দময় হয়ে উঠেছে। চরিত্রের দ্বন্দ্ব তেমন দানা বেঁধে উঠেনি। মুহিব হাসানের মতো অপরাপর চরিত্রগুলোও আরো সরব হয়ে উঠতে পারতো। তারপরেও বলা যায়, পুঁজিবাদী নগরসভ্যতার যান্ত্রিক আগ্রাসন, পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হওয়া– এসব প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে বাদ যায়নি রাজনৈতিক হানাহানি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজাত দেশভাগ-দাঙ্গা-মৃত্যু-অশ্রু আর রক্তে রাঙানো উন্মুলিত-উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার। মানবসৃষ্ট ইতিহাসের এ অমোঘ-নিয়তি ও বাস্তবতাকেও লেখক প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ষাট ও সত্তরের দশকে শহরের আবাসিক এলাকায় বসতি করে যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল; তারাই পরবর্তীকালে কর্পোরেট পুঁজির অভিঘাতে শেকড়ছিন্ন ও বেসামাল হয়ে পড়ে। নগরায়ণের দাবির মুখে মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং ও ফ্ল্যাটবাড়ি সংস্কৃতির জাঁতাকলে পড়ে একক মালিকানার ঠিকানা বর্তমানে শতজনের ঠিকানায় পরিণত হয়ে পড়ছে। এর ফলে স্থায়ী ঠিকানা বদলে যাচ্ছে। আর মানুষও হয়ে পড়ছে আবেগহীন, যান্ত্রিক ও ঐতিহ্যবিমুখ। পুঁজির পাপ ও প্রযুক্তির নখরাঘাতে কেবল বৃক্ষই উজাড়-উন্মুলিত হচ্ছে না বরং মানুষও হয়ে পড়ছে ঠিকানাহীন, শেকড়হীন,পরিচয়হীন ও ভাসমান। প্রাণহীন ও প্রকৃতিশূন্য প্রযুক্তিগত উন্নতি ও নামসর্বস্ব আধুনিক জীবনের পরিণতি যে-কত ভয়ংকর আর বিনাশী হতে পারে– শওকত আলীর *স্থায়ী ঠিকানা* তারই এক অশনিসংকেত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসটি শওকত ১৯৫৮ সনের দিকে লিখেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ-বাইশ বছর। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি ১৯৬১ সনে মাসিক *পূবালী* পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে *মুক্তধারা* প্রকাশনী ১৯৬৩ সনে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এর দুই বছর পর কলকাতার *হরফ* প্রকাশনী থেকেও এ উপন্যাসের একটি সংস্করণ বের হয়।-[উৎস-ড. মোহাম্মদ হাননান সম্পা. শওকত আলী রচনাসমগ্র; প্রথম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৫৮৭]

২. রুকসানা বেগম : *পিঙ্গল আকাশ: নারীর দহন কথা* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*; শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ- ৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী, ২০১৬, পৃ. ১১০
৩. সৈয়দ আজিজুল হক : *এক মানবীমনের পিঙ্গল আকাশ* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা)*;পূর্বোক্ত, পৃ.১০৮-১০৯
৪. সৈয়দ আজিজুল হক : *পূর্বোক্ত*; পৃ. ১০৯
৫. জোহা আজাদ : *উত্তরাধিকারের অসতর্ক সংকেত* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া);* সংখ্যা- ১৬, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ১৫২-১৫৩
৬. বজলুল করিম বাহার : *মাটি-মানুষের তন্নিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক লেখক শওকত আলী* (সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ);* শওকত আলী সংখ্যা, বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, ১৯৯২, পৃ. ১১৮
৭. চঞ্চল কুমার বোস : *শওকত আলীর কথাসাহিত্য: জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬*
৮. রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৬১-১৬৩
৯. মোস্তফা আলী : *যন্ত্রণা-শুদ্ধ উপলব্ধিতে শওকত আলী* (সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ*); পূর্বোক্ত; পৃ. ৩২
১০. Karl Marx : Op. cit. Note. No-11, P. 66-80, দ্বৈতীয়িক উৎস– বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়াণ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৩
১১. তাশরিক-ই-হাবিব : *গন্তব্যে অতঃপর :* মনোবিকলনের প্রতিবেদন (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০-২৩৫
১২. মোস্তফা আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪
১৩. মোস্তফা আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪১-৪২
১৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ২১
১৫. রবিউল হোসেন : *সমাজসত্যের উপন্যাস: শওকত আলীর ভালোবাসা কারে কয়* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪৪-২৪৫
১৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০-২৪
১৭. মামুন মুস্তাফা : *যেতে চাই: পুঁজিবাদী সমাজে নাগরিক মধ্যবিত্তের যন্ত্রণা* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪৭
১৮. মামুন মুস্তাফা : পূর্বোক্ত; পৃ.২৪৭
১৯. আল মাকসুদ : *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা: নাগরিক উচ্চমধ্যবিত্তের খেয়ালি* অনুভাষ্য (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
২০. আল মাকসুদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
২১. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
২২. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৭
২৩. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬
২৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
২৫. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩০
২৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৮-২৯
২৭. সৈয়দ তৌফিক জুহরী : *জননী ও জাতিকা: মধ্যবিত্ত-নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমীকরণ* (চন্দ আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯৮
২৮. সৈয়দ তৌফিক জুহরী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯৮-২৯৯
২৯. বিদ্যুৎ সরকার : *নারী, প্রেম এবং শওকত আলীর উপন্যাস* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া*); পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮
৩০. শোয়ায়েব মুহামদ : *জোড়বিজোড়: থিতু না হওয়া মানুষের আখ্যান* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০
৩১. বিদ্যুৎ সরকার : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৬৯
৩২. *পাকা দেখা* উপন্যাসটি প্রথমে ২০০৩ সনে *সাপ্তাহিক ২০০০* পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এরপর ২০১৯ সনে *প্রথমা প্রকাশন* এটি গ্রন্থাকারে প্রথম বারের মতো প্রকাশ করে।-[উৎস-হাসান অরিন্দম : *শওকত আলীর পাকা দেখা* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫]
৩৩. হাসান অরিন্দম : *শওকত আলীর পাকা দেখা* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪৫
৩৪. আহমেদ মাওলা : *স্থায়ী ঠিকানা: উন্মূলিত মানুষের আত্মযন্ত্রণা* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*); পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৬৫
৩৫. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭-৩৮

৩৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪ ও ৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রামীণ চেতনার উপন্যাস

আবহমান গ্রামবাংলার জীবনপ্রবাহের গভীরে প্রোথিত থাকা বিচিত্র সংকট, ভাঙচুর আর রূপান্তরের অনুষঙ্গ উপস্থাপনায় শওকত আলী সর্বদাই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রামীণ জীবনে যুগ যুগ ধরে ঘাপটি মেরে জেঁকে বসা শাস্ত্রাচার, লোকাচার, সমাজশাসন, পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষু, জোতদার-মহাজনদের দৌরাত্ম্যের সমান্তরালে দুর্বল-দেহাতী মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধা-কাম, অভাব-আকাল, মারী-মঙ্গার দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার প্রান্তসমূহকে লেখক বাস্তবমণ্ডিতভাবে রূপায়ণ করেছেন। খরা-অনাবৃষ্টি আর বৈরী ধূলি-ধূসর প্রকৃতির সঙ্গে একাট্টা হয়ে জোতদার- মহাজনেরা নিরন্ন-নিঃসম্বল শ্রেণিকে সর্বস্বান্ত করে। কিন্তু শওকত আপাত দৃষ্টিতে সরল, সমর্পিত, নতজানু, অসহায় ও দুর্বল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে লুকিয়ে থাকা সজ্ঞচেতনা, প্রতিবাদের বারুদ ও প্রতিশোধের স্পৃহাকেই আবিষ্কার করেছেন। ধনী-মহাজন শ্রেণির শোষণ-পীড়নের বিপরীতে এসব কৃষক-শ্রমজীবীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারায় ঐতিহাসিক ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহ, সিপাহিবিদ্রোহ ও তেভাগা বিদ্রোহের মতো জনবিস্ফোরক অনুষঙ্গকে তিনি প্রযুক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে গ্রামীণ জীবনপ্রেক্ষাপটে নারীর সহজাত দ্রোহচেতনা ও সংগ্রামী ভূমিকার কথাও বাদ পড়েনি। এমন গ্রামজীবন ও জনপদের প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস হচ্ছে– *সম্বল*, *নাঢ়াই* আর

মাদারডাঙার কথা। সামন্তসমাজ কাঠামোয় বন্দি গ্রামের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ক্ষুধা, ক্ষয়, অবদমন, লোভ, লালসা, স্বার্থপরতার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ অধ্যায়ে *সম্বল*, *নাঢ়াই* আর *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসগুলো আলোচিত হয়েছে।

তৃণমূলের তৃষ্ণায় শক্তি ও সম্ভাবনার অন্বেষা

সম্বল

সম্বল (১৯৮৬খ্রি.) শওকত আলীর গ্রাম-বাংলার আকাঁড়া জীবনবাস্তবতার এক অনবদ্য উপন্যাস। *গীতারাণীর গল্প* ও *ফুলবানুর গল্প* নামক দুটি অংশের সমন্বয়ে এ উপন্যাস গড়ে উঠেছে। এখানে যথাক্রমে মানিকগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের গ্রামীণজীবন, সাধারণ মানুষের প্রতিকারহীন অসহায়ত্ব, পুরুষতন্ত্রের সর্বগ্রাসী প্রবণতা এবং আদিম জঠরজ্বালার নিকট নিঃসম্বল মানুষের অনিবার্য আত্মসমর্পণের রূপায়ণ ঘটেছে। একদিকে গ্রামের অভিভাবকহীন নারীর অসহায়ত্বে সুযোগসন্ধানী পুরুষের লোভীদৃষ্টি ও ষড়যন্ত্র; অন্যদিকে ক্ষুধার কামড়ে দিশেহারা মানুষকে কৃতদাসে পরিণত করে কূটকৌশলী শোষক শ্রেণির স্বরূপ উপস্থাপন– এ দুটি অংশে পল্লবিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে পরিণতি পেয়েছে। গ্রামজীবন ভাবনায় শওকত আলী পল্লিপ্রকৃতির রূপ-রঙ-রেখায় মোহবিষ্ট ও ভাবাবেগ তাড়িত নন বরং শ্রেণিচেতনা দ্বারা ঋদ্ধ। তিনি সেই গ্রাম ও জনজীবনের কথা বলতে চান– যার মূল প্রতিনিধিত্বকারী ধনী জোতদার-মহাজন আর গরিব কৃষক-শ্রমিক। শোষক আর শোষিত– এ দুই শ্রেণিচরিত্রের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে গ্রামজীবন আবর্তিত হয়। যার একদিকে রয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর অসহায়ত্ব; অন্যদিকে রয়েছে বিত্ত-বিলাস, ক্ষমতার দাপট, লোভ-লালসা আর কপট মনোভঙ্গি। তবে শওকত গ্রামের সরল, সমর্পিত, নতজানু, অসহায় ও হতবল মানুষকে নয়; বরং অধিকার আদায়ে সঙ্ঘবদ্ধ, শ্রেণিসচেতন ও বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত জনগোষ্ঠীকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যারা কংস ও কলিরূপী মহাজন-জোতদারদের দুঃশাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে লোকশ্রুতির মজনু শাহ, মুসা শাহ, দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, হাজি শরিয়তউল্লাহ, তিতুমীর কিংবা বিপ্লবী জীবন থেকে প্রতিবাদের দীক্ষা নেয়। ইতিহাসের মানবমুক্তির ফেরিওয়ালা এসব অগ্নিপুরুষদের জীবনসংগ্রাম, আপসহীন মনোভঙ্গি ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বা বিস্ফোরক ঘটনাতরঙ্গ অসহায় মানুষদের প্রণোদনা যোগায়। যা তাদেরকে ক্ষমতাধর শাসক-জমিদার-জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই-প্রতিবাদ করতে বিপ্লবী কানু-সিধু ও নূরলদীনের মতো সংগ্রামে উজ্জীবিত করে। উত্তরবঙ্গের প্রতীকে তিনি মূলত ষাট থেকে আশির দশকে বিদ্যমান গোটা বাংলাদেশের সামন্ত-সমাজকাঠামোর দুঃশাসন, দুর্বিপাক, নেতি-নাস্তির পাশাপাশি সঙ্ঘচেতনা ও প্রতিবাদমুখর জীবনজঙ্গমতার চিত্রই উন্মোচিত করেছেন।

এ উপন্যাসে বাংলার চিরায়ত দুটি অভিশাপের চিত্র– ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কথাই প্রবল হয়ে উঠেছে। বাঙালি জীবনে এমন দারিদ্র্য ও ভাতের অভাবের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম বহু কাল থেকে চলে এসেছে। *চর্যাপদ*-এর 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী'– এবং *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের– 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এসব চিত্র ও প্রত্যাশা মূলত গ্রাম-বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যুগ যুগ ধরে চলে আসা জঠরজ্বালার তীব্রতা এবং দারিদ্র্যের কশাঘাতের ব্যাপকতাকেই উন্মোচিত করে। কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামোয় বিদ্যমান এমন দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জন্য কেবল সম্পদের বৈষম্যই দায়ী নয়, বরং এর সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপ, ভোগবাদ, স্বেচ্ছাচার এবং শোষণও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার ফলে এ–'পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈরী বৃত্তটি প্রায় সর্বগ্রাসী এবং বৃত্তের অভ্যন্তরে নিঃশেষে সমর্পিত হয় দেহাতি নারীর আত্মাহুতির যন্ত্রণা। গ্রাম কিংবা নগর সর্বত্রই খরখরে নখর মেলে উঁচিয়ে আছে পুরুষতান্ত্রিক ছায়া এবং এই ভয়ংকর ছায়ার প্রতিরূপ হিসেবে আবির্ভূত হয় কখনো মহাজন, কখনো ভূস্বামী, কখনো পরিচিত নিকটজন। সম্পর্কের সূত্রটি যেমনই হোক না; মনোভাব-আচরণে এবং অন্তর্গত স্পৃহায় এই কায়াধারী পুরুষের স্বরূপ অভিন্ন। এশিয়াটিক সমাজের কাঠামোটি আচ্ছন্ন করে রয়েছে ক্ষমতাদর্পী পুরুষতন্ত্র। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে পুরুষ নেই, সেখানেও রয়ে গেছে তার নেপথ্য উপস্থিতি। শাকুনিক হিংস্রতা নিয়ে নারীর অস্তিত্বকে এরা গ্রাস করতে চায়; উপভৌগিক প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় নারীর মূল্যমানকে।'[১] আশির দশকে প্রকাশিত *সম্বল* উপন্যাসে সে-সমাজ ও মানুষের যাপিত জীবনপ্রবাহই উন্মোচিত হয়েছে। এমন সমাজ ও মানুষ নারীর প্রতি তেমন উদার ও সহানুভূতিশীল নয়, যেমনটা হলে গীতারাণী ও ফুলবানুর মতো নারীরা নির্ভয়ে-নিঃসঙ্কোচে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। আর নিজস্ব অবস্থান থেকে নিজেদের অধিকার, সম্মান ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। *সম্বল* উপন্যাসের দুটি অংশের পরতে পরতে মিশে আছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও কামনার লকলকে শিখা। সমাজের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ শোষক আর শোষিত শ্রেণিকেও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।

গীতারাণীর গল্প অংশটি গীতারাণী, বিন্দুবাসিনী এবং হারান– এ তিনটি চরিত্রকে নিয়েই মূলত গড়ে উঠেছে। অল্প সময়ের জন্য বিজন চরিত্রটি কাহিনিতে জায়গা করে নিলেও মূল ঘটনায় তার ভূমিকা যৎসামান্যই। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র ও তাদের সম্পৃক্ত ঘটনারাজি বিন্দুবাসিনী ও হারানের স্মৃতিসূত্রেই আবর্তিত হয়েছে। বিন্দুবাসিনীর জীবনসংগ্রাম ও ঘাত-প্রতিঘাতের অনুষঙ্গে সমকালীন গ্রামজীবনের বিচিত্র প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। সে পিতৃ-মাতৃহীন এবং কাকার বাড়িতে আশ্রিতা এক অরক্ষণীয়া। বিয়ের আগে হারান চন্দ্র দে বিন্দুবাসিনীকে পছন্দ করতো, মনে মনে সঙ্গ-সংস্পর্শ কামনা করতো। কিন্তু হারানের বাবা নগদ পাঁচ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে অনড় থাকায় বিন্দুবাসিনীর বিয়েটাও আটকে যায়। ফলে বিন্দু–

> 'কাকার সংসারে দাসীগিরি করে এবং আশেপাশের দুচারখানা গ্রামের অল্পবয়সী ছেলেছোকরাদের আগ্রহের বস্তু হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল।'-[গী.গ.শওকত আলী রচনাসমগ্র; ৫ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৬/ পৃ.২৪]

গ্রামজীবনে প্রচলিত এ যৌতুক বা পণপ্রথাই বিন্দুর সুখ-স্বপ্নে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ সময় পার্শ্ববর্তী দত্তবাড়ির বয়স্ক আশুদত্তের স্ত্রী মারা গেলে বিন্দুর কপাল ফেরে এবং তার অরক্ষণীয়ার বদনাম ঘুচে। স্বামীর ঘরে গিয়ে বিন্দু মৃত সতীনের রাধারাণী ও সুধারাণী নামক দুই মেয়েকে পায়। সৎমেয়ে রাধারাণীর স্বামীই ছিল তার প্রথম জীবনের বাঞ্ছিত পুরুষ হারান। ভাগ্যের ফেরে হারান এখন তার জামাতা। বিন্দুর এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের সুখও বেশিদিন স্থায়ী হয় না। বড় মেয়ে সীতারাণী জন্মের পাঁচ বছরের মাথায় স্বামী আশুদত্তের মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর সময় ছোট মেয়ে গীতারাণী তখনো তার পেটে। ফলে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর কেবল সিঁথির সিঁদুর আর হাতের নোয়া-শাঁখাই ঘুচে না, বরং জীবনের সুখ-স্বপ্নও চিরদিনের মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। অথৈ সাগরে পড়া অসহায় বিন্দুর কাছে তখন তার কাকা নন্দ ঘোষ এসে ওঠায় সে কিছুটা বল-ভরসা পায়। যদিও নন্দবাবু– 'তখন বর্ডারের এপার-ওপার করছে। বউ ছেলেমেয়েদের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছে আর একটু একটু করে মানুষের চোখের আড়ালে তার ছড়ানো মেলানো সয়সম্পত্তি গোটাচ্ছে।' দেশভাগের হুজুগ ও পাক-ভারত যুদ্ধের জেরে এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুজনগোষ্ঠীর মনে শান্তি ও স্বস্তি ছিল না। প্রতিদিন-প্রতিবছর অসংখ্য হিন্দুধর্মাবলম্বী দেশত্যাগ করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে। *Holiday* পত্রিকার *The Missing population (1994)* প্রবন্ধের বরাত দিয়ে বলা হয়, ১৯৪৭ সন থেকে গড়ে প্রতিদিন ৪৭৫ জন হিন্দু বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্বপাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার ২৯.৭ শতাংশ ছিল সংখ্যালঘু। বর্তমানে তা নেমে এসেছে ৯.৬ শতাংশে।[২] একাত্তরের ক্রান্তিকালে নন্দ ঘোষসহ বিন্দু ভারতে যেতে বাধ্য হয় এবং সেখানে নন্দবাবুর মৃত্যু হলে বিন্দু প্রকৃত অর্থেই অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষে বিন্দু বড় মেয়ে সীতাকে জ্যাঠতুতো বোন ইন্দুবালার কাছে রেখে ছোট মেয়ে গীতাকে নিয়ে স্বামীর ভিটায় ফিরে আসে। এসময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও জমিজমার বন্দোবস্ত, দেখাশোনা ও হাটবাজার করার জন্য বিন্দু শ্বশুরের সম্পত্তিলোভী জামাতা হারানকে প্রশ্রয় দেয়। এসব অজুহাতে হারান সপ্তাহে এক-দুই বার শাশুড়ির বাড়ি আসলেও বিন্দুর রহস্যময় ব্যবহারে সে হাঁপিয়ে ওঠে। কারণ–

> 'জামাই-শাশুড়ির সম্পর্ক নয়, আবার শালি-ভগ্নীপতির সম্পর্কও নয়–মাঝামাঝি একটা অবস্থায় বিন্দু সম্পর্কটা ঠেকিয়ে রেখেছিল।'-[গী.গ/পৃ.২৬]

এভাবে সাত-আট বছর চলার পর হারানের দিক থেকে আগ্রহে ভাটা পড়ে। বড় মেয়ে সীতারাণীকে জ্যাঠতুতো বোন ইন্দুবালা কলকাতাতেই বিয়ে দেয়াতে বিন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু দশম শ্রেণিতে পড়া ছোট মেয়ে গীতাকে নিয়ে বিন্দু দুশ্চিন্তায় পড়ে। কারণ একদিকে পছন্দসই পাত্র না পাওয়া এবং পাত্রপক্ষের মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি; আবার অন্যদিকে জামাতা হারানের কূটকৌশলী মতিগতি দেখে বিন্দু গীতাকে নিয়ে ভারত যেতে চায়। ভারতে গিয়ে গীতার বিয়ে দেয়াই বিন্দুর মনোবাঞ্ছা। তাই মা-মেয়ের পাসপোর্ট করতে হারানের সঙ্গে ঢাকা যাবার প্রয়োজন হয়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আর পোড় খেয়ে খেয়ে বিন্দুর অভিজ্ঞতাও কম হয়নি। এ জন্য বিন্দু তার প্রথম বৈধব্যজীবনে খুড়তুতো বোন অনুরাধার সুদর্শন স্বামী সুবিমলের আগ্রহকেও প্রশ্রয় দেয়নি। আবার– 'সীতার মা, দ্যাশ ছাইড়ো না, তোমারে আমি রাণির মতোন মাথায় তুইলা রাখুম'– বলা সুপুরুষ ও প্রতাপশালী স্থানীয় নবী চেয়ারম্যানের আকুলতাকেও গুরুত্ব দেয়নি। শুধু সীতা ও গীতার ভবিষ্যতের কথা ভেবে 'বুকের ভেতরকার চাপা সাধ-আহ্লাদগুলোর পাখা ঝাপটানি'কে দমন করেছে। আবার অচেনা লোককেও বিন্দু বিশ্বাস করে না। কারণ অচেনা ধান্দাবাজদের পাল্লায় পড়ে চোখের সামনেই এলাকার শম্ভু মিস্ত্রি ও ছিপু দাসকে সম্পত্তি-বিনিময় (বীপযধহমব) করতে গিয়ে নিঃস্ব হতে দেখেছে। তাই অপছন্দের-অনিচ্ছার জামাতা হারানকেও শেষপর্যন্ত বিন্দু সফরসঙ্গী হিসেবে নেয়। কারণ–

> 'কাজ গোছাতে হলে অনেক জিনিস হজম করতে হয় এবং সময় সময় কিছুটা আশকারাও দিতে হয় পুরুষ মানুষকে।...অচেনা ফেরেববাজের হাতে পড়ার চেয়ে চেনা বদমাশের হাতে পড়াই ভালো।'-[গী.গ./পৃ.৪৬]

এজন্যই বিন্দু কপটস্বভাবী আর লোভী হারানের সাহায্য নেয়। আর সৎমেয়ে রাধারাণীকে হাতে পায়ে ধরে রাজি করায়। কারণ–

> 'মেয়ে (গীতা) দ্যাখ্ দ্যাখ্ করে কলাগাছের মতো বেড়ে উঠল। মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালে বুকের ভেতর ভয়ে কাঁপে।...আর দিনকালও পড়েছে কেমন দেখো। চুরি-ডাকাতির সময় টাকা-পয়সা মালপত্তরের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মানুষের ইজ্জতটাও খোয়া যায়।'-[গী.গ./পৃ.১৯]

সমকালীন সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে দেশবাসীর নাভিশ্বাস ওঠে। রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক নিরাপত্তার চরম অবক্ষয় ঘটে। নারীরাই এর প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে আক্রমণ-দমন-পীড়নের শিকার হয়। 'কখনো নৌকো গাড়ির ওপর, কখনো গাড়ি নৌকোর ওপর'– সংসারের এমন নিয়ম ও বাস্তবতাকে মেনেই পথের লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করেও বিন্দু হারানকে চটায় না। সদরঘাট পৌঁছানোর পর হারান দালাল শশিমোহনের পরিকল্পনা মাফিক পাসপোর্টের ফরমের সঙ্গে একটি দলিলে বিন্দুর সই করায়। বিন্দু তার অজান্তেই বাড়ি ও জমিজমা মেয়ে রাধারাণীকে লিখে দেয়। পরক্ষণেই হারানের মনোভঙ্গি আমূল পাল্টে যায় এবং দাম্ভিকতার সঙ্গে তা প্রকাশ করায় বিন্দুবাসিনীর–

> 'বুকের ভেতর ধড়াস করে পদ্মার পাড় ভাঙে। বুঝতে পারে কী সর্বনাশটা ঘটিয়েছে সে। তার মুখে কথা সরে না।'-[গী.গ./পৃ.৫৮]

বিন্দুবাসিনী নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ভবিষ্যৎ বিপদ টের পায়। তাই গীতা হাকডাক আর প্রতিবাদ করতে গেলেও বিন্দু তাকে থামায়। কৌশলে হারানকে একদিকে টাকার লোভ দেখায় এবং আরেক দিকে বিচার সালিশি ও মামলার ইঙ্গিত দেয়। এভাবে যেচে গিয়ে হারানকে তুষ্ট করা ছাড়া বিন্দুর কোনো উপায় থাকে না। কারণ গত বছর এলাকার বাসেত মেম্বার এরকম এক দলিল লিখে নগেন দাসকে ভিটেছাড়া করেছে। মেয়ে গীতার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা ও স্বাবলম্বী হবার কথা শুনে বিন্দুও সাহসী হয়ে ওঠে। তাই গ্রামের যে-বাঁশের সাঁকোটি ঢাকা যাবার সময় হারানের হাত ধরে পার হতে হয়েছিল, বাড়ি ফেরার সময় তা মেয়ে গীতার হাত ধরেই সে অবলীলায় পার হয়। তার মনে হয়–'এই রকমই সে সাঁকো পার হয়ে এসেছে সারা জীবন।' মনের এ সাহস সঞ্চয়ের ফলেই গীতার কথাগুলো বিন্দুর মনে ধরে আর সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নেয়–

> 'মামলা-মোকদ্দমা যা করার সবই করতে হবে, সেসব পরের কথা। কিন্তু বাড়ি ঘর ছাড়া চলবে না। লাজ-লজ্জার কথা ভুলে যেতে হবে। বাড়িতে আর হারানকে পা রাখতে দেয়া হবে না।'-[গী.গ./পৃ.৭৫]

শেষপর্যন্ত হারানের দুরভিসন্ধি, প্রতারণা ও শোষণের বিরুদ্ধে সঞ্চিত এ সাহসই বিন্দুবাসিনীর চলার পথের সম্বল হয়ে ওঠে। এ সম্বলই সহায়-সম্বলহীন বিন্দুর বেঁচে থাকার আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

গ্রামীণ সমাজকাঠামোতে দুর্বল দেহাতী নারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা দেয় কখনো সমাজপতি, কখনো নিকট-আত্মীয় আবার কখনো নিজের রূপযৌবন। বিন্দুকেও তার জীবনসংগ্রামে একে একে মোকাবিলা করতে হয় জামাতা হারান, ভগ্নিপতি সুবিমল ও স্থানীয় নবী চেয়ারম্যানের মতো পুরুষ কিংবা পুরুষের প্রতিনিধি সমাজপতিদের। হারান চন্দ্র দে এমনি এক লোভী ও লম্পট প্রকৃতির মানুষ। এক সময় সে বিন্দুবাসিনীকে পছন্দ করতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই বিন্দু হয়ে যায় তার সৎশাশুড়ি। ফলে তাদের সম্পর্কটা মাঝামাঝিতে ঝুলে থাকে। এসবই হারানের মর্মজ্বালার বড় কারণ। সৎশাশুড়ি বিন্দু

ও শালি গীতা উভয়ে তার বশবর্তী হোক, তাদের বসতভিটা, আবাদি জমি ও দেহজমি সবই তার পুরোপুরি দখলে থাক–এটাই হারানের একমাত্র প্রত্যাশা। তবে মা আর মেয়ে হারানের চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে সতর্ক থাকায় তার বহু দিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বিন্দু গীতার বিয়ের ব্যবস্থা করতে শাশুড়ি ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে পাসপোর্ট করার প্রয়োজন হয়। কপটস্বভাবী হারান শাশুড়ির এ অসহায়ত্বের সুযোগকেই কাজে লাগাতে চায়। কারণ–

> ‘তার নিজের একখান হিসেব আছে।...অনেক দিনের হিসেব তার।...এই একটা সুযোগ এসেছে এতদিনে। এ সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করতে চায়।’-[গী.গ./পৃ.১৭]

এ কারণেই ঢাকা যাবার পথে শাশুড়ি ও শালিকে সে চটাতে চায় না। হারান মাঝে মধ্যে আবার দ্বিধা-দ্বন্দ্বেও পড়ে। কারণ গীতাকেই শুধু তার দরকার নয় বরং শাশুড়ি বিন্দুকেও তার প্রয়োজন। দুজনের দুরকম আকর্ষণ তাকে অনবরত টানে। তাই তার–

> ‘গীতারাণীকে যেমন দরকার, তেমনি দরকার বিন্দুবাসিনীকেও। একজন যদি কামিনী তো অন্যজন কাঞ্চনের খনি।’-[গী.গ./পৃ.৩১]

হারানের এ বদস্বভাব, কুদৃষ্টি আর রিরংসা-লালসার জন্য কেবল শালি-শাশুড়িই উদ্বিগ্ন নয় বরং স্ত্রী রাধারাণীও রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বদস্বভাবের কারণেই স্বামী হারানকে রাধারাণী মুখের ওপর বলে–‘তুমি কি ময়-মুরুব্বিও মানবার চাও না? ছি ছি ছি–শাশুড়ি না মায়ের সমান।’ বউয়ের মুখে এমন অপবাদ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনেও হারান তা গায়ে মাখে না। বরং কটাক্ষের সুরে স্ত্রীকে বলে–

> ‘তর বইনের দেহি গতরখান দম্ দম্ হইয়া রইছে–তর হইলোটা কী, তর মায়েরও তো দেহি ঢলঢল করতাছে দেহখান–তুই হুটকি মাছের লাহান হইতাছস ক্যান?’-[গী.গ./পৃ.২৯]

এসব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহ-কোন্দল প্রায়ই কদর্য রূপ নেয়। আর রাধারাণীর চিৎকারে গোটা পাড়া মাত হবার উপক্রম হয়। ফলে যৌবনের রসসন্ধানী হারান ‘শুকনা কাঠের মতোন’ স্ত্রী রাধারাণীকে এড়িয়ে শালি ও শাশুড়ির মন পেতে উদগ্র হয়ে ওঠে। অথচ ‘সোয়াগণ্ডা (পাঁচ) মেয়ের পিতা’ হয়েও হারানের সংসারে মতি ফেরে না। উপরন্তু বাবার চেয়ারম্যান হবার শখ ও ভারতে যাবার পাগলামিতে হারানের জমি-জমাও শেষ হয়ে যায়। মাত্র দুই একর নিষ্ফলা জমি, পাঁচ মেয়ের দাবি-দাওয়া, স্থায়ী অসুস্থ স্ত্রীর– ‘কুইড়া’ ও ‘ঘাটের মরা’ বলা বিদ্রূপ এবং নিত্যসহচর অভাব-দারিদ্র্য মিলিয়ে হারান সংসার-উদাসী ও নিষ্কর্মা হয়ে ওঠে। তাই সে দোলগোবিন্দের স্ত্রী হরিদাসী বোষ্টমী, গোপাল জেলের বউ ও নগেন দাসের বিধবা মেয়ের যৌবনের রসে ডুব দেয়। গ্রামের ঠাকুরমশায়ের উপদেশ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পরামর্শও তাকে এ বদ নেশার পথ থেকে সরাতে পারে না। এসব বদস্বভাব ও লাম্পট্য থাকার পরেও হারানকে মাঝে মধ্যে দায়িত্বশীল হতে দেখা যায়। নিজের জমিতে তার ছয় মাসের খোরাকি হয় না। তাই মেয়ে ও বউয়ের মুখে খাবার তুলে দিতেই আইদর আলী মেম্বারের সঙ্গে খাতির দিয়ে সে আকালের বছর পাড়ি দেয়। মানবসৃষ্ট দুর্যোগের (রাজনৈতিক অরাজকতা, শোষণ, যুদ্ধ প্রভৃতি) মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও (দুর্ভিক্ষ, মঙ্গা-মহামারি, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা প্রভৃতি) গ্রামজীবনে বিপ্রতীপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বয়ে আনে। অসহায় দরিদ্র মানুষের কাছে এসব অভিশাপ হয়ে দেখা দিলেও সমাজপতি, ব্যবসায়ী, দালাল ও সুবিধাবাদীদের কাছে তা রীতিমতো আশীর্বাদ বয়ে আনে। এমন এক আকালের সময় হারান বৃন্দাবন দাসের বসতভিটা এবং কেষ্টমোহনের দুই বিঘা জমি আইদর মেম্বারকে পাইয়ে দিয়ে বেশ লাভবান হয়। আকালের সময় ঠাণ্ডা মাথায় এমন অন্যায়-অপকর্ম করেও সে নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দেয়–

> ‘ক্ষতি হয়েছে মানুষের–সে জানে। কিন্তু ওটুকু না করলে তার নিজের অবস্থাটা কী হত?’-[গী.গ./পৃ.৩১]

নিজের পরিবার ও স্বজনদের বাঁচাতে হারান এ অন্যায়কে জেনেশুনেও প্রশ্রয় দেয়। আবার ঘরবাড়ি, জমিজমা সব বিক্রি করে শাশুড়ি ভারত যেতে চাইলে হারান নিজের স্বার্থে ছাই পড়বে জেনেও দেশত্যাগ করে ভারতে গিয়ে যে-দুরবস্থার সৃষ্টি হয়; সে-অভিজ্ঞতার কথা জানাতেও সংকোচ করে না। তাই স্ত্রীকে বলে-

> ‘কই যাইব দেশ ছাইড়া? আমরা আছি না? দেখছি তো ইন্ডিয়া গেলে কী হয়! যার কাছে গেছি সেই তো দূর দূর কইরা কুকুর খেদান খেদাইছে, কইয়া দ্যাও তোমার মায়েরে, দেশ ছাইড়া গেলে মারা পড়বো।’-[গী.গী/পৃ.২২]

তাই দেখা যায়, হারান একেবারে মানবিক অনুভূতিশূন্য নয়। তারপরেও হারান মনে মনে গীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার এবং এর পরিণতির কথা ভাবে। কারণ এলাকার ললিত দাস তার শালিকে নিয়ে এবং কুতুব মেম্বারের ছেলে আইউব আলী শম্ভুনাথের মেয়ে ছবিরাণীকে নিয়ে পালিয়ে গেলেও তেমন কিছুই হয়নি। তার–‘সাধ ছিল সে বড় ব্যবসায়ী হবে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে, আমোদ-ফুর্তিতে জীবন কাটাবে’। কিন্তু সেই সাধ ও স্বপ্ন হারানের অধরাই থেকে যায়। তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো যুবতী শালি গীতা ও শাশুড়ির সম্পত্তি কব্জায় এনে হারান সেই স্বপ্ন-সাধ চরিতার্থ করতে চায়।

এ পরিকল্পনা মোতাবেক সদরঘাট গিয়ে কৌশলে জমির দলিলে শাশুড়ি ও শালির সই করায়। বিন্দু ও গীতাকে দলিলে সই করতে দেখে হারান মনে মনে বলে–

> ‘পাসপোর্টের দলিলে সই করছ না মেয়েকে জমিদান করার দলিলে সই করছ, তার কী বুঝবে তুমি? সে বিদ্যে তো তোমার পেটে নেই। দলিলে সই হয়ে যাবার পর হারানচন্দ্রের আসল চেহারা খানা দেখতে পাবে। তখন মা মেয়ে যাকেই বলবে; শোও তো শোবে। বলবে, বসো তো বসবে। বলবে, ন্যাংটা হয়ে নাচো তো নাচবে।’-[গী.গ./পৃ.৫৩]

হারান সজ্ঞানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে আধিপত্যকামী এক পুরুষে। সে আত্মীয়তার আবরণে হরণ করতে চায় অসহায় স্বজনের সম্পদ, সম্মান ও নারীত্ব। এভাবে হারান বিন্দুবাসিনীর অজান্তে তার সর্বস্ব লিখে নেয় এবং একপর্যায়ে বলে–‘তুমি যে আমারে তোমার সব কিছু লেইখা দিলা এখন আর তোমার হুকুম ক্যান্নে চলে কও?’ এতদিন যে হারান শাশুড়িকে কোনোকিছু বলে সম্বোধন করতো না, আজ দলিল সইয়ের মধ্য দিয়ে সে যেন তাকে নাম ধরে ডাকার অধিকারও পেয়ে যায়। এভাবে হারান শাশুড়ির দেমাগ এবং শালি গীতার ‘হারান্দেরে ছাড়ানদ্যাও’ কথার ওপর প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু ফেরার পথে গীতা ও বিন্দুবাসিনীর মধ্যে তেমন আনুগত্য, অসহায়ত্ব, সমর্পিত ও মরিয়া ভাব না দেখে বরং আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক মানসিক অবস্থা দেখে হারানের মনে খটকা লাগে। আবার ঢাকা গমনের নির্ভরশীল খালের সাঁকোটি প্রত্যাবর্তনের সময় বিন্দুবাসিনীকে নির্বিবাদে পার হতে দেখেও হারান অবাক হয়। হারানের– ‘মনে হচ্ছে হাওয়া কেমন যেন ঘুরে গেছে। গীতা ক্রমেই আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ক্রমেই স্বচ্ছন্দে কথা বলে চলছে এবং জিভও হয়ে উঠছে আরো ধারালো। সে ভেবে পায় না, কোন কথা ভেবে মা-মেয়ের এই স্বচ্ছন্দ ভাব।’ উপরন্তু শালি গীতার ঘরে রক্ষিত খাড়াখান বের করে শান দিয়ে রাখার পরিকল্পনা শুনেও হারানের মনের জোর কমে আসে। মনের ভেতরে একেকবার লোভ ও ভয় আসা-যাওয়া করে। শাশুড়ি ও শালির মানসিক দৃঢ়তা ও সম্ভাব্য প্রতিবাদের আকার-ইঙ্গিত পেয়ে হারান সাঁকোর দিকে পা বাড়াতে পারে না। এমনকি তার মুখ দিয়েও কোনো কথা বের হয় না। ফলে– ‘রৌদ্রময় শ্যামল হাস্যমুখর একটা জগৎ তার নাগালের বাইরেই থেকে যায়।’

সার্বিক বিবেচনায় হারানের এ কূটকৌশল, চাতুর্য, প্রতারণা, ভণ্ডামি, লাম্পট্য, উদগ্র লিবিডোতাড়নার সঙ্গে দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত– যা পাঠককে সমানভাবে আকর্ষণ করে। হারান চরিত্রের সকল বদস্বভাব থাকা সত্ত্বেও জঠরজ্বালা আর যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে তার যে-উদ্যম ও জীবনবেগের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো। তার এ স্বভাবের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প *প্রাগৈতিহাসিক*-এর ভিখু, *সরীসৃপ*-এর বনমালী চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। এ সংসক্তি (fixation) ও শোষণপ্রবৃত্তির কারণে যেভাবে ভিখু প্রতিদ্বন্দ্বী বসিরকে হত্যার মাধ্যমে টাকা পয়সাসহ তার সঙ্গী পাঁচিকে দখল করে, তেমনি বনমালীও তার পিতৃবন্ধুর দুই বিধবা মেয়ে চারু ও পরীকে কৌশলে প্রতারিত করে তাদের পৈতৃক বাড়ি নিজের নামে লিখে নেয়। আর প্রথম যৌবনের পছন্দের চারুকে আয়ত্তে না পেয়ে তারই ছোটবোন পরীকে ভোগ করে। অর্থ-সম্পদের লোভ এবং মনোবিকার হারান, ভিখু ও বনমালীকে একই কাতারে দাঁড় করায়। হারানের আত্মকথন ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এ পুরুষতন্ত্রের নির্মম স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে। যেমন–

ক. ‘পুরুষ মানুষের শখ-আহ্লাদ থাকবে না, আমোদ ফুর্তি করতে চাইবে না সে? তোর বাবা কি করেছিল সেটা চিন্তা কর। এ বুড়ো হাবড়া যদি যুবতী বউয়ের জন্য হেদিয়ে মরতে পারে, তো হারান কি দোষ করল?’-[গী.গ./পৃ-৩০]

খ. ‘ছেলে তো হলোই না, সোয়াগণ্ডা মেয়ের দিকে সে কেমন করে খেয়াল রাখে? যদি মরে যায়, জামাইরা তো চিতার উপর মুততেও আসবে না।’-[গী.গ./পৃ-৪২]

শওকত আলী দেখাতে চেয়েছেন, সমাজের পুরুষেরা আসলে নারীকে জমির মতো ভোগের সামগ্রী বিবেচনা করে এবং বিচিত্র উপায়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মতো ভোগ-দখলে নিতে নির্মমতায়-পাশবিকতায় একাট্টা হতে পিছ পায় হয় না। বরং নারী পীড়নে, নারীর সর্বস্বহরণে, লালসাপূরণে শাস্ত্রাচার ও সামাজিক বিধি-বিধানকে নিজ স্বার্থে আরোপ করতেও সংকোচ করে না।

আশির দশকে গ্রামের সমাজকাঠামো সামন্তবাদী শাসন-শোষণে বন্দি, স্থবির ও স্থানু হলেও নারীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং প্রত্যাশিত চাকরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার ঘটনাও দুর্লক্ষ্য ছিল না। নারীর এ জাগরণের চিত্র গীতারাণীর জীবনপ্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়েছে। গীতা–‘মেয়েটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং নবগ্রাম হাইস্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। আর মুখও চলে দারুণ।’ অভিভাবকহীন সংসারে মা বিন্দুবাসিনী তার বিয়ে নিয়ে নানা দুশ্চিন্তা করায় গীতা তার মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়–

> ‘তোমারে সিধা কথা কইয়া রাখলাম; আমার ভবিষ্যতের চিন্তা আমি করুম, তোমাগো করা লাগবো না–আমি কলেজে পড়ুম, তারপরে চাকরি করুম।’-[গী.গ./পৃ.২২-২৩]

তাই সে স্থানীয় মানিকগঞ্জ কলেজে মেয়েদের হোস্টেল না থাকায় ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ে স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন দেখে। আবার ব্যাংকের কেরানি-পাত্র সুধীর দাসের যৌতুক হিসেবে রেডিও, টেলিভিশন, মোটরসাইকেল ও নগদ টাকার দাবিতে গীতা যেমন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, তেমনি বুদ্ধির জোরেই সে নিম্নবর্ণের জাতে 'তিলি' নিজ শিক্ষক বিজন কুণ্ডুর সঙ্গে গড়ে ওঠা তিন বছরের প্রেমের বিষয় কাউকে বুঝতে দেয় না। 'কুসাইত বাপের ছেলে'– তিলি বংশীয় বিজনের সামাজিক পরিচয় ও অবস্থানজনিত সংকটকেও সে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই ক্লাস টেনে ওঠার পর কয়েকটি বিয়ের প্রস্তাব আসলেও তার বুদ্ধিতে বিজন তা ভেঙে দেয়। একারণেই সে বিজনকে তাদের সঙ্গে ঢাকা যেতে রাজি করায়, গোপনে বিয়ের পরামর্শ দেয় আর চাকরি ধরে ঢাকায় থিতু হতে বলে। এ জন্যই গীতা মায়ের কথায় ঢাকা যেতে এবং পাসপোর্ট করতে সম্মত হয়। গীতা সতর্ক থাকার পরও হারান কূটকৌশলে তাদের সকল সম্পত্তি লিখে নেয়। পরে এসব প্রকাশ পেলে গীতা–

> 'স্যান্ডেল তোলে। রাগে তার সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে জ্বলে। আর বলে, ভালোয় ভালোয় বাইরান কইতাছি, আপনের মতন মাইনষেরে ক্যামনে শিক্ষা দিতে হয় সেটা আমার জানা আছে।'-[গী.গ./পৃ.৫৮]

ভগ্নীপতির প্রতারণায় বাড়িঘর ও সম্পত্তি হারিয়ে কিছুটা হতাশ হলেও গীতা প্রেমিক বিজনের বিয়ের আয়োজনের ব্যাপারে পুরোমাত্রায় ছিল আশাবাদী। কিন্তু বিজনও সাহায্যকারী বন্ধু মনোরম ও অবিনাশের অজুহাতে এবং স্কুল ইন্সপেকশনের দোহাই দিয়ে তা এড়িয়ে যায়। ফলে ঢাকায় বাসা নিয়ে থাকার স্বপ্নও গীতার পূরণ হয় না। প্রেমিকের এ ব্যবহার ও অবিবেচনা দেখে গীতাও পুরোপুরি বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। তাই বিজনের আহ্বানে তার কক্ষে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষাকে গীতা প্রশ্রয় দেয় না। কারণ শরীরী সংস্পর্শের স্পৃহা বিজনের মধ্যে যতটা প্রবল, আসন্ন দুর্যোগ-প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাকে ঘরে তুলবার সাহস-আগ্রহ সে-তুলনায় দুর্বল। নিজের অজ্ঞাতে হারানের মতো বিজনও তার কাছে পরিণত হয় প্রতারক এক পুরুষে। সে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে আর–

> 'হঠাৎ তার (গীতার) মনে কৌতূহল জাগে, বিজনও কি হারানের মতো দেখতে? একবার মনে হল, কোথায় যেন মিল আছে দুজনের তাকানোর ভঙ্গিতে।'-[গী.গ./পৃ.৬৩]

প্রিয়জনের বিপদে প্রেমিক বিজনের এভাবে দায়িত্ব এড়ানোকে গীতা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাই বিজনের কোনো কথাতেই সে আশ্বস্ত হয় না। বিজন চলে যাবার পর দিনই গীতা তার মাকে নিয়ে হারানকে ছাড়াই ভাবলেশহীনভাবে বাসে ওঠে। সর্বস্ব হারিয়ে বিন্দুবাসিনী কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করলে গীতাই তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দেয়। আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে বলে–

> 'আমি এখন কী ভাবতাছি জানো? ভাবতাছি আর পরের ভরসা না– যা করার নিজেই করমু।...মাইনষে ধান ভাইনা খায় না, মুড়ি ভাইজা সংসার চালায় না?...অপরের উপর ভরসা কইরো না,নিজের পায়ে খাড়াও।'-[গী.গ./পৃ.৭২-৭৩]

গীতা তার মাকে সকল সংকোচ-লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে আত্মনির্ভরশীল হবার জোর তাগিদ দেয়। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল ভণ্ডামি, প্রতারণা, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ দেখায়। কিন্তু হারানের এমন দম্ভোক্তিতেও গীতা ভয় পায় না বরং প্রতিবাদ করে বলে–

> 'তো চলেন, দখল লইবেন।...মা খাঁড়া খান বাইর কইরা দিবা আইজই, শান দিয়া রাখতে হইবো।...এখন তো আমাগে ঐখানই সম্বল–আর তো কিছু নাই।'-[গী.গ./পৃ.৭৫]

গীতার এমন সাহসী উদ্যোগ ও প্রস্তুতির কথা শুনে হারান বিস্মিত হয় এবং পুলিশের ভয় দেখায়। কিন্তু তার কোনো হুমকি, হুঁশিয়ারি এবং ধমকেও মা ও মেয়ের বাড়িগমনের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করতে পারে না। দুই ক্ষিপ্তা নারীর এমন ভাবভঙ্গি দেখে হারান আর সামনে পা ফেলতে সাহস পায় না। হারানের এ অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গীতা– 'কই আইবেন না? বাড়ির দখল লইবেন না? আহা, হারান্দেরে ছাড়ান্দে!' বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপবাণ ছুঁড়ে দিলেও এর কোনো জবাব হারান দিতে পারে না। গীতার এ সাহসই তার পথ চলার সম্বল হয়ে ওঠে।

আত্মীয়তার পরিচয়ে সুযোগসন্ধানী হারান বিন্দুবাসিনী ও গীতার প্রভুর জায়গা দখল করে তাদেরকে শোষণ করতে চায়। এ শোষণ করার ক্ষেত্রে সে এক ধাপ সফল হলেও শেষপর্যন্ত মা-মেয়ের সাহস ও প্রতিরোধের উদ্যোগ দেখে ভেঙে পড়ে। কারণ কোনোভাবেই হারানের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা না পেয়ে অবশেষে প্রতিরোধকেই তারা টিকে থাকার শেষ উপায় হিসেবে বেছে নেয়। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বাড়িতে রাখা খাঁড়াটি শান দেবার। কালিকা দেবীর হাতে উদ্যত খাঁড়ার ভয়ে ভূ-ভারতের অত্যাচারী পুরুষেরা যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, গীতা ও বিন্দুবাসিনীর মধ্যেও ঔপন্যাসিক যেন কল্পনা করেছেন সেই অমিত মাতৃশক্তি। 'ধারালো জিহ্বা' এবং 'শান দেওয়া খাঁড়ার' চিত্রকল্পের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আদি শক্তিধারী দেবী কালিকার প্রতিরূপকেই যেন বিম্বিত করতে চেয়েছেন। যিনি অনায়াশে বিনাশ করেন অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার; যিনি অত্যাচারীকে নির্মূল করে জগতে নিয়ে আসেন স্থিতি ও কল্যাণ। *সম্বল* উপন্যাসের *গীতারাণীর গল্প* অংশে ঐ সাহস, দৃঢ়তা

ও সুতীক্ষ্ণ খাঁড়াটিই হলো গীতা ও বিন্দুবাসিনীর সম্বল।[৩] যা দিয়ে সংকুচিত অস্তিত্বের সব ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে তারা দুজনেই নির্মাণ করে আত্মপরিচয়ের এক নতুন মানদণ্ড।

তাই যতই তারা গ্রামের ভিটেমাটির নিকটবর্তী হয়েছে, ততই নিজেদের মধ্যে পুনরুদ্ধার করেছে হৃতসাহস ও বিশ্বাস। সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-নির্ভর সমাজে অবনত মস্তকে নিয়তিকে মেনে নেবার যে-প্রথা লক্ষ করা যায়, গীতা ও বিন্দুবাসিনী সেই প্রচলিত কাঠামোকে যেন ভেঙে ফেলতে অগ্রসর হয়। যা তাদেরকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মাসি-পিসি* গল্পের আহ্লাদির মাসি-পিসি-র স্তরে উন্নীত করে। গ্রামীণ বাস্তবতার চক্রাবর্তে নিষ্পেষিত হয়ে এবং হারানের ধ্বংসাত্মক অন্তর্ঘাতে জর্জড়িত হয়ে অবশেষে তারা বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নেয়। জীবনের ধর্মই হল অস্তিত্বের নিগূঢ় প্রেরণা সূর্যমুখী শক্তিতে উজ্জীবিত করে নিপীড়িতকে। ফলে কন্টকাকীর্ণ দুর্জ্ঞেয় মেঘের আড়ালেও দেখা দেয় আলোর ইশারা।[৪] এ তিনটি চরিত্রের মধ্যে মূলত গীতারাণীর মাধ্যমেই লেখক তাঁর নিজের দর্শনটি বলতে চেয়েছেন। গীতার হারানবিরোধী কথাগুলো বাহ্যিকভাবে হারানকে ভয় দেখাবার জন্যও হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে হারানের অনুপস্থিতিতে তার নিজের কাজ করে খাবার যে দৃঢ়তা, মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার–তা তার ভেতরকার সত্তাকে চিনিয়ে দেয়। যা তার টিকে থাকার জন্য একান্ত জরুরি।[৫] শওকত আলী হয়তো নিপীড়িতের ভেতরকার এ সাহসটুকুকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন– তাগিদ দিতে চেয়েছেন তাদের এ সম্বলটুকুর যত্ন করার।

তিনটি চরিত্রের সরল আখ্যানে শওকত আলী শোষক-শোষিতের চিরায়ত শোষণফাঁদ এবং তা থেকে মুক্তির মন্ত্র বলতে প্রাসঙ্গিকভাবে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নানা প্রান্তসমূহ তুলে এনেছেন। সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে হিন্দুজনগোষ্ঠীর ভারতে চলে যাবার যে-প্রবণতা শুরু হয় তা একাত্তর ও একাত্তর-পরবর্তী সময়েও চলমান ছিল এবং এখনোও তা অব্যাহত রয়েছে। যা এককালের হিন্দু অধ্যুষিত মানিকগঞ্জ জেলার প্রতীকে সমগ্র বাংলাদেশের চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়া যাত্রাপালা, আখড়ার কীর্তন, রথের মেলা, লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা এবং হাটকেন্দ্রিক যাপিত জীবনের চিত্রও পাওয়া যায়। আবার আশির দশকের বাস্তবতায় নারীর স্কুল-কলেজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হবার প্রবণতাও বড় হয়ে উঠেছে। তবে সমকাল বাস্তবতায় নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে-দোর্দণ্ড প্রতাপ, নিপীড়ন ও সর্বগ্রাসী প্রবণতার চিত্র ঔপন্যাসিক চিত্রায়িত করেছেন তা একান্তই তাৎপর্যপূর্ণ। শওকত আলী দেখাতে চেয়েছেন, সমাজের পুরুষেরা আসলে নারীকে জমির মতো ভোগের সামগ্রী বিবেচনা করে এবং বিচিত্র উপায়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মতো ভোগ-দখলে নিতে ও নির্মমতায়-পাশবিকতায় একাট্টা হতেও পিছ পা হয় না। আবার নারী পীড়নে, নারীর সর্বস্বহরণে, লালসা পূরণে শাস্ত্রাচার ও সামাজিক বিধি-বিধানকে নিজ স্বার্থে আরোপ করতেও সংকোচ করে না। যা হারানের আত্মকথন ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এ পুরুষতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

ভাষায় তেমন জটিলতা না থাকলেও লেখক বিন্দু ও হারানের চৈতন্যপ্রবাহরীতি বা নস্টালজিয়াকে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। ছয় পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট তিন দিনের এ কাহিনিকে লেখক রাস্তায় শুরু করে রাস্তাতেই পরিসমাপ্তি টেনেছেন। উপন্যাসের এ অংশের নাম *গীতারাণীর* গল্প হলেও গীতার তুলনায় বিন্দুবাসিনীর জীবনচিত্র ও মনোভাবনাই এখানে অধিকমাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনযুদ্ধের চিন্তা ও অস্তিত্বসংকটের মুখোমুখি হয়েছে সেই বেশি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে অনেকের কাছে এ অংশের শিরোনাম *বিন্দুবাসিনীর গল্প* হওয়াটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু লেখক সেই সম্বলের কথা বলতে চান; যা মানুষকে বিপদে-আপদে বল-ভরসা দেয়, স্বপ্ন-আশা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, প্রয়োজনে সাহসী ও প্রতিবাদী করে তোলে– তা বিন্দুবাসিনীর মধ্যে নেই। এসব তিনি সচেতনভাবেই আরোপ করেছেন গীতারাণীর মধ্যে। কাজেই এ অংশের নামকরণ করা হয়েছে *গীতারাণীর গল্প*।

ফুলবানুর গল্প অংশটি ফুলবানু, নুরবানু ও আলাউদ্দিন মুনশি ওরফে আলা মুনশি–এ তিনটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করেই নির্মিত হয়েছে। এ অংশটি মারী-মঙ্গা, খরা-অনাবৃষ্টি আর বৈরী প্রকৃতির ধূলি-ধূসর উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সামন্তবাদী সমাজের সর্বগ্রাসী শোষণ-পীড়ন ও আসঙ্গলিপ্সার পাশাপাশি অসহায়–উপায়হীন দরিদ্রজনগোষ্ঠীর চিরায়ত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের আকাঁড়া আলেখ্য হয়ে উঠেছে। শওকত আলী আবহমান গ্রামবাংলার সমাজকাঠামোয় বিদ্যমান ঘাপটি মেরে থাকা নানা অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধা-লালসা এবং জীবন-যৌবনের অপচয়কেই শুধু উন্মোচিত করেননি বরং একই সঙ্গে কংস ও কলিরূপী ভূস্বামীদের পতন শেষে চিরদুঃখী-দেহাতী মানুষের জীবনের জয়গান ও জাগরণের কথাও বয়ান করেছেন। কারণ–

> '*ফুলবানুর গল্প* কাহিনির প্রেক্ষাপটে রয়েছে শোষণ-বৈষম্যপীড়িত আবহমান গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো। এই গ্রাম অনড় ও স্থানু। এখানে মহাজনের রক্তচক্ষু উঁচিয়ে থাকে প্রতি মুহূর্তে; জোতদার আর ভূস্বামীর দাপটে গ্রামীণসমাজ সব কিছু মেনে নেয় নির্বিচারে।

শোষণের ধারণাটিও এখানে পুরনো, মাৎস্যন্যায়ের চর্চা গ্রামজীবনে এখনো প্রকট এবং তীব্র। মহাজন-জোতদাররাই গ্রামের এক নায়ক।'[৬]

আলা মুনশির জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে *ফুলবানুর গল্প* অংশের মূল কাহিনিটি অগ্রসর হয়েছে। এটিও শোষক আর শোষিতের গল্প। তবে এখানে শোষকের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। শোষকরূপে দেখানো হয়েছে চৌধুরী মহাজনদের। এদেরই একজন কালু চৌধুরী। কালু চৌধুরীর আঁধারের ভোগের সামগ্রী সংগ্রহের দায়িত্বে আছে এ আলা মুনশি। গল্পের শোষক ও শোষিতের স্বরূপটি মূলত আলা মুনশির আত্মকথন ও চরিত্রের ভেতর দিয়েই উঠে এসেছে।[৭] একসময় ক্ষুধা আর দারিদ্র্যই ছিল উত্তরবঙ্গের মানুষের নিত্যসঙ্গী। জঠরজ্বালা থেকে মুক্তি পেতে তারা সবকিছু করতে বাধ্য হয়। ক্ষুধার জ্বালায় অসহায়-অবসিত মানুষের উপায়হীন আত্মসমর্পণের সুযোগটিকে মহাজনেরা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে। এ দুঃখদীর্ণ মানুষের প্রতিপক্ষ কেবল মহাজনশ্রেণি নয় বরং সর্বগ্রাসী ক্ষুধাও। যার কাছে পরাজিত হয় নারীত্ব, সতীত্ব, সততা, নৈতিকতা এবং আদর্শও। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম ইচ্ছাপূরণের সেই খাদ্য (ধান) আর যৌনভোগের উৎস (নারী) দুটোই থাকে মহাজনদের হাতে।

জোতদার মহাজন কালু চৌধুরীর আশ্রয়ে থেকেই আলা মুনশি গরুর রাখাল থেকে শুরু করে গাড়োয়ান, ইমাম ও নারী সংগ্রহের দালালে পরিণত হয়। তার জীবন রূপান্তরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে চৌধুরী মহাজনের শোষণ-অত্যাচার ও লাম্পট্যের নানা কাহিনি। দালালিসূত্রেই আকলিমা, টুলটুলি, মোমেনা বা রোমেনা ও আনু বিবির মতো মামা-মামির আশ্রিতা জামতলির ফুলবানুকেও মুনশি যোগাড় করে। নামহীন-গোত্রহীন এ মুনশির সঙ্গে মনিব কালু চৌধুরীর ইচ্ছাতেই বাড়ির আরেক কাজের বাঁদি নুরবানুর বিয়ে হয়। নুরবানুই তার বোধ ও আত্ম-আবিষ্কারের চেতনাকে যেমন কিছুটা উস্কে দেয়, তেমনি জীবন ও জগতের নতুন পাঠ শেখায়। কিন্তু মুনশি এ পাঠে দীক্ষিত হয় না। কারণ দাসত্ব আর আনুগত্যের পাকে সে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, কোনোভাবেই এ বৃত্ত ভেঙে বের হতে পারেনি। এ বৃত্ত ভেঙে বের হতে যে-সাহস, বুদ্ধি, উদ্যম আর চেতনা লাগে–তার কোনোটিই মুনশির ছিল না। ফলে প্রভুর প্রতি এক ধরনের অবিচল দাসত্ব, আনুগত্য আর ভয় তার মনে জেঁকে বসে। মহাজন বাড়ির খাস বাঁদি নুরবানুকে ঘর-গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে প্রতিরাতেই শরীর বিকিয়ে দিতে হয়। এ কথা আকারে-ইঙ্গিতে সে মুনশিকে বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু মুনশি সে-কথা বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি। ক্ষেত্রবিশেষ আবার বিশ্বাসও করেনি। এসব নিয়ে মহাজন বাড়ির চাকর-বাকররা তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও মুনশি এতে তেমন কান দেয়নি। কারণ তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল–

> 'বউয়ের মাথায় দোষ আছে। না হলে তার মতো আবাং বোকা লোকের কপালে অমন সুন্দর আস্ত একখানা বউ জোটে?...তাই তার বিশ্বাস হতো না।...বিশ্বাস হতো না বলেই ভাবত, নুরবানুর কান্নাকাটির ব্যাপারটি সাজানো। মহাজন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে সে আলাদা জায়গায় গিয়ে সংসার পাততে চায়, সেই জন্যই তার অমন কান্নাকাটি।'-[ফু.গ./পৃ.৯০-৯১]

তাছাড়া মহাজন বাড়ির বাঁদিরা কর্তাদের সেবা করতে গিয়ে সে-ঘরেই রাত কাটিয়ে দেবে–এ ঘটনাও মুনশির কাছে কখনো অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তারপরেও ঘরের মেঝেতে পড়ে নুরবানুর কান্নার আকুলি-বিকুলি দেখে একেক দিন মুনশি বউকে কিছু না বলে সাত মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনে চলে যেতো। আর পালাবার চিন্তা করতো। কিন্তু স্টেশনে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়, প্রকাণ্ড জানোয়ারের মতো গাড়ি আর বিচিত্র মানুষের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি দেখে মুনশি–

> 'ভয় পেয়ে যেতো। বাইরের দুনিয়াটা তার কাছে এত প্রকাণ্ড লাগতো যে শেষপর্যন্ত তার সাহসে কুলাতো না। সে মলিন মুখে ফিরে আসতো। আসলে এ ভয় থেকেই তার ছোটো হওয়া, পাপী হওয়া এবং প্রতারক হওয়া।'–[ফু.গ./পৃ.৯২]

আসলে আনুগত্য, দাসত্ব ও হীনমন্যতাবোধ– এসব মুনশির শুভবোধ ও চেতনার শানকে সম্পূর্ণরূপে ভোঁতা করে দেয় বিধায় ন্যূনতম সাহস ও প্রতিবাদ করার সামর্থ্যটুকুও সে খুঁজে পায় না। আলা মুনশির এ দাসত্ব ও স্ত্রীর ওপর স্বত্ব হারানোর সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার *গিলগামেশ* কাব্যের ও নিকট-অতীতের ভারতীয় ইতিহাস-আশ্রয়ী অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মহিষকুড়ার উপকথা* এবং *দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। রাজা গিলগামেশ যেমন তার অধীনস্থ যুবকদেরকে তাদের পরিবারের কাছে যেতে দেয় না, স্ত্রীদের সবলে হরণ করে; আর জোতদার গয়ানাথ কৌশলে অন্ত্যজশ্রেণির বাঘারু বর্মণকে তার ক্রীতদাস বানায়; তেমনি জোতদার-ভূস্বামী জাফরুল্লাও ছিন্নমূল আসফাককে নিজের চাকর-দাসে পরিণত করে, তার জীবনসঙ্গিনী কামরুনকে বিয়ের বাতাবরণে দখল করে এবং তার ঔরসজাত সন্তান মুন্নাফের পিতৃস্বত্ব করায়ত্তসহ কৌশলে পিতাকে অবজ্ঞা করতে শেখায়। গিলগামেশ, গয়ানাথ ও জাফরুল্লার শোষণ-আধিপত্যের বৃত্ত থেকে সদিচ্ছা থাকার পরও এনকিডু, বাঘারু ও আসফাক বের হতে পারে না। প্রতিকারহীন অব্যাহত শোষণ আর জীবনের বঞ্চনা এনকিডু, বাঘারু, আসফাক ও আলা মুনশির ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও সদিচ্ছার চেতনা গ্রাস করে তাদেরকে ভারবাহী পশু তথা দাসের স্তরে নামিয়ে আনে।

নুরবানু মহাজন, মহাজনের ছেলে ও নাতির অব্যাহত ভোগের শিকার হয়ে এক সময় গর্ভবতী হয়ে পড়লে মুনশি কিছুটা বেকায়দায় পড়ে। কারণ মনের অশান্তি আর পাপচিন্তায় নুরবানু মুনশিকে ভর্ৎসনা করে পালাবার তাগিদ দেয়। কিন্তু পালানোর ব্যাপারেও মুনশি তেমন সাড়া দেয় না। তার চিন্তা জুড়ে থাকে–'পালিয়ে সে যাবে টা কোথায়– গেলে কাজ কামের কী হবে– পেট চলবে কেমন করে।' যথাসময়ে নুরবানু এক মৃত সন্তান প্রসব করে এবং মুনশি দেখে বউ তার কষ্ট না পেয়ে খুশিই হয়েছে। এসময় মহাজনের বাড়িতে আসা রাখাল ঢ্যাঙা সবদরের সঙ্গে নুরবানুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই দুই বছরের দাম্পত্যজীবন শেষে সবদরের সঙ্গে নুরবানু পালিয়ে যায়। এতে মুনশির জীবন-ভাবনায় বড় পরিবর্তন আসে এবং চেতনায় আঘাত লাগে। তার মনে উদয় হয়–

> 'সেদিন যদি সে বাড়িতে থেকে পাহারা দিত–তাহলেও নুরবানু পালাত। কারণ পালানোর ঘটনার সূচনা তো অনেক আগে। যেদিন বিয়ে দিয়ে একখানা গোয়াল বাসোপযোগী করে তাকে সংসার পাতবার জন্য দেওয়া হয়, সেদিনই তার বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, সংসারটা সে পাততে যাচ্ছে। সেটা সম্পূর্ণই তার নিজের, নাকি মহাজনেরই সংসারের একটা অংশ। যে ঘরখানিতে তার সংসার হবে, সেখানি মানুষের থাকবার জন্যে, নাকি গাইগরু থাকবার জন্য। যদি বুঝে নিতে পারতো,তাহলে পথও তার বাছা হয়ে যেত। সে পথ একেবারেই অন্য রকম, সে পথে মানুষ সংসার থেকে পালায় না–সংসারেই ঘুরে ফিরে আসে।'-[ফু.গ./পৃ.১০৭]

মুনশির এ বোধোদয় নুরবানু থাকতে হয়নি। কিন্তু নুরবানুর পলায়ন ও শূন্যঘর মুনশির জীবন বিস্বাদ করে তোলে। তাই শেষে– 'একদিন সেও কেটে পড়ল। কিন্তু ভেসে গেল না।' প্রকাণ্ড দুনিয়া দেখে সে ভয় পেয়ে যায় এবং আশেপাশের গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, রেলস্টেশন ও নদীরঘাটে ঘুরে বেড়ায়। মুর্শিদাবাদ-মালদহের আরেক বাউণ্ডুলে দরবেশ ওহিদুল্লাহ মৌলবির সংস্পর্শে তিন মাসেই আমপারা শেষ করে কুরআন শেখে। এভাবেই আলাউদ্দিন 'মুনশি আলাউদ্দিন'-এ পরিণত হয়। জুমার নামাজ, মিলাদ, বিয়ে পড়াতে সক্ষম মুনশির মনে মসজিদের ইমাম হবার বাসনা জাগে। এসময় বেশরিয়াতি বিয়ে পড়ানো নিয়ে মহাজনের সঙ্গে রাশভারী মেজাজের ওহিদুল্লাহর বাদানুবাদ হয়। ফলে ওহিদুল্লাহর বিদায় ঘটে এবং তার পদে মুনশির অভিষেক হয়। ইমাম হয়েই মুনশি চৌধুরীর ইচ্ছামতো পাগল হায়দারের সঙ্গে তার ভাগ্নির বিয়ে পড়ায়, পুরনো মাজার আবিষ্কার ও ফতোয়া দিয়ে গরিব মধু মিয়াকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে। এর সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* উপন্যাসের ময়মনসিংহ গারো পাহাড় এলাকার ছিন্নমূল মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে এসে মোদাচ্ছের পিরের মাজার আবিষ্কার, ফতোয়া দিয়ে প্রতিবাদী তাহের-কাদেরের বাপকে গ্রামছাড়া করা, আমেনা বিবিকে তালাক দেয়ানো এবং প্রগতিশীল আক্কাসকে জব্দ করার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। ধুতুরার বীচি খাইয়ে হায়দারকে মারা এবং মধুর সর্বস্বান্ত হবার ঘটনায় প্রথমে মুনশির কষ্ট হলেও সে মনকে প্রবোধ দেয়। কারণ এটা মেনে না নিলে সমাজ চলে না। আর চৌধুরীদের ক্ষমতাও তার ভালোভাবেই জানা। কাজেই–

> 'মুনশির বিলক্ষণ কষ্ট হয়েছিল ঐ ঘটনায়। কিন্তু যে কাজের যে ধারা তাই তো করতে হবে।...কারণ মসজিদটা তৈরি হয় কার পয়সায়? কার হুকুমে মসজিদে চাঁদা ওঠে? কে হ্যাঁ বললে তবে খড়ো চালের মসজিদে পাকা ছাদ হয়ে যায়। সেই লোকটিকে সমঝে চলতে হবে না?...এটাই নিয়ম–এই নিয়ম মেনেই চলতে হয়েছে মুনশিকে। না চলে উপায় নেই।'-[ফু.গ./পৃ.১১২]

কিন্তু তার পরেও মুনশি নিজ পদ ধরে রাখতে পারেনি। কালু মহাজন নির্বাচনে জিততে ভোট সংগ্রহের জন্য তাহের মৌলবির শ্বশুরকে হাত করতে–'আলা মুনশি তুমি নামো' বলে এক কথায় তার চাকরি তাহেরকে দিয়ে দেন। আর এভাবেই মুনশি–

> 'সেই যে নামল আর উঠতে পারল না ইমামের আসনটিতে। জ্ঞান-বুদ্ধি, চালাকি-ধূর্তামি-কোনোটাই তার কাজে লাগল না শেষ পর্যন্ত।...মুনশি ছুটকো ফরমাস খাটতে খাটতে কবে যে মেয়ে মানুষ জোটানোর দালাল হয়ে গেছে– সে নিজেও জানে না।'-[ফু.গ./পৃ.১১৩]

দালালি জীবনে প্রথম নারী হিসেবে সংগ্রহ করে কসিমুদ্দীনের বিধবা বউকে। প্রথম প্রথম এ কাজ নুরবানুর প্রতি একধরনের ক্ষোভ-আক্রোশ থেকে করলেও পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। কারণ–'মুনশির মতো বুড়ো লোকও মহাজন বাড়ির খুঁটিতে শিকল দিয়ে বাঁধা।' তাই মুনশি তার ভাগ্যবিধাতা মহাজন কালু চৌধুরী, মহাজন পুত্র লেকু ও নুকু এবং নাতির লালসা মেটাতেই এ পথে নামে। মারী-মঙ্গা, দুঃখ-দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে সে খুব সহজেই বিরল এলাকার গেদু মোহাম্মদের শালি আকলিমা, গোলাপগঞ্জের দীনু সরকারের প্রথম পক্ষের মেয়ে টুলটুলি, কাউনিয়ার আনু বিবি এবং সুন্দর আলীর মেয়ে মোমেনা বা রোমেনাকে যোগাড় করে। আর মহাজন বাড়ির পাপপুরীতে ঢুকিয়ে দেয়। সংগৃহীত সকল মেয়েদের জীবনেই দেখা যায় অভাব-ক্ষুধা-দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী এবং ক্ষুধার জ্বালা থেকে মুক্তি পেতেই তারা অনেকটা স্বেচ্ছায় এ নরকসদৃশ অদৃশ্য কারাগারের জালে জড়িয়ে পড়েছে। যেখান থেকে খুব সহজে তাদের মুক্তি মেলেনি। কারণ–

> 'চৌধুরী বাড়িতে...দুই নিয়ম। এক হলো চৌধুরী মহাজনের নজরে পড়ে সোজাসুজি তার ঘরে গিয়ে ওঠা এবং তারপর চৌধুরী গিন্নির হেফাজতে যাওয়া। আর দ্বিতীয় নিয়মটি হলো, প্রথমে চৌধুরী গিন্নির আশ্রয়, তারপর সেখান থেকে নজরে পড়লে পদোন্নতি হয়ে কর্তার ঘরে ঠাঁই পাওয়া। শেষ পরিণতি অবশ্যি দু'ক্ষেত্রেই এক। চৌধুরীর ঘর থেকে গিন্নির হাত হয়ে একেবারে বাড়ির বাইরে। শেষ ফলাফলে কখনো হেরফের হয় না।'-[ফু.গ./পৃ.৯৯]

অর্থাৎ নেশা কেটে গেলেই এসব বাঁদিদের খুব নির্মমভাবে মহাজনবাড়ি থেকে তাড়ানো হয়। কখনো কখনো কলঙ্ক এড়াতে জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটিয়ে এদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়। অথবা একেক সময় এরা খুন-গুমের শিকার হয়। কারণ-'মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত এলাকার মানুষের দুর্বলতার সুযোগটিকে মহাজনেরা পরম্পরাভাবে বিচিত্র উপায়ে ব্যবহার করেছে। আর্থ-সামাজিক কোনো সম্মান তাদের নেই, এমনকি নারীত্বের শেষ সম্বলটুকুও তারা তাদের পাতা ফাঁদে ফেলেই কিনে নেয় এবং প্রয়োজন শেষ হলে ছুঁড়েও ফেলে নির্দয়ের মতো।'[৮] এ হতভাগ্য নারীরা শুধু মহাজনবাড়ির পুরুষদের দ্বারাই লাঞ্ছিত-অপমানিত হয় না, বরং সঙ্গে সঙ্গে মহাজন গিন্নিদের মাধ্যমেও অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হয়। নিজেদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার না পেয়ে, স্বামীর অপকর্ম বন্ধের অক্ষমতায় তাদের সমস্ত আক্রোশ ফেটে পড়ে এ নিঃস্ব-নিরপরাধ দাসী-বাঁদিদের ওপর। আর তাই–

> 'মধ্যরাতে একেকদিন মহাজন বাড়িতে মেয়ে মানুষের কান্না শোনা যায়। আর তখন বাইরের ঘরে শুয়ে শুয়ে শোনে মুনশি। মনে মনে মেয়েটিকে সে বলে-এ হলো তোমার ভাতের দাম বাপু; বেঁচে থাকতে চাইলে এই দাম তোমাকে দিতেই হবে।'-[ফু.গ./পৃ.১০৮]

দালালি কর্মের ধারাবাহিকতায় মুনশি অবশেষে জামতলির দীনহীন শুকুর মোহাম্মদের বাড়িতে আশ্রিতা এতিম 'আকুয়ারী বহিনবেটি' ফুলবানুকে শিকারে পরিণত করে। মাত্র দু'শত টাকার বিনিময়ে খুব সহজেই মুনশি ফুলবানুকে হাতিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মহাজনেরা দারিদ্র্যের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-আকালের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও স্বার্থের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তাই মুনশি পথের দেখা এক মোটাতাজা শেয়াল এবং 'শেয়ালের লম্বা জিভ, তার ছুঁচাল মুখ, জ্বলজ্বলে লোভী চোখ–স্ফীত গোলাকার বপু'–সমস্ত কিছুতেই সে মহাজনের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। তাই শেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলে–'এখুন মানুষ মরছে, গরু মরছে, ছাগল মরছে–তমারে দিন শালারা–এক তমার দিন, আর এক হইল মহাজনের দিন। খাও শালারা দোনোজনে মিলে দুনিয়াটাক খায় ফালাও।' আকাল-মারী-মঙ্গা, অভাব-অনটন দেখা দিলে শেয়ালের মতো মহাজনেরও বিশেষ সুবিধা হয়। মুনশি তার জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই বলে–

> 'আকাল পড়লে যেমন শেয়াল-কুকুরের মোচ্ছব, তেমনি মহাজনও মোচ্ছবে মেতে ওঠে। একদিকে একটা করে সংসার নিকেশ হয়, আর অন্যদিকে মহাজনের তহবিল এবং শিয়াল-কুকুরের পেটও মোটা হতে আরম্ভ করে। ঐ সময় শিয়াল কুকুরের গায়ের চেকনাই এবং মহাজনের গায়ের চেকনাই সমান রকম দেখতে পাওয়া যায়।'-[ফু.গ./পৃ.৮৩]

সমাজকাঠামোর কেন্দ্র ও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাতে মুনশি সমাজের বিদ্যমান শোষণ, অসঙ্গতি ও বাস্তবতাকে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যদিও জীবনের প্রয়োজনে, অস্তিত্বরক্ষায় ও স্বার্থের প্রশ্নে মুনশি সমাজের সেই শোষক শ্রেণিরই অপকর্মের দোসর হয়ে ওঠে। তারপরেও ফুলবানুর অপেক্ষমাণ অনিবার্য দুর্ভোগ এবং মহাজন ও তার ছেলে-নাতিদের দ্বারা প্রতি রাতে বলাৎকারের কথা মনে পড়তেই সে দ্বিধায় পড়ে। তাই সে একবার ভাবে ফুলবানুকে পালিয়ে যেতে বলবে। কিন্তু তার পালানোর কোনো জায়গা না থাকায় সে আবার ভাবে মানসিক পূর্ব প্রস্তুতি নিতে মহাজন বাড়ির আসল চেহারার কথা খুলে বলবে। কারণ প্রথম রাতে মহাজনের লালসা মেটাতে গেলে–'অল্পবয়সী আঁকুয়ারী মেয়ে, ভয় তো পেতেই পারে।' তাই মহাজন বাড়ির নিকটবর্তী পৌঁছানো মাত্রই বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং শেষপর্যন্ত ফুলবানুকে পালানোর তাগিদ দিয়ে বলে–

> 'মুই মহাজনের নফর–নফর কি মহাজনের বদনাম করিবা পারে? ভালো চাহিস তো তুই পালা।...ধনী মানুষের খাসলত বড়ো খারাপ–বেচ্ছুয়া দেখিলে কুনো ধনীর হুঁশ থাকে না–তুই বাঁচিবো নাই বো–ঐঠে গেলে বাঁচিবার রাস্তা নাই...কতো বেচ্ছুয়ার যে ইজ্জত নাশ করিছে শালা, তার হিসাব নাই–তুই ঐঠে যাইস না।...মুই কঁহছো তুই পালায় যা।...ভাত দিবে, কিন্তুক নষ্ট করে দিবে তোক–আকুয়ারী বেটি তুই, তোক শেষ করে দিবে।...যেইঠে তোর মন চাহে তুই পালা।'–[ফু.গ./পৃ.১২৮-১২৯]

মুনশি তার অবস্থান থেকেই ফুলবানুকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করার পরামর্শ দেয়। তবে এসময় রাস্তায় মানুষের হৈহুল্লর, হাঁকডাক, আর টর্চের আলো জ্বেলে অস্ত্র হাতে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে দুজনেই সাঁকোর নিচের জঙ্গলে লুকায়। শেষপর্যন্ত শ্রেণিশত্রু খতমকারী নকশালবাড়ি[৯] গ্রুপের হাতে দুজনে বন্দি হয়। জমিদার-জোতদার-মহাজনদের প্রতিকারহীন অব্যাহত শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে বিপ্লবী চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি আন্দোলনের (১৯৬৭) ঢেউ এসে লাগে উত্তরবঙ্গের ধুরইল অঞ্চলেও। জোতদার কালু চৌধুরী ও দালাল আলা মুনশিদের নকশালপন্থীরা শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। দুজনকেই পাকড়াও করে উত্তেজিত বিপ্লবীরা তাদের শোষণ-অত্যাচারের বর্ণনা দিতে জানায়–

> 'বিদেশি বেচ্ছুয়াটার পেট কে বানালে? তুই না তোর মহাজন?...আবুল হুসেনের জমিখান কাড়ে লিস নাই– কহ?...মহাজন রিলিফের গহম বেচা টাকা গিলা কুনঠে থুইছে।...কহ, টাকা গিলা কুনঠে থাকিবা পারে?'–[ফু.গ./পৃ. ১৩৭-১৪১]

এরা পালিয়ে যাওয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত ও রক্তাক্ত কালু চৌধুরীকে ধরে আনে। একজন বক্তৃতা দেবার মতো করে মহাজনদের গম চুরি, গরিবের ঘরবাড়ি ও জমি দখল, নারীর সম্ভ্রম লুট, থানার দারোগার সঙ্গে যোগসাজশসহ শোষণের কথা বলে। আর মুনশিকেও নারী সরবরাহের দালালির জন্য একপ্রস্থ 'কিল-ঘুষি-লাথি হজম করতে হয়।' তবে এ শোষক শ্রেণিকে সাহায্য ও সুরক্ষা দিতে বরাবরের মতো সরকারি পুলিশ প্রশাসন এগিয়ে আসায় গণআদালতের রায় বাস্তবায়নে বিঘ্নিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত 'দোনো শালক একসঙ্গে কুরবানী দ্যাও' বলে লম্বা ধারালো অস্ত্র হাতে মুনশি ও কালু মহাজনের মাথার ওপর কোপ ঝারে। কালু চৌধুরীর মুণ্ডুটা প্রায় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ভাগ্যগুণে মুনশি লাফিয়ে ওঠায় কোপটা তার হাঁটুতে লাগে এবং রাস্তার ধারে গড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার পর মুনশির চেতনা ফেরে। তবে 'আজন্ম ভয়ের মধ্যে বাস করতে করতে নফর আর দালাল হয়ে যাওয়া' মুনশির মধ্যে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে জীবনকে, জগৎকে, নারীকে ও সংসারকে বুঝতে পারে। তাই মুনশি–

> 'ঐ মুহূর্তে উপুড় হয় এবং মাটিতে বুক ঠেকিয়ে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অবলম্বন খোঁজে। বেশি দেরি হয় না–অবলম্বন পেয়ে যায় সে। এক হাতে মুঠো ভর্তি ঘাস পায়, আর এক হাতে পায় একটা আগাছার গোড়া।...সরীসৃপের মতো গতি সঞ্চারের আদিম প্রক্রিয়াটি সে চালু রাখে। আর সমস্ত জীবনটা সে দেখতে পায় ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে।'-[ফু.গ./পৃ.১৪৬]

এ মাটি আকড়েই মুনশি রাস্তায় ওঠে। রক্ত-কাদা-মাটিতে জড়ানো নগ্ন মুনশিকে প্রথমে দেখে ফুলবানু ভয় পেলেও পরক্ষণেই লুঙ্গি পরিয়ে তাকে সাaনা দেয়। এসময় ফুলবানুকে মুনশির শৈশবের মমতাময়ী মা ও যৌবনের নুরবানু বলে প্রতিভাত হয়। ফুলবানু একটা গাছের ডাল ভেঙে মুনশির হাতে ধরিয়ে দিলে সে বহু কষ্টে অকেজো ডান পা তুলে এগিয়ে চলে। এসময় রক্তের গন্ধে কাছাকাছি আসা এক শেয়াল দেখে মুনশি উত্তেজিত হয়ে বকে আর বলে–

> 'যে মুর্দাটা কবরত যাবে এটার বগলত যাবা পারিস না, মুই এখুনও মরোঁ নাই। মোরঠে আসিছে-হ্যাঁরে, মহাজন কি তোর বাপ, আঁ? বাপ হয় নাকিন তোর?'-[ফু.গ./পৃ.১৫০]

এর মাধ্যমে মুনশি একদিকে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে শোষক-দুরাত্মা মহাজনের প্রতি চরম ঘৃণার কথা প্রকাশ করে। রক্ত-মৃত্যুর নিষ্ঠুর উপত্যকা পেরিয়ে অবশেষে আলা মুনশি অস্তিত্বের নিগূঢ় প্রেরণায় জেগে ওঠে। এই অস্তিত্ববোধ ও সদর্থক চেতনাই মুনশি চরিত্রের উজ্জ্বল দিক। তাই ফুলবানুকে নিয়ে 'ঠ্যাঙের ঘাওকান যেইঠে সারিবে' সেই আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ফের যাত্রা করে। যাতে মাটিকে ভয় না পেয়ে, কষ্টকে ভয় না পেয়ে, দুনিয়াকে ভয় না পেয়ে এবং মানুষকে ভয় না পেয়ে একটি ঠিকানায় পৌঁছাতে পারে। আর এ পথেই সে পেয়ে যাবে অনাগত সঙ্গী, সন্তান আর সংসার।

জমিদার-জোতদারদের সৃষ্ট ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়ে অসহায় নুরবানুও ধুরইলের মহাজন কালু চৌধুরীর বাড়ির খাস বাঁদিতে পরিণত হয়। তারও পিতৃপরিচয় ও গ্রামের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বয়সে যুবতী, দেখতেও সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী। এ কারণেই আকলিমা, টুলটুলি, আনুবিবি ও মোমেনা বা রোমেনাদের মতো কাজের বাঁদি হিসেবে মহাজন বাড়িতে তার আগমন ঘটে। আর রহস্যজনকভাবেই মনিব চৌধুরী মহাজনের ইচ্ছাতেই এক রাতে তার সঙ্গে অপর খাস নফর হাবাগোবা আলা মুনশির বিয়ে হয়। তাদের বসবাসের জন্য মহাজন বাড়ির একটি গোয়াল ঘর বরাদ্দ দেয়া হয়। গরু ছাগলের ঘরেই এ নফর-বাঁদির ঘর-সংসার শুরু হয়। দুজনে দিনভর মহাজন বাড়িতে কাজ করে এবং দেখা হয় মধ্য রাতে ঘুমানোর সময়। প্রথম প্রথম নুরবানু মহাজন বাড়ির রান্নাবান্না-ঘর-গৃহস্থালির কাজ সেরে মধ্যরাতে ঘরে ফিরে জ্যোৎস্নারাতে গুনগুন করে গান গাইতো। আবার মাঝে মধ্যে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো। স্বামী এ কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নুরবানু হাউমাউ করে বলতো–

> 'চলেন হামরা পালিয়ে যাই-এইঠে থাকিলে মুই বাঁচিম নাই।...মুই বিষ খামু–এমন জিন্দগী মোর দরকার নাই–পাপ আর মোর সইয্য হয় না।'-[ফু.গ./পৃ.৯০]

কিন্তু রাতের বেলা মহাজনের শরীর মালিশ করার ডাক আসলে নুরবানু যেতে না চাইলেও মুনশি জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিতো। যদিও সে মহাজন কালু চৌধুরী, মহাজনের বয়স্ক ছেলে ও নাতির লাম্পট্যের কথা জানতো। ফলে এ তিন রকমের বয়সী ও সম্পর্কে জড়ানো লম্পটেরা–

> 'রোজ রাতে নুরবানুকে নষ্ট করেছে।...শুধু ঐ গোরস্থানের মড়াই নয়, তার বুড়ো ছেলেটিও কম যায় না এবং নাতিটি নাকি সাক্ষাৎ বাঘ, সুযোগ পেলেই নুরবানুকে একদফা কামড়ে কামড়ে খেয়ে নেয়।'-[ফু.গ./পৃ.৯১]

এভাবে মহাজন বাড়ির নরকপুরীতে ভোগের ভাটিতে সিদ্ধ হতে হতে নুরবানু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। আর স্বামীকে বলেও তার কোনো লাভ হত না। বরং প্রভুভক্ত স্বামী একে মহাজন বাড়ির নিয়ম ও প্রথা বলে গণ্য করতো এবং 'কান্দিস না নুরু, মিছামিছি কান্দে কুনো লাভ নাই'-বলে সাaনা দিতো। স্বামীর এ অসহায়ত্ব, ব্যক্তিত্বহীন ও ভীরু কাপুরুষ মনোভঙ্গি দেখে নুরবানু শেষে আর কাঁদতো না, অনেকটা গুম হয়ে থাকতো। কারণ মনে মনে সে ঠিক করে নিয়েছিল–'যে কান্নার প্রতিকার হয় না, সে কান্না আর সে কাঁদতে যাবে না।' এভাবে নুরবানু মুখের কান্না থামাতে পারলেও বুকের জমানো

বেদনার ভার নামাতে পারেনি। উপরন্তু মহাজন বাড়ির লম্পট পুরুষদের অব্যাহত ভোগের শিকার হয়ে সে একসময় গর্ভবতী হলে তার খ্যাপামি আরো বেড়ে যায় এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। তাই রাতের বেলা মুনশি তার গায়ে হাত দিলে– 'কে বলে' চিৎকার করে উঠতো এবং একেকদিন খামচে দিতো। সে কোনোভাবেই মহাজন বাড়ির সংস্রবকে সহ্য করতে পারতো না। মহাজন বাড়ির চাকর-নফরদের কাউকে পেলেই সে ডেকে ডেকে বলতো–'এইঠে তমরা থাকেন না–পালায় যাও–এইঠে বড় পাপ।' আর চিৎকার করে স্বামীকে বলতো–

> 'মোক বিষ আনে দেন, মুই বিষ খামু।...মুই আর বাঁচিবা চাহোঁ না–মুই কনে বিষ পাইলে খাঁও।'-[ফু.গ./পৃ.১০৪]

আসলে নুরবানু তার গর্ভস্থ পাপের-অনিচ্ছার-অপ্রত্যাশিত সন্তানের জননী হতে চায়নি এবং একে জন্ম দিতেও রাজি ছিল না। ফলে প্রচণ্ড আত্মদহনে তার একধরনের মানসমৃত্যু ঘটে। তবুও সে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করেনি। এসময় মহাজনের বাড়িতে তরুণ চটপটে ঢ্যাঙা সবদরের আগমন ঘটে। সে গরুর রাখাল হলে মুনশি মহাজনের গারোয়ান হয়ে বাইরে বাইরে থাকতো। এ ঢ্যাঙা সবদরই ডাক্তার-কবিরাজ ডেকে আনতো, বাড়ি পাহারা দিতো আর অসুস্থ নুরবানুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতো। মুখে সর্বক্ষণ হাসি লেগে থাকা, চমৎকার গান গাওয়া ও পরোপকারী সবদরকে ঘিরে নুরবানু স্বপ্নের জাল বোনে। যথাসময় সে এক মৃত বাচ্চা প্রসব করলে দাঁই ডাকা, মৃত সন্তানের কবর দেয়ার সকল ঝামেলা সবদরকেই পোহাতে হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয়– মৃত বাচ্চার শোকে নুরবানু তেমন কাতর হয়নি বরং প্রকাণ্ড একটা বোঝা নেমে যাওয়াতে সে স্বস্তি পায়। তাই আলা মুনশি দেখতে পায় নুরবানুর কাহিল মুখে–'দিব্যি হাসি ফুটে আছে। ফুরফুরে রঙিন প্রজাপতিটির মতো সে চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে।' অর্থাৎ মৃত সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে নুরবানু মনের সকল পাপ-তাপ-গ্লানি থেকেও একধরনের পরিত্রাণ পায়। এক হিসেবে তার নবজন্ম ঘটে এবং নতুন জীবন শুরুর প্রস্তুতি নেয়। তাই মহাজন শরীর মালিশের জন্য তাকে ডেকেও বিফল হয়। স্বামীর মিনতি, রাগ-ধমককেও সে পরোয়া করে না। নুরবানুর এক গোঁ–'মহাজন বাড়িতে সে কিছুতেই যাবে না।' এ সময় সে রাতের বিছানাও আলাদা করে। কারণ ভীরু ও ব্যক্তিত্বহীন স্বামীর পরশকেও তার চরম ঘৃণার মতো লাগে। তাই আলা মুনশি তাকে জোর করে এক বিছানায় শোয়াতে গেলে সে ছিটকে দূরে সরে যায় এবং মুখ ঝামটা দিয়ে বলে–

> 'নফর চাকরের সঙ্গে মুই শুতিবা চাহোঁ না।...মুই কি চাঁহো বুঝেন না? যেদিন বুঝিবেন, ঐদিন মোক শুতিবা ডাকেন।'-[ফু.গ./পৃ.১০৬]

নুরবানু মনে প্রাণে চেয়েছে তার স্বামী মহাজন বাড়ির আত্মবিক্রিত আনুগত্য ও দাসত্বের শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসুক এবং অন্যত্র গিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে সংসার গড়ে তুলুক। তাই স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে– 'মুই সংসার চাহোঁ গোলামের ব্যাটা, তোর মহাজনের বাড়িত বান্দী থাকিবা চাহোঁ না।' কিন্তু আলা মুনশি নুরবানুর সে-ইচ্ছা, স্বপ্ন ও সাধকে পূরণ করতে পারেনি। বরং সে মহাজনের দেয়া টাকায় রূপার খাড়ু কিনে নুরবানুর মন পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে এ খাড়ু পেয়ে তীব্র ক্ষোভে আলা মুনশি ও তার মনিব মহাজনের উদ্দেশ্যে সে বলে–

> 'নাঙ এর কড়ি, ভাতারের নাম–খাড়ু আনে দ্যাও নাইয়র যাম–সেই রকম বুঝিছেন মোক, না? তমার মহাজনের গহানাত মুই মুতে দু।'-[ফু.গ./পৃ.১০৬]

এ কথাতেও মুনশির বোধোদয় ঘটে না। ফলে নুরবানু তার সিদ্ধান্তানুযায়ী ভীরু ও ব্যক্তিত্বহীন স্বামীকে ত্যাগ করে। মহাজন বাড়ির পাপপুরী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, স্বাধীন ইচ্ছার ও স্বপ্নের নতুন জীবন গড়তে হিতাকাঙ্ক্ষী ঢ্যাঙা সবদরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। তার কাছে এ পালানোই ছিল পরিত্রাণের একমাত্র পথ। নুরবানু তার অবস্থান থেকেই সমাজবিধাতা মহাজন চৌধুরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালিয়ে এক ধরনের প্রতিবাদ জানান দিয়ে যায়। বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমাস্পদের প্রেমই নুরবানুর এমন সাহস ও প্রতিবাদের শেষ পুঁজি বা সম্বল হয়ে উঠেছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর অব্যাহত শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিলে অসহায় কৃষক পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে। ফুলবানুর অনুষঙ্গে ছিন্নমূল ও পরাশ্রিত নারীর জীবনযন্ত্রণার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ফুলবানু পাঁচপোখর এলাকার মেয়ে। শৈশবে মা-বাবা হারানোর কারণে এতিম-অসহায় কিশোরী ফুলবানুকে জামতলী মামার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু দুঃসহ ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের সংসারে মামা শুকুর মোহাম্মদ তার এ 'আঁকুয়ারী বহিনবেটি' ফুলবানুকে বাড়তি বোঝা ও ভাত-কাপড়ের অপচয় জ্ঞান করে। ফলে উঠতে বসতে মামা-মামির বকা-ঝকা আর লাঞ্ছনা প্রাপ্তিকে ফুলবানু তার প্রাত্যহিক ব্যাপার ও নিয়তি হিসেবেই মেনে নেয়। তবে এসব পীড়নকে সে ধর্তব্যের মধ্যে ফেলে না, বরং 'কেবল ভাতের ক্ষুধাকেই সে ভয় পায় এবং একে সহ্য করতে পারে না।' ক্ষুধার জ্বালা নেভাতে শুকুর মোহাম্মদ যখন বসতভিটা বিক্রির জন্য ঘুরঘুর করছিল, ঠিক তখনই ঘুঘুডাঙ্গার হাটে আলা মুনশির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। 'পেটত ভাত জুটে না–তার উপর এই জেয়ান বহিনবেটির বোঝা। আর মুই বোঝা টানিবা পারোঁ না, মোর বহিনবেটির একটা গতি করে দেন'–এমন কথা শুকুরের মুখে শুনেই আলা মুনশি তাকে লোভের ফাঁদে ফেলে। আর ধুরইলের মহাজন কালু চৌধুরীর বাড়ির খাস বাঁদি

হিসেবে মাত্র দু'শত টাকার বিনিময়ে ফুলবানুকে কিনে নেয়। এছাড়া ফুলবানুকে আনার দিন মুনশি শুকুরকে আরো পঞ্চাশ টাকা দেয় এবং তার জন্য কবিরাজের হাট থেকে কেনে ষাট টাকার দামি নীলরঙের ঠেঁটি (পাড়হীন ছোট শাড়ি) ও কাচের চুড়ি। সন্ধ্যার পর খেয়ে দেয়ে বিদায় নেবার কালে ফুলবানুকে তার মামি ও খালা সাa্না দিয়ে বলে–'তুই সুখে থাকবি মা–কুনো চিন্তা করিস না।' আর মামা শুকুর দু'খানা দশ টাকার নোট ফুলবানুর হাতে দিয়ে সস্নেহেই বলে–'হাউস হইলে কুছু কিনে খাইস বেটি, আর শুন, মহাজনের বাড়িত মন দে' কাম করিস মা।' এভাবেই কিশোরী ফুলবানু মামা-মামির সংসার থেকে বিদায় নেয়। অথচ এ বিদায় মুহূর্তে তার তেমন কষ্টও হয়নি, এমনকী কান্নাও পায়নি। কারণ–

> 'তার এখন মুক্তি হচ্ছে। হাঁটুর নিচে ঝুর ঝুর করে খসে পড়া কাপড় দিয়ে তার আবরু রাখা যাচ্ছিল না; পেটের ভেতরে ধিমি তাতের আগুনের মতো খিদে নিশিদিন জ্বলত, তার ওপর আবার ছিল মামু-মামির নিত্যকার লাথি-ঝাঁটা। সুতরাং কাঁদবে কেন সে?'-[ফু.গ./পৃ.৭৮]

আসলে ফুলবানুর কাছে জীবনযন্ত্রণা মানেই ক্ষুধা ও জঠরজ্বালা আর জীবনের পরিতৃপ্তি মানেই ভাত। আপাত এ ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেয়ে এবং ভাত-কাপড় পাবার একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা হবার কারণেই সে অনেকটাই নির্ভার হয়ে ওঠে। তাই অতীতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে ভবিষ্যতের ভাত-কাপড় সমেত জীবন নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে নিঃসঙ্কোচে দালাল মুনশির সঙ্গে ধুরইল গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার মনে পড়ে– 'সপ্তাহ দুই আগে...তিন দিন টানা উপোস দেওয়ার পর চাল কিনে এনেছিল মামু–আহা কতদিন পর সেদিন পেটপুরে ভাত খাওয়া'-র কথা। তাই মুনশির মুখে ভাত-কাপড়-তেল-সাবানের ভরসা পেয়ে কিশোরী ফুলবানুর মনে প্রহার বা পিটুনির আশঙ্কা জাগে। এ আশঙ্কা থেকেই সে মুনশিকে জিজ্ঞাসা করে–'নানা, মহাজনের বাড়িত কি মারে?' জবাবে মুনশি ফুলবানুকে আশ্বস্ত করতে–'মারপিট ঐঠে নাই' বলে জানায় এবং একে আরো সুনিশ্চিত করতে ধর্মের বাতাবরণ দিয়ে বলে–'মায়া মানুষের উপর কেহ হাত উঠাইলে তো গজব পড়ে যায়।' মুনশি কৌতূহলবশত ফুলবানুকে–'কে বেশি মারে তোক, তোর মামু না মামি?' এমন জিজ্ঞাসায় সে অকপটে জানায়–

> 'দোনোজনেই মারে।...লাঠি দে মারে, হাত দে মারে, পাও দে মারে– যেখুন যেমুন মন চাহে।'-[ফু.গ./পৃ.১১৪]

'তোক যুদিন মুই বেহা দু– তুই রাজি?'– মুনশির মুখে নিজের বিয়ের কথা শুনে ফুলবানু তেমন লজ্জা পায় না। বরং সে জানতে চায়–'ভাত দিবা পারিবে?' যদি ভাত কাপড় দিতে পারে তাহলে এতে তার কোনো আপত্তি নেই। কারণ–'গেরস্থ ঘরের মেয়েদের বিয়ের কথায় লজ্জা-সংকোচ থাকলেও হাভাতে ঘরের মেয়ের কাছে বিয়ের অর্থ নিশ্চিত ভাত-কাপড় পাওয়া।' এজন্য ফুলবানুকে তার মামি রোজই বলতো–'হারামজাদি একখান ভাতার ধরিবা পারিস না।' মামির এ কথা আর জীবনবাস্তবতা থেকেই সে বুঝতে পেরেছে–বিয়েতে মেয়ে মানুষের পছন্দ-অপছন্দের বালাই নেই। কারণ সে ভালো করেই জানে–'মেয়ে মানুষের বিয়ে হওয়াটাই আসল– জীবনভর খেতে, পরতে পারলেই তার হলো। তারপর যেমন কপাল।' জীবনের দুঃসহ ক্ষুধা-দারিদ্র্য, ভয়াবহ শোষণ-বঞ্চনা ফুলবানুর মতো গ্রাম্য নারীদেরকে অনিবার্যভাবে নিয়তিবাদের দিকে ঠেলে দেয়। ভাতের জন্যই ফুলবানু চৌকিদার বাড়ি কাজ করতে গিয়ে শীতকালে তিন বেলা পান্তা ভাত খেয়েছে। আবার ভোন্দা সরকারের মতো পাকা দাঁড়িওয়ালা বুড়াকে বিয়ে করতে চেয়ে সরকার গিন্নির হাতে পিটুনি খেয়েছে। তাই মুনশি যখন নিজে বৃদ্ধ হয়েও এবং ঘরবাড়ি না থাকার পরও বিয়ে করার কথা বলে, তখনও ফুলবানু অকপটে বলে–

> 'মুই উসব জানো না–মোর ভাত পাইলেই চলে।'-[ফু.গ./পৃ.১২০]

মুনশি ফুলবানুর ভবিষ্যৎ জীবনের অনিবার্য দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার কথা ভেবে তাকে পালাবার পরামর্শ দিলেও সে ভয় পায় না বরং শুধু জানতে চায়–'ক্যানে উমরা ভাত দেয় না?...ভাত তো দিবে মহাজন, না কী?' মুনশি তাকে সতর্ক করতে 'ভাত দিবে, কিন্তুক নষ্ট করে দিবে তোক–আঁকুয়ারী বেটি তুই, তোক শেষ করে দিবে।'– বললেও সে পালাতে চায় না। তাছাড়া তার পালাবার মতো জায়গাও অবশিষ্ট নেই। কারণ একমাত্র আশ্রয় যে-মামার বাড়ি; সেখানে ফিরে গেলেও তাকে পুনরায় 'ক্ষুধা আর লাঞ্ছনা ঘেরা খাঁচাটার ভেতর গিয়ে' ঢুকতে হবে। এসব ভেবে ফুলবানুর ভয়ানক ক্লান্তি লাগে এবং রাস্তার ধুলোর ওপর বসে পড়ে। পরে ধীর স্থির কণ্ঠে জানায়–

> 'তমার কথা মুই শুনিবা চাঁহো না–পালায় মুই কুনঠে যামু, কারঠে পালামু, কহেন দি মোক...ভোকের জ্বালা আর মুই সহিবা পারো না–ভাত চাহোঁ মুই।'-[ফু.গ./পৃ.১২৯]

ভাতের প্রশ্নে ফুলবানুর এ আপসহীন মনোভাব– তার চরম বুভুক্ষুজীবনের ইঙ্গিতবাহী। 'ঐঠে তোর মরণ, তোর ইজ্জত থুবে নাই'– এ ইজ্জত-সম্মানের কথা শুনেও ফুলবানুর হাসি পায়। জীবন টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে সে ইজ্জতকেও তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাছাড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতায় বিবাহিত জীবনেও তো নারীর (বিশেষ করে গরিব-অসহায় নারীর) এ ইজ্জত-সম্মান সে দেখতে পায় না। তাই সে বিরক্তির সুরে বলে–

‘ইজ্জত কার থাকে কহেন দি? গরীবের বেটির ইজ্জত থাকে? বাপ তো হাউস করে বেটির বিহা দেয়, তারপর?...দুই মাস যাইতে না যাইতেই ভাত নাইরে, কাপড় নাইরে, রোজ ডাংগের বাড়ি খাওরে। বেটিক খেদায় দিলে বাপ স্যালা দোসরা একটা ভাতার ধরায় দেয়–পেট শুকানি আর ডাংগের বাড়ি–দুই তিনটা ছুয়া পরসাইতে পরসাইতে বেটি হয়ে যায় তিন ভাতারি চার ভাতারি–তারপর জানও নাই, ইজ্জতও নাই–মহাজনের বাড়িত তো তাহো জানটা থাকে।’-[ফু.গ./পৃ.১২৯-১৩০]

এ নির্মম সমাজবাস্তবতায় গরিব-অসহায় নারীর জীবনে বিয়ে-ইজ্জত-সম্মানের প্রসঙ্গকে তার কাছে ছেলে খেলার মতো মনে হয়েছে। কারণ ফুলবানু জানে-‘পুরুষমানুষ বিয়ে করলে মেয়ে মানুষের পেটের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা হয়। বাকি যা কিছু হয়, সেগুলো নিতান্তই আনুষঙ্গিক। কী হয় সেটাও তার জানা।...বিয়ে করে ঐ কম্মো করলে ইজ্জত থাকে–আর বিয়ে নিকে না করে ঐ কম্মো করলে ইজ্জত চলে যায়।’ তাই জীবনের প্রশ্নে, অস্তিত্বের প্রশ্নে ফুলবানু বিয়েকে ও ইজ্জতকে ভয় পায় না বরং ‘তার ভয় হয় আজন্মকালের ক্ষুধাকে।’ পেট ভরে ভাত পাইলে ইজ্জত যাবার কষ্টকে এবং পিটুনির কষ্টকেও তার কষ্ট বলে মনে হবে না। তাই–‘মহাজনের বাড়িত তুই যাইস না–গেলে তোর শরীল খান ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।’ মুনশি এমন কথা বললেও ফুলবানু ভয় পায় না। বরং প্রতিউত্তরে বলে–‘তো তমরা আছেন কুন ক্যামে?’ মুনশি তার চাকর-নফর হিসেবে নিজের অক্ষমতার কথা জানালেও ফুলবানু তাকে কটাক্ষ করে বলে– ‘নফর থাকেন ক্যান? ঐকাম ছাড়ে দেন।...তোমার দশাও দেখোঁ হামারই মতন।’ আসলে সামন্ত সমাজকাঠামোর শোষণ-বঞ্চনা-অসহায়ত্ব নারী-পুরুষকে নিজস্ব সত্তা ভুলিয়ে সবাইকে ‘দাস’-এ পরিণত করে। সার্বিক বিবেচনায় ফুলবানু ‘দু’মুঠো ভাতের জন্য’ মহাজন বাড়ি যেতে নিজের শরীর ও মনকে তৈরি করে। কারণ ‘জঠরের ক্ষুধা জন্মাবধি তাকে ঠেলে নিয়ে চলছে বয়সের দিকে।’ আর এ জঠরজ্বালা তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও অস্তিত্বকে এমনভাবে গ্রাস করেছে, সে যে-একজন নারী– তাও সে মাঝে মধ্যে বেমালুম ভুলে যায়। মহাজন বাড়ির নিকটে এসে দুজনে নকশালপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ভাগ্যগুণে মুনশি বেঁচে গেলে এবং ডানপায়ে জখম নিয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তার ধার বেয়ে উপরে উঠে আসামাত্রই সে দ্রুত মুনশিকে বুকে আগলে নেয়। এ পর্যায়ে ফুলবানু যেন যৌবনবতী কোনো নারী নয় বরং আহত-অসুস্থ বৃদ্ধ মুনশিকে সেবাযত্ন ও শুশ্রূষা করতে করতে সে পরিণত হয় স্নেহময়ী আদিম মাতৃসত্তায়। তরুণী অবয়ব মুছে গিয়ে দেখা দেয় চিরন্তন জননীরূপে।[১০] তাই দেখা যায়–

‘মুনশির দাড়িভর্তি মুখ ফুলবানুর কুমারী বুকে অনেকক্ষণ ধরা থাকে। কাঁদতে কাঁদতে সে আদিম মাতার মতো মুনশির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে যায়–নানা ডরাইস না, তুই বাঁচে যাবো–তোর শরীলত বল হোবে–তোর কুনো চিন্তা নাই, মুই তোর ঠে আছোঁ।’-[ফু.গ./পৃ.১৪৮]

কিশোরী ফুলবানু বয়স্ক মুনশিকে শুধু সাময়িকভাবে সাaনাই দেয় না, বরং দীর্ঘদিনের জন্য সেবা-শুশ্রূষার, রান্না-বান্নার, দেখভালসহ তার পরবর্তী জীবনের দায়িত্বভারকেও নিজ কাঁধে তুলে নেয়। তাই ফুলবানু কিছুক্ষণ পূর্বের–‘মরণ আর জীবন, ফুল আর উদরভর্তি খিদে’র চিন্তাস্রোত পেড়িয়ে ‘পথ দেখানো বুড়ো লোকটা’-কেই বেছে নেয়। তাই সকাল হবার আগেই গাছের একটি ভাঙা ডাল মুনশির হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাকে টেনে তোলে। কুয়াশা আর মেঘ কেটে যাওয়া সকালে দুই মানব-মানবী ‘সিধা রাস্তা ধরে’ চলতে শুরু করে।

ফুলবানু চরিত্রের প্রধান দিক তার অকুণ্ঠ জীবনবাদিতা। খোঁপায় লাল মাদারের ফুলের শোভা নিয়ে ফুলবানু যেন উচ্চকণ্ঠে জীবনের জয়গান ঘোষণা করে। তাই ভাঙা ডাল ধরে আলা মুনশি ও ফুলবানুর উঠে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক বিম্বিত করেছেন এদের জীবনমুখিতা ও গভীর অস্তিত্বচেতনার কথা।[১১] মহাজন বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে সে; তাই বৃদ্ধ আলা মুনশির সঙ্গে তার অনিশ্চিত যাত্রা শুরু। রূঢ় মামার বাড়ি থেকে মহাজন বাড়িতে যাত্রার দীর্ঘপথটি যেন ফুলবানুরই দুঃখদীর্ণ জীবনের কড়চা। পথে যেতে যেতে ফুলবানু পাঠ করে তার জীবনকাব্যের মলিন পাতা।[১২] *ফুলবানুর গল্প* আসলে তৃণমূল-আশ্রয়ী দেহাতী নারীর টিকে থাকার গল্প; তার সংগ্রাম ও অপরাজেয় জীবনপিপাসার গল্প। বিয়ের অর্থ যে নারীর কাছে দু’বেলা পেটভরে ভাত খাওয়ার নিশ্চয়তা এবং নিশ্চিত মাথা গোঁজার ঠাঁই– ফুলবানুও তেমনি নিরস্তিত্বপ্রায় ছিন্নমূল এক নারীর প্রতিনিধি।

ফুলবানুর গল্প অংশের কোনো পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই। এর কাহিনি সহজ-সরল হলেও বিষয় বর্ণনা দিতে ঔপন্যাসিক বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে আলা মুনশি ও ফুলবানু চরিত্রের চৈতন্যপ্রবাহরীতি, চিত্রকল্প ও পরাবাস্তববাদেরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে শওকত আলী যে-মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন–তা একান্তই অসাধারণ। এর কাহিনি এক রাতে সংঘটিত হয়েছে এবং রাস্তায় শুরু হয়ে রাস্তাতেই শেষ হয়েছে। এ রাস্তায় চলা গল্পের হাত ধরে লেখক শুধু গ্রামীণ জোতদার-মহাজনি শোষণ, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, আকাল, জবরদখল আর নারী-লালসার চিত্রই উন্মোচিত করেননি, সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, যাত্রাপালা, পান-তামাক, মাজার জিয়ারত, সংস্কার-বিশ্বাস ও শ্রেণিশত্রু খতম-

আন্দোলনের মতো বিষয়কেও সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসের এ অংশের কাহিনি *ফুলবানুর গল্প* হলেও শওকত আলীর মানস নায়িকা হয়তো নুরবানু। এই নুরবানুই শোষণের বৃত্ত ভাঙার সাহস দেখিয়েছে। সে শুধু নিজেই প্রতিবাদ করেনি বরং স্বামী মুনশিকেও প্রচণ্ড ঘৃণা-ধিক্কার দিয়ে তার মনের দাসত্বকে আঘাত করে ভেতরকার ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করেছে। তাই এ অংশের নাম *ফুলবানুর গল্প* হলেও প্রকৃত ফুলবানুকে এখানে পাওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক এ ফুলবানুর মধ্যে একাত্ম করে দিয়েছেন সমকালীন হাজারো ফুলবানুকে। আকলিমা, টুলটুলি, আনু বিবি, মোমেনা বা রোমেনা– এমন অসংখ্য ফুলবানু একইভাবে নিরুপায় হয়ে মহাজনদের ভোগের সমুদ্রে প্রাণ দেয়। লেখক তাই নুরবানুকে সৃষ্টি করেছেন এসব ফুলবানুদের বাঁচাবার জন্য।[১৩] তবে নুরবানুর মধ্যে লেখক যেমন জীবনবেদ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন, তেমনি ফুলবানুর মধ্যেও জ্বালিয়েছেন ভালোবাসার দেউটি। এমন প্রতিবাদ, প্রেম আর প্রাণময়তাকেই লেখক হয়তো এ শ্রেণির মানুষের সম্বল মনে করেছেন।

সম্বল উপন্যাসের *গীতারাণীর গল্প* ও *ফুলবানুর গল্প* নামক দুটি অংশকে আলাদাভাবে পাঠ করলে দুটি ভিন্ন কাহিনি, চরিত্র, ভাষা ও আবহের ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। তারপরেও লেখক স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী এ দুটি গল্প বা কাহিনিকে একত্র করে *সম্বল* নাম দিয়ে একটি উপন্যাসে রূপদান করেছেন। এ দুটি গল্পকে এক করে দেবার সূত্রটি হলো–দুটি গল্পই শোষক আর শোষিতের গল্প। দুটি গল্পেই চূড়ান্ত শোষণে অসহায়-উপায়হীন মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন বা সম্বল অনুসন্ধানই বড় হয়ে উঠেছে।[১৪] *গীতারাণীর* গল্প-তে গীতার সাহস ও প্রতিবাদে বিন্দুবাসিনী ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর *ফুলবানুর গল্প*-তে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে ফেরা অসহায় ফুলবানু মুনশির ভালোবাসাকে সম্বল হিসেবে বেছে নিয়েছে। এ পর্যায়ে গীতারাণীর ছায়া নুরবানুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ঢ্যাঙা সবদরের প্রেম নুরবানুর প্রতিবাদের সম্বলকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ সমাজকাঠামোতে পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ মহাজন-জোতদারদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কারো টু শব্দ করার সাধ্য থাকে না। এমন সমাজশাসন, শাস্ত্রাচার ও পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে গীতারাণী, বিন্দুবাসিনী, নুরবানু ও ফুলবানুর মতো নারীরা যে-প্রতিবাদের দুঃসাহস দেখায়–তার মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। দুটি গল্পই শেষ হয়েছে এক ধরনের আশাবাদ দিয়ে। আবার দুটি গল্পই রাস্তায় শুরু হয়ে রাস্তায় শেষ হয়েছে। এ রাস্তায় তারা আবিষ্কার করেছে জীবনচলার পথ ও পাথেয়, দেখেছে বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন। শওকত আলী অবশ্য এর সঙ্গে সাহস ও প্রতিবাদকেও মূল সম্বলের সঙ্গে যোগ করে বেঁচে-বর্তে থাকার সম্বলকে মজবুত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সমাজের প্রতি থাকা এক ধরনের অঙ্গীকার ও অকৃত্রিম দরদ দিয়ে তিনি গ্রামের নিঃসম্বল মানুষের অনালোকিত ক্রমজটিল অসহায়ত্বের এক সরল আখ্যান রচনা করেছেন। এ সারল্যই *সম্বল* উপন্যাসের দীপ্তিময় প্রান্ত।

নাঢ়াই

শওকত আলীর *নাঢ়াই* (২০০৩খ্রি.) উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট সংযোজন। লেখক এ উপন্যাসে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গ্রাম-বাংলার কৃষকদের অধিকার আদায়, বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও বিদ্যমান শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে যে-সঙ্ঘশক্তির রূপায়ণ করেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ 'নাঢ়াই'[১৫]-এর প্রতীকে তিনি মূলত কৃষকদের ধানের লড়াই ও অধিকার আদায়ের ইতিকথাকেই বলতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক উত্তরবঙ্গের কৃষকদের তেভাগা-আন্দোলন ও ইতিহাস উন্মোচিত করলেও এ ইতিহাসকে তিনি বিন্যাস করেছেন জাতীয় আন্দোলন তথা ইংরেজ শাসিত ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অনুষঙ্গে। জাতিগত ঐক্যের প্রশ্নকেও ঔপন্যাসিক এখানে উপেক্ষা করেননি। একদিকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, অন্যদিকে তীব্রতর হয়ে ওঠা আধিয়ার শ্রেণির তেভাগার লড়াই– এ কথাবস্তুর উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সঙ্ঘশক্তির ওপর গড়ে ওঠা তেভাগা-আন্দোলন নানা কারণেই বিশিষ্ট ও স্মরণযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫খ্রি.) শেষ হবার পর থেকেই ভারতবর্ষে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন জোরদার হয়। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে–এই ঘোষণায় জমিদাররা খাসজমি দখলের প্রতিযোগিতায় নামে। ফলে অসহায় গরিব প্রজা ও কৃষকের বহু জমি জমিদাররা গ্রাস করে। অন্যদিকে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে অভাবের তাড়নায় কৃষকরা যে-সমস্ত জমি জমিদার-জোতদারদের হাতে তুলে দিয়েছিল তা ফেরত পাবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই জোতদারদের জমির পরিমাণ একদিকে যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে কৃষকরা তাদের জমি হারিয়ে ক্রমশই নিঃস্ব, বর্গাচাষি, আধিয়ার ও ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সনের এক জরিপে দেখা যায়, সারা বাংলায় জমিদারের সংখ্যা ছিল দুই হাজার এবং এদের মধ্যে দুইশত বারোটি ছিল বড়

জমিদার পরিবার। আর জোতদারের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।[১৬] ভূমিহীন কৃষকরা জোতদারদের জমি আবাদ করে দুই প্রথায় জমিদারকে খাজনা দিত। এক প্রথানুসারে কৃষকদের মোট উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দিতে হতো; যার নাম ছিল আধি, বর্গা বা ভাগচাষ। আর অন্য প্রথানুসারে একটি নির্ধারিত মান ফসলে জমির খাজনা দিতে হতো; যার নাম ছিল টঙ্ক, গুলা, সাঁজাভাগ, খাড়াফাগ, মকরাবাগ প্রভৃতি।

যদিও জোতদারদের জমির বীজধান বা বিছন সরবরাহ, জমি চাষের মূল্য, সারের মূল্য ও ধানকাটা-মাড়াই-ঝাড়াই বাবদ কিছু অর্থ কৃষকদের দেবার শর্ত থাকতো। কিন্তু জোতদাররা এসব তো দিতই না বরং কৃষকের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে বিচিত্র উপায়ে প্রতারণা ও শোষণের আশ্রয়ে এদেরকে সর্বস্বান্ত করতো। ধার করা সুদের টাকা উসুল করতেই কৃষকদের নাভিশ্বাস ওঠতো। ফলে জমির ধান তারা তো পেতই না, উপরন্তু ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি, জমি-জিরাত, গরু-ছাগল, ক্ষেত্রবিশেষ স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে নিজের জীবনও হারাতো। কারণ জমির খাজনা ও ফসল করের বাইরেও জোতদারদের আরোপিত মার্চা তহুরী, খোলানচাঁহা, মহলদারী, গোলাপূজা, বরকন্দাজী, সন্ন্যাসী, হাতিখোয়া, মাছখোয়া, পার্বণী, গাজন, থিয়েটার– প্রভৃতির নামে প্রায় একান্ন ধরনের করের ফাঁদে পড়ে কৃষকের নিজের বলতে কিছুই থাকতো না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ অভিশপ্ত কালাকানুন ও শোষণের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বাংলার কৃষকরা ক্ষেপে ওঠে। শোষক জমিদার-জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে 'জমি যার ফসল তার, আধি নয়- তোভাগা চাই'– এমন শ্লোগানে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমে উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতেও তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সন অবধি এ তেভাগার লড়াইয়ে অবিভক্ত বাংলাদেশের উনিশটি জেলার প্রায় ষাট লক্ষ কৃষক অংশগ্রহণ করে। চারিত্রিক দৃঢ়তার দিক থেকে এ তেভাগার লড়াইটি ছিল সবচেয়ে বিস্তৃত ও শক্তিশালী। এ লড়াইয়ের প্রথমশ্রেণির নেতা ছিলেন কৃষ্ণবিনোদ রায়।[১৭] কৃষকদের প্রজন্মব্যাপী বঞ্চনার এ আক্রোশ বিদ্রোহ ও গণআন্দোলনে রূপ নেয়। তৎকালীন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।[১৮] এতে মুসলমান-রাজবংশী-সাঁওতাল কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ফসল কাটার সময় হলেই এ আন্দোলন লড়াইয়ে রূপ নিতো। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগপন্থী জমিদার-জোতদাররা পুলিশের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও ভাড়াটে লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে কৃষকদের নির্যাতন, খুন ও গুম করতো। ফলে এ তেভাগা-আন্দোলন এত ব্যাপক, বিস্তৃত, মারমুখী আর জঙ্গি ছিল যে; বাংলায় সিপাহিবিদ্রোহের পরে কৃষকদের মধ্যে এমন আলোড়ন আর দেখা যায়নি।[১৯] শওকত আলী শৈশবে এ তেভাগা-আন্দোলন দেখেছেন এবং এর তাপ-চাপ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরগাঁওয়ে তিন বছর (১৯৫৯-১৯৬১ খ্রি.) চাকরিসূত্রে তিনি তেভাগা-আন্দোলনে জড়িত কৃষকদের সংস্পর্শ ও ভাববিনিময়ের দ্বারা এ বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। এরও প্রায় চার দশক পরে তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এ তেভাগা-আন্দোলন নিয়ে *নাঢ়াই* নামক উপন্যাসটি নির্মাণ করেন। স্বভাবতই বাড়তি মনোযোগ, অভিনিবেশ, অনুসন্ধিৎসা ও আন্তরিকতা দিয়েই শওকত আলী বাংলার দুঃখী-দরিদ্র কৃষকের জীবনকথা, জীবনযন্ত্রণা ও জীবনযুদ্ধকে বাস্তবমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন।

সামন্ত সমাজকাঠামোর নীলদংশনে গ্রামের কৃষককুলের জীবন বিচিত্র শোষণ-বঞ্চনায় ক্ষতবিক্ষত হয়। ঠাকুরগাঁওয়ের মাহীগঞ্জের দরিদ্র কৃষকদম্পতি ফুলমতি-আহেদালির জীবন-সংগ্রামের নানা অনুষঙ্গে এসব বিষয়-আশয় পল্লবিত হয়েছে। প্রকৃতি প্রসন্ন থাকলে, হালের গরু ঠিক থাকলে, আবাদ যথাসময়ে হলে এবং স্বামী-স্ত্রীর গতর ঠিক থাকলে ফুলমতির সংসারে অভাব থাকে না। গত বছর ভাদই ধান ও পাটের আবাদের সময় হালের একটি বয়েল (বলদ) মারা যাওয়াতে আহেদালি ভীষণ বিপদে পড়ে। তখন প্রতিবেশী সবুরাতুর বলদ ধার করে কোনোমতে আবাদি জমি চাষ করে। কিন্তু গতবারের ন্যায় এবারও আহেদালির একমাত্র বলদ 'বাহাদুর' অসুস্থ হলে সে দিশেহারা হয়ে ওঠে। তাই ফুলমতি বলদকে কবিরাজ দেখানোর জন্য পাঠায়। কিন্তু গরুর খারাপ অবস্থার কথা শুনেই আহেদালি কবিরাজের দুহাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে জানায়–'দাদা এমন কথা না কহেন, মোর গোরুটাক বাঁচান, ঐ গোরুটায় হামার সম্বল, ঐটা মরলে মুইও বাঁচিম নাই'। আহেদালির এ কাকুতি-মিনতির পেছনে যৌক্তিক কারণও ছিল। কেননা–'গরিব গিরস্থের ঘরে গোরু ছেলেমেয়ের মতোই আদরের জিনিস...গোরু হলো কিরষাণের জীবনসঙ্গী। যার গোরু নেই, সে কিরষাণ হতে পারে না।' কৃষকের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় বিবি-বাচ্চার চেয়েও মূল্যবান হয়ে ওঠে। কবিরাজের মুখে গরুকে বিষ খাওয়ানোর কথা শুনে আহেদালির মনে ভয়-সন্দেহ দাপাদাপি করে। কারণ–

> 'গোরুকে বিষ খাওয়ানো...কিরষাণ গিরস্থকে পথে বসানোর এ এক প্রাচীন শয়তানি।...যদি কিরষাণের জীবন শেষ করে দিতে চাও, তাহলে তার হালের বলদ খতম করে দাও। এক গেরস্তের ফসল আবাদের ক্ষমতা যদি কমে যায়, তো অন্য গেরস্তের সেটা বাড়ে।'-
> [শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৯ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৮, হালগিরস্তি/পৃ. ২১৮-২২০]

ফলে আহেদালির সন্দেহের তীরটা একেকবার প্রতিবেশী সবুরাতু, সবদরালি, মৎলেব ও মুনশির দিকে যায়। আধির জমি ছাড়িয়ে নিতেই এরা এসব করতে পারে। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও এ ঘটনার সঙ্গে অমিয়ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে। চামড়ার ব্যবসায়ী কফিলুদ্দির কাছ থেকে বারোটি গরুর চামড়া সরবরাহের চুক্তি বাবদ দাদন নেয়া টাকার জন্য মাধাই বায়েন কলাপাতায় বিষমাখানো ভাত দিয়ে বুধেডাঙার গরিব কৃষক রজব আলী সান্দারের গরুসহ চিকন্দি গ্রামের মোট চারটি গরু মেরে ফেলে। কবিরাজের ব্যবস্থাপনাতে এ যাত্রায় আহেদালির বলদ বেঁচে উঠলেও আহেদালি নিজেকে বাঁচাতে পারে না। আবাদের সময় কারো বলদ ধার না পেয়ে আহেদালি জোরবর্ষণে গরুর জোয়ালের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে জমি চষে। এভাবে এক বিঘার মতো আউশের আবাদ করেই আহেদালি জ্বরে পড়ে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। স্বামীর এ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ফুলমতি প্রকৃত অর্থেই অথৈ সাগরে পড়ে এবং তার জীবনযুদ্ধ শুরু হয়। গ্রামীণ সমাজবাস্তবতায় দেখা যায় সবুরাতু, সবদরালি, মৎলেব ও মুনশির মতো প্রতিবেশী– যারা আহেদালি-ফুলমতির সংসারকে ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্র ও কুৎসা রটনা করতো; আবার তারাই আহেদালিকে কবরস্থ করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, ঐতিহ্য ও লোকাচার পালন করতেই পিতৃহারা কিশোর আবেদালিকে দিয়ে তারা জনসম্মুখে বলায়–

> ‘পঞ্চজনা, দাদা চাচা মামু নানা খালা ফুফু ভাই বহিন বেরাদর, মোর বাপের যুদিন কুনো দোষ হয়া থাকে তো তোমরা মাপ করে দেন।...মোর বাপের কাহারও ঠে যুদিন ধারদেনা থাকে, তো মুই তার দায়িক– সাবালক হয়া মুই সব ধারদেনা শোধ করে দিমু।’– [হালগিরস্তি/পৃ.২২২-২২৩]

এভাবে গ্রামীণ সমাজকাঠামোতে ধর্মের নামে, লোকাচারের নামে, সামাজিকতার নামে– সমাজ ও ধর্ম যুগ যুগ ধরে শোষণকে জিইয়ে রাখে। এর মূল্য-মর্যাদা দিতে গিয়ে অসহায় ফুলমতি-আবেদালিদের মতো হাজারো গরিব কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হয়। স্বামীর শোকে ফুলমতি তেমন কাঁদারও অবসর পায় না। পেটের ক্ষুধা, ছেলের ভবিষ্যৎ আর ঘর-সংসার টিকিয়ে রাখতেই সে সংসারের কাজে মন দেয়। চল্লিশার দিন শেষ কান্না কেঁদে ফুলমতি তার শেষ সম্বল সাতাশ একর জমি, ষোলো কাঠা আধির ধান, পাঁচটি হাঁস, চারটি মুরগি, একটি বলদ আর তিনটি বাচ্চাসহ এক দুধেল বকরি নিয়ে জীবনযুদ্ধে নামে। প্রতিবেশী জয়গুনের মা, সবুরাতুর বউ, গোলবানু, সবুরাতুর বিধবা বোন আকিমন, পোহাতুর মা ও প্রধানবাড়ির দাসী আমেলার মা ফুলমতিকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয় আর বলে–

> ‘এ্যাম্নে কয়দিন চলিবে? জওয়ান রাঁঢ়ি, একেলা ক্যাম্নে থাকবো? মুই কহোঁ, দেখে শুনে তুই একখান ভাতার ধরেক।’- [হালগিরস্তি/পৃ.২২৫]

একজন পুরুষ মানুষ ছাড়া যে-তার গতি নেই–একথা ফুলমতি নিজেও বুঝে এবং দিনে দিনে টেরও পায়। কারণ প্রতিবেশী সবুরাতু, দেলবর মণ্ডল, মুনশি ও দূর সম্পর্কের দেবর সুজাত আলী (আহেদালির ফুপাতো ভাই) দিনে-রাতে ফুলমতির কাছে আসে। অযথা গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে বিয়ের আকুতি ও অশ্লীল ইঙ্গিত দেয়। আবার জোয়ান ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে বুড়ো-আধাবুড়োদেরও ফুলমতি বাড়ির সামনে দিয়ে লোভী দৃষ্টি নিয়ে যেতে দেখে। কোনো কোনো দিন রাতের বেলা দরজায় করাঘাত করে চাপাগলার ‘ফুলু, ফুলমতি, দুয়ার খুল।...ও মোর ফু-ইল, তোর মনত্ কি মায়া দয়া নাই!’– এমন আকুতিও শোনা যায়। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ফুলমতি একেকদিন এসব নাগরদের লক্ষ করে গামলাভর্তি গরম পানি ছুঁড়ে দেয়। আর ভবিষ্যৎ বিপদ বুঝেই আত্মরক্ষার প্রস্তুতিস্বরূপ বিছানার কাছেই একখানা দা আর কুড়াল রাখে। তবে বারো কাঠা হেঁউতির ধান, খাসি বিক্রির পৌনে চার টাকা আর মুরগি বেচা সোয়া দুই টাকা পেয়ে ফুলমতির আপাতত ভাতের চিন্তা না থাকলেও আসঙ্গলিপ্সু লম্পটদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার চিন্তাই বড় হয়ে ওঠে। তবুও সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায়– ‘যত কিছুই হোক, তাকে বেঁচে থাকতে হবে।’ তাই ফুলমতি–‘হামার মিঠাভাবীর হাতের পানি খানও বড়ো মিঠা’ বলা সুজাত আলীর এমন কৌশলী কথাতেও সে বিভ্রান্ত হয় না। আবার প্রতিবেশী আকিমন ও পোহাতুর মায়ের বলা– ‘ফুলু বহিন, বুঝে শুনে চলিস, তোর একখান বসত’ছে, একখান আবাদি জমিন’ছে, ঐ বসত আর জমিনের লালচে মানুষ মিঠা কথা কহে তোর মন ভুলাবা চাহিবে’– এমন কথাও ফুলমতির মনে ধরে। তাই সে বলে–

> ‘সবায় মোর পাছত নাগিলে মুই কুনঠে যাঁও? বাপ-ভাই কেহ নাই যে অমারঠে যায় থাকিমো–ইদিক ঘরত যা ছিল, সব তো খায় যাছোঁ আগিলা...মুই খালি এইটা বুঁঝো যে মোক হুঁশিয়ার থাকিবা হোবে।’-[হালগিরস্তি/পৃ. ২৩০]

চর্যাপদ-এর ‘অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী’-র মতো ফুলমতিও প্রথমে লম্পট পুরুষদের হাত থেকে নিজের রূপ-যৌবনকে রক্ষা করতে সতর্ক হয়। এ জন্য অনেকে আবেদালিকে মহাজন বাড়িতে রাখালির কাজে দিয়ে সেখানেই থাকা-খাওয়ার পরামর্শ দিলেও ফুলমতি রাজি হয় না। কারণ এতে ছেলের অনুপস্থিতিতে লম্পট পুরুষেরা আরো সুযোগ পাবে। তাই প্রথমত ফুলমতি ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করে। মাঠে বলদ চড়িয়ে আর পাঠশালায় পড়ে আবেদালি তার নিজের কাছেই থাকে। দ্বিতীয়ত ফুলমতি পেটের ক্ষুধা মেটাতে মহাজন বাড়ি থেকে ধান আনে, ধান ভেনে ও চিরাকুটে বাড়তি উপার্জনের পথ বের করে। সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে এ কাজ মহাজন বাড়িতে না করে নিজের বাড়িতেই করে। কারণ–

‘জীবন তাকে এভাবেই কাটাতে হবে। অন্তত আরও বছর পাঁচেক; আবেদালি গায়ে-গতরে বড়সড় হয়ে উঠলে আর একটা বলদ কিনতে পারলেই তার আর কোনো চিন্তা থাকবে না।’-[হালগিরস্তি/পৃ. ২৩৫]

এরকম লক্ষ্য নিয়েই ফুলমতি কোমরে আঁচল বেঁধে জীবনযুদ্ধে নামে। কিন্তু কদরালি মহাজনের বড় ছেলে লম্পট সদরালির নজরে পড়ে সে চিন্তিত হয়ে ওঠে। রাতের বেলা প্রস্তাব নিয়ে আসা সুরুজ মিয়ার শরীরে ফুলমতি গরমপানি ছুঁড়ে দেয়। এ ঘটনার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী সবুরাতু ফুলমতিকে বলে–

‘সুরুজ মিয়া বড়া হারামি লোক, কুনদিন যে কুন ক্ষতি করবে তার কুনো হিসাব পাত্য নাই।...কুনদিন তমাক উঠায় লে যাবে, কুছু কহা যায় না–ইজ্জত গেলে আর এই গাঁওত থাকিবা পারবেন তমরা?...যুদিন তমার ঘরত আগিন লাগায় দেয়? তো ঐ দাও দে কী করিবেন তুমরা?’– [হালগিরস্তি/পৃ.২৫১]

এমন কথায় ফুলমতি যথার্থই দুশ্চিন্তায় পড়ে। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে ঘরবাড়ি, সন্তান ও গরু-ছাগলের আসন্ন বিপদের চিন্তা জেঁকে বসে। নির্মম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেকে ও সংসার রক্ষায় কেবল দা-কুড়ালকেই তার আত্মরক্ষার শেষ সম্বল ভাবতে মন সায় দেয় না। বরং জীবনের হিসেব মেলাতে সে একটি জিনিসের অভাববোধ করে। তার মনে হয়–‘ মেয়েমানুষ বড় দুর্বল, পুরুষমানুষ পাশে না থাকলে মেয়ে মানুষের বেঁচে থাকাই মুশকিল।’ এ অভাব সে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে অনুধাবন করছিল। কারণ শরীরী প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও ‘পুরুষমানুষকে দরকার হয় মেয়েদের বেঁচে থাকার জন্য, দরকার হয় মনে জোর পাবার জন্য।’ আসলে পুরুষ ছাড়া, পুরুষ অভিভাবক ছাড়া, পুরুষের বল-ভরসা ও আশ্রয়-প্রশ্রয় ছাড়া সমকালীন সমাজে কোনো নারীর একাকী জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না। অবসর সময়ে আয়নাতে নিজের গায়ের রঙ, বুক, জাং আর পেছনটার উথলে ওঠা ভাব দেখেও ফুলমতি ভয় পায়। তাই মধ্যরাতের ঘরবাড়ি-বাগ-বাগিচায় আছড়ে পড়া কান্দরের হুহু বাতাসে জেগে থাকা ফুলমতি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নারীলোলুপ শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক হয়। সে নিজেই নিজের মনের পাহারাদার হয়ে ওঠে। এমতবস্থায় ফুলমতি সতর্কতার সঙ্গে নিজের জীবনসঙ্গী বাছাইয়ে উদ্যোগী হয়।

আসলে ফুলমতি নিজের ঘর-সংসার ঠিক রেখে, জমি জিরাত আবাদ করে এবং একমাত্র ছেলেকে সঙ্গে রেখে জীবনসঙ্গী বাছাই করতে চায়। যাতে মা-ছেলের সম্পর্কও ঠিক থাকে আর সংসারও বিনষ্ট না হয়। ফলে পোহাতুর মায়ের– ‘আলো মাগী...তুই বরং একটা ডাংগুয়া ধর’ এমন কথাতেই সে বেশি আশ্বস্তবোধ করে। কারণ কমবয়সী ডাংগুয়া (ঘরজামাই) বেছে নিলেই সে-লোক– ‘ফুলমতির বাড়িতে থাকবে, সংসারের দায়িত্ব পালন করবে–কিন্তু মালিক হবে না কখনো–মালিক থাকবে শুধু আবেদালির মা-ই আর অন্য কেউ নয়।’ এ ব্যবস্থাপনাটি গ্রহণে ফুলমতির দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। যা পার্শ্ববর্তী আদিবাসী মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায়নেরও ইঙ্গিতবাহী। তাই হাটের দোকানদার গাইবান্ধার শৌখিন মালেক মিয়াকে প্রথমে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে মালেকের টাকার প্রতি লোভ, আধিপত্যকামী মনোভাব আর কামকাতর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে তাকেও হিসেব থেকে বাদ দেয়। কারণ ফুলমতি এই বোধে উপনীত হয় যে–

‘জীবনটা তো তার, সংসারটাও তার, ঘরবাড়ি জমি সন্তান, সবই তার। আর সবই তো বেঁচে থাকার জন্য দরকার–তাকে তো বাঁচতে হবে। জীবনতো আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।’-[হালগিরস্তি/পৃ.২৫৩]

এ বোধই ফুলমতিকে ব্যক্তিত্বময়ী, সত্তাসন্ধানী ও প্রচণ্ড জীবনবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে। তবে মালেক দোকানদারের সহকারি গজুয়া (হাবাগোবা) কুতুবালি তার মাথার দশসেরী ধানের বস্তা নিজেই মাথায় নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এমন সরল-সোজা, এতিম, অসহায়, পরোপকারী আর শক্ত-সামর্থ্যবান কুতুবালিকেই ফুলমতি ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী হিসেবে ভাবে। এসময় ফুলমতিকে মহাজন বাড়ির বাঁদি আমেনার মেয়ে মোমেনা এসে সদরালির বিষয়ে সতর্ক করে। জীবনের প্রতি এমন অশনিসংকেত পেয়ে ফুলমতি চিন্তিত হয়। তবে এ ভাবনাও তার মনকে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করতে পারে না। কারণ উঠানে শালিকছানা মুখে নিয়ে আসা এক দাঁড়াশ সাপ দেখে হাঁস-মুরগি চেঁচাম্যাচি করলে ফুলমতি সামনে আসে। শালিকছানাকে গিলতে ব্যস্ত সাপটাকে দেখে–

‘ফুলমতির রাগ হয়।...সে একখানা বাঁশের লম্বা টুকরো দিয়ে বেড়ার গায়ে বাড়ি মারে আর তাতে সাপ ছানাটাকে মুখে নিয়েই পালাতে চায়। দ্বিতীয়বার আরো জোরে আঘাত করে ফুলমতি, এবার কাজ হয়। মুখের শিকার ফেলেই সাপটা পালায়।’-[হালগিরস্তি/পৃ. ২৫৭]

সাপকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে ফুলমতি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা পরনারী ও পরসম্পদ গ্রাসে উদ্যত সাপরূপী লম্পটদের মাড়িয়ে যাবার এক দুঃসাহসও অর্জন করে। এমন পরিস্থিতিতে ফুলমতির জন্য আরেক দুঃসংবাদ ধেয়ে আসে। প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় বলদ নিয়ে আবেদালি বাড়িতে না ফেরায় সে নানা রকম আশঙ্কা করে। সে পাগলের মতো পাড়া প্রতিবেশীদের খবরটা দিয়ে সাহায্যের জন্য বড় মহাজনের বাড়ি যায় । সবাই মুখে মেকি সান্ত্বনা

দিলেও কেউ আন্তরিক কোনো পদক্ষেপ নেয় না। বরং প্রতিদ্বন্দ্বী মুনশি ধর্মীয় ফতোয়া দিয়ে একে শয়তান-জ্বিন-ভূতের কারসাজি বলে প্রচার করে। আর গ্রামবাসীকে বিভ্রান্ত করতে স্বভাবসুলভকণ্ঠে বলে–

> 'যে ছুয়ার মায়ের উপর শয়তানের আসর হয়, তার উপর যদি গজব না লামে তো কার উপর লামিবে, তমরায় কহেন? বেওয়া মায়া-মানুষ, কিন্তুক পর্দা নাই, পুশিদা নাই, হাটত যায়, বাজারত যায়, ঐ মায়ের এ তো ব্যাটা।'-[হালগিরস্তি/পৃ. ২৬০]

তবে কুতুবালির তৎপরতায় আবেদালিকে জঙ্গলে হাত পা বাধা অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে মেলে বলদ বাহাদুরকেও। ফুলমতি বুঝতে পারে তাকে শায়েস্তা করতেই মহাজনপুত্র সদরালি এ কাজটি করিয়েছে। তবে আশাভঙ্গের কারণে তাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে কুতুবালির ওপর। কুতুবালি ফুলমতির বাড়ি আসে এবং আবেদালির দেখভাল ও সেবা-শুশ্রূষা করে। এ নিয়ে প্রতিবেশী দেলবর মণ্ডল ও দেবর সুজাত আলীর সঙ্গেও তর্ক-বিতর্ক হয়। তারপরেও ফুলমতি কুতুবালিকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সদরালি, নজিবর ও সুরুজালিরা রসিয়ে রসিয়ে মালেক ও কুতুবালিকে জড়িয়ে ফুলমতির নামে কুৎসা রটায়। কুতুবালির আগ বাড়িয়ে ফুলমতিকে সাহায্য করার অজুহাতে মালেকের দোকানও ভেঙে দেয়। মালেক দোকানদার পুনরায় ব্যবসায় শুরু করতে ফুলমতির কাছে একশো টাকা ধার চাইলে এবং আবেদালির পড়ালেখার দায়িত্ব নেবার আশ্বাস দিলে ফুলমতিও কিছুটা নরম হয়। মালেককে ঘিরে পুনরায় সংসার গড়ার জাল বুনতে বুনতে সে যেন দেখতে পায়–

> 'তার জমিতে লাঙল চলছে, গোয়ালে জোড়া বয়েল বাঁধা, বাড়তি একটা দুধেল গাইও, গাইটা দোয়ানো হচ্ছে, পাশে কোমল বাছুরটিও মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, উঠানে কাটা ধানের পালা–এই রকম একের পর এক ছবি।'-[হালগিরস্তি/পৃ.২৭৪]

ভরাভরান্ত সুখের ঘর-সংসারের জন্য লালায়িত ফুলমতির এ স্বপ্নের জাল বোনাও শেষপর্যন্ত স্থায়ী হয় না। কারণ হাটের দিন মালেক তার বলদ বিক্রির চেষ্টা করলে ফুলমতি ঘৃণায় ও ক্ষোভে মালেকের দিকে তাকায়। আর ঐ মুহূর্তে– 'তার সারা শরীর ঘেন্নায় বিজ বিজ করে ওঠে। মুখে উঠে আসে একদলা থুতু। সে থুঃ শব্দ করে থুতুটা ফেলে প্রথমে, তারপর খদ্দেরের হাত থেকে গরুর রশিটা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নেয়।' প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলমতি নিজের বলদ ও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। আর নিজের বর্তমান-ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা না করে কুতুবালিও ফুলমতির সঙ্গে আসে। এভাবে ফুলমতির বাড়ি কুতুবালির জন্য একটি অস্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে। কুতুবালি সংকোচবোধ করলেও ফুলমতির ধমকে ঘরের বারান্দাতেই সে রাতে ঘুমায়। ঝড়ের কবলে ফুলমতির গোয়ালঘর ভাঙে আর কুতুবালির ডান পা জখম হয়। ফুলমতি শরম-লজ্জা ভুলে কুতুবালির শরীরে রসুনতেল মালিশ করে আর হলুদবাটা কলা পাতা দিয়ে জখম স্থানে লাগায়। এসব নিয়েও গ্রামের মানুষ বদনাম ছড়ায়। তবে ফুলমতি এসব কথা ও কুৎসাকে আমল দেয় না। কুতুবালির অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘর থেকে গরু-ছাগল বের করা, আমগাছের ডাল কেটে লাকড়ি বানানো ও গোয়াল ঘর মেরামত করা দেখে ফুলমতি আশাবাদী হয়ে ওঠে। তাই কাজের অবসরে ও বর্ষার চাঁদনী রাতে বাইরে কান্দরের দিকে তাকিয়ে ফুলমতি গুনগুন করে শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কমলা সুন্দরীর ও ব'লো ভাইয়ের গান গায়–

> 'দীঘির ঘাটত যায় লো কমলা কাঁখেত কলস
> কমরে হেলন দেখে বানিয়ার মনত জাগে রস।
> হামার ভিতি চাও কইন্যা হামার ভিতি চাও
> তুমার তানে কইন্যা হামার পরাণ করছি ভাও।'-[*ঘর-সংসার*/পৃ. ২৯১]

অতীত দিনের স্বামী-সোহাগের স্মৃতি মনে করে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বর্ষার চাঁদনী রাতে ফুলমতি উঠানে হাঁটতে হাঁটতেই কুতুবালিকে নিয়ে সংসার বাঁধার হিসেব করে। এলাকার জয়গুন ও তসিরনের জীবনের করুণ অবস্থার কথা স্মরণ করে কোনোক্রমেই সতীনের ঘর না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই কুতুবালিকেই জীবনসঙ্গী করতে সে পাকা সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক রাতে ছাগীর পাল দেখিয়ে কুতুবালি বাড়ি ফেরে। 'মুই ইবার যাঁউ'–বলে কুতুবালি রাত কাটাতে অন্যত্র যেতে চাইলে ফুলমতি বাধা দেয়। ফুলমতি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাগে হিসহিস করে এবং ঠেলতে ঠেলতে গরু ছাগলের চালার নিচে নিয়ে যায়। আর বলে–'খেইল পাইছিস!...গলামের ব্যাটা গলাম, মোর বদনামের দায়িক কে?...তুই গেলে মোর বদনাম হবে নাই? মোর বদনামে তুই পালাবা চাহিস ক্যানে, এ্যাঁ?...এ্যালা মোর কী হোবে? বুঝিস না ক্যানে?' এমন ধাক্কা আর আবেগী আহ্বানে বেসামাল কুতুবালি ফুলমতিকে জড়িয়ে ধরে খড়ের পাজায় পড়ে। এভাবেই চাঁদনী রাতে বাড়ির ছাগীর সঙ্গে কর্ত্রী ফুলমতির জীবনেরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সৃষ্টি রহস্যের আদিম প্রেমলীলায়– 'বহুদিন পর যুবতী বেওয়া ফুলমতি পুরুষমানুষের স্বাদ পায় আর গজুয়া কুতুবালি মেয়ে মানুষের স্বাদ নিতে নিতে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।' অবশেষে নিঃসঙ্গ ফুলমতির একক জীবন-জোয়ালে কুতুবালিও যুক্ত হয়। বৈশাখের মাঝ রাতের ঝোড়োবাতাস বা কালবৈশাখী ফুলমতি আর কুতুবালিকেও জীবনের ভিন্ন পাঠে দীক্ষিত করে। গৃহজীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ফুলমতিকে প্রণোদনা দেয় গরু-ছাগলের চালার নিচে কুতুবালির সঙ্গে আদিম আনন্দে মেতে উঠতে। এ ঘটনাটি ফুলমিতর অবদমিত

জীবনস্পৃহার দ্যোতক। তার এ নবজাগ্রত প্রেম বিধৃত হয়েছে কমলাসুন্দরীর গীতে।[২০] চালার বাইরে এসে কুতুবালিকে জড়িয়ে ধরেই সে বলে–

> 'কুনঠে পালাবার চাহিস, এ্যাঁ? আর পালাবা পারিবো নাই–এম্নেই মোর সঙ্গে মিলে থাকিবা হোবে।...আইজ থে-তমরা মোর পুরুষ, আর মুই তমার মাউগী, মোর বাড়িত তমার বাড়ি, মোর ব্যাটা তমার ব্যাটা, মোর দুখ তমার দুখ, মোর সুখ তমার সুখ, বুঝিছেন?'-[ঘরসংসার/পৃ.৩১২]

এভাবে ফুলমতি নিজ আগ্রহেই সংসারবিবাগী কুতুবালিকে সংসার বৃত্তে, মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ করে এবং তাকে জীবনের নতুন পাঠে দীক্ষিত করে। তবে সচেতন ফুলমতি সমাজের বদনাম, কুৎসা ও শাসনের হাত থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতেই খুব গোপনে কুতুবালির সঙ্গে বিয়ে পড়ানোর জন্য নেকমরদের মাজারে যায়। এমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফুলমতি তার সমাজ ও লম্পট প্রতিবেশীদের মুখে প্রচণ্ড ঘৃণা ও চপেটাঘাত ছুঁড়ে দেয়। নিজের মায়ের বিয়ে হতে দেখে কিশোর আবেদালি স্বভাবতই কষ্ট পেলে দরবেশ তাকে সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

> 'যত কিছুই হোক, ছেলের জন্যে মায়ের মনে সবসময়ই মায়া থাকে। ছেলেকেও বুঝতে হবে, মা একা সংসার চালাতে পারে না। সংসারে একজন শক্তসমর্থ মরদ পুরুষ না থাকলে তো মায়ের বিপদের অন্ত নেই। কুতুবালিকে তুই বাপ কহিবা না চাইলে কহিস না, চাচা কহিস, কিন্তুক দুশমন বুঝিস না, আপনা লোক বুঝিস?'-[ঘরসংসার/পৃ.৩২৮]

এরপরও আবেদালি মন থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে পারে না। তবে বাড়ি প্রত্যাবর্তনের সময় পথে ব্যাঙ ধরা গহমা (গোখরা) সাপের মুখোমুখি পড়ায় দ্রুততার সঙ্গে কুতুবালি সাপকে লেজধরে পাশের ঝোপে ছুঁড়ে দেয়। এর মাধ্যমে আবেদালির মনের সকল দ্বিধা-সংকোচের বরফ গলে, গ্রামের সম্ভাব্য অপেক্ষমাণ প্রতিকূলতা সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই 'এবার হাঁটার সময় কেউ সামনে পেছনে থাকে না। মাঝখানে হাটে আবেদালি আর দুপাশে বাকি দুজন।' এভাবে তিনজনে মিলিত সঙ্ঘশক্তি দিয়ে নতুন সংসার গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে বাড়ি ফেরে। এসব শুনে সবুরাতু সালিশ ডেকে সবাইকে গ্রামছাড়া করার হুমকি দেয়। কিন্তু শুক্রবার জুমার দিন মসজিদে সবুরাতু ও মুনশি বিচার ডেকেও তেমন সুবিধা করতে পারে না। কারণ দেলবর মণ্ডল আর হযরতালি কুতুবালির পক্ষে দাঁড়ায়। তারা সবুরাতু ও মুনশির বদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাইকে বলে–

> 'ফুলমতির বাড়িঘর হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তার বদনাম করা হচ্ছে–না হলে নেকমরদের মাজার শরিফের ইমাম হুজুর যাদের নিকা পড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের নামে কেন বদনাম তুলছে এরা?'–[ঘরসংসার/পৃ.৩৩-৪৮]

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো তারা জব্দ হয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অনিবার্য নিয়মে গরু ছাগলের চালাঘরে পূর্বের ন্যায় আদিম প্রেমলীলায় দুজনে উপগত হয় এবং বাড়ির ছাগীর মতো ফুলমতিও গর্ভবতী হবার পথে অগ্রসর হয়। কুতুবালির পরামর্শেই ফুলমতি ছাগল বিক্রি ও গহনা বিক্রির টাকা দিয়ে বলদ কেনে। ফলে বর্ষার মৌসুমে হেঁউতি ধানের আবাদও কুতুবালি নিজের বলদ দিয়ে করে। নিজের জমির নধর নধর সবুজ ধানগাছের শিষগুলোর ওপর ফুলমতি আলতো করে হাত বুলায়। আর মনে মনে বলে–'এগুলোই তার সুখ, এগুলোই তার শান্তি, এগুলো তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, তার সন্তানকে বাঁচাবে, তার স্বামীর সুখ টিকিয়ে রাখবে–দিনে দিনে তার সংসারকে ভরে তুলবে।' এভাবে সুখ আর সচ্ছলতার এক ভবিষ্যৎ জীবন-স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে ফুলমতির মনে মাতৃতৃষ্ণা পুনরায় জেগে ওঠে। অগ্রহায়ণের হিমেল হাওয়ার চাঁদনী রাতে সে স্বামীকে বলে–

> 'জমিনত তামান দিন নাঙ্গল চালায় এই ধানের বুকত দুধ আনিছ, কিন্তু আরে গলামের ব্যাটা গলাম, তোর মাউগীর বুকত দুধ আনিবা পারিস না ক্যানে?-[*ঘরসংসার*/পৃ.৩৫৮]

ফলে 'হেলেপড়া জোছনারেখার পাশে, শরতে হিমঝরানো আকাশ আর ঝিকিমিকি আলো ফোটানো তারাদের নিচে' সন্তান কামনায় স্বামী-স্ত্রী পুনরায় উপগত হয়। আর এতেই–'প্রাণ ও জীবনধারার সূচনা হয় এবং তা প্রবাহিত হয়। জীবনের বিকাশেও ঐ একই প্রক্রিয়া, বাধাবিঘ্ন বৈরিতাকে পরাহত এবং অতিক্রম করতে হয়।' এভাবেই ফুলমতির জঠরজমিনে এক নতুন প্রাণবীজ রোপিত হয়। হেমন্তের ধানকাটা শেষ হলে এক রাতে ঘুমে আচ্ছন্ন কুতুবালির বুকে ঝাঁপিয়ে ফুলমতি কিল মারতে মারতে জানায়–'অই গজুয়া মরদ, তমরা বুঝেন না, মুই পোয়াতি হইছোঁ? তমরা ব্যাটার বাপ হবা যাচ্ছেন? বুঝেন না?' ভারি সুখে খ্যাপামি ভর্তি কথাগুলো ফুলমতি উচ্চারণ করে। এভাবে ফুলমতির ভাঙা সংসার আবার জোড়া লাগে, গোয়ালে হালের দুই বলদ শোভা পায়, মাটির দুই কুঠি নিজের জমিনের ধানে ভরে ওঠে আর মাটির কলসিতেও চাল জমানো থাকে। তাকে আর মহাজন বাড়ির ধান এনে ভানতে হয় না। ফুলমতি সমাজের শত বাধা, শত প্রলোভনের হাতছানির সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে সংসারকে ঠিক রাখে। কোনোভাবেই সংসারকে ভাঙতে দেয় না। সংসার রক্ষায়, সন্তান রক্ষায় ও সম্ভ্রম রক্ষায় তার এ লড়াই-সংগ্রামের সঙ্গে শওকত ওসমানের *জননী* উপন্যাসের দরিয়া বিবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যে দরিয়া বিবি পর্যায়ক্রমে দুই স্বামীর অকাল মৃত্যুতে চার সন্তান ও সংসার রক্ষার্থে জীবনযুদ্ধে নামে। অসীম

ধৈর্য ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সংসার-সন্তান টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ বারো বছর পর পুনরায় গর্ভবতী হয়ে ফুলমতি উল্লসিত হয়। তার বমি করা দেখে সই মাজেদা ঠাট্টা-রসিকতা করায় ফুলমতি হাসিমুখেই বলে–

> ‘সই মানুষটা বড়া ভাল, মোর এখন বহুত সুখ। তমরা মোর তানে দোয়া করেন।’-[*ঘরসংসার*/পৃ.৩৬৯]

সংসারজুড়ে এ ভরাভরান্ত সুখের কারণেই ফুলমতির বাড়িতে- ‘ভোরবেলা ভাপাপিঠা আর চিতুয়া পিঠা দু-চারদিন পরপরই পাওয়া যায়।’ সুখের প্রবাহকে ঠিক রাখতেই ফুলমতি বলদ কেনার ধারের টাকা দ্রুত পরিশোধ করতে তাগিদ দেয়। কারণ এসব–‘দেড়িয়া হিসাব। ৪ কাঠা ধান কর্জ নিলে শোধ দিতে হয় ৬ কাঠা। সেটা শোধ না করতে পারলে পরের বার ঐ কর্জই হয়ে যাবে ৯ কাঠা।’ এমন ঋণের ফাঁদে পড়েই তার শ্বশুর খটু মহাজনকে দুই বিঘা জমি লিখে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঘটনা ফুলমতি কখনো ভুলেনি। তাই সে–

> ‘মনে মনে কসম খায়। আর কোনোদিন সে কর্জ নিতে দেবে না–তার পুরুষকে না, তার ছেলেকেও না।’-[*নাঢ়াই*/পৃ.৩৭১]

দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার সুযোগে বংশ পরম্পরায় বয়ে চলা এ সর্বগ্রাসী ঋণের জ্বলন্ত চিত্র পাওয়া যায় প্রেমচন্দ-র *সওয়াসের গহু* নামক গল্পে। পিতার করা সোয়া সের গমের ঋণ পুত্র সারাজীবন বাধা মজুরি খেটেও শোধ করতে পারে না। এমন ভয়ংকর সুদের ফাঁদে পড়ে গ্রাম-বাংলার কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। যথাসময়ে ফুলমতির কোলজুড়ে ছেলে-সন্তান সাবেদালি শোভা পায়। এ ছেলেকে নিয়ে তার ব্যস্ত সময় কাটে। স্বামীর মুখে বন্ধু সুবল দাসের বউ নয়নতারার সন্তান না হওয়াতে এলাকায় তার বদনাম-গঞ্জনার কথা শুনেও ফুলমতি সহানুভূতিতে সিক্ত হয়। তাই রেগে বলে–

> ‘ছুয়া পরসাবা না পারিলে মায়া মানুষের একেলার দোষ ক্যান হোবে, পুরুষ মানুষের দোষ হবা পারে না? নিমরদ মানুষ কি নাই?’-[*নাঢ়াই*/পৃ.৪০৩]

এমন বক্তব্যের মাধ্যমে ফুলমিতর দূরদৃষ্টির পরিচয় মেলে। সন্তান না হবার পেছনে যে-শুধু নারী একা দায়ী নয় বরং পুরুষও সমানভাবে দায়ী হতে পারে–এমন যৌক্তিক কথা ও বোধের চেতনায় সে নিজেকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়। তাই প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো নয়নতারার সন্তান লাভের জন্য ফুলমতি কাছিমের ডিম খাবার মতো প্রচলিত লোকচিকিৎসা বা টোটকার পথ বাতলে দেয়। তারপরেও ফুলমতির সংসারে এমন সুখ অব্যাহত থাকে না। ‘লাঙল যার, জমি তার’, ‘তেভাগা চাই, কিরষাণ ভাই’ এবং ‘জান দিব, তবু ধান দিব না’–এমন দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা সারা দেশের তেভাগা-আন্দোলনের ঢেউ ও তাপ-চাপ ফুলমতির জীবনসংসারের উপরেও আছড়ে পড়ে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর কম্যুনিস্ট পার্টির স্বার্থের হিসাব ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে গড়া আন্দোলনে মাহীগঞ্জ এলাকাতেও জোতদার-মহাজনদের সঙ্গে দরিদ্র কৃষকদের বিভাজন-বিভক্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতও শুরু হয়। এর রেশ ধরেই ফুলমতির বাড়ি পুলিশ এসে হানা দেয়। বাধ্য হয়ে কুতুবালি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। স্বামীর প্রত্যাবর্তনের আশায় পথ চেয়ে থেকে ফুলমতির মাথার চুলে পাক ধরে। তবু ফুলমতির পথ চেয়ে থাকার শেষ হয় না। অন্যায়-শোষণের বিরুদ্ধে নাঢ়াই (লড়াই) করতে যাওয়া প্রতিবাদী কৃষক স্বামীর ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়েই ফুলমতিকে অপেক্ষা করতে হয়।

ফুলমতির জীবনসংগ্রামের স্বরূপ উন্মোচন করতে এ উপন্যাসের ভূমিকায় বলা হয়েছে–‘গরিব কৃষকের ঘরে এক বালক সন্তানের অল্পবয়সী মা ফুলমতি বিধবা হলে শুরু হয় তার বাঁচার লড়াই। লোভ-লালসা, সম্পদ আর সম্ভ্রম লুণ্ঠনের নানান চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হয়। তবে এ লড়াই ক্রমে একাকার হয়ে যায় গরিব কৃষকের লড়াই তেভাগার সঙ্গে।’ তাই *নাঢ়াই* উপন্যাসের পটভূমিকাটি বৃহত্তর হলেও উপন্যাসের মৌল আদল গড়ে উঠেছে ফুলমতি নামক এক দরিদ্র দেহাতী নারীর অনমনীয় লড়াই ও প্রতিরোধের অনুষঙ্গে। ফুলমতির এ লড়াই শুরু হয় স্বামী আহেদালির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। রক্ষণশীল সামন্ত সমাজকাঠামোর সঙ্গে প্রাত্যহিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ফুলমতিকে প্রমাণ করতে হয়েছে তার টিকে থাকার স্পৃহা। নারীলোভী পুরুষের উদগ্রদৃষ্টির সামনে নির্ধন-নির্বিত্ত ফুলমতি অক্ষুণ্ন রেখেছে তার অনমনীয় মানসিকতা।[২১] এ হার না মানা প্রবণতাই ফুলমতি চরিত্রকে দিয়েছে এক অনন্য মহিমা।

গ্রামীণ সমাজকাঠামোর উদার প্রকৃতি ও মাটির পরশে এমন অনেক মানুষ বেড়ে ওঠে– যারা স্বার্থপরতা-সংকীর্ণ মনোভঙ্গির পরিবর্তে পরোপকারী ও আত্মত্যাগী মানসিকতায় দীক্ষিত হয়। যাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে নির্বীর্য ও নিস্তেজ মনে হলেও সত্য-ন্যায়-সংগ্রাম ও সমাজের প্রয়োজনে তারা নির্বীর্যের খোলস ছেড়ে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। যারা সাহস ও সজ্ঞচেনায় হয়ে ওঠে এক একজন সংশপ্তক সেনা। স্বভাবে ‘আবাং আর গজুয়া’ নাকবোঁচা কুতুবালির জীবনযুদ্ধের অনুষঙ্গে এমন বাস্তবতা এ উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। একবার হরিপুরে কলেরার মড়ক দেখা দিলে অন্যান্য মানুষের মতো কুতুবালির বাবা-মাও মারা যায়। পাঁচ-ছয় বছরের কুতুবালিকে রাস্তার ধারে ক্ষুধায় কান্নারত অবস্থায় নেকমরদ মাজারের দরবেশ দেখতে পান। প্রথমে তাকে নিয়ে যান খুশালডাঙ্গার সরকার বাড়িতে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় দরবেশের সঙ্গে কুতুবালি

ঘুরে বেড়ায়। দরবেশ আজমির শরিফ সফরে গেলে তাকে হাশেম প্রধানের বাড়িতে রেখে যান। কিন্তু ফিরে এসে তিনি কুতুবালিকে এ প্রধান বাড়িতে পাননি। নিজের পালানো সম্পর্কে বলতে গিয়ে দরবেশকে সে জানায়–

> ‘না পালায় কী করম। কতো মাইর সহ্য হয়, কহেন? বিহানে মাইর, দুপুরে মাইর, রাইতে মাইর–মাদারগঞ্জের কলিম চৌধুরী তো মারতে মারতে মোর একখান হাত–এ ভাংগে দিছে।’-[*ঘরসংসার*/পৃ.৩২৫]

এভাবে মহাজন-জোতদারদের পাশবিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কুতুবালির পালিয়ে বেড়ানো শুরু হয়। সে কালমেঘের হাটে কিছুদিন কামারের কাজ, কিছুদিন এক চৌধুরী বাড়িতে রাখালের কাজে যুক্ত হয়। কিন্তু ক্ষুধা ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে মাহীগাঁও এসে গাইবান্ধার মালেকের দোকানে বই বিক্রির কাজ নেয়। এভাবে কুতুবালির জীবনের প্রথম অধ্যায়ের ইতি ঘটে। এ বই বিক্রির কাজ করা অবস্থাতেই কুতুবালির সঙ্গে ফুলমতির পরিচয় ঘটে। ফুলমতির জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়। ফুলমতি তাকে তার জীবন-সংসারের দায়িত্বভার নিতে বললেও সে পিছু হটে না। এ ধারাবাহিকতায় ফুলমতির বীজতলা প্রস্তুত করতে গিয়ে সবুরাতুর পাঁড়ের (বাঁশের লাঠি/নড়ির) পিটুনি সে শুধু হজমই করে না বরং পাল্টা আঘাত করে। আর হুঁশিয়ার করতে সদম্ভে জানায়–

> ‘পাঁড়ের বাড়ি কেমুন লাগে বুঝিছ? মোক মারিলে মুইও ছাড়িম নাই। মুইও মাইর দিমু, হাঁ? খেয়াল থুইস।’-[*ঘরসংসার*/পৃ.৩১৬]

এভাবে ফুলমতির সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে ‘আবাং-গজুয়া কুতুবালি’-র ভীরু-কাপুরুষ সত্তার বৃত্ত ভেঙে ‘দুঃসাহসী-দায়িত্বশীল কুতুবালি’-র নবজন্ম ঘটে। আর বেঁচে থাকার সংসার নামক শক্তমাটির ঠিকানা খুঁজে পায়। সে সবুরাতুর কূটকৌশল ও অশ্লীল কথাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে হালের গরুর অভাবে কোদাল দিয়ে বীজতলা তৈরি করে। আবার তার বুদ্ধি ও পরামর্শেই ফুলমতির ছাগল ও গহনা বিক্রির টাকা দিয়ে হালের বলদ যোগাড় হয়। এ বলদসংগ্রহ, ঘোষবাবুদের দুটি ক্ষেতের আধিপ্রাপ্তির বন্দোবস্তও ঘটে কুতুবালির তৎপরতায়। ভরা জ্যৈষ্ঠের হেঁউতি ধানের আবাদের সময়ও কুতুবালি জেদের সঙ্গে নিজের ও আধির জমিতে রোপাধান বপন করে। সে জমির নধর নধর ধানের বড় শিষগুলো দেখে নিজেই অবাক হয়। যে কেউ তার ফসলের চেহারা দেখে তাকে পাকা গৃহস্থ বলে আন্দাজ করে। সম্ভাব্য ফসলের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের ছক কাটতে কাটতে কুতুবালি বলে–

> ‘দুই জমি থেকে যা ফসল পাওয়া যাবে, তাতে সে পুরোপুরি গিরস্থ হয়ে যাবে। জন্ম থেকে সেই যে এক জায়গা থেকে থেকে আরেক জায়গায় ভেসে ভেসে বেড়ানো, এক মালিকের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আরেক মালিকের বাড়ি গিয়ে চাকর খাটা, দিনের পর দিন লাথি-কিল আর গালা-গালি খাওয়া, শীতের দিনে বিছানা আর কাপড়ের অভাবে সারারাত বসে বসে আগুন পোহানো– সেইসব দুর্ভোগের দিন তার শেষ।’-[*ঘরসংসার*/পৃ.৩৫৫]

কুতুবালির জীবনের এ বাঁকবদল, নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও ইতিবাচক উত্থান– এসবই হয়েছে ফুলমতির আগ্রহ, আশ্রয় আর ভালোবাসার পরশেই। তাই কৃতজ্ঞ কুতুবালিও মনে মনে শপথ নেয় আর বলে–‘আবেদের মা-ই তাকে গিরস্ত বানিয়ে দিল। খুবই ভালো মেয়ে মানুষ তার গিরথানটি– ওকে ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না। মরতে যদি হয়, তো সে এখানেই মরবে।’ ফুলমতির প্রতি কুতুবালির এমন অঙ্গীকারের মূলে ছিল তার জন্য ফুলমতির মায়া আর ভালোবাসা। এছাড়া কুতুবালির জীবনে কোনো স্থিতি আসতো না, স্ত্রী-সংসার নামক ঠিকানাও মিলতো না। ফলে আশ্রয়দাত্রী, জীবনদাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী ও হিতাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী ফুলমতি যখন রাতের বেলা তাকে শরীর আর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, তখন তার মনে হয়– ‘মা থাকলে বোধ হয় এমন করেই তার গায়ে মাথায় হাত বুলাত।’ শুধু বয়সে বড় হবার কারণে নয় বরং তার জীবনে স্ত্রীর বিরাট ও বহুমুখী ভূমিকা থাকার জন্যই কুতুবালির কাছে ফুলমতী জায়া সত্তার সমান্তরালে জননী সত্তায় অবতীর্ণ হয়। যা অসহায়, অনিকেত, অস্তিত্বসংকটে উদ্‌ভ্রান্ত কুতুবালির কাছে কখনোই অস্বাভাবিক মনে হয়নি। ফুলমতির সংস্পর্শে এসে তার জীবনের মোড় ও গতি অনিবার্যভাবে পাল্টে যায়।

ভাদই ধান কাটার আগ মুহূর্তের অবসরে অন্যান্য কৃষকদের মতো কুতুবালিও বন্ধু সুবলকে নিয়ে চৌধুরী মহাজন বাড়ির রাখাল সাঁওতালপাড়ার দীনেশ মুর্মুর[২২] সঙ্গে গল্প করে। বহু গল্প জানা দীনেশ রসিয়ে রসিয়ে বুঢ়া বোঙা, শিব বোঙা ও মারাঙ বুরুর গল্প করে এবং তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে জানায়–

> ‘ষাঁড়ের পিঠে চেপে সে (শিব বোঙা) ঘোরে। আর মহুয়ার রস খেয়ে ভোম হয়ে থাকে। দুনিয়ার যদি কোথাও কোনো অন্যায় হয়, তো খুব রাগ হয় তার। তখন হাতের ত্রিশুলখানা ওপরে তুলে সে নাচন শুরু করে আর তাতে কখনো ঝড়-তুফান আরম্ভ হয়ে যায়। কখনো হয় বান-বরিষা আর কখনো কখনো ভূঁইচালা।...আর মারাং বুরু হাতে আমগাছের একটা ডাল নিয়ে সব মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে আর বলে, যাও তোমরা নাঢ়াই করো, দুশমন খতম করো।’-[ঘরসংসার/পৃ.৩৫১]

এছাড়াও দীনেশ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা বিজয়ী বীরসা বোঙারও গল্প করে। আর সুবল করে শিব ঠাকুর, দুর্গা ও কালি দেবীর অশুভ শক্তি ও মহিষাসুর দমনের গল্প। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে দেবী মনসার যুদ্ধ-বিবাদের কথা বলতেও ভুলে না। আর কুতুবালি গল্প বলতে না পারলেও তার মনে কারবালা প্রান্তরের পাপাত্মা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনের যুদ্ধ

ও মাছের পিঠে চড়ে এ দেশে আসা পির দরবেশের কথাও সুস্পষ্টভাবে জাগে। পৌরাণিক মিথ ও ইতিহাসের এসব গল্প শুনে সবাই শোষক-পীড়ক-দুরাত্মার বিরুদ্ধে দেব-দেবীর যুদ্ধ করা ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ-সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথাও বুঝতে পারে। আসলে– 'নাঢ়াই শুরু করার প্রণোদনা এসেছে আদিবাসী মানুষের দেবোপাখ্যান থেকে।...ঔপন্যাসিক মৃত্তিকালগ্ন মানুষের মৌলিক মনস্তত্ত্বের প্রতি গভীরভাবে প্রত্যয়নিষ্ঠ। দৈবপ্রেরণা তাদের উদ্দীপ্ত করে প্রবলভাবে। আদর্শিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে দৈবনির্ভরতা তাদের কাছে অনুপ্রেরণামূলক। এই নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন দেবকথার।'[২৩] কিছুদিন পর দীনেশ এক বাবুর কাছে শোনা অন্য ধরনের গল্প বলতে গিয়ে জানায়–

> 'জমির মালিক যে চাষ করে সে-ই। অন্য কেউ কীভাবে মালিক হয় জমির? সে কি জমি বানিয়েছে? জমি সে বানায়নি, চাষ করে না, বীছনও তৈরি করে না। অথচ ফসলের সবটারই সে মালিক হয়ে যায়। জমির আসল মালিক তো কিরষাণ।'-[ঘরসংসার/পৃ.৩৫১]

জীবনে প্রথম এমন অদ্ভুত কথা শুনে সবাই। সুবল ও কুতুবালির বিশ্বাস হতে চায় না। এদেরকে আরো তরতাজা খবর শোনাতে দীনেশ বলে– 'এখন দেশের রাজা বিলাতি সাহেবরা, তাদের নাকি খেদিয়ে দেবে শহরের বাবুরা। বড় বড় শহরে নাঢ়াই শুরু হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই দেশের রাজা বদলে যাবে।...হামার দেশের সাহেব বাবুরা রাজা হবে।' এমন কথা কুতুবালি ইতঃপূর্বে মাহীগঞ্জের যতীন মাস্টারের কাছে শুনেছে। কিন্তু দেশের মানুষের রাজা হবার কথা শুনে সুবল ক্ষেপে যায় আর বলে–'ঐ গিলা কথা হামাক শুনাইস না, হামার সাহেব বাবুরা রাজা হইলে হামার কী? হামার নয়াবাল গাজাবে?' আসলে সে বুঝতে পারে বড়লোকরাই সর্বদা রাজা হয়, ক্ষমতায় যায় এবং এরা নিজেদের স্বার্থের জন্য গ্রামের বড়লোক-জোতদার-মহাজনদেরও আপন করে নেয়। গরীবের ভাবনা কেউ ভাবে না। শোষণ আর স্বার্থের ক্ষেত্রে সকল শাসক ও ধনীরাই এক আর একাট্টা। এপর্যায়ে কুতুবালিরা জানতে পারে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কলকাতা-দিল্লিতে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা। এভাবে গোটা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের তাপ-চাপ কুতুবালিদের নিস্তরঙ্গ চিন্তা-চেতনায় এসেও আঘাত করে।

অগ্রহায়ণের শেষে হেঁউতির ধানকাটা শেষে তা মহাজন ঘোষবাবুদের প্রকাণ্ড দুটি খোলানে কাঁড়ি দিয়ে রাখা হয়। ধানের মাড়াই-ঝাড়াইয়ের কাজটা আধিয়াররা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে করলেও তাদের কাছ থেকে তা খরচবাবদ কেটে নেয়া হয়। রাণীসংকৈল, বীরগঞ্জ ও কাহারোল থানায় আধিয়ার কৃষকরা ধান মহাজনের খোলানে তুলতে চায়নি। এ নিয়ে ভীষণ উত্তেজনা হয়েছে সেসব জায়গায়। মনে চাপা ক্ষোভ আর সন্দেহ নিয়ে হরিদাস বর্মণ, নকুল বর্মণ, সহদেব বর্মণ ও কুতুবালি নিজেদের ধান বুঝে নিতে যায়। নকুলের মোট ধান হয় দুই কুড়ি চার কাঠা। তাহলে এক কুড়ি দুই কাঠা করে ধান পাবে মহাজন ও আধিয়ার। কিন্তু ঘোষ বাবুদের সরকার মশাই বৃন্দাবন নকুলকে এক কাঠা ধান কম দেয়াতে সে প্রতিবাদ করায় বৃন্দাবন জানান–'মুই যে হিসাব কিতাব করো তমার ধানের, মোর কামের দাম নাই? দিনিয়ারের ধান কুনঠে?' এসব শুনে নকুল ক্ষেপে ওঠে। আর প্রতিবাদ করে বলে–

> 'দিনিয়ার ধান ফের কিসের? জমিন আধি লিছে আধিয়ার, সেই জমিন ক্যাম্নে আবাদ করিবে, ক্যাম্নে ধান লাগাবে, ক্যাম্নে কাটিবে, সব আধিয়ার জানে, মহাজন উগিলা হিসাব ক্যানে করিবে?'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৩৩৩]

আগে ধানকাটা, ধানমাড়াই ও খোলান ঝাড়া বাবদ ষোলো কাঠায় এক কাঠা হিসেবে মোট ধান থেকে দিনিয়ারের ধান দেয়া হতো। যা মহাজন ও আধিয়ারের উভয়কে বহন করতে হতো। কিন্তু এ বছর পুরোটাই আধিয়ারের পক্ষ থেকে কেটে নেয়া হয়। এসব নিয়ে নকুলের সঙ্গে বৃন্দাবন সরকারের বাগবিতণ্ডা হয়। বৃন্দাবন যুক্তি দিয়ে বলেন– 'যান শুনে আসেন, কেমুন নয়া নয়া হিসাব বাহার করিছে মহাজনরা। বীরগঞ্জের দিক জমিদারের খাজনার ধান পাইলে বাহার করে লেয়, ছুয়া মাইয়া ইস্কুলত পড়ে, সেই ছুয়া পঢ়ানি ধানও কাটে লয়– যান খবর লে দ্যাখেন, চারো দিকে কী হবা লাগিছে।' তাই আধিয়ার প্রজার ছেলে-মেয়ে স্কুলে না পড়লেও আধিয়ারের ভাগ থেকে এর জন্য 'পঢ়ানি ধান' হিসেবে দিনিয়ারি, কর্জের দেড়িয়া সুদ, সরকারের হিসাবী, খোলান ঝাড়া ও স্কুল পড়ানি বাবদ কর ও তোলা কেটে নেয়া হয়। যা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে উল্লিখিত বসতকর, লবণকর, সানাভাত, ধানকাটি, কলম কসুরে, পার্বণী, সেলামী, ধুতি ও দিগারি-র মতো। কয়েক মাস আগে ভাদই ধান কাটার সময়েও এমন নিয়ম ছিল না–একথা নকুল বলায় 'হিসাব না মানিলে, আধিভাগের ধানও তো নিবা পারিবেন নাই' বলে বৃন্দাবন হুমকি দেন। ফলে বাধ্য হয়ে নকুল তা মেনে নেয় এবং আশ্বিন মাসের ধান কর্জ বাবদ আরো চার কাঠা ধান 'কর্জের হিসাব দেড়িয়া' মাপে অর্থাৎ চার কাঠার জন্য ছয় কাঠা ধান তাকে পরিশোধ করতে হয়। তাই রাগে উত্তেজিত হয়ে নকুল কুতুবালিকে জানায়–

> 'দুই কুঁড়ি পাঁচ কাঠা ধান উপজালে আধিয়ার, আর ভাগত পালে মোটে পন্দ্রহ কাঠা–জোতদারের ইটা কেমুন হিসাব কহেন? ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ রাখে দিলে–পানি ঝাড়ি রোদ তুফান মাথাত লে জমিন চষিল আধিয়ার...কিন্তুক ফসল ভাগের সময় আধিয়ার পালে মোটে এক ভাগ–এই বালের আধিয়ারি না করিলে কী হয়? মানুষ মরে যায়?'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৩৬৫]

এভাবে নকুল মন থেকে রাগ ঝাড়ে। বাড়ি ফেরার সময় নকুল, নকুলের বড় ভাই অর্জুন, ছোট ভাই সহদেব, বংশী ও কুতুবালিরা জানতে পারে রাণীসংকৈল, আটোয়ারি, বীরগঞ্জ ও কাহারোল থানায় আধিয়াররা ফসলের তেভাগা দাবি করছে। এক ভাগ পাবে জোতদার মহাজন আর দুই ভাগ পাবে আধিয়ার। আর ধান মাড়াই হবে মহাজনের খোলানে নয় বরং আধিয়ারের খোলানে। এসব কথা কুতুবালির মগজে অনেক সময় ঢুকতে চায় না। তবে এ হিসেব বুঝতে কুতুবালির বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না। ঘোষ বাবুদের বাড়িসংলগ্ন পালানের দুটি জমিতে বর্গা হিসেবে কুতুবালি পেয়াজ-রসুন বাদে আলু, বেগুন, কলাই, সরিষা, মরিচ, হলুদ, মুগ, বুট আর মটর চাষ করে। ফলনও ভালো হয়। কিন্তু ফসল ভাগাভাগির সময় দেখা যায় মাত্র দু'টুকরি আলু এক বস্তায় ভরে কুতুবালিকে দেয়া হয়। এসব দেখে কুতুবালি মনে মনে রেগে ওঠে। তাই বেগুন, মরিচ, কালাই, মুগ, মটর ও বুট না পেয়ে মিনতির সুরে ঘোষগিন্নীর উদ্দেশ্যে বলে–'হামরা কালাই পামু নাই?' প্রতিউত্তরে কর্তাগিন্নী হাসতে হাসতে বলেন–

> 'তোর বুঝিন ডাল খাবার হাউস হইছে?...দেরে, মুগ আর বুট দোনো রকমের কালাই দুই খুচি করে।...তোর বাড়িত যুদিন কুছু নাগে তো মোক কহিস, পরে মুই দে দিমু।'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৩৯৫]

একথা শুনে কুতুবালির হুঁশ হয়। তাই সে শুধু আলু নিয়ে বাড়ি ফেরে আর ক্ষোভের সুরে ফুলমতিকে জানায়–'এ কেমন নিয়ম, পাটের ধানের আবাদ করলে আধির ভাগ আছে, কিন্তু অন্য আবাদের বেলাতে কেন ভাগাভাগির নিয়ম নাই? কেন হিসেব হবে না?' জবাবে ফুলমতি তাকে সাaনা দিতে বলে–

> 'আরে এইটা তো নয়া কিছু নহে–এইংকায় তো হয়ে আসিছে–আধিয়ারির হিসাব তো খালি ধান আর পাটের বেলায়–এইগিলি খুচরা আবাদের কুনো হিসাব কেহ ধরে না–কুনোদিন কেহ ধরে নাই।'-[নাঢ়াই/পৃ.৩৯৬]

ফুলমতির এ কথার মাধ্যমে আধিয়ার কৃষকদের ওপর বংশ পরম্পরায় চলে আসা জোতদার-মহাজনদের ভয়াবহ শোষণ-বঞ্চনার ধারাবাহিক ইতিহাসটাই উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু চারদিকে গণজাগরণ উঠতে থাকায় সাঁওতাল পাড়ার বারাম হোরো ক্ষুব্ধ হয়ে বলে– 'খুচরা হোক, ছোট হোক, ঐগিলাও তো কাম– পরিশ্রম ছাড়া কাম হয়?' এ কথাকে সমর্থন দিয়ে সাঁওতাল মহিন্দরও বলে– 'মেহনতের দাম আগে চাহে নাই বুলে কুনোদিনই চাহিবে নাই, এমুন কথা কি কহা যায়?' এভাবে মাহীগাঁওয়ের গরিব হিন্দু-মুসলমান ও সাঁওতাল আধিয়ার কৃষকদের মাঝে উত্তেজনা বাড়ে। আধিয়ার কৃষকদের এ উত্তেজনাকে আরো বহুগুণে উস্কে দেয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা। সমকালীন বাংলার এ তিনটি রাজনৈতিক দলের তাপ-চাপ নিস্তরঙ্গ মাহীগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ক্রমশই আন্দোলিত করে। সুভাষ বোসের ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও কলকাতার আশুতোষ কলেজের ছাত্র নির্মল কান্তি রায় ভারতছাড় আন্দোলনের সময়ে থানা পুলিশের ঝামেলা এড়াতে মাহীগঞ্জে আসেন। আর পার্টি পরিচয়ে জোতদার কৈলাস ঘোষের আশ্রয়ে থেকে মাহীগঞ্জের পাঠশালার হেডমাস্টার হন। তিনি কৌশলে কৃষক সমাজের মধ্যে ঘরোয়া বৈঠক করে কংগ্রেসের পক্ষে জনসংযোগ করেন। তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন জোতদার কৈলাস ঘোষ, তপন ঘোষ ও আব্দুল হাকিম চৌধুরীর মতো কংগ্রেসপন্থীরা। তিনি কৃষক ও আধিয়ারদের বৈঠক ডেকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির নামে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির প্রসঙ্গে বলেন–'হিন্দু মুসলমান আমরা ভাই ভাই; আমাদের মধ্যে কোনোদিন শত্রুতা ছিল না–এটা আমরা যেন ভুলে না যাই। ইংরাজরা দুই ভায়ের মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তুলে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে।' এ কথা বলাতে সাঁওতাল ভায়া মাঝি তীব্র প্রতিবাদ করে বলে–

> 'তমরা হিন্দু মোসলমানরা ভাই হবা চাহেন, দোস্ত হবা চাহেন, সেইটা তো বুঝিনু, কিন্তুক হামরা? সান্তালরা? মুণ্ডারা? হামাক তমরা কুনঠে থুবেন, কুনঠে হবে হামার দেশ?'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৩৮৮]

ভায়া মাঝির মুখে এমন যৌক্তিক কথা শুনে নির্মল বাবু বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। নিরক্ষর-নিরন্ন আদিবাসী কৃষকের এমন সচেতন জীবনবোধ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দেখে তিনি বিস্মিত হন। তবে পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে তিনি এবার কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের আদর্শ-উদ্দেশ্যের পার্থক্য এবং জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় জমিদার-আধিয়ারদের মিলেমিশে থাকার পরামর্শ দিলে ভায়া মাঝির সহ্য হয় না। তাই সে পুনরায় বলে–

> 'আংরেজ খেদাবার তানে উসকানি দিমু, না পেটের ভাত জুটামু–মাস্টার বাবু হামার কথা কহিবা চাহেন না ক্যানে? হামরা হালগিরস্তির কাম জানি, হামার জমিন নাই। যারা উগিলার কাম জানে না, অরাই তামান জমিনের মালিক হয়া বসিছে, এইটা ক্যানে কহিবা চাহেন না তমরা, কহেন দি?'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৩৮৯]

ভায়া মাঝির এমন জিজ্ঞাসারও কোনো সদুত্তর নির্মল রায় দিতে পারেন না। আসলে এসব দরিদ্র আধিয়ার কৃষক রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ইংরেজ না দেশীয় বাবুরা রাজা হলো– তা নিয়েও এদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কারণ তারা জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নিয়েছে যে, ধনী হিন্দু-মুসলমান ও জোতদার-মহাজন সবাই মিলে গরিব মানুষদের সমানভাবেই ঘৃণা, অবজ্ঞা আর শোষণ করে। এরা কেউ তাদের আপন নয়। ধর্ম তাদের আলাদা হলেও স্বভাব ও চরিত্র সবারই এক। তাই এদের কাছে নির্মল রায়ের কথার চেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভিমন্যু সেন ওরফে মন্নু ডাক্তারের কথাই

বেশি ভালো লাগে। হাটখোলায় রোগী দেখতে আসা ডাক্তারের চেম্বারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহিন্দর, বিরেন্দর, কুতুবালি, দীনেশ, বারাম হোরো, সুবলরা হাজির হয়। সেন বাবু কৃষকদেরকে নিজের স্বার্থরক্ষা, দাবি আদায় ও ন্যায্য-পাওনা বুঝে নিতে হরিপুর, রাণীসংকৈল, বীরগঞ্জ ও আটোয়ারি অঞ্চলের মতো কৃষক সমিতি গঠন করতে বলেন। 'লাঙল যার জমি তার, কিরষাণ ভাই তেভাগা চাই এবং জান দিব তবু ধান দিব না'– সেন বাবুর এসব কথায় কুতুবালিরা দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়। দেখতে দেখতে হাটখোলার মালেক দোকানদারের পরিত্যক্ত দোকান ঘরটি কৃষক সমিতির অফিস ঘর হয়ে ওঠে। নবগঠিত এ সমিতির সভাপতি দেলবর মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক দীনেশ মুর্মুর নেতৃত্বে জোর তৎপরতা চলায় মাহীগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল, রাজবংশী, পোলিয়া, মুণ্ডা কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী কৃষকরাই বেশি মারমুখী ও উৎসাহী হয়ে ওঠে। প্রত্যেক হাটবারের মিটিং বেশ জমে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতায় কৃষক সমিতি জোরদার হয়ে উঠলে মুসলিম লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা নড়ে চড়ে বসে। ফলে মাহীগঞ্জের স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা বড় মহাজন আমজাদ আলী, তার ছেলে মজিবরের পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা আব্দুল্লাহ কাফি সাহেব মাদারগঞ্জ হাটসহ কয়েক জায়গায় মাহফিল করে মুসলমানদের জন্য আলাদা মুলুক পাকিস্তানের পক্ষে ওয়াজ করে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি ফতোয়া দেন–'পাক ওয়াতান কায়েমের জন্য মুসলিম লীগ লড়াই করছে। যে মুসলমান মুসলিম লীগের পক্ষে নাই, সে বেইমান, তাকে দোজখে যেতে হবে।' মাওলানার এমন বক্তব্য কুতুবালি যেমন বুঝতে পারে না, তেমনি পোহাতুর বাবাও বিভ্রান্ত হয়। তাই বিরক্ত হয়ে কুতুবালি ফুলমতিকে বলে–

> 'কে জানে স্বদেশী, না কুনদেশী, খুব চিল্লায় চিল্লায় কী য্যান খালি কহিল, মুই বুঝোঁ নাই। আংরেজ বাদশা নাকি থাকিবে নাই, রাজা হোবে হিন্দুরা, শ্যালা মোসলমানক থাকিবা দিবা নাই। সেই তানে হামরা মোসলমানেরা আলাদা মুলুক চাহি, হামার নিজের মুলুক।'-[নাঢ়াই/পৃ.৩৮২]

আলাদা মুলুক হলে নিজেদের ঘরবাড়ি ও জমিজিরাতের কী হবে, কোথায় যেতে হবে–এসব প্রশ্ন কুতুবালি ও পোহাতুর বাপের কাছে বড় হয়ে দেখা দিলেও মুসলিম লীগের নেতাদের এসব ভাবনার সময় ছিল না। তারা জোতদার হিন্দু কংগ্রেসদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধনী মুসলমান মহাজনদের একত্রিত করে মাহীগঞ্জ হাটখোলায় রাতারাতি দুই দলের দুটি অফিস খুলে। দুটি অফিসেই চরকার নকশা করা তেরঙ্গা পতাকা আর চাঁদতারাওয়ালা সবুজ পতাকা টাঙিয়ে দেয়। আর মাঝে মধ্যে চোঙা ফুঁকে–'ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম, ব্রিটিশ রাজ ভারত ছাড়' এবং 'নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর, করকে হাম জান কুরবান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'– এমন শ্লোগানে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি করে। ফলে স্কুলে লক্ষ্মীপূজার ছুটি থাকলেও শবেবরাতের কেন ছুটি নেই– এ নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এর মধ্যেও তেভাগার দাবিতে– 'লাঙল যার জমি তার, কিরষাণ ভাই তেভাগা চাই' কুতুবালি-দীনেশদের এমন তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তাই কৃষক সমিতির আধিয়ারদের শায়েস্তা করতে জোতদার-মহাজনরা আধির জমি ছাড়িয়ে নেবার হুঁমকি দিলেও কুতুবালি-দেলবর-দীনেশরা ভয় পায় না। বরং দেলবরকে দীনেশ বলে–'ঘাবড়াছেন ক্যানে দাদা, লেউক না জমিন ছোড়ায়, হামরাও দেখি, কুন শালার ব্যাটা ঐ জমিন আবাদ করিবা যায়।' এমন উত্তেজনা কুতুবালিকে নবজাতক সন্তান, স্ত্রী ও সংসারের মায়া-মমতা ঘরে আটকে রাখতে পারে না। কারণ তার তখন– 'একদিকে ভাদই ধানের আবাদ আর অন্যদিকে সমিতি।' এ ভাদই ধানকাটা নিয়ে কৃষক সমিতির মধ্যে জোর উত্তেজনা চলে। সবাই নাঢ়াই-এর পক্ষে মত দেয় এবং আধিয়ারদের খোলানে ধান এনে মাড়াই-ঝাড়াই করে তেভাগা কায়েমের জোর দাবি তোলে। আবার জোতদারদের আধির জমি বাদ রেখেই কুতুবালি-দীনেশরা যৌথভাবে একেক দিন একেক জনের জমি খুব সহজেই তৈরি করে। আধিয়ার কৃষকদের এ সমবায়িক তৎপরতা জোতদার-মহাজনদের রীতিমতো দুশ্চিন্তায় ফেলে।

ভাদই ধান পাকার পূর্বেই 'জোতদার-মহাজনরা ভয়ানক রেগে গেছে–আধিয়ারকে তারা ধান কাটতে দেবে না–ধান কাটাবে বাইরে থেকে লোক আনিয়ে'– এমন গুঞ্জন ছড়ায়। এ নিয়ে আধিয়াররাও সতর্ক হয়। রাণীসংকৈলের মিত্রবাবুরা ধান পাহারা দিতে ভাড়াটে লাঠিয়াল আনে। আবার বারাম হোরো সব থানায় পুলিশ দিয়ে জোতদারদের ধান পাহারা দেবার খবর জানায়। এমন উত্তেজনার মুহূর্তে ডাক্তার অভিমন্যু সেন কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন–

> 'ওরা যা ভালো বোঝে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা কি সেজন্য বসে বসে আঙ্গুল চুষব? ওরা লাঠিয়াল আনছে, আমরা তো বন্দুক জোগাড় করতে পারব না। তাই আমাদেরকে লাঠিই হাতে তুলে নিতে হবে...কিরষাণদের হাতে তখন থাকবে সাড়ে চার হাত লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি।'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৪২৭]

ডাক্তার বাবু কৃষকদের শুধু লাঠি তৈরির পরামর্শই দেন না বরং সবাইকে পুলিশের হাত থেকে এড়িয়ে চলারও তাগিদ দেন। আর যেকোনো মূল্যে ধান কেটে নিজেদের ঘরে তোলার নির্দেশন দেন। তাই সবাই লুকিয়ে থাকে এবং জোতদার-মহাজনদের পক্ষে সরকার, থানা-পুলিশ থাকার পরেও সুবল দাস ধান কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। তার একথা সমর্থন করে কুতুবালিও বলে–

'মুই খালি এইটা বুঝোঁ যে চুপচাপ বসে থাকিলে কুনো লাভ নাই; কুছু করা দরকার।...মরণ থাকিলে হোবে-মরণের ডরে ক্যাতোদিন নুকায় থাকিবেন, কহেন?'-[নাঢ়াই/পৃ.৪৩৩]

মরণ-ভয়কে উত্তীর্ণকারী কৃষকরা সবাই প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা নিয়ে ধানকাটার সিদ্ধান্ত নেয়। মহাজনদের দালাল সবুরাতু ও নির্মল সেনের কোনো ফাঁদেই এরা পা দেয় না। কৃষকদের এ সংগ্রাম, জাগরণ আর অনমনীয় মনোভাবের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হারানের নাতজামাই* ও *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* গল্পের বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'কুতুবালি তুই যদি না থাকিস তো তোর গিরথান সংসার চলাবা পারবে?'- দেলবর মণ্ডলের এমন প্রশ্নের জবাবে কুতুবালি অকপটে বলে-'মুই এইটা তো নিজের চোখে দেখিছোঁ যে আবেদালির মা-ও সংসারটা ভাঙ্গিবার দেয় নাই, মোর মন কহে, মোর গিরথান পারবো।' এমন সাহসের ওপর ভর করেই পশ্চিম কান্দরের ধান কাটার সিদ্ধান্ত হয়। সকাল হতেই সবার কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। পঙ্গপালের মতো কৃষকরা হাতে কাস্তে, লাঠি, তীর-ধনুক নিয়ে হাড়িটোলা, সাঁওতালপাড়া, পোলিয়াপাড়া থেকে বেরিয়ে আসে এবং ধান কাটা শুরু করে। এসময় কয়েকজন পাহারাদার নিয়ে জোতদার সাহা বাবুর বড় ছেলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেও কৃষকদের নড়াতে পারে না। উপরন্তু হাঁড়িপাড়ার ব্রজমোহন চিৎকার করে বলে-

'মহাজন, তমার হাতত বন্দুক একটা, কিন্তু হামার তীর ধনুক ক্যাতো গিলা ভাল করে দেখে লেন, তমরা একখান গুলি মারিলে হামরা পাঁচখান তীর মারিমো, বুঝেসুনে তমরা গুলি মারেন-হামাক তমরা বাধা দিবা পারিবেন নাই-তমরা এইঠে থে চলে যান।'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৪৩৫]

সার্বিক বিবেচনায় বিপদ এড়াতে সাহাবাবুরা লোকজন নিয়ে কেটে পড়ে। ফলে-'ঢাকের বাদ্য উত্তাল হয়ে ওঠে। সমস্বরে জয়ধ্বনি ওঠে- জোতদার মালিক শুনেন ভাই, হামরা সবাই তেভাগা চাই, নাঙ্গল যার জমি তার, জোতদার হুঁশিয়ার।' এভাবে মুহূর্তের মধ্যেই দুই বিঘা জমির ধান কেটে আটিগুলো বাঁহুকায় করে আধিয়াররা নিজ খোলানে নিয়ে আসে। আবেদালির কাছে বড় মহাজন, ঘোষ বাবু, চৌধুরী মহাজনদের থানায় যাওয়া ও পুলিশের ধরপাকড়ের ইঙ্গিত পেয়েও ক্লান্ত-শ্রান্ত কুতুবালি ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিনই মধ্যরাতে তাকে ধরতে বাড়িতে পুলিশ আসে। আবেদালির কথায় সে সতর্ক হয় এবং এ সৎছেলেকে সংসারের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে হাতে ধান কাটার কাস্তে তুলে নেয়। উদ্বিগ্ন স্ত্রী ফুলমতির-'তমরা কুনঠে যাবেন?' এমন প্রশ্নের জবাবে সে দৃঢ়ভাবে বলে-

'মুই জানোঁ না, কুনঠে যাবা হোবে, তাহো মুই যাঁছো- মোর না যায়া উপায় নাই, মোক নাঢ়াই করিবা হোবে।'-[*নাঢ়াই*/পৃ.৪৩৮]

এরপর কুতুবালি দ্রুত বেড়ার বাঁধন কেটে পিছন দিক দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে যায় এবং মাঝরাতের কুয়াশা মাখা গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ধানের নাঢ়াই করতে যাওয়া কুতুবালির আর বাড়ি ফেরা হয় না। অথচ এ কুতুবালিই প্রথম জীবনে নিজেকে দাবি করতো গজুয়া হিসেবে। কুতুবালির সঙ্গে ফুলমতির যুক্তজীবন এ উপন্যাসে তৈরি করে দ্বিতীয় প্রচ্ছদপট। ফুলমতির কাঁধে ভর দিয়ে গ্রামের মানুষের কুৎসা ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কুতুবালি আশ্রয় নেয় ফুলমতির দাওয়ায়। ফুলমতির মধ্যে যেমন জীবনের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা কাজ করে, তেমনি একদিন অকস্মাৎ কুতুবালির মধ্যেও জেগে ওঠে সুপ্ত পৌরুষ। নির্জিত অস্তিত্ব নিয়ে গ্রামের প্রবল আক্রমণের মুখে সে নিশ্চুপই ছিল। কিন্তু সবুরাতু দ্বারা আক্রান্ত হবার পর কুতুবালি তার চিরচেনা খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসে। বেপরোয়া সবুরাতুর প্রহারের প্রতিদানে কীটপ্রতিম কুতুবালি পাল্টা আঘাত হানে। নেকমরদের মাজার থেকে বিয়ে করা বউ ও ছেলেকে নিয়ে ফেরার পথে বিষাক্ত গহমা সাপের লেজ ধরে ছুঁড়ে মারার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক বিম্বিত করেছেন কুতুবালির অন্তর্গত তেজ ও সাহসকে।[২৪] তেভাগা-আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কুতুবালি চরিত্রের যে-পরিণামী উত্তরণ ঘটেছে- তা তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রান্ত।

সাত পরিচ্ছেদের *হালগিরস্তি*, নয় পরিচ্ছেদের *ঘর-সংসার* ও নয় পরিচ্ছেদের *নাঢ়াই* অর্থাৎ পঁচিশ পরিচ্ছেদের সমন্বিত রূপ এ *নাঢ়াই* উপন্যাস। *হালগিরস্তি* অংশে স্বামী হারিয়ে ও হালের গরুর অভাবে ফুলমতির দুঃসহ সংগ্রামমুখর জীবন; *ঘরসংসার* অংশে সংসার-সন্তানের স্থায়িত্বের জন্য কুতুবালিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বাছাই করে ভাঙা সংসার গড়ে তোলা; আর *নাঢ়াই* অংশে জোতদার-মহাজনদের অব্যাহত শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফসলের তেভাগার দাবিতে কুতুবালিদের লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথই প্রবল হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের মূল কাহিনি ফুলমতির সংসার জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও লেখক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, মিথ-পুরাণ ও ইতিহাসের নানা প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করেছেন। এসবের মধ্যে-লোকজ চিকিৎসা, পাঠশালার পড়া, ধানভানা, চিরাকুটা, উজানির মাছধরা, ছাগলের পাল দেখানো, মাজার জিয়ারত, বর্ণপ্রথা, ডাংগুয়াপ্রথা, গ্রাম্যবিচার-সালিশি, জিন-ভূতের বিশ্বাস, তাবিজ-কবচে বিশ্বাস, ধানের বতর, ধানের খাজনা, আধিয়ারি প্রথা, ভারতীয় পুরাণ, ইসলামি পুরাণ, আরব্যরজনীর গল্প, কিংবদন্তি, রূপকথা, চল্লিশা, সিন্নি, যাত্রাগান, আব্বাস উদ্দিনের পল্লিগীতি, জারিগান, ব'লো ভাইয়ের গান, ছড়া-প্রবাদ, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শবেবরাত, ঈদ, যাত্রাপালা, গোপীচাঁদের পালা, সার্কাস, নাগরদোলা, মেলা, হাটবাজার, আকাল, কলেরার মহামারি, ওয়াজ, মিলাদ মাহফিল, রক্ষিতাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, পলাশীর যুদ্ধ, সাঁওতালবিদ্রোহ, সিপাহিবিদ্রোহ, স্বদেশি-আন্দোলন, তেভাগা-আন্দোলন, ভারতছাড়-আন্দোলন, পাকিস্তান-আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বসমর ও

প্রজাস্বত্ব আইন বিশেষভাবে ভাষারূপ পেয়েছে। এসব বিচিত্র বিষয়কে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দরদ, দক্ষতা ও সহানুভূতি দিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপদান করেছেন।

আবার উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের কৃষকদের যাপিত জীবনপ্রবাহকে নিখাদ আর নির্ভেজালরূপে চিত্রায়িত করতে বহু আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষাবুলি যে-দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন– তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এর ভাষা সরল-ঋজু হলেও তা গভীর-গম্ভীর, ব্যঞ্জনাদীপ্ত আর চিত্রকল্পময়। আর আছে কৃষকজীবন ও সামন্তপ্রথার খুঁটিনাটি চালচিত্র। শব্দের গাঁথুনি মজবুত, বুনোট টানা, বর্ণনা চমৎকার এবং গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের উত্তর বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অতি নিপুণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ।[২৫] কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের ভূমিহীন বর্গাচাষিরা সংঘবদ্ধ হবার পথে অগ্রসর হয়। একদিকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, অন্যদিকে তীব্রতর হয়ে ওঠে আধিয়ার শ্রেণির ভূমির লড়াই। বস্তুত তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য হলেও ঔপন্যাসিক সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ক্যানভাসকে ব্যবহার করেছেন বিস্তৃত বর্ণনায়। উচ্চবিত্ত পুঁজিবাদী-জোতদার শ্রেণির স্বার্থে ও তাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সাম্যবাদী এ চেতনার সঙ্গে বুর্জোয়া রাজনীতির সমস্ত অপকৌশল ভ্রান্ত প্রমাণ করে কৃষকদের তেভাগার চেতনায় জেগে ওঠাই *নাঢ়াই* উপন্যাসের উজ্জ্বল প্রান্ত।[২৬] উত্তরবঙ্গের রুঠো প্রকৃতি আর রুষ্ট সমাজপতিরা মিলে হাজার বছর ধরে আধিয়ার কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে পেটের ভাত কেড়ে নেয়। স্থায়ী মারী-মঙ্গা, ক্ষুধা-দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় কৃষকদের খুব সহজেই শোষণের ফাঁদে ফেলে ধনী জোতদার-মহাজনরা রসিয়ে রসিয়ে তা উপভোগ করে। কিন্তু তারপরেও জোতদারদের এ দুঃশাসন-দৌরাত্ম্য, জুলুম-নিপীড়ন শেষপর্যন্ত চিরস্থায়ী হয় না। কারণ এ উত্তরবঙ্গের মাটিতেই জন্ম নিয়েছে কানু-সিধু ও নূরলদীনের মতো বিপ্লবীরা। এদের উত্তরসূরি হিসেবেই *নাঢ়াই* উপন্যাসে কুতুবালি-দেলবর-দীনেশরা তেভাগা-আন্দোলন গড়ে তোলে। পোড়খাওয়া আধিয়াররা শেষপর্যন্ত নিজেদের অধিকার আদায়ে জীবন বাজি রাখতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ লড়াইয়ের সমান্তরালে সমাজের অন্যায়, আপস, ভণ্ডামি, ভীরুতা, স্বার্থপরতা, সুখ, স্বপ্ন, প্রতিবাদ, প্রত্যয় আর জীবনের বোঝাপড়াও শওকত আলী সূক্ষ্মভাবে ছেঁকে-ছেনে তুলে এনেছেন। সার্বিক বিবেচনায় তেভাগা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নির্মিত *নাঢ়াই* বাংলা উপন্যাসের এক নতুন দিগ্বলয় উন্মোচিত করেছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে যেমন ফুলমতির প্রতীকে আধিয়ারশ্রেণির জীবনসংগ্রামের বৃহত্তর প্রচ্ছদপট অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি প্রান্তিক পর্বে কুতুবালির জাগরণে সামাজিক আন্দোলনের বাস্তবতাও প্রবল হয়ে উঠেছে। কারণ তেভাগার লড়াইকে শওকত আলী বৃহত্তর জাতীয় লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। তাই তিনি যেমন ফুলমতিকে জীবনের সমগ্রতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, তেমনি কুতুবালিকেও নির্জিত-নির্বীর্য করে রাখেননি। বরং জীবনের প্রয়োজনে রক্তে মিশে থাকা শাশ্বত লড়াই-সংগ্রামের চেতনাকে উস্কে দিয়েছেন এবং প্রতিবাদের যে-আগুনকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন গোটা উত্তরের সীমানায়– তা কখনো নিঃশেষ-নির্বাপিত হবে না। কারণ মাটি, মানুষ, শীত, বর্ষা, ফসল, ঘাম আর রক্তের সমন্বয়ে যে-গণআন্দোলনের জন্ম হয়েছে, তার কোনো ক্ষয়-লয়-মৃত্যু নেই। অপেক্ষা কেবল মহাকালের ডমরুতে আঘাত আর আহ্বানের।

মাদারডাঙার কথা

শওকত আলীর *মাদারডাঙার কথা* (২০১১খ্রি.) উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিভিন্ন দিক থেকেই বিশিষ্ট ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত। আধুনিককালের আবেগহীন বিজ্ঞান ও প্রাণহীন প্রযুক্তির অভিঘাত গ্রামীণ মানুষের লোকপুরাণ, লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের জগতে যে-ভয়াবহ বিপন্নতা ও অস্তিত্বসংকট বয়ে আনে; এরই প্রেক্ষাপটে লেখক *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসটি রচনা করেছেন। বাংলার গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকশ্রুতি কিংবা কিংবদন্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে ফকিরবিদ্রোহ, সিপাহিবিদ্রোহ, তেভাগা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মতো তিন শতাব্দীব্যাপী অতীত ইতিহাসের সব বিস্ফোরক ঘটনাতরঙ্গ। মাদারডাঙা অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের আধিভৌতিক মানসকাঠামোর শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। লেখকমাত্রই শেকড়স্পর্শী, ঐতিহ্যলগ্ন ও ইতিহাস-সন্ধানী। শওকত আলীও ইতিহাস-ইতিহ্য-লোকপুরাণ অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন ব্যক্তি ও গণমানুষের জীবনসংগ্রামের ইতিকথা। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের ভৌগোলিক ফ্রেমে উঠে এসেছে মাদারডাঙা-জনপদের ইতিহাস, লোকমানস এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনজঙ্গমতার বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গ।

পাঁচ পরিচ্ছেদের *একজন দৌলতালি* এবং নয় পরিচ্ছেদের *আব্বাস গজুয়ার কাজকাম* নামক দুটি পর্বের সমন্বয়ে এ উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে।[২৭] উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে জনচেতনার অন্তর্দেশে বহমান বিশ্বাস, ঐতিহ্যের সুবিশাল জগৎ ও তার বয়ান। চেতন-অবচেতন কিংবা বাস্তব-অধিবাস্তব আর স্বপ্নবাস্তবের যে-বয়ান শুরু করেন শওকত আলী; সেই বয়ান

সমকালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের জলজ্যান্ত চলচ্ছবি। প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চল হিসেবে ঔপন্যাসিক বেছে নেন বাংলাদেশের উত্তরভূমির একটি প্রান্তিক জনপদ। ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, সিপাহিদের মহাবিদ্রোহ, তেভাগা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথার প্রতিরোধী ঐতিহ্যে এই জনপদ ঋদ্ধ। ঔপন্যাসিক প্রতিরোধী ঐতিহ্যের এই জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে তাঁর উপন্যাসে প্রতিনিধি-চরিত্র হিসেবে দাঁড় করান দৌলতালি, সুজাত আলি মুনশি, শম্ভুনাথ মাহাতো কিংবা আব্বাস গজুয়াকে। বিদ্যমান বাস্তবতার বিপরীতে এরা প্রত্যেকেই লালন করে ভিন্ন আরেকটি চৈতন্য। এই চৈতন্যের মূল প্রোথিত বহমান লোকমিথ বা পুরাণ কিংবা ঐতিহ্যে। বিদ্যমান বাস্তবতার বিপরীতে সচেতনভাবেই ঔপন্যাসিক নির্মাণ করতে চান ভিন্ন আরেক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা অতীত থেকে রসদ নিয়ে ভিন্ন আরেক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে সক্ষম।[২৮] *The Power of Myth* (১৯৮৮খ্রি.) গ্রন্থের লেখক জোসেফ ক্যাম্বেলের মতো শওকত আলীও একথা বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে শওকতের ভাষ্য–

> ‘মীথ মানুষের বিদ্রোহের আর লড়াইয়ের স্মৃতি থেকে যায় তার অবচেতনার পরতে পরতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এবং তা বেরিয়ে আসে কখনো মন্ত্র বা গানের শোলক হয়ে, কখনো আঁকিবুকি টানা নক্সার ভেতর দিয়ে, আবার কখনো বা স্বপ্ন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে...কখনো লোককাহিনী বা লোকগীতি কখনো পট-পুতুল, কখনো বা প্রাণদেবতার পূজা বা মেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।’[২৯]

মিথের শক্তি ও সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন–

> ‘আমাদের দেশের অধিকাংশ মীথ যে অতীতের বহু বিদ্রোহ ও গণসংগ্রামের স্মৃতিকে ধারণ করে রেখেছে– এই ব্যাপারটা একাডেমিক বিবেচনায় খুব কমই গ্রাহ্য হতে দেখা যায়। সেই যুদ্ধের ইতিহাস থাকে যেগুলো ঘটে রাজায় রাজায়, কিন্তু রাজায়-প্রজায় যে নিরন্তর লড়াই চলে তার ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে?...তথাকথিত এলিট শ্রেণীর হস্তক্ষেপে মীথের প্রকৃত তাৎপর্য চাপা পড়ে যায়, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষ তার ভুল ব্যাখ্যাও দেয়া হয়ে থাকে– একটি মীথকে নিষ্প্রভ করার জন্য ভিন্ন মীথও তৈরি করা হয়।...এ শ্রেণি নিজ স্বার্থের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে স্বর্গের দেব-দেবীকে পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে দেয়।... যে স্মৃতি ও প্রেরণার সঙ্গে বিদ্রোহের ঘটনা জড়িত, তা প্রকাশ্যে উচ্চারণে দমন-পীড়নের আশঙ্কা থাকায় সে-সব স্বাভাবিকভাবেই চলে যায় বহু মানুষের অবচেতনায়।...আর তা গণমানুষের বিশ্বাস, বিস্ময়, লোকাচার, পূজা-পার্বণ-মেলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয়। আর এভাবেই ভূমিলগ্ন মানুষের লোকস্মৃতি আর লোকবিশ্বাস থেকে ইতিহাসের বাস্তবতা আবিষ্কৃত হয়।...মীথ কেবল অতীতের জিনিস নয়– তা বর্তমানেও এসে পড়ে জীবনযাপনের সূত্র ধরে। দূর অতীতের ঘটনা অবলম্বনে গড়ে ওঠা মীথ বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সাধারণ মানুষের চিন্তা ও লোকশ্রুতির মাধ্যমে। এভাবেই তৃণমূলের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, স্বপ্ন, উদ্দীপনা, অঙ্গীকার ও আশা একাকার হয়ে যায়।...তাই তৃণমূলের মানুষের মনের ভেতরে ঠাঁই নেয়া ওই মীথ ও স্বপ্নকল্পনা কখনো মরে যায় না।’[৩০]

এসব মিথই গ্রামীণ গণমানুষের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। মানব মনের এমন অবচেতনার collective sub-consciousness-এর শাশ্বত সত্যকেই শওকত আলী এ উপন্যাসে পরম যত্নে বিনির্মাণ করেছেন।

মাদারডাঙার কথা উপন্যাসে উল্লিখিত মাদারডাঙা ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম। সামরিক শাসক এরশাদের শাসনামলের চারটি বছর (১৯৮৫-১৯৮৯) এ উপন্যাসের সক্রিয় ঘটনাকাল। উপন্যাসের এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে– ‘পয়ষট্টি বছরের রাষ্ট্রপতির গলায় চেন আর চোখে কালো চশমা দিয়ে’ গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর কথা। তাই প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক হয়ে বসার পূর্বের স্বৈরশাসনকাল এর সক্রিয় ঘটনাকালের আওতায় পড়েনি। যদিও এর আখ্যান শুরু হয়েছে আঠারো শতকের ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহের (১৭৬০-১৮০০খ্রি.) মধ্য দিয়ে। মক্কা-মদিনার ইসলাম প্রচার করতে আসা আরব ও পারস্য দেশের পির-দরবেশ-সুফিরা অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষে এসেও মসজিদ ও মাজার গড়ে তুলেন। ইসলামে দীক্ষা এবং এর বিধি-বিধান শিক্ষাদান করার পাশাপাশি এরা দেশবাসীর সুখ-দুঃখের শরিকে পরিণত হন। অনেক সময় তারা জনগণের সঙ্গে মিলে শাসকদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। বাংলার ইতিহাসে এরকম একটি সংগ্রাম ফকিরবিদ্রোহ[৩১] নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের তাপ-চাপ থেকে মাদারডাঙার নিভৃত গ্রামটিও মুক্ত ছিল না। জনশ্রুতি মতে, বহুদিন পূর্বে এক বৃদ্ধ দরবেশ এসে মাদারডাঙার প্রকাণ্ড প্রাচীন পাকুড় গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তন্দ্রার মধ্যেই তিনি শুনতে পান ‘আর কত ঘুরবি, অনেক তো হলো, এবার কোথাও ডেরা বাঁধ এদিকে’–এমন এক দৈববাণী। এ গায়েবি আওয়াজে দরবেশের ঘুম ভাঙে। তিনি দেখতে পান বহুকালের ঠাকুর বেনেদের পোড়োভিটার মাঝখানের জায়গাটির উঁচু হয়ে ওঠা এবং সেখান থেকে মাটি ফেটে এগিয়ে যাবার দৃশ্য। ভয় পেয়ে দরবেশ হাতের আসাদণ্ডটি (লাঠি) মাটিতে ফেলে চিৎকার করে বলেন–‘পীর হুজুর দম মাদারের হুকুম, তুই এবার থাম।’ এভাবে পরিবেশ শান্ত হলে দরবেশ প্রাচীন মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে সোনার মহরভর্তি একটি কাঁসার ঘড়াও পান। এ টাকা দিয়েই তিনি কোম্পানি বাহাদুরের আমলে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) মাদারগাছ অধ্যুষিত জঙ্গল এলাকায় মাদারি[৩২] সম্প্রদায়ের জন্য মাদার পির বা দম মাদারের মাজার প্রতিষ্ঠা করেন। আর সাধনার সঙ্গে চালিয়ে যান ‘ফকিরালি’ ও ‘দরবেশি’ কর্মকাণ্ড। আস্তানার সঙ্গেই মাটির নিচে ছিল এক হুজরাখানা। এটি বাইরে ‘সাধনঘর’ হিসেবে

প্রচার পেলেও তা মূলত ছিল ফকির মজনু শাহ, মুসা শাহ ও চেরাগ আলীদের পরিচালিত ফকির-বিদ্রোহের মন্ত্রণাকক্ষ, কোম্পানির বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকে প্রাপ্ত টাকার কোষাগার এবং ফেরারি ফকিরদের আত্মরক্ষার নিরাপদ আশ্রয়। চারজন দরবেশ পরপর এ আস্তানাটি পরিচালনা করলেও পাঁচ নম্বর পরিচালক দরবেশ আস্তানাটি মাইল খানেক দূরে এক প্রকাণ্ড দিঘির পাড়ে নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানির গোরা সৈন্যরা এসে পুরাতন আস্তানাটি ঘিরে ফেলে। কিন্তু ধরতে আসা ফকির-দরবেশদের কোনো হদিশ তারা পায় না। গ্রামবাসীও এ রহস্যময়, কৌশলী ও নিশাচর ফকিরদের কোনো তথ্যও দিতে পারে না। তবে এ পরিত্যক্ত আস্তানার গুপ্তধনে ধনী হওয়া রাজু পণ্ডিত, তার বউ আকলিমা, আকলিমার ধর্মবাপ সুজাত আলী মুনশি ও দরবেশদের বীরত্বমূলক কর্মকাণ্ডের মুখরোচক গল্প গ্রামে প্রচার পায়। এ গল্প বলতে পারতেন বুড় দৌলতালি, হাসান শেখ এবং দোলগোবিন্দ বর্মণ প্রমুখ। এদের মধ্যে বুড় দৌলতালিই ছিলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য।

লোকমিথ ও লোকশ্রুতি নিস্তরঙ্গ গ্রামের মানুষ ও তাদের মনস্তত্ত্বকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে– তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মাদারডাঙা গ্রামের বুড়ো দৌলতালি। দৌলতালির জন্ম গ্রহণের রাতে তাদের বাড়িতে এক দরবেশ এসে অতিথি হন। কিন্তু তিনি সে-রাতেই আবার রহস্যজনকভাবে উধাও হন। তবে যাবার পূর্বে শিশু দৌলতালির মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে বলে যান–

> ‘শিশুটি ভারি পয়মন্ত, তাকে যেন ভালোভাবে মানুষ করা হয়–কারণ ভবিষ্যতে সে খুব বড় ধনী হবে।’-[এ.দৌ;নান্দনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১/ পৃ.৪৫]

দরবেশ দৌলতালির নামও ঠিক করে যান। দরবেশের ঘুমানোর জায়গায় একটি তাবিজও পাওয়া যায়। যাকে অশেষ পুণ্যময় মনে করে তাজিমের সঙ্গে তার গলায় বেঁধে দেয়া হয়। অন্যান্য গ্রামবাসীর মতো দৌলতালির বাবা-মাও দরবেশের এ ভবিষ্যৎবাণীকে অবহেলা করার সাহস পায়নি। তাই কষ্ট হলেও দৌলতালিকে তারা সাহাবাবুদের হাতে-পায়ে ধরে নারায়ণপুর করোনেশন হাই স্কুলে ভর্তি করে। কিন্তু শৈশবেই দৌলতালির মা গোলবানুর ভেদবমিতে মৃত্যু হলে তার বাবা ধলু মিয়ার তালাকপ্রাপ্ত বন্ধ্যা মেয়ে আসিমা বিবিকে বিয়ে করে। কিন্তু মেহ-প্রমেহরোগে হযরত আলীর মৃত্যু হলে দৌলতালিকে তার চাচা কুদরত আলি বুকে টেনে নেয়। ভাইয়ের দশ বিঘা জমি রক্ষার্থে সে আসিমা বিবিকে ডাং মারার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ চাচার মৃত্যু হওয়াতে জমির লোভে চাচাতো ভাইয়েরা দৌলতালিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এভাবে বারো বছর বয়সে দৌলতালি সংসার থেকে বেরিয়ে পড়ে। সে আর কখনো সংসারে ঢুকতে পারেনি। কখনো দিনমজুরি, কখনো দোকানের ফাইফরমাশ, কখনো গৃহস্থ বাড়ির টুকিটাকি কাজ করে দৌলতালির দিন কাটে। একটু খেয়ালি স্বভাবের হওয়াতে সে কোথাও স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি। আর গ্রামবাসীও অনাথ-অসহায়-এতিম দৌলতালির এ খামখেয়ালিপনাকে প্রশ্রয় না দিয়েও পারতো না। কারণ–

> ‘বটতলির হাশেমের দোকানে চুরি হয়ে গেলে সেই চুরি হয়ে যাওয়া মালের হদিস এনে দিয়েছিল… চৌধুরী বাড়ির ছোট ছেলেটিকে সাপে দংশালে শম্ভুনাথ মাহতকে ডেকে এনেছিল… ঘোর বর্ষার মধ্যরাতে জঙ্গল কান্দরে ঘুরে ঘুরে শেকড়–বাকড়গুলো খুঁজে এনে দিয়েছিল…জয় বাংলার যুদ্ধের সময় মিলিটারি আসবার খবরটি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে যথাসময়ে এনে দিয়ে সেনবাবু ও তালুকদার সাহেবদের গুষ্টিসুদ্ধ রক্ষা করেছিল…প্রধান বাড়ির ছোট গিন্নীর শিশু-সন্তান আইনুদ্দিন মাছ ধরার সময় যখন পানিতে ডুবে যাচ্ছিল, ওই সময় দৌলতালি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটিকে টেনে ডাঙায় তোলে।’-[এ.দৌ./পৃ.৪৪-৪৭]

এমন পরোপকারী, নির্ভীক আর নিবেদিতপ্রাণ দৌলতালি পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলেও ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে তার তেমন ভাবনা ছিল না। তার সকল চিন্তা ও ভাবনার রাজ্য জুড়ে ছিল জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরে দরবেশের সেই ‘বড় লোক হবার’ ভবিষ্যৎবাণী। দরবেশদের বাণী যে-কখনো মিথ্যা হয় না এবং এর যে-কোনো ব্যত্যয় ঘটে না–এমন অটল-অবিচল বিশ্বাস তার চেতনাকে গ্রাস করে। তাই সে–

> ‘জীবনভর মাটির তলার ধন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বয়স বেশি হওয়ার কারণে যতখানি নয়, তার চাইতে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে নজর রেখে চলার কারণে তাকে বেশি কুঁজো দেখায়। একটি চটের থলে থাকে তার কাছে সর্বক্ষণ। ওই থলের ভেতরে থাকে মাটি খুঁড়বার হাতিয়ার–একখানি ছোট খোন্তা আর সিঁদকাঠির মতো ছোট একখানি লোহার তৈরি জিনিস। কোমরের রশির সঙ্গে আরও একটি ছোট থলে ঝুলানো থাকে, তার ভেতরে কী, তা কেউ কখনো জানতে পারেনি।’–[এ.দৌ/পৃ.৩৯]

তার দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মাটি খুড়ে ধন তালাশি জীবনে তসিরুদ্দিনের বিধবা বউ আমিরণ বেওয়াকে বিয়ে করার ঘটনা একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায়। ‘লাঙল যার জমি তার–সাবধান জোতদার, ফসলের তিনভাগ। দুই ভাগ আধিয়ারের, এক ভাগ জোতদারের।’– এমন শ্লোগান নিয়ে তেভাগা আন্দোলনে অন্যান্য কৃষকের সঙ্গে বিনোদচরণ, আমানুল্লাহ, ঢেলা কিস্‌কু, বেলায়েত আর তসিরুদ্দিনরাও মাঠে নামে। জোতদার ঘোষ বাবু, সরকার বাবু, প্রধান মহাজন, তাদের পক্ষের থানা পুলিশ ও ভাড়াটে লাঠিয়ালদের সঙ্গে পীরগঞ্জ, ফুলবাড়ি, ডোমার ও ডিমলার মতো মাদারডাঙাতেও ভয়ানক লড়াই হয়। মহিম দাস চামার আর মধু শিকদারদের দালালিতে অন্যান্যদের মতো তসিরুদ্দিনও গুম হয়। নিরুপায় হয়ে সবজির

কারবার করা বিধবা আমিরণকে সন্ধ্যার পর সারা পথ নিরাপত্তা দিয়ে দৌলতালি বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এমন হিতাকাঙ্ক্ষী আর পরোপকারী দৌলতালিকে আমিরণ বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিত দিলেও দৌলতালি এ আহ্বানে সাড়া দেয় না। কারণ তার ধারণা জন্মায়–

> 'ব্যভিচার করলে পাপ হয় আর পাপ করলে এবং শরীর অপবিত্র হলে দরবেশ বাবার দোয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এই এক কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ ভয়।'–[এ.দৌ/পৃ.৮২-৮৩]

এসব কারণেই দৌলতালি নিজের মন ও লালসাকে দমিয়ে রাখে। কিন্তু এক চাঁদনী রাতে আমিরণের জেদ আর আগ্রহের কাছে তাকে পরাস্ত হতে হয়। চাঁদনী রাতের আদিম প্রেমলীলা তার জীবনে যুক্ত করে আরেক প্রচ্ছদপট। কারণ–

> 'দৌলতালির তখন শেষ যৌবন। কিন্তু মেয়ে মানুষের শরীরের স্বাদ প্রথম। কয়েকদিন ঘোরের মধ্যে কাটে। আমিরণও বহুকাল পরে নতুন করে জেগে ওঠে।'-[এ.দৌ/পৃ.৮৩]

দৌলতালি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমিরণের সংসারবৃত্তে বাঁধা পড়ে। দিনের বেলা বউ রোজগারের জন্য সবজি বিক্রি করতে গেলে ডাংগুয়া (ঘরজামাই) দৌলতালি ঘর-সংসার-সন্তানদের সামলাতো। কিন্তু সে অষ্টপ্রহর সংসারবৃত্তে আটকে থাকার লোক ছিল না। তাই 'মাঝবয়সী মেয়েছেলের উথলে ওঠা জওয়ানির দাপট সামাল' না দিয়ে সে ধনরত্ন খুঁজতে থলে-খুন্তে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তিন মাস পর ফিরে দেখে স্ত্রী আমিরণের ঘরে দুপুরবেলা এক অচেনা যুবক শুয়ে আছে। 'মোর মা দোসরা ডাংগুয়া থুইছে'– সৎছেলে আব্বাসের মুখে এমন কথা শুনে দৌলতালি অবাক হয়। আর তাই–

> 'তিনমাসও থাকতে পারেনি দৌলতালি আমিরণের সংসারে। মেয়ে জাতটার ওপর তার ঘেন্না ধরেছিল।...তার ভাগ্যেই সংসার নেই; থাকলে কি দরবেশ বাবা সে কথা বলতেন না?'-[এ.দৌ/পৃ.৮৪]

দরবেশের ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়ে অতি মাত্রায় ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত এক অলৌকিক ধারণা দৌলতালির ব্যক্তিসত্তাকে গ্রাস করে। ফলে তিন মাসের দাম্পত্যজীবনের এক বিরূপ অভিজ্ঞতা নিয়ে সে পূর্বের গুপ্তধন খুঁজে ফেরার জীবনে নামে। পরশপাথর খুঁজে ফেরা খ্যাপার মতো তাকেও এর পেছনে জীবন-যৌবন হারাতে হয়। এভাবে ব্যর্থতা আর শূন্যতায় ভরা জীবনসায়াহ্নে এসে দৌলতালি এক আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্বসংকটের মুখোমুখি হয়। মাদারডাঙা গ্রামেরই রাজু পণ্ডিতের নাতির ব্যাটা ঢাকাবাসী সৈয়দ আলী আফজাল গভীর নলকূপ প্রকল্প নিয়ে এসে হৈ চৈ ফেলে দেয়। আলী আফজালের উৎস কোম্পানি কাজের প্রয়োজনে বহুকালের অসংখ্য প্রাচীন মাদারগাছসহ পুরাতন মাজারের জঙ্গলটি কাটতে গেলেই দৌলতালি ক্ষেপে ওঠে। কারণ গ্রামের নাম বিলুপ্তির আশঙ্কা, বন-জঙ্গল বিনাশে বিষাক্ত সাপের লোকালয়ে আসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব, ফসলি জমি হারানো ও পুণ্যাত্মা ফকির-দরবেশদের অভিশাপ– সম্ভাব্য এ পাঁচ রকমের ভয় থেকেই সে প্রতিবাদ করে বলে–

> 'ও মহাজনের ব্যাটা... দোহাই তোমার, জঙ্গলখান কাটেন না বাহে, বহুত পুরানা, হামার দাদো পরদাদোর আমলের জঙ্গল–মান্দারের গাছ গিলা কাটে ফালালে হামার গাঁওয়ের নামখানাই ক্যাম্নে থাকে কহেন?'-[এ.দৌ/পৃ.৩৯]

এভাবে ঐতিহ্যবাহী, বহু দরবেশের দোয়া, হাজার মানুষের মানত-মানসিকের স্মৃতিবিজড়িত জঙ্গলের মাদারগাছ না কাটতে দৌলতালি অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয়। তাই সে আব্বাসের চাচাতো ভাই ফালু-মালু-দেলুদের উদ্দেশ্য বলে–

> 'জমিজমা থাকিবে নাই বাপু, কুনো গিরস্থের জমি থাকিবে নাই, খামাখায় তমরা অত চিন্তা করেন–মাদারডাঙার গাঁওখানই থাকে কি না পহিলে দেখো, তারপর জমির চিন্তা করেন।'-[আ.গ.কা/পৃ.১৪৫]

রাতের বেলা অভ্যাসবশত কোম্পানির মাদারগাছ ও মাটিকাটা জঙ্গলের গর্তে নেমে গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে সে বোরা সাপের কামড় খায়। তার আর্তচিৎকারে মানুষজন জড়ো হয় এবং গ্রামবাসী রাগে-ক্ষোভে আফজালের অফিসঘর ভেঙে তছনছ করে। আফজাল কৌশলে দৌলতালিকে চিকিৎসা করায়। কিন্তু আফজাল তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে জেলা শহরের বাসায় রাখে। আর কৌশলে পনেরো হাজার টাকায় তার জমি কিনে নেয়। আফজালের এমন প্রতারণা আর ভণ্ডামিতে দৌলতালি প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও দলিলে সই করার সময় ঠিকই বলে–

> 'তুমরাও মানুষ ভালো না বাহে, তুমরাও খুব খারাপ মানুষ, নষ্ট মানুষ, বুঝলেন?'-[আ.গ.কা/পৃ.১৫৫]

তাই আফজালের ব্যবস্থাপত্রের ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাক, দামি খাবার, টিভি, ভিসিআর এবং আরাম-আয়েশের বিলাসীজীবনও মাটির তলার খবর রাখা দৌলতালিকে আটকে রাখতে পারে না। আধুনিক প্রযুক্তির মায়াবী নাগপাশ ছিন্ন করে, নাগরিক জীবনের বন্দিশালা মাড়িয়ে সে আব্বাসকে নিয়ে রাতের বেলা মাদারডাঙার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জমি বিক্রির পনেরো হাজার টাকাকে আফজাল 'জমির গুপ্তধন' বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও দৌলতালি তা মেনে নেয়নি। বরং বিবেকের দংশনে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়–

> 'মনের ভেতরে লোভ না থাকলে টাকাগুলো সে নিল কেন? একজন জোর করে দিল, সেজন্য না হয় নিতে হলো, কিন্তু টাকা নিয়ে সে লুকিয়ে রইলো কেন?... সে নিজে তো ঐ টাকা জমিতে পায়নি, তাহলে ঐ টাকা সে নেয় কেমন করে?...ঐ জমি কি তার? ঐ

জমি ছিল তার বাবার, তার আগে তার দাদার, তারও আগে তার পরদাদার। তাহলে? জমিখানা তো তার নয়। সে তো অন্যের জিনিস বেচে দিয়েছে।'-[আ.গ.কা./পৃ.১৬৫]

নিজের সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া করতে করতে সে গ্রামে ফেরে। গ্রামে এসে আফজালের ডেইরি ফার্ম, মাজারকে পাকা করে পিরের দিঘিকে ঘিরে পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা এবং এলাকার কৃষকদের এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেবার কথা শুনে সে ক্ষেপে ওঠে। এ জন্য নিজের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের কথা পরিষ্কারভাবে আব্বাসকে জানিয়ে দেয়। তার প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য–

'সে-ও যাবে না ঐ মিথ্যেবাদীর আস্তানায়। মুখে বলে ভালো কথা, কিন্তু ভেতরে? ভেতরে যত শয়তানি আর লোভ। লোভ ছাড়া আর কী? জমি হাতাবার লোভ, জমির ভেতরকার যে প্রাণ আছে, সেই প্রাণ লুঠ করার লোভ। জমির আসল মালিক যে কিষাণ, সেই কিষাণকে চাকর বানানোর লোভ। সে আর যাচ্ছে না কখনো–পীর হুজুরের আস্তানায় সে পড়ে থাকবে, তাতে যদি জান চলে যায়, তো যাবে।'-[আ.গ.কা./পৃ.১৭২]

কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায়, জমির প্রাণ রক্ষায় আর গ্রামের নাম, প্রকৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার এক অঙ্গীকার নিয়ে দৌলতালি নিস্প্রাণ নগর ছেড়ে মাদারডাঙার শান্তির নীড়ে ফিরে আসে। এ প্রত্যাবর্তনের পথই আজন্ম সহজ-সরল ও সংসারবিবাগী দৌলতালিকে ঐতিহ্যসচেতন, মানবিক মুক্তি ও জনকল্যাণে সজাগ করে তোলে। পুঁজির পাপ, প্রযুক্তির প্রাণহীনতা, যান্ত্রিক-যন্ত্রণা যে-মানুষকে লোভী, লালসাগ্রস্ত, পাশবিক করে তোলে; নিজস্ব ঐতিহ্য ভুলিয়ে দাসে পরিণত করে এবং শেকড়ছিন্ন করে আত্মপরিচয়হীন তথা দিকভ্রান্ত করে– এমন চেতনা দ্বারা দৌলতালি নিজেকে ঋদ্ধ করতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে প্রযুক্তির দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে হুঁশিয়ার আর প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিয়ে যায়।

গ্রামজীবনের শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচার, লোকমিথের প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস ও বিস্ময় সরল-অসহায় মানুষকে অস্তিত্বসংকটে ফেলে। তবে এ মিথ তাদের কখনো কখনো শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অনুপ্রাণিত করে। যা দৈবপ্রেরণার মতো তাদেরকে সঙ্ঘশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। যার ধারক-বাহক মাদারডাঙা গ্রামের আব্বাস গজুয়া। তেভাগা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাবা তসিরুদ্দিনের মৃত্যু হলে তার মা তাদের পড়ালেখা ও সংসার ঠিক রাখতে হাটে-বাজারে সবজি বিক্রি শুরু করে। আবার সমাজশাসন বিবেচনায় নিয়ে প্রথমে দৌলতালি এবং পরে দিলবর মিয়াকে ডাংগুয়া (ঘরজামাই) রাখে। কিন্তু মায়ের অকাল মৃত্যুতে শুরু হয় আব্বাসের জীবনসংগ্রাম। ধকরবাপ দিলবর মিয়া বাড়ি ও জমিজিরাত দখল করতে তাকে বাড়ি থেকে তাড়ায়। কিন্তু প্রতিবেশী কালু শেখ তা সহ্য করেনি। কারণ–'তসিরুদ্দিনের সঙ্গে তার ভালো দোস্তি ছিল, আধিয়ার কিষাণের তেভাগা লড়াইতে সেও ছিল। একদিন দিলবর ব্যাটাকে ধরে এমন ঠ্যাঙানি দিল যে-সে বাপ বাপ বলে পালাতে দিশা পেল না।' এভাবে আব্বাসদের ঘরবাড়ি ও পাঁচ বিঘা আধির জমি সব কালু শেখের দখলে যায়। ফলে–

'মাকে হারিয়ে বোধবুদ্ধিতে খাটো আব্বাস গজুয়া কিছুদিন পথে পথে কেঁদে বেড়ায়। তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দিঘির পাড়ে এই আস্তানায় আসে এবং এখানেই থেকে যায়।'-[এ.দৌ/পৃ.৮৪]

আব্বাস পিরের দিঘির মাদারপিরের আস্তানায় ঠাঁই পায়। গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে টুকিটাকি ফাইফরমাশ খেটে আর পিরের আস্তানায় খাদেমগিরি করে তার নিঃসঙ্গ জীবন কাটে। মাজারের ওরশ, সিন্নি, ঢোল-বাজনার সঙ্গে ফকিরদের কাওয়ালী গীত–এসবেও আব্বাসের মনের শূন্যতা দূর হয় না। তাই সে মাজারের বেল ও ছাতিম তলায় বসে প্রকাণ্ড পিরের দিঘির স্বচ্ছ পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে পড়ে এ দিঘি তৈরি সম্পর্কে সুজাত আলী মুনশির কেচ্ছা। আবার মাথার উপর সূর্য এলে রোদের আলোয় বড় বড় গজার মাছের প্রকাণ্ড ঘাই মারা দেখে সে–'পীর হুজুরের আস্তাবলটি দেখতে পায়। সে একেকদিন স্পষ্ট করে দেখে ঘোড়াগুলো গা ঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আয়েস এবং আহার করছে।' এর সঙ্গে তার মনে পড়ে–

'এই এলাকায় এসেছিলেন এক বহুত বড় বুজর্গ পীর হুজুর। পানির ওপর দিয়ে হেঁটে আসেন তিনি।...তিনি একা আসেননি, তাঁর পেছনে পেছনে ছিল তাঁর সাগরিদরা।...দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি অবশ্যই ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিলেন বহুত দূরের দেশ থেকে। ডাঙা পথেই তাঁকে আসতে হয়েছে। কিন্তু পানির দেশে এসে...পানির পথই তাঁকে ধরতে হয়েছে। তাঁর আর তাঁর সাগরিদদের ঘোড়াগুলো পীর হুজুরের হুকুমে হয়ে যায় মাছ।'-[আ.গ.কা./পৃ.১০৪]

এলাকায় প্রচলিত পির-হুজুরের কিংবদন্তির কথা স্মরণ করাতে আব্বাসের বিশ্বাস আরো প্রগাঢ় হয়। কিন্তু আফজাল মাদারপিরের পরিত্যক্ত আস্তানার মাদারগাছসহ জঙ্গল কাটা শুরু করলে এর সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয় নিয়ে এলাকায় শুকুর মোহাম্মদ ও হায়দারের হুঁশিয়ারি শুনে আব্বাসও সচেতন হয়ে ওঠে। তার বারবার মনে পড়ে শিকলি দরবেশ বাবার সতর্কবাণী। তিনি বলতেন–

‘বানবান্য আসুক, কি মহামারী হোক, কিংবা দেখা দিক রাষ্ট্রবিপ্লব বা যুদ্ধ, সবই হয় মানুষের পাপের কারণে। মানুষ পাপ করে চলেছে বলেই তোমার চারদিকে এত অশান্তি।’-[এ.দৌ./পৃ.৮৬-৮৭]

পুঁজি আর প্রযুক্তির পাপ-তাপ আব্বাস গজুয়ার নিস্তরঙ্গ, নির্ভার ও নির্লক্ষ্য জীবনকেও ক্রমশই জটিল করে তোলে। কারণ পরিত্যক্ত মাজারের জঙ্গল কাটতে গিয়ে ফকিরবিদ্রোহে, সিপাহিবিদ্রোহে, তেভাগাবিদ্রোহে ও মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুবরণকারী অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল, করোটি ও হাড় বেরিয়ে এলে সহজ-সরল গ্রামবাসী ক্ষেপে ওঠে। এ নিয়েই শুকুর মোহাম্মদ, বলরাম আর অর্জুন মুর্মুদের ডাকে (১৯৮৮ সনের ২৯ মার্চ) ভোরবেলা উত্তেজিত গ্রামবাসী আফজালের উৎস কোম্পানির অফিস ঘর ভেঙে ফেললে পুলিশি ধরপাকড় ও জেলজুলুম শুরু হয়। তদন্ত করতে আসা পুলিশের ধমকে আর ক্ষুধার যন্ত্রণায় এক পর্যায়ে গজুয়া আব্বাস তার নির্বীর্যের খোলস থেকে বেরিয়ে সাহসী সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু এলাকার কাসেম চেয়ারম্যান, দালাল পোহাতু মণ্ডল, উৎস কোম্পানির আফজাল আর ম্যানেজার বাটু বেলালের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ আব্বাসকেই গ্রেফতার করে। এ পর্যায়ে হাবাগোবা আব্বাসের কাছ থেকে চাচাতো ভাই ফালু, মালু ও দেলুরা প্রতারণা করে জমি লিখে নেবার ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হয়। এ জেলজুলুমকে কেন্দ্র করে আফজাল নতুন খেলা খেলে। আফজাল নিজের খরচে উকিল-মোক্তার ধরে খুব সহজেই আব্বাসকে মুক্ত করে ঠাকুরগাঁওয়ের বাসায় তোলে। আর ধকর বাপ দৌলতালির সঙ্গে তারও জমি পনেরো হাজার টাকায় কৌশলে কিনে নেয়। কিন্তু পিরের দিঘির বহুকালের গজার মাছ মেরে নতুন করে মাছের চাষ, পুকুরপাড়ে রেশমের চাষ আর মাদারপিরের দরবারকে পাকা করে পর্যটন এলাকা বানানোর কথা জানতে পেরে আব্বাস ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাই আফজালের বাসার বিলাসীজীবন ছেড়ে ধকরবাপ দৌলতালিকে নিয়ে রাতের বেলা মাদারডাঙার উদ্দেশে হাঁটা শুরু করে। ‘বিহান হোক, বিহানের বাস গাড়িতে চড়ে যামো’–দৌলতালির এমন কথায় সে বিরক্ত হয়। আর ক্ষোভের সঙ্গে জানায়– ‘তুমরা না যান, মুই একেলা যামু, বুঝিছ বুড়া? ঐ শয়তানের বাড়িত মুই আর কুনোদিন যামু নাই।’ আব্বাস হাঁটে আর পুনরায় বলে–

‘শালারা কহে হামার পীর হুজুরের দিঘিটাক থুবে নাই। মাজার খানক দালান বানাবে। ক্যান মাটির মাজার থাকিলে কি হয়? বড়লোকের মন আসিবা চাহে না, না? ক্যানে, কুন কালের হামার এ মাজার খান–হামার পীর হুজুর নাঢ়াই করিছিল কি ধনী লোকের তানে? আঁ? শয়তানি খান দেখিছেন? শাল মাছ গিলাক নাকি থুবে নাই– আরে শয়তানের পয়দা! উগিলা মাছ নহে, হামার পীর হুজুর আর তার সাগরিদদের সব ঘোড়া– ফের নাঢ়াই হইলে ওই ঘোড়াত চড়ে হামার পীর হুজুর নাঢ়াই করিবা যাবে। ওই ঘোড়া গিলাক ওষুধ খিলায় মারিবার চাহে– শালারা গজব পড়িবে তুমহার উপর! গজবের আগিনত জ্বলে শালারা খাক হয়ে যাবেন।’-[আ.গ.কা./পৃ.১৭২]

এসব কথা বলতে বলতে আব্বাস জোর কদমে হাঁটে। বৃদ্ধ দৌলতালি–‘আয় বা, কনে জিরায় লি’ বলে বিশ্রাম নিতে চাইলে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে আব্বাস চিৎকার করে বলে–

‘না চাচা, হামার জিরাইবার সময় নাই। কেহ দুনিয়াত জিরায় না, আসমানের চান্দ সুরুজ দেখেন, গাছ বিরিখ দেখেন, ভূঁইয়ের ফসল দেখেন, কেহ জিরায় না। মাটিতে গাছ গাজায়, সেয়ানা হয়। ফুল ফুটে, ফল ধরে। তারপর ঝরে যায়–ঝরে যায় মরণ হলে, তার আগে জিরান নাই। মরণের আগে হামারও জিরান নাই। হামাক পীরের মাজারত পুঁহুচিবা হোবে। যায় কবা হবে– হুঁশিয়ার সভায়, দুশমন আসিবা নাগিছে, তৈয়ার থাকেন।’-[আ.গ.কা./পৃ.১৭২]

এভাবে জীবন-মরণ কবুল করে, মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে আব্বাস পিরের মাজার ও দিঘিকে রক্ষা করার শপথ নিয়েই পথ চলে। গ্রামে ফিরে অদৃশ্য শত্রুর সর্বনাশা থাবা থেকে গ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে এবং গ্রামের নাম-নিশানাকে রক্ষার জন্য গ্রামবাসীকে জাগাতে আর সতর্ক করার গুরুদায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ‘কে শুনবে তোর হুঁশিয়ারি?’– দৌলতালির এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আব্বাস দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়–

‘সভায় শুনবে...মাজার খান শুনবে, দিঘির পানি শুনবে, পাড়ের গাছ বিরিখ শুনবে, পাইখ পাখালি শুনবে, পীর হুজুরের যে সাগরিদরা শহীদ হয় কবরত আছে, তারা শুনবে, দিঘির ভিতর যে ঘোড়া গিলা মাছ হয় চরে বেড়াছে তারা শুনবে–কহ কে না শুনবে।’-[আ.গ.কা./পৃ.১৭৩]

চারপাশের প্রাণ আর প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এবং গণমানুষের সঙ্ঘশক্তিকে আশ্রয় করে আব্বাস গ্রামে ফেরে। তার জীবনের নিত্যসহচর, অস্তিত্বের অংশীদার, বেঁচে থাকার অবলম্বন, ইতিহাস-ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী মাজার ও দিঘিকে নিষ্কলুষ-নির্মল রাখতে, প্রযুক্তির পাপ থেকে মুক্ত রাখতেই আব্বাস এ লড়াই-সংগ্রামে দীক্ষিত হয়।

পুঁজিপতি ও ঠিকেদারি মনস্তত্ত্বের লোভ-লালসা, নাগরিক জীবনের আলো-অন্ধকার, আপস-ভণ্ডামি ও সর্বগ্রাসী প্রবণতার পরিচয় মেলে সৈয়দ আলী আফজালের মাধ্যমে। আফজাল মাদারডাঙা গ্রামের গুপ্তধনে ধনী হওয়া রাজুপণ্ডিত ওরফে রাজ মোহাম্মদ পণ্ডিতের নাতির ব্যাটা। সে ঢাকানিবাসী, পেশায় ঠিকেদার এবং উৎস কোম্পানির স্বত্বাধিকারী। প্রায় দুই বছর বসে থেকে আফজাল ঠাকুরগাঁওয়ের মাদারডাঙা গ্রামে গভীর নলকূপ বসানোর কাজ পায়। বিশাল সম্ভাবনার এ

কাজটিতে–‘টাকা দেবে বিশ্বব্যাংক, খবরদারি করবে সরকার, দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর কাজ করবে আফজালের উৎস লিমিটেড।’ এতগুলো প্রতিষ্ঠান আর এর কর্তাব্যক্তিদের খুশি করে কাজ শেষ করতে পারাটাই তার জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বহু ঝুঁকি থাকার পরেও তাকে এ কাজ করতে হয়। কারণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহবুব বলেছে–‘এই একটা সুযোগ তোর–যদি কাজটা গুছিয়ে করতে পারিস, তাহলে দেশের বাইরে থেকে তোর কোম্পানির ডাক পড়বে।’ এ জন্যেই সে দুই বছর ধরে কাজটি পেতে নানা জনকে উপহার দিয়েছে ও টাকা-পয়সা ঢেলেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বন্ধু আকরামের রূপসী বউ কামরুনকে ব্যবহার করে কাজটি বাগাতে সক্ষম হয়। এর জন্য কামরুনকে ব্যাংককে বেড়িয়ে আনাসহ শপিং এবং আকরামকে হোটেল খরচ ও হুইস্কির বোতল দিতে হয়েছে। দুই কোটি টাকার কাজের জন্য কামরুন আরো কিছু চাইলে তাকে সে-আবদারও রক্ষা করতে হতো। এ নিয়ে বন্ধু আকরাম অযথা সন্দেহ করায় আফজাল বলে–

> ‘যে গরু দুধ দেয় তাকে ভালোভাবে খাওয়াতে হবে না?...কামরুনের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে বলে আকরামের সন্দেহ হচ্ছে। হোক, হতেই পারে। সে নিজে ধোয়া তুলসী পাতা নয়– কামরুনও নয়– আর আকরাম তো নয়ই। বরং বলা যায়, সে উল্টো অর্থে তুলসী বনের সাক্ষাৎ বাঘ। নিজে সতেরো রকমের মেয়ে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে– আর বউ একজন দু’জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই আপত্তি।’-[এ.দৌ./পৃ.৬৩]

আফজালের এ উক্তির মাধ্যমে কর্পোরেট পুঁজিপতি নাগরিক সমাজের চারিত্রিক অধপতন, মূল্যবোধের অবক্ষয় আর পুঁজির পাপ-পঙ্কিলতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। এখানে বিত্তের কাছে মানবিক সম্পর্ক দেদারে বিকিয়ে যায়। অর্থ ও বিত্ত-বিলাসের জন্য নিজের বউকেও এরা ভোগের ভেট ও সমৃদ্ধির সিঁড়ি বানাতে সঙ্কোচবোধ করে না। এভাবে নারী (বন্ধুর বউ), টাকা আর উপঢৌকনের মাধ্যমে পাওয়া গভীর নলকূপ বসানোর কাজ নিয়ে আফজাল পূর্বপুরুষের ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরের মাদারডাঙা গ্রামে আসে। তার আধুনিক প্রযুক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আগমন ঘটায় পির-দরবেশের নানা কিংবদন্তি, মাজারের নানা মোজেজায় বিভোর নিস্তরঙ্গ-নিভৃত গ্রাম ও গ্রামবাসীর মনে সহজেই ছন্দপতন ঘটে। মাদারপিরের পরিত্যক্ত আস্তানার প্রাচীন মাদারগাছের বহুকালের পুরাতন জঙ্গলটি কেটে গভীর নলকূপ বসানোর কথা শুনেই দৌলতালি, আব্বাস গজুয়া, শুকুর মোহাম্মদ, হায়দার, অর্জুন মুর্মু, বলরাম বর্মণরা নানা অকল্যাণ আর অশুভ পরিণতির আশঙ্কা করে। ঠিকেদারি স্বভাবে সে স্থানীয় উপজেলার চেয়ারম্যান, ইউ. পি চেয়ারম্যান, মেম্বার, জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী, থানা-পুলিশকে টাকা ও উপহার দিয়ে আয়ত্তে আনে। আবার টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রামের হিন্দু-মুসলিম-আদিবাসী কৃষকদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়। এলাকার প্রভাবশালীদের হাতের মুঠোয় আনার পরেও আফজাল গ্রামের সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট করতে বিশাল এক ভূরিভোজের আয়োজন করে। গ্রামবাসীর বিশ্বাস-বিস্ময়-আস্থা-আবেগ-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে সম্যক ধারণা না নিয়ে মাদারগাছ কাটতে গিয়ে সে গ্রামবাসীর বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু এসবকে গ্রামবাসীর কুসংস্কার ভেবে ও দৌলতালিকে ‘ওল্ড হ্যাগার্ড’ অভিহিত করে মাদারগাছ কাটা অব্যাহত রাখে। ফলে পিরের দরবারে আসা শিকলি দরবেশ বাবার কাছে হায়দার প্রতিবাদ করে বলে–

> ‘মাদার গাছের জঙ্গলখান কাটে ফালাছে–হামার খুব চিন্তা–কী হয় কে জানে। সাপে কাটে না ব্যারাম হয়। নাকি বান আসে, আল্লাহ জানে।...ওসব গাছ কি আজকের? এ খুব খারাপ কাজ–এর শাস্তি পেতে হবে, দেখো তোমরা, কেউ না কেউ এর শাস্তি পাবেই।’-[এ.দৌ./পৃ. ৮৭]

এসব কথায় গ্রামবাসীর মনে চাপা আতঙ্ক আর ভয় বিরাজ করে। শ্রমিকদের দুই দলে ভাগ করে একই সঙ্গে জঙ্গল কাটা আর পুরনো আস্তানার ভিত খুঁড়ে ভাঙা ইট-আবর্জনা তোলার কাজ জোর গতিতে চালিয়ে যায়। আর কালো গহমা সাপের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত শ্রমিকদের সাহস যোগাতে কয়েক গ্যালন কার্বোলিক এসিড ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু মাটি খুঁড়তে গিয়ে কিছু পাজরের হাড় ও অন্যান্য টুকরো উঠে আসায় সবাই ক্ষেপে ওঠে। আফজাল নতুন করে অন্য কোনো গর্ত না করে খোঁড়া গর্তেই কাজ চালিয়ে যাবার হুকুম দেয়। এ উটকো ঝামেলার কারণে রাতের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতায় আফজালের মন বিগড়ে ওঠে। কিন্তু চতুর পোহাতু মণ্ডলের তৎপরতায় বাটু বেলাল এক সাঁওতাল যুবতী নারীকে তার তাবুতে রাতের প্রমোদসঙ্গী হিসেবে নিয়ে আসায় *Man Hunger* পর্ণোগ্রাফিসদৃশ গ্রন্থে যৌনসুখ খোঁজা আফজাল খুশিই হয়। এ পর্যায়ে–

> ‘মাদারডাঙার বিধ্বস্ত প্রাচীন জঙ্গলখানির পাশে আলী আফজাল একাকী দাঁড়িয়ে থাকে আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। এই প্রাচীন গ্রামখানির এখন সেই অধীশ্বর। এর প্রাচীন বৃক্ষগুলি সে কেটে ফেলেছে। প্রাচীন ভূমিকে সে ক্ষতবিক্ষত করেছে, এখানকার পুরুষরা হয় তার দাস নতুবা সহযোগী, তাহলে কি তুমিই রাজা?’–[এ.দৌ./পৃ.৯৫]

আসলে মধ্যযুগের সামন্ত রাজা-জমিদারদের মতো পুঁজিপতি আফজালও পুঁজির দাপটে মাদারডাঙা গ্রামের সকল জমিকে গ্রাস করতে, সকল জরুকে (নারী) ভোগ করতে আর সকল পুরুষ-কৃষকদের দাসে পরিণত করতে চেয়েছে। কারণ বর্তমানকালের এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও যান্ত্রিকসভ্যতা মিলে মানুষকে ক্রমশই এক নয়াদাসত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আফজালও এ আধিপত্যবাদী, ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোরই একজন যোগ্য প্রতিনিধি। আফজাল ফুরফুরে মেজাজে আদিবাসী সাঁওতাল নারীর সঙ্গে আদিম লীলারসে রাতকাটাতে গিয়েও শেষপর্যন্ত তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারে

না। শেষ রাতের দিকে আস্তানার খোঁড়া গর্তে গুপ্তধন খুঁজতে এসে দৌলতালি বোরা সাপের দংশনে আর্তচিৎকার করে ওঠে। সবদর মোল্লার হাঁকডাকে চারপাশের লোক ছুটে আসে। সাপের ওঝা ডাকার পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী শাবল, কোদাল, গাঁইতি দিয়ে গর্তের মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। আর তাতেই–

> 'বেরুতে থাকে মুণ্ডুর পর মুণ্ডু, কঙ্কালের পর কঙ্কাল, হাড্ডির পর হাড্ডি। যে হাতিয়ার দিয়েই আঘাত করে তাতেই মাটির তলা থেকে লাফিয়ে ওঠে করোটি আর কঙ্কাল। কতদিনের কেউ জানে না। যারা মাটি খুঁড়ে ওই সব বার করে তারা হয়তো নিখোঁজ হওয়া আত্মীয়-স্বজন কিংবা চেনাজানা মানুষগুলোর কথাই স্মরণ করে। কিন্তু কে বলবে তাদের এই...হাড়-হাড্ডি-কঙ্কালগুলো পাকিস্তানি সেপাইদের লড়াইয়ের সময়কার, কিংবা তারও আগের দেশের বাঘী সেপাইদের বিদেশি গোরা সেপাইদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়কার, বা তারও আগের...ফকির মজনু শাহের আর তার সাগরিদ মুসা শাহ আর চেরাগ আলী শাহের ফকিররা কোম্পানি সেপাইদের বিরুদ্ধে তিরিশ বছর ধরে লড়াই করেছিল গ্রাম থেকে গ্রামে, জঙ্গল থেকে জঙ্গলে আর কান্দর থেকে কান্দরে।'-[এ.দৌ/পৃ.৯৭]

মাদারডাঙার নিঃসম্বল, নিরক্ষর, নিরন্ন কৃষকেরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে তেভাগার লড়াই, সিপাহিবিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহের অতীত ইতিহাস আর হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া দেশবাসীর হদিশ ঠিকমতো না জানলেও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ধানের লড়াইয়ের গুম-হত্যার শিকার হওয়া বীরযোদ্ধা তসিরুদ্দিন, বিনোদচরণ আর ঢেলা কিস্‌কুদের স্মরণ করে এবং তাদের উত্তরসূরি হিসেবে শুকুর মোহাম্মদ চিৎকার করে বলে–

> 'দেখো রে ভাই, হামার মাদার গাছ গিলা কাটে ফালাইছে শালারা–কহেন দি কুন দোষ করিছিল হামার দাদোর পরদাদোর আমলের গাছগিলা? কহেন তোমরা? হামার গাঁওয়ের নাম কী? মাদারডাঙা না? ওই গাছের নাম হামার গাঁওয়ের নাম–শালারা গাছ গিলা কাটে হামার গাঁওয়ের নাম মুছে ফালাবার চাহে–কহেন তোমরা; এইটা কি ঠিক কাম? তোমরা মানবেন?'-[এ.দৌ./পৃ.৯৮]

এসব বিস্ফোরক কথায় গ্রামবাসীর শরীর-মনে ক্রোধ আর জ্বালা টগবগ করে। আর 'না, না'– বলে চিৎকার করে ওঠে। **'হামার কমরত কি জোর নাই? হামার বাঁহুকা গিলা কি হ্যারায় ফালাইছি? হামরা কি সভায় নিমরদ হয়–এ গেইছি? শালারা হামার বহু বেটির ওপর নজর দেয়–এ্যাত্তো সাহস?'**–শুকুর মোহাম্মদের এমন কথায় উত্তেজিত জনতা নিমিষেই আফজালের অফিস ঘর তছনছ করে। এ নিয়ে আফজাল মামলা দিয়ে আব্বাস গজুয়া, অর্জুন মুর্মু, শুকুর মোহাম্মদ আর বলরাম বর্মণকে জেলে ঢোকায়। আবার কৌশলে নিজেই আসামিদের ছাড়িয়ে এনে এলাকাবাসীর বাহবা কুড়ায়। ঢাকায় গিয়ে বন্ধুপত্নী ও প্রমোদসঙ্গিনী প্রেমিকা কামরুনকে মাদারডাঙায় ভেজিটেবল, পোলট্রি, ডেইরি, ফিশারিজ আর শস্য প্রকল্পের কথা বলে পার্টনারশিপের জন্য রাজি করায়। এ লক্ষ্যকে সফল করতেই খুব কৌশলে জমি হারানো কৃষক ফালু, মালু, দেলুসহ আদিবাসীদের নিজ ফার্মে দিনমজুরির চাকরি দেবার অগ্রিম ঘোষণাও দেয়। পিরের দিঘি আর মাজারকে ঘিরে সে ভেজিটেবল, ফিসারিজের সঙ্গে সঙ্গে সিল্ক-হর্টিকালচার আর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ফন্দি আঁটে। পিরের মাজার ও দিঘির কাছে গিয়ে নীরব-নিস্তরঙ্গ এলাকার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে হিসেব করে আর বলে–

> 'মাজারটি পাকা করে ঘরটর যদি বানিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে ভক্তরা এখানে আসবে তো বটেই, তারা রাতও কাটাতে পারে। দিঘির পাড়ে পাকা রাস্তা থাকবে পায়ে চলার জন্য। রাস্তার পাড়ে থাকবে দোকান-পাট আর দিঘির পাড়ে থাকবে স্পিডবোট, টুরিস্টদের জন্য।...হ্যাঁ তখন আর দিঘি বা বিল বলা হবে না। বলা হবে লেক। আর ঐ লেকের গভীর পানিতে থাকবে অসংখ্য মাছ–ঐসব মাছের আকার আকৃতিও হবে দেখবার মতো। সব মিলিয়ে নতুন এবং বিখ্যাত একটা জায়গা হয়ে দাঁড়াবে মাদারডাঙা, একেবারেই নতুন একটা জগৎ।'-[আ.গ.কা./পৃ.১৪৯-১৫০]

এসব লাভের হিসেব বাস্তবায়নে আফজাল ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাও ঠিক করে। তাই প্রথমে বিরাগভাজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিক শুকুর মোহাম্মদ, অর্জুন মুর্মু ও বলরাম বর্মণকে লেবার না করে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ দেয়। আর নারীদের ক্যারিয়িং ও ইটভাঙার কাজ দিয়ে অন্যান্যদের মতো অর্জুন মুর্মুর প্রতিবাদী বউ টুরিকেও বশে আনে। অবশেষে ডিপটিউবওয়েলের বের হওয়া পানির ঢলে গ্রামবাসীর মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য ও খুশির জোয়ার দেখে আফজাল বিজয়ীর হাসি হাসে। মাদারডাঙা নিয়ে ভবিষ্যৎ স্বার্থের হিসেব-নিকেশে সে বিভোর হয়। তাই যখন সে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়–

> 'তখনও তার মনে ছবির পর ছবি উঠছে। একদিকে মাজার আর মসজিদের মিনারটি, বোটে করে টুরিস্ট মেয়ে পুরুষ ক্রুইজিং করছে, পাড়ের চারদিক ঘিরে নানান ধরনের গাছ, বাইরের দিকে দোকান আর মানুষের বিরামহীন কোলাহল, দিঘির পানি স্বচ্ছ আর টলটলে, সূর্যের আলোয় পানির নিচের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, মাছেদের আঁশে সূর্যের আলো চিকচিক করে ওঠে।'-[আ.গ.কা./পৃ.১৭১]

আফজাল একবিংশ শতাব্দীর নতুন পরিবর্তিত সময়ের মানুষ, মাদারডাঙা নিয়ে তার ভাবালু আবেগ নেই বরং রূপান্তরিত সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সে পৈতৃকভিটার উপর নির্মাণ করতে চায় আগামী দিনের অর্থসমৃদ্ধ নানা পরিকল্পনা। নাগরিক রস-রুচি নিয়ে বেড়ে ওঠা আফজাল তাই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় অপরিবর্তনীয় গ্রামজীবনের নিশ্চলতা ও স্থবিরতা। তারপরেও বিত্তবান ঠিকেদার আফজাল পুঁজি ও প্রযুক্তির অভিঘাতে মাদারডাঙার নিস্তরঙ্গ জনপদ ও জনমনে পালাবদল ঘটাতে সক্ষম হয়। পুঁজির প্রভাব, প্রযুক্তির শক্তি ও নিজ চাতুর্যে ভর করে সে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করে

যায়। তার আয়ত্তের শক্তি-সক্ষমতার কাছে গ্রামবাসীর আবেগ, বিশ্বাস আর বিস্ময়ের অনিবার্য পরাভব ঘটে। এটিই পুঁজি ও প্রযুক্তির ধর্ম।

গ্রামজীবনের সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার-লোকশ্রুতি, পুরুষতন্ত্রের পাশবিকতা ক্ষতবিক্ষত করে আকলিমা, আমিরণ ও শরিফন্নেসার মতো নারীদের। তবে জীবনের প্রয়োজনে এরা কখনো কখনো পুরুষ অভিভাবক ও সমাজবিধাতা পুরুষের আধিপত্য মারিয়ে দ্রোহের চেতনায় উজ্জীবিত হয় এবং ব্যক্তিসত্তার জাগরণ ঘটাতেও সক্ষম হয়। আকলিমা খাতুন কুতুবালি সরকারের মা মরা মেয়ে। শৈশবেই তাকে গামহারডাঙার সুজাত আলী মুনশি পালতে নেন। যথা সময়ে রাজুপণ্ডিতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দুই বছর পর আকলিমা যখন গর্ভবতী, তখন তার ছাগল ভানুমতি হারায়। বহু খুঁজে বিফল হয়ে আকলিমা ধকর বাপ সুজাত মুনশিকে দিয়ে 'আল্লাহু ও বিচিত্র নক্‌শা কাটা' এক পুণ্যবান তাবিজ বানিয়ে আনে। ভক্তি ও বিশ্বাস থেকেই আকলিমা স্বামীর গলায় তা বাঁধতে গেলে তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ হতে হয়। নিরুপায় হয়ে আকলিমা নিজের গলায় তাবিজটি বেঁধে মাদারপিরের পরিত্যক্ত জঙ্গলের পোড়োবাড়িতে গিয়ে নিখোঁজ ভানুমতির সঙ্গে গুপ্তধনও পায়। তবে মোহরভর্তি গুপ্তধনের কলসটি তুলতে গিয়ে বোরা সাপের কামড় খায়। তারপরেও না ঘাবড়িয়ে–'দম দম মাদার বাবা ইয়া দম মাদার' নাম জপে কলসটি তুলে ঘোর সন্ধ্যাবেলা চুপিসারে বাড়ি পৌঁছায়। ফেরার পথে বটতলার অন্ধকারে সাদা কাপড়ে মোড়া লম্বা একটি জ্বিনকেও সে দেখে। আর ততক্ষণে–

> 'তার বোঝা হয়ে গেছে যে, যতক্ষণ তাবিজখানি তার গলায় আছে, ততক্ষণ তার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। বাবা পীর মাদার তাকে রক্ষা করবে। জ্বীন, ভূত, ডাইন, মাশান তার গলার তাবিজখানির কাছে কিছুই না।'–[এ.দৌ./পৃ.২৬]

এমন আত্মবিশ্বাস থেকেই আকলিমা সর্পাঘাত নিয়ে তেমন চিন্তিত হয় না, বরং সরল বিশ্বাসে স্বামীকে গুপ্তধন পাবার কথা জানায়। পাঁচদিনের দিন হাতের ক্ষতস্থানটি ফুলে উঠে দুর্গন্ধ ছড়ালে আর কষ বের হলে আকলিমার টনক নড়ে। হাতখানা দেখিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে–'ডাকতর কবিরাজ দেখান, হাতের ঘাওখান তো বাড়ে যাচ্ছে।' কিন্তু রাজুপণ্ডিত ক্ষতস্থান দেখে নীরব হয়ে থাকে। গ্রামের আকালুর মা তার দুর্দশা দেখে হাঁড়িপাড়ার বলরাম ওঝাকে ডেকে আনে। বলরাম তাকে চিকিৎসা করে; তবে যাবার সময় কৌশলে তার গলার পুণ্যবান তাবিজটি নিয়ে যায়। সেদিন রাতেই আকলিমা স্বপ্নে দেখে–

> 'সফেদ চুল দাড়িঅলা এক বুড়ো তার গলার তাবিজখানা দেখতে চায় প্রথমে, তারপর দেখতে না পেয়ে খুব রাগ করে বলে, মোহরভর্তি ঘড়াটা যেখান থেকে তুলে আনা হয়েছে সেখানেই যেন রেখে আসা হয়– না হলে পরিণাম খুব খারাপ হবে। বুড়ো যেমন ধমকায় তেমনি শাসায়।'-[এ.দৌ./পৃ.২৮]

ঘুম ভাঙলেই আকলিমা মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে। কারণ ততদিনে তাবিজ আর মোহরভর্তি ঘড়া দুই-ই তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। স্বামীকে এ স্বপ্নের কথা বলায় রাজুপণ্ডিত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়। ধকর বাপ সুজাত মুনশিও আকলিমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। চার দিন পর আকলিমার করুণ মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীর ধারণা রাজুপণ্ডিতই আকলিমাকে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছিল। এ ঘটনাও সুজাত মুনশি তিন বছর গোপন রাখেন। কারণ শ্বশুরকে রাজুপণ্ডিত তার দ্রুত ফুলে-ফেঁপে ওঠা ব্যবসায়ের চাকরি দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সীমাহীন স্বার্থপরতা, দাপট আর দৌরাত্ম্যের কাছে আকলিমাকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়। আকলিমা এ পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর বলির শিকারে পরিণত হয়।

গ্রামের সামন্তবাদী জোতদার-মহাজন-দালালগোষ্ঠীর শোষণ-স্বার্থের নখরাঘাতে পর্যুদস্ত হয় অসহায় কৃষক পরিবার। প্রতিকারহীন অন্যায়-অবিচারের তোড়ে হারিয়ে যায় আমিরণের মতো বহু নারীর জীবনসংসার। আমিরণ বেওয়া কৃষক তসিরুদ্দিনের বউ এবং আব্বাস ও আসগরের মা। ঠাকুরগাঁও হরিপুর থানার কৃষক সমিতির উদ্যোগে আবু তাহের ও বিনোদচরণের মতো তসিরুদ্দিনও তেভাগা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। 'তেভাগা চাই নইলে ইবার রক্ষা নাই। লাঙল যার জমি তার, সাবধান জোতদার: শ্রমিক কিষাণ ভাই ভাই, জনগণের মুক্তি চাই'–এমন শ্লোগান তুলে তসিরুদ্দিনরা ভাতারমারীর কান্দরের ভাদই ধান ও কাতিশালি ধান তেভাগার ভিত্তিতে কাটতে গিয়ে এক ভীষণ লড়াইয়ে জড়ায়। অনেক কৃষকের মতো তসিরুদ্দিনও খুন-গুমের শিকার হয়। স্বামী হারিয়ে দুই কিশোর পুত্রকে নিয়ে আমিরণ অথৈ সাগরে পড়ে। তাপরেও সে ভেঙে পড়ে না, বরং–

> 'লাজলজ্জা চুলোয় তুলে দিয়ে সে পেটের ভাত জোটানোর জন্য পথে নামে।... বেশ বড় আকারের একটা টুকরি তুলে নেয় মাথায়। গেরস্থের বাড়ি থেকে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ এইসব কেনে...তারপর শুরু করে হাটে হাটে পসারি।'-[এ. দৌ./পৃ.৮০]

এভাবে আমিরণ কোমরে আঁচল বেঁধে জীবনযুদ্ধে নামে। বয়সে যুবতী হওয়ায় তার মনে নানা আশঙ্কা জাগে। তাই গ্রামের সরল সোজা দৌলতালিকে বলে– 'দাদা যেখুন বাড়ি যাবেন মোক কহেন, মুই তোমার সঙ্গে যামু।' এভাবে সদাসতর্ক থেকে সমাজে ঘাপটি মেরে থাকা পুরুষের নানা লোভের ফাঁদ, প্রতারণা ও শোষণের বিরুদ্ধে আমিরণ জীবনযুদ্ধ চালায়। হাট থেকে ফেরার পথে দৌলতালি আমিরণকে নানা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করলেও সে তা আমলে নেয় না। সমাজের লম্পট-লালসাগ্রস্ত পুরুষদের নিয়ে আমিরণের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। বরং হাবাগোবা দুই ছেলে ও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হয় না। এমন দুঃখের কথা দৌলতালিকে বলতে গিয়ে জানায়–'মোর চিন্তা খালি ব্যাটা দুইটাকে লিয়ে

কী যে করোঁর– মানুষ হয় কি না হয়– বাপের মতোন কেহ হইল নাই।...মুই চাহোঁ ব্যাটারা মোর গাভুর জোয়ান মরদ হোক।' আমিরণের এ জোয়ান, সাহসী আর শক্ত-পোক্ত সন্তান প্রত্যাশার পেছনে নানাবিধ কারণও ছিল। অন্যায়ভাবে তার স্বামীকে জোতদার ঘোষ ও সরকার বাবুরা মেরে গুম করলেও তার কোনো বিচার হয় না। আবার প্রতিবেশী পোহাতু মণ্ডল ধারে জিনিস কিনে পয়সা দেয় না। আরেক প্রতিবেশী ফালু শেখ ও তার ছেলেরা কৌশলে আধির জমি ছিনিয়ে নিলেও সে কিছু করতে পারে না। সমাজের এসকল অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ নিতেই সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে– 'মরদ তো নাই– থাকিলে বিচার না হয় পারে? মানুষ গিলাক মারে নুকায়ে থুলে তাহো কেহ কুনো কথা কহে না?...মোর যুদিন লোক থাকিলে হয়, তো গলামের ব্যাটার গলাতে গামছা দিনু হয়।' চাঁদনী রাতে রাতচরা পাখির কাঁহা ডাকে আমিরণের স্বামী তসিরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে। চোখের পানি মুছে দুঃখভরা জীবনের কথা জানাতে দৌলতালিকে বলে–

> 'বুঢ়ার ব্যাটা তমরা দেখেন, দুনিয়াত কেহ একেলা নাই। সবার জোড়া আছে–পইখ পাখালি কহেন, জন্তু জানোয়ার কহেন, ব্যাগর জোড়া কেহ নাই। মুই এ খালি ব্যাগর জোড়া, আল্লা খোদা মোর–এ কপাল ভাঙে থুলে দুই-দুইটা ব্যাটাক মুই ক্যাম্নে মানুষ করোঁ।'-[এ. দৌ./পৃ.৮২]

এ দুঃখের পাঁচালিতে আমিরণের শুধু হতাশা আর দীর্ঘশ্বাসই প্রকাশ পায়নি, বরং একই সঙ্গে জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ভরাভরান্ত ঘর-সংসারের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহও উন্মোচিত হয়েছে। তাই– 'তমরা কী কহোঁ–মুই বুঝে পাও না' বলে দৌলতালিকে চুপ থাকতে দেখে তার রাগ হয়। রাগে হিসহিস করে মধ্যরাতের ভাঙা চাঁদের জ্যোৎস্নায় আমিরণের আগ্রহে দুজনে আদিম প্রেমলীলায় মেতে ওঠে। এভাবে উভয়ের জীবনভূগোল ও ভাবনায় যুক্ত হয় এক নতুন অধ্যায়। মসজিদের মুনশি ডেকে নিকা পড়িয়ে আমিরণ দৌলতালিকে নিজ বাড়িতে ডাংগুয়া হিসেবে রাখে। আর রাতের বেলা স্বামীর গলা জড়িয়ে ফিসফিস করে বলে– 'মরদ হে, মোর ছুয়া চাহি, বহুত ছুয়া।' দুই ছেলে থাকার পরেও স্ত্রী বহু ছেলে চাওয়াতে হাবাগোবা দৌলতালি বলে–'ক্যানে অত ছুয়া চাহিস তুই মাগী? দুই ব্যাটা দিয়ে তোর মন ভরে না?' জবাবে আমিরণ গম্ভীর হয়ে জানায়–

> 'ছুয়া চাঁহো মুই গলামের ব্যাটা। বহুত ছুয়া–এমুন ছুয়া দে যারা নাঢ়াই করিবা পারে–এমুন ছুয়া মুই প্যাটাত ধরিবা চাহোঁ। ঢাল তোর যত মধু আছে, ঢালে দে মোর ভিতর।'-[আ.গ.কা./পৃ.১২৫]

নাঢ়াই(লড়াই) করার মতো জোয়ান মরদ ছুয়া (ছেলে) জন্মদানের প্রত্যাশা থাকলেও আমিরণ-দৌলতালির তিন মাসের দাম্পত্যজীবন দ্রুত শেষ হয়। কারণ আজন্ম সংসারবিবাগী দৌলতালিকে দিয়ে আমিরণের মন মতো সংসার গড়ে তোলার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে আমিরণ দিলবর মিয়াকে নতুন ডাংগুয়া হিসেবে বেছে নেয়। বেশি বয়সে জোয়ান ছেলের মা হতে গিয়ে আমিরণের মৃত্যু ঘটে। ফলে তার বহু মরদ ছেলের মা হবার বাসনা পূরণ হয় না। আর ভরাভরান্ত সংসার নিয়ে, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে, ছেলেদের সরকার বানিয়ে ও প্রতিবেশীদের জুলুমের প্রতিবিধান করে বাঁচার স্বপ্ন-সাধও অধরাই থাকে। আমিরণ গ্রামবাংলার চিরদুঃখী, অসহায় ও দুর্ভাগ্যপীড়িত নারীর প্রতিনিধি। তারপরেও স্বামীহারা জীবনে তার একাকী পথ চলার সাহস, শপথ, সংসার-স্বপ্ন, মাতৃস্নেহ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর– তাকে দিয়েছে অনন্য মহিমা।

গ্রামীণ সমাজপ্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গঞ্জনা-অপবাদ ও নারীর জীবনসংগ্রামের আকাঁড়া বাস্তবতার চিত্র শরিফন্নেসার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। শরিফন্নেসা মাদারডাঙার শুকুর মোহাম্মদের মেয়ে এবং পর্যায়ক্রমে কলিমদ্দিন, কেরামত ও আবু তাহেরের স্ত্রী। মাত্র দশ বছর বয়সে বালিকা শরিফন্নেসার বিয়ে হয় চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর কলিমদ্দিনের সঙ্গে। বিয়ের দিন নানিকে সঙ্গে করে শ্বশুরবাড়ি আসা শরিফন নানা মানুষের কথায় আর কোলাহলে ভড়কে যায়। তাই বাসররাতে– 'মোক পছন্দ হইছে?' স্বামীর এমন আবেগী সম্ভাষণের জবাবে সে বলে– 'মোক নানীক ডাকে দ্যাও, মুই বাড়িত যামু।' এভাবে বাসররাত কাটিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসার পর তাকে আর শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়নি। কারণ নেকমরদের মেলায় গিয়ে কলিমদ্দিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যায়। যার ফলে–

> 'শরিফন দশ বছর বয়সে বিধবা হলো বটে– কিন্তু ঐ রাতের বিয়ের স্মৃতি তার সাড়া মন জুড়ে বসল। ঐ বালক স্বামী মারা গেলে সে কাঁদেনি। যখন বয়সে সে যুবতী, যখন অপয়া মেয়ে বলে লোকে ধিক্কার দেয়– ভাতারখাকী বলে মানুষ গাল দেয়– তখন একান্ত নিভৃতে শরিফন ঐ বালক স্বামীর ছবিটি মনের মধ্যে দেখতো আর কাঁদতো।'-[এ. দৌ./পৃ.৭০]

এভাবে বাল্যবিধবা শরিফনের জীবনের একটি অধ্যায় শেষে আবার দ্বিতীয় স্বামী কেরামত আলীর সঙ্গে সে জড়ায়। 'হেলিয়া পড়িল মোর সোনার যৈবন'–গান গেয়ে বেড়ানো নিষ্কর্মা কেরামত বাবা হযরত আলীর পিটুনি খেয়ে বাড়ি ছাড়ে। দুই বছর পর সরকারি সিপাহির বুটজুতা-পোশাক পরা কেরামত গ্রামে ফিরলে সবাই তাকে সমীহ করে। প্রধানবাড়ি ও চৌধুরীবাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে ছেলেদের দোস্তি পাতাবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং বাবা-মাও খুশিতে আটখানা হয়। কাল বিলম্ব না করে চাকুরে ছেলেকে হযরত আলী পাঁচ বিঘা জমির লোভে (যা শরিফনের নামে লেখা) বিধবা শরিফনের সঙ্গে

বিয়ে দেয়। গ্রামে প্রচার পাওয়া দারোগার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে স্বামী সম্পর্কে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার একরকম সুখও শরিফনের মনে ছিল। আবার সই, নানি-দাদিদের সতর্ক করা বাসররাতে দেহদানের বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেও স্বামী কেরামতের পাশবিক আচরণে সে বেসামাল হয়ে পড়ে। কারণ–

> 'অমন জোয়ান লোক...একেবারে লাফিয়ে পড়ল নতুন বউয়ের উপর।...প্রথম রাতে রক্তাক্ত হলো। দ্বিতীয় রাতে দেহখানি ফালাফালা করে দিল। দিনে রাতে কখনোই ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। শরিফনের মনে হয়েছিল, সে ঠিক মারা যাবে।'-[এ. দৌ./পৃ.৭০]

বউয়ের নেশায় দিনরাত বিভোর হয়ে থাকতে গিয়েই কেরামত নিজের বিপদ ডেকে আনে। যথাসময়ে চাকরিতে যোগদান না করায় তাকে সরকারি সৈন্যরা এসে তুলে নিয়ে গেলে আর হদিশ মেলে না। এতে শরিফনের কপাল পুনরায় ভাঙে। ফলে শরিফন দ্বিতীয়বার বিধবার অভিশাপ নিয়ে বাবার বাড়ি ফেরে।

বাবার বাড়ি আসার পরেও শরিফন দমে যায় না, বরং স্বভাবসুলভভাবে পাড়া ঘুরে বেড়ায়। তার উপচে পড়া যৌবনের মাদকতায় গ্রামের অল্পবয়সী যুবকদের নেতা আবু তাহের মুগ্ধ হয়। বাড়ির বাগিচা ও পালানসংলগ্ন আষাঢ়ের পাটক্ষেতে উভয়ের অভিসার ঘটতে থাকায় শুকুর মোহাম্মদও বিয়ের উদ্যোগ নেন। তাহেরের মা ছেলের এ বিয়েতে প্রথমে আপত্তি তুলেন। কারণ ততদিনে– 'শরিফনের ওপর ভাতারখাকী নামটা সেঁটে বসেছে। শুধু ভাতারখাকী নয়– সে না কি আবার বাঁজাও।' এমন অপবাদ থাকলেও শরিফনের নামে পাঁচবিঘা জমি লেখা থাকায় অভাবের সংসারে পিতৃহীন তাহেরের জেদে এ বিয়ে হয়। তৃতীয় সংসারে এসে শরিফনের দিন ভালোই কাটে। শরিফনের জমি আর আধির জমিতে তাহের ভাদই ধান বোনে। নিজের জমির প্রতি স্বামীর দুর্বলতা দেখে শরিফন ঠাট্টা করে বলে–'ক্যান মুই বুঝিন কিছু না?' জবাবে তাহের জানায়–'তুইও তো ভূঁইয়েরই লাখান, তোকও তো চাষ করা নাগে, কহ ঠিক না?' এমন মান-অভিমান আর রস-রসিকতায় ভরা শরিফন-তাহেরের সুখের ঘরকন্না যখন চলছিল, ঠিক তখনই পীরগঞ্জ, ফুলবাড়ি, ডোমার, ডিমলা এলাকার মতো হরিপুরের মাদারডাঙাতেও তেভাগা-আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। তসিরুদ্দিন, ঢেলা কিস্‌কু, বেলায়েত ও বিনোদচরণের সঙ্গে তাহেরও যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশ নেয়। ঘোষ বাবু ও সরকার বাবুদের ভাড়া করা পূর্ণিয়ার লাঠিয়ালবাহিনী এবং মধু শিকদার ও মহিম দাস চামারের মতো দালালদের মোকাবেলা করতেও তারা সতর্ক হয়। কিন্তু ভাতারমারীর কান্দরে ভাদই ধান ও কাতিশালি ধানকাটা নিয়ে জোতদার-লাঠিয়াল-পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের জোর লড়াই হয়। এতে আকালু বর্মণ আর জোবেদালি মারা যায়। তাহের, ঢেলা কিস্‌কু ও তসিরুদ্দিনের কোনো হদিশ মেলে না। তারা জোতদার বাহিনীর হাতে খুন-গুমের শিকার হয়। এসময় পরিত্যক্ত পিরের জঙ্গলের কাছে পুলিশ দুই মাস ক্যাম্প করে থাকে। আশেপাশে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। শেয়াল-কুকুর সেখানে ঘুরঘুর করতো। একদিন এক কুকুরের মুখে একখানা হাত দেখা যায়। এভাবে তৃতীয়বারের মতো শরিফনের কপাল ভাঙে।

ধানের লড়াইয়ের প্রায় বিশ বছর পর আবার একাত্তরের জয় বাংলার লড়াইতে সেই জঙ্গলের ধারে পাকিস্তানি সেনারা তিনটি তাবু ফেলে। এলাকার হাশেম চৌধুরী ও তার বাবা হামিদ চৌধুরী, কাসেম চেয়ারম্যান, মমিনউল্লাহ ব্যাপারী ও দিলবর রাজাকারদের তৎপরতায় সারা মাদারডাঙায় উত্তেজনা আর আতঙ্ক বাড়ে। একদিন আব্বাসের ভাই আসগর আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে পাক সেনাদের তাবু আক্রমণ করতে আসে। কিন্তু অপারেশন না করে ফেরার পথে ক্ষুধায় কাতর আসগররা শরিফনের বাড়ি ভাত খেতে বসে। মমিনউল্লাহর দালালিতে তিন জনই ধরা পড়ে এবং সবাইকে ভাতের থালার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায়। ফলে–

> 'মমিনউল্লাহ ব্যাপারীকে খুন করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে শরিফন বিবি। তাই প্রতিদিন একখানি দায়ে ধার দিত আর একটি মশাল খুব যত্ন করে সাজাত।'-[এ.দৌ./পৃ.৮৯]

দেশস্বাধীন হবার আগ মুহূর্তে সেনারা তাবু গুটিয়ে পালিয়ে গেলে শরিফনের প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়। সে এক হাতে জ্বলন্ত মশাল আরেক হাতে ধারালো দা নিয়ে ব্যাপারীর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু জনমানবশূন্য খালি বাড়ি দেখে তার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পায়। হাসতে হাসতে শরিফন ব্যাপারী বাড়ির সকল ঘরে আগুন লাগায়। মাদারডাঙার উৎসুক জনতা অবাক হয়ে দেখে–

> 'লাল শাড়ি পরনে এক হাতে মশালের লাল আগুন– শরিফন খলখল করে হাসতে হাসতে একবার এ ঘরের চালে আগুন দিচ্ছে, আবার ও ঘরের চালে। তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। আসমানের পশ্চিম দিকটাও লাল রঙ দিয়ে লেপা। একদিকে দাউ দাউ আগুন আরেক দিকে হাহা হিহি সোল্লাস হাসি।'-[এ. দৌ./পৃ.৮৯]

শফিরন এ প্রতিশোধের আগুন লাগাবার আনন্দের মাধ্যমে বহুদিনের জমানো ক্রোধ ও ঘৃণাকে প্রশমিত করে। ধনী জোতদার-মহাজনশ্রেণির সীমাহীন শোষণ দেখে, সুবিধাবাদী অবস্থান দেখে আর জাতির ক্রান্তিকালে দালালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে গ্রামের নির্ধন-নিঃস্ব বিধবা শরিফন যে-প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে দেয়–তার মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়।

যুগ যুগ ধরে মাটির তলায় লুকানো অদৃশ্য ক্রোধ, বুকের ভেতরে চাপা থাকা ঘৃণা আর রক্তে মেশা প্রতিশোধের বারুদ– সব মিলেমিশে শরিফনকে 'মানুষ না দোসরা কিছু' অর্থাৎ অসুরনাশিনী, দুরাত্মাদলিনীর মতো এক আদ্যাশক্তিতে অধিষ্ঠিত করে।

উপন্যাসের চরিত্রসমূহের মধ্যে দৌলতালিই প্রধান এবং সমগ্র উপন্যাসের মধ্যমণি। তাকে শওকত আলীর প্রচ্ছন্ন সত্তা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ এ দৌলতালিই লেখকের মুখপাত্র এবং উপন্যাসের মুখ্য বক্তা। কেবল অতীতের গল্প, অলৌকিক গল্পই তার জীবনের পুঁজি নয়; অনেক কাহিনি আর অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও এ দৌলতালি। তাই প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও দৌলতালির গুরুত্ব অপরিসীম। আর আব্বাস গজুয়া ও আলী আফজালের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান চরিত্রগুলোর সঙ্গে সঙ্গে লেখক পার্শ্বচরিত্র রূপায়ণে যে-মেধা, মনন ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন–তা স্মরণ করার মতো। 'তেভাগা হইলে কিরষাণের লাভ, মোর কী?'– এই খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কহীন মহিম দাস চামার মাত্র পাঁচ টাকার বখশিশ পেয়ে আন্দোলনকারী কৃষকদের নাম বলে দেয়। আধা লাইনের একটি উক্তি দিয়ে লেখক অসাধারণভাবে একটি চরিত্রের মনোজগৎ ও ভাবনাকে রূপায়ণ করেছেন। আলী আফজালের শহুরে ভিত্তি, যৌনলিপ্সা এবং নাগরিক রুচি আলোচ্য উপন্যাসে তৈরি করেছে এক বিপ্রতীপ স্রোত। কিন্তু তাই বলে সে এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নয়। এমনকি ঘটনা বিকাশে তার ভূমিকাও জোরালো নয়। দৌলতালি এবং আব্বাস গজুয়ার অকপট প্রাকৃতজীবন এ উপন্যাসের প্রাণ। মনোজগতের গভীরে লোকমিথের যে-বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, পুরুষানুক্রমে চলে আসা পির-দরবেশ মাজারের প্রতি সাধারণ মানুষের যে-নিগূঢ় বিশ্বাস– তা আব্বাস গজুয়াদের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। তাই তারা এখনো অপেক্ষা করে এবং স্বপ্ন দেখে ঘোড়ায় চড়ে পির-হুজুর লড়াই করবে অত্যাচারী শাসক, রাজা-জমিদার-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। তারা লড়াই করবে গরিবের জন্য, ধনীর জন্য নয়। এমন গভীর বিশ্বাসই মাদারডাঙাবাসীর মর্মমূলে প্রোথিত।

চরিত্রচৈতন্যের নিরালোক প্রান্তসমূহের চিত্র উপস্থাপনায় লেখক অনেক সময় সর্বজ্ঞদৃষ্টি, প্রেক্ষণবিন্দু, পরাবাস্তবতা, যাদুবাস্তবতা, চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, প্রবাদ-প্রবচন, সাপের মন্ত্র ও গানের বহুল ব্যবহার করেছেন। এ পর্যায়ে সাপের গুণিন শম্ভুনাথ মাহাতোর প্রার্থনার ভঙ্গিতে সুর করে মনসা দেবীর দোহাই দিয়ে পাঠ করা ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত সাপের মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য–

'দোহাই নাগে, দোহাই নাগে ভাই
কী করে দেখ বিষহরি মায়ী।
দোহাই ফের দোসরা দোহাই
হুকুম দিসে কামিখ্যা মায়ী।
ক্যালার পাত ভাঁটির সাত
তাগা বান্ধে কুন সে হাত।
আয় রে আয় গহমা ভাই
ডাক দিছে তোর বিষহরী মায়ী।
চল সান্তালী পাহাড়ত যাই
ঐঠে বসে হামার মনসা মায়ী।'-[এ.দৌ./পৃ. ৫০-৫১]

আবার উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশকে জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবমণ্ডিত করে তুলতে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাবুলি ও গালির প্রয়োগ করেছেন। একই সঙ্গে বহু আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দের অব্যর্থ ব্যবহার করেছেন। গ্রামবাংলার অবারিত সবুজপট, শস্য-শ্যামল প্রকৃতি, প্রাণোচ্ছল মানুষের অবাধ স্বপ্ন, জীবনচর্চার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বাস-বিস্ময়ের অবিনাশী প্রাণপ্রবাহের বর্ণনা দিতে লেখক যে-কাব্যময় গীতল ভাষা ব্যবহার করেছেন তা একান্তই প্রশংসাযোগ্য। উপরন্তু তিন শতাব্দীব্যাপী (১৭৬০-১৯৮৮খ্রি.) বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ফকিরবিদ্রোহ, সিপাহিবিদ্রোহ, তেভাগাবিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধের মতো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চারটি আন্দোলন- সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। আবার একই সমান্তরালে আকাল, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ, একাত্তরের শান্তিকমিটি, একাত্তর-পরবর্তী রক্ষীবাহিনী, শ্রেণিশত্রু খতম-আন্দোলন, কিংবদন্তি, লোকাচার, সংস্কার-বিশ্বাস, ঝাঁড়-ফুক, তাবিজ-কবচ, ডাংগুয়া প্রথা, সিন্নি, মাজার জিয়ারত, জ্বিন-ভূতে বিশ্বাস, যাদু-মন্ত্রে আস্থা, বর্ণপ্রথা, লোকচিকিৎসা বা টোটকা, হাটবাজার ও মেলার মতো বিচিত্র প্রান্তসমূহকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

শওকত আলীর *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর *চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর*, অভিজিৎ সেনের *রহুচণ্ডালের হাড়*, দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*, বদরুন্নেসা আবদুল্লাহর *কাজলাদীঘির কথা*, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *কুবেরের বিষয়-আশয়*, সুবোধ লাহিড়ীর *ভস্তীর বিল*, আবু জাফর শামসুদ্দীনের *ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান*, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *আলমনগরের উপকথা* এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* ও *খোয়াবনামা* উপন্যাসের বিষয়-বয়ানকৌশলে মিথগত সামঞ্জস্যের সন্ধান মেলে। উল্লেখ্য সবগুলো

উপন্যাসের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে এবং চৈতন্যে জনমিথ, লোকপুরাণ কিংবা ঐতিহ্যবিশ্বাস, সংগ্রাম-বিদ্রোহ তথা আপস না করে বেঁচে থাকার অন্তর্গত প্রভাবক হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে। মিথ এখানে জনগোষ্ঠীর জীবন্ত জৈবিকতা এবং মানবিকভাবে মাথা উঁচু করে, বুক চিতিয়ে বেঁচে থাকবার অবেচতন আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাসতত্ত্বের বাইরে এসে ইতিহাসের জন-ভাষ্য নির্মাণ করেছেন এসকল ঔপন্যাসিক। এদিক বিবেচনায় প্রথাগত আধিপত্যবাদী ইতিহাসের বিরুদ্ধে এ উপন্যাসগুলো সুস্পষ্ট এক বিদ্রোহ। কারণ সংগ্রাম-বিদ্রোহ ও বিকাশের এই মানবীয় আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিকতম প্রত্যাশা।[৩৩] *মাদারডাঙার কথা* ও *খোয়াবনামা* দুটি উপন্যাসেরই শুরু হয়েছে ফকির মজনু শাহের প্রসঙ্গ দিয়ে। আবার দুটি উপন্যাসেই ইতিহাসের বিস্ফোরক ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে না এসে বরং চরিত্র ও ঘটনার প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনেই ধরা দিয়েছে। তাই *খোয়াবনামা*-তে যেমন পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট বা পূর্বাভাস রয়েছে, তেমনিভাবে *মাদারডাঙার কথা*-তেও ফকিরবিদ্রোহ থেকে শুরু করে একাত্তরের ক্রান্তিকাল, রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডব ও স্বৈরাচার এরশাদের সময়কার (১৯৮৮খ্রি.) অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ও উঠে এসেছে। আর মিথ, কিংবদন্তি, মাজার, ফকির-দরবেশদের বিষয়, লোকাচার ও বিশ্বাস দুটি উপন্যাসেই বিদ্যমান রয়েছে। আবার আধুনিক যুগ ও যন্ত্র-সভ্যতার তোড়ে কাহার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিলুপ্তির চিত্র পাওয়া যায় *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* উপন্যাসে। এ উপন্যাসের কর্তাবাবা, বনওয়ারী ও করালীর সঙ্গে *মাদারডাঙার কথা*-র দরবেশ বাবা, দৌলতালি ও আলী আফজালের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে *কুমুরডাঙ্গার* মোক্তার মোছলেহ উদ্দিনের মেয়ে সকিনার বাকাল নদীর কান্নার আওয়াজ শোনার সঙ্গে আব্বাসের পিরের দিঘির পানিতে গজার মাছকে দরবেশ বাবার ঘোড়া হতে দেখা ও তাদের আহারের শব্দের মিল পাওয়া যায়। উপরন্তু *চিলেকোঠার সেপাই*-এর চেংটুর বৈরাগীর ভিটার বটগাছে জিন দেখা, করমালি ও আলী বক্সের যমুনার বুকে অশুভসংকেতস্বরূপ ঘোড়ার ডাক শোনা এবং *খোয়াবনামা*- র তমিজের বাপের কাৎলাহার বিলের পাকুড়গাছে আশ্রয় নেয়া ফকিরবিদ্রোহে মৃত্যুবরণকারী মুনসি বায়তুল্লা শাহকে দেখার সঙ্গে এ *মাদারডাঙার কথা*-র আকলিমার বটগাছে জ্বিন দেখারও সাদৃশ্য রয়েছে।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে জলপাইগুড়ি সংলগ্ন তিস্তাপারের গণমানুষের কল্যাণে বন্যা নিয়ন্ত্রণে তিস্তাব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্পে প্রযুক্তির প্রয়োগ ও পরিণামী প্রাপ্তিযোগে গরিব বাঘারু বর্মণদের কিছুই মেলে না। এর সুফল পুরোটা গ্রহণ করে জোতদার গয়ানাথ, এমএলএ বীরেন, সরকারি সেটেলমেন্ট অফিসের কর্তা ও কর্মচারী প্রিয়নাথরা। সরকারি প্রকল্পে তিস্তাপারের জনজীবনে আমূল পরিবর্তন আসলেও বাঘারুদের জীবনে এর কোনো পরশ লাগে না। উপরন্তু তাকে জোতদার গয়ানাথের ক্রীতদাস হতে হয়। *কুবেরের বিষয়-আশয়*-এ বর্ধিষ্ণু কলকাতার জনজীবনে থেকেও কুবেরের মানসিকতা ঐতিহ্যিক মানসবৃত্ত অতিক্রম করতে পারে না। তাই সে শহর ছেড়ে নদীর চরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করে এবং নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। *রহুচণ্ডালের হাড়*-এ বাজিকর গোষ্ঠীর আত্মান্বেষণের পথে দেড়শ বছরের পরিব্রাজক– যার পরিণতি ঘটে ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শারিবার স্বগোত্রভাবনার উন্মেষ ও ফেরা *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা*-র করালীর ফেরার মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না। এরা সবাই দৌলতালি ও আব্বাস গজুয়ার মতো প্রকৃতির সন্তান।

শওকত আলী তাঁর *ওয়ারিশ*, *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসে এবং *পুশণা* গল্পে মিথ ব্যবহারে বহুমাত্রিক, বহুস্তরিক ও ক্রমবিবর্তনের ছাপ রেখেছেন। *ওয়ারিশ*-এ কাহিনির অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজবাস্তবতা নির্মাণের প্রয়াস থেকেই রায়হানদের প্রধানবাড়ির ঐতিহ্য পুনঃআবিষ্কারে পারিবারিক ঘোড়াপির, মাটির ঘোড়া ও বুড়ির বিলের গজার মাছের প্রসঙ্গ এসেছে। যদিও এখানে শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক চৈতন্যের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের একটা দ্বন্দ্বও চোখে পড়ে। এ সময় পর্বে লেখকের কাছে লোকমিথের সংগ্রামশীল ক্ষমতার দিকটি স্পষ্ট ছিল না। আবার *পুশণা* গল্পে ব্রিটিশ শাসকদের আধিপত্যবাদী খ্রিষ্টানধর্ম ও সংস্কৃতির বিপরীতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্ম-সংস্কৃতি তথা অস্তিত্বরক্ষার অবচেতন প্রতিরোধ হিসেবে কার্যকর থেকেছে মিথ। কিন্তু বাস্তবে সমাজবাস্তবতার কাছে হার মানা সাঁওতাল গোত্রপতির নিজস্ব অবচেতনে বীর মারাঙ বুরু অমিত শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হলেও তা সামষ্টিক রূপ ধারণ করে না এবং কোনো বিদ্রোহ বা সংগ্রামও সৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসে দৌলতালি ও আব্বাস গজুয়ার মতো সংসারবিচ্ছিন্ন অথচ প্রাণ ও প্রকৃতিলগ্ন মানুষেরাই ঐতিহ্য রক্ষায় বিদ্রোহের ডাক দেয়। তারাই জনমানুষের সামষ্টিক অবচেতনায় লুকিয়ে থাকা মিথগত ক্ষমতাকে চেতনে নিয়ে আসে এবং বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটায়।[৩৪] এখানেই *মাদারডাঙার কথা*-র বিশেষত্ব। তারপরেও এ উপন্যাসের শিল্পশৈলীর সীমাবদ্ধতা হিসেবে যা নজরে পড়ে, তা হলো মৃত্যুপথযাত্রী পালক মেয়ে আকলিমার মুখে শোনা জঙ্গলে ছাগল খুঁজতে গিয়ে গুপ্তধন পাওয়া এবং যা বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসার বর্ণনা। এত শিল্পসম্মত আর শৃঙ্খলা রেখে সুজাত মুনশি ঘটনার যে-অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং যা চার পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত– তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ লেখক যেহেতু তা বর্ণনা করতে সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন, সেহেতু আকলিমার স্মৃতিচারণের ঘটনাটি তিনি আবার সুজাত মুনশির স্মৃতিসূত্রে ফেলে বর্ণনা করতে পারেন না। আবার *ওয়ারিশ*, *দলিল*, *বসত* উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসের শেষে লেখক যে-কৈফিয়তমূলক এক ঘোষণাপত্র সংযোজন করেছেন– তাও আপত্তিকর বলে মনে হয়। কারণ সমাজ ও ইতিহাসের বাস্তব ও জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনি, ঘটনা ও চরিত্রকে তিনি বাস্তব না ভেবে কাল্পনিক মনে করতে পাঠকসমাজের

প্রতি অনুরোধ করেছেন। অথচ আবার তিনিই উপন্যাসের 'মুখবন্ধে' লোকসমাজে প্রচলিত ইতিহাসের গল্প-কাহিনি নিয়ে যে-এ *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাস রচনা করেছেন– তার স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছেন। এসব নিয়েই আমাদের এক চিলতে আপত্তি।

এসব ছোটখাটো সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও বলা যায়, উপন্যাসটির অন্তর্বুননের কেন্দ্রীয় প্রভাবক হচ্ছে জনমিথ বা লোকঐতিহ্য। মিথ-আশ্রয়ী এই উপন্যাসটির পুরো ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে শওকত আলী সচেতনভাবেই জনমিথের উপর আশ্রয় নিয়েছেন। পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার উন্নয়নরূপী সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের বিপরীতে জনমানুষের ভিটেমাটি, ভূমি, ঐতিহ্য এবং একই সঙ্গে প্রকৃতি-প্রতিবেশ তথা সামগ্রিক অস্তিত্বরক্ষায় প্রকৃতিলগ্ন মানুষের যে-লড়াই ও সংগ্রাম– তারই বয়ান এ *মাদারডাঙার কথা*। এ লড়াইয়ের সামষ্টিক অবচেতন হয়ে উঠেছে তিনশো বছরের ঐতিহাসিক পারম্পর্য। ইতিহাসের প্রতিরোধী উপকরণগুলো মাদারডাঙা গ্রামের জনগোষ্ঠীর কাছে মিথগত তাৎপর্য হয়ে উপস্থিত হয়। অতীতের প্রতিরোধী ঘটনাপ্রবাহ সব মিলেমিশে বর্তমান সময়ের বিদ্যমান নিপীড়ন-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ কিংবা ঐতিহাসিক জনবিশ্বাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে এসে একবিন্দুতে মিশে যায় এ উপন্যাসটিতে। এ দুইয়ের মাঝে এক্ষেত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এক কথায় বলা যায় মানবীয় সংবেদনা ও যুক্তিবাদ–এ দুইয়ের সম্মিলন ঘটেছে *মাদারডাঙা কথা* উপন্যাসে।[৩৫] *মাদারডাঙার কথা* কেবল বিচ্ছিন্ন একটি ভূভাগের আত্মভুক নরনারীর বেদনাক্লিষ্ট জীবনের ভাষ্য নয়, নয় কেবল তাদের মানসিক বৃত্তাবদ্ধতার একমাত্রিক উচ্চারণ; আঞ্চলিক ভাষার অন্তরঙ্গটানে মাদারডাঙার পরিপ্রেক্ষিত ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছে বাণিজ্যপ্রবণ শহুরে বাস্তবতার দিকে এবং সেই পরিধি ছাড়িয়ে এই ইতিবৃত্ত আরও বিস্তৃত হয়েছে তেভাগা আন্দোলন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে। মাদারডাঙার আঙ্গিকে উঠে এসেছে পুরো বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড,চিত্রায়িত হয়েছে এই জনপদের মানসকাঠামো। যেখানে ইতিহাস-রূপকথা-প্রত্নকথা আর কাল্পনিক উপকাহিনির প্রতি মানুষের রয়েছে প্রশ্নহীন অনুরাগ। প্রাচীন প্রচলিত এইসব বিশ্বাসের অনুষঙ্গে বেড়ে ওঠে তাদের মানস গড়ন।[৩৬] শ্রমজীবী প্রান্তিক ক্ষুদ্র মানুষ কীভাবে বিশালাকার হয়ে যায়– হয়ে যায় শক্তি, সম্ভাবনা ও অঙ্গীকারের প্রতীক– তা লেখক এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন। দৌলতালি ও আব্বাস গজুয়ারা হয়তো হারিয়ে যাবে, কিন্তু হারাবে না তাদের চিৎকার, অঙ্গীকার এবং আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে দেবার উদ্যম।

শওকত আলী বিপ্রতীপ-স্বভাবী সময়খণ্ডে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক বিস্ফোরক ঘটনা ও ঐতিহ্যকে এ উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনাক্রম ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন মানুষের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের নিগূঢ় প্রাণবীজ আবিষ্কার করেছেন। সমকালের সংকট ও সমাজসত্তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ঔপন্যাসিক ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোকপুরাণে উজ্জীবনের যে-শক্তির উৎস অনুসন্ধান করেছেন তার মূল্যও অনিঃশেষ। কারণ– 'These ancient stories owe their persistence, as traditional material of art, to their power of expressing or symbolizing and so relieving, typical human emotions'.[৩৭] শওকত আলী মাদারডাঙার জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া গণকবরকে সচেতনভাবেই সময়-পরিসর ভেঙে দিয়ে এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে বেঁধেছেন। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন বিস্ফোরক ও বাঁকবদলের ঘটনাকে গণকবরের রূপকে বর্তমান সময় পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে উপস্থিত হন। এই গণকবর জনমিথের অন্তর্নিহিত শক্তির রূপক, সঙ্ঘশক্তির সম্মিলন বা উদ্বোধন ঘটাতে পারলেই ঘটতে পারে বিদ্রোহ। শওকত আলী বাস্তব-অধিবাস্তব আর স্বপ্নবাস্তব মিলিয়ে আরেক নিরেট বাস্তবতা নির্মাণ করেছেন এ উপন্যাসে। এখানে হঠাৎ জেগে ওঠা জনগোষ্ঠী বৃহৎ আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে, কৌশলের কাছে সাময়িক পরাভব মানে। আলী আফজালের মতো বর্তমান সময়ের খলনায়কেরা শক্তি, মিথ্যা আর কৌশলের ফাঁদে ফেলে ইতিহাসের প্রকৃত নায়কদের।[৩৮] কিন্তু যাদের কাছে মাটির খবর এসে পৌঁছায় কিংবা যাদের চৈতন্যের শেকড় প্রোথিত থাকে জনঐতিহ্যে– তারা আফিমসদৃশ প্রযুক্তির নেশা কাটিয়ে ঠিকই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে মানুষ, গাছপালা, পশু-পাখি ও দিঘির মাছ– সবাইকে জাগ্রত আর হুঁশিয়ার করতে দীক্ষিত হয়। কারণ স্বপরিচয়ে বাঁচতে হলে লড়াই-সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বের প্রতিবাদী দার্শনিক নোয়াম চমস্কির মতো শওকত আলীও বিশ্বাস করতেন– 'জনগণকেই তার ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব নিতে হবে।' তাঁরা উভয়েই এ তৃণমূলের সঙ্ঘশক্তিকে মানবিক সমাজরূপান্তরের শানিত আয়ুধ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এ অবিনাশী প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহী মানসিকতাই *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসের সবচেয়ে গৌরবময় প্রান্ত।

পুঁজি ও প্রযুক্তি মানব সভ্যতায় সমান্তরালভাবে বয়ে এনেছে আশীর্বাদ ও অভিশাপ। কালের অনিবার্য পরিবর্তন ও প্রত্যাশাকে কেউ-ই অগ্রাহ্য করতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত প্রাচীন মূল্যবোধ, মানবীয় সম্পর্কের বাঁধন ও আত্মপরিচয়ের অবলম্বনগুলো যখন বিনষ্ট হয়, তখন মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রবল হয়ে ওঠে। বিশাল প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশ ও নাড়িমাটিকে ঘিরে মানুষের যে-জীবনবিকাশ ঘটে, যে-বিশ্বাস-বিস্ময়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে– তা পুঁজির পাপ-পঙ্ক ও যন্ত্রের যন্ত্রণা মিলে তাকে প্রাণহীন-নামহীন-গোত্রহীন আর দিকভ্রান্ত করে। এতে শওকত আলী বেদনা অনুভব

করেন। তাই লেখক পুঁজিতান্ত্রিক আগ্রাসনের বিপ্রতীপে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ের প্রান্তিক মানুষ, মাটি আর প্রকৃতি-প্রতিবেশকে একীভূত করেছেন। জনচৈতন্যে লালিত বহমান বোধ-বিশ্বাস, সংস্কার, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মিথ-পুরাণ মানুষকে চেতনে-অবচেতনে প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে নেয়। ধারাবাহিক এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরোধ-সংগ্রাম সৃষ্টি করে মানুষের নতুনতর ইতিহাস। বিদ্যমান প্রতিটি লড়াই-সংগ্রামে সে-সম্ভাবনার বীজই উপ্ত থাকে। কিন্তু এ লড়াইয়ের পরিণামী প্রাপ্তিযোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতেই ন্যস্ত থাকে। শেষপর্যন্ত *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসে ধনের চেয়ে ধানের, প্রযুক্তির চেয়ে প্রাণের, পুঁজির চেয়ে প্রেমের এবং মৃত্যুর অপচয়ের চেয়ে জীবনের জয়গানই প্রবল হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. চঞ্চল কুমার বোস : *শওকত আলীর কথাসাহিত্য: জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ;* বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৯০

২. অশ্রুকুমার সিকদার : *ভাঙা বাংলা ও বাংলাসাহিত্য;* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১০; **দ্বৈতীয়িক উৎস–** তপন কুমার রায়: *শওকত আলীর কথাসাহিত্য: প্রসঙ্গ দেশভাগ* (কাজী ইকবাল সম্পা. *তৃণমূল;* শওকত আলী সংখ্যা-১১), শ্রাবণ ১৪২৬/জুলাই , ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৬১

৩. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯২

৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৯

৫. তানভীর দুলাল : *সম্বল: মাটিবর্তী মানুষের জটিল অসহায়ত্বের সরল আখ্যান* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা;* শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৬, সংখ্যা- ৭, রাজশাহী, ২০১৬, পৃ. ২২২

৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৩

৭. তানভীর দুলাল : পূর্বোক্ত; পৃ. ২২৪

৮. তানভীর দুলাল : পূর্বোক্ত; পৃ. ২২৬

৯. নকশাল আন্দোলন একটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের নাম। ১৯৬৭ সনের ২৫ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ছোট গ্রাম 'নকশালবাড়ি' থেকে এর সূত্রপাত ঘটে। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সত্যনারায়ণ সিং, কানু সান্যাল ও জালে সাঁওতাল প্রমুখ। মতাদর্শগতভাবে এরা মাওসেতুং-এর অনুসারী ছিলেন। নকশালবাড়ি এলাকায় কৃষকের উপর স্থানীয় জোতদার-ভূস্বামীরা ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে শোষণ-নির্যাতন চালাতো। এমন অন্যায়-অবিচার চারু মজুমদারকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি কৃষক-মজুরের 'শ্রেণিশত্রু' হিসেবে জোতদার, ব্যবসায়ী, পুলিশ ও বুর্জোয়া রাজনীতিবিদসহ সুবিধাবাদী দালালদের চিহ্নিত করেন। এদেরকে খতম করতে সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি বিখ্যাত 'Historic Eight Documents' বা 'ঐতিহাসিক আট দলিল' নামক বই লেখেন। এ আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সরোজ দত্তও এর স্বপক্ষে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। ফলে খুব দ্রুত এ আন্দোলন ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এর তাপ-চাপ থেকে বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীও মুক্ত ছিল না। নেপাল, বার্মা ও শ্রীলংকাতেও এর প্রভাব পড়ে। শুরুতে এ আন্দোলন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনগুলোর ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্ররা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। আর নিজেদের বিদ্যাপীঠকে আন্দোলনের অস্ত্রাগার ও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করে তোলে। এদের তৎপরতায় গোটা ভারতবর্ষ আলোড়িত হয়। এদের হাতে জমিদার-জোতদার-ব্যবসায়ী-বিত্তবানদের হত্যা, অর্থ-সম্পদ লুটপাট ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দেখে ভারত সরকার ভয়াবহ দমননীতি গ্রহণ করেন। এজন্য পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর বর্বর জেল-জুলুম, হত্যা, খুন, গুম ও নিপীড়নের কবলে পড়ে এ-আন্দোলনের উত্তেজনা কমে আসে। এছাড়া ১৯৭১ সনে অন্তর্দ্বন্দ্বে চারু মজুমদারের দল থেকে সত্যনারায়ণ সিং বেরিয়ে গেলে দল দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আলীপুর জেলে চারু মজুমদারের রহস্যময় মৃত্যু (১৯৭২), তাত্ত্বিক নেতা সরোজ দত্তের পুলিশি হেফাজতে গুম হওয়া, পলিটব্যুরোর অন্যতম নেতা সুশীতল রায়চৌধুরীর আত্মগোপনে থাকাবস্থায় মৃত্যু, কানু সান্যালের আত্মগোপনে থাকাবস্থায় আত্মহত্যাসহ অসংখ্য নেতাকর্মীর জেলবন্দি থাকা এবং দলের বহু বিভাজনে এ আন্দোলন ক্রমশই স্থিমিত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং ভ্রান্ত লাইনের কবলে পড়ে বহু সম্ভাবনাময় নেতাকর্মী ও ছাত্রযুবকের জীবন বিপন্ন হয়। আশির দশকে ভারতে প্রায় ত্রিশটি নকশালবাদী দল সক্রিয় ছিল এবং তাদের জনবল ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো। বর্তমানে এরা ভারতের একষট্টিটি জেলা ও এক পঞ্চমাংশ বনভূমিতে এখনো সক্রিয় রয়েছে।– [উৎস- আজিজুল হক: *নকশালবাড়ি: তিরিশ বছর আগে এবং পরে;* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৮৪-১৯০]

১০. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৬

১১. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৬

১২. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৩

১৩. তানভীর দুলাল : পূর্বোক্ত; পৃ. ২২৭-২২৮

১৪. তানভীর দুলাল : পূর্বোক্ত; পৃ. ২২৯

১৫. 'নাঢ়াই' আঞ্চলিক শব্দ; যার সরাসরি অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় না। তবে এর আনুষঙ্গিক কয়েকটি শব্দ যেমন–'নাড়া' মানে সঞ্চালন, ঝাঁকুনি, আন্দোলিত হওয়া এবং ধান কাঁটার পর জমিতে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় অংশবিশেষ–এমন অর্থগুলো নজরে আসে। আবার দুটি ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, পাঁঠা ও মোরগের মুখোমুখি, মাথায় মাথায় বা শিং দিয়ে প্রচণ্ড বেগে লড়াইকে বোঝায়। এছাড়া দুজন ব্যক্তি, দুটি পক্ষ বা দুটি পাড়া কিংবা জনপদের মধ্যে লাঠি, বর্শা-দা-হাঁসুয়া, তীর-ধনুক দিয়ে মারামারি করাকে বলা হয় নাঢ়াই। তবে সার্বিক বিবেচনায় শওকত আলী উত্তরবঙ্গের এ আঞ্চলিক শব্দ *নাঢ়াই*-কে লড়াই ও সংগ্রাম অর্থেই বেছে নিয়েছেন।-[উৎস- শারমিনুর নাহারঃ *নাঢ়াই: তেভাগা আন্দোলনের উপন্যাস* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া*); সংখ্যা- ১৬, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২৪৩ এবং আযাদ কালাম: *নাঢ়াই দিনাজপুরি উপভাষার আকরগ্রন্থ* (কাজী ইকবাল সম্পা. *তৃণমূল*; শওকত আলী সংখ্যা); ঢাকা, সংখ্যা-১১, শ্রাবণ ১৪২৬/জুলাই ২০১৯, পৃ. ১১৭]

১৬. বদরুদ্দীন উমর : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক;* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, জুন ১৯৯৮, পৃ. ৫৩

১৭. তেভাগা আন্দোলন ১৯৩৬ সনের দিকে কৃষকদের মধ্যে শুরু হলেও তা ১৯৪৬ সনে এসে দুর্বার সাংগঠনিক ও জঙ্গিরূপ ধারণ করে। সমগ্র বাংলার ১৯টি জেলায় (দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, চব্বিশপরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, নদীয়া, খুলনা, পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম) ছড়িয়ে পড়ে। ৬০ লক্ষ কৃষক-কৃষাণী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় এ আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। বর্গাজমির মোট ফসলের আধি (অর্ধেক) নয়, বরং তেভাগার (তিনভাগের) দাবি নিয়ে এ দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে পুলিশ ও জমিদার-জোতদারদের গুলিতে শহিদ হয় কয়েক হাজার কৃষক, আহত হয় ১০ হাজার, গ্রেফতার হয় ৩,১১৯ জন এবং অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তেভাগার তৃতীয় পর্যায়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ও কিষাণসভা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন নারী বাহিনীর তৎপরতা ছিল উল্লেখ করার মতো। 'নিজ খোলানে ধান তোল, আধি নাই– তেভাগা চাই, কর্জ ধানের সুদ নাই'– তেভাগার এ তিন দাবি নিয়ে সর্বপ্রথম দিনাজপুর জেলা কমিটি ও কৃষক সমিতি এগিয়ে আসে। এতে নেতৃত্ব দেন– সুশীল সেন, বিভূতি গুহ, রূপনারায়ণ রায়, গুরুদাস তালুকদার, জনার্দন ভট্টাচার্য, হাজী দানেশ, বরদা চক্রবর্তী প্রমুখ। ১৯৪৭ সনের ৪ জানুয়ারি অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানার তালপুকুর গ্রামে কৃষকেরা তেভাগার দাবি আন্দোলন করতে গেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন স্থানীয় কৃষক সমিরুদ্দিন ও শিবরাম মাঝি। পরবর্তীতে আরো অনেকে হতাহতের শিকার হন। এ ঘটনা থেকেই তেভাগার দাবিটি গণআন্দোলনে রূপ নেয়।- [উৎস- হোসেনউদ্দিন হোসেন: *বাঙলার বিদ্রোহ*; বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪৫]

১৮. বেলাল বাঙালি (সম্পা.) : *কথাশিল্পী শওকত আলী: ব্রাত্যজনের কথক*; গণপ্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৩৫-১৩৭

১৯. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.) : *বাংলাদেশ: নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ;* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৫৫১

২০. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩০-১৩১

২১. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩০

২২. মুর্মু আদিবাসী সাঁওতালদের অন্যতম গোত্র। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে, আদি মানব পিলচু বুড়ো (হাড়াম) ও আদি মানবী পিলচু বুড়ির সাত জোড়া সন্তান থেকেই তাদের উদ্ভব। এ জন্য সাঁওতালরা প্রধানত সাত গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালী ভাষায় এ গোত্রকে বলে 'পারিস'। তবে এ সাত গোত্র থেকে পরবর্তীকালে আরো পাঁচ গোত্রের উদ্ভব ঘটে মোট বারো গোত্র হয়। এ গোত্রগুলো হচ্ছে হাঁসদা, সরেন, টুডু, কিস্‌কু, মুর্মু, মাণ্ডি, বাস্কে, বেসরা, হেম্বরম, পাউরিয়া, চঁড়ে ও বেদেয়া। সাঁওতালদের মধ্যে টোটেম বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। প্রতিটি গোত্র তাদের পূর্বপুরুষ কিংবা গাছপালা, জীবজন্তু ও পশুপাখি প্রভৃতির নামে পরিচিত। মুর্মু শব্দের অর্থ- 'নীল গাভি'। যা এ সম্প্রদায়ের টোটেম বা গোত্রচিহ্ন। তাই এ গোত্রের জন্য নীল গাভি শিকার, হত্যা ও মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এরা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। এরা রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে বসবাস করে। আদিকাল থেকেই কৃষি এদের প্রধান পেশা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় এরা অভ্যস্ত। সাঁওতালি ভাষায় দেবতাকে বলে 'বোংগা'। 'মারাং বুরু' ও 'আবগে বোংগা' দেবতার প্রভাব তাদের জীবনে প্রবল। মুর্মুরা খুব আমুদে লোক। শিকার ও নাচগানে এদের উৎসাহ অপার। 'সোহরাই' (বার্ষিক উৎসব), 'বাহা' (শীতকালীন) 'বাপলা' (বিবাহ), 'ভাণ্ডান' (ফতে অনুষ্ঠান), বারানি (বারুনি মেলা) ও বাহা পরব মুর্মুদের প্রধান উৎসব হিসেবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক সাঁওতালবিদ্রোহে (৩০ জুন, ১৮৫৫) সিধু মুর্মু ও কানু মুর্মু ছিলেন বিশিষ্ট নেতা। আর রঘুনাথ মুর্মু ছিলেন একজন খ্যাতিমান ভাষাতত্ত্ববিদ, লেখক, নাট্যকার এবং সাঁওতালি ভাষায় ব্যবহৃত 'অলবিকি লিপির' উদ্ভাবক।-[উৎস- সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.): বাংলা পিডিয়া ৮ম খণ্ড; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, মার্চ, ২০০৩, পৃ. ২৫৭]

২৩. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩২

২৪. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩০-১৩২

২৫. সাধন চট্টোপাধ্যায় : *ইতিহাসের লড়াই বা লড়াইয়ের ইতিহাস: শওকত আলীর 'নাঢ়াই'* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯-৩৪১

২৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৫

২৭. *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাসটি প্রথম ১৯৯২ সনে দেশের একটি জাতীয় পত্রিকার ঈদসংখ্যায় প্রকাশ পেলেও গ্রন্থাকারে তা ২০১১ সনে প্রকাশিত হয়। কলকাতার একটি পত্রিকার পুজো সংখ্যাতেও এ উপন্যাসটি কিছুটা কাটছাঁট করে (গরুজবাই ও আল্লাহু আকবর সংবলিত তাবিজের অংশ বর্জন করে) ছাপানো হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের *সাপ্তাহিক পত্রিকা* ২০০০-এ ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৯ সনের ঈদসংখ্যায় 'মাদারডাঙার কথা' শিরোনামে এবং ২০০০ সনে 'দৌলতালি আর আব্বাস গজুয়ার বৃত্তান্ত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ১০ বছর পরে আবার কিছুটা পরিমার্জন করে 'একজন দৌলতালি' ও 'আব্বাস গজুয়ার কাজকাম' নামকরণ করে দুটি অংশকে একই মলাটে *মাদারডাঙার কথা* নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। যা ২০১১ সনে ফেব্রুয়ারির বইমেলায় *নান্দনিক প্রকাশনী* প্রকাশ করে।-[উৎস- মনোজ দে: *শওকত আলীর মিথ-পুরাণ ভাষ্য* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া*); পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৯ এবং রাহেল রাজিব: *পাঠ উন্মোচনের খসড়া*; রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯০-৯১]

২৮. মনোজ দে : *শওকত আলীর মিথ-পুরাণ ভাষ্য* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া*); পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৯-১০০

২৯. শওকত আলী: *মীথ: তৃণমূলে যাবার এক পথ* (*তৃণমূল; আখতারুজ্জামান স্মারক গ্রন্থ*); ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭-৫৮

৩০. শওকত আলী : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৮-৬৮

৩১. ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০খ্রি.) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনাপর্বে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের প্রথম প্রতিবাদ হিসেবে গড়ে ওঠে। মুঘল আমল থেকেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলমান সমাজে মদদ্-ই মাস, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও পিরপাল নামক লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদানের প্রচলন ছিল। আর তীর্থস্থান, মঠ-মন্দির, মাজার-দরগাহ ও মেলায় সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের ভ্রমণ-গমন-অবস্থান ও ভিক্ষাবৃত্তিতে স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু কোম্পানির দুঃশাসন ও দুরভিসন্ধির ফলে এসব সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা বন্ধ করায় মুসলিম মাদারি সম্প্রদায়ের ফকির এবং বৈদিকী একদণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সাদৃশ্য এ দুই সম্প্রদায়কে সহজেই ঐক্যবদ্ধ তথা সঙ্ঘশক্তিতে পরিণত করে। কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণে সারা বাংলায় ভয়াবহ ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ/১৭৬৯-৭০ খ্রি.) শুরু হলে পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে ওঠে। এতে চাকরিচ্যুত বেকার সৈনিক, সম্পত্তি হারানো জমিদার ও নিঃস্ব কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরা ফকির মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, সোবাহান শাহ, মাদার বক্স, জরি শাহ, করিম শাহ, ভবানী পাঠক (ভোজপুরী ব্রাহ্মণ) ও দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে বিহার, পুর্ণিয়া, মালদহ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলে বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। এরা তরবারি, বর্শা, গাদা বন্দুক, লাঠিসহ দেশীর অস্ত্র নিয়ে কোম্পানির কুঠি, জমিদারের কাচারি, নায়েব গোমস্তার বাড়ি, দালাল-বেনিয়াদের নৌকা ও সৈন্যদের রসদ আক্রমণ-লুটপাট করে গোটা ভারতবর্ষে তীব্র আলোড়ন তুলে। এদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার। বিদ্রোহীদের হাতে কোম্পানি ও দেশীয় জমিদার-দালালদের টাকা-পয়সা লুণ্ঠনসহ বহু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী খুন-গুমের শিকার হয়। কোম্পানি ও দেশীয় দালালদের চোখে এরা 'ডাকাত-দস্যু-দুষ্কৃতিকারী' বলে প্রতীয়মান হলেও ভুক্তভোগী দেশের বিরাট সংখ্যক কৃষকশ্রেণি ও কতিপয় জমিদারদের সাহায্য-সহানুভূতি অর্জনেও এরা সক্ষম হয়। কিন্তু ১৭৮৭ সনে মজনু শাহের মৃত্যু, নেতৃত্বের বিভাজন এবং দেশীয় জমিদার ও উঠতি পুঁজিপতিদের বিরোধিতা আর কোম্পানির দমন-পীড়নে বিদ্রোহীরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবার উন্নত প্রশিক্ষণ-অস্ত্র-যোগাযোগ-প্রযুক্তির অভাবও বিদ্রোহীদের পরাজয়কে তরান্বিত করে। তাছাড়া এ বিদ্রোহের তেমন কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কিংবা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকাও এ আন্দোলনের অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলত ধর্মের উপর আঘাত আসাতেই এ শান্তিপ্রিয় ফকির-সন্ন্যাসীরা অস্ত্র হাতে নেয় এবং প্রায় চল্লিশ বছর (১৭৬০-১৮০০ খ্রি.) বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। তারপরেও ব্রিটিশ শাসনের সূচনাপর্বে ধর্মীয় আবরণে বাংলায় অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণবিরোধী ফকির-সন্ন্যাসীদের যে-শক্তিশালী বিদ্রোহ গড়ে ওঠে– তা পরাধীন বাংলার প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত।– [উৎস- মুনতাসীর মামুন (সম্পা.): *বাংলাদেশ: নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ;* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৭-৬১]

৩২. মাদারিয়া সম্প্রদায় বা তরিকাহ ভারতবর্ষে ইসলামের সুফিবাদের মধ্যে অন্যতম শাখা। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিরিয়া থেকে আগত সুফি সাধক বদিউদ্দিন শাহ্-ই মাদার বা শাহ বদিউদ্দিন কুতুব-উল মাদার। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন এবং মাদারিয়া মতবাদ প্রচার করেন। 'মিরাত-ই বদারী' (১৬০৩ খ্রি.) নামক ফারসি গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়, শাম বা

সিরিয়া দেশের বনী ইসরাইল বংশে আবু ইসহাক শামীর ঔরসে তিনি ১৩১৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবয়সে তিনি ভারতে আসেন এবং গুজরাট, আজমির, কনৌজ, কাশী, লক্ষ্ণৌ ও জৌনপুর ভ্রমণ করেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শরকীর রাজত্বকালে কানপুরের চল্লিশ মাইল দূরবর্তী মাখনপুরে ১৪৩৬ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। এ বদিউদ্দিন মাদার পিরের অনুসারীদের বলা হয় মাদারি সম্প্রদায়। আর অঞ্চল ভেদে মাদার পির-'শাহ মাদার' বা 'দম মাদার' নামে অভিহিত হন। পরবর্তীকালে এ মতবাদ গোটা বাংলায় প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন শাহ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানা। বুরহানার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মোহিত হয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার শাহ সুজা তাকে বিশেষ সুবিধা ও অধিকার সংবলিত এক সনদ প্রদান করে। দিনাজপুরের হেমতাবাদের বালিয়াদিঘীতে বুরহানার আধিপত্য বিস্তার বিষয়ে আজো জনসাধারণের মধ্যে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। মারেফতি এ তরিকার অনুসারীরা সাধারণত 'শাহ' ও 'ফকির' উপাধি ধারণ করতেন। এদের প্রধান অনুষ্ঠান 'মাদার বাঁশ' ও 'ঝাণ্ডা মাদার' প্রভৃতি। সাধারণত মানুষ রোগ-শোক-অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে মাদার পিরের নামে মানত বা মানসিক করেন। এসব অনুষ্ঠানে মাদার পির ও শিষ্য জুমল শাহের স্মরণে বন্দনা গীতও করা হয়। অনেকে বৈদান্তিক 'একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী' হিন্দু যোগীদের মতো অর্ধনগ্ন থাকতেন, চুল জটার মতো করে বাঁধতেন এবং গায়ে ছাই মাখতেন। উত্তরভারতে এ মতবাদের সূত্রপাত ঘটলেও বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে এর প্রধান নেতা নির্বাচিত হন ঐতিহাসিক ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহের নায়ক ফকির মজনু শাহ। বদিউদ্দিন বহু মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। উত্তরভারত, বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বালিয়াদীঘি, চট্টগ্রামের মাদারশা ও মাদারবাড়ি স্থানে মাদারপিরের অনুসারী ভক্তবৃন্দ রয়েছে। 'মাদারীপুর' জেলার নামকরণে এ মাদারপিরের প্রভাব রয়েছে বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। এখানে তার একটি কৃত্রিম সমাধি রয়েছে। এ মতবাদকে সৈয়দ অজমল, সৈয়দ বুঢ়ন, দরবেশ মুহম্মদ ও আবদুল কুদ্দুস প্রমুখ শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। ঐতিহাসিকদের মতে, বদিউদ্দিন শাহ আরেক সুফি দরবেশ মখদুম জাহানীয়ার (১৩০৭-৭৯ খ্রি.) সমসাময়িক ছিলেন। ভারতে প্রচারিত-প্রচলিত 'চোদ্দ তরিকা বা চতুর্দশ মণ্ডলী'-র প্রভাবের বাইরেও এ মাদারি তরিকা বেশ আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। অপরাপর সুফি আন্দোলনের মতো এটিও ধর্মীয় সংস্কার সাধন করলেও এ মতবাদে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualistic) প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সাধন, ভজন, জীবনাচার ও নীতিদর্শনে এদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা ছিল।-[উৎস- মনসুর মুসা (সম্পা.): *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (১ম খণ্ড); বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭৮-৮০ এবং মুনতাসীর মামুন (সম্পা.): *বাংলাদেশ: নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ*; কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৭-৪৯]

৩৩. মনোজ দে : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৫-৯৯

৩৪. মনোজ দে : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৭-৯৯

৩৫. মনোজ দে : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৯

৩৬. চঞ্চল কুমার বোস : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৭

৩৭. Moud Bodkin : *Archetypal patterns in poetry*; Oxford university press, 1957, P.13.

৩৮. মনোজ দে : পূর্বোক্ত; পৃ. ৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনার উপন্যাস

প্রতিটি সমাজকাঠামোর রূপান্তরের পেছনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে চলিষ্ণু সময়। একটি জাতিগোষ্ঠীর জন্মকথার মৌল চারিত্র্য প্রতিফলিত হয় ইতিহাসের পাতায়। শওকত আলী ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ঘেটে জহুরির মতো তুলে এনেছেন বাঙালি জাতিসত্তার ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়। ইতিহাসের অব্যাহত ভাঙাগড়া আর চড়াই- উৎরাইয়ের পথ ধরেই একটি ভূখণ্ডের জনমানস গড়ে ওঠে। কারণ দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ সময় ও মানুষের হাতে নির্মিত ইতিহাসের গর্ভে জন্ম নেয় একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্য, ভবিতব্য ও সম্ভাবনা। 'পাণ্ডববর্জিত বাংলা'– নামক এ ভূখণ্ডটি প্রাচীন কাল থেকেই শাসিত-শোষিত হয়ে এসেছে বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বহিরাগত শক্তি দ্বারা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি, বৌদ্ধ, তুর্কি, পাঠান, ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের আগমন, আক্রমণ কিংবা আধিপত্যবাদী শাসনামল বাঙালির ঐতিহাসিক পরাধীনতারই অমোঘ সাক্ষী। হাজার বছর ধরে বাঙালির শোষিত হওয়া, পীড়িত হওয়া, বার বার ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়ানো– যা মধ্যযুগ থেকে সাতচল্লিশের দেশভাগ হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইতিহাসের এ শাশ্বত সত্য এবং অমানবিক বিষয়টি শওকত আলীকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। তাই তিনি বাঙালির প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে এ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জীবন-জীবিকা, জনপদ, লোকাচার, বিশ্বাস-বিস্ময়, ভাব-ভাষা-ভাবনা, রাজা-প্রজার সম্পর্কের স্বরূপ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ধর্মের প্রভাব, অভিবাসনের যন্ত্রণা এবং সমাজ সংকটের এপিক রূপটি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। শওকত আলী এক ধরনের ধ্রুপদী ভাষ্যে বাঙালির দূরবর্তী জীবন ও পরিচয়ের কথাকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যলগ্ন করে ভাষারূপ দিয়েছেন। প্রায় আটশত বছরের অতীত মৃত্তিকামূলে শেকড় সঞ্চার করে তিনি সমকাললগ্ন সমাজ ও মানুষের অবয়বকে শনাক্ত করেছেন। তিনি ইতিহাসের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বীরপূজা (cult-worship) না করে বরং নিম্নবর্গীয় তৃণমূলস্পর্শী জনগোষ্ঠীর সংগ্রামীচেতনাকে নির্মাণ করেছেন। তাদের অমিত শক্তি, দ্রোহ ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির সহজাত সংগ্রামী মানসিকতা। এ ব্যতিক্রমী বর্ণাঢ্যরূপই *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। এ ধারার প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস হচ্ছে *প্রদোষে প্রাকৃতজন*। এ অধ্যায়ে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসটি আলোচিত হয়েছে।

ধ্রুপদী ভাষ্যে বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা

প্রদোষে প্রাকৃতজন

শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪খ্রি.) বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় এক ব্যতিক্রমী ও বৈভবমণ্ডিত সংযোজন। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* ও *দুষ্কালের দিবানিশি* [১] নামক দুটি খণ্ডের সমন্বয়ে এ উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। লেখক এখানে ইতিহাস ও উপন্যাসের উদ্দিষ্ট সময়ের মূল প্রবণতা ও অন্তর্গত সত্যকে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। শওকত আলী এ উপন্যাসে ইতিহাসের বিশেষ একটি সন্ধিক্ষণকে বেছে নিয়েছেন। মুসলমান-তুর্কিদের গৌড় ও বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বৌদ্ধধর্মীদের সঙ্গে সনাতন ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের বিরোধ, লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৯-১২০৭খ্রি.) শাসনকালের অন্তিম পর্বে সামন্ত ও মহাসামন্তদের প্রবল নিপীড়নের মুখে প্রাকৃত মানুষের কণ্ঠস্বরের সংবাদও জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে এ উপন্যাসটিতে।[২] এখানে প্রদোষের *ইতিহাস ও প্রাকৃতজনদের* নৃতত্ত্ব গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কৌণিক সন্ধিলগ্ন এর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলেও একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলার উপায় নেই। আবার মানুষ নামের এক বহুতল জনসমষ্টির হাতে রয়েছে সময়ের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু তাই বলে সে-মানুষকে কেবল বাঙালি, পূর্বপ্রান্তের, নামগোত্রহীন শ্রমজর্জর মানুষ বলেও চালিয়ে দেয়া যায় না। এখানে যে-কাহিনি আছে, তা সুদীর্ঘকালের অতীতপ্রবাহ ও তার অন্বেষণের কাহিনি। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ ব্যক্তিনিচয় কখনো কখনো ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত দিলেও সে সামাজিকতার মুখপাত্র।[৩] সম্রাট অশোকের (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ ইতিহাসে তৈরি করে এক ভিন্ন মাত্রা। কারণ অশোক ও তার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা তথা উদ্যোগে পূর্ববাংলায় গড়ে তোলা হয় এক শক্তিশালী বৌদ্ধব্যূহ। এ সাফল্যের ধারা মৌর্য ও গুপ্তযুগেও বজায় ছিল। নিঃস্ব ও প্রায়নিঃস্ব নিম্নশ্রেণির কাছে বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল আশীর্বাদের মতো। কিন্তু পরবর্তীকালে পুণ্ড্রবর্ধনের শাসক সম্রাট শশাঙ্কের (৬০৫-৬৩৭খ্রি.) শাসনামলে এসে ইতিহাসে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ জটিলাবর্ত। যার রেশ চলে কয়েক শতাব্দীব্যাপী। কারণ এ মগধের সন্তান শৈব শশাঙ্ক মগধ থেকে সরে এসে পুণ্ড্রবর্ধনে কেন্দ্রীভূত হন এবং এখানেই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন বা গৌড়তন্ত্রের প্রচলন ঘটান। শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে অভিজাততন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ধীরে ধীরে শৈব শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ বৌদ্ধবিদ্বেষী মনোভাবের রেশ ধরে চলে শতবর্ষব্যাপী (৬৫০-৭৫০খ্রি.) মাৎস্যন্যায়। পরে নিজেদের স্বার্থেই সামন্ত-মহাসামন্ত ও গ্রামপতিরা কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক শাসকরূপে মগধবাসী সামন্ত বৌদ্ধ গোপালকেই নির্বাচিত করে এবং মেনে নেয়। কারণ- 'রাজা ও রাষ্ট্র ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কখনও একান্ত হইয়া থাকে নাই। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র আমাদের জীবন ছিল একান্তই সমাজকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আমাদের যাহা কিছু কর্মকৃতি সমস্তই আবর্তিত হইতো সমাজকে ঘিরিয়া।'[৪] তবে বৌদ্ধ পাল রাজাদের চারশত বছরব্যাপী (৭৫০-১১৬২খ্রি.) শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি সনাতন হিন্দুধর্মও রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। কারণ রাজদরবার ও মন্ত্রিপরিষদে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি ও প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মহা. বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের (১২০৩-১২০৪ খ্রি.) বহু পূর্ব থেকেই বাংলা অঞ্চলে (বিশেষত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী) আরব বণিক ও সুফি-দরবেশদের আনাগোনা ছিল। এ বাংলা প্রদেশই একমাত্র প্রদেশ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কালক্রমে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। ঐতিহাসিক রিচার্ড এম ইটন তাঁর *দি রাইস অব ইসলাম এ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার: ১২০৪-১৭৬০* গ্রন্থে বাংলার বিপুলসংখ্যক মানুষের ইসলামধর্ম গ্রহণের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। এক. অন্তর্ভুক্তি (inclusion); দুই. চিহ্নিতকরণ (indentification) ও তিন. অপসারণ (displacement)।[৫] এ তিনটি পর্বের মাধ্যমে মূলত বাংলা অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রবেশের প্রাথমিক অবস্থা, মধ্যবর্তী সমন্বয় প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যমূলক পর্যায়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তবে সার্বিক বিবেচনায় বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেশীয় নিম্নশ্রেণির নর-নারীর ইসলামে দীক্ষার ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া বা তরিকা কার্যকর ছিল। এক. সুফিয়ানা বা সুফি তরিকা; দুই. তুর্কানা বা তুর্কি তরিকা।[৬] অর্থাৎ মুসলিম সুফি-পির-দরবেশদের অলৌকিক ক্ষমতা, জনশ্রুতি বা মিথ, প্রেমের বাণী ও দয়াধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এদেশের বিরাটসংখ্যক মানুষ ইসলামে দীক্ষা নেয়। সুফিদের আস্তানা ও খানকাহ ছিল এদেশের অসহায় নিম্নশ্রেণির ভরসার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। সুফি-পির-দরবেশগণ ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় প্রজ্ঞাবান, মানসিকতায় উদার ও

দয়াশীল। পক্ষান্তরে অনুদার, অশিক্ষিত ও হিংস্রস্বভাবের তুর্কি শাসক, সেনাপতি ও সৈন্যদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে, পরিস্থিতির মুখে পড়ে এবং জীবন রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে কিছু সংখ্যক মানুষও ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সেনদের (১০৭০-১২৪৬খ্রি.) প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রাচার, কৌলীন্যপ্রথা, অস্পৃশ্যতা (don't touch-ism), ধর্মকর্মে অনাধিকার, শাস্ত্রপাঠ ও মন্দির প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক দমন-পীড়ন-বঞ্চনায় নিম্নশ্রেণি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় এক রকম সাগ্রহেই ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। তাই ১৮৯১ সনের আদমশুমারির রিপোর্টে বলা হয়– মুসলমানদের বাংলা আক্রমণকালে হিন্দুধর্ম শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিম্নবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয়নি।[৭] এর ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শের বজ্র আঁটুনি শিথিল হয়ে পড়ে এবং সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় গ্রহণ-বর্জন অনিবার্য হয়ে ওঠে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ-উচ্চারণে পরিবর্তন সাধিত হয়। এর চিত্র *চৈতন্যমঙ্গল*, *মধুমালতী*, *মনসামঙ্গল* ও *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। সমকালীন গৌড়বাংলা অঞ্চলে ইসলামের এ সর্বপ্লাবী প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে হুমায়ুন কবির বলেছেন-'প্রথম যুগের মুসলমান সকল মানুষের পার্থিব ও পারত্রিক মুক্তির আহ্বান বহন করে এনেছিল বলেই দাসত্বে প্রতিষ্ঠিত পারশিক ও রোমক সাম্রাজ্য তাদের আঘাত সইতে পারেনি। ভারতবর্ষেও যে বহুক্ষেত্রে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান তদানীন্তন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের বিপুল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছে, তার প্রধান কারণ সে-দেশের জনসাধারণের বৃহৎ অংশ রাজশক্তিকে সাহায্য না করে আক্রমণকারীকেই সাহায্য করেছে। *শূন্যপুরাণে* তার ইঙ্গিত এত স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে ভুল করবারও অবকাশ নেই।'[৮] ঐতিহাসিক এ সত্যভাষণ ও বাস্তবতার চিত্র শুধু *শূন্যপুরাণে* নয় বরং *সেকশুভোদয়া* ও *নিরঞ্জনের উষ্মা* গ্রন্থেও পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের এমন চরম দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও অস্তিত্বসংকটে পতিত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে প্রেমের বাণী, সহানুভূতির হৃদয় ও আপসের মনোভাব তথা বিধান নিয়ে এগিয়ে আসেন শ্রী চৈতন্যদেব, দেবীবর ঘটক, স্মার্ত রঘুনন্দন ও ষড়গোস্বামী প্রমুখ। তবে এদের প্রযত্ন-প্রচেষ্টার ফলে আপাত হিন্দুধর্ম ও সমাজ আসন্ন বিপযর্য়ের হাত থেকে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু সমাজদেহের গভীরে যে-ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিরাময় করা আদৌ সম্ভব হয়নি।

সমকালীন বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত পরিচয় ও স্বরূপ-সন্ধানে শওকত আলী যে-শিল্পদক্ষতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন– তা একান্তই স্মরণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি 'লেখকের দায়িত্ব' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন– 'লেখক হওয়া মানেই নিজেকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করা, এক থেকে বহু হয়ে যাওয়া। শুধু নিজের কথাই কখনো কোনো লেখক লেখেন না। কিংবা বলা যায়, লেখক যাই লিখুন, তা যদি কেবল নিজের কথাও হয়, তাহলেও সে রচনাকে সবার কথা হয়ে যেতে হয়। যদি না হয়, তাহলে সেই রচনার সাহিত্য হিসেবে কোনো দাম নেই। শুধু একের কথা না হয়ে বহুর কথা হতে গেলে রচনার শরীরে ও আত্মায় যা থাকে তারই মধ্য দিয়ে লেখক নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।'[৯] রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতটবাসী প্রাকৃতজনের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের স্মরণে নিবেদিত হয়েছিল যে-অসামান্য আখ্যান, সেই *প্রদোষে প্রাকৃতজন* সম্পর্কেও উপর্যুক্ত বক্তব্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

আবহমান বাংলা ও বাঙালির প্রত্ন-ইতিহাস মন্থন করে শওকত আলী আহরণ করেছেন অনালোকিত অন্ত্যেবাসীর কথাবীজ। তারপর বিপুল দক্ষতায় ও পরম যত্নে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টিকে। যেন বাহির থেকে দেখায় সম্পৃক্ত হয়েছে ভেতর থেকে দেখার উদ্ভাসন। ইতিহাসের সৃজনশীল বিনির্মাণ কত সার্থক হতে পারে, তারই নিদর্শন হিসেবে গণ্য-*প্রদোষে প্রাকৃতজন*। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্পন্ন সন্ধিক্ষণের জীবনসত্য উপন্যাসিত হয়েছে। শওকত আলী দেখিয়েছেন সময়ের স্বর আখ্যানে যুগপৎ বহির্বৃত ও অন্তর্বৃত। আর প্রতীয়মান আবরণেও নিয়ামক যেমন বহতা কাল, তেমনিই গভীরতর আবরণেও তার উপস্থিতি প্রকট।[১০] সমাজের অন্ত্যেবাসী, অনিকেত, অসহায় শ্রমজীবী ব্রাত্যশ্রেণির প্রতি লেখক তাঁর এক ধরনের পক্ষপাত, সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং এ বৃহৎ শোষিতগোষ্ঠীর শক্তি-সম্ভাবনার ওপর আস্থা ও গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণস্বরূপ 'লেখকের দায়িত্ব' নিবন্ধে শওকত বলেছেন-'শিল্পকলার সঙ্গে সৃজনশীলতার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। কেননা শিল্পকলার ইতিহাস নিজেকে ক্রমেই অতিক্রম করে যাওয়ার ইতিহাস।...অর্থাৎ সৃজনশীলতার ব্যাপারটি মানবসমাজের সেই অংশটির সঙ্গে সম্পর্কিত যে অংশে আলোড়ন, যে অংশে সচলতা, যে অংশে রূপান্তরের প্রক্রিয়া ক্রীয়াশীল। মধ্যযুগে ব্যক্তির স্বাধীনতাই ছিল অন্বিষ্ট, কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়

শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিই হলো প্রধান কথা।...কেননা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেই সমাজ রূপান্তরের বীজ উপ্ত হচ্ছে। সেখানেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটছে।...সুতরাং গভীর জীবনোপলব্ধির তাগিদে, সৃজনশীলতার নতুন নতুন দুয়ার খুলে দেওয়ার জন্যেই লেখকের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে উপায় নেই। শিল্পীর একটাই পক্ষ, আর তা হলো জনগণের পক্ষ।...জনগণের সঙ্গে থাকা, শোকে-দুঃখে, বিদ্রোহে-বিক্ষোভে, কর্মে-চিন্তায়, অবিরল-অবিচ্ছন্নভাবে জনগণের মধ্যে ডুবে থাকা।'[১১] মানবিক দায়বদ্ধতা ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকার থেকেই শওকত আলী বাংলার অবহেলিত-অবাঞ্ছিত-অন্ত্যেবাসী-অভাজন কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসীদের কৌমজীবন পরম মমতা ও যত্ন দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের অখ্যাত-অনুপস্থিত নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর জীবনাচরণ, শোষণ, নির্যাতন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মূল্যবোধের আকাল, দীপ্তি ও দ্রোহ প্রভৃতি এ উপন্যাসে সৃষ্টি করেছে এক অভিনব রূপকল্প। এজন্য তিনি শুধু ইতিহাসের আশ্রয় নেননি বরং কখনো কখনো ঢুকে পড়েছেন আরো গভীরে, প্রাচীন অন্ধকার গুহার গাত্রে, মঠ-মন্দিরের মৃৎপাত্রে, পুত্তলি ও ফলকের মতো শৈল্পিক ফসিলে। ইতিহাস-ঐতিহ্য আশ্রয়ী এ উপন্যাসটি প্রায় আটশত বছরের অতীত বাংলা জনপদের মানবগোষ্ঠীর এক অসাধারণ কালচিত্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায়। সময়-সমাজ-ব্যক্তির সংকট ও সম্ভাবনার প্রহরটি তিনি যে-নির্মোহ ও নান্দনিকভাবে বিনির্মাণ করেছেন, তা এক কথায় দুশ্চর-দুরূহ কর্ম।

সমকালীন বাংলায় সেন শাসকগণ সমাজশৃঙ্খলার নামে ধর্মীয় বাতাবরণে সৃষ্টি করেন কৌলীন্যপ্রথা। এ অভিজাততন্ত্রে নিম্নবর্ণ ও ব্রাত্যশ্রেণির কোনো জায়গা ছিল না। সামাজিক আচার-আনুষ্ঠানিকতার মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও এদের অংশগ্রহণ ও প্রবেশাধিকার হরণ করা হয়েছিল। বিল্বগ্রামের পরম বৈষ্ণব কায়স্থকুল শিরোমণি মহাসামন্ত সুধী মিত্র সনাতন হিন্দুধর্মের উজ্জীবন ও প্রতাপ প্রসারে নিজ গ্রামেই বিশাল বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। এর সাজসজ্জায় গুরু বসুদেবের ডাক পড়ে। সঙ্গতকারণেই বসুদেব প্রিয় শিষ্য শ্যামাঙ্গকে নিয়ে বিল্বগ্রামে এসে মন্দির সজ্জায় ব্যস্ত হন। মন্দির গাত্রে রামায়ণের আবহ ফুটিয়ে তুলতে জানকীর বরমাল্য দান, রামের বনগমন, হনুমানের গন্ধমাদন বহন করার দৃশ্য সম্বলিত মৃৎফলক তৈরির ভার শ্যামাঙ্গের ওপর বর্তায়। কিন্তু বাংলা ও গৌড়ীয় মৃৎশিল্প চর্চায় ও সৃষ্টিতে নৈপুণ্য লাভকারী খেয়ালি শ্যামাঙ্গ রামায়ণের উচ্চমার্গীয় ধর্মীয় আবহ বাদ দিয়ে চিরচেনা বাংলা ও বাঙালি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী প্রেমিকের কণ্ঠলগ্না ব্যাধ তরুণীর প্রণয়দৃশ্য, প্রণয়ীর জন্য শবর যুবতীর প্রতীক্ষার দৃশ্য ও মাতৃময়ী ধীবর রমণীর সন্তানকে স্তন্যদানের দৃশ্য গড়ে তোলে। কিন্তু গুরু বসুদেব শ্যামাঙ্গের এমন ব্রাত্য জীবনাশ্রয়ী মৃৎফলক দেখে ক্ষেপে যান। জানকী ও যক্ষিণী মূর্তির পার্থক্য না দেখে এবং আভিজাত্যের কাঠিন্য ও ঔদ্ধত্য না থাকায় বিরক্ত হন। উপরন্তু– 'দেখো, কোনোভাবেই যেন ফলকে ব্রাত্য প্রসঙ্গ না থাকে– শাস্ত্রানুশাসন বিচ্যুত হয়ো না' বলে উপদেশ দেন। কিন্তু শ্যামাঙ্গ তা মানতে পারেনি। তাই প্রতিবাদ করে গুরুর উদ্দেশ্যে বলে-

> 'কেন গুরুদেব, ব্রাত্য মুখচ্ছবিতে অপরাধ কী? এসব মূর্তিতে যে আমার আবেগ স্পন্দিত হয়েছে।'-[প্র.প্রা. শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৩য় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৫/পৃ. ২০-২১]

অথচ বসুদেব এসব মানতে নারাজ। তিনি শুধু প্রতিমা নির্মাণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন বরং ধর্মশাস্ত্রেও প্রজ্ঞাবান। তাই শ্যামাঙ্গকে ভর্ৎসনা করে বলেন– 'মূর্খ, তুমি শ্যামাঙ্গ, একেবারেই মহামূর্খ। তোমার স্মরণে থাকা উচিত যে এসব নির্মিত হচ্ছে তোমার পিতৃধনে নয়। এসবের ব্যয়ভার বহন করছেন কায়স্থ কুলতিলক মহাসামন্ত সুধীমিত্র। সুতরাং তাঁর আদেশ-নির্দেশই তোমাকে পালন করতে হবে। তুমি আদেশের দাস মাত্র– তাঁর আদেশ পালনের জন্যই তোমাকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে– প্রতিমা নির্মাণশাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য নয়।' গুরু বসুদেবের এমন নির্মম, গ্লানিকর ও আনত মানসিকতার বক্তব্য শ্যামাঙ্গ মেনে নিতে পারেনি। যদিও সমগ্র মধ্যযুগেই সামন্তশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তথাপি শিল্পীর আপস ও দাসত্বকে শ্যামাঙ্গ গ্রহণ করতে পারেনি। বরং তার মনে এক দ্রোহের ভাব জাগে। তাই গুরুর উদ্দেশ্যে শ্যামাঙ্গ বলে-

> 'শিল্পী কি ক্রীতদাস? রাজানুগ্রহ ব্যতিরেকে শিল্পীর কি অস্তিত্ব নেই? ধীমান বীটপাল কি রাজাদেশের দাস ছিলেন? প্রথা ও অনুশাসন ছিন্ন করেন যে শিল্পী তিনি কি ক্রীতদাস হতে পারেন?'-[প্র.প্রা./পৃ. ২৩]

তবুও বসুদেব শ্যামাঙ্গের কোনো যুক্তিকেই মেনে নেন না এবং প্রশ্রয়ও দেন না। সমকালীন কুলগৌরবে অন্ধ সামন্তবাদী সমাজে উচ্চ ধর্মীয়আবহ ব্যতীত লোকায়ত আবেগ, আদর্শের কোনো মূল্য ছিল না। তাই বসুদেব শ্যামাঙ্গের মৃৎফলক পদাঘাতে ভেঙে ফেলায় সে অভিমানে গুরুর শিক্ষা ও গুরুকে ত্যাগ করে গ্রামের বাড়ি রজতপটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সামন্তশাসকদের স্বেচ্ছাচার ও ধর্মরক্ষক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের আগ্রাসী-অমানবিক বিধি-বিধান সমাজশৃঙ্খলার পরিবর্তে চরম

অরাজকতার জন্ম দেয়। এতে জীবনের নিরাপত্তা ও সামাজিক সংহতি চরমভাবে বিঘ্নিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর দেশীয় গরিব নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুক্তির আশায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এ অরাজকতার সূত্রেই উজুবট গ্রামের মায়াবতীর যুবক ভাই চন্দ্র দাসের দস্যুদের হাতে মৃত্যু হয়। আর বিয়ের পাত্রী মদনপুরের পিতৃবন্ধু প্রফুল্ল দাসের কন্যা মধুবতীর উন্মাদদশার ঘটনা ঘটে। এমন পরিস্থিতিতেই ক্লান্ত-শ্রান্ত শ্যামাঙ্গ উজুবট গ্রামে মায়াবতীদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এ আশ্রয়সূত্রেই সে যোগমায়ার মাতৃস্নেহ, মায়াবতীর বোনের আদর এবং স্বামীপরিত্যক্তা লীলাবতীর প্রেমের পরশ পায়। সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় শুধু মানুষের জীবনের নিরাপত্তাই হুমকিতে পরেনি বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির (চাল, গম ও বস্ত্রের) দামও বৃদ্ধি পায়। রাজার সৈন্যদের হাতে প্রায়ই জনসাধারণকে নিগ্রহের শিকার হতে হয়। আর বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দু রাজা ও সামন্তদের শত্রুতার সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ততর হয়ে ওঠে। কারণস্বরূপ শুকদেব জানান–

> ‘বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, কাষায় বস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক ঐ ভিক্ষুরা নানাবিধ দুষ্কর্মের আকর। তারা একসময় রাজদ্রোহী ছিল। একারণে গৌড়াধিপতি ও রাজপুরুষেরা তাদের সমূলে উৎপাটিত করেন– তাদের মন্দিরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে পুরোহিতদের নিক্ষেপ করা হয়।...একসময় ভিক্ষুদের গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।’-[প্র.প্রা./পৃ. ৩৯-৪০]

তবে এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দেশীয় বৌদ্ধদের তৎপরতা, তাদের বহু সংখ্যায় একত্রে গমনাগমন এবং পার্শ্ববর্তী গোকুলহাটের মতো বহু হাটবাট ও গ্রাম-গঞ্জে পশ্চিম দেশীয় যবন মুসলমানদের ক্রমাগত উপস্থিতির বিষয়। আবার এসব মুসলমান দরবেশ-ব্যবসায়ীদের একত্রে বসে খাবার খাওয়া, আজান দেয়া, অজু করা, নামাজ পড়া এবং সাম্য, মৈত্রী ও মধুর স্বভাবে দেশবাসীকে আকৃষ্ট করার ঘটনায় দীনদাস ও গৌরদাস আতঙ্কিত হন। তাই শুকদেব বলেন–

> ‘এই যবন জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং হিংস্র; মগধ দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রায় সকল রাজ্যই এখন তাদের পদানত।’-[প্র.প্রা./পৃ. ৪১]

যবন মুসলমানদের সঙ্গে দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে দেখে রাজা, সামন্তশ্রেণি ও দেশবাসীর মনে নানা আতঙ্ক, সন্দেহ আর জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। দেশের অত্যাসন্ন মহাবিপর্যয়ের আশঙ্কা এবং জীবনের নির্লক্ষ্য অবস্থার মধ্যে পিপ্পলী হাটে এক চরম বর্বর ও বিভীষিকাময় ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ডোম ও চণ্ডাল নারীরা চাঙাড়ি, খুচি, ডুলা ও টুকরি বিক্রি করতে এসে মহাসামন্ত হরিসেনের অনুচর বজ্রসেনের সঙ্গে হাটকর আদায় নিয়ে তুমুল ঝগড়ায় জড়ায়। ডোমনী নারী কুসুম কর প্রদানের প্রতিবাদে ক্রুদ্ধস্বরে বজ্রসেনকে বলে–

> ‘অরে ছিনালপুত্র, আমরা যে তোর পিতার কর্মস্থলের দ্বারদেশ থেকে তোকে টেনে এনে জগৎ দেখবার সময় কর দিয়ে এসেছি, সে সংবাদ কি তোর মা তোকে জানায়নি?-[প্র.প্রা./পৃ.৬৪]

সামন্তশাসক ও বিত্তবানদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রাত্য নর-নারীরা সঙ্ঘচেতনা নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। অনুরূপ শোষণ-জুলুমের চিত্র পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের শুরুতে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে। বর্ধমানের সিলিমবাজ তালুকের ডিহিদার, সরকার, পোদ্দার ও জমাদারদের বসতকর, লবণকর, সানাভাত, ধানকাটি, কলম-কসুরে, পার্বণী, সেলামী, ধুতি ও দিগারির অত্যাচারে মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। আর গুজরাট নগরে মহামণ্ডল সেজে প্রতারক ভাড়ু দত্তের চালানো হাটকরের নামে লুটপাটের পীড়নেও নগরবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ঝগড়া প্রশমন করতে আসা বৌদ্ধ ভিক্ষু চেতনানন্দের কাঁধে খড়গাঘাত করায় পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটে। এতে উত্তেজিত জনতা-‘ধর শ্যালককে’ বলে মার মার ধর ধর বলে এগিয়ে আসে। আর তাতেই-

> ‘বজ্রসেনের দেহ ডোমনীরা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।...বজ্রসেনের সহচরদ্বয় পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না–সমবেত জনতার মুষ্টি, পদ এবং কর্মকারদের হস্তলীর আঘাতে দু'জনেরই দেহ কিমাকার মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়।’-[প্র.প্রা./পৃ.৬৪]

এ ঘটনায় চারপাশের এলাকায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সামন্ত হরিসেন একে নিজের প্রতাপ-প্রভাব ও অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করেন। ফলে নিম্নশ্রেণির ডোম-চণ্ডালদের এ অবাধ্যতার চরম শিক্ষা দিতে তিনি দুই দিন ধরে দুইশত অস্ত্রধারী সৈনিক সংগ্রহ করেন ও বহু লোকজনের বহর নিয়ে পিপ্পলীর হাটে এসে উপস্থিত হন। বিপদ দেখে হাটের পার্শ্ববর্তী ডোমপল্লীর যুবক-কিশোররা গভীর বনে আশ্রয় নেয়াতে বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশুরা সহজেই হরিসেনের কব্জায় চলে আসে। জনসম্মুখে কুসুম ডোমনীকে ধরে এনে হরিসেনের উপস্থিতিতে তারই অনুচর ঘোষণা করে–

> ‘এই স্বৈরিণী সকল বিরোধের মূল, দেহের যে অংশের কারণে এই স্বৈরিণী পুরুষ সমাজে বিরোধ এবং লোভের বীজ বপন করে, শরীরের যে অংশ যথার্থই নরকের দ্বার, সেই অংশটি আমরা প্রজ্জ্বলিত করে দেবো।’-[প্র.প্রা/পৃ.৬৫]

ধর্মের নামে ও সমাজশাসনের নামে এমন বর্বর, বীভৎস ঘোষণা শোনার পরও কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অসহায় বৃহৎ গরিব শ্রেণির ওপর প্রভুত্বকারী সংখ্যালঘু শাসক-নিপীড়ক শ্রেণির প্রতিনিধি হরিসেনের আদেশ ও আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবায়িত হয়। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসম্মুখে-

> 'কুসুমকে নির্বস্ত্রা করে তার যোনিদেশে একটি উত্তপ্ত লৌহদণ্ড প্রবেশ করিয়ে দেয়া হল। মৃত্যুর পূর্বেকার চিৎকার, বাঁচার জন্য আকুলি-বিকুলি, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ–সবই কুসুম করেছিল। কিন্তু সবই তখন দেখাচ্ছিলো জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুত্তলীর হস্তপদ সঞ্চালনের মতো।'-[প্র.প্রা./পৃ.৬৫]

এ ঘটনার প্রায় আটশত বছর পর ধর্মান্ধ পাকিস্তানি শাসনামলেও এরূপ বর্বরোচিত পীড়নের পরিচয় মেলে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উস্কানিতে সরকারি পুলিশ বাহিনী নাচোলের কৃষকদের তেভাগা-আন্দোলন নস্যাৎ করতে নারীনেত্রী ইলা মিত্রের উপরেও এমন পৈশাচিক পীড়ন চালায়। বাংলার ইতিহাস বদলে গেছে, যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ঘটেছে অথচ নারীর প্রতি সমাজ ও শাস্ত্রের রক্ষাকর্তা পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, মর্ষকামিতা ও নিপীড়নের কোনো তারতম্য ঘটেনি। শুধু কুসুমকে পাশবিকভাবে হত্যা করেই হরিসেনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় না। কুসুমের দুই শিশুপুত্রকেও 'জারজ আর পাপের সন্তান' আখ্যা দিয়ে খড়গাঘাতে দু'টুকরো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শত্রুতা এবং নিম্নশ্রেণিকে বিদ্রোহে উস্কানির অজুহাত ও অপরাধের জন্য গুরুতর অসুস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষু চেতনানন্দকেও জ্বলন্ত আগুনে ফেলা হয়। যদিও পাল শাসনামলে এদেশে সনাতনধর্মী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে সদ্ভাব, সৌহার্দ্য ও সহাবস্থান ছিল। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে নিগ্রহ-নিপীড়নের তেমন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সেন আমলে এসেই ব্রাহ্মণদের কূটকৌশলে এ সম্প্রীতির অবসান ঘটানো হয়। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে উভয় উভয়ের শত্রুতে পরিণত হয়। তাই চেতনানন্দকে শুশ্রূষাকারী ভিক্ষু শুদ্ধানন্দকেও আগুনে ফেলতে আনা হয়। কিন্তু উপস্থিত জনতা-'কেন, কেন...ওর কি দোষ? ওর কি অপরাধ?' বলে চিৎকার করায় তার নিতম্বে সজোরে পদাঘাত করে তাকে পালিয়ে যেতে দেয়। জনতার এমন প্রতিবাদে হরিসেন ও বিষ্ণুদাসরা আর বাড়াবাড়ি না করে ফিরে যায়। কারণ পিপ্পলী হাটের এ প্রজ্বলিত আগুন যুগ যুগ ধরে নিপীড়নের শিকার ব্রাত্যশ্রেণির অস্থি ও শোণিতের মাঝে যে-প্রতিবাদের শিখা উস্কে দেয়, যে-চেতনার স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করে দেয়– তা দেখে হরিসেনরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

পিপ্পলী হাটের এমন পৈশাচিক ঘটনার প্রভাব পড়ে নবগ্রাম হাটেও। হরিসেনের দুজন সৈনিক এসে শ্যামাঙ্গকে সন্দেহ করে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। পিপ্পলীহাটের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ তুলে তাকেও লাঞ্ছিত করে তবে দুই কুড়ি মুদ্রা ঘুষ দিয়ে সে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। শ্যামাঙ্গের এমন দুরবস্থার সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ছোটবকুলপুরের যাত্রী* গল্পের দিবাকর চরিত্রের বেশ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। না জেনে কেনা পানের ঠোঙ্গায় বিপ্লবের ইশতেহার বহন করার দায়ে তাকে ও তার স্ত্রী আন্নাকে রাজশক্তির সহযোগী জোতদার বাহিনীর হাতে নাজেহাল হতে হয়। দেশের এমন অবিচার, অযাচার ও অবক্ষয় দেখে প্রাণভয়ে শ্যামাঙ্গ পথে পা বাড়ায়। নিজগৃহে আদৌ পৌঁছাতে পারবে বলে সে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারে না। কারণ-

> 'পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়া উভয় তীরের বিস্তীর্ণ ভূভাগের জনপদগুলির তখন প্রায় একই অবস্থা।...তথাপি ব্রাহ্মণ সুখী, কায়স্থ সুখী, বৈশ্য সুখী। কেবল ব্রাত্য শূদ্রদের গৃহে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মস্তকোপরি গৃহের আচ্ছাদন থাকে না। আজ যদি গ্রামপতি বসবাসের স্থান দিলেন তো কালই বললেন, দূর হ, দূর হ, পামরের দল।'-[প্র.প্রা./পৃ. ৬২]

সমাজের নিম্নশ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে অশীতিপর রাজা লক্ষ্মণ সেনের দেশ শাসনে উদাসীনতা কিংবা মন্ত্রী-রাজকর্মচারী-সামন্তদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। উপরন্তু অত্যাসন্ন তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ না করে সভাসদদের নিয়ে উমাপতি, ধোয়ী, জয়দেবের কাব্যগীতে ও বারাঙ্গনাশ্রেষ্ঠা বিদ্যুৎপ্রভার নৃত্যকলায় নিমগ্ন হয়ে থাকা। যদিও এতদ্বিষয়ে ইতিহাসে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।[১২] তবে বাংলার এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মূলে যে-রাজা-প্রজার মধ্যেকার পিতা-পুত্রের আন্তরিক সম্পর্কের স্থলে প্রভু-দাসসুলভ অবস্থা, ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়শোষণ, পর্বতপ্রমাণ সম্পদের বৈষম্য ও চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ দায়ী ছিল– তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। পাল আমলে বাঙালি সংস্কৃতির একটি বহুমুখী ধারা বিকশিত হলেও তা পরবর্তী সেন আমলে এসে বিঘ্নিত হয়। অভিজাত সংস্কৃতভাষা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রক্ষণশীল সংস্কৃতি চর্চায় গোঁড়ামি প্রবল হওয়াতে শাসকগোষ্ঠী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে দেখা দেয় অবক্ষয়। তখন প্রাকৃতজনগোষ্ঠী মনে প্রাণে পরিবর্তন কামনা করছিল। তুর্কিদের আগমন তাদের সে-প্রত্যাশার সুযোগ এনে দেয়।

শ্যামাঙ্গ নবগ্রাম হাট থেকে একরকম পালিয়ে কুসুম্বী গ্রামে এসে কুম্ভকার মনোহর দাসের বাড়ি আশ্রয় নেয়। তবে আসার পথে বনভূমি এলাকায় দুস্যুদের হাতে তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। বাংলার সমাজকাঠামোর ভাঙন-বিশৃঙ্খলা, জনমনের অশান্তি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সুযোগ তুর্কি মুসলমানরা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে। শ্যামাঙ্গ দুজন বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে জানতে পারে পশ্চিম দেশ থেকে যবনদের ক্রমশই অশ্ব হাঁকিয়ে রক্তের হোলি খেলতে খেলতে এবং দেশদখল করে পূর্ব দিকে এগিয়ে আসার কথা। যবন-সৈনিকদের হিংস্রতা ও রক্তপিপাসার সঙ্গে দীনদাসের কাছে শোনা যবন সাধু-দরবেশদের আচরণ মেলাতে গিয়েও সে মেলাতে পারে না। একজন যোগী ভিক্ষুকে নিয়ে শ্যামাঙ্গ উজুবট গ্রামে এসেও বিপদে পড়ে। কারণ গভীর রাতে উজুবট গ্রাম হরিসেনের সেনারা আক্রমণ করে এবং গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। দূরে খোলা তরবারি হাতে, বীর ধটিকা পরিহিত হিংস্র সৈন্যদের দেখে শ্যামাঙ্গ নিশ্চিত হয় যে, এরা ডাকাত-দস্যু নয়। লীলাবতীকে এরা ধরতে এলে শ্যামাঙ্গ অভিমন্যু দাসের দলকে চিহ্নিত করে। তলোয়ারধারী দুই সৈনিকের বিরুদ্ধে শ্যামাঙ্গ দুটি প্রজ্বলিত বাঁশখণ্ড হাতে তুলে নেয় এবং-'তুমি চলে যাও লীলা' বলে চিৎকার করে ওঠে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যখন শেষ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন ঐ মুহূর্তেই-

> 'ধাবমান অশ্বের খুরধ্বনিও শোনা গেল। ধূম ও অগ্নিশিখার প্রক্ষিপ্ত প্রতিফলনে ছায়ার মতো অশ্বারোহীদের আগমন-নির্গমন দেখা যেতে লাগল। এই অশ্বারোহীদের কারও হাতে উন্মুক্ত তরবারি, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা।...দীর্ঘদেহ, শ্মশ্রুময় মুখমণ্ডল, মস্তকে উষ্ণীষ– না কোনো সন্দেহ নেই– এরাই সেই যবন দল।'-[প্র.প্রা./পৃ. ৮৯]

অর্থাৎ উজুবট গ্রামে প্রথম আক্রমণ করে দেশীয় সামন্ত হরিসেনের সৈন্যরা। আর দ্বিতীয় আক্রমণ চালায় যবন তুর্কি মুসলমান সৈন্যরা। বনে আশ্রয় নেয়া শ্যামাঙ্গ প্রজ্বলিত, লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত উজুবট গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর নিজের অক্ষমতায় নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং মনে জাগ্রত হওয়া কেবল একটি জিজ্ঞাসার কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারে না। কারণ-

> 'তার মনে কেবল একই প্রশ্ন, এরা কারা? একই স্থানে আঘাত হানে, একই গৃহে অগ্নি দেয়, একই পল্লীর মানুষকে হত্যা করে–অথচ দুটি ভিন্ন দল–এদের মধ্যে সত্যিই কি কোনো পার্থক্য আছে?'-[প্র.প্রা./পৃ. ৮৯]

আসলে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-ভূগোলের অমিল থাকলেও প্রজাপীড়নে, পরধর্ম অবমাননায়, পরধন লুণ্ঠনে, পরনারী নির্যাতনে ও পরদেশ-সমাজ আক্রমণে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল পাওয়া যায়। তাই ঘরের ও বাইরের শত্রুর যুগপৎ আক্রমণ ও আগ্রাসনে গৌড়বাংলার নিম্নশ্রেণির অসহায় নর-নারীর কীটপতঙ্গের মতো মৃত্যু ও বনেবাদাড়ে পলায়ন ব্যতীত কোনো গত্যন্তর থাকে না। কারণ ততদিনে 'যবন জাতির হাতে মহাকালের ডমরুতে অনাহত ধ্বনি বেজে উঠেছে। কেউ জানে না, ভবিষ্যতে কী আছে। বড় ধূসর ঐ প্রদোষকাল।' দেশের ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। শ্যামাঙ্গ লীলাবতীকে নিয়ে দুদিন জঙ্গলে অপেক্ষা করে। গ্রামে ফিরতে না পেরে পালিয়ে যায় কদম্বঘাটের সূর্যমন্দিরে ও বিল্বগ্রামে। গুরু বসুদেব ও বন্ধু নীলাম্বরকে না পেয়ে লীলাবতীর মামা যোগীসিদ্ধ দীননাথের সঙ্গে তারা নবপাটক গ্রামে শীলনাথের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অমাবস্যা তিথিতে নারীলোলুপ শীলনাথ লীলাবতীকে যোগাচারের সাধনসঙ্গিনী বানাতে চায়। কারণ এ যোগসাধনার সঙ্গে যৌনাচারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সমকালীন উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীদের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ উপাসক কালচক্রযানীদের প্রভাব ও প্রসারও এখানে বিকশিত হয়। চর্যাপদ রচয়িতা কাহ্নপার জন্মভূমি হিসেবে অনেকেই দিনাজপুরের আত্রাই নদীর তীরবর্তী সমজিয়া অঞ্চলকে দাবি করেন। এ সহজপন্থীরা ছিলেন উদার, সংস্কারমুক্ত ও বর্ণাশ্রম-বিরোধী। আর এ ধর্মমত ছিল চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরুস্থানীয়দের উপাধি ছিল 'সিদ্ধাচার্য' বা 'সিদ্ধপা'। কালচক্রযানে তিথি, নক্ষত্র, দিবস ও রাশির উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে দিনাজপুর অঞ্চলে গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রসার ঘটে।[১৩] এর বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় লীলাবতীকে যোগব্রতে দীক্ষার আয়োজন ও আনুষ্ঠানিকতায়। যেমন–

> 'শ্যামাঙ্গ কিছুই বলার অবকাশ পেলো না। একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন শ্যামাঙ্গকে। কক্ষের মধ্যস্থলে ভূমিতে চক্র ও রেখা অঙ্কিত।...ধূপ জ্বলছে, প্রদীপ জ্বলছে, কয়েকটি পদ্মফুল সেখানে, সেই সঙ্গে আবার জবাফুলও। ঐ মধ্যস্থলেই দেখলো, বসে আছে লীলাবতী। শীলনাথ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। সে বললো গুরুদেব, আজ রাত্রে তো কোনো শুভলগ্ন নেই, জাতক জাতিকার কায়াশুদ্ধিরও একটি ব্যাপার আছে– অনুষ্ঠানটি পরে করলে হতো না? সে-চিন্তা আমার; সিদ্ধপা জানালেন। বললেন, কালযোগ বলে একটি কথা আছে।...উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার মন্ত্রপাঠ করলেন...অগ্নিতে ধূপ নিক্ষেপ করলেন। অগ্ন্যায় স্বাহাঃ বললেন কয়েকবার।'-[দু.দি./পৃ. ১৩২-১৩৩]

এদেশে ধর্মানুভূতির প্রাবল্য বরাবরই বিদ্যমান ছিল। ত্রয়োদশ শতকের সেই দ্রুত পরিবর্তমান সময়ে এর ভূমিকা ছিল আরো প্রভাবসঞ্চারী। লেখক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর শিল্পীর মন দিয়ে বর্ণনা করেছেন সেইসব মানুষের ধর্মভাবনা। দেশের

এমন ঘোর দুর্দিনে যোগী দীননাথ শিষ্য শীলনাথের দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরে শ্যামাঙ্গ ও লীলাবতীকে যোগব্রতের দীক্ষা দেন। আর দুজনকে পুণ্ড্রনগরের দিকে পাঠিয়ে দেন। বিপদের আশঙ্কা দেখলে মুসলিম পির-দরবেশদের যবনকেন্দ্রে নির্দ্বিধায় আশ্রয় নেবারও পরামর্শ দেন। বিদায় বেলা ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে আঙুল তুলে শ্যামাঙ্গের উদ্দেশ্যে যোগী দীননাথ বলেন-

> 'নক্ষত্রমালা সাক্ষী, রাত্রির অন্ধকার সাক্ষী, তোমার আমার নিঃশ্বাস বায়ু সাক্ষী–শ্যামাঙ্গ, আমি তোমার হাতে লীলাবতীকে সমর্পণ করলাম; ওকে তুমি রক্ষা করো। তোমাদের বিবাহ হবে না– কেননা শাস্ত্রের কোনো বিধান নেই...এ বড় দুষ্কাল বৎস, জানি তোমাদের সংসার হবে না– তথাপি আমি তোমাদের মিলিত করে দিলাম– পারলে যোগব্রত পালন করো।'-[দু.দি./পৃ. ১৩৩]

এমন বিবাহযোগ্য ও পরিণত বয়সের প্রেমিক-প্রেমিকাকে যোগী দীননাথ ধর্মের নামে, যোগের নামে, শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কারের নামে যে-অদৃশ্য বাধার দেয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেন; তা মোটেও মানবিক নয় এবং কোনো কল্যাণও বয়ে আনে না। বাস্তবতাবিবর্জিত ও অদূরদর্শী এমন ব্যবস্থাপনা পরবর্তীকালে শ্যামাঙ্গ-লীলাবতীর পরাশ্রিত-পলায়নপর জীবনের নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, বদনাম, গ্লানি, বিবেকের দংশন ও মনের জ্বালা-যন্ত্রণাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ধর্মের তথা যোগব্রতের ঐশী বিধানও রক্তমাংসের জীবন্ত নর-নারীর প্রেম-প্রীতির কাছে পরাস্ত হতে বাধ্য হয়। আষাঢ় রাতের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশের মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ও লালসাগ্রস্ত শীলনাথের দুরভিসন্ধির ভয়-আতঙ্কের মধ্যে লীলাবতীর সুরক্ষার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে শ্যামাঙ্গ অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। আর পদে পদে বিব্রতকর অবস্থা ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। কিন্তু পুণ্ড্রনগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছে দুজনে একদল নেশাখোরের কবলে পড়ে জীবনরক্ষার্থে পরদেশি-পরজন-পরধর্মাবলম্বী মুসলিম দরবেশদের আশ্রয়শিবিরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। দেশীয় শাসকদের শোষণ-অত্যাচারে উদ্ভূত অরাজক পরিস্থিতি ব্রাত্যশ্রেণির শুধু জানমালের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় না বরং হাজার বছরের লালিত ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের জগতেও প্রচণ্ড অভিঘাত বয়ে আনে। তাই লীলাবতীর মুখে যবনধর্মের প্রশংসা শুনে ও পক্ষপাত দেখে শ্যামাঙ্গ ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। যখন প্রাকৃত বাংলার মানুষেরা পেরিয়ে যাচ্ছিল এক তীক্ষ্ণ বাঁক। যে-বাঁকে অচিরেই রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে একটি জনগোষ্ঠী দেশীয় মানুষের হাজার বছরের জীবনদর্শন ও আচার বদলে দিয়েছিল। তাই লীলাবতীর সাম্য-সম্প্রীতির সর্বপ্লাবী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবার বিষয়ে আগ্রহ দেখে শ্যামাঙ্গ জানায়-

> 'লীলা, স্বধর্ম যে ত্যাগ করে, সে পাপিষ্ঠ–আমরা কি পাপ করেছি, বলো? কেন আমরা নিজধর্ম ত্যাগ করব?'-[দু.দি./পৃ. ২১৪]

শ্যামাঙ্গ নিজধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের শেকড় ছিন্ন করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হয় না। শ্যামাঙ্গ কয়েকজন ভিক্ষুসহ পুণ্ড্রনগরীর এক প্রাচীন বিহারে আশ্রয় নেয়। এ বিহারের পাথরে গড়া গৌড়ীয় রীতির প্রতিমা দেখে সে বিস্ময়াভিভূত হয়। দুদিন ধরে সে প্রতিমাগুলো পর্যবেক্ষণ করে এবং লীলাবতীর মতো যক্ষিণীমূর্তির পাশে নিজের গড়া মৃন্ময়মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তৃতীয়দিন সে প্রতিমা গড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু রাজধানী পতনের খবর ও তুঙ্গননদীর পশ্চিম তীর থেকে ধেয়ে আসা যবন দলের কোনো সংবাদ শ্যামাঙ্গ রাখেনি। শ্যামাঙ্গের ধারণা ছিল যবনেরা বৌদ্ধভিক্ষু ও শূদ্রদের কিছু বলবে না। কিন্তু সকল হিসেব ও কল্পনা উল্টে যায়। কারণ-

> 'সেনাপতি কাফুর খান ক্ষুদ্র দলটির সেনাপতি। দুইশত সৈন্য ছিল প্রথমে। এখন হয়েছে দুই সহস্র–এদের অধিকাংশ দেশীয় সৈন্য। অবাধ লুণ্ঠনের লোভে এরা কাফুর খানের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।...মিত্র সামন্তদের সেনাদল ও যবন সেনাদল এখন প্রায় একাকার। পথিমধ্যে একত্রেই এখন তারা গ্রাম লুণ্ঠন করছে।'-[দু.দি./পৃ. ২২২]

এদেশের ইতিহাসে সর্বদা একটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে; সুবিধাবাদী,ধনী ও শোষক শ্রেণিরাই বার বার দালালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নিজ শ্রেণির বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আপস, দেশের স্বাধীনতা ও জাতির মর্যাদা বিকিয়ে দিতেও এরা পিছপা হয়নি। দালাল ও লম্পট অভিমন্যুর আগ্রহে যবন বাহিনী প্রথমে উজুবট ও মদনপুরের গ্রাম লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যালীলা চালিয়ে পরে পুণ্ড্রনগরের বৌদ্ধভিক্ষুদের শায়েস্তা করতে আসে। পূর্বের প্রতিহিংসাবশত অভিমন্যু শ্যামাঙ্গকে শূলে চড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শ্যামাঙ্গের ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে কালান্তরের স্বর। হাজার বছর পরে বিশ শতকের কিংবদন্তি-প্রতিম চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো তাঁর রচিত নাট্য-সংলাপের সূত্রে জানিয়েছিলেন 'জ্বেলে দাও সব আলো, বুলেট ও বেয়নেটের দিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা ছুঁড়ে দেই এক ঝাঁক পায়রা'– এ যেন তারই বহুদূরবর্তী পূর্বাভাস। চিত্র প্রতিমা দিয়ে বস্তুর ও মানুষের পুনরাবিষ্কার করতে চায় যে শিল্পী, তাকে তো রুদ্ধ সময়ের শাসন মেনে নিয়ে চেনা সম্ভব নয়। লোকায়তিক রূপকল্পের লাবণ্য ও শক্তি আবিষ্কার করতে চেয়েছিল আত্রেয়ী তীরবাসী শ্যামাঙ্গ নামক মৃৎশিল্পী।[১৪] তবে শেষ পর্যন্ত শ্যামাঙ্গ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে যেন মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কাহিনির সঙ্গে শ্যামাঙ্গের শিল্পচৈতন্যবোধ তেমনভাবে বিকশিত-বিবর্তিত হয় না। সৃজনশীলতার যে-সম্ভাবনায় শ্যামাঙ্গ নিজের অভিষেক ঘটিয়েছিল তাও যেন থিতিয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিক যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই শ্যামাঙ্গ-চরিত্রের যোগসূত্র রক্ষা করতে চাননি। বিকশিত হবার আগেই

কাহিনিসূত্রে অনুজ্জ্বল থেকে যায়। তারপরেও বলা যায়, ঔপন্যাসিকের গড়া শ্যামাঙ্গ এমন এক মৃৎশিল্পীর প্রতিনিধি যার উদ্ভব মৃত্তিকালগ্ন জনগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু যুগের পরম্পরায় তার সত্তা সংকটগ্রস্ত– সেই সংকট থেকে জন্ম আতঙ্কের ও প্রশ্নের। এ প্রশ্ন কেবল শিল্পীর অন্তরের প্রশ্ন নয়– জীবনের, সংস্কৃতির সর্বোপরি মানব-অস্তিত্বের।[১৫] তাই অদৃষ্টের কাছে হেরে গেলেও প্রাকৃত পুরুষ মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গরা কখনো পরাভব মানে না। ব্যক্তি-শিল্পীর মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু তার সৃষ্ট শিল্প মৃত্যুহীন। কালান্তরে তারা জন্মায় এবং সংগ্রাম চালিয়ে যায়। উপরন্তু শ্যামাঙ্গই লোকবাংলার মৃৎশিল্পের প্রতিনিধি, প্রেমিক আর ব্রাত্য মানুষের আদর্শ। শওকত আলীর সৃজিত শ্যামাঙ্গ চরিত্রটি দেশপ্রেম আর শিল্পপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সমকালীন বর্ণবাদী হিন্দু সমাজে বংশীয়বৃত্তি পরিবর্তনের কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ এ জীবন ও জীবিকা ছিল সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্র দ্বারা স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ। এর অমান্যকারী সমাজ ও ধর্মের কাছে পাপী ও বিদ্রোহী হিসেবে পরিগণিত হত। এমন চিত্র দেখা যায় আত্রেয়ী নদী তীরবর্তী আম্রপট্টলী গ্রামের বসন্ত দাসের জীবনে। শৈশব থেকেই বসন্ত দাসের বংশীয়বৃত্তি কৃষিকাজ ভালো লাগত না। বাণিজ্য তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আকর্ষণ করতো। তাই কৃষিকাজ বাদ দিয়ে আত্রেয়ী নদীতে চলাচলকারী বারণাসী, প্রয়াগ, কামরূপ, সোমদ্বীপ, বিক্রমপুরের বণিক ও বাণিজ্যতরীর কাছে গিয়ে সে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ঘোরাঘুরি করতো এবং ব্যবসায়বৃত্তির বিষয়-আশয় নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করতো। বসন্ত দাসের বংশীয়বৃত্তি কৃষিকাজ ত্যাগ করে ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণের এমন বিদ্রোহাত্মক চেতনা উস্কে দিয়েছিল তারই বাল্যশিক্ষার গুরু আরেক বিদ্রোহী যোগীপুরুষ। আত্রেয় নদী তীরবর্তী এলাকায় যোগীপুরুষের বসবাস হওয়াতে এ নদীতীরও তাকে আকর্ষণ করতো। কারণ এ যোগী-

> 'অষ্টপ্রহর গীত গাইতেন। রামায়ণকাহিনী, ভারতকথা, পুরাণবৃত্তান্ত– সমস্তই থাকতো তাঁর গীতে। ঐ প্রৌঢ় যোগীটি আবার শিক্ষাদানও করতেন। এক প্রকার উন্মাদ ছিলেন সম্ভবত। তা না হলে ধর্মহীন চণ্ডাল, হড়ডি, শবর ইত্যাদি নীচ জাতীয় বালকদের কেউ শিক্ষা দান করে?...কাজটি ছিল গর্হিত। কেননা, কে কবে শুনেছে যে, ডোমের পুত্র, হড়ডির পুত্র, বিদ্যাভাস করে?'-[দু.দি./পৃ- ৯৮]

সমকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজে ব্রাত্যশ্রেণির শাস্ত্রপাঠে ও শ্রবণে, লোকাচার তথা ধর্মকর্মের আনুষ্ঠানিকতায়, মঠ-মন্দিরে অনুপ্রবেশের ও প্রতিমাদর্শনের ন্যূনতম অধিকার ছিল না। সমকাল বিবেচনায় গুরুর এহেন উদ্যোগ ছিল সত্যিই এক ধরনের বিদ্রোহের শামিল। বণিকদের মুখে শোনা দূর দেশের কাহিনি ও প্রথাবিরোধী যোগীগুরুর শিক্ষার বাইরেও গুরুর প্রাকৃত গীতগুলি বসন্ত দাসের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে সেও গুরুর মতো হয়ে ওঠে বংশীয়বৃত্তি বর্জনে বিদ্রোহী, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, প্রথাবিরোধী, দেশপ্রেমিক ও কিছুটা সংসারবিবাগী। গুরুর মুখে শোনা রামায়ণকাহিনি, মহাভারতকাহিনি, পুরাণবৃত্তান্ত তথা প্রাকৃতগানই তার চিন্তা-চেতনায় স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের বীজ বপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বাইরের দেশ ও সমাজের দুর্বার টানে বসন্ত দাস বণিকদের সঙ্গে পালিয়ে বাড়ি ছাড়ে এবং রীতিমতো এক বিত্তবান বণিকশ্রেষ্ঠীতে পরিণত হয়। মায়াবতীকে বিয়ে করে সংসারে মনোযোগ দেয়। কিন্তু দেশের অরাজক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামন্তদের দুঃশাসন ও ঘুষ-দুর্নীতির প্রাবল্যে বসন্ত দাসের সংসার জীবন ও বণিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাওয়ার মতো তার অর্থকড়ি দস্যু,রাজকর্মচারী, সামন্তশাসক ও গ্রামপতিদের লুটপাট ও ঘুষের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যায়। দেবীকোটের মেলায় অবস্থানকালেই এক ঘোড়া ব্যবসায়ী মুসলমান বৃদ্ধের স্বল্পদিনের সান্নিধ্য-সংস্পর্শ বসন্ত দাসের চেতনার দ্বার খুলে দেয়। কারণ গৌড়-বঙ্গদেশের সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাস, বর্তমান দুরবস্থার কারণ এবং তুর্কি যবন-সেনা ও পশ্চিমদেশীয় যবন পির- দরবেশদের মৌলিক পার্থক্য– এসব বিষয়ে বৃদ্ধ বণিকের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য বসন্ত দাসের চেতনায় বার বার আঘাত করে। আবার– 'তোমরা নিজেকে জানো না– আত্মবিস্মৃতির মতো পাপ আর নেই' এমন কথাতেও মনের মধ্যে সে এক ভিন্নতর জগৎ ও জীবনের সন্ধান পায়। এতে করে সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায়–

> 'সমস্ত কিছুই ললাটলিপি নয়–রাজা রাজপুরুষ কেউ অজেয় নয়। রাজার বিরুদ্ধেও প্রজা দ্রোহ উত্থাপন করতে পারে এবং ক্ষেত্র বিশেষ সফলও হয়।...ছুৎমার্গ একেবারেই অহেতুক। স্পর্শ মাত্রই খাদ্যবস্তু নষ্ট হয় না।'-[দু.দি./পৃ. ১০৯]

সমাজ, ধর্ম, শাস্ত্র, স্বদেশ, স্বজাতি ও রাজনীতির ঘনায়মান সংকটের মুখোমুখি হয়ে সে নিজের চিন্তাস্রোত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঔদার্য ও মানবতার উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই নিজে না পালিয়ে পান্থশালায় কলেরার মহামারিতে আক্রান্ত যবন বণিকের সেবা-শুশ্রূষা করে। তারপরেও বণিক মৃত্যুবরণ করায় সে একাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। বৃদ্ধ বণিককে সমাধিস্থ করতে গিয়ে সে সাতটি হীরকখণ্ড, দশটি স্বর্ণখণ্ড ও কিছু মুদ্রা পেয়েও রীতিমতো বিপদে পড়ে। কারণ- 'পূর্বে যান, দক্ষিণে যান, উত্তরে যান, সর্বত্রই একই কাহিনী। সর্বত্রই ধর ধর রব, সর্বত্রই মার মার চিৎকার।' বসন্ত দাস ধনরত্ন বিক্রির উদ্দেশ্যে পুণ্ড্রনগরীর ফল্গুগ্রামের সামন্তপতি শ্রীনাথবর্মণের কাছে গিয়ে সর্বস্ব হারায়। চুরির অপবাদ দিয়ে এবং কৃষককুলে জন্ম নিয়ে বণিকবৃত্তি গ্রহণ করাকে অপরাধ হিসেবে উত্থাপন করে তিনি ভয়-ভীতি দেখান। এজন্য শ্রীনাথবর্মণ বলেন– 'তা

ক্ষেত্রকররা কি ইদানীং বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছে না কি, আঁ? বৃত্তি সংকর্য সৃষ্টি করে চলেছো, তোমার লজ্জা করে না? পাপবোধ নেই আঁ?...তাহলে তুমি ধর্মদ্রোহীও বটে।' ধর্ম ও সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত চতুর্বর্ণে বিন্যস্ত শ্রমব্যবস্থাপনাকে অতিক্রম করার সুযোগ ও স্বীকৃতি পাবার অধিকার বসন্ত দাসের ছিল না। কারণ বৈদিক যুগ থেকেই বাংলার হিন্দুসমাজ চতুর্বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বিভক্ত, বিন্যস্ত ও প্রভাবিত ছিল। শাস্ত্র আর সংহিতাই ছিল সমাজ শাসনের সংবিধান। ব্রাহ্মণরাই সকল বর্ণের সামাজিক মর্যাদা, অবস্থান ও পেশা বা বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেন। এরা নিজেদের আভিজাত্য এবং রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে প্রচার করতেন– 'যবন দোষে, কাশী দাসে ও বামুন ঘেঁষে– এই তিন সর্বনেশে।' বাংলা ও বাঙালির সমাজকাঠামো বর্ণ ও বৃত্তির উপর আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাস প্রায় একই মাপকাঠিতে বাঁধা ছিল। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য– 'বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণনির্ভর। আর বর্ণ ছিল জন্মনির্ভর। বৃত্তি যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণি একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে এবং শ্রেণির মর্যাদাও সেই সমাজের বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়।'[১৬] এতদ্বিষয়ে যতীন সরকার আরো বিস্তৃতভাবে বলেছেন– 'সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের ফলে সৃষ্ট যে- শ্রেণিবিভক্তি, ভারতবর্ষে তারই প্রকাশ বর্ণাশ্রমের মধ্যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সেই বর্ণাশ্রম প্রথাজাত কর্তৃত্বশীল শক্তি; সে-শক্তির দাপটে সমাজের শ্রমজীবী শূদ্র, অন্ত্যজ ও ব্রাত্যরা নিষ্পিষ্ট ও নিগৃহীত।'[১৭] সমকালীন বাংলার সমাজকাঠামোতে নিম্ন ও নিম্নতর শূদ্র-অন্ত্যজ শ্রেণি শুধু বর্ণ হিসেবেই নয় বরং অর্থনৈতিক বিচারেও তারা ছিল সমাজের তলের তল (bottom of the bottom) পর্যায়ের মানুষ। এ শ্রেণিকেই রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী চক্রবর্তী আন্তোনী গ্রামশির *Selections from the Prison Notebooks* গ্রন্থের আলোকে বলেছেন Sub-altern class বা প্রান্তজনবাসী কিংবা ভূমিহীন, প্রায় ভূমিহীন, নিঃস্ব বা অন্যান্য পেশার মানুষ। সমাজে এদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না এবং এদের সদিচ্ছার কোনো মূল্যও স্বীকৃতি পেত না।

একারণেই কৃষককুলে জন্ম নেয়া বসন্ত দাস ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ করায় তাকে সমাজকর্তাদের রোষানলে পড়তে হয়। এভাবে সামন্তপতি শ্রীনাথবর্মণের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে বসন্ত দাস এর প্রতিকার চাইতে বিল্বগ্রামের সামন্তপতি শক্তিবর্মণের কাছে গিয়েও কোনো সুবিচার পায় না বরং হুমকির সম্মুখীন হয়। আসলে সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসক ও তার প্রতিনিধিদের এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ও স্বেচ্ছাচারিতার কাছে বসন্ত দাসের মতো অসহায় জনগণের সুবিচার পাবার উপায় ছিল না। আবার নদীতে বণিকদের আত্মরক্ষায় নৌবীথি সাজিয়ে রাতযাপন করার দৃশ্য দেখেও দুঃখের মধ্যে বসন্ত দাসের হাসি পায়। কারণ– 'পথে দস্যু যা হস্তগত করে সে আর কতটুকু! পক্ষান্তরে যুগ যুগ ধরে নিজ গৃহেই অপহৃত হয়ে চলছে তারা। গ্রামপতি নেয়, রাজপুরুষেরা নেয়, ব্রাহ্মণেরা নেয়, কায়স্থরা নেয়– কে তাদের শ্রমলব্ধ উপার্জনের অংশ নেয় না?' এ চতুর্মুখী শোষণে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও তারা তা বুঝতে পারে না কিংবা বুঝতেও চায় না। এমনকী এ দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান দাসত্ব ছেড়ে নিজেদেরকে বিপুল সঙ্ঘশক্তিতে উজ্জীবিত করারও প্রয়োজনবোধ করে না। অথচ দুরাচার শাসকের দৌরাত্ম্য থেকে দেশের জনগণের মুক্তির ব্যাপারে কৃষ্ণাদের মতো সামান্য দেবদাসীদের আত্মনিয়োগ ও প্রতিবাদী হতে দেখে বসন্ত দাস অবাক হয়। এদের সংস্পর্শে বসন্ত দাসের চেতনায় আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তাকে বৃহৎ জগতের সঙ্গে যুক্ত করে। তাই তার মনে হয়–

> 'বণিক জীবনের মৃত্যু ঘটেছে ফল্গুগ্রামে, বালিগ্রামে হয়েছে তার অন্ত্যেষ্টি এবং ঐ অন্ত্যেষ্টির পর আরম্ভ হয়েছে তার নতুন জীবন।...এই উপলব্ধির নাম মুক্তি। সীমারেখা থেকে মুক্তি, গণ্ডিরেখা থেকে মুক্তি, স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্তি এবং একইভাবে ঘৃণা থেকে, সংকোচ থেকে, হীনমন্যতা থেকে ক্রমাগত একের পর এক মুক্তি।'-[দু.দি./পৃ. ১৭০]

সামান্য দেবদাসী কৃষ্ণার প্রেম ও বোধের সংস্পর্শ বসন্ত দাসের জীবনে এক নবজন্ম ঘটায়। ফলে স্ত্রী মায়াবতীর আকর্ষণ পরিহার করে মঙ্গলদ্বীপে মিত্রানন্দের সঙ্গে দেখা করতে দিবানাথের বাড়ি যায়। দেশের আসন্ন বিপ্লব-বিক্ষোভ নিয়ে নানা প্রশ্ন তার মনে জাগে। তাছাড়া– 'আমি তো যুদ্ধ চাইনি।...কেন এই দ্রোহ উত্থাপনের প্রস্তাবনা; এতে তো মৃত্যু এবং ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছুই আমি দেখছি না' বসন্ত দাসের এমন কথা মিত্রানন্দের ভালো লাগে না। এর জবাবে মিত্রানন্দ বলে– 'মনে কি হয় না আপনি পুরুষানুক্রমে দাস? সামন্তপতির দাস, কায়স্থের দাস? আপনার কি ভগবান আছে? আপনি ভগবানের পূজা করতে পারেন? চণ্ডাল-ডোম-হড্ডিদের কথা চিন্তা করুন।...শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভেদ, একে অপরের ওপর লাঞ্ছনা করে, শোষণ করে, লুণ্ঠন করে। আপনি কি লুণ্ঠিত হননি, বুলন? তার প্রতিকার কোথায়?' মিত্রানন্দের এমন যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবঘনিষ্ঠ কথাকে বসন্ত দাস অস্বীকার করতে পারে না। এমনকী- 'শ্রেষ্ঠ মানব তার গুণে, জন্মে নয়, কুলক্রমেও নয়'– একথাও স্বীকার করে। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগে সেন শাসনের অবসান হলে তৃতীয় শক্তি হিসেবে তুর্কি যবন মুসলমানদের যদি উত্থান ঘটে; তখন দেশের অবস্থা কীরূপ দাঁড়াবে, আর সে-পরিবর্তনে গরিব শ্রেণি লাভবান হবে কী না,

তাদের জীবনের কোনো সুখকর পরিবর্তন আসবে কী না–এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা তাঁর মনে উকিঝুঁকি দেয়। তাই মিত্রানন্দকে সে বলে–

> 'আমি জানি এই ব্যবস্থা আমার ধনার্জনের পথ উন্মুক্ত রাখেনি, আমাকে বিদ্যার্জন করতে দেয়নি–এমনকি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষও যে নিরুপদ্রব সংসার জীবনযাপন করবে তারও কোনো সুযোগ সৃষ্টি করেনি–আমি প্রচলিত ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চাই–কিন্তু এর পরিবর্তে আমি কী পাব।'-[দু.দি./পৃ. ১৭৩]

এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মিত্রানন্দ দিতে পারে না, বরং এর জন্য আরো অপেক্ষার পরামর্শ দেয়। গৃহত্যাগের সময় বসন্ত দাসের লক্ষ্য ছিল ব্যবসায় বৃত্তির মাধ্যমে ধনী বণিক হওয়া। কিন্তু বর্তমানে তার একমাত্র চিন্তা দেশবাসীর দাসত্বের মুক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। তাই বসন্ত দাস শ্বশুরালয়ে অবস্থান করে ও স্ত্রীর বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করেও খুব কৌশলে কখনো রাতের বেলা বনগ্রামে, আবার কখনো নদীর তীরে মিত্রানান্দের পাঠানো ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখা করে মতামত জানায়। ভিক্ষুরা এসময় তুর্কি যবনদের ডেকে এনে সেনশাসকদের পরাস্ত করতে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে চায়। কিন্তু 'এখনও সময় হয়নি'– বলে সে মিত্রানন্দকে নিবৃত্ত করে। তাই বলে পাঠায়–

> 'যবন জাতি বহিরাগত– তারা এলে তুমি আর আমি কেউ থাকবো না। আর জেনো, তারা শুধু রাজ্য জয়ই করছে না– ধর্মকে পর্যন্ত জয় করে নিচ্ছে।...এক সন্ত্রাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যদি আমরা আরেক সন্ত্রাসের মধ্যে নিপতিত হই, তাহলে সেটা কোনো কাজের কথা নয়।'-[প্র.প্রা./পৃ. ৭৫]

এক্ষেত্রে ভিক্ষু মিত্রানন্দের চেয়ে বসন্ত দাসের চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে অনেক বেশি দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত মনে হয়। কারণ সেনদের পতন-ধ্বংসের ওপর যবন তুর্কি মুসলমানদের অনিবার্য উত্থান ঘটলে এবং তৎপরবর্তী সংকট যে-আরো ভয়াবহ রূপ নেবে–তা বসন্ত দাস ঠিকই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। উজুবট গ্রামে এসে চোখের সামনে ধ্বংস আর মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দেখে সে রীতিমতো ভয় পায়। অসহায় গ্রামবাসীর এমন ভয়ঙ্কর ও করুণ পরিণতি বসন্ত দাস কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। গোটা দেশের ধ্বংস, মৃত্যু, অনিশ্চয়তা ও অনিকেত দশাকে তার নরক বলে মনে হয়। কেননা বিকৃতি, পাপ, পচন ও পতনই তো নরকের লক্ষ্মণ। তাই ধনসম্পদ, স্ত্রী-সংসার ও মানবিক সকল সম্পর্ক থেকে বিছিন্ন হয়ে বসন্ত দাসের কেবলি মনে হয়–

> 'কোন পরিচয় আমার? আমি কি বণিক? বণিক হলে বিত্তহীন, সম্বলহীন অবস্থায়...কেন? নাকি আমি ক্ষেত্রকর? তাহলে তো আমার গৃহবাসী হয়ে ক্ষেত্রকর্মে যুক্ত থাকার কথা। না সে বণিক নয়। ঐ পরিচয় তার অপহৃত হয়ে গেছে ফল্গুগ্রামের জনপদে। এবং ক্ষেত্রকর পরিচয়টি পরিত্যক্ত হয়েছে আরও পূর্বে। এখন তাহলে সে কি ভৃত্য? দাস? নাকি সাধু অথবা যোগী? সে নিজের জন্য কোনো অভিধা আবিষ্কার করতে পারে না।'-[দু.দি./পৃ. ৯৬]

এভাবে শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণ-অবিচার ও দেশব্যাপী দুর্যোগ আর দুর্বিপাকের অভিঘাতে বসন্ত দাস শুধু পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদই হারায় না বরং একই সঙ্গে বৃত্তি, পদবি হারিয়ে সে নামহীন-গোত্রহীন-আত্মপরিচয়হীন দশায় উপনীত হয়। কারণ এসময়েই মদনপুর গ্রাম অভিমন্যু দাসদের প্ররোচনায় তুর্কি যবন সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার খবরে বসন্ত দাসসহ সবাই আতঙ্কিত হয়। আর কদম্বঘাট এলাকার অবস্থা হয়ে ওঠে আরো নাজুক। কারণ-

> 'নদীপথে দক্ষিণগামী বৃহৎ নৌকার সংখ্যা অধিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামন্তপতিরাই শুধু নয়, তাদের অনুচরদের পরিবারও দক্ষিণে এবং পূর্বে চলে যাচ্ছে।...পশ্চিমের গ্রামগুলি থেকেও লোক পলায়ন করছে। প্রত্যেকের মুখেই যবনাক্রমণের সংবাদ। দু'তিনটি যুবতী রমণী এবং কয়েকটি গাভী ও ছাগল নিয়ে গেছে।...যাবার সময় মন্দিরটি অপবিত্র করে গেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে গো-হত্যা করে সেই গো-মাংস দগ্ধ করে ভক্ষণ করেছে এবং ঐ মন্দিরেই রমণীদের বলাৎকার করা হয়েছে।'-[দু.দি./পৃ. ১৯১]

পশ্চিমাঞ্চল ও মদনপুরে তুর্কি যবন সেনাদের সঙ্গে দেশীয় সামন্তসেনাদের সম্মিলিত আক্রমণের খবর শুনে প্রাণভয়ে বিল্বগ্রাম, সুনন্দপুর, কদম্বঘাটসহ বহু এলাকার মানুষ ক্রমশ দক্ষিণ ও পূর্ব দেশে পালিয়ে যায়। দেশবাসীর এমন অসহায়ত্ব, অব্যাহত শোষণ-নির্যাতন, পলায়নপর মানসিকতা ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিদ্রোহী বসন্ত দাসের সহযোদ্ধা নিরঞ্জন বৌদ্ধদের মহাসমাবেশে যা বলে তা বাস্তবসম্মত হলেও গ্রহণ করা যায় না। সে দেশের আপামর জনসাধারণের উপর বল-ভরসা না করে রাষ্ট্রীয় গোলযোগের সুযোগে হিন্দু ক্ষত্রিয় সেন শাসকদের উৎখাত করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। তাই সে বলে–

> 'সর্বত্রই দেখেছি উচ্চশ্রেণীর লোকদের হাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিপীড়ন– প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষ হোক। লুণ্ঠন, হত্যা, দস্যুবৃত্তি–এগুলি প্রায় নিত্যসঙ্গী মানুষের জীবনে। রাজপাদপজীবী যাঁরা, তাঁরা কিছুই করে না– সম্ভোগ ও ব্যসনে তাঁদের আসক্তি সীমাহীন। প্রজারা তাদের কাছে যেন পীড়নের পাত্র– পালনের নয়। ছিন্নমূল ক্ষুদ্র তরুর মতোই তাদের অবস্থা। ফলে যখনই দেখি

যবনেরা আসে, তখনই তারা হয় পলায়ন করে নতুবা বশ্যতা স্বীকার করে– কখনই যুদ্ধ করে না। যবন শক্তি ভিন্ন দেশীয়। তারা আজ আছে কাল নেই।'-[দু.দি./পৃ. ১৯৪]

কিন্তু দেশের এরকম পরিস্থিতিতে বসন্ত দাস অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, দেশীয় সামন্তদের প্ররোচনা ও প্রশ্রয় ছাড়া তুর্কি যবনরা এমন আক্রমণ চালাতে পারে না। তুর্কিদের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতাদখল, তৃতীয় শক্তি উত্থানের আশঙ্কা ও দেশবাসীর বিপ্লবে চেতনা তথা প্রস্তুতি নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভিক্ষুদের মহাসমাবেশ শেষ হয়। কেউ কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারে না। এক ধরনের হতাশা নিয়েই বসন্ত দাস মিত্রানন্দকে নিয়ে পুণ্ড্রনগরের যবনকেন্দ্রের দরবেশ মহাত্মা আহমদের সঙ্গে দেখা করে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আগত তুর্কি যবন সেনাদের সঙ্গে ভিক্ষু ও দেশবাসীর কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত– এমন জিজ্ঞাসায় তিনি যা বলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সাবধানী উচ্চারণ। কারণ হিসেবে মহাত্মা আহমদ বলেন-

'যারা আসছে তারা ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, অসহযোগিতা করে কী লাভ বলো?...সদ্ধর্মীদের কেউ কেউ সামন্তপতিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যবন বাহিনীকে পথ দেখিয়ে আনতে চান–সাবধান ঐ কাজ যেন কেউ না করে– এই যবনেরা তুর্কি, এরা বর্বর, জ্ঞান-বিদ্যা-ধর্ম কোনো কিছুতেই এদের শ্রদ্ধা নেই। এদের ডেকে আনা আর আত্মঘাতী হওয়া একই ব্যাপার।...যারা বহিরাগত, তারা যদি মনে প্রাণে বহিরাগতই থেকে যায়, তাহলে এদেশে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু তারা যদি মৃত্তিকালগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে, প্রকৃতিপুঞ্জের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, তবে কিন্তু তাদের এদেশ থেকে বিতাড়ন করা অসম্ভব হবে।'-[দু.দি./পৃ. ২০২-২০৩]

দরবেশ আহমদের এমন কথায় বসন্ত দাসের বোধ ও উপলব্ধি আরো পরিষ্কার হয়। কারণ বর্বর তুর্কি যবন সেনাদের ডেকে আনা যে-দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের শামিল হয়ে দাঁড়াবে– এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। দেশের আসন্ন ঘনায়মান মহাদুর্যোগ দেখে, কৃষ্ণা-শুক্লা-বিভাবতীদের আত্মত্যাগের ব্যর্থতা দেখে, কুসুম-চেতনানন্দদের মৃত্যুর অপচয় দেখে বসন্ত দাসের মন ব্যথা-বেদনায় ভরে ওঠে। তারপরেও পার্শ্ববর্তী হাটে গিয়ে জুলুমকারী দুই সৈনিকের বিরুদ্ধে মিষ্টিবিক্রেতা এক প্রৌঢ়া মহিলার প্রতিবাদী তৎপরতা দেখে সে আশাবাদী হয়ে ওঠে। চির দুঃখী-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত বাঙালি তার অবস্থান থেকে, সহজাত সাহসে ভর করে যে-যার মতো সমাজের বিদ্যমান অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে অমিত শক্তি নিয়ে সর্বদা প্রতিবাদ করে যায়। বিদ্রোহ-বিপ্লব আর প্রতিবাদের চিরচেনা রূপটি প্রাকৃত বাঙালি উত্তরাধিকারসূত্রে অস্থি-মজ্জায়-শোণিতের স্রোতধারায় বহন করে চলছে। তাই বসন্ত দাস মিত্রানন্দকে প্রাকৃতজনদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রাণবীজের স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে বলে-

যদি সকল প্রাকৃতজন একত্রে এই প্রকারে প্রতিরোধ করতে পারতো, তাহলে কী হতে পারতো। যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতজন এইভাবেই প্রতিরোধ করে, লাঞ্ছিত হয়, নিহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায়, তথাপি সে ঐ একই সঙ্গে প্রতিরোধ করতে ভোলে না–হয়তো বিচ্ছিন্ন, হয়তো একাকী এবং শস্ত্রহীন– তথাপি তার দিক থেকে প্রতিরোধ থেকেই যায়।'-[দু.দি./পৃ-২১০]

গণমানুষের চেতনার মধ্যে শোষণবিরোধী ও অত্যাচারবিরোধী বিদ্রোহের বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু তা বিরাট সম্ভাবনাময় সঙ্ঘশক্তিতে রূপ নেয় না। যদিও সমকালে সংগঠিত বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবাদের তেমন সুযোগও ছিল না। এপর্যায়ে বসন্ত দাসের একে একে মনে পড়ে স্ত্রী মায়াবতীর মুখচ্ছবি, কৃষ্ণা ও ছায়াবতীর স্বপ্ন এবং নিরঞ্জনের দীর্ঘশ্বাস। তারপরও বসন্ত দাস স্বপ্ন, ক্রোধ, জ্বালা এবং প্রণয় থেকে আঘাত ও হাতছানি পেয়ে শেষপর্যন্ত সংসারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কেননা-

'আপাতত এটিই তার পথ। কারণ সংসারে মায়াবতী আছে এবং মায়াবতীর গর্ভে তার সন্তান জন্ম লাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।'-[দু.দি./পৃ-২১১]

কারো জন্য অপেক্ষা বা প্রতীক্ষার যোগ্য জায়গা হল সংসার। দেশের মহা দুর্যোগকালে এ সংসারে থেকেই বসন্ত দাস অনাগত সন্তানকে সুরক্ষা দেবে। কারণ স্বদেশ-স্বজাতির এ দুষ্কালে বিশ্বাস-ভালোবাসায় সংহত আর সুদৃঢ় হতে না পারলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। আর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি, শক্তি ও সাহসের মাধ্যমে তাকে যোগ্য করে তুলবে। কারণ তাকেই তো বহন করতে হবে পিতৃপুরুষের অসমাপ্ত বিদ্রোহের পতাকা। দুষ্কালের দিবানিশির অবসান ঘটাতে এ ভবিষ্যৎ প্রাকৃত পুরুষকেই মহাকালের ডমরুতে আঘাত করে তুলতে হবে প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি। বসন্ত দাস জীবনের শুরুতে বংশীয়বৃত্তি বর্জনে বিদ্রোহের পরিচয় দেয়, বাণিজ্যে বের হয়ে দেশে দেশে ঘুরে রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারে, জীবনের বঞ্চনা-ভালোবাসা থেকে উপলব্ধি করে স্বজাতীয় চেতনা এবং শেষাবধি ব্রাত্য জাতির মুক্তি-সংগ্রামে বিদ্রোহী বৌদ্ধ ভিক্ষু মিত্রানন্দের সংস্পর্শে বিপ্লবী হয়ে ওঠে।

বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ ও সমাজপতি কায়স্থদের নিপীড়ন-নির্মমতায় সমকালীন বঙ্গদেশে সাধারণ মানুষের জীবনমান চরমভাবে ব্যাহত হয়। এতে গোটা সমাজকাঠামো ভেঙে পড়ে। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় উজুবট গ্রামের হরকান্তের মাতৃহীন মেয়ে ও স্বামী-পরিত্যক্তা লীলাবতীর জীবন-সংসার ও সুখ-স্বপ্নও তছনছ হয়ে যায়। স্বামী অভিমন্যু দাসের প্রতি লীলার প্রচণ্ড ক্ষোভ-বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের নেপথ্যে রয়েছে স্বামীর বিকৃত মানসিকতা, কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ ও নারীবিদ্বেষী মনোভাব। অভিমন্যুর এ বিকার-বিকৃতির মূলেও রয়েছে তার কিশোরী বোন পুষ্পবতীর স্থানীয় কায়স্থ যুবকের দ্বারা বলাৎকারের ঘটনা। আম্রপট্টলী গ্রামের অভিমন্যু বোনের এ চরম অপমান-লাঞ্ছনায় কিছুই করতে না পারার অক্ষমতায় মানসিক পীড়নে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই বাসর রাতের কুসুমশয্যায় নববধূ সুন্দরী লীলাবতীকে নির্বস্ত্র করে যৌন অঙ্গগুলো নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে আর বলে–

> 'আমার বিশ্বাস হয় না– আমার বিশ্বাস হয় না।...বিবাহে বিশ্বাস হয় না, নারীতে বিশ্বাস হয় না, তোমাকে বিশ্বাস হয় না।...এটি কে প্রথম মর্দন করেছে বলো, সেই ব্রাহ্মণ কিশোর, নাকি কোনো কায়স্থ লম্পট, নাকি তোমার প্রতিবেশীদের কেউ?...এখানে কেন নখরাঘাতের চিহ্ন নেই? সেই ব্রাহ্মণ কিশোর কি নখর রাখত না?'-[প্র.প্রা/পৃ. ৫৪-৫৫]

এভাবে বাসর রাতের কুসুমশয্যা লীলাবতীর বিবাহিত জীবনের শ্মশানশয্যা হয়ে ওঠে। বাবার বাড়িতে ফিরে আসাতে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাই এক বছর পেরিয়ে গেলেও স্বামী অভিমন্যু তাকে নিতেও আসেনি, আর সে নিজেও যেতে চায়নি। কিন্তু দেশের আসন্ন এ মহাদুর্যোগকাল লীলাবতীকে ভাবিয়ে তুলে। কারণ এ সংকট শুধু রাষ্ট্রের নয় বরং তার জীবনেও অভিশাপ বয়ে এনেছে এবং অনিবার্য অংশ হয়ে উঠেছে। অভিমন্যুর সামন্তপতি হরিসেনের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের কথা মামা দীননাথের মাধ্যমে লীলাবতী জানতে পারে। দীননাথ প্রথম জীবনে গৃহস্থ কৃষক থাকলেও এলাকার কায়স্থপল্লির ছেলেরা তার একমাত্র ছেলেকে পুনর্ভবা নদীতে ফেলে হত্যা করায় প্রচণ্ড আঘাত পান। পুত্রশোকে স্ত্রী কমলাও নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করায় তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করে যোগী সন্ন্যাসী হয়ে যান। নিজের লক্ষ্যহীন জীবন লীলাবতীকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। তাই সে-

> 'নিজের অতীত বর্তমান একত্রে দেখতে পাচ্ছিলো। এক অদৃশ্য বিধানের নিগড়ে আবদ্ধ সবাই। কেবলি ভয়, কেবলি নিষেধ, কেবলই হতাশা। পিতৃগৃহে দেখেছে, স্বামীগৃহে দেখেছে, মাতুলালয়ে দেখেছে–সর্বক্ষেত্রেই জীবন পিষ্ট, সঙ্কুচিত এবং বিবর্ণ।...কিন্তু তবু বাঁচতে হবে– কৌশলে হোক, ছলনা করে হোক, আত্মপ্রতারণা করে হোক।'-[প্র.প্রা./পৃ. ৮৫]

সমকালীন বাঙালি সমাজে নারীর জীবনপরিসর ও পোড়খাওয়া বাস্তবতার অভিঘাতে আক্রান্ত লীলাবতী অনেক বেশি জীবনবাদী, যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। নারীর জীবন যে-এক দীর্ঘ দুঃখের আধার, ত্যাগে-কারুণ্যে পিষ্ট এবং শাস্ত্র-সমাজ-পুরুষতন্ত্রের দাপটে ক্ষতবিক্ষত– তা নিজের জীবনাভিজ্ঞতায় সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আসলে লীলাবতী দেশের, সমাজের ও জীবনের যে-কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ও দুঃখে ভেঙ্গে না পড়ে জীবনকে টিকিয়ে রাখতেই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। দেশের দুষ্কাল-দুর্দিনের ঘোর অন্ধকারে অগণন মানুষের মতো ঘরবাড়ি হারিয়ে লীলাবতী গ্রাম থেকে পালিয়ে প্রেমিক শ্যামাঙ্গের সঙ্গে প্রথমে বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এখান থেকে পর্যায়ক্রমে কদম্বঘাটের সূর্যমন্দিরে, বিল্বগ্রামে ও নবপাটক গ্রামে শীলনাথের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পিতার মৃত্যুতে লীলাবতী অনেকটা নিশ্চুপ-নির্বাক হয়ে যায়। কারণ এতদিন তার স্বামী থেকেও ছিল না। তবে বৃদ্ধ বাবা হরকান্ত থাকায় বাবার গৃহই ছিল তার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু গোটা দেশে মহাদুর্যোগ-দুর্বিপাক শুরু হলে প্রথমত ঘরবাড়ি হারিয়ে, দ্বিতীয়ত বাবাকে হারিয়ে যথার্থই সে অভিভাবকহীন ও অনিকেত হয়ে পড়ে। উপরন্তু স্বামীর শত্রুতায় বানের কচুর মতো নদীতে ভেসে বেড়ানো লীলাবতী নির্ভরতার শক্ত কোনো মাটি কিংবা শেকড়ের সন্ধান খুঁজে পায় না। বাধ্য হয়ে একমাত্র আত্মীয় মামা যোগী দীননাথ ও হিতাকাঙ্ক্ষী শ্যামাঙ্গের সঙ্গেই অজানার উদ্দেশ্যে পালিয়ে বেড়ায়। যুগ যুগ ধরে চলা যুদ্ধ, মন্বন্তর ও বিপ্লব-বিক্ষোভের বড় কোপ এসে পড়েছে গরিব, বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশুদের ওপর। অর্থাৎ *চর্যাপদে* বর্ণিত–*অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী-র* মতো লীলাবতীরও একই অবস্থা হয়। কারণ লীলাবতীর কাছে শুধু দেশের আসন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাক, পরধর্ম, পরদেশি শাসক ও দেশীয় সামন্তরাই বিপদ হয়ে উঠেনি বরং আপন দেহের রূপ-যৌবনও নিজের শত্রু হয়ে দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে তাকে বনপোড়া হরিণীর মতো সর্বদা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়। এ পর্যায়ে লীলাবতী নতুন বউয়ের মতো নকল পরিচয়ে শ্যামাঙ্গের সঙ্গে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গরুর গাড়িতে আবার কখনো নৌকায় করে আশ্রয়ের আশায় ছুটে বেড়ায়। আত্রেয়ী নদীর তীরবর্তী পান্থশালার অধিকারীর বাড়িতে একই কক্ষে দুজনে রাতযাপন করলেও এবং উভয়ে রক্তমাংসের দেহ উন্মুখ-অধীর হলেও লীলাবতী এ লেলিহান সাধকে প্রশ্রয় দেয়নি। কারণ সমাজশাসন, শাস্ত্রাচার, লোকাচার, যোগব্রতের বিধান ও যোগী মামার সতর্কবাণী– এসব বিধি-নিষেধের অর্গল দিয়ে লীলাবতীর স্বপ্ন-বাসনার দ্বার বন্ধ করে রাখা হয়। তাই সে শ্যামাঙ্গের উদ্দেশ্যে বলে-

'শ্যামাঙ্গ, তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাও– আমার ক্ষমতা নেই যে আমি তোমাকে গ্রহণ করি– যখনই তুমি আমার দিকে তাকাও, তখনই নিজেকে অপরাধী মনে হয়– কিন্তু তবু আমি নিজেকে নিঃশেষে দান করতে পারি না। কখনও দেহ উন্মুখ হয়, কখনও মন। বড় জটিল অবস্থা আমার–তুমি আমাকে ত্যাগ করো।'-[দু.দি./পৃ-১৭৭]

সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহিতা লীলাবতী স্বামীত্যাগ করে আরাধ্য প্রেমিক শ্যামাঙ্গকে গ্রহণ করার অধিকার পায়নি। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্যামাঙ্গকে ত্যাগ করে স্বামীপরিত্যক্তা, সন্তানহীন, পিতৃ-মাতৃহীন লীলাবতীর অন্যত্র যাবার বা থাকারও কোনো স্থান অবশিষ্ট ছিল না। তার সামনে কেবল তিনটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত; স্বামী তার কাঙ্ক্ষিত নয় বিধায় প্রেমিককে গ্রহণ করে যৌথ জীবন-যাপনে সংসারী হওয়া। দ্বিতীয়ত; সনাতন ধর্মাপেক্ষা উদার ও সাম্যের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে যবন কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া। আর তৃতীয়ত; আত্মহত্যা বা মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তির পথ বেছে নেয়া। এর বাইরে আরেকটি পথ অবশিষ্ট ছিল; তা হলো বারাঙ্গনাপল্লিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শেষের পথটি ছিল লীলাবতীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ঈপ্সিত বাসনা আর সমাজ বিধানের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে লীলাবতীর মনে এরূপ দোলাচলের জন্ম নেয়। সময়-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে তার মর্মমূলে প্রোথিত হয় এক অভিশঙ্কার বীজ। স্বামী-সন্তান-সংসারপ্রত্যাশী রোদন উচ্ছ্বসিত লীলাবতীকে সান্ত্বনা দিতে শ্যামাঙ্গ তার পিঠে হাত রাখলে উভয়ে এক অনির্বচনীয়, অনাস্বাদিত ও অজ্ঞাত আনন্দ-স্রোতের সন্ধান পায়। আর তাই-

'হঠাৎ প্রদীপটি নির্বাপিত হলে শিল্পী শ্যামাঙ্গের হাত দুখানি যেন শিল্প নির্মাণ আরম্ভ করে দেয়।...পুত্তলি নির্মাণকালের আনন্দ ঐ সময় শতগুণে তার সমস্ত অস্তিত্বকে আন্দোলিত করতে থাকে।...আর সেই সঙ্গে লীলাবতী যেন তার অনিশ্চিত অস্তিত্বের মধ্যে একটি মূলের সন্ধান পেয়ে যায়। নিজেকে সে নিঃশেষে নিবেদন করে। তার মনে হয়, এরপর যদি মৃত্যু হয়, তো হোক । জীবনের মর্মে কোথায় যেন সে নিজেকে প্রোথিত বোধ করে।'-[দু.দি./পৃ. ১৮৩]

এভাবে প্রেমের নিঃশেষ নিবেদনের মধ্য দিয়ে লীলাবতীর জঠর জমিনে প্রেমের ফসলরূপ এক প্রাণবীজ নিষিক্ত হবার পথ পায়। এ প্রেমপূর্ণ-সম্মানজনক শরীরী সম্পর্কের ঘটনায় লীলাবতীর পলায়নপর ও পরিচয়হীন জীবনের অনিবার্য বাঁকবদল ঘটে।

দিগ্বিজয়ী ইসলামের জয়যাত্রায় তৌহিদি ইসলাম নয় বরং সুফিবাদের ইসলাম দ্বারাই এদেশবাসী দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। ইসলামের মূল স্পিরিট যে-সাম্যবাদ–তা এক্ষেত্রে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে বিত্তবান-অভিজাতদের তুলনায় নিপীড়িত-নির্ধন-অন্ত্যজ সম্প্রদায়ই অধিক সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষা নেয়। যার প্রমাণ মেলে পুণ্ড্রনগরীর যবনকেন্দ্রে অন্ত্যজশ্রেণির স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগমন ও আশ্রয় প্রার্থনায়। পশ্চিমদেশীয় যবন বণিক ও যবন পির-সাধু-দরবেশদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যবন কেন্দ্রে অবস্থান করে লীলাবতী বেশ আশ্চর্য হয় এবং তার মনের ভেতরেও বেশ পরিবর্তন ঘটে। যবন কেন্দ্রের প্রধান দরবেশ মহাত্মা আহমদ সম্পর্কে নানা অলৌকিক লোকশ্রুতি, নদীর জলে ডোবা মৃত ছেলেকে জীবিত করা, জিন-পরির ওপর নিয়ন্ত্রণ, বনের বাঘ ও সাপকে বশীভূত করা, দেশীয় কুষ্ঠরোগীদের দীর্ঘ লাইন, হড়ডি কন্যা নিয়ে চর্মকার পুত্রের আশ্রয় নেয়া, ডোম-চণ্ডাল-কৃষক-কামার-কুমার-জেলেদের ইসলামধর্মে দীক্ষা নেয়া, দীক্ষার সহজ নিয়ম, সকলে মিলে একসঙ্গে আহার ও নামাজ আদায়, বিয়ে ও বিচ্ছেদের সহজ পদ্ধতি এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ঔদার্য দেখে লীলাবতী প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই আগ্রহভরে শ্যামাঙ্গকে বলে-

'জানো, এদের ধর্ম একেবারেই অন্যরূপ। বিবাহ যদি সুখের না হয়, তাহলে এরা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুনর্বিবাহ করে। আর উচ্চ নীচ ভেদাভেদ একেবারেই নেই।...প্রভু-ভৃত্য একত্রে, এক স্থলীতে আহার করে।...আরও অদ্ভুত কাণ্ড, এদের ভগবানের বিগ্রহ মূর্তি নেই।...এদের দীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠানটিও সহজ।...দীক্ষামন্ত্রটিও সহজ...লা-ইলাহা ইল্লাল্লা, মোহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ।'-[দু.দি./পৃ. ২১৩]

ইসলামের সাম্য, উদারতা, মানবিক মর্যাদা, সহজ-সরল জীবন ও অনুশাসন– এসবের চেয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে, বিচ্ছিন্নতায় ও পুনর্বিবাহে স্বাধীনতার বিষয়টি লীলাবতীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যা গৌড়বঙ্গের নিপীড়িত নিম্নশ্রেণির শূদ্র নর-নারীর জন্য ছিল একই সঙ্গে অভাবনীয়, অকল্পনীয় ও আশীর্বাদস্বরূপ। তাই ইসলামধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য শ্যামাঙ্গকে সে নানাভাবে প্ররোচিত করে। কিন্তু শ্যামাঙ্গ নিজধর্ম ত্যাগ করাকে পাপ ও পাপিষ্ঠের কাজ বলে উল্লেখ করায় লীলাবতী প্রতিবাদ করে বলে-

'এ তুমি কী বলো শ্যামাঙ্গ, পাপ করিনি আমরা? তাহলে এভাবে নিজ পরিচয় গোপন করে পলায়ন করছি কেন? আমরা যা করেছি, তা যদি পাপ না হয়, তাহলে পাপ আর কাকে বলে? তুমি কি আমাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে চাও? বলো, আমার কী অপরাধ? আমি কেন সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত হবো। আমি তো বলেছি তোমাকে, জীবনকে আমি পরিপূর্ণভাবে চাই। আমি সংসার চাই, স্বামী চাই, সন্তান চাই– প্রত্যেকটিই আমার প্রয়োজন, একটি ন্যূন হলে চলবে না। যদি আমার পরিপূর্ণ জীবন হয় উত্তম, না হলে জীবনকে আমি প্রত্যাখ্যান করবো।'-[দু.দি./পৃ. ২১৪]

প্রচলিত সমাজশাসন, শাস্ত্রাচার, পুরুষতন্ত্রের দাপট ও দৌরাত্ম্যে লীলাবতী কিছুই পায়নি। জীবনের কোনো প্রত্যাশাও তার পূরণ হয়নি বরং তাকে শুধু হারাতে হয়েছে। তাই জাতীয় মহাদুর্যোগকালে যবন ধর্মের বদৌলতে লীলাবতী ঈপ্সিত স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা দেখে প্রচণ্ড রকমের আশাবাদী হয়ে ওঠে। চিরবঞ্চিত, নারীত্বে-মাতৃত্বে অতৃপ্ত, সংসারধর্মে লালায়িত লীলাবতী এমন সুযোগকে কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চায়নি। 'তাই বলে তুমি নিজধর্ম পরিত্যাগ করতে চাও'– শ্যামাঙ্গের এমন কথায় সে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং স্বামী-সন্তান ও সংসারের জন্যই সে বলে-

> 'হ্যাঁ, চাই। আমার ধর্ম কোথায়?...যদি ছিল ধরে নিই, তাহলে সে-ধর্ম আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এমন বিবাহ দিয়েছে, যা আমি চাইনি– যে ধর্ম আমার জীবনকে বিপন্ন করেছে, যে ধর্ম আমাকে পিতৃহীন করেছে– বলো, তাকে আমি ধর্ম বলবো?'-[দু.দি./পৃ. ২১৪]

প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সনাতন ধর্মই লীলাবতীকে তার স্বপ্ন, সম্মান ও সংসারজীবন থেকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। তাই যে-ধর্ম মানবতাবিরোধী, কল্যাণের অন্তরায়, পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবন্ধক এবং জীবনবিকাশের পরিপন্থী– সেই সনাতন ধর্মের প্রতি লীলাবতী তীব্র প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই শ্যামাঙ্গ যবন কেন্দ্র ত্যাগ করতে বলায় লীলাবতী বলে–

> 'এক গৃহে বাস করিনি কি? এক শয্যায় শয়ন করিনি কি? কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন এই তো? এভাবে কতোবার পলায়ন করবো, কোথায় পলায়ন করব, বলো? চুরি করেছি, না দস্যুতা করেছি?...জীবন আমার কম বিপর্যস্ত নয়, লাঞ্ছনা কম হয়নি, আমাকে যদি জীবিত থাকতে হয়, তাহলে সেই জীবন আমার নিজেকেই গঠন করে নিতে হবে।... তোমাকে না পেলে মরণ ব্যতীত আমার গতি নেই।'-[দু.দি./পৃ. ২১৪-২১৫]

লীলাবতী আসলে সমাজের প্রচলিত ধর্ম, সমাজশাসন ও রাজপুরুষের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কারণ ধর্ম যেমন তার দাম্পত্য জীবনকে দগ্ধ করে, তেমনি রাজা ও সামন্তদের দুঃশাসন সমাজ ও দেশকে নরকে পরিণত করে তুলে। সব মিলিয়ে লীলাবতী নিজধর্ম ত্যাগ করতে চায়। তার এ ধর্মত্যাগের নেপথ্যে শুধু জীবনবঞ্চনার অভিমানই সক্রিয় নয় বরং নতুনজীবন সূচনার আকাঙ্ক্ষাও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শ্যামাঙ্গ নিজ ধর্মত্যাগের পক্ষাপাতী না হওয়াতে লীলাবতী কিছুটা অবাক হয়। 'চলো, আমরা নিজেদের গৃহে যাই'– এমন কথা শ্যামাঙ্গ পুনরায় বলাতে লীলাবতী নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ়ভাবে বলে-

> 'আমি তোমার পুত্তলি নই শ্যামাঙ্গ, আমি জীবন্ত নারী– আমার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই– ঐগুলিই আমার ধর্ম, অন্য ধর্ম আমি জানি না– আমাকে তুমি প্রকাশ্যে বিবাহ করো।'-[দু.দি./পৃ. ২১৬]

এমন কথার মাধ্যমে লীলাবতীর ব্যক্তিত্ব ও সত্তাসন্ধানী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অথচ ধর্মের নামে, সামাজিকতার নামে, শাস্ত্র-লোকাচারের অজুহাতে শ্যামাঙ্গ তার প্রেমকে মর্যাদা দিতে পারেনি। এমনকী প্রেমিকার দুর্দিনে দায়িত্বও নিতে পারেনি কিংবা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোনো বল-ভরসার বাণীও শোনাতে পারেনি। একজন পুরুষ হিসেবে শ্যামাঙ্গ এসব এড়িয়ে যেতে, অস্বীকার করতে পারলেও নারী হিসেবে লীলাবতীর এসবের সঙ্গে আপসের কোনো সুযোগ ছিল না। তৎকালীন গৌড়-বঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে একজন নারীর স্বামী-সন্তান-সংসারের মতো অবলম্বন ব্যতীত বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারও ছিল না। দেশীয় সামন্তপতি হরিসেনের আস্থাভাজন সেনাদের ও বর্বর তুর্কি যবন সেনাপতি কাফুর খানের সৈন্যদলের যুগপৎ আক্রমণে উজুবট, বিল্বগ্রাম, মদনপুর, উদয়পুরের মতো পুণ্ড্রনগরেও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। শ্যামাঙ্গ দুরাচার ও লম্পট অভিমন্যুর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে। ফলে সময়সৃষ্ট এমন দুর্যোগকালই লীলাবতীর স্বপ্ন ও সাধনাকে মুহূর্তেই শেষ করে দেয়।

ভয়কে জয় করে, প্রথা ও ধর্মকে উপেক্ষা করে লীলাবতীর শ্যামাঙ্গকে ভালোবেসে অনির্দেশ্য যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর যবন ধর্মে আস্থা স্থাপন যে-শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে তা নয়–বরং অনাগত সন্তানের নিরাপদ আগমন নিশ্চিত করার জন্যেও বটে। আবার এ লীলাবতীই প্রেমিক শ্যামাঙ্গকে দ্রোহের ভাষা নতুন করে শেখায় ও সন্ধান দেয়। দগ্ধ গ্রাম আর যাপিত জীবনকে পেছনে ফেলে কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা এ লীলাবতী।[১৮] তার প্রেমেই শ্যামাঙ্গ স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং সে-বিশ্বাস পূর্ণতা পায়। তার চর্চা ও আরাধনার মানসমূর্তি থেকে অবয়বে রূপ পায় এ লীলাবতী। শিল্পচর্চা মিশে যায় জীবনচর্চার সঙ্গে। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, রীতিভঙ্গের গৌড়ীয় রীতির আঙিনায় শ্যামাঙ্গ দাস একা নয়। শ্যামাঙ্গের এ দ্রোহ চেতনাকে উদ্বোধন ও উস্কে দিতে অনুপ্রেরণার উৎসই এ লীলাবতী। লীলাবতী আবহমান বাংলার শাশ্বত নারী। যার ধর্ম-গৃহপ্রেম। সন্তান, স্বামী আর আত্মীয়বৃত্তের মধ্য দিয়ে ধর্মপালন। ঔপন্যাসিক এ লীলাবতীর মধ্যে ব্রাত্যজীবনের অসীম সাহসী এক প্রগতিবাদী নারীর মুখশ্রী রচনা করেছেন। লীলাবতী ধর্ম ও শাস্ত্রের বিধানে জীবনকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজি নয়। এমনকি প্রচলিত রীতি ও শাস্ত্রানুশাসনে সে প্রতিবাদী। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্রোহের ধ্বনি উচ্চারণ করে সে নিজের শক্তি, সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দেবদাসী প্রথা সেন আমলে এসে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা চলে আসলেও ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় তা বহুগুণ বেড়ে যায়। নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে ধর্মের বাতাবরণে পুরোহিত ও সমাজপতিদের রিরংসা মেটাতেই মূলত এ প্রথা গড়ে ওঠে। ওড়িশার মন্দির, মুলতানের সূর্যমন্দির, তাঞ্জোরের মন্দির, সোমনাথ মন্দির, ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির, কেরালাপুরম মন্দির, উত্তরবঙ্গের বানগর মন্দির, প্রদ্যুনেশ্বরের মন্দিরে অসংখ্য দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দত্তা, হৃতা, বিক্রেতা, ভৃত্যা, ভক্তা, সালংকার ও গোপিকা বা রুদ্রগণিকা– এমন সাত পদ্ধতিতে এসব দেবদাসীদের সংগ্রহ করা হতো। সুন্দরী নারী কিনে দেবালয়ে উপহার দিলে দাতার পুণ্য হয়– ব্রাহ্মণদের এমন কথায় সচ্ছল মানুষেরা দরিদ্র পিতা-মাতার কন্যাদের কিনে দলে দলে মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়। পুরোহিত ভোগ্যা করলে দুবার পুণ্য লাভ হয়। এতে দেবতাপ্রীতির সঙ্গে পুরোহিত ও সমাজপতিও প্রীত হন।[১৯] পুণ্যের নামে নিষ্পাপ-সতীসাধ্বীদের যে- অদৃশ্য কারাগার কিংবা নরকে বন্দি করা হয়, সেখানে তাদের ভোগের ভাটিতে সিদ্ধ হতে হতে জীবন দিতে হয়। এমন দুঃসহজীবনের চিত্রও এ উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে। কৃষ্ণা, বিভাবতী ও শুক্লার মতো বিল্বগ্রামের প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের দেবদাসী এবং কদম্বঘাটের সূর্যমন্দিরের ছায়াবতী নামের নারীরা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান অনুযায়ী যে-প্রাগ্রসর চেতনার পরিচয় দিয়েছে, গণবিপ্লবে যেভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে, গণকল্যাণে যেভাবে আত্মোৎসর্গের দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে–তা এক কথায় বিস্ময়কর। তাই দিকভ্রান্ত বসন্ত দাসকে দেশের আসন্ন বিপ্লব-বিক্ষোভের স্বরূপ, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে কৃষ্ণা বলে–

> 'আমাকে কি দেবে সেই উপপ্লব? আমরা মন্দিরদাসী, আমাদের গৃহ নেই, সংসার নেই, ভবিষ্যৎ নেই– তথাপি আমাদের মনে হয়েছে, এ অনাচারের অবসান হওয়া প্রয়োজন, অত্যাচার দূর হওয়া উচিত, মানুষের অপমান এবং লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। যদি আমাদের নিষ্ফল জীবন মানুষের জন্য কল্যাণময় ভবিষ্যৎ এনে দিতে পারে; তাহলেই মনে করব জীবন আমার সার্থক হয়েছে। কল্যাণ ও মঙ্গলময় সেই ভবিষ্যৎ আমাদের হবে না, হবে তোমাদের, যাদের গৃহ আছে, সংসার আছে– তথাপি আমরা মনে করব, আমাদের জীবন জগতের কাজে লাগলো।'-[দু.দি./পৃ. ১৬৯]

কৃষ্ণার উপর্যুক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে রাজা-সামন্তপতি-ব্রাহ্মণদের পরিচালিত শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শুধু ডোম-চণ্ডাল-হড্ডি, কৃষক-কামার-কুমার ও ভিক্ষুরাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেনি বরং সমাজের মূলস্রোতের বাইরের সামান্য মন্দির দেবদাসীদের আগ্রহ-সহকারে সম্পৃক্ত হবার অভাবনীয় উদ্যোগের বিষয়ও উপস্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রের দুঃশাসন, দৌরাত্ম্য, অনাচার-অবিচারে অন্য সবার মতো সামান্য দেবদাসীরাও প্রচণ্ড বিদ্বেষে একলা আমি-র প্রাঙ্গণ ছেড়ে বহু আমি-র কাতারে নিজেদের শরিক করে। তাদের এ জীবনোৎসর্গ একাধারে সমাজ শাসনের নামে অনাচার-অবিচারের প্রতি, ধর্মের খোলসে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-রাজপুরুষের লালসা-রিরংসা-ব্যভিচারের অন্ধকারময় জগতের প্রতি, পুণ্যের নামে নিষ্পাপ নারীদের মন্দিরের নন্দিত নরকে বন্দি করার প্রতি, স্বর্গের নামে নারীর সম্ভাবনাময় জীবনকে জোর করে বন্ধ্যা-নিষ্ফলা করার প্রতি একধরনের প্রতিবাদী কণ্ঠের কোরাসধ্বনি। যা শাসক শ্রেণির প্রতি সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের শুভ উদ্বোধনকে ইঙ্গিতদান করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের প্রেমময়ী নারী আর গৃহলক্ষ্মী স্ত্রী চরিত্রের আদর্শ-প্রতিরূপ মায়াবতী। মায়াবতীর মাধ্যমে সরলা গৃহবধূর রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক আবহমান বাঙালি নারীর সৌন্দর্য-চিত্র অঙ্কন করেছেন। যোগমায়া যথার্থই চিরচেনা বাঙালি গৃহের আদর্শ মাতৃমূর্তিতে উন্নীত। পুত্রসন্তানের মৃত্যুর শোকে, দুঃখী মেয়ের মঙ্গল ভাবনায় এবং মাতৃহারা শ্যামাঙ্গের তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে স্নেহের শীতল সুধা বর্ষণে যোগমায়া চরিত্রটি নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। আবার লেখক সচেতনভাবেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য দেখানোর পরেও গুরু বসুদেবকে কখনোই খাটো করে চিত্রায়িত করেননি। মধ্যযুগের শিল্প সাহিত্যে সামন্ত-ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাবের কথা এবং শিক্ষাগুরুর সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনের কথা তিনি বিস্মৃত হননি। ফলে সমাজসত্য ও ঐতিহাসিকবাস্তবতা উন্মোচনে লেখকের প্রাগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

সমকালীন বাঙালি সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা পারিবারিক জীবনের সকল কিছুই চরমভাবে নিয়তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুচতুর সামন্তশাসকরা কৌশলে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের স্থায়ী দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য, দুর্যোগ, সমাজবিপ্লব,

দাসপর্যায়ের জীবনমানের জন্য নিয়তিবাদকে জুড়ে দেন। ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে তুলে তাদেরকে শ্রেণিচেতনা ভুলিয়ে দেয়া হয়। যাতে জন্ম-মৃত্যুর শাশ্বত বিধানের মতো সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের বিপর্যয়-বঞ্চনাকে নিয়তি বা ললাটলিখন বলেই মেনে নেয়। আর এ মনোভঙ্গি সমাজের নিম্নশ্রেণির মতো রাজপুরুষদেরও সংক্রমিত করে। তাই দেশীয় বৌদ্ধদের বিরুদ্ধাচরণ ও তুর্কি যবন মুসলমানদের আগমন-আক্রমণে দেশের অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব, শাসক-রাজপুরুষদের প্রজাপালন দেশশাসন ভুলে ভোগ-বিলাস-লুণ্ঠনে মেতে ওঠার বিষয়কে ব্রাহ্মণ সোমজিৎ ও রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র ললাটলিখন বলে চিহ্নিত করেন। তাই আক্ষেপের সুরে সোমজিৎ বলেন–

> 'রাজকর্ম কী, প্রজাপালন কী, যুদ্ধবিগ্রহ কী– এসকল বিষয়ে কারও কোনো চিন্তা নেই। উত্তম লক্ষ্মণাবতী, উত্তম রাজচক্রবর্তী...পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণ সেন দেব, সমস্তই উত্তম, কারোই কিছু করণীয় নেই– না তোমার, না তোমার অনুচরদের। ভবিতব্য তোমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা-ই ঘটবে, বৃথাই আমরা চিন্তা করে মরি।'-[দু.দি./পৃ. ১৪৪-১৪৫]

প্রতিউত্তরে রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র যা বলেন, তাও প্রচণ্ড নিয়তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত। যেমন–

> 'ব্যক্তির ইচ্ছায় কিছুই হয় না– কর্মফল থাকবেই–দাসও থাকবে, প্রভুও থাকবে। প্রভু যে-শাসন করে, সে-যেমন কর্মফল, দাস যে-শাসিত হয়, সেও তেমনি কর্মফল। যবনদের আগমনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই বা কী করবে– যা ভবিতব্য তাই হবে।'-[দু.দি./পৃ. ১৪৩]

এ মানসিকতা থেকেই দেশরক্ষা, দেশবাসীকে রক্ষা ও দেশের ঐতিহ্যরক্ষায় শাসকগোষ্ঠী কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। বরং এ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষীদের পরামর্শ মোতাবেক দেশজুড়ে সমাজপতিদের যাগযজ্ঞ পালনের আদেশ দেয়া হয়। ধর্মে মোহবিষ্ট শাসকগণ নির্মম বাস্তবতাকেও উপলব্ধি করতে পারে না।

শাসক, রাজপুরুষ, মন্ত্রী কিংবা সামন্তদের সুবিধাবাদী অবস্থান, সুযোগসন্ধানী মনোভঙ্গি ও আপসরফার বিষয়টি রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে। স্বার্থের প্রশ্নে এরা সবাই এক আর একট্টা হতে দ্বিধাবোধ করে না। শাসক আর শোষিতের চিরায়ত দ্বন্দ্ব ও বৈরী সম্পর্কটিকে লেখক যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। হলায়ুধ মিশ্র স্বভাবে প্রাচীনপন্থী ও অনুদার হওয়াতে দেশের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটকে দৈবঘটনা বলে চিহ্নিতকরণ এবং এর উপশমে রাজকীয় যাগযজ্ঞের বিধান দিলেও বন্ধু সোমজিৎ ব্রাহ্মণের দেয়া প্রস্তাবকে (নিজেদের স্বার্থে দেশের বৌদ্ধ ও ব্রাত্যশ্রেণিকে কাছে টেনে যবন-তুর্কিদের প্রতিহত করার) তেমন গুরুত্ব দেননি। যদিও দেশের অরাজকতা ও শোষণ-জুলুমে নিম্নশ্রেণির পেশাজীবী, দাস-দাসীদের পলায়নে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের মতো সমাজপতিদেরও ঘর-গৃহস্থালি ও ভূমির চাষবাস চরমভাবে ব্যাহত হয়। তারপরেও রাষ্ট্রকাঠামোর কেন্দ্রে থেকে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষমতার পালাবদল সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা খুবই যৌক্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এতদ্বিষয়ে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তিনি বলেন–

> 'যবনদের আগমনে ধর্ম বলো, জাতি বলো, সমাজ বলো, কোনো কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা যদি এদেশ জয় করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের এদেশ শাসন করতে হবে। সামন্ত বলো, মন্ত্রী বলো, সেনাপতি বলো, এমনকি গ্রামপতি-বীথিপতি বলো– এদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কি রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব?...যবনরা যদি আসে, তখনও দেখবে তাদের উচ্চশ্রেণির লোকেরা সদ্ভাব করছে আমাদের উচ্চশ্রেণির লোকদের সঙ্গে। নীচ যে সে সর্ব অবস্থায় নীচই থাকবে।'-[দু.দি/পৃ. ১৪৩]

হলায়ুধ মিশ্র তার অবস্থান ও শ্রেণি-চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ মন্তব্য করলেও পরবর্তীকালে তা শতভাগ বাস্তবে রূপ নেয়। সহজে রাজ্য জয় ও শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতেই যবন সেনাপতি কাফুর খান দেশীয় সামন্তপতি হরিসেন এবং তার অনুচর অভিমন্যুদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। কারণ ধর্ম-বর্ণ-ভূগোল ভিন্ন হলেও শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে ও শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের স্বভাব ও চরিত্র একই। এজন্যই তারা পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী আর উদ্দেশ্য হাসিলে একাট্টা হয়ে ওঠে। সর্বকালেই এসব ক্ষমতালিপ্সু, শোষক ও দালালশ্রেণির চক্রান্তে দেশপ্রেমিক বসন্তদাস, শ্যামাঙ্গ, বিভাবতী, কৃষ্ণা ও লীলাবতীদের মতো সাধারণ মানুষদের সর্বস্ব হারাতে হয়েছে। যা যুগ যুগ ধরে চলমান রাজা-প্রজার সম্পর্ক, শাসক আর শোষিতের সহজাত প্রবণতা, শ্রেণি-চরিত্র, সামাজিক অবস্থান, মানসিক বৈপরীত্য, বৈষম্য ও বিভেদের চিরচেনা বাস্তবতারই ইঙ্গিতবাহী।

উজুবট গ্রামে শ্যামাঙ্গের আতিথ্যগ্রহণ সূত্রে সমকালীন হিন্দু সমাজকাঠামো ও যাপিত জীবনের বিচিত্র বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। উজুবট গ্রামটিও ছিল গ্রামপতি বিপ্রদাস দ্বারা শাসিত। সঙ্গতকারণেই গ্রামপতির বাড়িটি দেখা যায় বিষ্ণুমন্দির সংলগ্ন। আর শূকরপাল চড়ানো শূদ্র ডোমপল্লি গড়ে উঠেছে একেবারে গ্রামের প্রান্তসীমানা ঘেঁষে। যাদের ন্যূনতম কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। বৈশ্য কৃষক, বণিক ও কুম্ভকার মৃৎশিল্পীদের পরিবারের নারীরা অনেকটা স্বাধীন ছিল। তাই বিবাহিত লীলাবতী ও মায়াবতীদের বিকেলে নদীর তীরে বেড়ানো, মাছধরা দেখা, অপরিচিত যুবক শ্যামাঙ্গের সঙ্গে

কুশলবিনিময়সহ রস-রসিকতা করতে দেখা যায়। তবে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমেও বর্ণপরিচয়ের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে। তৎকালে অজানা-অচেনা পথিককে মঠ-মন্দিরে আশ্রয়দানের পাশাপাশি গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতেও ঠাঁই দেবার প্রচলন ছিল। আতিথেয়তায় গ্রামবাসীও কার্পণ্য করতো না। শ্যামাঙ্গকে মায়াবতী শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়তার পরিচয়ে নিজেদের বাড়িতে অতিথি করায় তার রাতের খাবারে ব্যাপক আয়োজন দেখা যায়। যেমন–

> 'মৎস্যের ব্যঞ্জনই তিন প্রকার, ভর্জিত ইলিশখণ্ড, সন্তলিত চিতলপেটিকা এবং নবাম্রসহযোগে মৌরলা। অলাবুসহ মুগও ছিল সঙ্গে। একটি মাত্র পাত্রে মাংস-ব্যঞ্জন।...এতদতিরিক্ত দধি, খণ্ড মিষ্টান্ন ইত্যাদি।'-[প্র.প্রা./পৃ.৩৯]

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসের চরিত্ররা আমাদের প্রতিদিনের চেনা-জানা মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। লেখকও রাজপথ, নগর এড়িয়ে গৌড় বাংলার কৌম সমাজের প্রান্তঘেঁষা মাটি-কাদায় মাখামাখি প্রাকৃত মানুষদের আদিম, অকৃত্রিম এবং অমলীন জীবনকে আত্রেয়ী-পুনর্ভবার তীরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে, গ্রামের জনপদ ও জন-অরণ্যের পথে-প্রান্তরে অন্বেষণ করেছেন। শ্যামাঙ্গ ও বসন্ত দাস উভয়ে ব্রাত্যশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা সচেতনভাবে সমাজের দুটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। শ্যামাঙ্গকে কাহিনির মূলকেন্দ্রে রাখা হলেও উপন্যাসের সার্বিক উত্তরণে বসন্ত দাসই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে বৃত্তি তাদের ভিন্ন হলেও বোধ ও বিবেচনায় তাদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। শ্যামাঙ্গ আর বসন্ত দাস ব্রাত্যসমাজ উদ্ভূত প্রাকৃতজনের দুই প্রতিনিধি। তারা তাদের জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছে তারা মূলত পুরুষানুক্রমে দাস; সামন্তপতিদের দাস, কায়স্থদের দাস। তারা এও প্রত্যক্ষ করেছে বর্ণাশ্রম প্রথায় জর্জরিত ধর্মব্যবস্থা, শ্রেণিতে শ্রেণিতে রয়েছে বিভাজন, পারস্পরিক লুণ্ঠন ও শোষণ ব্রাত্যমানুষের স্বাভাবিক ও স্বাধীনবিকাশের পথ করেছে রুদ্ধ। ক্ষেত্রকর ও কুম্ভকার– এ দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখক তুলে এনেছেন অত্যাচার ও শোষণের খরদাহে হারিয়ে যাওয়া মানুষজন, তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি। দেখিয়েছেন কীভাবে হত্যা ও হরণে বিধ্বস্ত হয়ে ব্রাত্যশ্রেণিটি দুর্বল হতে হতে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ঔপন্যাসিক পারঙ্গমতার সঙ্গে শ্যামাঙ্গ ও বসন্ত দাসের পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন দীননাথ, শুকদেব, ভিক্ষু মিত্রানন্দ, সাধুপুরুষ আহমদ, মৃৎশিল্পী বসুদেব, মহাসামন্ত হরিসেন, সামন্তপতি শক্তিবর্মণ ও শ্রীনাথ বর্মণ, অভিমন্যু, ব্রাহ্মণ সোমজিৎ ও রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের মতো শোষক আর শোষিত চরিত্রসমূহ। এদের একপক্ষ মানবতার পক্ষে, অন্যপক্ষ বিপক্ষে। মানবতার পক্ষ–বিপক্ষের এই খেলা আজও ক্রিয়াশীল। আমাদের কালেও সেই প্রদোষকালের মতই মানবজীবনের অস্তিত্বসংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিবাদ ও দ্রোহ নতুন রূপে উপস্থিত।[২০] সেই প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি আমাদের সর্বকালের সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, চেতনা, প্রতিবাদ, দ্রোহ আর ইতিহাসকে ধারণ করে। এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক মূলত বাঙালির সর্বকালীন জীবনবাস্তবতার এক দলিল রচনা করেছেন।

অন্যদিকে মায়াবতী, লীলাবতী, ছায়াবতী, কৃষ্ণা, বিভাবতী, শুক্লা ও কুসুম ডোমনীদের চিরচেনা জীবনও সামাজিক সংকটে আর সুস্থির-স্বস্তির ও স্বাভাবিক থাকেনি বরং দিনে দিনে জটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। মায়াবতী, লীলাবতী–প্রাচীন মৃৎরমণীদের মতো ডোম্বী-শবরীদের এইসব উত্তরসূরি নদীর মতো বহু বাঁক ও মোড় নিয়ে নিত্য কলস্বনরত। কিন্তু তাদের জীবনপ্রবাহে ঢুকে পড়ে বেনো জল। মায়াবতী-লীলাবতীর প্রিয় পুরুষেরা ছিটকে পড়ে জীবনের কেন্দ্র থেকে। ব্যক্তিপ্রেমের কাদায় বেশিক্ষণ আটকে থাকা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। কারণ বেনো জলের তোড়ে ছিন্নভিন্ন হয় সকল শম ও শান্তি।[২১] এ উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে শওকত আলী প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বীরপূজা (cult-worship) না করে বরং আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত, অচ্ছুত, অভাজন, অবহেলিত, ঘৃণিত প্রাকৃতজনদের গৌরব-গ্লানি এবং পঙ্ক ও পঙ্কজময় জীবনকেই মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। এ যেন তাঁর শেকড়ে ফিরে যাওয়া, মাটির সোঁদা গন্ধ আর কাদামটি মাখা শরীর নিয়ে হাজার বছর ধরে বহমান প্রান্তজনের জীবনধারা ছোঁয়া ও অনুভব করার শৈল্পিক যাত্রা।

প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাস নারীবাদী চেতনা ও ভাবনা দ্বারাও অনেকটা ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। আধুনিক ইউরোপের অবমূল্যায়িত নারী সমাজের প্রতীকী প্রতিনিধি হেনরিক ইবসেনের *A Doll's House* (১৮৭৯খ্রি.) নাটকের মুখ্যচরিত্র নোরা আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদার অন্বেষায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কোড উপেক্ষা করে স্বামীর মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নোরার দরজা বন্ধ করার এ প্রচণ্ড শব্দ পুরো ইউরোপের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু তার বহু আগেই মধ্যযুগের বাংলায় নিগৃহীত নারী সমাজের প্রতীকী প্রতিনিধি *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর লীলাবতীকে দেখতে পাই পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম, সমাজ ও সংস্কারের প্রতি ভ্রূকুটি করে নারী

সমাজের পুতুল-নিয়তি অগ্রাহ্য করে নারীর আত্ম-অধিকারের ইশতেহার ঘোষণা করতে। নোরা স্বামী-সন্তান ছেড়ে চলে যায় অধীনস্ততার শৃঙ্খল ভেঙে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে। আর লীলাবতী স্বামী-সন্তান গ্রহণ করতে চায় শাস্ত্রাচার-লোকাচারের বিধানকে পায়ে মাড়িয়ে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ও ইচ্ছে মতো বিকশিত করতে। দুজনের প্রত্যাশার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উপলব্ধির জায়গাটি এক। তবে পার্থক্য এই যে, নোরা যা ভেবেছে উনিশ শতকে– তা লীলাবতী ভেবেছে প্রায় সাতশত বছর পূর্বে।[২২] লীলাবতীর এ প্রাগ্রসর ভাবনা, দ্রোহচেতনা ও প্রচণ্ড জীবনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সত্যেন সেনের *পাপের সন্তান* উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র শদরার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। চিরবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের মিকা ও ক্যালদীয় শদরার প্রেম জাতিবিদ্বেষের জাঁতাকলে পিষ্ট হবার উপক্রম হলেও শদরা ভেঙে পড়ে না, আপস করে না কিংবা আত্মপরিচয় গোপন করে না। প্রেমের মর্যাদা রক্ষায় সে যেমন নিজ বাড়ির ক্রীতদাস প্রেমিক মিকাকে নিয়ে স্বদেশ (বাবিলরাজ্য), সমাজ, স্বধর্ম ও স্বজনকে ত্যাগ করে জেরুজালেমে আসে; তেমনি ইহুদি ধর্মমোহে আসক্ত মিকার কর্তৃত্ববাদী মনোভঙ্গির অবসান ঘটিয়ে তাকে মানবধর্মের নবপরিচয়ে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। শদরা তার সাহস, ব্যক্তিত্ব, বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে শুধু কট্টরপন্থী ইহুদি ধর্মযাজক ও অসহিষ্ণু জনসাধারণকে মোকাবিলা করেনি বরং অসহায়-অনিকেত-বিপদগ্রস্ত মিকাকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমের ফসল গর্ভজাত সন্তানের সুরক্ষায় সুদূর মিশর রাজ্যে গিয়ে ঘর-সংসার গড়ে তোলে। উপন্যাসের শেষদিকে এসে দেখা যায় মায়াবতী ও লীলাবতী উভয়েই সন্তানসম্ভবা। দুজনই সংসারের জন্য তৃষিত। কিন্তু লীলাবতীর সন্তান যে-নতুন ধর্মের, নতুন সমাজের সদস্য হতে যাচ্ছে– তা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। অন্যদিকে অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করেও সংসারের নতুন সৃজনধারায় যুক্ত হতে চলছে মায়াবতীর সন্তান। ইতিহাস এই জনপদের অনাগতদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসের বিষয়, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোলগা থেকে গঙ্গা*, সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী* ও *বিদ্রোহী কৈবর্ত*, রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা*, সেলিনা হোসেনের *নীলময়ূরের যৌবন* ও *চাঁদবেনে*-র বেশ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *ভোলগা থেকে গঙ্গা*-তে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছরের পটভূমিতে চীনের ভোলগা থেকে শুরু করে বর্তমান উত্তরভারতের গঙ্গা নদীর তীরবর্তী স্থানে ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, শ্রেণির বিকাশ, শাসকের হাতিয়াররূপে ধর্মের ব্যবহার, শ্রমজীবীদের ওপর শাসকশ্রেণির নিপীড়ন, মাতৃতান্ত্রিক কৌমসমাজের রূপান্তরের চিত্র বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আবার সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী*-তে রাজা যিহোয়াকিমের শোষণ-পীড়নে, মেতানিয়া ওরফে যেদেকিয়ার দুর্বল শাসনের সুযোগে এবং মন্দির অধ্যক্ষ পশহুর কিংবা ভণ্ডনবি হানানিয়ার চক্রান্তে ইহুদিদের স্বাধীন জেরুজালেম রাজ্যের পতন ঘটে। পার্শ্ববর্তী বাবলিরাজ নেবুকাডনাজার ইহুদিদের ধ্বংস করে জেরুজালেমে যে-ক্যালদীয় শক্তির উদ্ভব ঘটান; একে প্রতিরোধ করা নবি যেরেমিয়া, লোকপ্রধান অহিকম, ক্রীতদাস নেতা গেদালিয়া, য়ুসুফ ও জিল্লা-সারা-নামাহদের মতো দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নর-নারীদের পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। এ লেখকেরই *বিদ্রোহী কৈবর্ত*-তে বৌদ্ধ পাল রাজা মহিপালের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে কৈবর্ত শ্রেণির দিব্যোক শূদ্রদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয়। আবার রিজিয়া রহমান তাঁর *বং থেকে বাংলা*-তে আড়াই হাজর বছর পূর্বের সমতট অঞ্চলের দ্রাবিড় শাখা বং থেকে বিবর্তিত হতে হতে একাত্তরে বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় উন্মোচিত করেছেন। এতে ব্রাত্যশ্রেণির ওপর পরিচালিত শোষণ-বঞ্চনা; উত্থান-পতন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাও বাদ যায়নি। তবে রিজিয়া রহমান এ উপন্যাসে যেভাবে লোকগীতিকা ও শ্লোক ব্যবহার করেছেন, শওকত আলী তা করেননি। করলে এ উপন্যাস আরো উপভোগ্য হয়ে উঠতো। আর সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* উপন্যাসে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে পাল রাজাদের বিজয়গাথা, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের গণজোয়ারের প্রতাপ ও ব্রাত্যজনগোষ্ঠীর চিরচেনা লাঞ্ছনা-বঞ্চনার চিত্রই গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে চর্যাপদ রচনার অপরাধে রাজা বসুমিত্রের মন্ত্রী দেবল ভদ্রের নির্দেশে কাহ্নপাদের হাত কেটে ফেলা হয়। আবার *চাঁদবেনে* উপন্যাসে চম্পাইগঞ্জের জোতদার আজু মৃধার শোষণ-আগ্রাসন, প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি এবং প্রযুক্তির দানবরূপী ফারাক্কার বাঁধ– সব মিলিয়েই চাঁদ-ছমিরণ দম্পতির জীবন হয়ে ওঠে দারিদ্র্যে জর্জর, প্রাণ-প্রাচুর্যহীন ও সম্ভাবনাশূন্য। তারপরেও চাঁদের নেতৃত্বে চম্পাইগঞ্জের সাধারণ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে আজু মৃধার হত্যা, বেহাত হওয়া বসতভিটা ও জমি উদ্ধার, নিঃসন্তান স্ত্রী ছমিরণের মৃত্যুপরবর্তী সকিনার প্রেম ও তার গর্ভজাত অনাগত সন্তান লখিন্দরের প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বাধীনচেতা চাঁদের পুনরুত্থান ঘটে। যা *মনসামঙ্গল*-এর মিথ-পুরাণের অনুষঙ্গে অন্ত্যজ-শ্রমজীবী বাঙালির চিরায়ত অস্তিত্বসংগ্রামের কথাবীজ ও পথপরিক্রমারই ইঙ্গিত দেয়। উপর্যুক্ত সকল উপন্যাসেই রাজশক্তির শাসন-শোষণ ও নিপীড়নে বিক্ষুব্ধ ব্রাত্যশ্রেণির বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শাসক শ্রেণির সমান্তরালে শোষিত শ্রেণির দুর্বিষহ জীবন এতে জায়গা করে নিয়েছে। তারপরেও শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর সঙ্গে এসব উপন্যাসের মৌলিক ও

চেতনাগত পার্থক্য রয়েছে। কারণ লেখক ইতিহাসের প্রচলিত ডিসকোর্সকে বর্জন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের আলোচিত-উচ্চকিত-উচ্চকণ্ঠের শাসক-সামন্তদের পরিবর্তে চির অবহেলিত-অনুল্লিখিত-ব্রাত্যজনগোষ্ঠীর হারানো ও লুণ্ঠিত গৌরবময় কথামালা তুলে ধরেছেন। এদের অবদান, শক্তি, সাহস ও সম্ভাবনাময় দ্রোহের ধ্বনিকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একধরনের সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এজন্যই রাজা লক্ষ্মণ সেন, মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র ও সামন্ত হরিসেনরা গুরুত্ব না পেয়ে বরং শ্যামাঙ্গ, বসন্ত দাস, লীলাবতী ও মায়াবতীদের মতো সাধারণ মানুষেরাই শওকত আলীর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

শওকত আলী দশ পরিচ্ছেদের *প্রদোষে প্রাকৃতজন* এবং ষোলো পরিচ্ছেদের *দুষ্কালের দিবানিশি* নামে দুটি খণ্ডের মোট ছাব্বিশ পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* নামক এ উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। তবে এ পরিচ্ছেদ বা পর্যায়গুলো বোঝা গেলেও তিনি তা সুস্পষ্ট করেননি। আবার উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে পুনশ্চ-র আদলে একটি কৈফিয়তমূলক যে-অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন তাও বিতর্কমুক্ত নয়। এ বিষয়ে দুটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। প্রথমত; ঔপন্যাসিক তো শুধু কাহিনিকার নন বরং ব্যাখ্যাদাতাও বটে। তাই জানা-অজানা কাহিনি তার হাতে নিষ্পত্তি ও পরিণামী গন্তব্যের বা ইঙ্গিতের দাবি রাখে। দ্বিতীয়ত; পাঠ শেষে পাঠকের মনে জাগ্রত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসারও সুস্পষ্ট জবাব থাকতে হয়। যা শওকত আলী ইতিহাসের দায় ও লেখকের সীমিত শক্তির অজুহাতে এড়াতে পারেন না। আবার ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনা বর্ণনায় লেখক সত্যসন্ধ হতে চেয়েছেন। এ জন্য একদিকে তিনি যেমন সংযম অবলম্বন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে নাটকীয়তা পরিহার করেছেন। কিন্তু ঘটনার বাঁকে বাঁকে এ নাট্যগুণ যুক্ত করলে এর কাহিনি আরো প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারতো। আবার সমকালীন সমাজে মানুষের ব্যবহৃত বস্ত্র, রান্না-বান্না ও খাবারের বাসন-কোসন, আসন পদ্ধতি, হাড়ি-পাতিল, ঘরনির্মাণ কাঠামো, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, ঘুমানোর শয্যা, ঘর-গৃহস্থালির আটপৌরে যাপিত জীবনচিত্র, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোকাচার ও লোকজ উৎসবের তেমন চিত্র পাওয়া যায় না। যা থাকলে আগ্রহী-অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রত্যাশা পূর্ণতা পেতো এবং সেই সঙ্গে সমকালীন পরিবেশ ও প্রতিবেশ আরো বাস্তবমণ্ডিত হয়ে উঠতো।

এসব সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও লেখক ত্রয়োদশ শতকের মহাসংকট ও মাৎস্যন্যায়ের মতো প্রসূতিলগ্নের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-দোলাচল ও দ্রোহের অনুষঙ্গসমূহ অত্যন্ত বাস্তবমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন। রাজা, রাজপুরুষ, সামন্ত, সেনা, কৃষক, মৃৎশিল্পী, জেলে, যোগী, মন্দিরসেবক, বৈদ্য, অধিকারী,ভিক্ষু, ব্যবসায়ী, দোকানি, ব্রাহ্মণ, কামার, দেবদাসী, বারাঙ্গনা, ডোম, চণ্ডাল, হড্ডি, পকেটমার অর্থাৎ সমাজের উচ্চশ্রেণি থেকে একেবারে নিম্নশ্রেণির বহু পেশাজীবী মানুষের সরব উপস্থিতিও এখানে লক্ষণীয়। এদের কর্মকাণ্ড, কোলাহল ও পদভারে লক্ষ্মণাবতীর রাজপথ ও পুণ্ড্রনগর থেকে শুরু করে পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ও মহানন্দার তীরবর্তী জনপদ ও অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানে সেন রাজাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে ব্রাত্যশ্রেণির বিদ্রোহ, রাষ্ট্রকাঠামোর দুর্বলতার সুযোগে উদীয়মান যবন তুর্কি সেনাদের গৌড়-বাংলা দখলের ঐতিহাসিক বিষয়ই সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে সমকালীন বাঙালি সমাজের শাস্ত্রাচার, লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস, আতিথেয়তা, মাছধরা, নিয়তিভাবনা, রোগ-শোক-ব্যাধি-মহামারি, খেলাধুলা, বকা ও গালি, ঠাট্টা-রসিকতা, হাট, মেলা-গঞ্জ-বন্দর, বর্ণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দাপট,ক্ষত্রিয়ের শোষণ, বৈশ্য ও শূদ্রের নাভিশ্বাস, দেবদাসীপ্রথা, যোগসাধন, যবন তুর্কি মুসলমানের হিংস্রতা ও পশ্চিমদেশীয় পির-দরবেশদের কিংবদন্তি এবং ডোম-চণ্ডাল-হড্ডিদের মতো সাব-অলটার্নদের ঘুরে দাঁড়ানোর মতো বিষয়-আশয় ভাষারূপ পেয়েছে।

ভাষাশৈলী নির্মাণ ও এর ব্যবহার নিয়ে লেখক এ উপন্যাসে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ ভাষা নিয়ে লেখকের ললাটে একাধারে প্রশংসা ও সমালোচনা জুটেছে। লেখকের মতে এ উপন্যাসের ভাষা তুর্কি আগমনের সময়কালের। বাক্যগঠন প্রণালী লক্ষ করলে দেখা যায় এতে রয়েছে সংস্কৃত ও সমাসবদ্ধ শব্দের বাহুল্য। এক্ষেত্রে লেখকের শিক্ষাজীবনে সংস্কৃত বিষয়ের পাঠ ও তদ্জাত জ্ঞানও প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। এর উৎস হিসেবে ধরা হয় কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নিম্নোক্ত এ চিঠিকে-

> ‘লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। এখন তোমার আকার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকূলে প্রীতির বীজ হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে যে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগেতে আছি। তোমাকে এ গোটা কর্তব্য উচিৎ হয়। না কর যান আপনে জান। অধিক কি লেখিম।’[২৩]

আবার রাহুল সাংকৃত্যায়ন *ভোলগা থেকে গঙ্গা* নামক উপন্যাসে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছরের পটভূমি নিয়ে চীনের ভোলগা থেকে আধুনিক যুগের গঙ্গার তীরে এসে মানব জাতির বিবর্তিত জীবনযাত্রাকে চিত্রায়িত করেছেন। ফলে তিনি ইন্দো-

ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছেন। লেখক সামন্ত শাসকশ্রেণির ভোগ-বিলাস ও রতি-বিহারের যাপিত জীবনকে এ উপন্যাসের 'চক্রপাণি' অংশে সুনিপুণভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন। যেমন-

> 'মহারাজকে স্বয়ং কঞ্চুক খুলতে দেখে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিলো তরুণীরা। তাঁর লোমচর্ম শীর্ণ চিবুক, কাঁচাপাকা গোঁফ, প্রসূতির স্তনের মতো ঝুলেপড়া বুক, মহাকুম্ভের মতো উদর, শীর্ণ ঢিলে চর্মাবৃত উরু এবং জঙ্ঘা আর কর্কশ লোমশ বাহু সাধারণত তরুণীরা ঘৃণা না করে পারে না। কিন্তু এদের দেহপ্রাণ সবই এই বৃদ্ধের হাতে। কেউ তাঁর দন্তহীন ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল, কেউ তাঁর দেহে আপন স্তনদ্বয় পীড়িত করতে লাগলো, আবার কেউ তাঁর লোমশ বাহু নিজের কাধে বা গালে ঝুলিয়ে দিতে লাগলো। কামোদ্দীপক গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ শুরু হল, রানী এবং পরিচারিকাদের মাঝে দাঁড়িয়ে মহারাজও তাঁর বিশাল ভুঁড়ি নাচাতে আরম্ভ করলেন।'[২৪]

এসব লিখিত গদ্য বিবেচনা করে বলা যায়, শওকত আলী তাঁর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে যে-গদ্যশৈলী বা ভাষা ব্যবহার করেছেন তা লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলের নয়। কারণ পরিশীলিত লেখ্য বাংলা গদ্যের প্রচলন তখনো হয়নি। তারপরেও তিনি এ উপন্যাসে একধরনের কৃত্রিম ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এ উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে সেন বংশের শেষ রাজা মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজদরবারের সুখ-ভোগ, বিলাস-ব্যসন ও কাব্যকলার আদি রসের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

> 'গৌড়বঙ্গের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে মহামহিম পরম ভট্টারক শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজসভায় উমাপতি, ধোয়ী, এবং জয়দেবের কাব্য-গীতির সুললিত মূর্ছনায় সভাস্থল বিমুগ্ধ। জয়দেবের কৃষ্ণলীলার বর্ণনা শ্রবণে সভাসদবর্গ তুরীয়ানন্দে বিহ্বল, ধোয়ীর পবনদূতের বর্ণনায় কামকলানিপুণা রমণীকুলের উল্লেখে শ্রোতৃবর্গ অহো অহো উল্লসিত স্বর উচ্চারণ করে উঠছেন। স্মার্ত পণ্ডিতের ভাগবত বিশ্লেষণে মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সাধু সাধু রব।'-[প্র.প্রা./পৃ. ৬২]

তাহলে দেখা যায় প্রায় একই ধরনের ভাষাশৈলী ব্যবহার করে *ভোলগা থেকে গঙ্গা*-তে উত্তর ভারতের গঙ্গা তীরবর্তী জনপদের মানুষদের কথা এবং *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ও মহানন্দার তীরবর্তী উত্তরবঙ্গের জনপদের প্রাকৃত মানুষদের মুখের ভাব-ভাষা-ভাবনা, আচার-আচরণ-উচ্চারণকে প্রকাশ করা হয়েছে। মহাভারতীয় যুগের পরিবেশ সৃজনে সুবোধ ঘোষ যেমন *ভারতপ্রেমকথা*-য় তৈরি করেন সংস্কৃতি-নির্ভর সুচয়িত অনন্য ভাব, তেমনি *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে প্রদোষকালের বাস্তবতা উন্মোচনে শওকত আলীও নিমগ্ন প্রাচীনগন্ধী ভাষাভঙ্গিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর এ ভাষা বর্ণনাত্মক, শেকড়সন্ধানী, মৃত্তিকাগন্ধী ও মানবিক। এ বিষয়ে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের ভাষ্য–

> '*প্রদোষে প্রাকৃতজন* এর ভাষাটা অবশ্যই কৃত্রিম। যখনই আমি শিল্পনির্মাণ করতে যাই, তখনই আমাকে শিল্পের বাহন বা মাধ্যম হিসেবে একটা কিছু বেছে নিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে ভাষাটাই হচ্ছে প্রধান। ভাষাটা মাধ্যমও বটে; উপকরণও বটে।... সাংস্কৃতাইজ ভাষা তখনকার দিনের সাধারণ মানুষ বলত না। সেটা আমিও জানি; কিন্তু সেটার ফরমটা কি হবে তা আমি জানি না। কেউ জানে না। সেই কারণে দৈনন্দিন জীবনের ভাষার সঙ্গে এর ভাষাটাকে জড়াতে চাইনি। কারণ ইতিহাসের একটা দূরত্ব আছে। আর সে-দূরত্ব রেখেই জানতে হবে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* এর ঘটনাবলী। কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে না, অতীতকে কল্পনা করে নিতে হচ্ছে। সেই জন্যে আমার মনে হয় *প্রদোষে প্রাকৃতজন* এর কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে একটা বিস্তর দূরত্ব আছে। এই দূরত্বটাই আমি ভাষা পরিবর্তনের মাধ্যমে রাখতে চেষ্টা করেছি এবং সেই জন্যেই এই ভাষাটি ব্যবহার করেছি।'[২৫]

এ উপন্যাসের ভাষা নির্মাণে শওকত আলী সচেতনভাবেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই লেখক ইতিহাসের দূরবর্তী যাপিত জীবনের আবহ বজায় রাখতে তৎসমশব্দবহুল ও সমাসবদ্ধপদের সমন্বয়ে যে-শ্রমসাধ্য ক্লাসিক গুণমণ্ডিত গদ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন– শেষপর্যন্ত তাও বিতর্কমুক্ত হয়নি। কারণ তিনি সমাজের অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও ব্রাত্যশ্রেণির সকল পেশাজীবী মানুষের মুখে একই ভাষা প্রয়োগ করেছেন। লীলাবতী ও মায়াবতীদের বলা 'চুপচুপ দগ্ধমুখি' এবং 'ভ্রাতঃ, আপনি কি নিদ্রাগত'– এর স্থলে 'পোড়ামুখি' ও 'ভাই, আপনি কি ঘুমান'– ব্যবহার করলে তা অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত ও শিল্পসম্মত হয়ে উঠতো। এ নিয়েই সচেতন পাঠকদের রয়েছে এক চিলতে আপত্তি। কিন্তু তারপরেও সকল শ্রেণির মানুষের মুখে একই ধরনের কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করার পরেও উপন্যাসের রসাস্বাদনে তেমন বাধা তৈরি করেনি। বরং চরিত্রসমূহ যেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি পাঠকও তাদের মধ্য দিয়ে অতীতের অনালোকিত মানুষকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে। কারণ বিচিত্র শ্রেণিচরিত্রের মানুষেরা প্রত্যেকে একই ভাষায় কথা বললেও লেখকের মুন্সিয়ানার কারণে এসব চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য, অবস্থান ও রস-রুচি স্বমহিমায় উন্মোচিত হয়েছে। গদ্য কাব্যময়, গীতল ও চিত্রময় হওয়াতে এর ভাব-ভাষা-ভাবনা প্রাণবন্ত, ব্যঞ্জনাময়, সরল ও সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তবে শওকত যৌনতার বর্ণনায় যে-আশ্চর্য রকমের সংযমতার পরিচয় দিয়েছেন– তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। অন্তত তিনটি জায়গায় বাৎস্যায়নী কামকলা ও রতিবিহারের পূর্ণ পরিবেশ ও যৌক্তিক কার্য-কারণ থাকার পরেও যেভাবে ঘটনাকে মোচড়

দিয়ে অন্যদিকে বাঁক-বদল করে দিয়েছেন এবং রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে যেভাবে আদিরস-শৃঙ্গারকে শৈল্পিকভাবে রুচির আবরণ-আভরণে রূপ দান করেছেন– তা এক কথায় অসামান্য। তাঁর মতো শক্তিমান লেখকের হাতে পড়ায় বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এর অংশবিশেষ বাৎস্যায়নী কামসূত্রে পরিণত হয়নি। এখানেই শওকত আলীর কৃতিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির জায়গা।

চব্বিশ ঘণ্টার রাত-দিনের সময়প্রাবহকে মোট আটটি প্রহরে ভাগ করা যায়। পর্যায়ক্রমে এ আটটি প্রহর হলো-প্রাতঃপর্ব, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি ও নিশান্ত। সাধারণত 'প্রদোষ' বলতে সূর্য অস্ত যাবার পর যে-সময় থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সে-সময়টিকে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ যা আলো-আঁধারময় পরিবেশ-পরিস্থিতি, অস্পষ্টতা, ধূসরতা ও দুর্বোধ্যতাকে ইঙ্গিত করে। আর 'প্রাকৃতজন' বলতে মূলত নীচ, অধম, অভাজন, অন্ত্যজ, ইতর, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, নির্ধন ও নিম্নশ্রেণির প্রান্তজনবাসী অসহায় জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। যারা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় অধিকার তো নয়-ই বরং ন্যূনতম মৌলিক ও মানবিক মর্যাদা, সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এরা এমনই নামহীন-গোত্রহীন ও আত্মপরিচয়হীন মানুষ। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* নামের মাধ্যমে লেখক মূলত রাঢ়-বঙ্গের ইতিহাসের এক প্রসূতিপ্রহরের অন্ধকারময় দুর্যোগকালীন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গরিব-গতরসর্বস্ব মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে বড় করে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের সময় ও সমাজসত্যের সঙ্গে অগণন মানুষের জীবনসত্যের যে-আকাঁড়া শিল্পভাষ্য রূপায়ণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। সার্বিক বিবেচনায় এ নামটিও সর্বাঙ্গসুন্দর, সফল ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

এ উপন্যাসের ব্যাপক লুণ্ঠন-নরহত্যা-অগ্নিসংযোগ-নারীধর্ষণের বিবরণ বিপুলভাবে চিহ্নায়িত। কেননা তা কেবল তেরো শতকের সূচনা পর্বের বিবরণ নয়। অখণ্ড ও অবিভাজ্য বাঙালি জাতির ইতিহাস যখন সর্বভারতীয় প্রভুত্ববাদের চক্রান্তে দ্বিখণ্ডিত হল, বিশ শতকের চারের দশকের শেষ পর্ব থেকে একই বিবরণ এখনও পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়েছে বহু বার। শওকত আলী দেখিয়েছেন, মহাসামন্ত হরিসেন ও অভিমন্যু দাসদের মতো বিকারগ্রস্ত মানুষেরাই বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গজয়কে নারকীয় বীভৎসতার চরম শিখরে নিয়ে যায়। কাফুর খান ইতিহাসের উপলক্ষ মাত্র। একাত্তরের ভাবনা এখানে এসেছে বহুস্তরস্পর্শী ভাবনা পেরিয়ে। এ বিষয়ে স্বয়ং লেখকের ভাষ্য–

> '*প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ একটা পুরনো কালের ঐতিহাসিক ঘটনা আছে বটে। কিন্তু এখানে যেটা দেখা গেছে সেটা হল, এই মানুষগুলো আক্রান্ত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। ৭১ সালে আমরা যখন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছি, সেখান থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছি।...তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এইগুলো কবে থেকে আমাদের মধ্যে শুরু হয়েছে? মোঘলরা যখন আক্রমণ করেছে তখন কি এভাবে পালিয়েছে মানুষ? কিংবা ব্রিটিশরা যখন আক্রমণ করতে আসছিল, পলাশীর যুদ্ধের দিকে যাচ্ছিল সৈন্যবাহিনী নিয়ে, তখন কি এসব ঘটনা ঘটেছে? কিংবা যখন একেবারে প্রথম দিকে আর্যরা আসতে শুরু করল, তখন কি পশ্চিম দিক থেকে লোকগুলো এখানে এসেছে?...তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাহলে কতদিন ধরে আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছি? কতদিন ধরে আমরা পলায়ন করছি বা স্থান ত্যাগ করছি? এই যে মাইগ্রেশন অব পপুলেশন, একদিকের মানুষ আর একদিকে চলে যাওয়া, জীবন ভেঙে যাওয়া, জীবন বিপর্যস্ত হওয়া, আবার নতুন করে জীবন গড়া– এই ব্যাপারটা, এই প্রসেসটা কতদিন ধরে চলে আসছে? এই কথাটি নিয়েই, ইতিহাস নিয়েই আমার ঘাঁটাঘাঁটি এবং তা থেকেই এই উপন্যাসটা বেরিয়ে এসেছে।'[২৬]

তাই একাত্তরের সংকটকে দেখেই শওকতের মনে প্রশ্ন জেগেছে–কতবার, কতকাল ধরে প্রাকৃতজনেরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায়, কীভাবে সংগ্রাম করে টিকে ছিল যা আজও ঘটছে। রাজশক্তি সর্বদা জন সাধারণকে উপেক্ষা করেছে ও নিপীড়ন করেছে। আর আস্থা রেখেছে অস্ত্রধারী সেনাদল ও প্রজাপীড়নে পারঙ্গম সামন্ত প্রভুদের ওপর। ইতিহাসের নানাপর্বে এ পুনরাবৃত্তি কেবল নতুন নামে পরিচিত হয়েছে-এই যা।[২৭] এ পর্যায়ে আলোচ্য গ্রন্থের মলাটলিপি বা ফ্ল্যাপলিখনে ড. আনিসুজ্জামানের মন্তব্যটি স্মরণীয়-

> 'সেনরাজার শাসন থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে দেশ, তুর্কি আক্রমণ অত্যাসন্ন। তবু সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচারের শেষ নেই। সেই অত্যাচার রুখে দাঁড়ায় কখনো অন্ত্যজেরা, কখনো বৌদ্ধরা। শাসকের বিশেষ রোষ তাই তাদের উপরেই।...ইতিহাসের সেই প্রদোষকালের জটিল আবর্তে ঘূর্ণ্যমান কয়েকজন প্রাকৃত নরনারীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসে তাদের নাম নেই। হয়তো অন্য নামে তারা বাস করেছে সেই কালে, হয়তো অন্য কালেও। মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের যত্নকৃত শিল্পরচনায় কেন ছেদ পড়ে, কীসের অন্বেষণে তাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয়? স্বামী পরিত্যক্তা লীলাবতী কী চায়, কেন পায় না? মায়াবতীর কোমল বাহুবন্ধন ছিন্ন করে বসন্ত দাস কেন মিত্রানন্দের সঙ্গী হয়? মানুষকে স্বপরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে বলে মিত্রানন্দ, নতজানু দাসত্ব থেকে

মুক্ত হতে বলে। এর বেশি সে জানে না, জানবার আবশ্যকতাও বোধ করে না। বসন্ত দাসও চায় প্রচলিত ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করতে, কিন্তু সে আরও জানতে চায় যে, তার পরিবর্তে কী পাবে সকলে? এসব প্রশ্ন মীমাংসা হবার আগেই ইতিহাসের ঝঞ্ঝা এসে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে। কিন্তু এইসব জিজ্ঞাসা আর ভালোবাসা, স্বপ্ন আর প্রয়াসের সারাৎসার তারা সঁপে দিয়ে যায় উত্তরসূরিদের হাতে।'[২৮]

উপন্যাসটি বিভিন্ন ভাষার অনেক আধুনিক ক্লাসিক উপন্যাসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এটি আবহমান বাঙালি সমাজের এক বিশেষ মুহূর্তের সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাগুলো যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সঙ্গে ধারণ করেছে। শওকত আলীর এ *প্রদোষে প্রাকৃতজন* যেকোনো তাত্ত্বিক বিচারে গত দেড়শ বছর ধরে বাংলা ভাষায় রচিত সেরা উপন্যাসগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।[২৯] কেননা- 'It sets locale and the tone of the 12th century Bengal under the sena empire...showkat ali's maserly crafted novel *pradoshe prakritajon,* a narration of meseries that low-cast groups suffered and of the revolt that the 'untouchables' did against their oppressions.'[৩০] শ্রেণিশোষণ, সামন্তশোষণ ও সামরিক শাসনপীড়িত বর্তমান সময়খণ্ডে দাঁড়িয়ে শওকত আলী তাঁর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে বাঙালি জাতির ইতিহাসের প্রদোষলগ্নকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের শাসনামল ও তুর্কি আক্রমণের পটভূমিতে প্রাকৃতজনদের অস্তিত্বসংকট ও সংগ্রামের দর্পণে ঔপন্যাসিক বাঙালির আবহমান জীবনসংগ্রাম ও তার পরিণতিকে রূপদান করেছেন। বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস, শ্রেণিসংগঠন ও শ্রেণিসংগ্রামের আদি-বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অনুধাবন শওকত আলীর সমাজ-অধ্যয়নের ঐকান্তিকতার পরিচয়বাহী। শিল্পীসত্তা ও মানবতার সর্ববন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ উপন্যাসের বিষয়সন্ধানের মূলে ক্রিয়াশীল।[৩১] যা শওকতের ইতিহাসজ্ঞান ও সাহিত্য-সাধনার শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিময় প্রান্ত।

পরিশেষে বলা যায়, যবন তুর্কি-মুসলমানদের গৌড়বঙ্গ বিজয়ের প্রাক্কালে বৌদ্ধধর্মীদের সঙ্গে সনাতন ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মীদের বিরোধ–এ তিন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংঘর্ষ, সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুগের এ নির্মম বাস্তবতা বা পরিণামকে মেনে নেয়াই হয়ে ওঠে এ দেশবাসীর একমাত্র নিয়তি। তবে সেন শাসনামলের অন্তিমপর্বে এসে সামন্ত–মহাসামন্তদের চালানো শ্রেণিশোষণ, বর্ণশোষণ ও ধর্মশোষণের বিরুদ্ধে শোষিত ব্রাত্যশ্রেণির প্রতিবাদের ধ্বনিই এ উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য। অভিজাত শাসক শ্রেণির অর্থাৎ দেশীয় সামন্ত ও তুর্কি সেনাপতিদের স্বার্থের ষড়যন্ত্রে, দালালি ও আপস রফায় বরাবরের মতো বিদ্রোহী অভাজনেরা শেষ পর্যন্ত হার মানে এবং ক্ষমতার কাঠামোটি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে সমাজের বৃহৎ প্রাকৃতজনগোষ্ঠীর স্বপ্ন-প্রত্যাশার মৃত্যু ও দ্রোহের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যায় না। কারণ প্রথাভাঙার প্রাণোচ্ছল-স্বাধীন গৌড়ীয় রীতির সাংস্কৃতিক উপাদানে, পুণ্ড্র-গৌড়-বঙ্গের প্রত্ন-প্রতিমায় এবং অনাগত প্রাকৃতপুরুষদের শোণিতের ধারায় তারা যে-অবিনাশী প্রতিবাদের প্রাণবীজ রেখে যায়; সে-শপথ, শক্তি ও সম্ভাবনার ক্ষয়-লয় ও বিনাশ নেই। লীলাবতী-মায়াবতীদের জঠরজমিনে বেড়ে ওঠা সংশপ্তক সেনারূপী অনাগত সন্তানেরাই দ্রোহের পতাকা তুলে ধরে পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত আন্দোলন-উদ্যোগকে সম্মুখপথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এপথেই মিলবে সেই প্রত্যয় ও প্রত্যাশার অক্ষয় পদচিহ্নরেখা। এমন সদর্থক, সঞ্জীবনী ও সম্ভাবনার বাণীই *প্রদোষে প্রাকৃতজন*–এ প্রবল হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এ উপন্যাসটি ১৯৮২ সনে শাহাদাৎ চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* পত্রিকায় 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' ও 'দুষ্কালের দিবানিশি'– নামে দুটি পর্বে দুই কিস্তিতে পর পর দুটি ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর ইউ.পি.এল প্রকাশনী ১৯৮৪ সনে এ দুটি পর্বের সমন্বয়ে প্রথম গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশ করে।-[উৎস- মোহাম্মদ হাননান সম্পা. *শওকত আলী রচনাসমগ্র*; ৩য় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, জুন ২০১৫, পৃ. ৬৬৪]

২. অরিজিৎ ভট্টাচার্য : *ইতিহাসের আখ্যান*; এবং প্রান্তিক, বারণাসী, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৩

৩. মহীবুল আজিজ : *শওকত আলীর প্রাকৃতপুরাণ* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া*); সংখ্যা-১৬, সেপ্টেম্বর ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৭৪

৪. নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব); দে'জ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ৪২৬

৫. অরিজিৎ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭

৬. অরিজিৎ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪০

৭. আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)*; বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৫৩

৮. হুমায়ুন কবির : *বাঙলার কাব্য*; চতুরঙ্গ, কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৫৮

৯. শওকত আলী : *লেখকের দায়িত্ব*; মোহাম্মদ হাননান (সম্পা.), শওকত আলী রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫০৩

১০. তপোধীর ভট্টাচার্য : *প্রদোষে প্রাকৃতজন: আখ্যানে নরক দর্শন* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী ২০১৬, পৃ. ১৩২

১১. শওকত আলী : *লেখকের দায়িত্ব;* পূর্বোক্ত; পৃ. ৫০৭-৫০৮

১২. ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস সিরাজ তাঁর *তবাকৎ-ই-নাসিরী* এবং ইসমী তাঁর *ফতুহ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে বয়োবৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের বীরত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা, সুশাসন ও দানশীলতার বহু প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। রমেশচন্দ্রের বরাত দিয়ে প্রভাতাংশু মাইতি বলেছেন, কাজী পদবিধারী মিনহাজ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বাংলা অঞ্চলে আসেন। আর জনশ্রুতিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে গৌড়, বঙ্গ, কামরূপ, কলিঙ্গ, কাশী, পুরী, বারণাসী ও এলাহাবাদ জয় করেছিলেন তাঁর পিতামহ বিজয় সেন; লক্ষ্মণ সেন নন। বলা যায় লক্ষ্মণ সেন এসকল অভিযানে সেনাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই তাঁর 'গৌড়েশ্বর', 'অরি-রাজ-মর্দন-শঙ্কর' এবং 'পরম মহেশ্বর' উপাধি গ্রহণও অনেকটা অতিরঞ্জন। আবার তিনি অবিবেচকের মতো প্রতিবেশী শক্তি কনৌজের গাহড়বাল আক্রমণ করেন। এ গাহড়বাল শক্তিই ছিল বাংলায় তুর্কি আক্রমণের প্রতিরোধের প্রধান রক্ষা প্রাচীর। এদের দুর্বল করায় তুর্কিরা সহজেই বাংলায় ঢুকে পড়ে। আবার নবদ্বীপ দেশের রাজধানী না হওয়াতে এ অবকাশ কেন্দ্রে আত্মরক্ষার কোনো দুর্গও তিনি গড়ে তুলেননি। ফলে তাঁর পূর্বে উত্তর ভারতের বহু রাজপুতরা তুর্কি আক্রমণ ঠেকাতে পরাজিত হলেও ইতিহাসের গ্লানি লক্ষ্মণ সেনকেই বহন করতে হয়। ষাট বছর বয়সে সিংহাসনে বসে তিনি পূর্বপুরুষদের শৈব মতকে পরিহার করে বৈষ্ণব মতকে গ্রহণ করেন এবং 'পরমবৈষ্ণব' বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। ফলে রাজদরবারে বৈষ্ণবভক্ত কবি জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ মিশ্র ও শ্রীধর দাসদের প্রধান্য বৃদ্ধি পায়। যা কালক্রমে নৈতিক শিথিলতা তরান্বিত করে। গোবর্ধনের *আর্যসপ্তশতি* গ্রন্থ, জোলক ও বসন্তোৎসব এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সব মিলিয়ে লক্ষ্মণ সেনের ব্যর্থতা ছিল একটি system বা প্রথার ব্যর্থতা। তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত জাতিভেদনীতি, কৌলীন্যপ্রথা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম-পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণে বাংলার সমাজ জীবনে জাতীয় সংহতির যে-পতন ঘটে– তাঁর করুণ পরিণতি লক্ষ্মণ সেনকে বরণ করতে হয়।

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, পালযুগের সহজিয়া বৈষ্ণববাদ, সর্বধর্মে সমন্বয়বাদী প্রবণতা ও তান্ত্রিকধর্মের প্রভাবকে অপসংস্কৃতি জ্ঞান করে সেন রাজারা সমাজশোধনের নামে বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ আচার প্রবর্তনে অতিমাত্রায় ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির পরিচয় দেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিষ্টান গির্জার যাজকদের মতো এরাও জনগণের জীবনমান, আচার পদ্ধতি, বিবাহ, জাতিভেদ ও কর্মবিন্যাস রক্ষা করতে গিয়ে নানা শোষণ-পীড়নে সমাজশৃঙ্খলা বিনষ্ট করেন। ফলে জনমনে অশান্তি ও অসন্তোষ বাড়তে থাকে। আবার লক্ষ্মণ সেন ভবদেব ভট্ট ও হলায়ুধ মিশ্রের প্রভাবে অতিমাত্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রনির্ভর হওয়াতে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণীতে মন্ত্রী, অভিজাত, সামন্তশ্রেণির মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ না করে সকলেই পালিয়ে যায়। তাই লক্ষ্মণ সেনের গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থাও বখতিয়ারের রণকৌশলে সহজেই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়নপর, উপদেষ্টা ও মন্ত্রিবর্গ পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক; সেখানে সকল প্রতিরোধই দুর্বল হতে বাধ্য। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও আন্তরিক সহযোগিতা থেকে লক্ষ্মণ সেন বঞ্চিত হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেন রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তার পিতার পথে না হেঁটে বৌদ্ধদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ইসলামপন্থী সুফি সাধকদের সঙ্গে আপস-রফার মনোভাব নিয়ে শাসন কাজ চালাতে থাকেন। তিনি শেখ মুখদুম শাহ জালাল উদ্দিন তাব্রিজীকে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও তাঁর অনুরোধে বাইশ হাজার মুদ্রা পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় এমন গ্রামসমূহ দান করেন। এসময় সমগ্র উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ শেখের অলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। দেবীকোটে বখতিয়ারের বসতি স্থাপনের বহু আগে থেকেই এখানকার মানুষ ধর্মান্তরিত হতে থাকে। তুর্কি বীর বখতিয়ার যেদিন দেবীকোটে আসেন, সেদিন তাঁকে স্বাগত জানানোর লোকের অভাব ছিল না।– [উৎস- প্রভাতাংশু মাইতি: *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*; প্রথম খণ্ড, শ্রীধর প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫৪-৩৫৮ এবং নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর ইতিহাস*; আদিপর্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২-৪১৫]

১৩. মাসুদুল হক : *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা. *উলুখাগড়া)*; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

১৪. তপোধীর ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৯-১৪০
১৫. মহীবুল আজিজ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭৮-১৭৯
১৬. নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৬০-১৬১
১৭. যতীন সরকার : বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য; ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬১
১৮. মাহবুবুল হক : *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (*শওকত আলী রচনাসমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পরিশিষ্ট-১); পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২-৫৬৩
১৯. সুকুমারী ভট্টাচার্য: *প্রাচীনভারত: সমাজ ও সাহিত্য;* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮
২০. মাসুদুল হক : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯৪-১৯৫
২১. মহীবুল আজিজ : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮১
২২. রাশিদ আসকারী: *প্রদোষে প্রাকৃতজন: একটি বিকল্প পঠন* (চন্দন আনোয়ার সম্পা. *গল্পকথা*, *শওকত আলী সংখ্যা*); পূর্বোক্ত; পৃ. ১৬০
২৩. শ্যামলকুমার চক্রবর্তী : *বাংলাদেশের গদ্যের ক্রমবিকাশ*; সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩৩
২৪. রাহুল সাংকৃত্যায়ন : *ভোলগা থেকে গঙ্গা*; বুক সেন্টার, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৮২-১৮৩
২৫. সরকার আশরাফ : কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর মুখোমুখি দুই সন্ধ্যায় (সাক্ষাৎকার); সরকার আশরাফ সম্পা. *নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা, বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, মার্চ, ১৯৯২, পৃ. ২৮-২৯
২৬. সরকার আশরাফ : পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫
২৭. তপোধীর ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩২
২৮. আনিসুজ্জামান : *প্রদোষে প্রাকৃতজন*; ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ফ্ল্যাপলিখন অংশ
২৯. রাশিদ আসকারী : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৬১
৩০. Abu Jar M. Akkas : *The Literary Luminance that Brightend the Twilight* (বেলাল বাঙালি সম্পা. *কথাশিল্পী শওকত আলী: ব্রাত্যজনের কথক*); গণপ্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭৩
৩১. রফিকউল্লাহ খান : *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯০-৯১

উপসংহার

উন্মথিত বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শওকত আলী। গভীর জীবনোপলব্ধি, ব্যাপক অভিজ্ঞা এবং মানুষের প্রতি অতলস্পর্শী ভালোবাসা কিংবা মানবপ্রীতির সমন্বয়ে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় তিনি নির্মাণ করেছেন এক নবতর শিল্পসম্ভার। লেখার শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও সুষমার গুণেই ষাটের দশকে নিজের আবির্ভাব, অবস্থান ও আসনকে তিনি পাকাপোক্ত করেন । *স্বাক্ষর* ও *কণ্ঠস্বর*–এর মতো কলাকৈবল্যবাদীদের কালে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এসময় দেশের সাহিত্যাঙ্গনে যেমন আঙ্গিকবাদী ও অস্তিত্ববাদীদের দাপট চলছিল, তেমনি সমাজকাঠামোতে বিদ্যমান ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ, পাকিস্তানপ্রীতি, ধর্মীয় উন্মাদনা, সামরিক দুঃশাসনের জগদ্দল পাথর, পর্বতপ্রমাণ সামাজিক বৈষম্য, গণমানুষের অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক জাগরণ। এ যুগলস্রোতে বাংলাদেশের সমাজ ছিল গতিচঞ্চল, দ্বন্দ্বক্ষত এবং আসন্ন পরিবর্তনমুখী। ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত ও বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় হবার মধ্য দিয়ে প্রথম যৌবনেই শওকতের মানসলোকে অঙ্কুরিত হয়েছিল উদার-মানবতাবাদী চেতনা ও মুক্ত জীবনবীক্ষার বীজ। শওকতের সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার কর্মজীবন যেমন ছিল আদর্শময়, তেমনি সাহিত্যজীবনও ছিল বৈচিত্র্যময় আর বিদ্রোহে ঋদ্ধ। ব্যক্তিজীবনের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার মতো তিনি সাহিত্যজীবনে যে-সাহস ও দ্রোহের পরিচয় দিয়েছেন– তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। উপন্যাসের বিষয় ও ভাষা, ভাবসম্পদ ও প্রকরণ স্বাতন্ত্র্য– উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ছিলেন প্রাগ্রসর। শওকত-সাহিত্যের মূল প্রবণতা হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা, নাগরিক জীবনবীক্ষা, তৃণমূলের সংঘশক্তির অন্বেষা, মধ্যবিত্তের স্বরূপ-সন্ধান এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনা– এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়।

রাজনীতির চড়াই-উৎরাই একটি জাতিকে শুধু আত্মসন্ধানের পথ করে দেয় না, সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার স্বরূপ অনুধাবনেরও সুযোগ এনে দেয়। যেকোনো জাতির অভ্যুদয়ের মৌল বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয় তার রাজনীতির

জনবিস্ফোরক চেতনায়। শওকত রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের আগ্নেয় উত্তাপ ও উত্তাল মুহূর্তগুলো ছেঁকে-ছেনে তৈরি করেছেন জনজীবনের কঠিন ছাঁচ। ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্মকথার সঙ্গে অগুনতি মানুষের রক্ত, জীবন-যন্ত্রণা আর মৃত্যু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দেশভাগের অভিঘাতে অপরাপর মানুষের মতো ব্যক্তি শওকতের জীবনও বিপন্ন হয়ে ওঠে। জীবন ঘষে আগুন জ্বলে ওঠা চল্লিশ দশকের দেশভাগের সংকট হতে শুরু করে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের প্রতিটি প্রান্তকেই শওকত অত্যন্ত নির্মোহ ও সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম পাঠ বা দীক্ষা শওকত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ প্রভাব, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, জাতিবিদ্বেষী রাজনীতির মেরুকরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুসংকট, পাকিস্তানি সামরিক শাসন-শোষণ, ভাষা-আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (আন্দোলন), শিক্ষা-আন্দোলন, ছয়দফা-আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (আন্দোলন), ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তি-সংগ্রাম, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনের মতো অগ্নিঝড়া বিস্ফোরক মুহূর্তগুলো বিম্বিত হয়েছে। বিশ শতকের এমন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে শওকত নিজেকে ঋদ্ধ করেন। এসময় দেশের বাইরে বহির্বিশ্বও ছিল নানা ঘটনায় টালমাটাল অবস্থায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে এশিয়া-আরব-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশের সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হবার ঘটনা; র‌্যালফ ফক্স-ক্রিস্টোফার কডওয়েল- জন কনফোর্ডের মতো লেখকদের ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবনোৎসর্গের বিষয়; বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে মালরোর ফ্রাঙ্কো-হিটলারের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং পরবর্তীকালে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করার ঘোষণা দান; ইয়াসির আরাফাত- আহমদ বেন বেল্লা- হো চি মিন- প্যাট্রিস লুমুম্বা- জামাল আবদেল নাসের- জোমো কেনিয়াত্তা ও জুলিয়াস নায়েরের মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের ডাকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী আহ্বান এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও চেগুয়েভারার মতো বিপ্লবীদের আকর্ষণে ল্যাটিন আমেরিকার লাখো তরুণদের উজ্জীবনের ঘটনা– এসবের তাপ-চাপ শওকতের মানসলোকে কার্যকর প্রভাব ফেলে। ফলে তিনি পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই (কলেজের ছাত্রবস্থাতে) বাম রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও বামদলের শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বামদলের পরাভব, রুশ-চীন মতভেদে বিভক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন– এমন যুগ্ম-বৈপরীত্যের (Binary-opposition) বাস্তবতায় তিনি রাজনীতি নিয়ে আরো বেশি পর্যবেক্ষণ-প্রবণ হয়ে ওঠেন। দেশভাগের একটি বড় ধাক্কা অনিবার্যভাবে তাঁর লেখক সত্তার ওপর পড়ে। সেই সঙ্গে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সামাজিক বিবর্তনের তাপ-চাপ তাঁকে আরো বেশি আন্দোলিত করে। এ সংক্ষুব্ধ সময় ও বিরূপ প্রতিবেশেই শওকত নিজেকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চৈতন্যের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে পাওয়া যায়–ত্রয়ী *দক্ষিণায়নের দিন*-এর সেজান, মনি ও রাখী; *ওয়ারিশ*-এর মুর্শেদ, সালমা ও রায়হান, *উত্তরের খেপ*-এর নিশাত বানু, হায়দার ও মরিয়ম; *অবশেষে প্রপাত*-এর আনিস, রীনা ও ইফতিখার; *দলিল*-এর রায়হান ও মঞ্জু, *স্ববাসে প্রবাসে*-র তাপস দত্ত, আফসান ও অরুন্ধতী এবং *বসত*-এর মুর্শেদ ও রায়হান আলী হেনুকে।

শওকতের লেখার মধ্যে এক ধরনের আত্মসচেতনতা, সমাজের গভীরে প্রবেশের এক ধরনের ব্যাকুলতা বা সদিচ্ছা সবসময়ই ছিল। তিনি মার্কসবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এবং মার্কসবাদীদের সঙ্গে সখ্য ও চলাফেরা করলেও সাহিত্যকে কখনোই মার্কসবাদী তত্ত্বে পরিণত করেননি। এক ধরনের শৈল্পিক নিরাসক্তিকে (artistic detachment) তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। উপরন্তু লেখার মাধ্যমে তিনি মার্কসবাদকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মার্কসবাদের সাফল্য ও সম্ভাবনা তিনি কামনা করলেও সমকাল বাস্তবতায় মার্কসবাদীদের সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা, বামদলের ব্যর্থতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি-বিভাজনকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি জীবনকে একপেশে কিংবা একরৈখিকভাবে না দেখে বরং সামগ্রিকভাবে (totality of life) উপস্থাপন করেছেন। তিনি কোনো তত্ত্বচালানোর বশবর্তী হয়েও লেখেননি। অথবা কোনো পূর্ব ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করাও তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেননি– এটিই সবচেয়ে বড় কথা। জীবন ও সাহিত্যকে তিনি কিছুটা সমালোচনার (criticism of life) দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। কোনো তত্ত্ব, মতাদর্শ ও শ্লোগানকে তিনি লেখায় জোর করে আরোপ করেননি। ব্যক্তিজীবনে তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন: তবে কট্টর ছিলেন না। এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অনুভূতি আর আদর্শের জায়গা। তিনি বিশ্বাস করতেন– শোষণহীন, বৈষম্যহীন, সম্প্রীতিপূর্ণ একটি মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্র প্রয়োজন। এ সমাজতন্ত্রের জন্য নাস্তিক্যবাদ (atheism) ও দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ (dialectic-metarialism) তেমন জরুরি নয়। বরং বেশি প্রয়োজন দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য মেনে জাতীয় চেতনায় নিজেকে ঋদ্ধ করা। শওকত ছিলেন মূলত সময়ের সৃষ্টি। ষাটের দশকের উত্তাল রাজনীতি তাঁকে ও তাঁর লেখক সত্তাকে যুগপৎভাবে পুষ্টি যুগিয়েছে।

নাগরিক জীবনবীক্ষা শওকত-প্রতিভার আরেক প্রোজ্জ্বল দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে। সময়ের দাবিতে এবং শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের ক্রমবর্ধমান অংশের জীবনবাস্তবতাকে সাহিত্যে নির্মাণ উপলক্ষে তিনি দূর ইতিহাস ও

ঐতিহ্যঘেরা নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ প্রতিবেশ ছেড়ে ক্রমশই মফস্বল শহর, উপনগর ও রাজধানীর প্রেক্ষাপটকে আত্মস্থ করতে মনোযোগী হন। শওকত সর্বদ্রষ্টার মতো আধুনিক নগরজীবন ও নাগরিক মানুষের বিকাশ-বিকার, স্বপ্ন-হতাশা, প্রেম-পাশবপ্রবৃত্তি, হৃদয়াবেগ-রিরংসা, উত্তরণ-নিমজ্জন, পাপ-পঙ্ক-পঙ্কজময় বিনাশী নৈঃসঙ্গ্যের রূপকেও পারঙ্গমতার সঙ্গে ভাষারূপ দিয়েছেন। তিনি উদয়াস্ত শ্রমে-ঘামে অবসিত সিসিফাসরূপী নাগরিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধ, বিচিত্র টানাপোড়েন ও নিরালোক মনের দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এ নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্য, মেকি ও মুখোশধারী প্রতিবেশকে। পুঁজিসর্বস্ব এ নাগরিক সমাজব্যবস্থায় জীবন যে-অনেক বেশি যান্ত্রিক, আবেগহীন, স্বার্থঘেরা ও লাভ-ক্ষতির হিসেব দ্বারা সংক্রমিত–তাও তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এড়িয়ে যায়নি। দীর্ঘ নাগরিক জীবনাভিজ্ঞতায় শওকতের কাছে এ জীবনের স্থায়িত্বকে রঙিন ফানুস ও বেলোয়ারী কাঁচের মতো ক্ষণস্থায়ী মনে হয়েছে। এ জীবনকে কখনোই তাঁর কাছে স্বস্তিকর মনে হয়নি। তারপরেও এ জীবনকে ধরতে এবং নতুন দিকে মোড় ফিরতে তিনি নাগরিক মানুষ ও নগরকে সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। অনেকেই একে হালকা চালের লেখা বলে সাব্যস্ত করতে চান। কিন্তু হালকা চাল– শওকতের চাল নয় বরং তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কারণ তিনি সর্বদাই ছিলেন একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। তাঁর সব লেখাতেই একটি আহ্বান ও অঙ্গীকারের জায়গা রয়েছে। তিনি পাকা জহুরির মতো নাগরিক নর-নারীর নিরালোক মনের ভেতরকার মানুষ, বা 'আরেক মানুষ'-এর যন্ত্রণাসহ উপলব্ধিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উন্মোচন করেছেন। এমন জীবনযন্ত্রণা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, পলায়নপ্রবণতা, প্রতারক, উচ্চাভিলাষী, ভোগ-লালসার দানবীয় রূপের সন্ধান মেলে– *পিঙ্গল আকাশ*-এর মঞ্জু, আনিস, সালেহা বেগম, বেনু, কাসেম খান ও আকরাম; *গন্তব্যে অতঃপর*-এর আলী আকবর, নীহার ও নীলা; *ভালোবাসা কারে কয়*-এর লীলা, আহসান, সমিরউদ্দিন ও হামিদ; *যেতে চাই*-এর জাফর ও নিশাত; *পতন*-এর হাসান আবদুল্লাহ, রোকেয়া, বিলকিস ও নিরঞ্জন; *তনয়ার স্বীকারোক্তি*-র সীমা, সাজিদ ও বশিরউল্লাহ; *জোড় বিজোড়*-এর কামরুল হায়দার ও মুশতারি বানু; *শেষ বিকেলের রোদ*-এর হাসিব ও মীজু: *এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা*-র মাহফুজ, আকলিমা, মাসুম ও বুলু; *জননী ও জাতিকা*-র আবিদা, জাফর, রীনা ও ইব্রাহীম; *পাকা দেখা*-র দীপা, নীপা ও রাতুল; *স্থায়ী ঠিকানা*-র মুহিব হাসান; *দোলাচল*-এর জাহিদ ও মীনা; *কাহিনী ও কথোপকথন*-এর হাইদর প্রধান,সওহর, জওহর, হাসান মাহমুদ ও তিমা; *অস্তাচলের আলো*-র সাজিদ হাসান ও মনজিলা এবং *ঘরে যেতে চাই*-এর মাহবুব হোসেন, আরমান, নাসিমা ও মারিয়ার যাপিত জীবনে।

নাগরিক প্রৌঢ় জীবনের লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা নৈঃসঙ্গ্যের ভয়াবহ রূপকে শওকত সুন্দর ও সার্থকভাবে পাঠকের গোচরীভূত করতেও মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। শওকত মূলত পুঁজিনির্ভর নাগরিক জীবনের পণ্যপূজা (commodity fetishism) এবং বিচ্ছিন্নতাকেই (alienation) গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। এ পণ্যপূজা মানুষের সর্ব কার্যক্রম ও মূল্যমানকে বিক্রয়যোগ্য করে তোলে। আর বিচ্ছিন্নতা মানুষকে নিঃসীম হতাশা আর আত্মক্ষয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তবে এসব নাগরিক মানুষ উন্মূলিত ও হতাশায় নিমজ্জিত হবার পরেও কখনো কখনো আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্যোগী হয়,সদর্থক বা সামষ্টিক (positive identity/universality of being) চেতনায় ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় (social commitment) সপ্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। একলা আমি-র প্রাঙ্গণ ছেড়ে এরা ক্রমশই বহু আমি-র কাতারে নিজেদের শরিক করে। বহু নেতি ও নাস্তির প্রতিবেশে দাবদগ্ধ হয়েও তাদের এ সদর্থক চেতনা ও সত্তাসন্ধানী প্রবণতাকে শওকতের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতির (borderline situation) মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব-অনুসন্ধানই শওকতের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যুগের দাবিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনিবার্য সংকট তথা অভিঘাতের প্রেক্ষাপটে নাগরিক মানুষের মনোজগতের ভাঙচুর ও বিচ্ছিন্নতা বিশ্লেষণে শওকত যে-প্রাজ্ঞদৃষ্টি ও পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন; তা একান্তই প্রণিধানযোগ্য।

তৃণমূলের সংঘশক্তির অন্বেষায় শওকত তাঁর নাড়িমাটি উত্তরবঙ্গকেই বেছে নিয়েছেন। কারণ এ উত্তরবঙ্গ ছিল বাংলার রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক আন্দোলন-সংগ্রামের চারণভূমি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ বিরাট অভিজ্ঞতার আলোকে শওকত তৃণমূলের জনজীবনকে ভাষারূপ দিয়েছেন। আবহমান গ্রামবাংলার জীবনপ্রবাহের গভীরে প্রোথিত বিচিত্র সংকট, ভাঙচুর আর রূপান্তরের অনুষঙ্গ উপস্থাপনায় শওকত ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রামজীবনে যুগ যুগ ধরে ঘাপটি মেরে জেঁকে বসা শাস্ত্রাচার, লোকাচার, সমাজশাসন, পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষু, জোতদার-মহাজনদের দৌরাত্ম্যের সমান্তরালে দুর্বল-দেহাতী মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধা-কাম, অভাব-আকাল, মারী-মঙ্গার দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণার প্রান্তসমূহকে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্মাণ করেছেন। খরা-অনাবৃষ্টি আর বৈরী ধূলি-ধূসর প্রকৃতির সঙ্গে একাট্টা হয়ে জোতদার-মহাজনেরা নিরন্ন-নিঃসম্বল শ্রেণিকে সর্বস্বান্ত করে। কিন্তু শওকত আপাত দৃষ্টিতে এ সরল,সমর্পিত, নতজানু, অসহায়, দুর্বল-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে লুকিয়ে থাকা সংঘচেতনা, প্রতিবাদের বারুদ ও প্রতিশোধের স্পৃহাকেই আবিষ্কার করেছেন। ধনী জোতদার-মহাজন শ্রেণির শোষণ-পীড়নের বিপরীতে এসব কৃষক-শ্রমজীবীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারায় ঐতিহাসিক ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহ, সিপাহিবিদ্রোহ ও তেভাগা-আন্দোলনের মতো লোকমিথ ও জনবিস্ফোরকমূলক অনুষঙ্গকে শনাক্ত করেছেন। কৃষকদের গড়ে তোলা এ তেভাগা-আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে গৌরবময় ও তাৎপর্যবাহী অধ্যায়। সেই সঙ্গে এসব সংগ্রামে গ্রাম্য নারীর

সমানপর্যায়ে অংশগ্রহণ, সহজাত দ্রোহচেতনা ও সংগ্রামী ভূমিকায় উত্তীর্ণ হবার বিষয়টিও বাদ পড়েনি। যে- সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতেছিলেন শওকত, তার মূলে অনুপ্রেরণার বিষয় ছিল তৃণমূলের মানুষ। এসব মানুষের সুখ-দুঃখের জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা- স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনাজর্জর জীবনচর্চাই শওকতকে করেছে মানবমুখী, জীবনমুখী, মাটিলগ্ন ও দেশলগ্ন। এ মানুষ মানে ব্রাত্য নিম্নবর্গের মানুষ, শ্রমশীল মানুষ আর সংগ্রামশীল মানুষ; পরিশ্রমবিমুখ পরশ্রমজীবী মানুষ নয়। মানুষের দুর্দশা- দুর্ভোগ-দুর্যোগ তাঁর অন্তর্গত সত্তাকে যেমন বেদনার্ত করেছে, একইভাবে তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তাকে করেছে উজ্জীবিত। তাঁর এ জীবন- অনুধ্যানের মধ্যে তিনি চেষ্টা করেছেন প্রকৃত প্রাণরসের সঞ্চার ঘটাতে। বাহ্যিক রূপের যাথার্থ্যতার প্রতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ- মূলক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা অতিক্রম করে সেই দৃষ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন অন্তর্গত সৌন্দর্যের প্রতি। ফলে তাঁর এ তৃণমূলস্পর্শী প্রতিটি সৃষ্টিকর্মই এত বেশি প্রাণস্পর্শী হতে পেরেছে।

শওকত নিজের আদর্শে, অঙ্গীকারে ও জীবন-যাপনে যতখানি বিশ্বস্ত, তেমনি গ্রামীণ জনজীবনের প্রতিও ঠিক ততখানিই বিশ্বস্ত। তিনি নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় শহুরে দূরত্ব না রেখে বরং নিজেকে একজন স্বগোত্রীয় হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি ছিলেন নিম্নবর্গের একজন যথার্থ প্রতিনিধি। তিনি এ জীবনকে নাগরিক রঙিন চোখ দিয়ে দেখেননি, বরং চর্মচক্ষু দিয়ে হুবহু প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ক্ষুধা-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা থাকা সত্ত্বেও এসকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অদম্য প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করেছেন। এ প্রাণশক্তি দিয়েই তারা ক্ষুধা-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, খরা-মঙ্গা, শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকে। এসব মানুষকে খুব সহজে মারা গেলেও তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়াকে সহজে স্তব্ধ করা যায় না। কারণ প্রতিবাদ, দ্রোহ, ক্রোধ আর ঘৃণা দীর্ঘকাল টিকে থাকে। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির এমন অদম্য আর অবিনাশী দ্রোহচেতনার পরিচয় মেলে *সম্বল*-এর গীতা, বিন্দুবাসিনী, নুরবানু ও ফুলবানু; *নাঢ়াই*-এর আহেদালি, আবেদালি, ফুলমতি, কুতুবালি, সুবল দাস,দীনেশ মুর্মূ ও বারাম হোরে; *মাদারডাঙার কথা*-র দৌলতালি, আব্বাস গজুয়া, আমিরণ, আকলিমা ও শরিফন্নেসার মতো মাটি ও প্রকৃতিলগ্ন মানুষের মাঝে। সামন্তসমাজ কাঠামোয় বন্দি গ্রামের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ক্ষুধা, ক্ষয়,অবদমন, লোভ, লালসা, স্বার্থপরতার পাশাপাশি মানুষের সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শওকত তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীল অনুভূতি দিয়ে লোকায়ত জনজীবনকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন এবং বলা যায় সফলও হয়েছেন। বৃহৎ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এমন গভীর বিশ্বাস থেকে, সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে তিনি সাহিত্যকে বিবেচনা করতেন। শেষদিন পর্যন্ত শওকত ছিলেন গণমানুষের লেখক। মাটি,মানুষ ও সমাজের প্রতি তাঁর এক ধরনের অঙ্গীকার ছিল। এ লক্ষ্য ও সাধনায় শওকত আমৃত্যু ছিলেন আন্তরিক এবং অক্লান্ত।

মধ্যবিত্তের স্বরূপ-সন্ধান বা জীবনবীক্ষার সাধনায় শওকত আগাগোড়াই ছিলেন সৎ, সাহসী ও সহানুভূতিশীল। নগরজীবন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নির্মাণ করেছেন। যে-মধ্যবিত্ত বাংলার সমাজকাঠামোর প্রক্রিয়াগত কারণেই সর্বদা থাকে অস্থিতিশীল ও আতঙ্কগ্রস্ত। এদের যেমন সুযোগ থাকে বিত্তবান শ্রেণিতে নিজেকে যুক্ত করার, তেমনি আবার আশঙ্কা থাকে সবকিছু হারিয়ে নিম্নবিত্ত কিংবা বিত্তহীনের কাতারে শামিল হবার। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। উর্ধ্বমুখী হবার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন এবং নিম্নমুখী পতনকে রোধ করার দুশ্চিন্তায় এদেরকে গলদঘর্ম হতে হয়। ব্যক্তিগত ও জাতীয় ইস্যুতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সহজেই শঙ্কিত হয় এবং নিজেদের অবস্থান সংরক্ষণেও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের যেকোনো পরিবর্তন বা অভিঘাত এ শ্রেণিকেই সবচেয়ে আলোড়িত করে। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে এ শ্রেণি যেমন শিক্ষিত, উদার, মানবিক, সংস্কৃতিমনা, সুমার্জিত, প্রতিবাদী, পরিশ্রমী, নীতিবান, দেশপ্রেমিক তথা ত্যাগ-তিতিক্ষায় অগ্রণী থাকে; তেমনি যেকোনো সামাজিক সংকটে এরা পলায়নপর, সুযোগসন্ধানী, দ্বিধাগ্রস্থ ও স্বার্থের কানাগলিতে বন্দি হয়ে পড়ে। এ শ্রেণির মূল শেকড় প্রোথিত গ্রামীণ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও কৃষি কাঠামোতে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এদেশে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ ও লব্ধজ্ঞানে ভর করে চাকরিতে সম্পৃক্ত হওয়া– এসব কারণেই গ্রাম ছেড়ে সকলের শহর কিংবা রাজধানীতে আগমন শুরু হয়। ফলে গ্রামের যৌথপরিবার কাঠামোতে ভাঙনের সুর তোলে নগরকেন্দ্রিক একক পরিবার গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ভূমিনির্ভর অর্থব্যবস্থার বদলে চাকরি-ব্যবসায়নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পত্তন ঘটে। এ পুঁজিনির্ভর নাগরিকজীবন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন, আত্মীয়তার বন্ধন তথা জীবনের মেকি,কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা ও উন্মূল অবস্থাকে শওকতের কাছে কখনোই স্বস্তিকর মনে হয়নি। আবার অধীত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ষাটের দশকে বাঙালির মাঝে যে-জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটে– এতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকাই ছিল অগ্রণী। এ জাগরণই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

এ বিজয়-সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং ত্যাগ-তিতিক্ষায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান ছিল সর্বোচ্চ। অথচ মধ্যবিত্তের বহু রক্ত, অশ্রু ও জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধীনতা অর্জিত হলেও বাঙালির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অধরাই রয়ে যায়। একাত্তরের পরেই স্বাধীন দেশের মানুষ এক নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার

বিপ্রতীপে গড়ে ওঠে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী-পুঁজিপতি-অভিজাত শ্রেণি। জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রগতিশীল মানুষের স্বপ্ন ভেঙে যায়, বাঁচার অবলম্বন ও নিশ্চয়তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এ স্বাধীনতার সুফল চলে যায় বিত্তবান শ্রেণির হাতে। অথচ সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীগুলো একে একে দখল করে নেয় রাষ্ট্রকাঠামোর সকল উৎস। একাত্তর-পরবর্তী রক্ষীবাহিনী ও বাকশাল গঠন এবং সামরিক শাসন জারিসহ নানা বিপর্যয়ে মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। সময় ও সমাজকাঠামোর এ উল্টোরথযাত্রা ও ভয়াবহ সংকট অমোঘ নিয়তির মতো আঘাত হানে মধ্যবিত্তের ওপর। একাত্তর ও একাত্তর-পরবর্তী নানা বাস্তবতা মধ্যবিত্তের জীবন-মানসে বয়ে আনে বিচিত্র সংকট। এ বাস্তব ও বিভ্রমে সঙ্কটাপন্ন, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় নীলকণ্ঠ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্বে অবসিত মধ্যবিত্তের পরিচয় মেলে *যাত্রা*-র অধ্যাপক রায়হান, হাসান ও লীলা; *অপেক্ষা*-র আলী আকবর, শামীম ও মুকুট; *উত্তরের খেপ*- এর হায়দার ও জুলকারনাইন; *হিসাব নিকাশ*-এর সাজিদ, নুরুদ্দিন ও রীনা এবং *ঘরবাড়ি*-র আফজালের যাপিত জীবনে। এ জীবনকে ধরতে এবং নতুন দিকে মোড় ফিরতে শওকত এ শ্রেণিকে ভাষারূপ দিয়েছেন। স্বগোত্রীয় হয়েও এ মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি যে-নির্মোহ ও নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা একান্তই স্মরণযোগ্য।

ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনায় শওকত বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জীবন-জীবিকা, আচার-আচরণ-উচ্চারণ, বিশ্বাস-বিস্ময়, ভৌগোলিক পরিবেশের আবাহনে সমাজের অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিরায়ত শাসন-শোষণ, দমন-পীড়ন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এপিক রূপটি বিনির্মাণ করেছেন। প্রতিটি সমাজকাঠামোর রূপান্তরের পেছনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে চলিষ্ণু সময়। একটি জাতিগোষ্ঠীর জন্মকথার মৌল চারিত্র্যধর্ম প্রতিফলিত হয় ইতিহাসের পাতায়। শওকত ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ঘেটে জহুরির মতো তুলে এনেছেন বাঙালি জাতিসত্তার ঐতিহাসিক আত্ম-পরিচয়। ইতিহাসের অব্যাহত ভাঙাগড়া আর চড়াই-উৎরাইয়ের পথ ধরেই একটি ভূখণ্ডের জনমানস গড়ে ওঠে। কারণ দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ সময় ও মানুষের হাতে নির্মিত ইতিহাসের গর্ভে জন্ম নেয় এক একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্য, ভবিতব্য ও সম্ভাবনা। 'পাণ্ডববর্জিত বাংলা'-নামক এ ভূখণ্ডটি বহুকাল থেকেই বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বহিরাগত শক্তি দ্বারা শাসিত-শোষিত হয়ে এসেছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি, বৌদ্ধ, তুর্কি, পাঠান, ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের আগমন, আক্রমণ কিংবা আধিপত্যবাদী শাসনামল বাঙালির ঐতিহাসিক পরাধীনতারই অমোঘ সাক্ষী। হাজার বছর ধরে বাঙালির শোষিত হওয়া,পীড়িত হওয়া, বার বার ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়ানো– যা মধ্যযুগের মাৎস্যন্যায় থেকে সাতচল্লিশের দেশভাগ হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইতিহাসের এ শাশ্বত সত্য এবং অমানবিক বিষয়টি শওকতকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। তাই তিনি বাঙালির প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে এ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জীবন-জীবিকা, জনপদ, লোকাচার, বিশ্বাস-বিস্ময়, ভাব-ভাষা-ভাবনা, রাজা-প্রজার সম্পর্কের স্বরূপ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ধর্মের প্রভাব, অভিবাসন-যন্ত্রণা এবং সমাজসংকটের এপিক রূপটি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন।

দিগ্বিজয়ী ইসলামের অগ্রযাত্রায় তৌহিদি ইসলাম নয় বরং সুফিবাদের ইসলাম দ্বারাই এদেশীয় নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধরাই বেশি প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামের মূল স্পিরিট যে-সাম্যবাদ;যা এদেশের নিরাকার ব্রহ্মবাদের অনেকটা কাছাকাছি– তা এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাই বাঙালি মুসলিম ও তৌহিদি মুসলিম এবং তুর্কি শাসক ও তুর্কি দরবেশদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পরীলক্ষিত হয়। যা শওকত সমাজ জীবনের ক্রান্তিকাল (transition period) ও দুই শতাব্দীর সন্ধিকালে (juncture of two centuries) ক্ষমতার পালাবদলের প্রেক্ষাপটে ধরবার চেষ্টা করেছেন। বিজয়ীরা সর্বদাই বিজিতদের (পরাজিতদের) সম্পর্কে নীচ ধারণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এসেছে। এ ধারা অব্যাহত ছিল আর্য-তুর্কি থেকে ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস নির্মাণের প্রেক্ষাপটে নিম্নশ্রেণির মানুষের যে-সক্রিয় ও গৌরবময় ভূমিকা ছিল– এ কথাটি শওকত বার বার বলার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের এ অমোঘ সত্য ফকিরবিদ্রোহ, তিতুমিরের বিদ্রোহ, সিপাহিবিদ্রোহ, তেভাগা-বিদ্রোহ, স্বদেশি-আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও পাওয়া যায়। এ বাংলার অধিকাংশ বিপ্লব-বিদ্রোহই ধর্মের আবরণে সংঘটিত হয়েছে। তারপরেও নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে ধর্মীয় পরিচয় বড় না হয়ে বরং জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে উঠেছে। সময় ও সমাজের এ চেতনাবীজকে ধরতে এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের আশ্রয় নিতে শওকতকে বহুদূর পর্যন্ত যেতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের সংগ্রামের, শক্তির ও সম্ভাবনার জায়গাটি তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সমাজ-রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে এসব মেহনতি মানুষের মাঝে যে-সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চেতনার স্পিরিট ছিল– এ বোধ ও বিশ্বাসই শওকতের লেখার মূল শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের জায়গা। এসব মানুষের মধ্যে শোষকের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত লড়াই করে টিকে থাকার শক্তি সাহসের যে-ইঙ্গিত তিনি দেখিয়েছেন–তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। কারণ সুফি-পির-দরবেশদের তৎপরতা; মজনু শাহ, মুসা শাহ, ভবানী পাঠক, তিতুমির, কালুগাজী, কালু রায়, সত্যপির, সত্যনারায়ণ, বনবিবি, বনদেবী, বড় খাঁ গাজী, দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি, শীতলাদেবী, বাস্তুবিবি, বাস্তুদেবী ও শাহজালালের নামে প্রচারিত কিংবদন্তি; সিপাহিবিদ্রোহ, তিতুমিরের লড়াই ও কৃষকদের লড়াই– এসব ধর্মের নামে সংঘটিত হলেও এর সবই ছিল ব্রিটিশবিরোধী

সামাজিক ও রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের অংশ। প্রান্তজনদের এ সংগ্রামী চেতনাকেই তিনি ধরার চেষ্টা করেছেন এবং পরাজয়কে নয় বরং বিজয়কে কামনা করেছেন।

শওকতের স্বপ্নই ছিল সাধারণ মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যের উত্তরণ ঘটাবে এবং মর্যাদার আসন পাবে। এ লক্ষ্যেই তিনি ইতিহাসের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বীরপূজা (cult-worship) না করে, বরং নিম্নবর্গের মানুষের গৌরবময় প্রান্তসমূহ ও সংগ্রামী অধ্যায়কে ভাষারূপ দিয়েছেন। কারণ সব ইতিহাসই লেখা হয় শাসকশ্রেণির তত্ত্বাবধানে। যেখানে রাজা-রাজড়া, সামন্তশাসক, বিত্তবান ও ধনীশ্রেণিই স্থান পায়। এদের ভিড়ে নিঃস্ব-নির্ধন-গরিব- মেহনতি মানুষেরা অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃত নায়কেরা হারিয়ে যায়। এ হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, অনালোচিত-অনুল্লিখিত অধ্যায়কেই শওকত পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। এমন ব্যতিক্রমী ইতিহাসের পরিচয় মেলে *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর শ্যামাঙ্গ, বসন্ত দাস, শুদ্ধানন্দ, চেতনানন্দ, দীননাথ, মিত্রানন্দ, নিরঞ্জন, লীলাবতী, মায়াবতী, কৃষ্ণা, বিভাবতী ও কুসুম ডোমনীর মতো চরিত্রে। প্রায় আটশত বছরের অতীত মৃত্তিকামূলে শেকড়সঞ্চার করে তিনি সমকাললগ্ন সমাজ ও মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও অবয়বকে শনাক্ত করেছেন। বাঙালি সমাজ ও ইতিহাসের চিরায়ত সত্যভাষণ উন্মোচন ও উপস্থাপনায় শওকত একজন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

রাজনৈতিক সচেতনতা, নাগরিক জীবনবীক্ষা, তৃণমূলের সংঘশক্তির অন্বেষা, মধ্যবিত্তের স্বরূপ সন্ধান এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনা– শওকতের শিল্পমানসে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করলেও আসলে এ-পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা তাঁর জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে ছিল সর্বদাই উপরিতলের বিষয়। শওকতের জীবনদর্শনের মৌল অনুষঙ্গ যথার্থ অর্থে তিনটি: সমাজভাবনা, আধুনিকতা ও বাস্তববাদিতা। এসব বৈশিষ্ট্যসূত্রেই উপর্যুক্ত পাঁচটি প্রবণতা তাঁর শিল্পিসত্তায় প্রযুক্ত হয়েছে। সমাজভাবনা শওকতের জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ছিল এক বড় চালিকা-শক্তি। তিনি ছিলেন আগাগোড়াই একজন সময়সচেতন ও সমাজসচেতন সাহিত্য-শিল্পি। সময়ই শওকতকে লেখক হিসেবে তৈরি করে দিয়েছে। সমাজ-রাষ্ট্রীয়-বৈশ্বিক নানা সংকট এবং এর তাপ-চাপ লেখক শওকতের ঘর-মন-জানালার দুয়ার খুলে দেয়। তিনি নিছক শিল্প সৃষ্টির জন্য সাহিত্য রচনা করেননি,বরং সমাজ-স্বদেশ-মানুষের প্রতি এক ধরনের অঙ্গীকার থেকেই হাতে কলম তুলে নেন। এ অর্থে শওকত ছিলেন সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন-প্রত্যাশী ও গণমানুষের কল্যাণকামী লেখক। এ সমাজভাবনার সঙ্গে প্রযুক্ত ছিল শওকতের মানবপ্রীতির অনুষঙ্গ। মানুষের প্রতি অতলস্পর্শী (বিশেষত শ্রমজীবীদের প্রতি) ভালোবাসাই শওকতের লেখক সত্তার অভিষেক ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো, খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উত্থান,তাদের প্রতিবাদী চেতনায় ঘুরে দাঁড়ানো এবং শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম– এমন প্রবণতা ও শুভবোধই শওকতের লেখার সবচেয়ে বড় জায়গা। মাটি-মানুষ-সমাজের কল্যাণে তিনি এক ধরনের সৎ-সাহিত্য রচনা করেছেন। শওকতের কাছে মানুষই ছিল সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। মানুষের (নিম্নবর্গের) জীবনসংগ্রাম ও যুগযন্ত্রণা উপস্থাপনের পাশাপাশি এসব মানুষের মানবিক মর্যাদা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বদাই ছিলেন আন্তরিক ও আশাবাদী। এজন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল সংকট উত্তরণ ও মোকাবিলায় শওকত একধরনের স্বচ্ছদৃষ্টি ও প্রগতিশীল চেতনায় পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি সাহিত্যে একদিক তুলে ধরেছেন সামাজিক অবক্ষয়কে ; আবার অন্যদিকে মেলে ধরেছেন চলমান অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমজীবীদের প্রতিবাদের কথা। এভাবে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শওকত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এক সংগ্রামী চেতনার বীজ। সমাজমনস্ক শওকত রাষ্ট্রের বিদ্যমান সকল শোষণ-বৈষম্য-অন্যায়ের অবসানে একটি উদার , অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও মর্যাদাবান সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। কারণ মানুষ যেমন নিঃসঙ্গ, তেমনি একই সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের শত বন্ধনেও জড়িত। এই বন্ধনের সঙ্গেই সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রশ্নটিও যুক্ত। মানুষ যত বেশি এই দায়িত্ব অনুভব করে, দায়িত্ব পালন করে, এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তত বেশি মহৎ হয়ে ওঠে। শওকতের মধ্যেও আমরা এই মহত্তর জীবনবোধের পরিচয় পাই। সংগ্রামের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক, সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক, আর সুন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক কল্যাণের– এটিই ছিল শওকতের সমাজভাবনার বিষয়। যা একই সঙ্গে তাঁর শিল্পদর্শন কিংবা সাহিত্যাদর্শের মূলকথাও বটে।

বাস্তবতাবোধ শওকতের ঔপন্যাসিক প্রতিভার এক বিশিষ্ট লক্ষণ। বাস্তবতার ক্ষেত্রে শওকত প্রারম্ভকাল থেকেই কলাকৈবল্যবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র পথের অনুসারী ছিলেন। এ গোষ্ঠীর বাস্তবতার চেতনাতেও যে-ভাবালুতা, উচ্ছ্বাসময়তা, রোম্যান্টিকতা ও জাতীয় জীবনের মর্মমূলবিচ্ছিন্নতা অব্যাহত ছিল, সে-সম্পর্কে শওকত ছিলেন সর্বদা সতর্ক ও বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন। এসব বর্জনের প্রবণতা ও প্রণোদনাই শওকতের বাস্তবতাবোধকে করেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। যথার্থ ও নির্মোহ বাস্তবতা রূপায়ণে অপরিমেয় আকুলতা শওকতের মধ্যে ছিল। সমাজ ও জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং তজ্জাত অভিজ্ঞতাই ছিল শওকতের বাস্তববাদিতার প্রধান ভিত্তি। এ কারণেই আদর্শগত বাস্তব অবস্থান থেকে চালিত হয়ে জীবনসত্য প্রতিষ্ঠা নয়,বরং প্রকৃত বাস্তব জীবনের আলোয় ওইসব যাচাই করে নেওয়াই ছিল তাঁর শিল্পিস্বভাবের মৌলধর্ম। ভাবোচ্ছ্বাসমুক্ত জীবনবাস্তবতার শিল্পী শওকত অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার সমন্বয়সাধনে সর্বদাই ছিলেন সতর্ক ও

আন্তরিক। শওকত তাঁর লেখায় জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার ও ধরার চেষ্টা করেছেন । তিনি কখনো অনুমাননির্ভর ও ধার করা অভিজ্ঞতা থেকে কোনো কিছু লিখেননি। তিনি জীবন ও প্রতিবেশে যা নিকট থেকে দেখেছেন, যেভাবে দেখেছেন, ঠিক সেভাবেই তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। নিজে আগে মক্‌শো বা হেফ্‌জো করে, পরে অন্যকে শেখানোর মতো। সময়সচেতন, সমাজসচেতন ও জীবন-ঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে তিনি মানুষের জীবনকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি জীবনকে চেটে চেটে দেখেছেন– সবটাই একেবারে গলধঃকরণ করেননি। জীবনকে ধরার, বোঝার ও আত্মবিশ্লেষণে মনোযোগী হতেই তিনি বেশি সচেষ্ট ছিলেন। শওকত জীবনকে চেখে চেখে এর ঘ্রাণ ও স্বাদকে গ্রহণ করেছেন। শুধু মিষ্টি-মধু-অমৃতকে নয়, সেই সঙ্গে তিক্ত-কটু-অম্ল-বিষকে বাদ দেননি। ফলে তাঁর মতো সংবেদনশীল মানুষ যখন সামাজিক উৎকণ্ঠায় ও বিবর্তনে জীবনের কাহিনি লিখেন, তখন তা ব্যক্তি বিশেষের না থেকে সমষ্টির ভাজে ভাজে ও পরতে পরতে মিশে যায়। তা একের না হয়ে দশের জীবনানুভূতির বাস্তব দলিল হয়ে ওঠে।শওকত প্রত্যক্ষ বাস্তবতার কথাকার হিসেবে তাই জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন,ভাষার স্টাইলকে নয়। জীবন-যাপন ও শিল্পযাপনের মধ্যে তাঁর কোনো ফাঁকফোকর ছিল না। জীবনের মেকি, কৃত্রিম ও খাদ নয় বরং রূঢ়-নির্মম-নীরস বাস্তবতা রূপায়ণে শওকত ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাহিত্যের বাস্তবতা ও জীবনের বাস্তবতাকে তিনি সুন্দর ও সার্থকভাবে সমন্বয় করেছেন। ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন কিংবা সংকটের চিত্রনির্মাণের পরিবর্তে ব্যক্তিমানস ও সমাজজীবনে এসবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার চারিত্র্য-উন্মোচনই ছিল শওকতের শিল্পচেতনার বৈশিষ্ট্য। সমাজ ও জীবনের সত্য কেবল বহির্জগতে নেই, এর অধিষ্ঠান ব্যক্তির অন্তর্জগতেও। তাই সমাজবাস্তবতা ও মনোবাস্তবতা– উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ কিংবা সমন্বয় সাধনে শওকত আমৃত্যু অক্লান্ত ছিলেন।

আধুনিকতাবোধ শওকতের ব্যক্তিমানস ও শিল্পিসত্তার প্রাগ্রসর চেতনা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী। তাঁর আধুনিক মনন গঠনে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও আন্তর্জতিক সমস্যা-সংকট ,ইতিহাস- ঐতিহ্যপ্রীতি, মার্কসবাদে আস্থাস্থাপন এবং সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কিত সচেতনতা যেমন কার্যকর ছিল, তেমনি ব্যক্তিজীবনের কতিপয় নিদারুণ, কষ্টকর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাও জীবনের শাশ্বত সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছিল সহায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা,দাঙ্গার পাশবিকতা, দেশভাগের অসীম বেদনা শওকতের মনে জাগ্রত করে জীবনের নিরর্থকতা, শূন্যতা, নিষ্ফলতা এবং উন্মুলিত-অনিকেত সত্তার অনুভব। উপরন্তু অভিবাসী জীবনসংগ্রাম ,অপরিমেয় অর্থকষ্ট,সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নভঙ্গ–এসব কিছুর সম্মিলিত আক্রমণ-অভিঘাতে তিনি সর্বদাই ছিলেন ক্ষতবিক্ষত। অনিশ্চয়তা-নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত শওকতের আধুনিকতার চেতনা এভাবে বহির্বিশ্ব ও অন্তর্বর্তীজীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাতরঙ্গ ও টানাপোড়েনের সমন্বয়ে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যের বিষয়-নির্বাচন, আঙ্গিকভাবনা, উপকরণসংগ্রহ, চেতনার উদ্বোধন, নারীর মূল্যমান কিংবা মনোভঙ্গি– সর্বত্রই শওকতের আধুনিক জীবনবোধের লক্ষণ অতি স্পষ্ট। ইতিহাসজ্ঞান ও চর্চায় শওকতের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। কারণ ইতিহাসে যারা চিরদিন অপাঙ্‌ক্তেয়,অচ্ছুত-অবহেলিত ছিল; তাদেরকে বিত্তবানদের বিপরীতে গুরুত্ব দিয়ে, গৌরব দিয়ে, তিনি রূপায়ণ করেছেন।এসব সাব-অল্টার্নদের প্রতি তিনি যে-মমত্ববোধ দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহ অভিনন্দনযোগ্য। কারণ ইতিহাস যারা নির্মাণ করেন ,ইতিহাস যারা পাল্টে দেন– সেই গরিব শ্রমিক, শোষিত শ্রেণি রাজা-রাজড়াদের ভিড়ে ইতিহাসের পাতায় তেমন ঠাঁই পায় না। অথচ এরাই শারীরিকভাবে-মানসিকভাবে ইতিহাসের পথ নির্মাণে ও গতিপথ পরিবর্তনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। ব্যক্তিজীবনে শওকত ইতিহাসের নষ্টরাজনীতির শিকারে পরিণত হন। সঙ্গতকারণেই প্রচলিত ইতিহাসের ব্যাপারে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির ধরনও ছিল আলাদা। চল্লিশ দশকের উত্তাল রাজনীতি শওকতকে মানুষের জীবন,জগৎ,রাজনীতি,অর্থনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে নতুন করে ভাবার পরিসর তৈরি করে দেয়। কারণ একজন প্রগতিশীল লেখকের কাজই হলো যা কিছু প্রচলিত, যা কিছু প্রতিষ্ঠিত, যা কিছু প্রামাণিক এবং যা কিছু মানুষ এক রকম মেনে নিয়েছে– তা থেকে বাঁকবদল করা,নতুন মোড় নেয়া কিংবা অন্য কিছু প্রতিপাদ্য করা। যেমনটা মাইকেল মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ* কাব্যে এবং জন মিল্টন *প্যারাডাইস লস্ট*-এ যথাক্রমে রাম ও আদমকে বাদ দিয়ে রাবণ ও শয়তানকেই মহিমান্বিত করে রূপ দিয়েছেন।

শওকত তাঁর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসে ঠিক অনুরূপ কাজটি করেছেন। তিনি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস ,মিথ ও লোকপুরাণকে ভেঙে নতুন এক ডিসকোর্স পুনরাবিষ্কার করেছেন। হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস যে-শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে-ঘামে-রক্তে-ত্যাগ-তিতিক্ষায় গড়ে উঠেছে এবং গৌরবান্বিত হয়েছে– তা শওকতই প্রথম চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। তিনি শুধু একটি উপন্যাস রচনা করেননি, সেই সঙ্গে আমাদের জন্য একটি নতুন ঐতিহাসিক পরিচয়ও নির্মাণ করে দিয়েছেন। আবার উন্মথিত বিশ শতকের বাস্তবতা নির্মাণে শওকত যে-ভাষা ও শিল্প-আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, তা রীতিমতো এক বিদ্রোহ। সমকালের উপনিবেশ-সৃষ্ট জনবিচ্ছিন্ন কলাকৈবল্যবাদীদের ভাষায় সাহিত্য চর্চা না করে বরং জীবনমান মূল্যায়নে এক ধরনের স্বোপার্জিত বিশ্লেষণধর্মী গদ্য ভাষা নির্মাণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ট্র্যাডিশনাল রূপকল্পের অনুসারী হয়েও ডারউইন ও ফ্রয়েড প্রভাবিত সমাজের বিদ্যমান ধর্মবোধ, সংস্কার ও বিশ্বাসকে ভাঙায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। এ যুগ্ম-বৈপরীত্যের (binary-oppossition) ধারায় শওকতও ঋদ্ধ ছিলেন এবং নিজেকে প্রকৃত অর্থেই

একজন ‘কলমপোষা মজুর’-এ পরিণত করেছিলেন। যা দিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক ভাষিক-কাঠামোকেই আঘাত করেছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। তাঁর নির্মিত চরিত্রের অন্তর্চৈতন্যে প্রায় একই স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা পল্লবিত হতে দেখা যায়। এরাই এদিন ছুঁড়ে ফেলতে সক্ষম হবে বর্ণ ও শব্দপুঞ্জের রক্ত ও মজ্জায় মিশে থাকা ঔপনিবেশিক প্রভুদের জন্মান্ধ প্রেতাত্মা। এ অর্থে শওকত বাংলাসাহিত্যে একক, স্বয়ম্ভু এবং প্রায় নিঃসঙ্গ। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এ তিনি ইতিহাস-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে শিল্পের এক নবতর যাত্রার কথা বলেছেন। তিনি এখানে শুধু ক্লাসিক গুণমানমণ্ডিত ভাষাই নির্মাণ করেননি বরং ইতিহাসের অনালোকিত একটি জীবনকেও মূর্ত করে তুলেছেন। ইতিহাসের অন্তর্স্রোতে মানুষের যে-জীবনপ্রবাহ– সে-জীবন সমাজ থেকে, প্রেম-ভালোবাসা থেকে, আদর্শের জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এমন জীবনচিত্র তো শুধু তাঁর মতো একজন আধুনিক শিল্পীর পক্ষেই লেখা সম্ভব। শওকত তাঁর শিল্পমনস্কতা ও চেতনা দিয়ে বহু দূরের গন্তব্যে আমাদের পৌঁছে দেন।
বিশ শতকের আলোকিত মানুষ ছিলেন শওকত। সঙ্গতকারণেই সদর্থক ও ইতিবাচক নারীভাবনার দ্বারাও তিনি ঋদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে বিবেচনা করেননি, বরং তাঁর চেতনায় এক বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও নারীকে মূল্যায়নের সদিচ্ছা। তিনি মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করেছেন নারীর সামূহিক উন্নতি। নারী-পুরুষের ভেদ তিনি মান্য করেননি। নারীকে তিনি করতে চেয়েছেন পুরুষনিরপেক্ষ। বাঙালি নারীর ঘরে-বাইরের, দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান অব্যাহত সংগ্রামের যে-জায়গাটি সাধারণত পুরুষের চোখে পড়ে না– সেই অনালোকিত প্রান্তকেও শওকত দরদ দিয়ে বলিষ্ঠভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন। নারীকে তিনি কেবল ‘নারী’ হিসেবে দেখেননি, বরং বিবেচনা করেছেন সমাজের বিরাট অংশের কণ্ঠস্বর হিসেবে। বাঙালি সমাজ-ইতিহাসে নারীরও যে-গৌরবময় অতীত আছে, অবদান আছে– সেই সত্যের ও শক্তির জায়গাটি শওকত শনাক্ত করেছেন। তাঁর সৃজিত রাখী, লীলাবতী, অরুন্ধতী, গীতারাণী, ফুলবানু, নুরবানু, ফুলমতি ও আমিরণ প্রমুখ যেভাবে সমাজের বিদ্যমান শৃঙ্খলকে ভেঙে ও সংস্কারকে পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যায়– এমন দুঃসাহস ও দায়িত্ব নিয়ে অনেক নারীবাদী লেখিকাও লিখেতে পারেননি। মানবাধিকার, সাম্য, অধিকারচেতনা, জীবনাকাঙ্ক্ষা ও পরস্পর সহযোগ-বাসনা শওকতের নারীবাদী ভাবনার মৌল প্রত্যয়।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একটি বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল নাম শওকত আলী। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী ধারার কথাকার। বামপন্থী রাজনীতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল সমাজচেতনায় ছিলেন গভীরভাবে আস্থাশীল। তাঁর উপন্যাসে বামরাজনীতি ও মার্কসীয় সমাজচেতনার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে । শওকতের কথাসাহিত্যের অন্তর্স্রোতে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে তাঁর সুগভীর ইতিহাসজ্ঞান ও ঐতিহ্যচেতনা। সাহিত্যের বিষয়-নির্বাচনে তিনি যেমন নানামাত্রিক বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন, তেমনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব একটি বয়নরীতি। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় নিজস্ব রীতি,শক্তি,স্বকীয়তা ও সুষমার গুণে শওকত বহুযুগ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শওকতের সাহিত্য-সাধনার মূল বিষয় ছিল বঞ্চিত মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। বিশেষত সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে যারা উদ্বাস্তু ও প্রান্তিক হয়েছেন– এদের জন্য ছিল তাঁর সমবেদনা। তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী। বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের ওপর বাঙালির নৈতিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন; ধর্ম-ভাষা-জাত-পাতের ভিত্তিতে বাংলা ও বাঙালি বিভক্ত হতে পারে না। যে-ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা রাজনীতি একদিন বাংলাকে, বাংলার আত্মাকে, বাংলার মাটি ও মানুষকে ভাগ করেছিল– তা শওকত কখনোই মেনে নিতে পারেননি। গোটা দেশ ও জাতির এ মহাবিপর্যয়-উত্তরণে তিনি মনে-প্রাণে কামনা করেছেন বহুধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি (composit culture), উদার,অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজের প্রতিষ্ঠা।

শওকত জীবনের কথায় ও সাহিত্যের আদর্শে কখনো আপস করেননি। সম্মান, সৌভাগ্য,যশ-খ্যাতি ও অর্থবিত্তের পেছনেও তিনি ছুটেননি। সর্বদাই একজন ধ্যানীর মতো একাগ্রচিত্তে মানব-কল্যাণে সাহিত্য রচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ছিলেন অটল-অবিচল। মোটকথা জীবনের মোহের কাছে তিনি কখনো পরাজিত হননি। ‘বাংলাসাহিত্যে বহু প্রগতিশীল লেখকের আবির্ভাব গোখরা সাপের মতো হলেও মৃত্যুর সময় এরা প্রায়ই ঢোঁড়া সাপ হয়ে মরেন’। কিন্তু শওকত আগাগোড়া গোখরা সাপই ছিলেন। শওকত যুগন্ধর; কালের দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথকে ধারণ করেই তিনি শিল্পী। সমাজের রূপ-রূপান্তর, ক্ষমতার পালাবদল এবং সমাজচেতনার পরম্পরিত-সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর উপন্যাস এপিক-বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ। ব্যক্তি, শিক্ষক ও সাহিত্যিক– এ তিন পরিচয়েই শওকত ছিলেন সৎ,দায়িত্বশীল ও অঙ্গীকারবদ্ধ। যারা সময় ও সমাজের ভাঙাগড়ার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার পালাবদল এবং জাতীয় সংগ্রামে সাধারণ মানুষের শক্তির জায়গাগুলোর সুলুকসন্ধান করেন,ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্য থেকে ব্যক্তির অমিত শক্তি-সম্ভাবনা ও জাগরণকে আহরণ করেন–তাদের কাছে শওকত সর্বদাই পথপ্রদর্শক হিসেবে মূল্য পাবেন। দেশ ও জাতির প্রতি এমন দায়বদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিশীল পথিকৃৎ লেখকের প্রতিকৃতি আজো বিরল।

পরিশেষে বলা যায়, সকল প্রকার প্রলোভনমুক্ত,জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,মাটি-মানুষের কল্যাণকামী এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শওকত আলী সাহিত্য-সাধনায় ছিলেন গভীরভাবে সৎ,সহানুভূতিসম্পন্ন, আন্তরিক ও অক্লান্ত। তিনি ছিলেন

সর্বাংশে আধুনিকচেতনাসম্পন্ন, সমাজসচেতন, রাজনৈতিকবোধে ঋদ্ধ, ঐতিহ্যলগ্ন, প্রগতিশীল এবং নির্মোহ-নিরাসক্ত বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নৈষ্ঠিক রূপকার।

জীবনপঞ্জি

১৯৩৬	:	জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি; বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার উকিলপাড়ায়। এ রায়গঞ্জ ৪৭-এর দেশভাগের পূর্বে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলারই অংশ ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুর ভেঙে দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এবং ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর করা হয়েছে।
পিতামহ	:	সওহর আলী প্রধান (ইতোপূর্বে ভুলবশত 'গওহর আলী প্রধান' লেখা হয়েছে)।
পিতামহী	:	মাহেজাবিন বেগম ও চিনিজান (পিতামহ দুই বিয়ে করেছিলেন)।
মাতামহ	:	ওয়াদা মোহাম্মদ সরকার (রায়গঞ্জের পার্শ্ববর্তী খোশালপুরের অধিবাসী)।
পিতা	:	শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. খোরশেদ আলী সরকার। HMB পাশ করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।
মাতা	:	সালেমা খাতুন। শ্রীরামপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রিপ্রাপ্ত। পেশায় ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা।
বিমাতা	:	মনোয়ারা বেগম (১৯৫৩ সনে মহসিনা নামক এক মেয়েসহ এ বিধবাকে খোরশেদ আলী সরকার বিয়ে করেন)।
ভাই-বোন	:	মোহাম্মদ আলী সরকার।
	:	মর্জিয়ানা খাতুন ও সোফিয়া খাতুন ভুনি (যমজ বোন)।
	:	শওকত আলী (শওকতের দাদার বংশ পদবি 'প্রধান', দাদির বংশ পদবি 'শেখ' এবং মায়ের বংশ পদবি ছিল 'সরকার'। তাঁর পিতার আগ্রহে 'সরকার' পদবি পরিবারে গৃহীত হলেও শওকত আলী তা গ্রহণ করেননি)।
	:	রাবেয়া খাতুন (শৈশবে মৃত্যু)
	:	ওসমান আলী সরকার
	:	আব্দুর রোউফ
বৈমাত্রেয়	:	আমেনা বেগম তুলসী
	:	জুলফিকার আলী সরকার
	:	আমজাদ আলী সরকার দানী
	:	জাহানারা বেগম মণি
	:	মনসুর আলী সরকার দুলাল
	:	রওশন আরা পলি
	:	মমতাজ বেগম বাবু
ডাকনাম	:	চাঁদ (মায়ের রাখা নাম)
মূল নাম	:	মোহাম্মদ শওকত আলী
স্ত্রী	:	শওকত আরা বেগম ডলি
সন্তান	:	আরিফ শওকত পল্লব
	:	আসিফ শওকত কল্লোল
	:	গালিব শওকত শুভ
বাল্যশিক্ষা	:	শ্রীরামপুর মিশনারি স্কুল (প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি; ১৯৪১-১৯৪২)।
প্রাথমিক শিক্ষা	:	রায়গঞ্জ করোনেশন ইংলিশ হাই স্কুল (তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি; ১৯৪৩-১৯৫১)।

প্রিয় লেখক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, উইলিয়াম ফক্‌নার, লিও টলস্টয় ও জেমস জয়েস প্রমুখ।

প্রিয় বই : ইউলিসিস এবং ওয়ার এ্যান্ড পিস প্রভৃতি।

১৯৪৯ : মায়ের মৃত্যু (৩৮ বছর বয়সে)।

১৯৫১ : রায়গঞ্জ করোনেশন ইংলিশ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ এবং মোহসীন বৃত্তি লাভ।

: এ সময় 'নতুন সাহিত্য' নামক কলকাতার বামপন্থী পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয়।

১৯৫২ : ভারত বিভাগের কারণে ১৬ বছর বয়সে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সপরিবারে আগমন। দিনাজপুর শহরের কালীতলায় নতুন বসতি স্থাপন।

১৯৫৩ : দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ।

১৯৫৪ : বামপন্থী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক পদ লাভ।

: গভর্নর ইস্কান্দার মির্জার শাসনামলে ৯২/ক ধারায় গ্রেপ্তার হয়ে দিনাজপুর কারাগারে ৯ মাস বন্দি (মার্চ– ডিসেম্বর)।

: কারাগারে থাকাবস্থায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ, বরদা চক্রবর্তীর মতো খ্যাতিমান কমরেডদের সংস্পর্শ লাভ এবং

স্থানীয় আদিবাসী রাজবংশী, মুর্মু, গারো, মাহাতো, সাঁওতাল ও পোলিয়াদের সঙ্গে মেশার সুযোগ লাভ।

: এ সময় থেকেই লেখালেখির চেষ্টা

১৯৫৫ : দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে স্নাতক পাশ (কারাগারে থাকার প্রভাবে ৩য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন)।

১৯৫৬ : মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রথম লেখা হিসেবে *দূরভাষিণী* নামক গল্প প্রকাশ।

১৯৫৮ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এমএ পাশ (অনিয়মিত ব্যাচের ৩০ জনের মধ্যে ১৪তম স্থান অধিকার করে ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন)। সহপাঠী ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবু বকর সিদ্দিক।

: দিনাজপুরে ফিরে আসা

: অল্প সময়ের জন্য বীরগঞ্জ হাই স্কুলে শিক্ষকতা।

১৯৫৯ : ঠাকুরগাঁও কলেজে অধ্যাপনা শুরু।

১৯৬১ : ২৫ সেপ্টেম্বর শওকত আরা ডলির সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন।

: *মাহেনাও* পত্রিকায় *ব্রহ্মনাগ* নামক ছোটগল্প প্রকাশ। এটি তাঁর প্রথম দিকের রচনা। ২০১৬ সনে শওকত আলীর ছোট গল্পসমগ্রে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৬২ : *সমকাল* পত্রিকায় তাঁর *মুখর প্রান্তর* গল্পের ও *রক্তপদ্ম* নাটকের ওপর লেখা প্রবন্ধ পড়ে প্রফেসর অজিত গুহ মুগ্ধ হন এবং ৬২-এর ১ সেপ্টেম্বরে ৪০৩ টাকা বেতনে জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন (একটানা ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত)।

: *সমকাল* পত্রিকায় *চৈত্র-মেঘ* নামক গল্প প্রকাশিত।

১৯৬৩ : প্রথম উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* প্রকাশিত।

১৯৬৮ : প্রথম গল্পগ্রন্থ *উন্মুল বাসনা* প্রকাশিত।

: ছোটগল্প রচনায় মৌলিক অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ।

১৯৭১ : পিতা খোরশেদ আলী সরকারের মৃত্যু (স্থানীয় বিহারি ও পাক বাহিনীর দ্বারা)।

১৯৭৬ : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *যাত্রা* প্রকাশিত।

১৯৭৭ : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *যাত্রা* রচনার জন্য বাঙলাদেশ লেখক শিবির আয়োজিত হুমায়ুন কবীর স্মৃতি পুরস্কার লাভ।

: *লেলিহান সাধ* গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৭৯ : *টুনকো নামের হাতি নামক* শিশু-কিশোর গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত।

: *নীল পাহাড়ের গান নামক কিশোর* গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৮৪ : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাস প্রকাশিত।

: সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্য অজিত গুহ পুরস্কার লাভ।

১৯৮৫ : *অপেক্ষা* উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৮৬ : ষাট দশকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ অবলম্বনে *দক্ষিণায়নের দিন* উপন্যাস প্রকাশিত।

: ত্রয়ী উপন্যাস সিরিজের অংশ হিসেবে *কুলায় কালস্রোত* ও *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* প্রকাশিত (এ উপন্যাস তিনটি সাপ্তাহিক *বিচিত্রা'র* ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮-সনের ঈদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল)।

: *সম্বল* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *শুন হে লখিন্দর* গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত।

: শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে ত্রয়ী *দক্ষিণায়নের দিন*-এর জন্য ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

১৯৮৭ : বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার সহ-সম্পাদক পদে যোগদান।

: *গন্তব্যে অতঃপর* উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৮৮ : *ভালোবাসা কারে কয়* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *যেতে চাই* উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৮৯ : *ওয়ারিশ* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *শুন হে লখিন্দর* গল্পগ্রন্থের জন্য আলাওল পুরস্কার লাভ।

১৯৯০ : বাংলা উপন্যাস রচনায় মৌলিক অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় একুশে পদকে ভূষিত।

: *বাসর* ও *মধুচন্দ্রিমা* উপন্যাস প্রকাশিত।

: বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার সম্পাদক পদে যোগদান।

: সরকারি আনন্দমোহন কলেজে বদলি (তবে যোগদানের পূর্বেই অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি)

: সরকারি সংগীত কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগাদান।

১৯৯১ : *উত্তরের খেপ* উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৯২ : *প্রেমকাহিনী* উপন্যাস প্রকাশিত।

: শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে *উত্তরের খেপ*-এর জন্য দ্বিতীয়বার ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

: *পতন* উপন্যাস প্রকাশিত (পরে এর সঙ্গে *বিদায় নিরঞ্জন* নামক আরো একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসও যুক্ত করে দেয়া হয়েছে)।

: বগুড়া থেকে লিটল ম্যাগাজিন *নিসর্গ*-তে শওকত আলীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত।

১৯৯৩ : সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ।

: বাঙলাদেশ লেখক শিবিরে যোগদান (অষ্টম জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে)।

১৯৯৪ : *বাবা আপনে যান* ছোটগল্প গ্রন্থ প্রকাশিত।

: *ভিতরগড়ের তিন মূর্তি* নামক কিশোর উপন্যাস প্রকাশিত।

: *তিন বন্ধু* ও *প্রাচীন রাজবাড়ি* নামক কিশোর গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৯৬ : *অবশেষে প্রপাত* উপন্যাস প্রকাশিত।

: ১৬ ডিসেম্বর স্ত্রী শওকত আরা ডলির মৃত্যু (মাদ্রাজে চিকিৎসাধীন অবস্থায়)।

১৯৯৭ : বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির (১৯৯৭-২০০০) দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৯৮ : *হিসাব নিকাশ* উপন্যাস প্রকাশিত।

: সৈয়দ গোলাম মোর্তজা স্মৃতি পুরস্কার লাভ।

২০০০ : *দলিল* উপন্যাস প্রকাশিত (দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়)।

: বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি (২০০০-২০১০) নির্বাচিত (নবম জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে)।

চলচ্চিত্র : *উত্তরের খেপ* উপন্যাস অবলম্বনে শাহজাহান চৌধুরীর পরিচালনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। এতে অভিনয় করে চিত্র নায়িকা চম্পা ও নায়ক মান্না। অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ চম্পা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

২০০১ : *তনয়ার স্বীকারোক্তি* উপন্যাস প্রকাশিত ।

: *স্ববাসে প্রবাসে* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *জননী ও জাতিকা* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *জোড় বিজোড়* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *ঘরবাড়ি* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *শেষ বিকেলের রোদ* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *এক ডাইনীর গেঞুয়া খেলা* উপন্যাস প্রকাশিত।

২০০২ : *ছবির উপরে ছাপ* উপন্যাস প্রকাশিত।

২০০৩ : শওকত আলীর প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত।

: *পাকা দেখা* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *হাল গিরস্তি* উপন্যাস প্রকাশিত (১৯৮৯ সালে *বিচিত্রার* ঈদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত)।

: *ঘর সংসার* উপন্যাস প্রকাশিত (২০০২ সালের *সাপ্তাহিক ২০০০-এর* ঈদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত)।

: *নাঢ়াই* উপন্যাস প্রকাশিত (২০০২ সালে *সাপ্তাহিক* ২০০০-এর ঈদুল আজহার বিশেষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। বর্তমানে এ তিন অংশের সমন্বয়ে নাঢ়াই উপন্যাস গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে)।

২০০৪ : *তিন রকমের চেনাজানা* উপন্যাস প্রকাশিত (*তনয়ার স্বীকারোক্তি, জোড় বিজোড়* ও *স্ববাসে প্রবাসে*–এ তিনটিকে একত্রে প্রকাশ করা হয়)।

২০০৫ : *বসত* উপন্যাস প্রকাশিত।

: *স্থায়ী ঠিকানা* উপন্যাস প্রকাশিত।

২০০৬ : *দিনগুজরান* ছোটোগল্প গ্রন্থ প্রকাশিত।

: *দোলাচল* উপন্যাস প্রকাশিত (অগ্রন্থিত); ২০০৬ সালে প্রথম আলোর ঈদের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২০০৭ : *কাহিনী ও কথোপকথন* উপন্যাস প্রকাশিত।

২০০৮ : প্রথম উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* অবলম্বনে নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত ধারাবাহিক নাটক নির্মাণ করেন। যা বাংলা ভিশন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

: বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের *তৃণমূল* পত্রিকা সম্পাদনা (৮ম সংখ্যা; মার্চ, ২০০৮)।

২০০৯ : *অস্তাচলের আলো* ও *ঘরে যেতে চাই* নামক দুটি উপন্যাস একই মলাটে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

২০১১ : *মাদারডাঙার কথা* উপন্যাস প্রকাশিত (ফকির-সন্ন্যাসবিদ্রোহ ও অন্যান্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত)।

২০১৪ : ঢাকার প্রকাশনা সংস্থা বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে প্রথমবারের মতো বারো খণ্ডে শওকত আলী রচনাসমগ্র

প্রকাশ শুরু।

: একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির কলেজ বইয়ের পাঠ্যসূচিতে *কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ গল্প* অন্তর্ভুক্ত।

২০১৫ : হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

২০১৬ : শওকত আলী গল্পসমগ্র প্রকাশিত।

: রাজশাহী থেকে লিটল ম্যাগাজিন *গল্পকথা*-য় শওকত আলী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত।

: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে *দক্ষিণায়নের দিন* অন্তর্ভুক্ত।

: *দক্ষিণায়নের দিন* তিন খণ্ডের অখণ্ড সংস্করণ ঢাকার বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত।

২০১৮ : মৃত্যুঃ ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি./১২ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, রোজ- বৃহস্পতিবার, সকাল ৮.১৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায়।

: *বামন* নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত।

: *অবিস্মৃত স্মৃতি* নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত।

শওকত-রচনাবলি

ক.	উপন্যাস	:	*পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩)
		:	*যাত্রা* (১৯৭৬)
		:	*প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪)
		:	*অপেক্ষা* (১৯৮৫)
		:	*দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫)
		:	*কুলায় কালস্রোত* (১৯৮৬)
		:	*পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৮৬)
		:	*সম্বল* (১৯৮৬)
		:	*গন্তব্যে অতঃপর* (১৯৮৭)
		:	*ভালোবাসা কারে কয়* (১৯৮৮)
		:	*যেতে চাই* (১৯৮৮)
		:	*ওয়ারিশ* (১৯৮৯)
		:	*বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯০)
		:	*উত্তরের খেপ* (১৯৯২)
		:	*প্রেম কাহিনী* (১৯৯২)
		:	*পতন* (১৯৯২)
		:	*অবশেষে প্রপাত* (১৯৯৬)
		:	*হিসাব নিকাশ* (১৯৯৮)
		:	*দলিল* (২০০০)
		:	*জননী ও জাতিকা* (২০০১)
		:	*স্ববাসে প্রবাসে* (২০০১)
		:	*তনয়ার স্বীকারোক্তি* (২০০১)
		:	*জোড় বিজোড়* (২০০১)
		:	*ঘরবাড়ি* (২০০১)
		:	*শেষ বিকেলের রোদ* (২০০১)
		:	*এক ডাইনীর গেণ্ডুয়া খেলা* (২০০১)
		:	*ছবির উপরে ছাপ* (২০০২)
		:	*পাকা দেখা* (২০০৩)
		:	*নাঢ়াই* (২০০৩)
		:	*বসত* (২০০৫)
		:	*স্থায়ী ঠিকানা* (২০০৫)
		:	*দোলাচল* (২০০৬)
		:	*কাহিনী ও কথোপকথন* (২০০৭)
		:	*অস্তাচলের আলো* (২০০৯)
		:	*ঘরে যেতে চাই* (২০০৯)
		:	*মাদারডাঙার কথা* (২০১১)
খ.	ছোটগল্প	:	*উন্মুল বাসনা* (১৯৬৮)
		:	*লেলিহান সাধ* (১৯৭৮)
		:	*শুন হে লখিন্দর* (১৯৮৮)

	:	*বাবা আপনে যান* (১৯৯৪)
	:	*দিনগুজরান* (২০০৬)
	:	*বামন* (২০১৮)
	:	সাক্ষাৎ আর মার্জনার গল্প (২০২০)
গ. শিশুতোষ রচনা	:	*নীল পাহাড়ের গান* (১৯৭৯)
	:	*টুনকো নামের হাতি* (১৯৭৯)
	:	*ভিতরগড়ের তিন মূর্তি* (১৯৯৪)
	:	*তিন বন্ধু ও প্রাচীন রাজবাড়ি* (১৯৯৪)
ঘ. প্রবন্ধগ্রন্থ	:	*শওকত আলীর প্রবন্ধ* (২০০৩)
ঙ. আত্মজীবনী	:	*অবিস্মৃত স্মৃতি* (২০১৮)

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আকরগ্রন্থ (কালানুক্রমিক):

পিঙ্গল আকাশ ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, প্র.প্র মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬৩

যাত্রা ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, প্র.প্র বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬

প্রদোষে প্রাকৃতজন ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ঢাকা, জুন ২০১৫, প্র.প্র. দি ইউনিভার্সিটি প্রেস.লি.ঢাকা, ১৯৮৪

অপেক্ষা ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, আগস্ট, ২০১৬, প্র.প্র. কালান্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

দক্ষিণায়নের দিন ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, প্র.প্র. মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫

কুলায় কালস্রোত ; পূর্বোক্ত, প্র.প্র.মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬

পূর্বরাত্রি পূর্বদিন ; পূর্বোক্ত, প্র.প্র. মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬

সম্বল ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, আগস্ট ২০১৬, প্র.প্র.এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৬

গন্তব্যে অতঃপর ; পূর্বোক্ত , প্র.প্র. অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা,১৯৮৭

ভালোবাসা কারে কয় ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, প্র.প্র. নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৮

যেতে চাই ; শওকত আলী রচনা সমগ্র ,পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত; প্র.প্র. নওরোজ সাহিত্য সংসদ ,ঢাকা,১৯৮৮

ওয়ারিশ ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, প্র.প্র.বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯

বাসর ও মধুচন্দ্রিমা ; পূর্বোক্ত, প্র.প্র. বিদ্যাপ্রকাশ,ঢাকা, ১৯৯০

উত্তরের খেপ ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, প্র.প্র.বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

পতন ; পূর্বোক্ত, প্র.প্র.বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

অবশেষে প্রপাত ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, প্র.প্র.বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬

হিসাব নিকাশ ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, নবম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, প্র.প্র. বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

দলিল ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, প্র.প্র. বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

জননী ও জাতিকা ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, প্র.প্র. বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

স্ববাসে প্রবাসে ; পূর্বোক্ত, প্র.প্র. বিদ্যাপ্রকাশ, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

জোড় বিজোড় ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, দশম খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, প্র.প্র. এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

ঘরবাড়ি ; পূর্বোক্ত, প্র.প্র. এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

পাকা দেখা ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, বারো খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৯; প্র.প্র. ২০০৩

নাঢ়াই ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, নবম খণ্ড, পূর্বোক্ত; প্র.প্র.বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

বসত ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, প্র.প্র. বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫

স্থায়ী ঠিকানা ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, প্র.প্র. মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

মাদারডাঙার কথা ; শওকত আলী রচনাসমগ্র, বারো খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, প্র.প্র. নান্দনিক, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১

খ. শওকত আলী-বিষয়ক গ্রন্থ (কালানুক্রমিক):

মিল্টন বিশ্বাস :*শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস: প্রসঙ্গ রাজনীতি* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৩, জুন, ১৯৯৬

শাফিক আফতাব :*শওকত আলীর উপন্যাস : কলাকৌশল ও বৈশিষ্ট্য*; ভাষাচিত্র,ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

: *শওকত আলীর রাজনৈতিক উপন্যাস : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রকরণ* ; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

: *শওকত আলীর উপন্যাস : মুক্তিযুদ্ধ ও ঐতিহ্য*; গ্রাফোসম্যান, ঢাকা, ২০১৬

: *শওকত আলী: জীবন ও শিল্পের উন্মেষ*; জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

রাহেল রাজিব :*পাঠ উন্মোচনের খসড়া* ; রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

: *শওকত আলীর ছোটগল্প : বিষয় উন্মোচন ও ভাষার অন্তর্দেশ* ; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,২০১৪

চঞ্চল কুমার বোস :*শওকত আলীর কথাসাহিত্য: জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ*; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

অরিজিৎ ভট্টাচার্য : *ইতিহাসের আখ্যান*; এবং প্রান্তিক, বারাণাসী, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৭

তপোধীর ভট্টাচার্য : *কথাপরিসর : বাংলাদেশ*; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭

বেলাল বাঙালি(সম্পা.) : *কথাশিল্পী শওকত আলী : ব্রাত্যজনের কথক*; গণপ্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

গ. সহায়ক বাংলাগ্রন্থ (বর্ণ-ক্রমানুযায়ী) :

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*; এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, ৭ম প্রকাশ, ১৩৯৫

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*; ২য় সংস্করণ, পাঠক ভবন, কলকাতা, ১৯৬৮

অতুল সুর : *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, ২য় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৫

: *বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস*; জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬

অনিরুদ্ধ কাহালি : বাংলাদেশের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে; টুম্পা প্রকাশনী, ঢাকা,২০০৫

অমলেন্দু সেনগুপ্ত : *উত্তাল চল্লিশ–অসমাপ্ত বিপ্লব;* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯

অমিতাভ চক্রবর্তী : *সাম্প্রদায়িকতা : উৎস ও প্রসার;* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩

অরবিন্দ পোদ্দার : *আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ*; ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, ১৯৬২

: *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য বিচার*; উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮৫

অরূপকুমার ভট্টাচার্য : *আঞ্চলিকতা ও বাঙলা উপন্যাস*; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: *কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের নব্বই বছর : ১৮৯১–১৯৮০)* ; ডি.এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৮২

: *কালের প্রতিমা (বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর : ১৯২৩–১৯৮২)* ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১

অরুণকুমার সান্যাল (সম্পা.): *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস*; ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* ; অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১

: *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য* ; দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা,২০০৫

অশীন দাসগুপ্ত : *ইতিহাস ও সাহিত্য* ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, কলকাতা, ১৯৮৯

আকবর আলি খান : *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

: *পরার্থপরতার অর্থনীতি* ; ইউপিএল, ঢাকা, ১৪০৭
আকরম হোসেন সৈয়দ : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
: *প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য* ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭
: *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
আকিমুন রহমান : *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩
: *বিবি থেকে বেগম* ; অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০5
আখতার মুকুল এম.আর: আমি বিজয় দেখেছি ; ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, ১ম অনন্যা প্রকাশ ,ঢাকা,২০০৭
আজিজুর রহমান মল্লিক : *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান* (দিলওয়ার হোসেন অনূদিত); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২
আজিজুল হক : *নকশাল : তিরিশ বছর আগে এবং পরে* ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯
আজিজুল হক সৈয়দ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮
আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* ; মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩
আনোয়ার উল আলম : *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা* ; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩
আবুল কাসেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য* ; আহমদ পাবলিকেশন্স হাউস, ঢাকা, ১৯৮৯
আবু সয়ীদ আয়ুব : *পথের শেষ কোথায়;* দে'জ পাবলিশিং, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯২
আমিনুর রহমান সুলতান: *বাংলাদেশের উপন্যাস : নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০3
আলী রীয়াজ : *সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ;* অঙ্কুর প্রকাশনী,ঢাকা, ১৯৯৫
আহমেদ শাফায়েত : *ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা* ; অ্যাডেন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০
ইদ্‌রিস আলী মুহম্মদ : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
অ্যান্থনী মাসকারেনহাস : *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ* (রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী অনূদিত); ১ম বাংলা সংস্করণ ১৯৮৯, পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০5
কঙ্কর সিংহ : *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, প্রথম অনন্যা প্রকাশ, ১৯৯৭
কল্যাণ মিরবর : *বাংলাদেশের উপন্যাসে চার দশক;* রৌদ্র-ছায়া, কলকাতা, ১৯৯২
কামরুদ্দিন আহমদ : *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি;* স্টুডেন্ট্স পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬
: *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ* (২য় খণ্ড); ইনসাইড লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩৮২
কামাল হোসেন ড. : *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*; প্রথমা প্রকাশন,ঢাকা,২০১৬
কাবেদুল ইসলাম : *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস* (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ); মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯
ক্রিস্টোফার কডওয়েল : *ইলিউশ্যন এ্যান্ড রিয়ালিটি (বাস্তব ও বিভ্রম)*; অনুবাদক : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পপুলার লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৮২
কুণাল চট্টোপাধ্যায় : *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭
কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী : *বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ ;* বর্ণালী, কলকাতা, ১৯৮৯
খালেদ হোসাইন : *আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ ;* আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০
খোকা রায় : *সংগ্রামের তিন দশক* ; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬
গিয়াস শামীম : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২
গোপাল হালদার : *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা* (১ম খণ্ড); ৫ম মুদ্রণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৫
: *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা* (২য় খণ্ড); ৫ম মুদ্রণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৫
: *তেরশ পঞ্চাশ*; পুঁথিঘর, কলকাতা, প্র.প্র., ১৯৪৫
: *বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি* ; ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৬৩
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬
: *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ* ; অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা, ১৯৭৭
ছন্দশ্রী পাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে পরিবার ও সমাজ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯
জয়ন্ত ভট্টাচার্য : *বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম* ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৯৬
জয়া চ্যাটার্জী : *দেশভাগের অর্জন : বাংলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭* (আবু জাফর অনূদিত) ; প্রথম মাওলা প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬
জীবেন্দ্র সিংহ রায় : *কল্লোলের কাল* ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭

তপোধীর ভট্টাচার্য : *উপন্যাসের সময়* ; এবং মুশায়েবা, কলকাতা, ১৯৯১

তানভীর মোকাম্মেল : *মার্কসবাদ ও সাহিত্য* ; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে* ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১

: *উপন্যাসে নতুন ধারার খোঁজে* ; দে'জ পাবলিকেশন্স ,কলকাতা, ১৯৯৬

দেবীপদ ভট্টাচার্য : *উপন্যাসের কথা* ; জি.এ.ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২

ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.) : *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক* (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড); নতুন পরিবেশন প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৩

: *তেভাগা আন্দোলন* ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি কলকাতা, ২০০০

নরহরি কবিরাজ : *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা* ; মণীষা, কলকাতা, ১৯৮৬

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০

নূহ-উল-আলম লেনিন : *বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ ;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়: উপন্যাস রাজনৈতিক; রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯১

ফরস্টার ই.এম. : *আসপেক্টস্ অব দ্য নভেল (উপন্যাসের বিষয়-আশয়)*; অনুবাদক: সুব্রত বড়ুয়া, নান্দীপাঠ, ঢাকা, ২০০৩

ফরিদা সুলতানা : *বাংলাদেশের উপন্যাসের জীবনচেতনা* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

ফয়েজ আহমদ : *আগরতলা মামলা: শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* ; সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

ফাতেমা কাওসার : *বাংলাসাহিত্যের কথকতা*; আফসার ব্রাদার্স,ঢাকা,২০০৩

বদরুদ্দিন উমর : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক* ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৯

: *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*; ঢাকা, ১৯৮৭

: *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি* ; চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬

: *ধর্ম সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা* ; চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭

: ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ; নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

: *যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ* ; আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪

: *যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ* ; আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪

বদরুল হাসান : *উনিশশতক: নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস* ; জগৎমাতা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০

বশীর আল হেলাল : *একাত্তরের গণহত্যা : হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট* (মূল উর্দু থেকে অনুবাদ); দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

বিজিত কুমার দত্ত : *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস* ; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৩

বিনয় ঘোষ : *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ* ; অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০

: *বাংলার নবজাগৃতি* ; ওরিয়েন্ট লংম্যান লি. কলকাতা, ১৯৯৩

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

: *বাংলা সাহিত্যপাঠ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

বীরেন্দ্র দত্ত : বাংলা কথাসাহিত্যের একাল; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮

বেগম আকতার কামাল (সম্পা.): *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব* ; অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৪

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *দেশবিভাগ: পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী ;* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৯৩

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

: *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

: *কথাশিল্পের কথামালা: শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর* ; অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৭

ভূইয়া ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসের সমাজচিত্র*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

মওদুদ আবদুল : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর* ; নওরোজ কিতাবিস্তান; ঢাকা, ১৯৬৯

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাংলার উপন্যাস* ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫

মফিদুল হক : *দেশভাগ,সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা* ; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২

মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি ;* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪

: *বিএনপি : সময়-অসময় ;* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

: *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭১;* প্রথমা প্রকাশন,ঢাকা,২০১৬

: *আওয়ামী লীগ : যুদ্ধদিনের কথা* ; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,২০১৭

মাঈদুল হাসান : *মূলধারা : ৭১;* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬

: *উপধারা একাত্তর : মার্চ - এপ্রিল ;* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,২০১৫

মালেকা বেগম : ইলামিত্র : *নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী;* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,২০১৩

মুনতাসীর মামুন : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ; মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা, ১৯৭৫

: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়া; মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা, ১৯৯৯

: *বাংলাদেশ: নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ (১৭৬৩-১৯৫০)* ; কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বাংলাদেশের সাহিত্য* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

মেহেদী হাসান মোহাম্মদ: *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন* ; মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

: *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা: বিভাগোত্তর কাল* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

যতীন সরকার : *পাকিস্তানোত্তর পূর্বপাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা* ; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

রঙ্গলাল সেন : *সমাজকাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র* ; নিউএজ পাবলিকেশন্স প্রা.লি,ঢাকা,২০০১

রণজিৎ গুহ : *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.); আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি কলকাতা, ১৯৯৯

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ* ; কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

: *সত্যেন সেনের উপন্যাস;* আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

: *শতবর্ষে বাংলা উপন্যাস* ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১

রাইছ উদ্দিন খান কে.এম. : *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা* ; খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯

রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় : *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান* ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ; কলকাতা, ২০০৫

রেজাউল করিম খন্দকার: *বাংলা উপন্যাসে বিধবা* ; মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

রেজাউল হক মুহম্মদ : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

রেহমান সোবহান : *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য* ; প্রথমা প্রকাশ, ঢাকা ২০১৭

র‌্যাল্‌ফ ফক্স : *নভেল অ্যান্ড দ্য পিপল* (অনুবাদ: সর্বজিৎ সেন ও সিদ্ধার্থ ঘোষ); পপুলার লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৮০

লায়েক আলি খান : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র; সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০

: রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা; সৃজন, মেদিনীপুর, ২০০৫

: প্রসঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

লিও টলস্টয় : *শিল্পের স্বরূপ* (অনুবাদ: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) ; পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮১

শহিদুল ইসলাম : *দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়* ; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা,২০০৮

শহীদ ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য* ; অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

শান্তনু কায়সার : *বাংলাদেশের উপন্যাসের ঐতিহ্যপাঠ*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

শামসুজ্জামান খান : *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮

শামসুল হক মুহাম্মদ : *স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি : আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি;* বলাকা, ঢাকা, ২০০৯

শাহরিয়ার কবির : *বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক চালচিত্র* ; পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩

শাহীদা আখতার : *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* ; মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৮৮

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : *পঞ্চাশের মন্বন্তর* ; বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪

শৈলেশকুমার বন্দ্যো. :*দাঙ্গার ইতিহাস* ; কলকাতা,১৯৯২, ১ম বাংলাদেশ সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : *ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা ;* উৎস মানুষ সংকলন,কলকাতা,১৯৯৩

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* ; সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭১

: *বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস: উত্তর প্রসঙ্গ ;* কলকাতা, ১৯৮৬

সাইফুজ্জামান গাজী মোহা. : *বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ* ; মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

সাঈদ-উর রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা* ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩

: *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

সারোয়ার জাহান : *বাংলা উপন্যাস: সেকাল-একাল*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

সালাহউদ্দীন আহমদ : *বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ*; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯১

: *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* ; সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

সাহেদা বেগম : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জেরা ও জবানবন্দি; গতিধারা,ঢাকা, ১৯৯৮

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১, ৩ খণ্ডে); এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

সুপ্রকাশ রায় : *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস;* ডি.এন.বি.এ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭০

: *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* ; ডিএন বিএ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৯

সুবোধ চৌধুরী : *সাহিত্য–শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব;* জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৯৯

সুলতানা নাহার : *সংখ্যালঘু সম্প্রদায়;* ঢাকা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৪

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গো. : *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য;* বসুধারা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৭

হরিশংকর জলদাস : *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজীবন;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

হাননান মোহাম্মদ : *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস: প্রসঙ্গ ও শৈলী;* সুদীপ্ত অয়ন, ঢাকা, ২০১০

: *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস;* স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯২

: *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : ১৮৩০-১৯৭১;* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

: বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: ১৯৭২-২০০০; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

হাবিবুর রহমান মুহাম্মদ : *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ ;* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি : ১৯৭১-২০১১; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

হারুন-অর-রশিদ : *আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফার ৫০ বছর*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬

হারুনুর রশীদ : *রাজনীতি কোষ* ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা* ; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮১

হাসান হাফিজুর রহ.(সম্পা.): *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল-পত্র* (প্রথম-পঞ্চদশ খণ্ড); হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : *উদ্বাস্তু* ; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০

হীরেন চট্টোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত;* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

হুমায়ুন কবির : *বাঙলার কাব্য;* দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুরঙ্গ, কলকাতা, ১৩৬৫, ১ম শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

হোসেনউদ্দীন হোসেন (সম্পা.) : *বাংলার বিদ্রোহ* : ৬০০-১৯৪৭ ; ১ম খণ্ড, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

ঘ. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ (বর্ণ-ক্রমানুযায়ী) :

অনন্ত মাহফুজ : *ওয়ারিশ থেকে উত্তরের খেপ; উত্তরাধিকার* ,শামসুজ্জামান খান(সম্পা.),*বাংলা* একাডেমি , ঢাকা, আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

অনীক মাহমুদ : *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও শওকত আলীর যাত্রা*; সরকার আশরাফ(সম্পা.) *নিসর্গ*; শওকত আলী সংখ্যা, বর্ষ-৭,সংখ্যা-১, বগুড়া, চৈত্র ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

আকরম হোসেন সৈয়দ : *'বাংলাদেশে', বাংলাদেশ;* মনসুর মুসা (সম্পা.) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭১

: *বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা,প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস;* অরুণ সান্যাল (সম্পা.) ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯১

: বাংলাদেশের উপন্যাস: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা; বাংলাসাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

আকাশ এম.এম. : *সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : ১৯৪৭-৭১; বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১); সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *অর্থনৈতিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৩

আজিজুল হক সৈয়দ : *এক মানবীমনের পিঙ্গল আকাশ*; চন্দন আনোয়ার (সম্পা.) *গল্পকথা;* শওকত আলী সংখ্যা, বর্ষ-৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী, মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

আনোয়ার হোসেন সৈয়দ : *বাঙালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি; বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

আবু জাফর শামসুদ্দিন : *বাঙালীর আত্মপরিচয় : আবহমান বাংলা*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আবু বকর সিদ্দিক : *শওকত স্মৃতি;* সরকার আশরাফ (সম্পা.) *নিসর্গ* ; বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *বাংলাদেশের সাহিত্য : রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি; বাংলাদেশের সাহিত্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

আহমেদ মাওলা : *শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন* ; আবুল হাসনাত (সম্পা.) *কালি ও কলম,* বর্ষ-১৫, সংখ্যা-২, ঢাকা, চৈত্র ১৪২৪/মার্চ, ২০১৮

করিম কে . এম. : *নবাবী আমলের সমাজকাঠামো: বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১); *সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৩

কায়েস আহমেদ : *শওকত আলীর গল্প : একটি পুনর্বিবেচনা* ; সরকার আশরাফ (সম্পা.) *নিসর্গ;* পূর্বোক্ত, চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

জাকির তালুকদার : *শওকত আলী : পথিকৃৎ লেখকের প্রতিকৃতি;* আবুল হাসনাত (সম্পা.) *কালি ও কলম* ; পূর্বোক্ত, ঢাকা, চৈত্র, ১৪২৪/মার্চ, ২০১৮

জুলফিকার মতিন : কথাসাহিত্যিক শওকত আলী: প্রেক্ষিত ও প্রবণতা; সরকার আশরাফ (সম্পা.) নিসর্গ; পূর্বোক্ত, চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

তপন কুমার রায় : *শওকত আলীর উপন্যাস : দেশকাল* ; চন্দন আনোয়ার (সম্পা.),*গল্পকথা;* পূর্বোক্ত, রাজশাহী, মাঘ ১৪২২/ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

তপোধীর ভট্টাচার্য : *প্রদোষে প্রাকৃতজন : আখ্যানে নরক-দর্শন;* চন্দন আনোয়ার (সম্পা.) *গল্পকথা* ; পূর্বোক্ত, মাঘ, ১৪২২/ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বজলুল করিম বাহার : *মাটি-মানুষের তন্নিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক লেখক শওকত আলী;* সরকার আশরাফ (সম্পা.) *নিসর্গ* ; পূর্বোক্ত, চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার : *মাদারডাঙার কথা : আগ্রাসী রাষ্ট্রায়নের বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনজাতির উত্থানের মহাকাব্যিক উপাখ্যান;* চন্দন আনোয়ার (সম্পা.),*গল্পকথা* ; পূর্বোক্ত, মাঘ, ১৪২২/ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ : পটভূমি ঢাকা; বাংলাদেশের সাহিত্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *রাজনৈতিক সংস্কৃতি : জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা* ; পাক্ষিক জনকণ্ঠ, ঈদসংখা, ২০০৩

মঞ্জুরুল ইসলাম সৈয়দ : *সচেতন ধারার উপন্যাস : প্রদোষে প্রাকৃতজন;* নাঈম হাসান (সম্পা.) *নিরন্তর,* ২য় সংখ্যা, বর্ণ মিছিল ঢাকা, ১৩৯২

মাহবুবুল হক : *প্রদোষে প্রাকৃতজন; মাসিক উত্তরাধিকার,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আশ্বিন, ১৪১৮

মিনার মনসুর : *সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি; আবহমান বাংলা,* মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৩

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : *বাংলাদেশের উপন্যাস; বাংলাদেশের সাহিত্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

রবীন্দ্র গুপ্ত : *দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য* ; মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) কলকাতা, ১৯৮৯

রাহেল রাজিব : *প্রদোষে প্রাকৃতজন : ইতিহাসের অনুপাঠ;* কালি ও কলম ; ঢাকা, মার্চ, ২০০৯

রেহমান সোবহান : *বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি: বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড,*অর্থনৈতিক ইতিহাস;* সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

শহীদুল্লাহ মুহম্মদ : *বাংলাদেশ : বাঙালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (অভিভাষণ); মুস্তাফা নূরউল ইসলাম(সম্পা.), সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০

শান্তনু কায়সার : *অতীতের দর্পণে সমকাল : ইতিহাস ও উপন্যাসের যোগাযোগ* ; সরকার আশরাফ (সম্পা.) *নিসর্গ; পূর্বোক্ত,* চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : *দেশভাগ-দেশত্যাগ;* অনুষ্টপ, কলকাতা, ১৯৯৪

সরকার আব্দুল মান্নান : *প্রদোষে প্রাকৃতজন : ধ্রুপদী ভাষ্যে দূরবর্তী জীবন;* আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম,* পূর্বোক্ত, চৈত্র, ১৪২৪/মার্চ, ২০১৮

সাধন চট্টোপাধ্যায় : *ইতিহাসের লড়াই বা লড়াইয়ের ইতিহাস : শওকত আলীর নাঢ়াই;* চন্দন আনোয়ার (সম্পা.), *গল্পকথা;* পূর্বোক্ত, মাঘ, ১৪২২/ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

সালাহ্‌উদ্দিন আহমেদ : *উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান: শিক্ষা-সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা; আবহমান বাংলা,* মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৩

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: *সাতচল্লিশের অভিমুখে; বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে;* মুস্তাফা নূরউল ইসলাম(সম্পা.), সাগর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯০
সুশান্ত মজুমদার : *শওকত আলীর গল্পে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার জীবনবেদ;* আবুল হাসনাত (সম্পা.) কালি ও কলম , পূর্বোক্ত, চৈত্র, ১৪২৪/মার্চ, ২০১৮
হরিপদ দত্ত : *অনার্য্য ভূমের কথক শওকত আলী*; সরকার আশরাফ (সম্পা.) *নিসর্গ* ; পূর্বোক্ত, চৈত্র ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২
হাসান আজিজুল হক : *শওকত আলী বন্ধুবরেষু*; সরকার আশরাফ(সম্পা.), *নিসর্গ* ; পূর্বোক্ত, চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২

ঙ.সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ (বর্ণ-ক্রমানুযায়ী) :

Alfred Adler : *Understanding Human Nature* ; tr.by W.Beran Wolfe, ,Fawcett World Library, New York ,1961
Archar K. Blood : *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*; UPL, Dhaka, 2002
A.R Siddiqui : *The Endgame : An Outlookers Journal 1969–1971*; Oxford University press, Pakistan, 2006
B.N. Pandey : *The Break-up of British India*; Macmillan Qco. Ltd. Lond,1969
Ben Kiernan : *Blood and Soil: A World History of Genocide and Extamination form Sparta to Darfur*; Yale University Press, New Haven and London, 2007
C.H. philips and Mary Doreen(ed.): *The Partition of India : Policies and Perpectives 1935-1947;* George Allen and Unwin Ltd. London, 1970
G.W Chaudhury : *Last Days of United Pakistan*; Oxford University press,Pakistan 1974
Georg Lukacs : *The Historical Novel* (tr.from the German by Hannah and stamley Mitchell); Merlin press, London,1962
Hasan Zahir : *The Separation of East Pakistan : The Rise and Realisation of Bengali Muslim Nationalism;* Oxford University Press, London 1994
Harun-Or-Rashid : *Inside Bengal Politics: 1936–1947–Unpublished Correspondence of Partition Leaders*; UPL, Dhaka, 2003
Maulana Abul Kalam Azad : *India Wins Freedom;* Orient Longman, Delhi, 1960
Mushirul Hasan(ed.): *India's Partition: Process, Strategy And Mobilization* ; Oxford University Press, Delhi, 1993
Niaz Zaman : *A Divided Legacy*; The University press Ltd. Dhaka;1999
Nirad C.Chaudhury: *The Autobiography of An Unknwon India* ; Macmillan and Qco. Ltd. London, 1951
Pamela Hicks : *Daughter of Empaire:Life As A Mountbetten;*London, 2012
Rehman Shobhan : *From Two Economies to Two Nations : My Journey To Bangladesh;* The Daily Star, Dhaka 2015
Roland N.Stromberg: *Realism, Naturalism, and Symbolism* (Modes of thought and expression in Europe; 1848-1914), Macmillan, London; 1968
S.K Chakraborti : *The Evolution of Politics in Bangladesh 1947-1978;* Associated publishing House; Delhi, 1978
Serajul Islam Choudhury : *Middle Class and the Social Revoloution in Bengal: An Incomplete Agenda* ; UPL, Dhaka, 2002
Siddiq Salik : *Witness to Surrender*; UPL, Dhaka,1977
Sigmund Freud : *An Outline of psychoanalysis*; (tr.) by James trachey,W.W Norton and company Inc. New York, 1963
: *Three Essays on the Theory of Sexuality*, (tr.) and (ed.) James Starchey London; 1962
Shila Sen : *Muslim politics in Bengal 1937–1947*; New Delhi;1976

Dhaka University Institutional Repository

Urvashi Butania : *Partition : The Long Shadow*; VKG2, India, 18 March, 2015
: The Otherside of Silence: Voices from the partition of India ; Panguin Random House, India 23 August, 2017
W.W Hunter : *The Indian Musalman*;Bangladesh first edition ,W.Rahman, Dhaka, 1975

চ. সহায়ক ইংরেজি প্রবন্ধ (বর্ণ-ক্রমানুযায়ী) :

B.R Nanda : *Nehru*: *The Indian National Congress and The Partition of India 1935-1937*; C.H.Philips and Mary Doreen (ed.), London, 1970
Leonard A. Gordon: *Divided Bengal : Problems of Nationalism and Identity in the 1947 Partition*; Mushirul Hasan (ed.), Delhi, 1993
Z.H. Ziadi : *Aspects of the Devolopment of Muslim League Policy1937-1947;*C.H Philips and Mary Doreen (ed.), London, 1970

ছ. সহায়ক পত্রিকা (বর্ণ-ক্রমানুযায়ী) :

আকরম হোসেন সৈ. (সম্পা): *উলুখাগড়া* (সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক); সংখ্যা-১৬, ঢাকা, আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/সেপ্টেম্বর, ২০১২
আনু মুহাম্মদ (সম্পা.) : *তৃণমূল;* সংখ্যা-৪, বাঙলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৮
আবুল হাসনাত (সম্পা.): *কালি ও কলম* (সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা); সংখ্যা-২, বর্ষ-১৫, ঢাকা, চৈত্র, ১৪২৪/মার্চ, ২০১৮
ইকবাল কাজী (সম্পা.) : *তৃণমূল* (শওকত আলী সংখ্যা); সংখ্যা-১১, বাঙলাদেশ লেখক শিবির,ঢাকা,জুলাই, ২০১৯/শ্রাবণ, ১৪২৬
ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ (সম্পা.): *সাম্প্রতিক দেশকাল* ; সংখ্যা ১২-৬২,বর্ষ-৪ ও ৫, ঢাকা, আষাঢ়, ১৪২৪/জুন, ২০১৮
গোলাম মোর্তোজা (সম্পা.) : *সাপ্তাহিক;* সংখ্যা-৩৪, বর্ষ-১০, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
গোলাম সারোয়ার মোহা.(সম্পা.) : *আমাদের সময়* ; ঢাকা, ঈদ সংখ্যা-২০১৮
চন্দন আনোয়ার (সম্পা.) : *গল্পকথা* (শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৬, সংখ্যা-৭, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
নঈম নিজাম (সম্পা.) : *বাংলাদেশ প্রতিদিন;* ঢাকা, ঈদ সংখ্যা- ২০১৮
পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা(সম্পা.) : *ভাষা-সাহিত্যপত্র*; সংখ্যা-৩৪, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/জুন, ২০০৮
বিমল গুহ (সম্পা.) : *পান্থজনের সখা*; সংখ্যা-৫ ও ৬,বর্ষ-৫, ঢাকা, আশ্বিন-পৌষ ১৪২৫/সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৭
ভীষ্মদেব চৌধুরী(সম্পা.) : অন্তর্দেশ (সহিত্য এবং জগৎ-জীবন বিষয়ক ষাণ্মাসিক); বর্ষা সংখ্যা-১৪২১, ঢাকা, জুন-আগস্ট, ২০১৪
: *অন্তর্দেশ* ; পূর্বোক্ত, বসন্ত সংখ্যা- ১৪২১, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল, ২০১৫
শওকত আলী (সম্পা.) : তৃণমূল; সংখ্যা-৮, বাঙলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা, মার্চ,২০০৮
শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) : মাসিক উত্তরাধিকার; বাংলা একাডেমি , ঢাকা, আশ্বিন, ১৪১৮
শাহাদাৎ চৌধুরী (সম্পা.) : *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ; সংখ্যা-৩৭, বর্ষ-১৭, ঢাকা, ২৮ মাঘ, ১৩৯৫/১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯
সরকার আশরাফ (সম্পা.) :*নিসর্গ* (শওকত আলী সংখ্যা); বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, বগুড়া, চৈত্র, ১৩৯৮/মার্চ, ১৯৯২
সুস্মিতা চক্রবর্তী (সম্পা.) : *চন্দ্রাবতী* (নারী বিষয়ক ছোট কাগজ); সংখ্যা-১, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

ঙ. প্রাসঙ্গিক অভিধান/পরিভাষাকোষ (বর্ণ-ক্রমানুযায়ী) :

অশোক মুখোপাধ্যায় (সংকলক) : *সংসদ সমার্থক শব্দ কোষ* ; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯০
আব্দুল হাকিম খান বাহাদুর (সম্পা.) : *বাংলা বিশ্বকোষ* (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড); নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২-১৯৭৬
আশফাক-উল আলম ও অন্যান্য (সম্পা.) : *বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শরীফ (সম্পা.) : *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*; বাংলা একাডেমি ,ঢাকা,১৯৯২

এনামুল হক মুহম্মদ (সম্পা.) : *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

কাইউ মো. আ. ও রাজিয়া সুলতানা (সং. ও সম্পা.) : *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাভাষার অভিধান* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০০৭

কবীর চৌধুরী : *সাহিত্য কোষ* ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪

দুলাল চৌধুরী : *লোক সংস্কৃতি : পরিভাষা*; রূপসী বাংলা, কলকাতা, ২০০২

ফরহাদ খান : *প্রতীচ্য পুরাণ*; প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪

মনজুরুর রহমান (সম্পা.) : *ঐতিহাসিক অভিধান*; বাংলা একাডেমি,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,আষাঢ় ১৩৭৮/জুলাই ১৯৬৭

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পা.) : *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (১ম ও ২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ২০১১

রাজশেখর বসু (সংকলিত) : *চলন্তিকা;* এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি. পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৯

: *রামায়ণ*; এম.সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৯৪

: *মহাভারত*; এম.সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৯৬

শহীদুল্লাহ মুহম্মদ (সম্পা.) : *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*; বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত) : *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*; সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ঊনবিংশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৫

সরদার ফজলুল করিম : *দর্শনকোষ* : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) : *বাংলা পিডিয়া* (সমগ্র খণ্ড),বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) : *পৌরাণিক অভিধান* ; এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি. পঞ্চম সংস্করণ ,কলকাতা, ১৩৯২

সুবলচন্দ্র মিত্র (সংকলিত) : *সরল বাংলা অভিধান*,নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা.লি. অষ্টম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯১

সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.) : *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬

সেলিনা হোসেন ও নূরুল হুদা (সম্পা.) : *চরিতাভিধান*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : *রাজনীতির অভিধান* ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, ১৯৯৭

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম ও ২য় খণ্ড); সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লি, ১৯৭৫

হারুন রশিদ মোহা.(সম্পা.) : *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

Sally Wehmeier (ed.) : *Oxford Advanced Learner's Dictionary*; Oxford UniversityPress, London, Sixth edition , 2002-2003

Zillur Rahman Siddiquie (ed.) : *English–Bangla Dictionary*;Bangla Academy, (First edition) : August, 1993

Dhaka University Institutional Repository

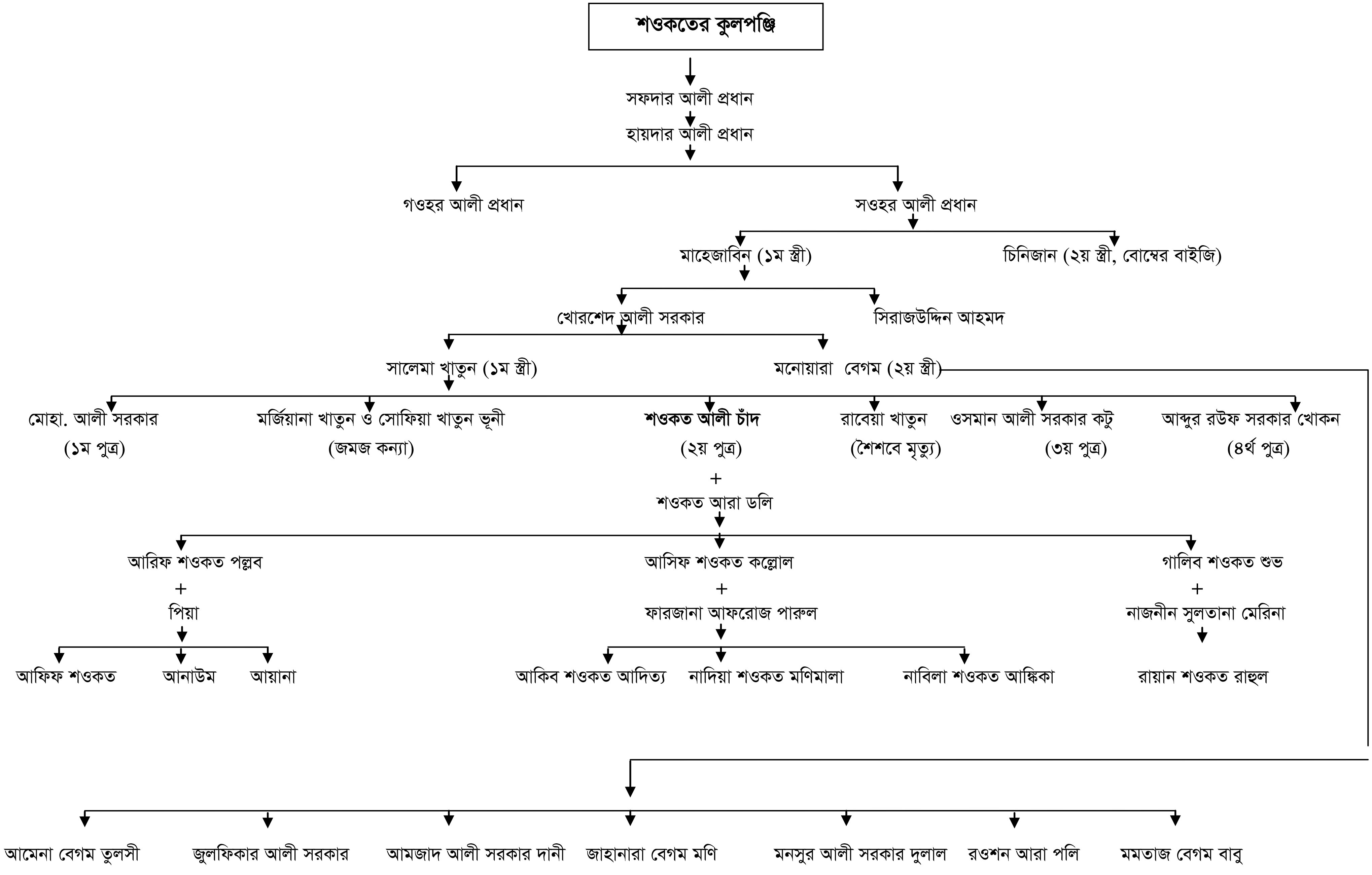

৩৫৬